

পাক পাঞ্জতন

অর্থাৎ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ), হজরত
আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত
এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত
এমাম হোছেন (রাজিঃ)
এর পবিত্র স্বহৃৎ জীবনী।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর জীবন-চরিত, হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবন-চরিত, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-
এর জীবন-চরিত, এসলাম-তত্ত্ব, প্রভৃতি বহু পুস্তক-পুস্তিকা
প্রণেতা, সুধাকর, মোলতান-কবুগ এছলাম প্রচারক
প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের
প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক বা সহযোগী সম্পাদক,
বঙ্গ-বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রণীত।

মূল্য ৯ পাঁচ টাকা মাত্র।

পাক পাঞ্জতনের সূচীপত্র

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-
এর জীবনী।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
প্রস্তাব ...	১
হজরত এছমাইল আলারহেস্‌সালাম হইতে হজরত রহুলে- আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (ছালঃ) পর্যন্ত কুর্সীনামা (বংশ-তালিকা) ...	৩
কোরায়েশ হইতে হজরত রেছালত-মাব (ছালঃ) পর্যন্ত বংশ-তালিকা ...	৪
আ-হজরত (ছালঃ)-এর জন্ম (মূল গ্রন্থে হেডিং নাই) ...	৫
শামের প্রথম সফর ...	১৪
হরবে ফোজ্জার অর্থাৎ প্রথম শরকৎ যুদ্ধ ...	১৫
হজরতের তেজারত বা সওদাগরী ...	১৭
শামের দ্বিতীয় সফর ...	২০
হজরত (সালঃ)-এর সঙ্গে বিবী খোদায়জা (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ ...	২১
আ হজরতের (ছালঃ)-এর ছাদেক এবং আল-আমিন উপাধি লাভ ...	২২
কোরেশদের উপর হজরতের নেতৃত্ব লাভ ...	২৪
হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত যয়েদ (রাজিঃ)-এর তরবিয়ত (শিক্ষাদি) ...	২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
খোদা তা-লার দিকে রুজু ও নির্জন-বাসের ইচ্ছা	৩১
ইসলাম-সূর্যোদয়	৩৪
তব্‌লিগুন্‌ই ইসলাম বা ইসলাম ধর্ম-প্রচার	৩৭
প্রকাশভাবে ইসলাম-প্রচার	৪৪
কোরেশদিগের শত্রুতাচরণ	৪৬
হজরত রহুলে-আকরম (ছালঃ)-এর সঙ্গে কোরেশদিগের বে-আদবী ও দুর্ব্যাহার	৫০
কোরেশগণের সন্ধির প্রার্থনা	৫২
আবু-তালেবের নিকট কোরেশদিগের দূত প্রেরণ	৫৪
হাবশাঃ অর্থাৎ আবিশিনিরায় হেজরত (মোসলমানদিগের প্রথমবার জন্মভূমি ত্যাগ)	৫৮
মক্কার কোরেশদিগের আর একটি অকৃতকার্যতা	৬১
হজরত আমীর হানযার ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ	৬৫
হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ	৬৮
শয়ব আবুতালেব	৭৪
আম আল্‌হাযন অর্থাৎ নবুরতের দশম বংশ	৮০
হজরতের সঙ্গে তায়েফ্বাসীদিগের বে-আদবী	৮৫
বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম-প্রচার	৯০
সুয়েদ বিন্‌-সামতের কথা	৯২
আয়াস্‌-বিন্‌-মায়ায্‌ (রাজিঃ)	৯৩
যমাদ আয্‌দি (রাজিঃ)	৯৪
তফিল-বিন্‌-ওমরু দওসি (রাজিঃ)	৯৫
আবুযর গফ্‌ফারি (রাজিঃ)	৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
মদীনার ছয়টি পবিত্রাত্মা ...	২৯
স্বক্‌বার বায়্‌য়েত্‌ বাঃ আওলা (স্বক্‌বার প্রথম দীক্ষা) ...	১০২
মরহুব-বিন্‌-য়মিরের মদীনায়া সাফল্য লাভ ...	১০৪
স্বক্‌বার দ্বিতীয় বায়্‌য়েত্‌ ...	১০৮
মদীনায়া হেজরত করিবার সাধারণ আদেশ ...	১১৪
দারম্মদওয়ার কোরেশদিগের সভা এবং পরম্পর পরামর্শ ...	১১৭
খোদা তায়ালার কর্তৃক হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি হেজরতের আদেশ ...	১২১
মুর গিরি-গহবরে সূর্য্য ও চন্দ্রের একত্র সমাবেশ ...	১২৬
হেজরতের ছফর ...	১৩২
ছফরের (প্রবাসের) পরিসমাপ্তি ...	১৩৬
হজরতের মদীনার প্রবেশ ...	১৪০
হিজরী সনের প্রারম্ভ ...	১৪৫
হেজরতের প্রথম বৎসর ...	১৪৬
হেজরতের দ্বিতীয় বৎসর ...	১৫৫
বদরের মহাযুদ্ধ ...	১৬১
হেজরতের তৃতীয় বৎসর ...	১৭৯
তুইজন দুর্ক্‌তের হত্যা-সাধন ...	১৮২
ওহদের তীষণ যুদ্ধ ...	১৮৪
হেজরতের চতুর্থ বৎসর ...	২০২
হেজরতের পঞ্চম বৎসর (৫ম হিজরী) ...	২১০
খন্দক অর্থাৎ পরিধার যুদ্ধ ...	২১৮
হেজরতের ষষ্ঠ বৎসর ...	২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
৭ম হিজরীর ঘটনাবলী	২৪২
হেজরতের ৮ম বৎসর	২৫৪
মৃত্যু: অভিযান ও তথায় ভীষণ যুদ্ধ	২৫৭
মক্কা-বিজয় (হেডিং নাই)	২৬৭
হানিন বা হেনায়নের ভীষণ যুদ্ধ	২৭৬
তায়েফ্ অবরোধ	২৭৯
আ-হজরত (ছালঃ)-এর মক্কা হইয়া মদীনায়া প্রত্যাবর্তন	২৮১
হেজরতের ৯ম বৎসর	২৮৪
তবুকের বিরাট অভিযান	২৮৯
হেজরতের দশম বৎসর	২৯৮
হজ্জতল ভেদা বা হজ্জ্ অল্-বালাগ্	৩০৪
হিজরীর একাদশ সাল (আ হজরত [ছালঃ]-এর পরলোক গমন)	৩০৭
আ-হজরত (ছালঃ)-এর হুনিয়া মবারক অর্থাৎ আকৃতি এবং শারীরিক গঠন	৩২২
আ হজরত (ছালঃ) সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়	৩২৫

দ্বিতীয় ভাগ ।

হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) :

প্রস্তাব	৩৪৭
হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর জন্মকথা	৩৫৪

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব (তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ, আ-হজরত (ছালঃ)- এর সঙ্গে বিভিন্ন জেহাদে অপূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ) ...	৩৬৭
বদরের মহাযুদ্ধ ...	৩৬৮
হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শুভ-বিবাহ ...	৩৭৪
আবু ছুফিয়ানের বিরুদ্ধে আ হজরত (ছালঃ)-এর অভিযান ...	৩৭৭
তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী (বনি-কিন্কায়ের যুদ্ধ) ...	৩৭৮
ওহদের ভীষণ যুদ্ধ ...	৩৭৯
চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী ...	৩৮৬
৫ম হিজরীর ঘটনাবলী (দোমতল-জন্দলের অভিযান) ...	৩৯১
খন্দক অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধ ...	৩৯২
বনি-করিজার সঙ্গে যুদ্ধ ...	৩৯৫
৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী ...	৩৯৬
৭ম হিজরী ঘটনাবলী ...	৪০০
হেজরতের ৮ম বৎসর ...	৪০৯
মৃত্যুর অভিযান ও তথায় ভীষণ যুদ্ধ ...	৪১১
নবম হিজরীর ঘটনাবলী ...	৪১৮
দশম হিজরীর ঘটনাবলী ...	৪২২
একাদশ হিজরীর ঘটনাবলী (আ-হজরত [ছালঃ]-এর পরলোক গমন) ...	৪২৬
হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের তৃতীয় পর্ব ...	৪৩৩
হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের শেষ পর্ব ...	৪৫৬

বিষয়

পৃষ্ঠা ।

মহামান্য খলিফার (আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর) মদীনা হইতে বশাতিমুখে যাত্রা	...	৪৭৫
জঙ্গ-জমল অর্থাৎ জমল যুদ্ধ	...	৪৮২
হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কুফায় রাজধানী স্থাপন	...	৪৯১
হজরত মোহাম্মদ-বিন-আবিবকর (রাজিঃ)-এর মেছেরের শাসনকর্তৃত্ব লাভ	...	৪৯৬
হজরত ওমর বিনন্ আহ (রাজিঃ) দামেস্কে	...	৪৯৫
ছফিন যুদ্ধ	...	৪৯৭
ছফিন যুদ্ধের প্রথম ভাগ	...	৫০০
ছফিন যুদ্ধের আর একসপ্তাহ	...	৫০৪
ছফিন যুদ্ধের শেষ দুইদিন (মহাসংহার কার্য)	...	৫০৫
আব্ব্রাহে মীমাংসাকারী (ছালেছ) দ্বয়ের ঘোষণা	...	৫১২
বিপ্লব-পন্থী খারেজী দল	...	৫১৬
হজরত গোবিরা (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে মেছের অধিকার	...	৫২২
হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর শাহাদৎ প্রাপ্তি	...	৫২৭
হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর আহ'লিয়া (দ্বী) ও সন্তান-সন্ততিগণ	...	৫৪১
স্বার্থনা	...	৫৫৫

তৃতীয় ভাগ।

খাতুন-জহরত হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ
(রাঃ-আঃ)-এর জীবনী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
প্রস্তাব	৫৪৫
স্বর্গের সম্রাজ্ঞী হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ-আঃ) ...	৫৫৩
১ নং উর্দু কবিতা	৫৮৪
২ নং উর্দু কবিতা	৫৮৬
৩ নং উর্দু কবিতা (হেডিং নাই)	৬১৬
মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকী আল্ ওয়াহেদী আকবরা বাদীর একটি উর্দু কবিতাংশ	৬৫০
আবদুল মজিদ ছিদ্দিকী ছাহেবের উর্দু কবিতাংশ ...	৬৫৬
মাষ্টার ছৈয়দ বাছেত আলী বাছেত বহওয়ানীর একটি উর্দু কবিতা	৬৬৬
মেছানমুহেন্দ হজরত আযিয্ মখ্‌নবীর একটি কবিতা ...	৬৬৯
মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকীর একটি উর্দু কবিতা ...	৬৭১
মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকী আকবরাবাদী ছাহেবের একটি প্রাণ- তোষিনী উর্দু কবিতা	৬৯৬
ঐ কবির লিখিত আর একটি উর্দু কবিতা ...	৬৯৮
শুকবি মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকীর আর একটি উর্দু কবিতা	৭১১

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
উপরোক্ত প্রসিদ্ধ কবির লিখিত আর একটি কবিতা (কনিষ্- ঘোইরাঃ - রাঃ—আঃ)	৭১৩
ফদকের মোসামেলা	৭১৭
ফদক কোথায় অবস্থিত ?	৭২৩
ফদক কিরূপে আ-হজরত (ছালঃ)-এর অধিকারে আসিয়াছিল	৭২৫

চতুর্থ ভাগ ।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)- এর জীবন চরিত ।

জীবনী আরম্ভ	৭৬৯
হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ পরিত্যাগ ও হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-কে খেলাফৎ প্রদান এবং তাঁহার হস্তে বস্য়েত (মূল গ্রন্থে হেডিং নাই)	৮০৯
হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর শাহাদত প্রাপ্তি (মূল গ্রন্থে হেডিং নাই)	৮১৬
খেলাফৎ হাছনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৮২০

পঞ্চম ভাগ ।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)- এর জীবনী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর (জন্ম-বৃত্তান্ত ...	৮৩১
কজায়েল ও মনাক্বব (সদৃশগাবলীও সদাচার) ...	৮৩৪
আরবী কবিতা (উর্দু অনুবাদ সহ) ...	৮৩৯
খোলক্ হোছারনী (সর্বপ্রকার সদ্যবহার ও ক্ষমাশূণ ইত্যাদি)	৮৩৯
এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর যোহদ ও তকওয়া (পরহেয্ গারী এবং পার্থিব সুখ-সম্পদে বিতৃষ্ণা) ...	৮৪১
শাদী (বিবাহ) ...	৮৪৩
আখ্বারে শাহাদৎ (শহীদ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী) ...	৮৪৭
এযিদের অলি আহাদী বা যুবরাজত্ব ...	৮৫৯
হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর 'ওফাত' (পরলোক গমন)	৮৬৯
এযিদ-বিন্-হজরত মোবিয়া ...	৮৭৪
হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মক্কা শরীফ হইতে কুফাভিমুখে যাত্রা ...	৯০৩
কারবালার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনা ...	৯১৩
কারবালার শাহাদত প্রাপ্ত মহাত্মাগণের নামের তালিকা ...	৯৪৮
কারবালার অন্যান্য শহীদগণের নাম ...	৯৪৯

ওবায়দুল্লাহ্ এব্‌নে বেরাদেব এব্‌নে মাবুছি (নৈরাশ্র)	...	২৫১
এমাম-বধ-রূপ পাপের প্রতিকূল ও শোচনীয় পৈশাচিক কার্যের ভীষণ প্রতিক্রিয়া	২৫৫
হজরত এমাম হোছেন (রাক্বিঃ)-এর শাহাদতের পরবর্তী কতিপয় ঘটনা । মোবিরা বিন্ এষিদের খেলাফৎ)	...	২৬৬
বশ্রায় এব্‌নে বেরাদ বদ-নেহাদেব বয়্‌য়েত গ্রহণ	...	২৬৮
তাজিয়াদারীর ইতিহাস	...	২৭৪
এরাকের কুফা শহর	...	২৮৮
নূতন কুফা	...	২৮৮
কারবালা শহর	...	২৮৯
হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের 'ছেব মবারক'	...	২৯৪
গ্রন্থকারের শেষ-প্রার্থনা	...	২৯৫

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

পাক পাঞ্জতন

অর্থঃ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ), হজরত
আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত
এমাম হাছন (রাজিঃ) — হজরত
এমাম হোছেন (রাজিঃ) —
এর পবিত্র স্বহৃৎ জীবনীঃ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) — এর জীবন-চরিত, হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) — এর জীবন-চরিত, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) —
এর জীবন-চরিত, এসলাম-তত্ত্ব, প্রভৃতি বহু পুস্তক-পুস্তিকা
প্রণেতা, সুধাকর, মোলতান-কব্বাগ এছলাম প্রচারক
প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের
প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক বা সহযোগী সম্পাদক,
বঙ্গ-বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক

নূশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রণীত ।

মূল্য ৯ পাঁচ টাকা মাত্র ।

প্রকাশক :—

মনিরুদ্দীন আহমদ

৩৩৭ নং আগার চিংপুর রোড,

কলিকাতা।



প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩৬ সাল, বৈশাখ।

কলিকাতা, ১৫৫ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট.

সোলেমানী প্রেসে

মোহাম্মদ সোলেমান দ্বারা মুদ্রিত.

ভূমিকা ।

গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-নিবেদন,—

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এখানে মুনশী মারুফুদ্দীন আহমদ মরহুম, জন্মস্থান—কাউনিয়া, বরিশাল টাউন । পূর্ব পুরুষদিগের বাসস্থান রাজা মাইলা, জেলা ঢাকা । অধীন থাক্কার সমাজের একজন অধ্যক্ষ ‘তাবেদার’ ও ক্ষুদ্রতম সেবক । লেখক বিগত ৫০ বৎসর যাবৎ বে, সমাজের সেবা ও বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন । মোসলেম-বঙ্গ-সাহিত্যের অন্ধকার যুগে যখন [redacted] সংখ্যক মোছল-মান, বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার প্রবৃত্ত ছিলেন ; সেই সময় এই অধ্যক্ষ সমাজ-সেবকের প্রাণে বঙ্গ-সাহিত্যালোচনার ইচ্ছা বলবতী হয় । অধীনের বিত্তা, সাধারণ বাঙ্গালার সীমাবদ্ধ—মধ্য-বাঙ্গালা অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি ক্লাস পর্য্যন্ত ; পরে কিঞ্চিৎ উর্দু । আমার শৈশবাবস্থায়—১২৭৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস ১লা রমজানুল-মবারক শুক্রবার প্রত্যবে, মদীয় পরম শ্রদ্ধের ওয়ালেদ মাজেদ বরিশাল—কাউনিয়াস্থ স্বীয় বাস-ভবনে এতেকাল করেন । ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে পরম শ্রদ্ধাভাজন জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পরলোক গমনে আমাকে বিতালয়ের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয় । তখন বঙ্গীয় মোসলেম-সাহিত্যক্ষেত্রে মীর মশাররফ্ হোছেন সাহেবেরই প্রধানতঃ প্রভাব দৃষ্ট হইত । আর মোলবী নসীমুদ্দীন মরহুম, মোলবী আনিছুদ্দীন আহমদ মরহুম, খান বাহাদুর মোলবী তছলিমুদ্দীন আহমদ মরহুম,

পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মশহাদী মরহুম, খান বাহাদুর মোলবী আবদুল আযিয্ মরহুম, মোলবী আবদুল হামিদ খান ইউছফ্ জয়ী মরহুম, ছৈয়দ আবদুল আগ্ ফর মরহুম, মোঃ নওশের আলী খান ইউছফ্ জয়ী মরহুম, কবির মোজাম্মেল হক্ ছাহেব, খান বাহাদুর মোলবী একিকুদ্দীন আহমদ ছাহেব, মুন্সী ওহাজুদ্দীন আহমদ মরহুম, মুন্সী শেখ আবদুর রহিম ছাহেব-প্রমুখ মুষ্টিমেয় মোহলেম-সাহিত্যিকের পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। অধীন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত রূপসা গ্রামে খীর পরম আত্মীয় মহাপরাক্রান্ত ■ দাতাগ্রগণ্য আদর্শ জমীদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজী মরহুম মগ্ ফুরের পরিবারভুক্তরূপে, তদীয় আশ্রয়ে থাকিয়া প্রথমে একটি পাঠশালার পরিচালন-ভার গ্রহণ করে; তৎকালে ঐ অঞ্চলে বাংলা বা ইংরাজী স্কুলের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। জমীদারী মন্তরে, সরকারী জায়গীরে, দুইজন অতি বিদ্বান্ মুন্সী ছাহেবের অধ্যাপকতার ঐ মন্তব প্রায় ৫০ জন ছাত্রকে আরবী ■ পারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। আরবী অর্থে কোরআন শরীফ্ বুকিতে হইবে। আমার ঐ পাঠশালাটি ক্রমে মধ্য-বাঙ্গালা ও মধ্য-ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হইয়া এক্ষণে একটি বিরাট হাইস্কুলে পরিণত হইয়াছে। আমি একটি "রিডিংরুম" স্থাপন করিয়াছিলাম, বর্তমানে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত। একটি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস স্থাপন করা হইয়াছিল, উহাও আমারই একান্ত উদ্যোগ ■ প্রচেষ্টায়। উহা এক্ষণে একটি উন্নতিশীল সাব-পোস্ট-অফিস। অধীনের অতি প্রিয় ছাত্র, স্থানীয় অগ্রতম ভূম্যধিকারী মুন্সী মোহাম্মদ মোজাফ্ ফর হোছেন মরহুম আজীবন আমার পরে পোস্টমাষ্টার ছিলেন; অধুনা তাঁহার একটি পুত্র পোস্ট-মাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন।

আমি ১২৮৫ কিংবা ৮৬ সালে, পণ্ডিতপ্রবর দয়ারসাগর মহানুভব

ঈশ্বর চন্দ্র বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত “ বোধোদয় ” নামক পুস্তকখানির কয়েকটি ভুল প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখি। তখন আমার বয়ঃক্রম ১৬১৭ বৎসরের অধিক নহে। ছেলেমানুষী খাম-খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেই পত্রখানি লেখা হয়; ৭৮ দিন পরেই পণ্ডিত প্রবর বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্র আমি প্রাপ্ত হই। পত্রখানিতে ঐ কয়টি ভুল স্বীকার করিয়া, আমাকে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বোধোদয় পুস্তকে, একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়া ভুল স্বীকার এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঐ বিজ্ঞাপনখানি বোধোদয় পুস্তকে তাঁহার জীবিত-কাল পর্য্যন্ত বরাবর ছাপা হইয়া ছিল। পরে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ উহা তুলিয়া দেন।

ঐ সময় “ বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ‘সময়’ ” প্রভৃতি ২ টাকা মূল্যের স্থলত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি জোরে-জোরে বাহির হয়। অধীন সর্বপ্রথমে হুগলীর “ এডুকেশন গেজেটে ” ও “ দৈনিক ” পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করি। পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের গোছলমান সম্রাট্দিগের নাম বিশুদ্ধভাবে লিখিয়া পাঠাই; তদনুসারে তিনি উহা সংশোধন করেন; রূপসার স্বনামধন্য জমীদার আমার ভাগিনেয় চৌধুরী আহমদ গাজী মরহুম মগ্‌ফুর পারসী ভাষার তওয়ারিখ্ হইতে ঐ সকল নাম আমাকে বিশুদ্ধভাবে লিখাইয়া দেন। ইনি পারস্ত ভাষার বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আবার পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র - বিজ্ঞারত্ন প্রেসে মুদ্রিত * ■ * বঙ্গদেশের ইতিহাসের অনেক স্থল সংশোধন করিয়া দিই। বিজ্ঞাসাগর মহাশয় ও বিজ্ঞারত্ন মহাশয় স্ব স্ব প্রণীত পুস্তকাবলী আমার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে দান করেন। তদানীন্তন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ■ আমার প্রার্থনানুসারে রাজকীয় ব্যয়ে

মুদ্রিত মহাভারত প্রভৃতি বহু পুস্তক আমার লাইব্রেরীতে প্রদান করিয়া-
 ছিলেন। পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ও নিজের সমস্ত পুস্তক দান
 করেন। ত্রিপুরা—পশ্চিমবঙ্গের নওয়াব ফয়েজুল্লাহ চৌধুরাণী ছাহেব মরহুমা-
 ও লাইব্রেরীর অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। জমীদার চৌধুরী আহমদ
 গাজী মরহুম এই লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর
 বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদিত “রাজস্থান” কলিকাতা—বহুবাজারস্থ বরাট
 প্রেস মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। আমি চিঠি-পত্র লিখিয়া তাঁহার সঙ্গে
 পরিচিত হই এবং লাইব্রেরীর জন্য রাজস্থান গ্রহণ করা হয়। এডুকেশন
 গেজেট, হুগলীর দৈনিক, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সময়, ঢাকা-প্রকাশ প্রভৃতি
 দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এই লাইব্রেরীতে মূল্য দিয়া গ্রহণ করা
 হইত। হিন্দুদিগের নূতন নূতন সংবাদপত্র দেখিয়া আমার মনেও জাতীয়
 মোছলমান সংবাদপত্র বাহির করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। এই সময় বাবু
 ■■■ কিশোর রায় নামক একজন কলিকাতা-প্রবাসী উত্তোগী পুরুষের সঙ্গে
 অধীনের পত্র-বিনিময় হইতে থাকে। তিনি তখন একজন কমিশন এজেন্ট
 ছিলেন। তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ
 করিতে থাকেন। আমার সংবাদপত্র বাহির করিবার ইচ্ছা এত বলবতী
 হইয়াছিল যে, সর্বদাই ঐ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। এই সময় বঙ্গবর
 কবি মোকাম্মেল হক সাহেবের লিখিত “কুসুমাজ্জলি” নামক পুস্তক
 খানির বিজ্ঞাপন বা সমালোচনা সংবাদ-পত্রে দেখিয়া, পত্র লিখিয়া উহা
 — গ্রহণ করা হয় এবং সেই সূত্রে তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হই। তখন অন্য
 কোনও মোছলমান লেখকের অস্তিত্ব আমি অবগত ছিলাম না ;
 কেবলমাত্র মীর মশাররফ হোছেন মরহুমের নামই অবগত ছিলাম ;
 কিন্তু তাঁহার লিখিত কোনও পুস্তক তৎকাল পর্যন্ত আমার দৃষ্টিপথে
 পতিত হইয়াছিল না। সম্ভবতঃ ১২৮৬ সালে “বোধোদয়-তত্ত্ব” নাম দিয়া

বোধোদয়ের একখানি বৃহৎ অর্থ-পুস্তক, ঢাকা-গির্গীশ যন্ত্রে মুদ্রিত করি। —
 কলিকাতার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে প্রধানতঃ উহা বিক্রয় হইত।
 পরে পরবর্তী সংস্করণ সমূহের ৫৬ হাজার করিয়া পুস্তক নগদ মূল্যে
 প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা গুরুদাস বাবু গ্রহণ করিতেন। পূর্বোক্ত
 পাঠশালাটি তখন মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। আমার
 শিক্ষক সাইসাদ্দা মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক উদার হৃদয়
 পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হেড্ পণ্ডিত, মাষ্টার-বসন্ত
 কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২য় শিক্ষক এবং আমি তৃতীয় শিক্ষকের পদে
 কাজ করিতে থাকি। স্কুলের কতকগুলি কার্ণিচার এবং আমার দোকানের
 কতকগুলি জিনিষ-পত্র খরিদ-জন্ত ১২৮৬ কিংবা ৮৭ সালে আমার পরম
 বন্ধু নৌলবী মহাশয়দিন আহ্নদ এবং দোকানের প্রধান কর্মচারী মুন্সী
 নাসিরুদ্দীন সাউদকে সঙ্গে লইয়া সর্ব-প্রথমে ষ্টীয়ার ও রেলযোগে
 আমি কলিকাতায় আগমন করি। ঐ সময় সংস্কৃত “পদ্ম-প্রহ্নন” নামী
 একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মির্জাপুর—পটলডাঙ্গার ব্যানার্জী প্রেসে ছাপাইয়া
 লই। ১১০ দিন কলিকাতায় থাকিয়া, কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া
 ও আবশ্যক জিনিষ-পত্র লইয়া কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রূপসা রওয়ানা
 হই। বেলেঘাটা হইতে সুন্দরবন ঘুরিয়া ১৫ দিনে রূপসার পঁহুছিয়া ছিলাম।
 স্কুলের জন্ত চেয়ার, টেবিল, ক্লকঘড়ি, বড় বড় মানচিত্র, কতকগুলি
 বাধাই খাতা-পত্র, ডিক্সনারী, অভিধান প্রভৃতি নেওয়া হইয়াছিল। রূপসা
 বাজারে আমার একখানি কাপড় এবং মনোহারী দোকান ছিল। ত্রাঞ্চ পোই
 মাষ্টারও আমিই ছিলাম। আমার ও আমার ওয়ালেদা মাজেদার খাওয়া
 দাওয়া এবং বস্ত্রাদি সমস্ত মদীয় আত্মীয় জমীদার ছাহেবের নিকট হইতে
 পাইতাম। আমি একই দস্তুরখানে বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতাম।
 এমন কি, আমার দোকানের ২১৩ জন কর্মচারীর খোরাকীও সরকারে

—ছিল। এই সময় আমার মাসিক আয় ২৫ টাকার কম ছিল না। ইহার উপর বরিশালে একখানি তালুকের ও কাউনিয়া বাসাবাড়ীর খাজানা বৎসরে ৭০—৭৫ টাকা পাইতাম। এত সুবিধা স্বত্বেও বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও জাতীয় সংবাদপত্র বাহির করিবার প্রবল বাসনা আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আর পল্লীগrame কুপ-মণ্ডুক হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা হইল না। অবশেষে ১২৯০ সালের ভাদ্র মাসে প্রায় ২০০০ টাকার জিনিস-পত্র সম্বলিত ঐ দোকানটি কর্মচারীদিগের হস্তে ফেলিয়া, অত-বড় হিতৈষী আত্মীয় জমীদার ছাহেব এবং অজ্ঞাত আত্মীয়-বন্ধুবর্গের নয়া-পাশ ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান কলিকাতায় আসিয়া পড়িলাম। কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যামোদীর মধ্যে মিত্রবর পণ্ডিত রেয়াতুদ্দীন আহমদ শাহ্‌হাদী মরহুমকে মাত্র প্রাপ্ত হইলাম; আর বন্ধুবর কবি মোজাম্মেল হক সাহেবের সাক্ষাৎ মাত্র পাইলাম; কিন্তু তিনি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া স্বীয় বাসস্থান “শান্তিপুরে” চলিয়া গেলেন। বাবু চন্দ্র কিশোর রায় আমাকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; আমার জন্য তিনি পূর্বেই মির্জাপুর—৬৪ নং ওল্ড বৈঠকখানা রোডে একটি পাকা কানরা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন; হাফেজ আবদুল আজিজ ছাহেব ঐ বাড়ীর স্থায়ী ভাড়াটে ছিলেন। আমি আমার বাল্য-বন্ধু ও রূপসার জমীদার ছাহেবের চাচ্চাষাদ ভাই চৌধুরী আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুমের সঙ্গে ঐ গৃহে বাস করিতে লাগিলাম।

কলিকাতায় পহুঁচার মাস দুই পরে একদা মহানুভব বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। সে দিনের কথা স্মরণ করিতে আজও আমার হৃদয়ে আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। মনে আছে, শৈশবে—১২৭৫ বা ৭৬ সালে ওয়ালেদ মাজেদ মরহুম মগ্‌ফুরের নিকট বিজ্ঞাসাগর মহাশয়-প্রণীত “বর্ণ-পরিচয়” পুস্তকখানি পাঠ করিয়া

ছিলাম। প্রায় ২০ বৎসর পরে আজ সেই পুস্তকের বিশ্ব-বিস্তৃত গ্রন্থকার — মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। আমি বিভাগাগর মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, দুইটি সুষ্টপুষ্ট স্নাতক বালক বাহিরে (বিস্তৃত আঙ্গিনায়) খেলা করিতেছেন; পরে জানিতে পারিলাম, ইঁহারা তাঁহারই দুইটি দৌহিত্র-রত্ন—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর। একতলে বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, একজন ধূতি-চাদর পরিহিত সুদর্শন হিন্দু যুবক তথায় বসিয়া আছেন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, ইঁনি একজন নবাগত হিন্দু ব্যারিষ্টার। ভূত্য একখানি গ্লেট ও পেন্সিল আনিয়া দিলে, উভয়ে তাহাতে নাম লিখিয়া দিলাম। ভূত্য গ্লেটখানি লইয়া উপরে চলিয়া গেল। ২।৩ মিনিট পরে আসিয়া সে আমাকে উপরে বাইতে ইঙ্গিত করিল। তদনুসারে আমি তাহার সঙ্গে দ্বিতলে আরোহণ করিলাম। প্রথমে একটি বৃহৎ কামরায় আমাকে লইয়া উপস্থিত করিল। দেখিলাম, অতি সুন্দর সোণালী বাইণ্ডিং করা কেতাব সমূহে পরিপূর্ণ ১০।১২টি গ্লাস কেশ আলমারী ঐ কামরায় রহিয়াছে। একটি ভূত্য পরিষ্কার ক্রমাল দিয়া এক একখানি পুস্তক মুছিয়া আলমারীর যথা-স্থানে রাখিতেছে; একখানি প্রকাণ্ড টেবিলের চারিদিকে ১০।১২ খানি চেয়ার। টেবিলের উপর একখানি পিতল নির্মিত ক্ষুদ্র ছাণ্ডে দেখিলাম একখানি লেপাফায়ুক্ত পত্র। পত্রখানির শিরোনামা দেখিয়া চিনিতে পারিলাম, আমার লিখিত সেই পত্রখানি—বাহা ৪।৫ বৎসর পূর্বে আমি বিভাগাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম। আমার পত্রখানি এরূপ যত্ন-পূর্বক রাখিতে দেখিয়া আমি নিতান্তই বিস্ময়াগত হইলাম। সেখানে ২।৩ মিনিট বসিবার পর ভূত্য আমাকে আর একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। দেখিলাম, সেই প্রকোষ্ঠেও এরূপ সুন্দর গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ আলমারী-গুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান আছে; একখানি বৃহৎ টেবিলের পাশে

- সোমা-মূর্তি এক প্রবীণ পুরুষ চেয়ারে বসিয়া আছেন, কিন্তু চেয়ারে তিনি পৃষ্ঠ সংলগ্ন করেন নাই। আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্ত-সহকারে পার্শ্ববর্তী ১ খানি চেয়ারে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি “সালাম” করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমি মনে করিয়া-ছিলাম, তুমি একজন বয়স্ক পুরুষ; এখন দেখিতেছি তরুণ যুবক মাত্র। তোমার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইহার পর আমাকে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আদবের সঙ্গে উত্তর দিতে লাগিলাম; কি উদ্দেশ্যে ‘সুদূর মফঃস্বল ছাড়িয়া কলিকাতার আসিয়াছি, তাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার উদ্দেশ্যের বিষয় শুনিয়া বেশ আনন্দানুভব করিলেন। কলিকাতা বড় প্রলোভনময় স্থান; নবগত লোকের জন্ত নানা বিপদের আশঙ্কা; নানা শ্রেণীর জুরাচোর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; নূতন লোক পাইলেই জালে ফেলিতে চেষ্টা করে; ইত্যাকার বহু উপদেশই আমাকে প্রদান করিলেন। নিজের সম্বন্ধে বলিলেন, পূর্বে আমি লাট সাহেব ■ বড় বড় সাহেব সুবাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতাম, ইদানীং আমি আর তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না। আর সেই শ্রেণীর সহৃদয় সাহেব-সুবাও আজকাল বড় একটা বিলাত হইতে এদেশে আইসেন না। আমার পরিচয়াদি বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; অবশেষে বলিলেন, মাঝে মাঝে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। এইবার আমি ভক্তিতাবে সালাম করিয়া বিদায়-গ্রহণ করিলাম। ভৃত্যটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নিরে নামিয়া আসিল; সে আমাকে বলিল, বিজ্ঞাসাগর মহাশয় এত অধিক সময় পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে বসিয়া আলাপ করেন না; পাঁচ-দশ মিনিটকাল আলাপ করিয়াই বিদায় দেন। আশ্চর্যের বিষয়, আপনার সঙ্গে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত খুব আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করিলেন। আমি নীচে নামিয়া আসিলে

ভৃত্যটি সেই ব্যারিষ্টার সাহেবকে ডাকিয়া উপরে লইয়া গেল। আমি ৪ টার পরে আছরের নমাজ পড়িয়া বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের বাড়ী গিয়া-ছিলাম এবং প্রায় ৫।০ টা কিংবা ৫দ০ টার সময় ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বাসগৃহ হইতে তাঁহার আবাস বাটী (বিজ্ঞাসাগর বাটী) অধিক দূরবর্তী ছিল না। চন্দ্র কিশোর বাবুকে বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপাদির বিষয় বলাতে তিনি অত্যন্ত বিশ্বয় প্রকাশ করিলেন। অতঃপর কয়েক মাস পরে শীতকালে গিয়া একদিন সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁহার গায়ে একখানি বনাত ছিল; সে দিনও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল আলাপাদি করিয়াছিলেন।

ঐ শীতকালেই একদা আমি ঢাকা—বিক্রমপুর—বানারি, ও ত্রিপুরা—রূপসা গমন করিয়াছিলাম; এবং ঢাকা শহরে কিয়দ্বিবস থাকিয়া তত্রত্য “মুসলমান-মুহম্মদ-সম্মিলনীর” অনুষ্ঠান বন্ধুদিগের অনুরোধে—বিশেষতঃ অক্সান্তকর্ম্মী সমাজ-সেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মোলবী আবদুল আশ্বি-বি-এ মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেকদিন আমাকে ঢাকায় আট্কাইয়া রাখিলেন।

ঢাকা হইতে বানারি হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন পূর্বক, মিত্রবর পণ্ডিত রেন্নাজুদ্দীন আহমদ ছাহেবের সঙ্গে সংবাদ-পত্র পরিচালন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমাকে আবার ঢাকা—বানারি আমার ফুফাতো ভগিনীপতি চৌধুরী গোলাম আহমদ ছাহেবের বাড়ীতে যাইতে হইল। ঐ সময় আমার ওয়ালেদা মাজেদা ছাহেদা ও বানারিতেই ছিলেন। বিক্রমপুরের কোনও ভূম্যধিকারীর পিতৃহীনা কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল; তজ্জনাই এত শীঘ্র বানারিতে প্রত্যাগমন! এই অবসরে বন্ধুবর চৌধুরী আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুম তাঁহার মাতুল ও খালা ছাহেবার সঙ্গে তাগলপুরে তাঁহাদের পীর

— ছাহেবদিগের আস্তানায় গমন করিলেন তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রেল-গাড়ীতে বন্ধমানে তাঁহার কলেরা হইল এবং কলিকাতা আসিয়া বিশেষ চিকিৎসাধীন থাকিয়াও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার মাতা ভ্রাতা এবং ভগিনিগণও আমার পক্ষে ইহা একটি অতীব শোকাবহ ঘটনা ছিল।

এই সময় প্রসিদ্ধ লেখক মীর মশাররফ হোছেন মরহুম ময়মনসিংহ— দেলহুয়ারের জমীদার-পত্নী করিমন্নেছা খানম ও তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র-দ্বয়ের পক্ষে টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন; এবং তাঁহার প্রণীত-“বিবাদসিদ্ধ” পুস্তকখানিও প্রায় এই সময় বাহির হইল। আর এ, কে গজনভী ছাহেব সেই বৎসরই বিলাত গমন করিলেন। ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক গজনবী ছাহেবকে লইয়া মীর ছাহেব একদিন আমাদের সেই ক্ষুদ্র বাসায়— ৬৪ নং ওল্ড বৈঠকখানা রোড—গির্জাপুরে আগমন করিলেন; আমিও একাধিকবার তাঁহাদের ওয়েলেসলী ট্রাট্‌স্ বাড়ীতে গমন করিয়াছিলাম। অতঃপর যে সকল সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র ঘটিত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি।

(১) আমি ১ম বার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, রাইট অনারেবল ছৈয়দ আমীর আলী মরহুমের (তখন তিনি ব্যারিষ্টার) কেরানী আবদুল হাকীম নামে বিজ্ঞাপিত ও “ইণ্ডিয়ান একো” নামক ইংরেজী সংবাদ পত্রের পরিচালক বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পরিচালিত “মুসলমান” নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হইলাম। পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত ও পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় আমার এই নিয়োগ-কার্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; কিন্তু এই কাগজখানি ১০।১২ সপ্তাহের অধিককাল জীবিত ছিল না।

(২) ২য় বার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইলাম, আমার সেই হিন্দু বন্ধু বাবু চন্দ্র কিশোর রায় “শ্রীমন্ত সওদাগর” নামক

একখানি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া, স্বীয় কার্য-
স্থল মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, হইতে ৩নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত
করিয়াছেন। বাবু কালী নারায়ণ সায়্যালের “ভারত-মিহির প্রেসে”
পঞ্চাশনতলা লেন হইতে কাগজখানি ছাপা হইয়া বাহির হইত।
আমি সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ করিতে লাগিলাম। রাত্রি ১০টা ১১টা
পর্যন্ত আমাকে অনেক সময় ছাপাখানায় থাকিয়া ঐ কাগজের প্রকৃ-
তি দেখিতে হইত। ঐ সময় কালী নারায়ণ বাবু ও সিটি কলেজের অঙ্ক
শাস্ত্রের প্রোফেসর (পরে আলীগড় কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের প্রোফেসর)
বাবু যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ
স্থাপিত হয়। অতঃপর চন্দ্র কিশোর বাবু নিজে একটি ছাপাখানায়
প্রতিষ্ঠা করিতে আমাকে বাধ্য হইয়া আহীরীটোলার নিকটস্থ
৭ নং মাণিক বস্তুর ঘাট ষ্ট্রীটে বাসস্থান নির্দেশ করিতে হয়।

ইতিপূর্বে ডক্টর ও সেন্ট জেভিয়ার কলেজদ্বয়ের আরব্য-পারশ্চাধ্যাপক
সমাজ-হিতৈষী মহাপ্রাণ মোলবী মেয়রাজুদ্দীন আহমদ ছাহেবের সঙ্গে
আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সংবাদপত্র পরিচালন
সম্বন্ধে তিনি আমাকে মহা উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঢাকা—
মুসলমান-সুহৃদ-সম্মিলনীর অধুরোধে বালিকাদিগের শিক্ষার্থে মোলবী
ছাহেব ও আমি “তোহফতুল মোসলেমিন” নামক একখানি মসুলার
কেতাব প্রণয়ন করি; সাপ্তাহিক প্রেসে উহা ছাপা হইয়াছিল। মুসল-
মান-সুহৃদ-সম্মিলনী ছাপার আংশিক ব্যয় প্রদান পূর্বক, অনেকগুলি
পুস্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় বন্ধুবর কবি মোজাম্মেল হক
ছাহেব ষ্ট্রিমারযোগে শান্তিপুর হইতে আসিয়া, আমার গৃহে কখন
কখন অবস্থান করিতেন। এখানে আসিয়া দেখিলাম, তিনি নীলের
দালালী-এবং কমিশন এজেন্টের কাজ করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন

করিতেছেন। আমাকে ঘরভাড়া ও খোরাকি বাবদ মাসে ২০/- ২৫/- টাকার বেশী দিতেন না। ক্রমে তাঁহার মেধাজের পরিবর্তন ঘটিল, গতিক ভাল নয় দেখিয়া আমি তাঁহার সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এই সময় আমার আবার ঢাকায় যাওয়া হইল। ঢাকাই বঙ্গগণ মোসলমান-মুহম্মদ-সম্মিলনীর কাজে প্রায় ৬ মাসকাল আমাকে ঢাকায় রাখিলেন। কলিকাতায় কিরিয়া আসিয়া ঐ স্থান—মানিক বঙ্গুর ঘাট স্ট্রীট, পরিত্যাগ পূর্বক মির্জাপুরে চলিয়া আসিলাম।

এই সময় “ক্রেসেন্ট” নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের পরিচালক মুনশী আবদুল ময়েজ একখানি বাংলা সংবাদপত্র বাহির করিবার মতলব করিলেন। বঙ্গবর মোলবী মেয়রাজ্ উদ্দীন আহমদ ছাহেব আমাকে ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। যে কোনওরূপে একখানি জাতীয় সংবাদপত্র বাহির করা—আমাদের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু তখন আবদুল ময়েজ ছাহেবের পুঁজিপাটা ইংরেজী সংবাদপত্র “ক্রেসেন্ট” কর্তৃক প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। যদিও “নব-সুধাকর” নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি আমার সম্পাদকতায় বাহির হইল; কিন্তু ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যেই উহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছিল।

৩। ইতিপূর্বে খান বাহাদুর মোলবী একিউদ্দীন আহমদ বি-এ ছাহেব কর্তৃক “ইসলাম” নামক মাসিক পত্র ২।৩ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত মাসিকপত্র সম্বন্ধেও আমি কতকটা খাটিয়াছিলাম।

৪। এই সময় মুনশী শেখ আবদুর রহিম ছাহেব, মোলবী মেয়রাজুদ্দীন আহমদ ছাহেবের সাহায্যে হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর জীবন-চরিত প্রথমে বাহির করেন এবং ঠিক ঐ সময়ই আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও

বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময় আমরা উভয়ে সংবাদপত্র বাহির করিবার উদ্দেশ্যে ব্যারিষ্টার ছৈয়দ আমীর আলী ছাহেবের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

৫। অতঃপর মোলবী ছাহেব, শেখ ছাহেব ও আমি “এসলাম-তত্ত্ব” নামক এসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক গ্রন্থখানি বাহির করি। উহার ২য় খণ্ড বাহির হইয়াছিল এবং মোছলমানদিগের ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ান ধর্মাবলম্বনের গতিরোধ করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়া ছিল। তদানীন্তন ইণ্ডিয়া গেজেটে এই পুস্তকখানির অতি উচ্চ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

৬। ইতিমধ্যে পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় আমি প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রস্তোত্তর এবং আরও কয়েকখানি অর্থ পুস্তক লিখিয়া দিয়াছিলাম। তজ্জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক ও পাইয়াছিলাম।

৭। “এসলাম-তত্ত্ব” প্রকাশের পর আবার আমাদের মনে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিবার প্রবল বাসনা জন্মিল। তখন বৈঠকখানা রোডের ৮০ নং বাড়ীতে আমাদের কার্যালয়।

১২৯৫ সালের প্রারম্ভে কলিকাতা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মোলবী আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুমের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ, নওশাব বদরুদ্দীন হায়দার খান বাহাদুর মরহুমের প্রবৃত্তি ও তত্ত্বাবধানে, তাঁহারই গৃহে সুসম্পন্ন হইল। ১২৯৬ সালের আশ্বিন মাসে আমরা “সুধাকর” নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ৯০ নং ওল্ড বৈঠকখানা রোড হইতে বাহির করিলাম। এই সংবাদপত্রের ইতিহাস বহু বিস্তৃত। চৈত্র মাস পর্যন্ত ছয়মাসকাল আমরা ইহা চালাইয়া ছিলাম। ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে হাইকোর্টের তদানীন্তন স্বনাম প্রসিদ্ধ উকীল মোলবী (পরে

নওয়াব) ছেরাজুল এছলাম খান বাহাদুর ইংহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় আমি উহার বেতনভোগী সম্পাদক ছিলাম। ছয়মাস-কাল চালাইয়া প্রায় ২১২২ শত টাকা ক্ষতি বহন করিয়া তিনি কাগজ-খানি বন্ধ করিলেন।

৮। ইংহার কিছুকাল পূর্বে খান বাহাদুর মোলবী কবিরুদ্দীন আহমদ মরহুমের মৃত্যু হওয়াতে, তদীয় সুবিখ্যাত ছাপাখানা “উর্দু গাইড প্রেস”, “উর্দু গাইড” সংবাদপত্র ও ইংরাজী “নোহামেডান অবজার্ভার” নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের স্বত্ব হাইকোর্টের উকীল মোলবী (পরে নওয়াব স্তার) ছৈয়দ শমসুল হোদা এম-এ, বি-এল ছাহেব ও তাঁহার পরম বন্ধু মোলবী মোহাম্মদ আমজদ ছাহেব ক্রয় করেন। “সুধাকর” চালাইবার ভার ও তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি পূর্ববৎ উহার সম্পাদক ছিলাম।

৯। একবৎসর পরে নওয়াব ছাহেব ছাপাখানা ও “সুধাকর” সংবাদপত্রের সংস্রব ত্যাগ করেন। তখন মোলবী মোহাম্মদ আমাজদ ছাহেব একাকীই প্রেস ■ কাগজ চালাইতে থাকেন; এই সময় কাগজ সম্পর্কে আমি একটা মানহানীর ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়ি। কিছুদিন পরে “সুধাকর” চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

১০। ১২৯৯ সালে আমি “বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা” বাহির করি। ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত উহা চলিয়াছিল। অবশেষে নানা বিপদ পরম্পরায় আমি উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হই।

১১। ঐ সময় আমি “রেয়াজুল ইসলাম প্রেস” নামক একটি ছাপাখানা স্থাপন পূর্বক, মোছলমান গ্রন্থকারদিগের পুস্তকাবলী বিশেষরূপ সংশোধন করিয়া ছাপিতে আরম্ভ করি।

১২। ১৩০৬ সালে মংকৃত "গ্রীস-তুরক-বন্ধ" প্রথমভাগ মুদ্রিত হয়। পরে উহার দ্বিতীয়ভাগ ও বথাসময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩। ১২০৮ সালের আশ্বিন মাসে আমার সর্বশুণালঙ্কৃত আহলিয়া (পত্নী) আয়েশা খাতুন চাহেবা অকস্মাৎ এন্তেকাল করেন; ইহা আমার জীবনের আর একটি ভীষণ শোকবহ ঘটনা। এই ব্যাপারে আমার সংসার-বন্ধন ছিন্ন। পারিবারিক শৃঙ্খলার লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যায়।

১৪। ১৩০৯ সালের মাঘ মাসে, বশোহর মির্জানগর (বাদশাহী সময়ের প্রাচীন শহর) নিবাসী এবং বশোহর চাকলার কাজী বংশধর ছৈয়দ রহমান বখশ্ ডকে বাদশাহ মিয়া পেশকার মরহুমের ২য় কন্যা হাফেজা খাতুনের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার নদীয়া—কুষ্টিয়ার অধিবাসী ছিলেন। আমার এই আহলিয়া চাহেবা "মোসলেম-পাক-প্রণালী" ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গীয় মোছলমান-সমাজে ইহা বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে।

১২৯৬ কিংবা ৯৭ সালে আমি বঙ্গীয় মোছলমানদিগের একনিষ্ঠ নেতা কন্সবীর নওয়াব বাহাদুর আবদুল লতীফ মরহুমের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি আমার প্রতি বিশেষ বৈহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন।

১৫। ইহার পর মংকৃত "কৃষক-বন্ধ", "আমার সংসার জীবন", "জঙ্গেরাম ও ইউনান", "হক নছিহত" প্রভৃতি পুস্তক ও পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৬। সম্ভবতঃ ১৩১২ সালে "সোলতান" সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতায়, রংপুর—মহীপুরের বিখ্যাত জমীদার খান বাহাদুর চৌধুরী আবদুল মজীদ-মরহুম ও মোলবী মির্জা মোহাম্মদ ইউছফ আলী সাব রেজিষ্টার মরহুমের অর্থানুকূল্যে, বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুন্নাহ্ মরহুম, এছলাম প্রচারক মুন্সী জমিরুদ্দীন বিজ্ঞাবিনোদ চাহেব

মোলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছাহেবের বিশেষ সাহায্যে বাহির হয়। মোলবী নূর আহমদ ছাহেব (অধুনা হাইকোর্টের পুরাতন রেকর্ড-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী ও কলিকাতা—টালিগঞ্জের ম্যারেজারোজ্জোয়ার) ও মাষ্টার ওয়াজেদ আলী মরহুম সহকারী সম্পাদক এবং প্রসিদ্ধ বক্তা ও গ্রন্থকার দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহমদ ছাহেব কাগজের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় দুইবৎসর পরে নানাপ্রকার গোলযোগ ও বিপ্লবে কাগজখানির ছাপাখানা ও দফ্তর প্রথমে কড়িয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া সিন্দুরিয়া পড়িতে—মাওলানা হাকের জামালুদ্দীন মরহুমের মসজিদে যায় এবং কিছুকাল পরেই বন্ধ হয়; তদনন্তর নূতন পলিসীতে (কংগ্রেসীমতে দীক্ষিত হইয়া) মোলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছাহেবের সম্পাদকতায় চলিতে থাকে; অবশেষে নানা পরিবর্তনাদির পর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া বন্ধ হয়।

১৩১৫ সালে আমি মাননীয় নওয়াব ছৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মরহুমের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত “মিহির ও সুধাকর” সংবাদ পত্রের সহযোগী সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হই। ইহার কিছুকাল পরে এই সংবাদ-পত্রখানি চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

যখন জনাব মাওলানা শাহ্ ছুফী মোহাম্মদ আবুবকর পীর ছাহেবের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং মোলবী আবদুর রহমান ছাহেবের তত্ত্বাবধানে ও মুন্শী শেখ আবদুর রহিম ছাহেবের সম্পাদকতায় “মোসলেম-হিতৈষী” বাহির হয়, তাহার কিয়ৎকাল পরে আমি উহার এডিসনাল সম্পাদক নিযুক্ত হই। পরে কাগজের আপিস-গৃহাদি অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে উহা কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

নিজের বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলাস্থ পৈতৃক ভূ-সম্পত্তির দরুণ নিম্ন আদালত হইতে হাইকোর্টে পর্যন্ত মোকদ্দমায়, এবং “বেরাদরে

ইউছফ্” রূপী হিন্দুভাতাদিগের চক্রান্তে কয়েকখানি পুস্তক প্রেসে ছাপা হওয়ার দরুণ আমি আদালতে অভিযুক্ত হইয়া দুইবার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হই। এই সকল মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্যন্ত পরিচালনে বহু অর্থ ব্যয় হওয়াতে আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। অতঃপর ১২২১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৪ খৃঃ অব্দে) ইউরোপের মহাযুদ্ধে কাগজ, কালী প্রভৃতি ছাপাখানার সরঞ্জাম নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়ে; কাজেই ছাপার কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। বাড়ী ভাড়া ১৫০—১৬ টাকা হইতে ৪০—৪২ টাকায় পরিণত হয়; সুতরাং ঋণজালে আরও বিষমভাবে জড়িত হইয়া পড়ি।

অতঃপর এই বিপদকালে ১৩২৩ সালে আমার ওয়ালেদা মাজেদা চাহেবা এন্তেকাল করেন। সেইদিন হইতে আমার বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া আইসে। কারণ আমাকে দোওয়া করিবার জন্য কোনও মুকদ্দমাই অবশিষ্ট রহিলেন না। এই সময় প্রায় ৪০০০ টাকার পুস্তক ও ২৫০০ টাকা মূল্যের ছাপাখানাটি কোন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করি। দুই বৎসর পরে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি সে আমার তৎসমস্তই আত্মসাৎ করিয়া আমাকে একেবারেই কপর্দক শূন্য করিয়াছে। অর্থাভাবে যথাসময়ে মোকদ্দমাও রুজু করিতে পারিয়াছিলাম না; সুতরাং নিতান্ত দৈন্য-দশায় পতিত হই।

ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গীয় মোছলমানদিগের গৌরব-কেতন, হাইকোর্টের এডভোকেট, প্রকৃত সমাজ-হিতৈষী মোলবী এ, কে, ফজলুল হক এম-এ, বি-এল (আমার ওয়ালেদ মাজেদ মরহুমের পরম বন্ধু দাতা ও সহৃদয় কাজী আকরম আলী মোখতার মরহুমের পৌত্র এবং বরিশালের গবর্ণমেন্ট প্লীডার, স্বনামখ্যাত উকীল, আমার ভক্তি-ভাজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থানীয় মোলবী মোহাম্মদ ওয়াজেদ বি-এল মরহুমের পুত্র-বধূ) স্বীয় তত্ত্বাবধানে

পরিচালিত “নবযুগ” সংবাদপত্রের সম্পাদক-পদে আমাকে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, বিপদকালে তিনি আমাকে ক্রমশঃ পাঁচশত টাকা অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই সময় এক ব্যারিষ্টার বন্ধু, বঙ্গীয় প্রজা-দিগের স্বার্থ রক্ষার্থে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি তদানীন্তন বঙ্গীয় কাউন্সিলের মেম্বরও ছিলেন। তিনি আমাকে ঐ কাগজের সম্পাদক মনোনীত করেন। আমি কাগজখানির নাম রাখিলাম “রায়ত-বন্ধু”। ব্যারিষ্টার সাহেব বিনা পুঁজিতে কাগজ বাহির করিলেন। রায়ত সম্প্রদায়ের সাপক্ষে অলস্তু ভাষায় প্রবন্ধাদি লেখাতে কাগজের গ্রাহকও বেশ বাড়িতে লাগিল; কিন্তু বিনা পুঁজিতে কি কাগজ চলিতে পারে? কিছুদিন পরে কাগজখানি বন্ধ হইল। এইরূপে একখানি অতি প্রয়োজনীয় সংবাদপত্রের সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সময় আমি বেকার ও সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু খোদা-তা’লার বিশেষ অনুগ্রহে একটি বৃহৎ ছাপাখানার বহু কার্যভার পাইয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে সক্ষম হইলাম।

অতঃপর প্রায় ৩ বৎসর পূর্বে আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, বঙ্গের অধিতীয় বাগ্মী সোদর-প্রতিম মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, মরহুমের সহকর্মী ও সহযোগী, বঙ্গবিখ্যাত বক্তা নদীয়া—গাঁড়াডোব নিবাসী মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ছাহেব, মুন্শী তাজুদ্দীন আহমদ মরহুমের অতি প্রাচীন ছাপাখানার অন্ত্যতম উত্তরাধিকারী ও তদীয় ভ্রাতৃপুত্র, বটতলার প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক—এখন হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে যিনি মুসলমান-সমাজে ধর্ম ও শিক্ষার আলো প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যিনি বঙ্গের পুঁথি-সাহিত্যের একজন আদি প্রচারক, মুসলমান-সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র, স্বজাতি-বৎসল, সমাজগতপ্রাণ, অক্লান্ত কর্মী এবং আমার বন্ধু স্থানীয়, ঢাকা—

গড়পাড়া নিবাসী মুন্শী মনিরুদ্দীন আহমদ মরহুমের সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ আফতাবুদ্দীন আহমদ “সাহিত্য-রত্ন” ছাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার দ্বারা “পাক-পাঞ্জতনের” পবিত্র জীবন-চরিত লিখাইবার অতিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আফতাব মির” প্রয়োজনীয় উর্দু গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেন। পাক পাঞ্জতনে এই ৫টা জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (ছালঃ); ২। হজরত আলী (কঃ—ওঃ); ৩। খাতুনে-জন্নত হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ); ৪। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ); ৫। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)—এই চারিজন মহামানবীর পুরুষ ও একজন মহামানবীয়া নারীর জীবন-চরিতই “পাক পাঞ্জতন” এর জীবনী। সর্ব প্রথমে হজরত রছুলে-আখেরজ্জমান (ছালঃ)-এর জীবনী বিস্তৃত আকারে লিখিয়া স্বতন্ত্ররূপে বাহির করা হয়। ২য়তঃ হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনীও স্বতন্ত্র আকারে বাহির হইয়াছে। এক্ষণে এই ■ পাঁচজন মানব-রত্নের পবিত্র জীবন-চরিত একত্রে “পাক পাঞ্জতন” নামে, ১৬ পেজি ডবল ক্রাউন ৬৩ ফর্মায় ও ১০০৮ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এছলামের ৫ জন গৌরব-সুস্তের জীবনী কত পবিত্র, কত মূল্যবান, কত উন্নত আদর্শে পরিপূর্ণ, কত হৃদয়-গ্রাহিণী, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ অগাধ সমুদ্রের অমূল্য মুক্তা-মালা ও রত্নাবলী গুণগ্রাহী পাঠক ও গুণ-গ্রাহিণী পাঠিকাগণই ভক্তিতাবে গলে ধারণ করিবেন বলিয়া আশা করি। এই সকল অমূল্য জীবনীর অমূল্য শিক্ষা ও অমূল্য উপদেশমালা যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি আদর্শ মানবে পরিণত হইবেন, তাঁহার পরকালের পথ পরিষ্কৃত হইবে।

সর্ব-সাধারণ মোছলমান ভ্রাতা ও ভগিনিগণের বোধ-সৌকার্য্যার্থ
এই পুস্তকখানি বতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিয়াছি ; এবং ইচ্ছা
পূর্বক অনেক সহজ আরবী ও পারসী এবং উর্দু শব্দ ব্যবহার করিয়াছি
মোছলমানের বাঙ্গালা ভাষা মোছলমানী হওয়াই দরকার । সংস্কৃত-মূলক
হিন্দু-ভাষার প্রভাবে পড়িয়া মোছলমানগণ জাতীয় ভাব, জাতীয়
খেয়াল, জাতীয় কল্পনা সমস্তই হারাইয়াছে । তাহাদের হৃদয় আজ
হিন্দুভাবে পরিপূর্ণ । তাহাদের চিন্তাধারা হিন্দু প্রভাবময় ।

আমি এই গ্রন্থে যে সকল আরবী, পারসী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার
করিয়াছি, তাহা ‘কোটেশনের’ মধ্যে দিয়া, বন্ধনীর মধ্যে উহার বাঙ্গালা
অর্থ লিখিয়া দিয়াছি । সুতরাং প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই ঐ
সকল শব্দের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন ।

আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৫—৬৬ বৎসর ; সুতরাং জীবনের শেষ-
সীমায় উপস্থিত হইয়াছি । উপরোক্ত ছাপাখানা ও পুস্তকালয়ের
সাহায্যে যদি আমি অবশিষ্ট জীবনে, আরও পবিত্রাঙ্গা মহাপুরুষদিগের
জীবন-চরিত ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি লিখিয়া জন-সমাজে প্রচার করিতে পারি ;
তবে জীবন সার্থক মনে করিব । প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনিগণ দোওয়া
করিবেন, যেন আমার এবং সমগ্র মোছলমানের ইহকাল এবং পরকাল
শান্তিপূর্ণ ও মঙ্গলময় হয় ।

২২শে রমজানুল মবারক,
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৫ সাল ।
প্লট নং ৩০৪, কড়েয়া ;
পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা ।

খাদেমুল কওম—

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

পাক পাঞ্জতনের সূচীপত্র

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-
এর জীবনী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
প্রস্তাব ...	১
হজরত এছমাইল আলান্নহেস্‌সালাম হইতে হজরত রহুলে- আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (ছালঃ) পর্যন্ত কুর্সীনায়া (বংশ-তালিকা) ...	৩
কোরায়েশ হইতে হজরত রেছালত-মাব (ছালঃ) পর্যন্ত বংশ-তালিকা ...	■
আ-হজরত (ছালঃ)-এর জন্ম (মূল গ্রন্থে হেডিং নাই) ...	■
শামের প্রথম সফর ...	১৪
হরবে ফোজ্জার অর্থাৎ প্রথম শরকৎ যুদ্ধ ...	১৫
হজরতের তেজারত বা সওদাগরী ...	১৭
শামের দ্বিতীয় সফর ...	২০
হজরত (সালঃ)-এর সঙ্গে বিবী খোদায়জা (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ ...	২১
আ হজরতের (ছালঃ)-এর ছাদেক এবং আল-আমিন উপাধি লাভ ...	২২
কোরেশদের উপর হজরতের নেতৃত্ব লাভ ...	২৪
হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত যয়েদ (রাজিঃ)-এর তরবিয়ত (শিক্ষাদি) ...	২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
খোদা তা-লার দিকে রুজু ও নির্জন-বাসের ইচ্ছা	৩১
ইসলাম-সূর্যোদয়	৩৪
তব্‌লিগুন্‌ই ইসলাম বা ইসলাম ধর্ম-প্রচার	৩৭
প্রকাশভাবে ইসলাম-প্রচার	■ ■
কোরেশদিগের শত্রুতাচরণ	৪৬
হজরত রুহুলে-আকরম (ছালঃ)-এর সঙ্গে কোরেশদিগের বে-আদবী ■ দুর্ব্যাহার	৫০
কোরেশগণের সন্ধির প্রার্থনা	৫২
আবু-তালেবের নিকট কোরেশদিগের দূত প্রেরণ	৫৪
হাবশাঃ অর্থাৎ আবিশিনিয়ায় হজরত (মোসলমানদিগের প্রথমবার জন্মভূমি ত্যাগ)	৫৮
মক্কার কোরেশদিগের আর একটি অকৃতকার্যতা	৬১
হজরত আমীর হামযার ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ	৬৫
হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ	৬৮
শয়ব আবুতালেব	৭৪
আম আল্‌ কাযন অর্থাৎ নবরত্নের দশম বৎসর	৮০
হজরতের সঙ্গে তায়েফ্বাসীদিগের বে-আদবী	৮৫
বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম-প্রচার	৯০
সুয়েদ বিন্-সামতের কথা	৯২
আয়াস্-বিন্-মায়ায্ (রাজিঃ)	৯৩
যমাদ আয্দি (রাজিঃ)	৯৪
তফিল-বিন্-ওমরু দওসি (রাজিঃ)	৯৫
আবুযর গফ্‌ফারি (রাজিঃ)	৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
মদীনার ছয়টি পবিত্রাত্মা ...	২৯
স্বক্‌বার বায়্‌য়েত্‌ বাঃ আওলা (স্বক্‌বার প্রথম দীক্ষা) ...	১০২
মস্‌ছব-বিন্-য়মিরের মদীনায়া সাফল্য লাভ ...	১০৪
স্বক্‌বার দ্বিতীয় বায়্‌য়েত্‌ ...	১০৮
মদীনায়া হেজরত করিবার সাধারণ আদেশ ...	১১৪
দারয়দওয়ার কোরেশদিগের সভা এবং পরস্পর পরামর্শ ...	১১৭
খোদা তায়ালা কর্তৃক হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি হেজরতের আদেশ ...	১২১
সুর গিরি-গহবরে সূর্য ও চন্দ্রের একত্র সমাবেশ ...	১২৬
হেজরতের ছফর ...	১৩২
ছফরের (প্রবাসের) পরিসমাপ্তি ...	১৩৬
হজরতের মদীনায়া প্রবেশ ...	১৪০
হিজরী সনের প্রারম্ভ ...	১৪৫
হেজরতের প্রথম বৎসর ...	১৪৬
হেজরতের দ্বিতীয় বৎসর ...	১৫৫
বদরের মহাযুদ্ধ ...	১৬১
হেজরতের তৃতীয় বৎসর ...	১৭৯
তাইজন দুর্ক্‌তের হত্যা-সাধন ...	১৮২
ওহদের ভীষণ যুদ্ধ ...	১৮৪
হেজরতের চতুর্থ বৎসর ...	২০২
হেজরতের পঞ্চম বৎসর (৫ম হিজরী) ...	২১০
খন্দক অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধ ...	২১৮
হেজরতের ষষ্ঠ বৎসর ...	২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
৭ম হিজরীর ঘটনাবলী	২৪২
হেজরতের ৮ম বৎসর	২৫৪
মৃত্যু: অভিযান ও তথ্য ভীষণ যুদ্ধ	২৫৭
মক্কা-বিজয় (হেডিং নাই)	২৬৭
হানিন বা হেনায়নের ভীষণ যুদ্ধ	২৭৬
তায়েফ্ অবরোধ	২৭৯
আ-হজরত (ছালঃ)-এর মক্কা হইয়া মদীনার প্রত্যাবর্তন	২৮১
হেজরতের ৯ম বৎসর	২৮৪
তবুকের বিরাট অভিযান	২৮৯
হেজরতের দশম বৎসর	২৯৮
হজ্জতল ভেদা বা হজ্জ্ অল্-বালাগ্	৩০৪
হিজরীর একাদশ সাল (আ হজরত [ছালঃ]-এর পরলোক গমন)	৩০৭
আ-হজরত (ছালঃ)-এর ছলিয়া মবারক অর্থাৎ আকৃতি এবং শারীরিক গঠন	৩২২
আ হজরত (ছালঃ) সম্বন্ধে কতিপয় স্তোত্রব্য বিষয়	৩২৫

দ্বিতীয় ভাগ ।

হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) :

প্রস্তাব	৩৪৭
হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর জন্মকথা	৩৫৪

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—৩ঃ)-এর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব (তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ, আ-হজরত (ছালঃ)- এর সঙ্গে বিভিন্ন জেহাদে অপূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ)	...	৩৬৭
বদরের মহাযুদ্ধ	...	৩৬৮
হজরত আলী (কঃ—৩ঃ)-এর শুভ-বিবাহ	...	৩৭৪
আবু ছুফিয়ানের বিরুদ্ধে আ হজরত (ছালঃ)-এর অভিযান	...	৩৭৭
তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী (বনি-কিন্কায়ের যুদ্ধ)	...	৩৭৮
ওহদের ভীষণ যুদ্ধ	...	৩৭৯
চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী	...	৩৮৬
৫ম হিজরীর ঘটনাবলী (দোমতল-জন্দলের অভিযান)	...	৩৯১
খন্দক অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধ	...	৩৯২
বনি-করিজার সঙ্গে যুদ্ধ	...	৩৯৫
৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী	...	৩৯৬
৭ম হিজরী ঘটনাবলী	...	৪০০
হেজরতের ৮ম বৎসর	...	৪০৯
মৃত্যুর অভিযান ও তথায় ভীষণ যুদ্ধ	...	৪১১
নবম হিজরীর ঘটনাবলী	...	৪১৮
দশম হিজরীর ঘটনাবলী	...	৪২২
একাদশ হিজরীর ঘটনাবলী (আ-হজরত [ছালঃ]-এর পরলোক গমন)	...	৪২৬
হজরত আলী (কঃ—৩ঃ)-এর জীবনের তৃতীয় পর্ব	...	৪৩৩
হজরত আলী (কঃ—৩ঃ)-এর জীবনের শেষ পর্ব	...	৪৫৬

মহামান্ন খলিফার (আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর) মদীনা হইতে বশাতিমুখে বাত্বা	...	৪৭৫
জঙ্গ-জমল অর্থাৎ জমল যুদ্ধ	...	৪৮২
হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কুফায় রাজধানী স্থাপন	...	৪৯১
হজরত মোহাম্মদ-বিন-আবিবকর (রাজিঃ)-এর মেছেরের শাসনকর্তৃত্ব লাভ	...	৪৯৬
হজরত ওমর বিনন্ আছ (রাজিঃ) দামেস্কে	...	৪৯৫
ছফিন যুদ্ধ	...	৪৯৭
ছফিন যুদ্ধের প্রথম ভাগ	...	৫০০
ছফিন যুদ্ধের আর একসপ্তাহ	...	৫০৪
ছফিন যুদ্ধের শেষ দুইদিন (মহাসংহার কার্য)	...	৫০৫
আব্বাছে মীমাংসাকারী (ছালেছ) কয়ের ঘোষণা	...	৫১২
বিপ্লব-পন্থী খারেজী দল	...	৫১৬
হজরত গোবিরা (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে মেছের অধিকার	...	৫২২
হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর শাহাদৎ প্রাপ্তি	...	৫২৭
হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর আহলিয়া (দ্বী) ও সন্তান-সন্ততিগণ	...	৫৪১
স্বার্থনা	...	৫৫৫

তৃতীয় ভাগ।

শাহুনে-জহরত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ
(রাঃ—আঃ) এর জীবনী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
প্রস্তাব	৫৪৫
শ্বর্গের সম্রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)	৫৫৩
১ নং উর্দু কবিতা	৫৮৪
২ নং উর্দু কবিতা	৫৮৬
৩ নং উর্দু কবিতা (হেডিং নাই)	৬১৬
মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকী আল্ ওরারেছী আকবরা বাদীর একটি উর্দু কবিতাংশ	৬৫০
আবদুল মজিদ ছিদ্দিকী ছাহেবের উর্দু কবিতাংশ	৬৫৬
নাষ্টার ছৈয়গ বাছেত আলী বাছেত বহওয়ানীর একটি উর্দু কবিতা	৬৬৬
মেছানগুহেন্দ হজরত আযিয্ লখনবীর একটি কবিতা	৬৬৯
মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকীর একটি উর্দু কবিতা	৬৭১
মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকী আকবরাবাদী ছাহেবের একটি প্রাণ- তোষিনী উর্দু কবিতা	৬৯৬
ঐ কবির লিখিত আর একটি উর্দু কবিতা	৬৯৮
শুকবি মাওলানা ছিমাং ছিদ্দিকীর আর একটি উর্দু কবিতা	৭১১

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
উপরোক্ত প্রসিদ্ধ কবির লিখিত আর একটি কবিতা (কনিষ্- ঘোইরাঃ - রাঃ—আঃ)	৭১৩
ফদকের মোসামেলা	৭১৭
ফদক কোথায় অবস্থিত ?	৭২৩
ফদক কিরূপে আ-হজরত (ছালঃ)-এর অধিকারে আসিয়াছিল	৭২৫

চতুর্থ ভাগ ।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)- এর জীবন চরিত ।

জীবনী আরম্ভ	৭৬৯
হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ পরিত্যাগ ও হজরত মোবিনা (রাজিঃ)-কে খেলাফৎ প্রদান এবং তাঁহার হস্তে বস্য়েত (মূল গ্রন্থে হেডিং নাই)	৮০৯
হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর শাহাদত প্রাপ্তি (মূল গ্রন্থে হেডিং নাই)	৮১৬
খেলাফৎ হাছনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৮২০

পঞ্চম ভাগ ।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)- এর জীবনী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর (জন্ম-বৃত্তান্ত ...	৮৩১
ফজায়েল ও মনাক্বব (সদৃশগাবলীও সদাচার) ...	৮৩৪
আরবী কবিতা (উর্দু অনুবাদ সহ) ...	৮৩৯
খোলক্ হোছারনী (সর্বপ্রকার সদ্যবচার ও ক্ষমাশূণ ইত্যাদি)	৮৩৯
এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর যোহদ ও তকওয়া (পরহেয্ গারী এবং পার্থিব সুখ-সম্পদে বিতৃষ্ণা) ...	৮৪১
শাদী (বিবাহ) ...	৮৪৩
আখ্বারে শাহাদৎ (শহীদ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী) ...	৮৪৭
এযিদের অলি আহাদী বা যুবরাজত্ব ...	৮৫৯
হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর 'ওফাত' (পরলোক গমন)	৮৬৯
এযিদ-বিন্-হজরত মোবিয়া ...	৮৭৪
হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মক্কা শরীফ হইতে কুফাভিমুখে যাত্রা ...	৯০৩
কারবালার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনা ...	৯১৩
কারবালার শাহাদত প্রাপ্ত মহাত্মাগণের নামের তালিকা ...	৯৪৮
কারবালার অন্যান্য শহীদগণের নাম ...	৯৪৯

ওবায়দুল্লাহ্ এব্‌নে বেরাদেব এব্‌নে মাবুছি (নৈরাশ্র)	...	২৫১
এমাম-বধ-রূপ পাপের প্রতিকূল ও শোচনীয় পৈশাচিক কার্যের ভীষণ প্রতিক্রিয়া	২৫৫
হজরত এমাম হোছেন (রাক্বিঃ)-এর শাহাদতের পরবর্তী কতিপয় ঘটনা । মোবিরা বিন্ এষিদের খেলাফৎ)	...	২৬৬
বশ্রায় এব্‌নে বেরাদ বদ-নেহাদেব বয়্‌য়েত গ্রহণ	...	২৬৮
তাজিয়াদারীর ইতিহাস	...	২৭৪
এরাকের কুফা শহর	...	২৮৮
নূতন কুফা	...	২৮৮
কারবালা শহর	...	২৮৯
হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের 'ছেব মবারক'	...	২৯৪
গ্রন্থকারের শেষ-প্রার্থনা	...	২৯৫

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

পাক পাঞ্জতন !

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সালঃ) এর জীবনী ।

হজরত ইসা আলায়হেস্-সালামের জন্মের পর ৫৭০ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে ; পৃথিবীতে আর কোনও পয়গম্বরের (নবী—তত্ত্ববাহকের) আবির্ভাব হয় নাই । ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কোনও এক সময় এমন অতীত হইয়াছিল না, যে সময় ছনিয়া পয়গম্বর শূন্য ছিল । এক এক সময় পৃথিবীতে শত সহস্র পয়গম্বরও বিরাজ করিয়াছেন । তাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পবিত্র ওয়াহ্‌দানিএত (একেশ্বরবাদ ধর্ম) প্রচার করিতেন । উপরোক্ত সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পৃথিবী একেবারে পয়গম্বর (নবী ও রসূল) শূন্য অবস্থায় ছিল । সুতরাং উহাকে সম্পূর্ণ 'যামানার জাহেলিয়াত' (অন্ধকার-যুগ) বলা যাইতে পারে । এই একমাত্র সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্-তায়ালার উপাসনা-আরাধনা এবং তাঁহার একেশ্বরবাদ প্রচারের কোনও অস্তিত্বই পৃথিবীতে পাওয়া যাইত না ।

হজরত এসমাইল আলায়-হেসসালামের বংশধরগণ আরবদেশের অন্তর্গত মুক্কা মোরাজ্জমার বাস করিলেও, তাহারা ঘোর পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছিল ; তন্মধ্যে অনেকে পবিত্র কাবা-গৃহে মালুমের মূর্তি রাখিয়া পূজা করিত । অসংখ্যক খৃষ্টীয়ান বা গিহদী ছিল ; তাহাদের মধ্যেও পবিত্র একেশ্বরবাদ

ধর্মের কোনও চিহ্ন বিস্তারিত ছিল না। যত প্রকার পাপাচার অনাচার মানুষের দ্বারা হইতে পারে, তাহার কোনটাই তাহারা বাদ দিত না। নরহত্যা, ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ, সুরাপান, জুয়াখেলা, স্ব স্ব কল্যাণগুলির বধ-সাধন, পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কতকগুলি পূর্বতন বীর-পুরুষের মূর্তি পূজা, বিমাতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ইত্যাদি বহুপ্রকার পাপানুষ্ঠান তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বংশের লোকের মধ্যে অনবরত মারামারি, কাটাকাটি চলিত। সমাজ-বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এই ত গেল আরবের অবস্থা। সিরিয়া, মিসর, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহুদেশে জনপদে খৃষ্টীয় ধর্ম বিকৃত আকারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; যিহুদী জাতি ছিল-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নানা দেশে বিস্তারিত ছিল; কিন্তু তাহাদের ধর্মও অতি মাত্রায় বিকৃত ভাবধারণ করিয়াছিল। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণ—জোরোয়াষ্টার (জর-দশ্ত) প্রবর্তিত অগ্ন্যুপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া, ভ্রাস্ত-পথের পাহ হইয়াছিল। বিশাল মহাচীন ও চীন দেশের লোকেরা বৌদ্ধ-ধর্ম ও কনফিউশি বা কনফিউশন প্রবর্তিত ধর্ম অবলম্বন পূর্বক এক প্রকার নাস্তিকত্বে পরিণত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের মধ্যে বৈদিক ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া পৌরাণিক পৌত্তলিক ধর্মের ভিত্তি মজবুৎ হইয়াছিল। কিন্তু উহার কোনটাই একেশ্বরবাদ ধর্ম ছিল না। তদ্ব্যতীত মূর্তি-পূজক, নর-পূজক, গো-পূজক, প্রস্তর ও বৃক্ষ-পূজক, ভূত ও প্রেত-পূজক, নদী ও নালা-পূজক প্রভৃতি শত প্রকারের ধর্ম-হীন মানুষের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আরব দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাচীন ইতিহাস, জাতি-বিভাগ ইত্যাদি হজরত রেছালত মাবের (ছালঃ) বড় বড় জীবন-চরিতে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাহা লিখা হইল

না । হজৰতেৰ দাদা (পিতামহ) মহাত্মা আবছল মোতালেবেৰ তেৱটী
পুত্ৰ-সন্তান জন্মগ্ৰহণ কৰে ; তন্মধ্যে আবছল সৰ্ব কনিষ্ঠ ■ পিতাৰ
সৰ্বাপেক্ষা প্ৰিয়পাত্ৰ ছিলেন । এক ■ তিনি এই প্ৰিয়তম পুত্ৰ-বন্ধকে
হজৰত ইব্ৰাহিম (আলাঃ) কৰ্তৃক হজৰত ইস্মাইল (আলাঃ) এৰ কোৱ-
বানী কৰাৰ জায় কোৱবানী কৰিতে উদ্যত হইরাছিলেন । শেষ সাজা-নাজী
জটনক কাহেনাৰ (গণক-নাৰীৰ) কথানুসাৰে দশ দশটী কৰিয়া উষ্ট্ৰেৰ সজে
আবছলৰ নামে কৰিয়া (গণনা সম্বন্ধীয় গুটি) ফেলাতে, প্ৰত্যেক বাৰেই
আবছলৰ নাম উঠিতে লাগিল ; ১০০ সংখ্যা পূৰ্ণ হইলে উষ্ট্ৰেৰ নামে কৰিয়া
উঠিল । পৰবৰ্তী আৰ তিন বাৰও ঐৰূপ উটেৰ নামে গুটি উঠাতে, তিনি
আবছলৰ পৰিবৰ্তে ১০০ উট কোৱবানী দিলেন । [১]

হজৰত এস্মাইল আলায়হেস্ সালাম হইতে হজৰত বুঢ়ে

আক্ৰম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ্তবা (সালঃ)

পৰ্য্যন্ত কুসীনায়া (বংশ-তালিকা) যিমে

দেওয়া হইল ।

১ । হজৰত ইস্মাইল (আলাঃ) ; ২ । কীজাৰ ; ৩ । আওয়াম ;
৪ । ওছ (১) ; ৫ । মৱৱহ (১) ; ৬ । সমায় ; ৭ । জৱৱাহ ; ৮ ।
নাজব ; ৯ । ময়াজ্জের ; ১০ । দীহাম ; ১১ । অক্-তাদ ; ১২ ।
দীহা ; ১৩ । হাজ্জান ; ১৪ । আনুফা ; ১৫ । অৱওয়া ; ১৬ ।
বলুখী ; ১৭ । বছরী ; ১৮ । হায়ী ; ১৯ । অনুন ; ২০ । হময়ান ;

[১] গণক বা আয়েলগণ ছক (পাশা) ভূতলে নিক্ষেপ কৰে ;
কিংবা পাতায় বা কাগজে নাম লিখিয়া লটীৱী খেলাৰ মতন তদ্বাৰা
ভূতান্তৰ নিৰ্দেশ কৰে, উহাকে “কৰিয়া” বলে ।

২১। আরকরা; ২২। আবিদ; ২৩। আনফ্; ২৪। আছকী;
 ২৫। মাহি; ২৬। নাখুর; ২৭। কাজেম; ২৮। কালেহ্; ২৯।
 বদলান; ৩০। ইলদাকম; ৩১। হেরা; ৩২। নাসেন; ৩৩।
 আবিল আউয়াম; ৩৪। মতসাভিল; ৩৫। বরু; ৩৬। ঔছ;
 ৩৭। সলামান; ৩৮। হমিসা; ৩৯। উদদ; ৪০। আদনান;
 ৪১। মুয়েদ; ৪২। হযল; ৪৩। নাবেত; ৪৪। সলামান; ৪৫।
 হমিসা; ৪৬। আল-ঈসাউ; ৪৭। উদদ; ৪৮। আদ; ৪৯।
 আদনান; ৫০। মুয়েদ; ৫১। নজার; ৫২। মজর; ৫৩। এল-
 ইরাস্; ৫৪। মদরকা; ৫৫। খজাইমা; ৫৬। কানানা; ৫৭।
 নজর; ৫৮। মালেক; ৫৯। কোহের বা কোরায়েশ। এই কোরা-
 য়েশ্ হইতেই মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কোরায়েশ্ বংশের উৎপত্তি।

কোরায়েশ্ হইতে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) পর্য্যন্ত।

১। কোরায়েশ্; ২। গালেব; ৩। লোয়াই; ৪। কারাব;
 ৫। মোরা; ৬। কেলাব; ৭। কোছার বা কোছাই; ৮। আবদ্-
 মনাফ্; ৯। হাশেম; ১০। আবহুল-মোস্তালেব; ১১। আবহুলা;
 ১২। হজরত রচুলে আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ্তবা
 ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ও ছাল্লাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হজরত ইস্-
 মাইল আলায়হেস্‌সালাম হইতে ৬৯ উনসত্তর পুরুষ পরে আমাদের
 হজরত রসুলোল্লাহ্ (সালঃ) আবির্ভূত হইয়া ছিলেন।

আ-ম আল্ ফিলের (এমনাধিপতি আব্রাহা কর্তৃক মক্কা আক্রমণের)
 কয়েক দিন পূর্বে আবহুল মোস্তালেব স্বীয় পুত্র আবহুলার সহিত,
 কোরেশের অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিবী আমেনা-বিস্তে-দহবের বিবাহ-
 কার্য সম্পাদন করিলেন। বিবাহ কালে আবহুলার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর

ছিল। এইস্থানে একথাও উল্লেখ যোগ্য যে, আবহুল মোস্তালেব স্বয়ং আমেনা বিবীর আশ্রিয়া—হালা:-বিস্তে দহিবকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই পত্নীর গর্ভে জগদ্বিখ্যাত মহাবীর হজরত আমীর হাম্বাঃ জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের কিছু দিন পরে আবহুল মোস্তালেব পুত্র আবহুল্লাকে তেজারতি কাফেলার (বণিক দলের) সঙ্গে বাণিজ্যার্থ শাম দেশে (সিরিয়ায়) প্রেরণ করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে আবহুল্লা পীড়িত হইয়া মদীনায়া স্বীয় আশ্রিয়বর্ণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং স্বীয় ব্যারামের সংবাদ পিতার নিকট পাঠাইলেন। মক্কার যখন আবহুল মোস্তালেব প্রিয়-পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইলেন, তখন স্বীয় অন্ততম পুত্র হারেসকে তাঁহার ‘খবর-গিরি’ ও সেবা-তত্ত্বয়ার মদীনায়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু হারেসের পঁহুঁছবার পূর্বেই আবহুল্লা পরলোক গমন করিলেন। তদীয় মদীনায়া আশ্রিয়গণ বহু নজারের কবর স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিল। হারেস শোকার্ত-হৃদয়ে মক্কার পঁহুঁছিয়া এই শোকাবহ ঘটনা পিতার নিকট জ্ঞাপন করিল। আবহুল্লার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে কয়েকটা উষ্ট্র, কতিপয় ছাগ, আর ওম্মে-এমিন নামী একটি দাসী মাত্র ছিল। এই সময় হজরত আমেনা গর্ভবতী ছিলেন। হজরত নবী দো-জাহান (হালা:) তখন মাতৃ-গর্ভে। তিনি মাতৃ-গর্ভেই এতিম (পিতৃহীন) হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে আবহুল্লার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। আছহাব ফিলের বারায় কিংবা পঞ্চায় দিন পরে—

১২ই রবিওল-আউওল সোমবার ছোবেহ ছাদেকের সময় দুনিয়ার শান্তিদাতা, মানুষের মুক্তিদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, ফথরে আশিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ্তবা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে-অ-ছাল্লাম জন্মগ্রহণ করিলেন।

ঊহার জন্মের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । আধুনিক কোনও কোনও ঐতিহাসিক ও গণনাবিজ্ঞা বিশারদ লোকদিগের মতে হজরতের তারিখ তারিখ ১২ই রবিওল-আউওল নয়—৯ই রবিওল-আউওল, ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দঃ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ৬২৮ সংবৎ—সোমবার । প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বেত্তা তাবরী, এব্নে-খলছন, এব্নে-হেশাম, কামেল প্রভৃতি হজরতের জন্ম দিন ১২ই রবিওল-আউওলই নির্দেশ করিয়াছেন । ঐতিহাসিক আবুল কেদার মতে জন্মের তারিখ ১০ই রবিওল-আউওল । সোমবার এবং ছোবে ছাদেক অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্ব সময় সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই । বর্তমান সময়ের বহু ঐতিহাসিক ও গণনাবিজ্ঞা বিশারদ ব্যক্তিগণ সূক্ষ্ম হিসাব দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ১২ই রবিওল-আউওল সোমবার হইতে পারে না । মিশরের প্রখ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মহম্মদ পাশা ফলকী একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হজরতের জন্ম ৯ই রবিওল-আউওল সোমবার হইয়াছিল । কিন্তু ১২ই রবিওল আউওল তারিখে হজরতের জন্ম হইয়াছে বলিয়া, সমগ্র পৃথিবীতে যেরূপ ভাবে মোসলমানদিগের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে ; তাহাদের সেই ধারণা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে ।

হজরতের জননী আমেনা খাতুন গর্ভাবস্থায়ই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, এক কেরেশতা আসিয়া ঊহাকে বলিলেন, তোমার গর্ভে যে সন্তান আছে, উহার নাম আহমদ । একান্ত মাতা ঊহার নাম আহমদ রাখিলেন ।

যখন হজরত জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন বৃদ্ধ আবদুল মোস্তালেব কাবাগৃহে বসিয়া মকার কতিপয় প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিতে ছিলেন । এই সময় হজরতের জন্মগ্রহণ সংবাদ ঊহাকে দেওয়া হইল । অনীতিপর বৃদ্ধ আবদুল মোস্তালেব এই সুসংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন । তিনি গৃহে গমনপূর্বক শ্রিয়-পৌত্রের মুখ-চন্দ্র দর্শন

করিলেন ; এবং এই নব-প্রসূত পৌত্রের নাম মোহাম্মদ (মালঃ) রাখিলেন । আবুল ফেদা বলেন, এই নাম শুনিয়া উপস্থিত লোকেরা বিশ্বাসবিষ্ট হইয়া আবদুল মোস্তালেবকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার বংশ-প্রচলিত নামগুলি পরিত্যাগ করিয়া, নবজাত পৌত্রের এমন একটি বিশ্বয়কর নাম কেন রাখিলেন ? তৎকালে আবদুল মোস্তালেব বলিলেন, আমি এই নাম এজন্য রাখিয়াছি যে, আমার পৌত্র সমস্ত ছুনিয়ার গৌরব এবং প্রশংসার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে । এখানে ছায়াদ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রছুলে আকরম (মালিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তখন তৎসঙ্গে প্রসূতির উদর হইতে কোনও আলাএশ্ (কদর্য্য শোণিত ইত্যাদি) বাহির হইয়াছিল না—যেমন অন্তান্ত সম্ভান ভূমিষ্ঠ কালে প্রসূতিদিগের ঐ সকল বাহির হয় । তিনি মাতৃ-গর্ভ হইতে মধুতুন (খৎনা হওয়া অবস্থায়) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন । ঐতিহাসিকগণ ইহাও রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, যখন হজরত ছারওয়ারে কামেনাত আখিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ সময় একটি ভূমিকম্পে মদ্যয়েন রাজধানীতে কেছরা (পারস্ত-সম্রাট) নওশেরওয়ার রাজ-প্রাসাদ প্রকম্পিত হইয়া, উহার চৌকটি কাদুরা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল । আস্তখরের সুবিখ্যাত অগ্নিকুণ্ড (পারসিকদিগের যে অগ্নিকুণ্ড সদা প্রজ্জ্বলিত থাকে—মূর্ত্তের জন্তও নির্দোষ হইয়া না) ইহাও নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সাওয়া নামক হ্রদের পানী শুকাইয়া গিয়াছিল । অনেকে এই সকল মোজেজা (অলৌকিক ঘটনা) অস্বীকার করেন । অবশ্য এই শ্রেণীর ব্যাপারে অনেক অতিরিক্ত কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু জগতের সর্বপ্রধান পয়গম্বর, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বোচ্চপদ বিশিষ্ট রছুল ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ কালে কোনও কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটা কিছুতেই অসম্ভব নহে । এক্ষণে এই সকল ব্যাপারে এত বিভিন্ন প্রকারের—বিভিন্ন শ্রেণীর রওয়ায়েত (বর্ণনা) লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে,

নকল হইতে আঙ্গল বাহির করিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এ বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

যাহা হউক, আবদুল মোস্তালেব হজরতের জন্মগ্রহণের ৭ম দিবসে আনন্দ প্রকাশার্থ পণ্ড কোরবানী করিলেন এবং সমগ্র কোরেশদিগকে ‘দাওত’ (নিমন্ত্রণ) করিয়া মহাভোজ দিলেন।

হজরতের জন্মগ্রহণের পর ৭দিন পর্য্যন্ত, আবুলহব-বিন্-আবদুল মোস্তালেবের আশাদ (মুক্তি প্রাপ্তা) দাসী সোয়েবা: তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। আবার হজরত রছুলোল্লার চাচ্চা (পিতৃব্য) হামযা: কেও সোয়েবাই দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। এই হিসাবে মস্কক-বিন-সোয়েবা: ■ হজরত হামযা: ইঁহারা উভয়ে হজরতের রেজায়ী ভাই (দুগ্ধ-ভ্রাতা) ছিলেন। ৮ম দিবসে শরীফ (সম্ভ্রান্ত) আরবদিগের প্রথানুযায়ী হওয়াবন জাতির বনি সায়াদ কবিলার (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) বিবী হালিমা নারী খাতীর ■ প্রতিপালনার্থ হজরত সমর্পিত হন। উদ্দেশ্য, তিনি খাতীরূপে হজরতকে দুগ্ধ পান করাইবেন, এবং নিজের কাছে—নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। আরবের—বিশেষতঃ মক্কার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ একজন্ম পুত্র-সন্তানদিগকে বন্ধু জাতীয়া খাত্রিদিগের হস্তে প্রতিপালনার্থ প্রদান করিতেন যে, তাহারা জঙ্গল ও মরুদানের মুক্ত বাতাসে থাকিয়া—কিরিয়া চলিয়া স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভ করে, এবং বলবান ■ মজবুৎ হয় ; আর তাহাদের ভাষা বিগুঢ় এবং নির্দোষ হইতে পারে। কারণ ভ্রমণশীল বা পল্লীবাসী বন্ধুদিগের ভাষা নাগরিকদিগের ভাষা হইতে পরিষ্কার, খাঁটি, ভেজাল-শূন্য ও বিগুঢ়। সাধারণতঃ শহরবাসীদিগের ভাষা বিভিন্ন স্থানবাসী লোকদিগের ভাষার সংমিশ্রণে অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়ে। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের অধিবাসীদিগের কথাবার্তা শুনিতে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারে।

খাত্তী বিবী হালিমা প্রতি ছয়মাস অন্তর—অর্থাৎ বৎসরে দুইবার হজরতকে মক্কায় আনিয়া জননী আমেনা খাতুন ও দাদা (পিতামহ) আবহুল মোত্তালেবকে দেখাইয়া লইয়া যাইতেন। হজরত দুই বৎসর কাল বিবী হালিমা ছায়াদিয়ার দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। দুগ্ধ ত্যাগের পর আরও দুই বৎসর—অর্থাৎ সর্বশুদ্ধ চারি বৎসর কাল হজরত, বিবী হালিমা ছায়াদিয়ার গৃহে—বনি ছায়াদিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যখন হজরতের বয়ঃক্রম চারি বৎসর হইল, তখন তাঁহার জননী বিবী আমেনা তাঁহাকে মক্কায় নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে যখন হজরতের বয়স ছয় বৎসর হইল, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মদীনাহু আশ্বীয়-শ্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মদীনায একমাস কাল থাকিয়া যখন মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে-ছিলেন, তখন “আবু-আমীন” নামক স্থানে পৌঁছিয়া সেই মোছাকেরি অবস্থায় (প্রবাসে) তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার সমাধি কার্য সম্পন্ন হইল। কাফেলার লোকেরা সেই মাতৃহীন শোকার্ত বালককে মক্কায তাঁহার পিতামহ আবহুল মোত্তালেবের নিকট পৌছাইয়া দিল। তিনি পিতৃ-মাতৃহীন পোলের প্রতিপালন-ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে হজরত পাঁচ বৎসর কাল খাত্তী হালিমা বিবীর গৃহে ছিলেন; আর এক বৎসর কয়েকমাস কাল মাত্র গর্ভধারিণীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার মেহ-ভালবাসা ভোগ করিতে হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর বয়সেই তিনি এতিম ও এছির (পিতৃ-মাতৃহীন) হইলেন। যখন [] বয়স পাঁচ [] ছিল, আর তিনি স্বীয় দুধ-ভাই-ভগিনী অর্থাৎ হালিমা বিবীর পুত্র-কন্যা [] বনি-ছায়াদের [] বালক-বালিকাদিগের সঙ্গে [] বাহিরে—মরদানে ছাগপাল চরাইতেন, সেই সময় একদা তাঁহার সিনা-চাক (বক্ষঃ-বিদারণ)

কার্য সম্পন্ন হয় । ছিরাতে এব্‌নে হেশাম নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসে বিবী হালিমার বর্ণিত বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে :—বিবী হালিমা বলিয়াছেন, “একদা আমার দুইটা পুত্র-সন্তান দৌড়িয়া আমার নিকট আসিল, এবং বলিল, দুইজন ছফেদ পোষ (খেতবস্ত্র পরিহিত) লোক আমাদের কোরেনী ভাইকে (হজরতকে) ধরিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার সিনা চাক (বক্ষঃ বিদারণ) করিয়া ফেলিয়াছে । এই সংবাদ শুনিয়া আমি এবং আমার স্বামী আহারহ-বিন্-আবদুল আযি,—উভয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তথায় গমন করিলাম । দেখিলাম, ভয়ে বালকের দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে । আমি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে গলায় জড়াইয়া লইলাম, এবং ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, দুইজন খেতবস্ত্র পরিহিত লোক, আমার নিকট আগমন করিলেন, এবং আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া আমার বক্ষঃ বিদারণ করিলেন ; আর বক্ষের ভিতর হইতে কোনও তুলিয়া লইলেন ।” হালিমা বিবী তাঁহার বক্ষঃস্থল দেখিলেন, কিন্তু কোনও যথম (ক্ষত) বা রক্তের চিহ্ন তাহাতে দেখিতে পাইলেন না । হালিমা বিবী মনে করিলেন, এই বালকের উপর হয় ত কোনও জেনের বা অথবা কোনও অপদেবতার ‘আছর’ (প্রভাব) হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে আর আমার নিকট রাখা উচিত নহে, এই মনে করিয়া অতি সত্বরে তাঁহাকে মক্কায় লইয়া গিয়া তদীয় জননীর হস্তে সমর্পণ করিলেন ; এবং হজরতের বক্ষঃ বিদারণের ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন । সজে নিজের ধারণা ও বিশ্বাসানুযায়ী বলিলেন, এই বালকের উপর কোনও জেন বা ঐ শ্রেণীর কোনও অপদেবতার আছর হইয়াছে । হজরত আমেনা বিবী বলিলেন, ইহাতে কোনও চিন্তার কারণ নাই । আমার এই পুত্র ছনিয়াতে আজিমশ্বান (বিরাট—অসাধারণ) মর্তুবা (সম্মান ও গৌরব) লাভ করিবে ও অসাধারণ মানুষ হইবে । এই বালক সর্ববিধ বিপদ

এবং সর্ব প্রকার ক্রেশ হইতে রক্ষা পাইবে । আর খোদাতারাল শরৎ উহার হেফাজত (রক্ষণাবেক্ষণ) করিবেন । কারণ, এই বালক যখন আমার গর্ভে ছিল, তখন গর্ভাবস্থায় আমি স্বপ্ন-যোগে বহুতর বেশারত (শুভ ভবিষ্যদ্বাণী) কেরেশ্বতাদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি । আর ইহার বহুতর কারামত (অলৌকিক কার্য) নিজেও দেখিয়াছি । সহি মোস্তালেমে আনস্-বিন্-মালেক (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, এক দিবস যখন হজরত বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, ঐ সময় হজরত জেবরাইল (আলাঃ) তাঁহার (হজরতের) নিকট আগমন পূর্বক তাঁহার দেল (জুপিণ্ড) বিদীর্ণ করিলেন, এবং এক কাৎরা (বিন্দু) কোনও জিনিষ বাহির করিয়া বলিলেন, ইহা শরতানের অংশ ছিল । পরে তাঁহার দেল যম্বমের পানী দিয়া ধোত করিলেন । তৎপরে উহা বক্ষঃস্থলের যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে পুনঃ সন্নিবেশিত করিলেন ।

মাতৃ-বিয়োগের পর হজরত দুই বৎসর কাল, পিতামহ আবদুল মোস্তালেবের ছরপরস্তিতে (আশ্রয়ে) ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন । যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর, তখন পিতামহ আবদুল মোস্তালেবও অতি বৃদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । যখন আবদুল মোস্তালেবের যানাবাঃ (শবদেহ) উঠান হইল, তখন হজরত বাম্পাকুলিত লোচনে যানাবার সঙ্গী হইলেন । আবদুল মোস্তালেব যত্নের অব্যবহিত পূর্বে প্রিয় পৌত্র (হজরত) এই এক্ষেজাম (বন্দোবস্ত) করিয়াছিলেন যে, শ্রীয জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে দিয়া বিশেষভাবে অছিয়ত (অস্তিম-উপদেশ প্রদান) করিয়া গিয়াছিলেন যে, তুমি তোমার এই ভ্রাতৃপুত্রের সম্পূর্ণরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ; এ সম্বন্ধে যেন কোনও রূপ ত্রুটি না হয় । হজরতের আরও কতিপয় চাচ্চা (পিতৃব্য)—আবদুল মোস্তালেবের পুত্র—ছিল । কিন্তু তন্মধ্যে আবু তালেব সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং হৃদয়বান্

পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সমর্পণ করিবার আরও একটি কারণ এই ছিল যে, আবু তালেব ও আবুহুলা একই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; আবুহুলা মোত্তালেবের কতিপয় পত্নী থাকাতে, ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আবু তালেব সহোদর ভ্রাতার পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ পুত্রকে অধিক স্নেহ করিবেন মনে করিয়াই ভবিষ্যৎকালী আবুহুলা মোত্তালেব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধারণা ও এই বিশ্বাস পরিণামে অশ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কর্তব্যপরায়ণ ও পিতৃভক্ত আবুতালেব পিতার অছিন্নত অতি মনোযোগ ও সাহসিকতার সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃহীন ভ্রাতৃপুত্রকে অপত্য-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণীও হজরতকে অতি স্নেহের সহিত পালন করিয়া স্বকর্তব্য সাধন করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই।

হৃদয়বান, কর্তব্য-পরায়ণ ও সৎ-সাহসী আবু তালেব হজরতকে শ্রীর পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। তিনি স্নেহান্বিত ভ্রাতৃপুত্রকে চক্ষুর আড়াল হইতে দিতেন না। রাত্রিকালে নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিতেন। হজরতের বাল্যাবস্থা আরবের অন্তান্ত বালকের অবস্থার তুলনায় অতি আশ্চর্য্য ও অতুলনীয় ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি অন্তান্ত ছেলেদের ত্যায় ক্রীড়ামোদে কখনও লিপ্ত হন নাই। খেলাধুলায় তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ এবং প্রবৃত্তি ছিল না; বরং তিনি ঐ সকল কার্যো বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি সেই বাল্যকালেই সত্যতা ও সত্যতার সম্পূর্ণ বশবর্তী ছিলেন; ক্রীড়ানীল, আমোদ-পরায়ণ বালকদিগের সঙ্গে তিনি একেবারেই মিশিতেন না। সর্বপ্রকার দুষ্টচরিত্রতা ও অশুভ আচার-ব্যবহার এবং কার্য্য-কলাপ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পাক (পবিত্র) ছিলেন। একবারের একটি ঘটনা এই যে, কতিপয় নব্য-আরব যুবকের সঙ্গে এক বিবাহ-সভায়

তঁাহাকে বাইতে বাধ্য করা হইয়াছিল । ঐ স্থানে গান বাজনারও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল । তিনি বিবাহ-সভায় যাইয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন । সমস্ত রাত্রি গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকিলেন । এমন কি, রাত্রি অবসান হইল, বিবাহ-সভা ভঙ্গ হইল, লোকজন চলিয়া গেল ; তখন তিনি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন । এইরূপে ঐ গান-বাস্তব যুক্ত সভার কোনও অংশই তঁাহাকে গ্রহণ করিতে হইল না । বাল্যকাল হইতেই সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ জনক কার্য ও অনুষ্ঠানে তঁাহার বীতানুরাগিতা দৃষ্ট হইয়াছিল ।

হজরতের বয়ঃক্রম যখন ৭ বৎসর, তৎপূর্বে জল-প্লাবনে কাবাগৃহের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল । এক্ষণে উহা নূতন ভাবে নির্মাণের ব্যবস্থা হইল । এই কাবা-নির্মাণ কার্যে সপ্ত বৎসর বয়স্ক হজরত (সালঃ) প্রস্তুত সকল তুলিয়া লইয়া গিয়া, রাজ-মিস্ত্রিদের নিকট পঁহুঁচাইয়া দিতেন । তিনি তহবন্দ পরিয়াছিলেন, একত্র চলিতে-কিরিতে ও প্রস্তুতগুলি রাজ-মিস্ত্রিদের নিকট পঁহুঁচাইয়া দিতে অনেকটা অসুবিধা হইতেছিল ; তহবন্দ পায় জড়াইয়া গিয়া বা উহার প্রান্তদেশ পদতলে পড়িয়া আছাড় খাইবার উপক্রম হইত । সাত বৎসর বয়স্ক বালকের উলঙ্গবস্ত্রায় চলা-ফেরা করা তখন দূর্বীর বলিয়া গণ্য হইত না ; একত্র তঁাহার অন্ততম পিতৃব্য আব্বাস তঁাহাকে তহবন্দের অসুবিধা হইতে মুক্ত করিবার জন্ত, তহবন্দের কেনারা ধরিয়া টান দিয়া উহা খুলিয়া ফেলিলেন ; বালক উলঙ্গ হইয়া গেলেন । তঁাহার লজ্জা ■ শরম এত অধিক ছিল যে, উলঙ্গ হইবামাত্র বেহোশ্ (অচৈতন্য) হইয়া পড়িলেন । লোকদিগের সম্মুখে আপনাকে উলঙ্গ অবস্থায় থাকা সহ্য করিতে পারিলেন না । সকলে তঁাহার জীদশ লজ্জাশীলতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল ; এবং তাড়াতাড়ি তঁাহাকে তহবন্দ পরাইয়া দিল ।

শামের প্রথম সফর।

মক্কার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ছিল। তাহারা বেশীর-
ভাগ শাম (সিরিয়া) দেশেই বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। তদ্ব্য-
তীত ইরাক ■ ইয়ন প্রদেশেও যাতায়াত করা হইত। হজরতের বয়স
যখন বার বৎসর, সেই সময় এক তেজস্বী কাকেলার সঙ্গে আবু তালেবও
কিছু বিক্রয়ের মাল লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি হজরতকে
মক্কার—স্বীয় গৃহে রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতামহের
মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্যকে ছাড়িয়া কখনও একাকী থাকেন নাই;
সুতরাং তিনি চাচ্চাজুনের জুদায়ী (বিচ্ছেদ) সহ করিতে অক্ষম ছিলেন।
একত্র যাত্রাকালে আবু তালেবকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ক্রন্দন করিতে
লাগিলেন। আবু তালেবও ভ্রাতৃপুত্রের দেল-শকনী (মনোভঙ্গ) করা
কর্তব্য মনে করিলেন না। স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃপুত্রকে সঙ্গে লইয়া শামের ‘সফরে’
যাত্রা করিলেন। শামের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ‘বোছরা’ (বজরাঃ) নামক
স্থানে যখন মক্কার বণিকদলের কাকেলা পৌঁছিল, তখন বহিরা নামক
একজন ইসরাইলী রাহেব (খৃষ্টীয়ান সন্ন্যাসী) হজরতকে দেখিয়াই মবী-
আখেরজ্জমান (শেষ পয়গম্বর—তত্ত্ববাহক বা প্রেরিত পুরুষ) বলিয়া
চিনিতে পারিলেন। তিনি আবু তালেবের নিকট আসিয়া বলিলেন,
তোমার এই ভ্রাতৃপুত্র নবীয়ে আখেরজ্জমান হইবেন। ইহার মধ্যে
ঐ সকল নিদর্শন বর্তমান—যাহার সম্বন্ধে তওরিত ও ইঞ্জিলে লিখিত
আছে; অতএব ইহাকে আর সম্বন্ধের দিকে লইয়া যাওয়া তোমার
কর্তব্য নহে। ইহাকে লইয়া যিহদীদিগের দেশে প্রবেশ করা কোনও
ক্রমেই উচিত নয়। তাহাদের দ্বারা ইহার কোনওরূপ বিপদ ঘটিতে পারে।
বহিরা রাহেবের কথা শুনিয়া আবুতালেব স্বীয় বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি তাড়া-

তাড়ি ঐ স্থানেই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন ; এবং হজরতকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। যদিও আবু তালেব শামের (সিরিয়ার) অভ্যন্তর ভাগস্থ কোনও শহরে প্রবেশ না করিয়া বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি শামের প্রবেশ-পথে—দক্ষিণদিকস্থ বোছরা শহরেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই তিনি প্রচুর লাভবান হইয়াছিলেন। অল্প রওয়াকেতে (বর্ণনার) আছে যে, আবু তালেব বহিরা সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া হজরতকে লোকজন সঙ্গে দিয়া মক্কার পাঠাইয়া দিলেন, ও স্বয়ং সিরিয়া-গামী বণিকদলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন ; এবং বাণিজ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে মক্কার প্রত্যাবর্তন করিলেন।

হরবে ফোজ্জার অর্থাৎ প্রথম শরকৎ যুদ্ধ।

আরবের “ওকায়” নামক স্থানে প্রতি বৎসর একটি বৃহৎ মেলা বসিত। এই মেলায় শামের অর্থাৎ কবিদিগের কবিতার প্রতিযোগিতা এবং ঘোড় দৌড় হইত। তদ্ব্যতীত পাহালওয়ান দিগের কুশলি-কুশলৎ, বোঁকাদিগের যুদ্ধাভিনয়—‘দঙ্গল’ও হইত। তদানীন্তন আরবের সকল সম্প্রদায়ের লোকই যুদ্ধ-বিজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ-লড়াই বাধিয়া যাইত, একটুতেই প্রতিপক্ষের উপর তরবারি চালাইত। ওকায়ের মেলায় সামান্য কোনও কথা লইয়া হাওয়ান্নে সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোরেশ সম্প্রদায়ের ‘ছেড়-ছাড়’ তর্ক-বিতর্ক—বাক-বিতণ্ডা আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথমতঃ উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমান যুবক লোকেরা এই বিবাদ বাড়িতে দেয় নাই ; সুতরাং এ ব্যাপারের এখানেই এক-প্রকার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বিবাদ-প্রিয়, কুচক্রী ‘ওয়াকেরা-পছন্দ’ (সুযোগাঙ্গী) লোক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিজ্ঞমান থাকে ; তাহারা এই সামান্য বিবাদের পরিণাম ফল এই দাঁড়াইল যে, মিটিয়া যাইবার

বিবাদানল আরবী তীব্রভেদে জলিয়া উঠিল। এইবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা
 ■ মার-কাট আরম্ভ হইল, উভয় পক্ষের বহুলোক হত এবং আহত
 হইতে লাগিল। এই ■ মহব্বরম মাসে আরম্ভ হইয়াছিল, একত্র
 ইহা “জঙ্গে-ফোজ্জার” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কারণ আরব জাতির
 তদানীন্তন আকিদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী মহব্বরম মাসে যুদ্ধ করা মহা
 পাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই মাসে চলিত যুদ্ধ-হাঙ্গামাও
 মূলতবি (স্থগিত) রাখা হইত। এই সামান্য যুদ্ধ পরবর্তী চারিটি বড়
 বড় যুদ্ধের ভূমিকা স্বরূপ ছিল; এবং প্রত্যেক পরবর্তী যুদ্ধ, পূর্ববর্তী
 যুদ্ধাপেক্ষা তীব্র ও লোক কয়কর মারাত্মক সমরাভিনয়ে পরিণত হইয়া-
 ছিল। কারণ যে যুদ্ধ প্রথমতঃ কেবল মাত্র হাওয়াযেন সম্প্রদায় ও
 কোরেশ দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; ক্রমে হাওয়াযেন দলের সঙ্গে ‘কয়েস’
 ও ‘য়িলান’ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং কোরেশ দলের
 ■ কেনানা সম্প্রদায়ের সমুদয় দল-উপদল যোগদান করিয়া অতি
 তীব্র ও সর্বসংহারক মহা সমরাভিনয়ের সূত্রপাত করিল। অতঃপর
 আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দল উভয় দলের যে কোনও দলে
 যোগদান করিয়া, যুদ্ধটিকে অতি তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলিল।
 অবশেষে এই যুদ্ধানল বিপ্লুতি লাভ করিয়া কয়েস সম্প্রদায় ও কানানা
 সম্প্রদায়ের জাতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হইল। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুদ্ধ
 অতি তীব্র লোককয়কর ও হৃদয়-বিদারক সমরাভিনয় ছিল। এই
 যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুতর দলপতি স্ব ■ পদদ্বয়ে ■ বেড়ি পরিয়াছিল
 যে, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পশ্চাৎপদ হইতে বা পলায়ন করিতে না পারে।
 এই শেষ যুদ্ধে আমাদের হজরত রেছালতমাব রছুলে আরবী (ছালঃ) ও
 অন্ত-শব্দে সুসজ্জিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। বনি-কানানার
 প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেনাপতি নির্বাচিত হইয়াছিল। তদনুসারে

বনি হাশেমের পক্ষে হজরতের অন্ততম পিতৃব্য বোবের-বিন্-আবদুল মোত্তালেব সেনাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সমগ্র বনি কালাব-এর পক্ষে সর্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন হরব-বিন্-গন্নিয়া। হজরত রেছালত পানার (সালঃ) বয়ঃক্রম এই সময় ১৫ বৎসর মাত্র ছিল। তাঁহার উপর এই ভার্যাপিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধকালে তিনি স্বীয় চাচ্চা- (পিতৃব্য) দিগের তীরগুলি তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেন। তাঁহাকে কাহারও সঙ্গে সন্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে বা ভীষণ শোণিতপাত-জনক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া কাহারও শোণিত পাত করিতে হইত না। এই লোকক্ষয়-কর ভীষণ যুদ্ধে প্রথমতঃ বনি হাওয়া যেনকে জয়ী বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু পরে যুদ্ধের 'হাওয়া' কিরিয়া গেল। অবশেষে বনি কানানাই জয়ী ও বনি-কয়েস্ পরাজিত হইল। স্থলকথা, পরিণামে কোরেশ দলই জয়লাভ করিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইব্নে খলদুনের মতে এই যুদ্ধকালে হজরতের বয়স ১০ বৎসর ছিল; কিন্তু সহি অর্থাৎ নিভুল ঐতিহাসিক মত এই যে, যজ্জার যুদ্ধের সময় হজরতের বয়ঃক্রম ১৫ বৎসরই ছিল।

হজরতের তেজারত বা সওদাগরী ।

হজরত যখন জওয়ান (পূর্ণ বয়স্ক যুবক) হইলেন, তখন তেজারত অর্থাৎ সওদাগরীর দিকে মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাঁহার পিতৃ স্বানীর চাচ্চা (পিতৃব্য) আবুতালেবও তাঁহার জ্ঞাত এই কার্য্যই পছন্দ (মনোনীত) করিলেন। ইহার পর তিনি মক্কার বণিক্‌দলের সঙ্গে কয়েকবার বাণিজ্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশে গমন করেন। প্রত্যেক বারেই বাণিজ্যে বেশ লাভ হইয়াছিল। এই সকল সফরে (বাণিজ্য যাত্রায়) লোকেরা হজরতের

দেয়ানত ও আমানত (বিশ্বস্ততা ও গচ্ছিত দ্রব্যের সংরক্ষণ), কারবারের সাধুতা ও কারবারিদিগের সঙ্গে সদ্যবহার প্রভৃতি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। বিশেষতঃ মক্কাবাসী যে সকল লোকের সঙ্গে কারবার-স্বত্রে সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিশ্বস্ত, প্রতিশ্রুতিতে অটল, সত্যবাদী ও কারবারে খোশমামেলা (সদ্যবসায়ী) পাইয়াছিল। ফলতঃ সর্ব বিষয়ে সর্বগুণ সম্পন্ন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী তৎকালে তাঁহার তুলনায় আর একজনও ছিল না। আবদুল্লা-বিন্-আবি-আলহামছা (রাজিঃ) নামক একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব-ছতের (পয়গম্বরী লাভের পূর্বে) যখন হজরত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, ঐ সময় আমি হজরতের সঙ্গে কোন কারবার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে ছিলাম। কিন্তু কথাবার্তা শেষ হইবার পূর্বে আমাকে কোনও বিশেষ প্রয়োজনে অন্তর্দিকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, যাইবার সময় আমি হজরতকে বলিয়া গেলাম, আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি এখনই কিরিয়া আসিয়া কারবার সম্বন্ধীয় কথাবার্তার শেষ মীমাংসা করিব। সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করার পর ওয়াদার (প্রতিশ্রুতির) কথা আমি ভুলিয়া গেলাম ; তৃতীয় দিবসে যখন আমি ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিলাম, দেখিলাম, তিনি সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া এই কথা মাত্র বলিলেন “তুমি আমাকে কষ্ট ও পরিশ্রমে কেলিয়াছ। আমি সেই হইতে এই স্থানে থাকিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছি।” এইরূপে ছায়েব (রাজিঃ) নামে একজন ছাহাবী ছিলেন ; তিনি যখন ঈমান আনিলেন (পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন), তখন কেহ কেহ হজরতের খেদমতে তাঁহার গুণ কীর্তন করিতেছিলেন। তচ্ছুবণে তিনি ফরামাইলেন যে, আমি ছায়েবকে তোমাদের অপেক্ষা ভালরূপে জানি। হজরতের উক্তি শুনিয়া

ছায়েব (রাজিঃ) আরজ করিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক । হজুর এক সময় তেজারতে আমার সঙ্গে শরীক (অংশী) ছিলেন ; এবং আপনি কারবার সম্বন্ধীয় হিসাব-পত্র অতি পরিষ্কার ভাবে রাখিয়া ছিলেন । দেনা-পাওনার একটুও গোলমাল হয় নাইঃ।

বহু আসদ সম্প্রদায়ের খোদায়জাঃ বিস্তে খোয়ায়নেদ, নারী এক সম্ভ্রান্ত মহিলা, কোরেশ দলের মধ্যে একজন খুব ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন । তিনি বিধবা ছিলেন ; ইতিপূর্বে ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল । তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী বিপুল ঐশ্বর্য রাখিয়া যান । বিবী খোদায়জাঃ স্বীয় কর্মচারীদের দ্বারা সর্বদা শাম (সিরিয়া), এরাক (মেসোপটেমিয়া) ও জৈমানে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি চালান দিতেন । হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) সততা, বিশ্বস্ততা ও কার্য-পটুতার প্রশংসাবাদ শুনিয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র রুতিমাকে হজরতের নিকট পাঠাইয়া এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি আমার বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া শামে গমন এবং প্রধান কর্মচারী রূপে এই কার্য সম্পাদন করিলে আমি সুখী হইব । হজরত স্বীয় চাচ্চা (পিতৃব্য) আবৃত্তালেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, এবং তাঁহার সম্মতি গ্রহণ পূর্বক এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন । বিবী খোদায়জাঃ-ও তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিদিষ্ট করিয়া দিলেন । অতঃপর তিনি বিবী খোদায়জার বাণিজ্য-দ্রব্যের প্রধান কর্মচারী রূপে কাজ লইয়া বাণিজ্যার্থ শামে গমন করিলেন । এই বাণিজ্য-যাত্রায় বিবী খোদায়জার (রাঃ-আঃ) বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ময়ছারাঃ ও তাঁহার একজন আত্মীয় খয়মাঃ এখানে হকিম হজরতের সঙ্গে গমন করিয়াছিল ।

শামের দ্বিতীয় সফর ।

উপরোক্ত তেজারতি কাফেলা, যাহার সঙ্গে হজরত প্রধান কর্মকর্তা রূপে গমন করিতেছিলেন—ঐ কাফেলা শামে (সিরিয়ায়) প্রবেশ করিয়া এক ঈসায়ী সাধনাশ্রমের নিকট শিবির সন্নিবেশিত করিল। ঐ আশ্রমে একজন রাহেব (সাধু বা সন্ন্যাসী) বাস করিতেন, তাঁহার নাম নস্তরা। নস্তরা হজরতকে দেখিতে পাইয়া ঐ সাধনাশ্রম হইতে কতিপয় প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ লইয়া আসিলেন। রাহেব (সন্ন্যাসী) হজরতের নিকটে আসিয়া তাঁহার শরীর ও বদন মণ্ডল অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একবার তাঁহাকে দেখেন, আবার কেতাব সমাধিয়া (খোদা-প্রেরিত গ্রন্থ) পাঠ করেন; এবং গ্রন্থোল্লিখিত নিদর্শন সমূহের সঙ্গে হজরতের শরীর, বদন মণ্ডল প্রভৃতি মিলাইয়া দেখেন। সন্ন্যাসীর এইরূপ অদ্ভুত কার্য-কলাপ দর্শনে খয়মার মনে সন্দেহের উদ্ভেদ হইল; তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “এয়া আলে গালেব” অর্থাৎ আহ্ লে গালেব, সাহায্যার্থ অগ্রসর হও। এই আওয়াজ শুনিয়া কাফেলার সমস্ত কোরেশ সেখানে দৌড়িয়া আসিল। নস্তরা কোরেশদিগকে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন; এবং স্বীয় আশ্রম-গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া বসিলেন। সেখান হইতে কাফেলার লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। তোমাদের সঙ্গে ঐ যে লোকটি আছেন, আমি সমাধিয়া গ্রন্থের সঙ্গে উঁহার দেহ এবং দেহের নিদর্শন সমূহ মিলাইয়া দেখিতেছিলাম। নবী আখেরম্ জমানের (শেষ পয়গম্বর বা প্রেরিত পুরুষের) যে সকল চিহ্ন, নিদর্শন লক্ষণ কেতাবে লিখিত আছে, সেই সমস্তই এই লোকটির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। একথা শুনিয়া কাফেলার লোকদিগের উৎকণ্ঠা দূর হইল।

এ যাত্রায়ও বাণিজ্য-দ্রব্য সিরিয়ায় বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হওয়া গেল । এইরূপে ক্রমান্বয়ে কয়েক বার হজরত, বিবী খোদেজার (রাঃ—আঃ) বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া পূর্বদিকে বাহ্-রায়েন, দক্ষিণ দিকে ঈমেন এবং উত্তর দিকে শাম (সিরিয়া) দেশে গমন করিলেন ; এবং প্রত্যেক বাণিজ্য-যাত্রায়ই প্রচুর লাভ হইল ।

হজরত (সালঃ) এর সঙ্গে বিবী খোদায়জার (রাঃ-আঃ) বিবাহ ।

হজরতের দেয়ানত, আমানত, সদ্যবহার, পবিত্রতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা, নম্রতা ইত্যাদি সদগুণ নিচয় বিবী খোদেজার (রাঃ-আঃ) অবদিত ছিল না । যদিও মক্কার শরীফ (সম্রাট) ও ওমরাঃ (ঐশ্বর্যশালী) ব্যক্তিগণ বিবী খোদেজাতুল কোব্রার (রাঃ—আঃ) পাণিগ্রহণের একান্ত আকাঙ্ক্ষী ছিলেন । কিন্তু তিনি স্বয়ং নকিছাঃ নামী এক স্ত্রী-লোকের দ্বারা—অন্ত রওয়াকেতে আতেকা-বিস্তে-আবতুল মোস্তালেব দ্বারা হজরত রেহালত মাবের (ছালঃ) খেদমতে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন । হজরত, প্রতিপালক পিতৃব্য আবুতালেবের অভিমত জানিতে চাহিলে, তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করাতে, তিনি নিজেও তাহাতে সম্মতি জানাইলেন । তদনুসারে যথাসময়ে শুভ-বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল । মক্কার তদানীন্তন প্রথামুখারী বিবাহ কার্য সম্পাদন ও আবুতালেব কর্তৃক বিবাহের খোতবা পঠিত হইল । এই বিবাহে ওরকা-বিন্-নওফল, ওমর-এব্নে আসদ প্রভৃতি বিবী খোদেজাতুল কোব্রার (রাজিঃ-আঃ) সমস্ত আত্মীয়গণ, পক্ষান্তরে হজরতের রেশ্-তাদার (স্বজন বর্গ) উপস্থিত ছিলেন । বিবাহের সময় হজরতের বয়ঃক্রম ২৫ পঁচিশ বৎসর

এবং হজরত খোদেজাতুল কোব্রার (রাঃ—আঃ) বয়স ৪০ চাষ্মিশ বৎসর ছিল। হজরত খোদেজাতুল কোব্রার (রাঃ—আঃ) গর্ভে হজরত (ছালঃ) এর তিনটি পুত্র ■ ৪টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ।

ছাদেক এবং আল-আমীন উপাধি লাভ ।

কেবলমাত্র মক্কা-মোয়াঙ্কমায় নহে—সমগ্র-আরবে তাঁহার নেকী (পুণ্যাহুষ্ঠান), সদাশয়তা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, শিষ্টতা, নম্রতা, সৌজন্য, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদগুণাবলী এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, লোকে তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া “আল-ছাদেক” কিংবা “আল-আমীন” বলিয়া ডাকিতেন। ঐ সময়ই সমগ্র আরবে “আস্-সাদেক” ও “আল-আমীন” বলিলে কেবলমাত্র তাঁহাকেই বুঝাইত। আর এই সকল নামেই লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত। ভারতীয় খ্রিস্টিয়ক্যাল সোসাইটির পেশোরা (পরিচালিকা বা নেত্রী) মিসেস এনি বেসান্ত হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও একবার দেখুন :—“পরগম্বর আজম (হজরত রছুলে আকরম [ছালঃ]), যে কথায় আমার হৃদয়ে তাঁহার আজমত (বড়ত্ব, মহত্ব) বোজর্গী (সম্মান) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ঐ ছেফৎ (গুণ), বদ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে “ আল-আমীন ” (বড় দেয়ানতদার—গচ্ছিত-দ্রব্য বিশ্বস্ততার সহিত সংরক্ষণকারী) উপাধি প্রদান করিয়াছিল ; কোনও প্রশংসা ইহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। আর কোনও কথা ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব বোধক মোসলমানও অমোসলমানের—উভয়ের জন্ম অনুকরণ যোগ্য (গ্রহণ যোগ্য) নাই।” * * ■ ইত্যাদি ।

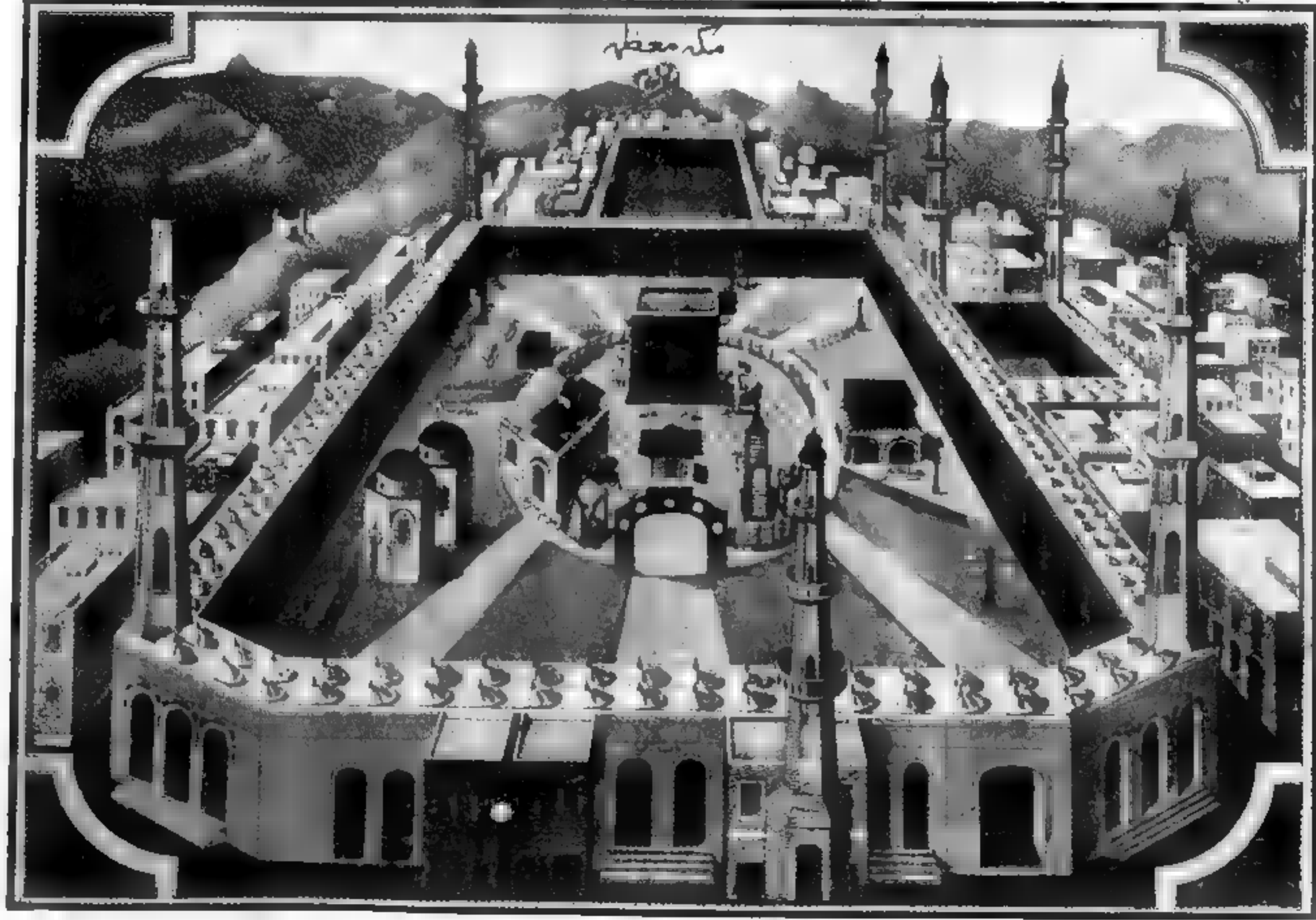
বহু প্রাচীনকালে আরব দেশে বিশেষতঃ মক্কার অনেকে মিলিয়া পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল যে, আমরা সর্বদা উৎপীড়িত লোকদিগের পক্ষাবলম্বন ও জ্বালেম (অত্যাচারী) লোকদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিব। ■ সকল লোক এই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিল, ঘটনা বশতঃ ইহাদের নামে “ফজল” শব্দ ব্যবহৃত হইত। এজন্য তাহাদের এই অহদ (সন্ধি বা সম্মতি) কে “হলকুল ফজল” বলা যাইত। হজরতের (ছালঃ) আবির্ভাব কালে এই সম্প্রদায়ের লোকের অস্তিত্ব আরব দেশে ছিল না। কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয় উল্লেখ করা হইত। ফজার যুদ্ধের পর হজরতের পিতৃব্য যোবের-বিন্-আবহুল মোস্তালেবের মনে এই খেয়াল পুনরায় জন্মিল যে, পূর্বোক্ত বিষয় আবার নূতনভাবে উজ্জীবিত করা হউক। তদনুসারে কতিপয় কোরেশ আবহুল্লা-বিন্-জদয়ানের গৃহে সমবেত হইয়া পরস্পর শপথ করিল যে, আমরা সর্বদা অত্যাচারীর বিরুদ্ধাচরণ এবং উৎপীড়িতের সাহায্য করিব। হজরত (ছালঃ) ঐ সময় বালক থাকিলেও, ঐদলে যোগদান করিয়াছিলেন। যখন তিনি বাল্যাবস্থা ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দলের নেতা, ছরদার এবং কর্তব্য-পরায়ণ বুদ্ধিমান লোক-দিগের নিকট দেশের অশান্তি, মোসাফের (প্রবাসী বা বণিক)-দিগের মাল-পত্র লুণ্ঠন, বৃদ্ধ এবং দরিদ্রদিগের প্রতি বলবান্ যবরদস্ত এবং আমীর (বড় লোক)-দিগের অত্যাচার ইত্যাদি অবস্থা জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া, বক্তৃতা প্রদান করিয়া) এই সকল বিষয়ের সংশোধন ও প্রতিকার ■ সকলকে উৎসাহিত ও মনোযোগী করিলেন। অবশেষে একটি “আশ্বমন” (সমিতি) গঠিত হইল। উহাতে বহু-হাশেম, বহুল-মতলেব, বহু-আসদ, বহু-যহরাঃ ও বহু-তমিম সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিত হইল। কিন্তু বহু-ওমিয়া ও বহু-নওফল উহাতে যোগদান করিল না। এই আশ্বমনের প্রত্যেক মেম্বরকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত যে,

(১) আমরা দেশের বদ আমনী (অশান্তি) দূর করিব ; (২) মোসাফের-দিগের হেফাযৎ (তত্ত্বাবধান ও রক্ষা কার্য) করিব ; (৩) গরীব- (দরিদ্র) দিগের সাহায্য করিব ; দুর্বলকে সবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিব । এই আঞ্জমেন দ্বারা দেশবাসীদিগের মহোপকার সাধন হইতে লাগিল । যখন হজরত (ছালঃ) পরগম্বরী লাভ করিলেন, তখনও তিনি বলিতেন, যদি আজও আমাকে পূর্বোক্ত সমিতি নামে লোকে আহ্বান করে, এবং আমার নিকট সাহায্য চায়, তবে আমি তাহাকে জওয়াব দিব— অর্থাৎ সকলের প্রথমে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইব ।

কোরেশ দলের উপর হজরতের নেতৃত্ব লাভ ।

অসতর্কতা বশতঃ পবিত্র কাবাগৃহে আগুন লাগিয়া ছিল । আগুনের প্রভাবে অনেক স্থানের প্রাচীরাদি ফাটিয়া গিয়াছিল । কোরেশগণ সঙ্কল্প করিল যে, এই অগ্নি-বিধ্বস্ত ইমারতকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐ স্থলে নূতন ইমারত নির্মাণ করা হউক । এই মতে সকলেই সায় দিলেন বটে, কিন্তু পুরাতন কাবা-গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কেহই সাহস পাইতেছিল না । তাহারা মনে করিতেছিল, যে কেহ পবিত্র গৃহ ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বিপদ অনিবার্য্য । অবশেষে কোরেশ ছদ্মারদিগের মধ্য হইতে অলিদ-বিন্ মসিরা প্রথমে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল । তৎপর ক্রমশঃ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই পুরাতন ও দম্ভীভূত কাবাগৃহ ভগ্ন করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল । ঠিক ঐ সময়েই “জেন্দা” বন্দরের সম্মুখে লোহিত সাগরে একখানি জাহাজ ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । এই সংবাদ প্রাপ্তিমাাত্র কোরেশগণ উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া ঐ জাহাজের কাঠগুলি ক্রয় করাইল । তন্মধ্যে যে গুলি কার্য্যের উপযুক্ত,

মক্কা শরীফ ও খানে কাবা



পাক পাজতন । ২৪ পৃষ্ঠা ।



এবং ভাল অবস্থায় ছিল, উহা উষ্ট্রের সাহায্যে মকায় আনীত হইল। এই মজমুৎ কাষ্ঠগুলি কাবা গৃহের ছাদে লাগাইবার জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল। পুরাতন কাবা-গৃহ ভাঙ্গিয়া এবং উহার মাল-মসানা সরাইয়া ভিত্তি গাঁথিতে গাঁথিতে যখন ইব্রাহিমির বনিয়াদ (ভিত্তি) পর্য্যন্ত পহুছিল, তখন ঐ স্থান ছাড়িয়া উহার পর হইতে আবার বনিয়াদ গাঁথার কাজ আরম্ভ হইল। পুরা ছাদের জন্য পুরা মাপের বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড সকল ছিল না, এজন্য খানা কাবা ইব্রাহিমি বনিয়াদের উপর পুরা গাঁথুনী করা হইল না। বরং একদিকে অল্প স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে গাথাই (নির্মাণ) কার্য্য ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে ঐ স্থান পর্য্যন্ত উঠিল, যেখানে “হজরল আছওয়াদ ” নামক পবিত্র প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রস্তর স্থাপন-ব্যাপার লইয়া কোরেশদিগের মধ্যে এমন মনোবাদের সৃষ্টি হইল যে, তাহা লইয়া একটা ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল। এই বিবাদের কারণ এই ছিল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দলপতি ইচ্ছা করিতেন, আমি হজরল আছওয়াদ যথাস্থানে স্থাপন করিব। দলপতিদিগের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ঐ পবিত্র প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন জন্য জেদ করিতে লাগিল। দলপতিগণ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া পরস্পরের মুণ্ডপাত করিবার জন্য বন্ধ পরিকর হইল। বনু-আব্দ দার অর্থাৎ আব্দ দার বংশীয়গণ শপথ করিয়া বলিল যে, হয় আমরা প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করিব, নয় প্রতিপক্ষদিগের মুণ্ডপাত করিব, এবং একাজের জন্য নিজেদের প্রাণ দিব। এই বিবাদের জন্য নির্মাণ কার্য্য পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিল। অবশেষে কোরেশ বংশের নেতাগণ কাবা-গৃহে সম্মিলিত হইলে, তথায় একটা সভার অধিবেশন হইল। এই ‘মজলেসে’ (সভায়) আবু ওম্মিয়া-বিন্-মগিরা একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিল। সেই প্রস্তাবটি এই—

আপামী কল্য যে ব্যক্তি সর্ব-প্রথমে পবিত্র কাবা-গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই ‘হাকেম’ (মীমাংসাকারী) নির্বাচিত করা হইবে ; ঐ ব্যক্তি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা সকলকেই মান্য করিতে হইবে । সকলেই এই প্রস্তাবে সন্মত হইল । পরদিন অতি প্রত্যুষে দেখা গেল, সর্ব প্রথমে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) কাবা-গৃহে প্রবেশ করিতেছেন । তাঁহাকে দেখিবামাত্র চতুর্দিক হইতে “আল-আমীন”—“আল্ আমীন” শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ; এবং সকলে বসিয়া উঠিল, আমরা সকলেই আপনার ‘ফয়সলার’ (মীমাংসার) উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত । হজরত সভায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে ঘটনাটি তাঁহার গোচরীভূত করিল ; এবং বলিল, আপনি-যে রূপ ভাল মনে করেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন । আপনি যে মীমাংসা করিবেন, আমরা সকলেই তাহা মানিয়া লইব । এখানে ভাবিবার ও ‘খেয়াল’ করিবার বিষয় এই যে, যে সম্মান ও প্রাধান্য মক্কার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গর্বিত ছদ্দার ও নেতাগণ লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিল, আর শোণিত পূর্ণ পেয়ালায় ঐশ্বর্য প্রক্ষেপ পূর্বক, ঐ সময়কার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে মরিতে কিংবা মারিতে প্রস্তুত হইয়া ‘গলিজ’ (অপবিত্র) শপথ করিয়াছিল,—ঐ সম্মান ও প্রাধান্য হজরতকে প্রদান জন্ত সকলেই ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত ছিল । এই দলিল ও প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, হজরতের স্মার-বিচার ও বিশ্বস্ততার প্রতি সকলেই আস্থা স্থাপন করিত । অমন গর্বোন্মত্ত, ‘যেদি,’ আত্মস্তরী, গৌয়াড়-গোবিন্দ কোরেশ জাতির হৃদয় অধিকার করা, তাহাদের কঠোর হৃদয় আকর্ষণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না । যে সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহারা হজরতের প্রতি আস্থা সম্পন্ন ও তাঁহার ভক্ত এবং অনুরক্ত হইয়াছিল, সে গুণ ■ সে শক্তি অতুলনীয় এবং অসাধারণ । তিনি ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই বিবাদীয়

বিষয়ের অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিলেন । তদ্বশনে বৃদ্ধ, বিচক্ষণ, বহুদর্শী কোরেশ-ছরদারগণ হজরতের (সালঃ) প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, অগাধ বিচার-ক্ষমতা ও বিবেক-শক্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল ; সঙ্গে সঙ্গে “ মার হাধা ” শব্দে গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিল । তিনি যাহা মীমাংসা করিলেন, তাহা এই :—হজরত (সালঃ) একখানা চাদর বিছাইলেন ; তাহার উপর স্বহস্তে হজরল আছওয়াদ স্থাপন করিলেন ; তৎপরে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ছরদার ও নেতাগণকে বলিলেন আপনারা সকলে চাদরের কেনারা ধরিয়া তুলুন ; তদনুসারে তাহারা সকলে চাদরের চতুর্দিক ধরিয়া তুলিল, এবং পবিত্র কাবা গৃহের যে স্থানে ঐ প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করা যাইবে, সেই পর্য্যন্ত চাদরসহ লইয়া যাইলে হজরত পবিত্র প্রস্তর খানি চাদর হইতে তুলিয়া লইয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রিরা তাহা :প্রচীরের সঙ্গে গাথিয়া ফেলিল । এই ব্যাপার এমন সুন্দরভাবে—বিষা খটকায় সম্পাদিত হইল যে, কাহারও কোন “শেকায়েত” বা আপত্তি করিবার উপায় রহিল না ; কেহ ইহাতে প্রতিবাদ-যোগ্য কোন কথা পাইল না । পরম্পর বিরুদ্ধবাদী সকল দলই ইহাতে সন্তোষ লাভ করিল, একটা ভীষণ ও মারাত্মক আসন্ন যুদ্ধের হস্ত ইহাতে কোরেশগণ অব্যাহতি লাভ করিল । এই ব্যাপারে ওত্‌বাঃ-বিন্-রবীয়া-বিন আব্দ শামছ, আছদ বিন্-মতলব বিন্-আছদ-বিন্-আবদুল ওয়া, আবু হযিকাঃ-বিন্-মগিরাঃ-বিন্-ওমর-বিন্-ফখরম এবং কায়ম্-বিন্-আদি আল ছমি এই চারি প্রধান ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ‘যেদ’ করিতেছিল । প্রস্তর উত্তোলনের গৌরব ও সম্মান লাভ ইহাদের মধ্যে কেহই অপরের নিকট মূনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না । হজরত কর্তৃক যে সুন্দর মীমাংসা হইল, তাহাতে এই চারিজন পরাক্রান্ত ছরদার (দলপতি) ও খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিল । যদি এই যুদ্ধ

সজ্জাটিত হইত, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় যুদ্ধ হইতে আরবে ইহা অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত। কত বংশঃধ্বংস হইত, কত গৃহ উজাড় হইত, কত নারী বিধবা হইত, কত বালক বালিকা 'এতিম (অনাথ) হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। হজরতের স্মৃতিসায় এই ভীষণ ও মহা সংহারক যুদ্ধানল অতি সহজেই নির্বাপিত হইল। এই সময় হজরতের বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল।

হজরত আলী (রাজিঃ) ও যাইয়েদ (রাজিঃ) এর তরবিয়ত (শিক্ষাদি)।

হজরতের (ছাগঃ) উচ্চ সম্মান ও সকলের হৃদয়াকর্ষক গুণ এবং শক্তিময় সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তৎকাল পর্য্যন্তও কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না। হজরতের (সালঃ) প্রতি স্নেহ প্রদর্শনকারী এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী লোকের সংখ্যা অনেক ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, প্রীতি-জনক ব্যবহার, সত্য-বাদিতা, বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সমগ্র দেশে আলোচনা হইত। তেজারত (বাণিজ্য) তাঁহার পেশা ছিল। খোদেজাতুল কোব্রার (রাঃ—আঃ) সঙ্গে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইবার পর তিনি সচ্ছল অবস্থায় জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। এক সময় মক্কায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। হজরতের চাচ্চা আবুতালেবের পরিবারে লোকসংখ্যা অধিক ও আয়ের পরিমাণ কম থাকাতে, দরিদ্রতা তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। যদিও তিনি স্বকীয় জ্ঞান-পরিমায়, বুদ্ধিমত্তায়, বংশ-মর্যাদায় মক্কায় একজন বিশেষ সম্মানিত পুরুষ ছিলেন; কিন্তু অর্থাভাবে অনেকটা ক্লেশ ভোগ করিতেন। দরিদ্রতা যেন তাঁহার চির সহচর ছিল। বিবাহের পর হজরত পিতৃব্যের আশ্রয় ছাড়িয়া নব-পরিণীতা সহধর্মিণীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতেছিলেন। হজরত

দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পিতৃব্য আবুতালেবের কষ্ট ও অসুবিধা দর্শনে নিতান্ত
 বাথিত হইলেন ; এবং অন্যতম পিতৃব্য আব্বাস : (রাজি :) কে (যাঁহার
 বংশধরগণ বোগদাদ নগরের প্রতিষ্ঠা ও তথায় রাষ্ট্রধানী স্থাপন করিয়া
 ভ্রগবিখ্যাত আব্বাসিয়া খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন) বলিলেন,
 চাচ্চাজান ! এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বড় চাচ্চাজান বিপুল পরিবার বর্গ
 লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কিছুতেই সংসারের ব্যয় সঙ্কলন
 করিতে পারিতেছেন না । আহুন, আপনি তাঁহার একটি পুত্রের ভরণ
 পোষণের ভার গ্রহণ করুন, আর একটীর ভরণ পোষণের ভার আমি গ্রহণ
 করি । আব্বাস-বিন্-আবদুল মোত্তালেব হজরতের এই প্রস্তাব ‘পছন্দ’
 (মনোনীত) করিলেন । তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে আবুতালেবের
 ‘খেদমতে’ উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন ।
 তচ্ছব্বে আবুতালেব বলিলেন, তোমাদের এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি
 নাই, আকিল (আবু তালেবের দ্বিতীয় পুত্র)-কে আমার নিকট রাখিয়া
 আর বাহাকে বাহাকে তোমাদের লইয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে
 লইয়া যাইতে পার । তদনুসারে আব্বাস আ-ফর-তইয়্যার বিন আবু তালেব
 কে (তৃতীয় পুত্র) এবং হজরত (ছাল :) ঃর্থ অর্থাতঃ সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র
 (হজরত) আলী (রাজি :) কে প্রতিপালনার্থ স্ব স্ব-গৃহে লইয়া গেলেন । ইহা
 ঐ বংশের ঘটনা, যে বংশের পবিত্র কাবাগৃহ পুনর্নির্মিত হয় । এই সময়
 হজরতের বয়স ■ বংশর, আর হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর বয়সক্রম
 ৫ বংশর মাত্র ছিল । ইহা কাবা গৃহ পুনর্নির্মাণের পরবর্তী সময়ের ঘটনা ।

হজরত খোদেয়েজাতুল-কোবরার (রাঃ—আঃ) ভ্রাতৃপুত্র হকিম-
 বিন্-খরাম কোনও স্থান হইতে একটি গোলাম (দাস) ক্রয় করিয়া
 আনিয়াছিল ; হকিম সেই ক্রীত দাসটিকে স্বীয় ফুপ্পিকে নজর
 (উপঢৌকন) স্বরূপ প্রদান করে । হজরত খোদেজাতুল কোবরা

(রাঃ—আঃ) আবার সেই দাসটী হজরতকে নজর স্বরূপ দিয়াছিলেন । এই ক্রীত দাসের নাম যয়েদ বিন্-হারেছঃ (রাজিঃ) ছিল । এই যুবক-দাস প্রকৃত পক্ষে এক স্বাধীন খৃষ্টীয়ান পরিবারের বালক ছিলেন । কোনও লুঠ-মারের হাঙ্গামায় ধৃত হইয়া দাস রূপে বিক্রীত হন । কিছুদিন পরে যয়েদের পিতা হারেন্ ও তাঁহার পিতৃব্য কারাব জানিতে পারে যে যয়েদ ক্রীতদাস রূপে মকায় কোন ও ব্যক্তির গৃহে আছে । তাহারা তদনুসারে মক্কা-মোরাক্কমায় আসিয়া হজরতের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইল যে যয়েদকে দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া আমাদের হস্ত সমর্পণ করুন, আমরা উহার পিতা এবং পিতৃব্য । হজরত তাহাদের প্রার্থন-তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করিয়া ফরমাইলেন যে, যদি যয়েদ তোমাদের সঙ্গে যাইতে চায়, তাহাতে আমরা কোনও আপত্তি নাই,—সম্পূর্ণ সম্মতি আছে । তদনুসারে যয়েদকে ডাকিয়া আনান হইল, হজরত রেছালত মাব (সালঃ) তাঁহাকে বলিলেন, যয়েদ ! তোমার পিতা ও পিতৃব্য তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে ; আমার পক্ষ হইতে তোমাকে ‘এজযত’ (অজুযতি) দেওয়া যাইতেছে যে, তুমি উহাদের সঙ্গে চলিয়া যাও । যয়েদ (রাজিঃ) বলিলেন, আমি ত আপনাকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা করি না । আমি আজীবন আপনার খেদমতেই থাকিব । তচ্ছুবণে যয়েদের পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া যয়েদ (রাজিঃ)-কে বলিল, তুই স্বাধীনতা হইতে গোলামী (দাসত্ব) পছন্দ করিতেছিস্ ? তদন্তরে যয়েদ (রাজিঃ) বলিলেন, আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) এর মধ্যে ঐ সকল মহৎ গুণ দেখিয়াছি, যাহা আমি আমার পিতা এবং সমস্ত দুনিয়ার লোককেও তাঁহার উপর তরজিহ্ (প্রাধান্য) দিতে পারি না । হজরত রেছালত মাব (সালঃ) যয়েদের (রাজিঃ) উত্তর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যয়েদ (রাজিঃ) কে সঙ্গে লইয়া পবিত্র কাবাগৃহে গমন করিলেন, এবং

উচ্চৈঃস্বরে ‘ফরমাইলেন’, হে উপস্থিত লোক সকল ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আজ যয়েদ (রাজিঃ) কে ‘আযাদ’ (স্বাধীন) *করিয়া দিলাম (দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান পূর্বক স্বাধীনতা দান করিলাম), এবং তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম । অতঃ হইতে যয়েদ আমার ওয়ারেস্ (উত্তরাধিকারী) হইবে ; পক্ষান্তরে আমি উহার ওয়ারেস্ হইব ।) যয়েদের (রাজিঃ) পিতা ও পিতৃব্য এই ব্যাপার দর্শনে আনন্দ লাভ করিল, আর যয়েদ (রাজিঃ) কে প্রসন্ন চিত্তে হজরতের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল । ঐ দিন হইতে যয়েদ (রাজিঃ) যয়েদ-বিন্ হারেস্ স্থলে, যয়েদ-বিন্-মোহাম্মদ (সালঃ) ক্রমে অভিহিত হইতে লাগিলেন । কিন্তু হজরতের (ছালাঃ) হেজরতের পরে যখন পবিত্র কোরআন শরীফে এই আয়েত ‘নাযেল’ হইল যে, মুখে পুত্র বলিয়া ডাকিলে পুত্র হইতে পারে না ; ঐরূপ পুত্র করা ‘যায়েজ’ (সিদ্ধ) নহে । তখন হইতে যয়েদ (রাজিঃ) আবার যয়েদ-বিন্-হারেস্ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন । কিন্তু যয়েদের (রাজিঃ) প্রতি হজরতের (ছালাঃ) স্নেহ ও ভালবাসা পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিয়া গেল । বয়ঃ দিন দিন উহার মাত্রা (পরিমাণ) বাড়িতে লাগিল । এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁহার স্বভাব ও ‘আখ্ লাক’ (শিষ্টতা ও সৌজন্য) কিরূপ উন্নত ছিল ।

খোদা তা-লার দিকে রুজু ■ নির্জন বাসের ইচ্ছা ।

যখন হজরতের বয়ঃক্রম বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তা-লার দিকে হৃদয়ের আকর্ষণ ও একাকী নির্জনে থাকিবার ইচ্ছা বড়ই

বাড়িয়া গেল । ঐ সময় হইতে একটা চমক ও জ্যোতিঃ (রওশনি বা আলো) তাঁহার দৃষ্টি পথে প্রায়ই পতিত হইত । ঐ রওশনি (মূর বা জ্যোতিঃ) দর্শনে তিনি আতঙ্কিত ও ভীত হইতেন । ঐ রওশনির মধ্যে কোনও কিছুর আকৃতি দৃষ্ট হইত না, কিংবা তন্মধ্য হইতে কোনও ‘আওয়াজ’ (শব্দ) ও গুনা যাইত না । আরবের মশরেকানা (অংশীবাদিত্ব) কার্যকলাপের প্রতি তিনি সর্বদাই ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন । এক সময় মক্কার কতিপয় মশরেক (অংশীবাদী) কোনও সভায় হজরতের সম্মুখে কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখিল, যাহা তৎপূর্বে বোত অর্থাৎ প্রতিমার ভোগ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল । তিনি ঐ খাদ্যদ্রব্য (কটি প্রভৃতি) যবেদ বিন্-ওমরুর দিকে সরাইয়া দিলেন । যবেদ-বিন্-ওমরুও ঐ খাদ্য দ্রব্য খাইলেন না ; এবং মশরেক অর্থাৎ প্রতিমা-পূজকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি প্রতিমার নামে ভোগ দেওয়া (উৎসর্গীকৃত) খাদ্য-দ্রব্য আহার করি না । ইনি সেই যবেদ-বিন্-ওমরু-বিন্-নকেল—যাহার কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । যিনি দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ্ আনহুর ‘চাচ্চা’ (পিতৃব্য) ছিলেন । হজরত একাকী নির্জন বাসকালে আল্লাহ্ তা-লার কোদরতের (মহিমাব) প্রতি গওর-ফোকর (চিন্তা) আলোচনা করিতেন । আর খোদাতা-লার অনন্ত মহিমাও বর্ণনার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন ; অর্থাৎ নিবিষ্ট মনে খোদাতালার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন । শেক এবং ‘মশরেকানা’ কার্যে (আল্লাহ তা-লার অংশীবাদিত্ব এবং ঐ শ্রেণী সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানে) তিনি চিরদিনই বিরত থাকিতেন । পয়গম্বরী লাভের—অর্থাৎ তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ চত্বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে, যতই ঐ সময় নিকটবর্তী হইতে লাগিল ; ততই তিনি একাকী নির্জন বাসে খোদাতা-লার অসীম মহিমা, অফুরন্ত করুণা ও অতুলনীয় শিল্প চাতুর্যের দিকে মনোনিবেশ ও আত্ম-নিয়োগ

করিতে লাগিলেন । তদনুসারে মকার নিকটবর্তী “হেরা ” নামক গিরিগুহা স্বীয় সাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করিয়া লইলেন । কিঞ্চিৎ ছাত্ত ও কিছু পানী সঙ্গে লইয়া তিনি-মকার অদূরবর্তী সেই গিরি-গহ্বরে প্রবেশ পূর্বক, অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা-লার উপাসনা ও আরাধনায় নিযুক্ত হইতেন । যখন ছাত্ত ও পানী ফুরাইয়া যাইত, তখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, এবং ঐ সমস্ত লইয়া আবার গারে হেরায় (হেরা পাহাড়ের গুহায়) প্রবেশ পূর্বক, মহামহিমাময় আল্লাহ্ তা-লার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইতেন । গারে হেরা আজকাল “জবল-নুর ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহা মকা হইতে ৩ মাইল দূরে—মিনা যাইবার পথে—বাম দিকে অবস্থিত । যে গহ্বরে বসিয়া হজরত (ছাল:) এবাদত-বন্দেগী ও ধ্যান-ধারণা করিতেন, উহা দৈর্ঘ্যে ■ চারি গজ ও প্রস্থে ১৫০ পোণে দুই গজ । ধ্যানাবস্থায় যে স্বপ্ন দৃষ্ট হইত, তাহাতে সোবেহ-ছাদেকের ‘রওশনির’ (আলোর) স্তায় আলো তিনি দেখিতে পাইতেন । ভোর বেলা যে ঘটনা ঘটিবে, রাত্রিকালেই তিনি সেই ঘটনার বিষয় দেখিতে পাইতেন । সুদীর্ঘ ■ বৎসর কাল এইরূপ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার এবাদত-বন্দেগী ও ধ্যানধারণায় তাঁহার অতিবাহিত হইয়া যায় । কিন্তু ইহার মধ্যে শেষ ছয়মাস কাল তিনি সর্বশক্তিমান্ খোদা-তা-লার-ধ্যানে ও প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মহারা এবং তন্ময় হইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন । এই শেষোক্ত ছয়মাসে তিনি সর্ব-নিরস্তা আল্লাহ্ তা-লার নির্মল ও পবিত্র প্রেমে সর্বাভায়ে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন । এই সময় মধ্যে তিনি পার্থিব কোনও কার্যের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখিয়াছিলেন না ; পার্থিব কোনও চিন্তা বা ‘খেয়াল’ স্বীয় মনে স্থান দিয়াছিলেন না । মহিমাময় জ্ঞানময় প্রেমময় বিশ্ব-পতির প্রেমে যথা-সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন । তাপস কুলের অগ্রণীকূপে তিনি মহাতপস্ভায়

আপনাকে নিয়োজিত করিয়া, মহাতাপস কুলের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন ।

ইসলাম-সূর্যোদয় ।

ইসলামের সূপ্রভাত ও সৌন্দর্যের বিকাশ সহজে উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে ; হজরতের (ছাঃ) বয়ঃক্রম এক্ষণে ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল । পৃথিবীতে ‘হেদায়েত’ ও ‘রেহালত’ (ধর্মোপদেশ ও পরগম্বরত্ব বা নবুয়তের) প্রচণ্ড সূর্য উদয় হইল । ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই যে যখন ঐ রূহানী তাকত (আধ্যাত্মিক শক্তি) আল্লাহ তা-লা তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশ করিলেন, যখন এবাদত-বন্দেগী ও সাধনা পূর্ণতা লাভ করিল, অহি এবং নবুয়ত লাভের শক্তি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্থান পরিগ্রহ করিল, দেল ও দেমাগ (হৃদয় ও মস্তিষ্ক) মজবুৎ হইল, তখন একদা গারে হেরায় (হেরা পর্বত-গম্বরত্ব সাধনাশ্রমে) তাঁহার নিকটে এক ফেরেশ্তা (স্বর্গীয় দূত) আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একরা পড় ; তিনি বলিলেন, “ মা আনা ব-কারিয়াত ” (আমি ত পড়িতে জানি না) ; তখন ফেরেশ্তা তাঁহাকে জোরের সহিত দাবাইলেন (চাপিয়া ধরিলেন) ; এবং বলিলেন, একরা ; তিনি আবার উত্তর করিলেন, “ মা আনা বকারিয়া ” ; ফেরেশ্তা আবার খুব জোরে তাঁহাকে দাবাইলেন ; এবং ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, “ একরা বেহ্মে রবেকাল্লাবী খালাক্, খালাকাল্ ইন্ছান্ মিন্ আলাক্ * * * * (পূর্ণ আয়াত)—“আপন প্রভুর নামে পড়, যিনি সকল জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মানুষকে জমাট শোণিত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ; পড়, আর তোমার রব (প্রভু) বড় বোয়র্গ, যিনি কলম দ্বারা এলেম (বিদ্যা) শিক্ষা দিয়াছেন, মানুষকে

তিনি এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন, বাহা তাহারা জানিত না।” এই কথা বলিয়া ফেরেশ্তা ‘গারেব’ (অদৃষ্ট) হইয়া গেলেন । (১) তিনি ভীত ও সম্বৃত্তভাবে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং হজরত খোদেজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) কে বলিলেন :—যেশোলুনী, যেশোলুনী “ আমাকে কদল দ্বারা আচ্ছাদিত কর, আমাকে কদল দ্বারা আচ্ছাদিত কর ” । ওম্মোল যুমেদিন হজরত খোদেজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) তাঁহাকে কদল দিয়া ঢাকিয়া দিলেন । কিন্তু তিনি ও এই বলিয়া ঘাব্রাইয়া (ব্যতিব্যস্ত হইয়া) গেলেন যে, এ কি হইল ? একি ব্যাপার ! একটু পরে যখন হজরত হির হইলেন, তখন হজরত খোদেজাতুল কোব্রার (রাঃ—আঃ) নিকট সকল ঘটনা আত্মপূর্বক বর্ণনা করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন, “লাকাদ খশিতো আনা নফ্ছি” (আমাকে নিজের জীবনের জন্য ভয় হইয়াছে) । তচ্ছু বণে হজরত খোদেজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) বলিয়া উঠিলেন, “কাল বানের ফওরান্নাহ লাইরাখ্যিকান্নাহো আবাদান ইন্নাকা লে তাছান্নেব রহ্মে ওয়া তাছদেকোল হাদীছে ওয়া তাহ্মেলোল কুলে ওয়া তাকুছেবোল্ মায়দুমে ও তাকাররোয বার্নেফে ও তাইওনো আলা নওয়া এবেল হাক্কে । ” না, না, আপনাকে ‘খুশী’ (সন্তুষ্ট) হওয়া চাই যে আল্লার শপথ, তিনি আপনাকে কখনও অপ্রতিভ (অপ্রস্তুত —অবমানিত) করিবেন না । কেননা, আপনি সর্বদা মাহুযের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, এবং সর্বদা সত্য কথা বলিয়া থাকেন ; আর যাহাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা কষ্টকর, তাহাদের ভরণ পোষণের খরচ-পত্র যোগাইয়া থাকেন ; আপনার মধ্যে ঐ সকল আত্মলাকী (শিষ্টতা-জনিত) সৌন্দর্য্য বিद्यমান আছে,—যাহা অন্য লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না । আপনি যেহ্মান ‘নওয়ায্’ (অতিথি-পরায়ণ বা অতিথি সেবায়

(১) হজরত জিব্রিল ফেরেশ্তা আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে ।

তৎপর), :তদ্যতীত হক্ কথা বলা ও সদহুষ্ঠান করার অন্ত যদি কেহ বিপদগ্রস্ত হয়, তবে আপনি তাহার সাহায্যকারী হন । এইরূপ প্রবোধ ■ সাহস প্রদানের পর হজরত খোদেজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) হজরতকে স্বীয় চাচ্চাত ভাই (পিতৃব্য পুত্র) ওয়ারকা:-বিন্-নওফলের নিকট লইয়া গেলেন । ঐ ব্যক্তি তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন । তিনি স্বীয় ভাতা ওয়ারকা:-বিন্-নওফলের নিকট সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিলেন । ওয়ারকা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, ইহা সেই অহি আকবর (আল্লাহর পবিত্র বাণী)—যাহা (এক সময়) হজরত মুসা আলায়হেস্ সালামের প্রতি ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হইয়াছিল । যাহা হউক, আমি যদি যুবক হইতাম, এবং ঐ পৰ্য্যন্ত জীবিত থাকিতাম,—যখন আপনাকে ‘কওম’ (জাতি) স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, (‘সেই ব্যাপার দেখিতে পাইতাম) । তচ্ছবণে হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ‘আওয়ামোথ্ কহম্’, বাস্তবিক কওম (স্বজাতি বর্গ) কি আমাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে ? ওয়ারকা:-বিন্-নওফল বলিলেন, হাঁ, তাহারা আপনাকে দেশত্যাগী করিতে বাধ্য করিবে । পৃথিবীতে যত রচুল (নবী বা পয়গম্বর—ভবিষ্যদ্বক্তা বা তত্ত্ববাহক) আগমন করিয়াছেন, এবং তওহিদেয় (একত্ববাদের) মহাবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, ও ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ‘কওম’ প্রথম হইতেই তাঁহাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিয়াছে । কোনও পয়গম্বরই স্বজাতির শত্রুতাচরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই । অতঃপর হজরত সেখান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক যথানিয়মে গারে হেরায় (হেরা গিরিশৃঙ্গহার) গমন করিলেন । কয়েক দিন পৰ্য্যন্ত তাঁহার প্রতি কোনও ওহি নাযেল (অবতীর্ণ) হইল না । উহাকে ‘ফেৎরতাঃ যমানাঃ’ বলা যায় । অবশেষে একদিন হজরত হেরা পর্বত-শৃঙ্গ হইতে যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ছিলেন ; সেই

সময় তিনি পথিমধ্যে আবার ঐ ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলেন । তিনি ফেরেশতাকে দেখিয়া পুনরায় থামিয়া গেলেন, এবং দণ্ডায়মান হইয়া বস্ত্র দ্বারা সর্বাবয়ব আচ্ছাদন করিলেন ; তখন তাঁহার কর্ণে এই 'পোর জালাল' (গৌরবময়) আওয়ায্ পহছিল :—“ইয়া আইরো হাল্ মোদাফেরো কুম ফান্বেয় ওয়া রাব্বাকা ফাকাবেয় ওয়াছিয়া বাকা ফাতাহ্ হেব্ ওয়া রাজব্ ফাহ্ জোর ” অর্থাৎ হে চাদরাচ্ছাদিত ব্যক্তি, উঠ, আর ঐ লোকদিগকে আজাহ্ র গযব্ (ক্রোধ) হইতে রক্ষা কর, ও স্বীয় সৃষ্টিকর্তার মাহাদ্মা ■ প্রাধান্ত বর্ণনা কর, শুদ্ধ বা পবিত্র কর ; এবং আপনার কাপড় পাঁক করা, অর্থাৎ অপবিত্রতা, শের্ক (অংশীবাদিত্ব) ও কুকার্য হইতে স্নাতক্য অবলম্বন কর (রক্ষা পাও) । ইহার পর হইতেই অ'। হজরতের (ছালঃ) প্রতি ক্রমাগত ওহি (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হইতে লাগিল । একদিন জিব্-রাইল (আলাঃ) আগমন করিলেন, এবং হজরত ছালালাহো আলায়হে ও ছালামকে পাহাড়ের পাদদেশে লইয়া আসিলেন ; সম্মুখে জিব্-রাইল আমীন স্বয়ং ওজু করিলেন ; তাঁহার দেখা দেখি হজরত রক্তম্বে আকরম (ছালঃ) ও সেই প্রণালীতে ওজু-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । অজু সমাপন হইবার পর হজরত জিব্-রাইল আমীন (আলাঃ) এমাম হইয়া নামাজ পড়াইলেন ।

তবলিগল্ ইসলায বা ইসলায ধর্ম প্রচার ।

হজরত রেছালতমাব, নবীয়ে দো-জাহান (ছালঃ) পরম করুণাময় আজাহ্ তা-লা কর্তৃক তওহিদ (একত্ববাদ) প্রচারের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তবলিগ্ অর্থাৎ ইসলায-প্রচার কার্যে মহা উৎসাহ সহকারে আত্ম-নিয়োগ করিলেন । লোকদিগকে -শের্ক্- অর্থাৎ অংশিবাদিত্ব হইতে

নিরন্তর রাখিবার জন্য, এবং ‘তওহিদ এলাহী’ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা-লার একত্ব-বাদ প্রচারের কার্য তিনি সর্বাগ্রে নিজের ঘর (বাটী বা পরিবারবর্গের মধ্যে) হইতেই আরম্ভ করিলেন। সর্বাগ্রে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্মিণী সাধ্বী সতী হজরত খোদেজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন (তাঁহাকে খোদা-তা-লার প্রেরিত নবী বলিয়া স্বীকার করিলেন)। হজরত আলী-বিন্-আবি তালেব (রাজিঃ) এবং হজরত যয়েদ-বিন্-হারেস (রাজিঃ) ও প্রথম দিনই হজরতের উপর ঈমান আনিলেন। তাঁহার ৩ জনই হজরতের নিজের ঘরের লোক ছিলেন। তদ্ব্যতীত হজরতের বন্ধু, হজরত আবুবকর আবদুল্লাহ বিন্-আবু বাক্বাহাফাঃ (রাজিঃ) ও প্রথম দিনেই হজরত রেছালত মাবের (ছালঃ) উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। এই প্রথম ঈমান আনয়নকারী ও পবিত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও ধর্মাবলম্বিনী চারিজনের মধ্যে একজন তাঁহার আহলিয়াঃ (পত্নী), একজন চাচ্চা যাদু তাই (পিতৃব্য-পুত্র), একজন স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস ও একজন একান্ত অল্পবয়স্ক অকপট বন্ধু। একথা অবিস্মৃত নহে যে, উপরোক্ত ৪ জন নরনারী হজরতের আত্মলাক (সৌজন্য), ও স্বভাব-চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। আর হজরতের জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোনও ঘটনা বা কোন কার্যই তাঁহাদের অবিস্মৃত ছিল না। ইহাদের পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রতি ঈমান আনা (পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া), স্মার-পরায়ণতা ■ সত্য-বাদিতার এক জীবন্ত দলিল বা প্রমাণ। হজরত সর্ব প্রথমে আপনার শিক্ষা সহকারী প্রচার কার্য নিতান্ত নীরবতার সহিত, স্বীয় পরম আত্মীয় ও বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেন। ইসলাম প্রচারের এই প্রাথমিক যুগে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) সর্বাপেক্ষা অধিক খেদমত আদায় করিয়াছিলেন। তাঁহার সে অলস উৎসাহ ও জীবন্ত ধর্মতাবের বিষয় চিন্তা করিলে বিশ্বাসপন্ন হইতে হয়। হজরত আবুবকর

হিন্দিক (রাজিঃ) কোরেশদিগের বিশেষ গণ্যমান্য পুরুষ ছিলেন । তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও বিস্তর ছিল । তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি এবং বন্ধুতার প্রভাবে হজরত ওসমান-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ), হজরত তালহা-বিন্-ওবায়েহুমা (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-অওফ্ (রাজিঃ), হজরত যোবের বিন্-অল-আওয়াম (রাজিঃ) প্রভৃতি মান্যগণ্য পুরুষ-গণ হজরতের প্রতি ঈমান আনিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । এই সকল মহাত্মাগণ উক্ত কালে পবিত্র ইসলাম ধর্মের সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে গণ্য হইয়াছিলেন । অতঃপর হজরত আবুবেদা-বিন্-যাবরাহ (রাজিঃ), হজরত আবুহলমাঃ আবদুল আসদ-বিন্-হেলাল (রাজিঃ), হজরত ওসমান-বিন্-মজযুন (রাজিঃ), হজরত কদামাঃ-বিন্-মজযুন (রাজিঃ), হজরত ছয়ীদ-বিন্-যরেদ (রাজিঃ), হজরত কাতেমা (রাঃ—আঃ)—(হজরত-ওমর-বিন্-খাত্তাবর [রাজিঃ] সহোদরা ভগিনী ও হজরত সরীদ (রাজিঃ) এর সহধর্মিণী প্রভৃতি পবিত্র ইসলামের ‘দায়েরায়’ (গতিতে) ‘দাখেল’ হইলেন । ইহাদের পরে হজরত সায়াদ-বিন্-আবিওকাস্ (রাজিঃ) পবিত্র ইসলামের সুশীতল আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিলেন । সন্দেশেই তাঁহার ভ্রাতা হজরত যামীর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা বিন্-মসউদ (রাজিঃ) হজরত জাফর-বিন্-আবুতালেব (রাজিঃ) ঈমান আনিলেন ; এবং মোসলমানদিগের একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল । এই দলে বালক, যুবক, প্রোড়, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন । প্রবল মোশরেক—অর্থাৎ অংশীবাদী পৌত্তলিকদিগের ভয়ে ইহারা নগরের বাহিরে পাহাড়ের ঘাটি সমূহে গিয়া গোপনে নমাজ আদায় করিতেন । তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইসলামের প্রচার কার্য এইরূপ চূপে চূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল । লোকেরা আস্তে আস্তে শের্ক্ (অংশিবাদিত্ব) বোত-পরন্তিতে (প্রতিমা-পূজায়) বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, ক্রমশঃ ইসলামে

আকৃষ্ট ও ঐ সত্যধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন । এই তিন বৎসর কালের মধ্যে কোরেশদিগের প্রত্যেক সভা-সমিতি এবং প্রত্যেক বৈঠকে এই নূতন ধর্ম সম্বন্ধে বিপরীত চর্চা ও আলোচনা হইতেছিল । মোসলমানগণ আপনাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা প্রচার করিতেন না ; একজন্ম মোসলমানদিগের পরম্পরের মধ্যেও সকলকে সকলে চিনিতেন না । ইসলাম গ্রহণ করিয়া সকলেই চুপে চুপে ধর্মাহুষ্ঠান করিতেন ; দুর্দান্ত কোরেশদিগের ভয়ে প্রকাশভাবে উপাসনাদি করিতেন না । কোরেশগণ প্রথমাবস্থায় ইসলাম প্রচার কার্যকে তেমন গুরুতর ও ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া মনে করে নাই ; সুতরাং এই নূতন ধর্ম সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাসি-ঠাট্টা, উপহাস-পরিহাস এবং বাচনিক কটু-কাটব্য বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত । মোটামুটি ভাবে সমগ্র কওম (সম্প্রদায়) মোসলমানদিগের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিত না । পক্ষান্তরে কোরেশদিগের মধ্যে এমন অনেক গুলি কুটীলমনাঃ, বিবাদ-প্রিয় লোক ছিল, বাহারা সুযোগ পাইলে মোসলমানদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিত, এবং তাহাদের প্রতি দৈহিক যাতনা প্রদান করিতে ও কুণ্ঠিত হইত না । একদা হজরত ছায়াদ বিন্-আবিওকাস্ (রাজিঃ) কতিপয় সঙ্গী সহকারে পাহাড়ের ঘাটিতে (পার্বত্য দরিপথে) নমাজ পড়িতে ছিলেন ; অকস্মাৎ মক্কার কতিপয় মোশরেক (অংশীবাদী—পৌত্তলিক) ঐখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহারা মোসলমানদিগকে নমাজ পড়িতে দেখিয়া, অতীব কঠোরতার সহিত নমাজে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইল ; তখন হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওকাস্ (রাজিঃ) তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার তরবারির আঘাতে একজন কাফের আহত হইল । ইহাই মোসলমানদিগের মধ্যে কাফেরের বিরুদ্ধে আজার নামে প্রথম অস্ত্র পরিচালন ।

একদা হজরত রেহালত যাব (সালঃ) ও হজরত আলী (রাজিঃ)

পাহাড়ের কোনও ঘাটিতে নমাজ পড়িতেছিলেন ; ঘটনাক্রমে আবুতালেব ঐ পথে আসিয়া বাহির হইলেন ; এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন । যখন হজরত (ছালঃ) নমাজ শেষ করিলেন, তখন আবুতালেব লাভুপুত্রকে (হজরত [সালঃ] কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ মজহব (ধর্ম)—যাহা তুমি অবলম্বন করিয়াছ ? উত্তরে হজরত রেছালত পানাহ্ (ছালঃ) বলিলেন, ইহা দীনে-ইব্রাহিম (হজরত ইব্রাহিম আলায় হেস্-সালামের অবলম্বিত ধর্ম) । সঙ্গে সঙ্গে পিতৃব্য আবুতালেবকে বলিলেন, আপনিও এই দীন কবুল (গ্রহণ) করুন । আবুতালেব বলিলেন, আমি ত আমার পিতৃ-পিতামহের ধর্ম পরিত্যাগ করিব না । কিন্তু হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে পুত্র ! তুমি (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর সঙ্গে ছাড়িও না । আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) তোমাকে ভালর দিক্ ভিন্ন মন্দের দিকে লইয়া যাইতে কখনই চেষ্টা পাইবে না । স্মূলকথা এই যে, ওহি অবতীর্ণ হইবার প্রথম হইতে ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত ইসলাম প্রচার কার্য নীরবে সম্পাদিত হইয়াছিল ; এবং পবিত্র ক্বহ (আত্মা) সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে (ইসলামের দিকে) আনয়ন করিতেছিল । অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় পরিষ্কার ছিল, যাহাদের সত্য পথে—প্রকৃত ধর্মের পথে অগ্রসর হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই সকল মহান্ পুরুষ পবিত্র ইসলাম ধর্মের সুশীতল আশ্রয়চ্ছায়ার শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন । এই সময় আল্লাহ্ তাবার এই ওহি অবতীর্ণ হইল :—“কাছদার বেমা তু মারো” তোমাকে যে আদেশ করা হইয়াছে, উহা খুলিয়া (প্রকাশ্য ভাবে) লোকদিগকে শুনাও । এই আদেশ নাযেল (অবতীর্ণ) হইবামাত্র তিনি “ ছাফা ” নামক পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যেক কবিলার (সম্প্রদায়ের) নাম

উচ্চারণ পূর্বক সত্য ধর্মের দিকে—পবিত্র ইসলাম ধর্মের দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । তাঁহার এই আহ্বান শ্রবণে আরববাসিদিগের দস্তুর মতাবেক (নিয়মাহুযারী), লোকেরা সেখানে আসিয়া সমবেত হইল । যখন সকল লোক সেখানে সমবেত হইল, তখন তিনি করমাইলেন :—“লও আখবর তোকুম আনাল্ আদু ওয়া মহ বাহকুম আও মমহবাকুম আন্না হুত্তম তছদকুনী” হে কোরেশগণ ! যদি আমি তোমাদিগকে সংবাদ প্রদান করি যে, সকালে, কিংবা সন্ধ্যাকালে তোমাদের প্রতি তোমাদের শত্রুদল আক্রমণ করিবে, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে সত্যবাদী বলিয়া মনে করিবে ? তখন কোরেশগণ একবাক্যে বলিল “ হাঁ ; কারণ আমরা ইতিপূর্বে তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিয়াছি । এই উত্তর শুনিয়া হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, “ আচ্ছ, বেশ কথা ; এক্ষণে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিতেছি যে, আল্লাহ্ তাবার আযাব (ক্রোধাগ্নি বর্ষণ) নিকটবর্তী, তাঁহার উপর ঈমান আন (তাঁহাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল বলিয়া বিশ্বাস কর), আল্লাহ্ তাবার ক্রোধাগ্নি হইতে আপনাদিগকে বাঁচাও । ” এই কথা শুনিয়া কোরেশগণ উচ্চহাস্তে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল । হজরতের (সালঃ) অন্যতম পিতৃব্য পাপা-চারী ইসলাম-শত্রু আবু লহব বলিয়া উঠিল, “ তোমার নিপাত সাধন হউক, তুমি এই জ্ঞা আমাদিগকে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে ? ” ইহার পর সমবেত জন-মণ্ডলী সেখান হইতে চলিয়া গেল । তাহার হজরতের কথার বিকৃত ■ বিপরীত সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল । আবুলহব উঠিয়া যাওয়ার পরে ছুরে “তাব্বাত্ এদা আবি লাহাবেও ” :নাযেল :(অবতীর্ণ) হয় । কয়েক দিন পরে “ ওআনুযর আশিরাতা কাল আকরবিন ”—অর্থাৎ করিবী রেশ্তাদার (নিকট আত্মীয়)-গণকে ভীতি-প্রদর্শন কর । ” এই বাক্য নাযেল হইয়া-

ছিল। তদনন্তর হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ) কে :একটি ঘোরাফতের (নিমন্ত্রণের) আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে হজরত আলী (রাজিঃ) একটি ঘোরাফতের (নিমন্ত্রণের) আয়োজন করিলেন। অতঃপর হজরত সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গকে দাওত দিলেন। তাঁহার প্রায় ৪০ চল্লিশ জন আত্মীয় নিমন্ত্রণ স্বার্থ তদীয় গৃহে আগমন করিলেন। যখন মেহমানদিগের আহার কার্য সম্পন্ন হইল, তখন তিনি একটি বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আবুলহব এমন 'বেহদা' (অস্ত্রাৎ অসঙ্গত) বাক্যালাপ করিতে লাগিল যে, হজরত বক্তৃতা প্রদানের কোনও সুযোগ পাইলেন না। ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় দিবস তিনি আবার ঘোরাফতের বন্দোবস্ত করিলেন; স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে আবার দাওত (নিমন্ত্রণ) করিয়া পাঠাইলেন। যখন সকলের আহার কার্য শেষ হইল, তখন তিনি সকলকে এই বলিয়া মোখাভেব (আপনার দিকে আকৃষ্ট) করিলেন যে, " দেখ, আমি তোমাদের নিকট ঐ কথা লইয়া আসিয়াছি, যাহা হইতে ভাল কথা কেহ স্বীয় কবীলার (সম্প্রদায় বা দলের) জন্য আনয়ন করে নাই। বল, একাজে কে কে আমার সাহায্যকারী হইবে।" এই কথা শুনিয়া সকলে চুপ হইয়া রহিল; কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না। এই সময় হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওরাজহ্ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যদিও আমি দুর্বল এবং বরসে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গী (সাহায্যকারী) হইব। একথা শুনিয়া সকলেই হাস্ত করিয়া উঠিল, এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে করিতে ■ স্ব গৃহে চলিয়া গেল।

প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম প্রচার।

এক্ষণে হজরত রছুল করিম (সালঃ) সাধারণ ভাবে—প্রকাশ্য রূপে লোকদিগকে তওহিদ (একত্ববাদ) ও ইসলামের দিকে আহ্বান করিলেন ; এবং মক্কা নগরের সর্বত্র বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন । ঐ সময় হইতে তাহার উপর, এবং তদীয় অল্পসংখ্যক শিষ্যদের উপর দুর্জয় কোরেশ দিগের ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল । সভা সমিতিতে, মেলা সমূহে, বাজারগুলিতে, জন-সমাগম স্থানে, গলি-কুচার এবং লোকদিগের গৃহে গমন পূর্বক হজরত (ছালঃ) তওহিদে (একত্ববাদে) সৌন্দর্য্য বর্ণনা এবং পৌজলিকতা (পুতুল পূজা) করিতে লোকদিগকে নিষেধ করিতেন । মূর্তি পূজার অবৈধতা ও অপকারিতা লোকদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন । যেনা (ব্যভিচার), দ্যুতক্রীড়া (জুয়াখেলা), মিথ্যা বলা, বিশ্বাস ঘাতকতা, চুরি, দস্যুতা ইত্যাদি কুকর্ম্ম হইতে লোকদিগকে বিরত রাখিতে চেষ্টা পাইতেন । মক্কার কোরেশ বংশ অতি সম্ভ্রান্ত এবং শরীফ বলিয়া বিখ্যাত ছিল । স্বীয় পূর্ব পুরুষদিগের মজ্হব (ধর্ম্ম) এবং তাহাদের কার্য্য-কলাপ ও আচার ব্যবহারের নিন্দাবাদ নীরবে সহ্য করা তাহাদের পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না । তাহাদের মধ্যে প্রভু এবং ক্রীতদাসের পার্থক্য একটা গুরুতর ও অপরিবর্তনীয় ব্যাপার ছিল । ইসলাম এক সাধারণ ভ্রাতৃত্ব কায়েম করিয়া প্রভু এবং দাসকে একই পংক্তিতে স্থান দিত । * প্রভু ও দাসের মধ্যে এরূপ সাম্য ভাব তাহাদের

■ এই তেরশত বৎসর পরেও সেই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই ; এখনও মস্জিদে নমাজের সময় বাদশাহ এবং দাস পাশাপাশি হইয়া দাঁড়ান । দাস প্রথম পংক্তিতে (কাতারে) এবং প্রভু পরবর্ত্তী পংক্তিতে থাকিলে দাসের পদতলে প্রভুর মস্তক লুপ্তিত হয় ।

পক্ষে অসহ্য ছিল। কোরেশ এবং অন্যান্য মক্কাবাসীর যে সম্মান ও প্রতিপত্তি আরবের অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইত, তাহা ঐ বোত (প্রতিমা বা মূর্তি) গুলির জন্যই ছিল—যাহার পূজা করিবার জন্য আরবের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা মক্কা সমবেত হইত। এবং কাবা-গৃহে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলির পূজা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। ইসলাম পৌত্তলিকতার শত্রু ছিল। যাহার প্রকাশ্য পরিণাম ফল ঐ পৌত্তলিকদিগের অবনতি এবং উৎসন্ন-প্রাপ্তি ব্যতীত : আর কিছুই ছিল না। বড় বড় ছরদার (গোষ্ঠিপতি) এবং উচ্চ সম্মানিত লোকেরা ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না যে, তাহারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ্জতবা (সালঃ) কে আপনাদের নবী বলিয়া মানিয়া লয় ; এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ছরদারী ও প্রাধান্ত্য পরিত্যাগ করিয়া হজরতের প্রভুত্ব স্বীকার করে। কোরেশের অধিকাংশ সম্প্রদায় (গোষ্ঠী) বহুহাশেমের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ ছিল। এজন্য তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারিত না যে, এক প্রতিপক্ষ শত্রু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে আপনাদের নবী (রহুল বা পরগম্বর) বলিয়া স্বীকার করে, ও তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। উপরোক্ত প্রকাশ্য ধর্ম-প্রচারের ফল এই হইল যে, সমগ্র কোরেশ জাতি হজরতের সহিত কঠোর শত্রুতাচরণ এবং বিরুদ্ধবাদিতা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। ইসলাম ও কোরেশের এই প্রকাশ্য বিবাদ-বিসম্বাদ হজরতের নবুয়ত (পরগম্বরী) লাভের ৪র্থ বৎসরেই খুব প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময়েই হজরত (সালঃ) ছাফা পাহাড়ের পার্শ্বে অবস্থিত আরকম-বিন্-আবুকমের গৃহখানিকে ইসলামী 'দরছগাহ' (বিদ্যালয়) স্বরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন। এই গৃহে ইসলামে নব-দীক্ষার্থী লোকেরা আগমন করিতেন, এবং পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ইসলাম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ

করিতেন । সুতরাং এই গৃহে সকল সময়ই মোসলমানদিগের সমাগম হইত । হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) এই গৃহেই ইসলাম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেন । আর এই গৃহেই সকলে মিলিয়া জময়াতে নমাজ আদায় করিতেন । তিন বৎসর, অর্থাৎ হজরতের উপর নবুয়ত অর্পিত হইবার ৩য় বৎসর পর্য্যন্ত হজরতের অবস্থান-স্থান এবং ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রস্থান এই গৃহেই ছিল । এই তিন বৎসরে যাহারা পবিত্র ইসলাম ধর্মের আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্মান ও “আউওলুল মোস্লেমিন” অর্থাৎ প্রাথমিক মোসলমান বলিয়া খুব উচ্চ ছিল । দারুল-আরকমে’ মোসলমান ধর্মে যাহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আনহু তাঁহাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি । তিনি ইসলাম মধ্যে দীক্ষিত হওয়ার মোসলমানদিগের বেশ শক্তি বৃদ্ধি হইল ; আর মোসলমানগণ তখন “ দারু আরকম ” হইতে বাহিরে আগমন করিলেন ; কোরেশগণ যখন হজরত (সালঃ) এবং তাঁহার দলের উদ্দেশ্য ও কার্য-কলাপের বিষয় বুঝিল, তখন তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করা, এবং তাঁহাদিগকে কষ্ট প্রদান করার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিল ।

কোরেশদিগের শত্রুতাচরণ ।

ঈমান গ্রহণকারী ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত লোকদিগের মধ্যে কয়েকজন ক্রীতদাসও ছিলেন । আর কতক লোক এমন ছিলেন—যাহারা আপনাদের শক্তি সম্পন্ন ও বলবান্ আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য লাভে বঞ্চিত থাকাতে অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া পরিগণিত হইতেন । ইহাদিগকে মুসলমান হইতে মোরতেদ (ধর্ম-ভ্রষ্ট বা ধর্মদ্রোহী) করিবার জন্য দুর্বল কোরেশগণ তাঁহাদের প্রতি শারীরিক :খাতনা প্রদান আরম্ভ করিল । যে সকল

লোকেরা কোনও কবীলা অর্থাৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেন, উহাদের প্রতি সাধারণ লোকের অত্যাচার করা একান্ত আশঙ্কাজনক ছিল যে, তাঁহাদের কবীলা-ওয়ারা (গোষ্ঠীস্থ ব্যক্তি)-গণ না উৎপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। একান্ত ইসলাম গ্রহণকারীদের আত্মীয়-স্বজনকে এইরূপ কার্যে বাধ্য করিতে চেষ্টা পাইল যে, তাহারা নিজেরাই যেন আপনাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী আত্মীয়-স্বজনবর্গকে শান্তি ও কষ্ট প্রদান পূর্বক মোরতেদ (ধর্মভ্রষ্ট) করিয়া লয়। মোসলমানদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিক্রপ করা, তাঁহাদের নিন্দাবাদ প্রচার করা, তাঁহাদের প্রতি গালি বর্ষণ করা ইত্যাদি কার্যের জন্য দস্তুর মতন আরোজন করা হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য, যাহাতে নূতন নূতন লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার সাহস ও সুযোগ লাভ না ঘটে। এদিকে হজরত (ছাল:) পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রকাশ্যভাবে প্রচার আরম্ভ করিলেন। ওদিকে কোরেশগণও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে শত্রুতাচরণের জন্য দৃঢ়তার সহিত প্রস্তুত হইল। হজরত বেলাল (রাজি:), ওম্মিয়া বিন্-খলফের গোলাম (ক্রীতদাস) ছিলেন। তাঁহার ইসলাম-গ্রহণের সংবাদ যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন ওম্মিয়া-বিন্-খলফ তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। সূর্য-তপ্ত অগ্নিবৎ গরম বালুকার উপর শোয়াইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে উত্তপ্ত ও ভারী প্রস্তর খণ্ড চাপাইয়া রাখা হইত। মোশক বাধিয়া কোড়া দ্বারা প্রহার করা হইত। অনাহারে রাখিত। গলায় দড়ি বাধিয়া ছেলেদের হস্তে সমর্পণ করিত; উহারা মক্কা নগরের গলি কুচার এবং নগরের পার্শ্বস্থ পাহাড় অঞ্চলে দড়ি ধরিয়া টানিয়া বেড়াইত। সঙ্গে সঙ্গে নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিত। এই সকল ভীষণ অত্যাচারও ও কঠোর শাস্তি হজরত বেলাল (রাজি:) অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে

“আহাদ-আহাদ.” শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া সুখ ও শান্তি অনুভব করিতেন। কোনও কষ্ট বা যজ্ঞণাকেই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। হজরত এমার (রাজিঃ), স্বীয় পিতা এম্বাহর (রাজিঃ) ও মাতা ছমিতাঃ (রাঃ—আঃ) সহ পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; আবুজহল তাঁহাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছিল। হজরত ছমিতাঃ রাজিঃ আল্লাহ্ আনুহাকে পাষণ্ড আবুজহল এমন ভীষণভাবে নেঘা (বল্লম বিশেষ) দ্বারা আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই তিনি শহিদ হইয়া গেলেন। হজরত যনিরাঃ রাজিঃ আল্লাহ্ আনুহকে ঐ অত্যাচারী দুর্বৃত্ত আবুজহল এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করিল যে, তিনি চক্ষু-বস্ত্র হারাইয়া অন্ধ হইলেন; এইরূপে বহু সংখ্যক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর উপর পাষণ্ড কোরেশগণ এমন ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল যে, সে কথা শ্রবণ করিলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ইসলাম এমন একটা জবরদস্ত (অপরাজেয়) শক্তির নাম যে, কোরেশদিগের হৃদয় বিদারক ভীষণ শক্তির দ্বারা ও তাহাদিগের হৃদয় বিচলিত করিতে এবং গন টলাইতে পারে নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজনকেও মোরতেদ (ধর্মদ্রষ্ট) করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা অবিচলিত চিত্তে সকল ক্রেশ ও সকল অত্যাচার অমানবদনে সহ করিয়াছিলেন। হজরত ওসমান বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ) বনি ওশিয়্যার মধ্যে একজন আমীর (ধনী) ব্যক্তি ছিলেন; তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে, তাহার চাচ্চা (পিতৃব্য) তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাধিয়া খুব প্রহার করিল; সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাপ্রকার যজ্ঞণা প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি-ওকাস্-(রাজিঃ) কে তাহার কবীলার (গোষ্ঠীর) লোকেরা নানাপ্রকার শারীরিক যজ্ঞণা প্রদান করিয়াছিল। হজরত যোবের-বিন্-আল্ আওয়াম (রাজিঃ)-কে তাহার পিতৃব্য চেটাইতে (মাদুরে) লেপ্টাইয়া তাহার নাকের ভিতর ধূম প্রদান

করিত। হজরত আবুযর গফ্ফারি-(রাজিঃ) কে কোরেশগণ কোরআন শরীফ পাঠ করিতে শুনিয়া, এরূপ নিদাক্ষণ প্রহার করিতে লাগিল যে, তিনি 'বেহোশ' (অচেতন) হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উহারা তাঁহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু ঐ সময় আব্বাস-বিন্-আব্দুল মোত্তালেব তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া ঐরূপ পৈশাচিক সঙ্কল্পে বাধা দিলেন যে, দেখ, এই ব্যক্তি বহু-গফ্ফার-সম্প্রদায়ের লোক, তাহারা তোমাদের বাণিজ্য-যাতায়াতের পথে বাস করে, বাণিজ্য-যাত্রা কালে তাহারা পথিমধ্যে তোমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবে। তাঁহার কথায় অত্যাচারী কোরেশদিগের চৈতন্যোদয় হইল; সুতরাং হজরত আবুযর গফ্ফারি (রাজিঃ) জীবন রক্ষা পাইল। এইরূপে হজরত আবদুল্লা-বিন্-মসউদ (রাজিঃ)-কে কাবা-গৃহের চাতানে (প্রাঙ্গণে) প্রহার করিতে করিতে অচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল; হজরত জনাব বিন্-আরস (রাজিঃ)-কে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়াছিল; একদা জলন্ত কয়লারশির উপর তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তিকে তাঁহার বুকের উপর বসাইয়া দেয়; উদ্দেশ্য, তিনি যেন পার্শ্ব-পরিবর্তন করিতে না পারেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ও কোমরের সমস্ত চর্ম ও মাংস পুড়িয়া কাবাবের আকার ধারণ করিয়াছিল। কোমও কোনও ছাহাবা (রাজিঃ)-কে গরু কিংবা উষ্ট্রের কাঁচা চামড়ার ভিতর পুরিয়া, মজবুৎ করিয়া বাধিয়া ফেলিয়া রাখিত। কাহাকেও কাহাকেও লোহার ঘরাহ (লৌহ-নির্মিত গাভাবরণ—যাহা যুদ্ধ কালে ব্যবহৃত হয়) পরাইয়া জলন্ত অগ্নি কিংবা জলন্ত কয়লা রাশির উপর ফেলিয়া দিত।

হজরত রচুল আকরমের (সালঃ)

সঙ্গে কোরেশদিগের বে-আদবী

■ দুর্ব্যবহার ।

হজরত রচুল করিম (সালঃ) একদা পবিত্র কাবাগৃহে নামাজ পড়িতেছিলেন। ঐ সময় ওক্বা-বিন্-আবি মরতিরা তাঁহার গলদেশে চাদর জড়াইয়া এমন জোরে টানিয়াছিল যে, তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া গিয়াছিল। যখন এই সংবাদ হজরত আবুবকর সিদ্দিকের নিকট পৌঁছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া কাবাগৃহে আসিলেন। তিনি সেই দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে হজরত (সালঃ)-কে রক্ষা করিলেন; এবং কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“আতাক্ তুলুনা রেজালান্ অ’ইইয়াকুলা রাব্বি আলাহো”—তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য বধ করিতেছ যে, তিনি বলেন, আমার রব (প্রভু) আল্লাহ্ তালা ? দুর্বৃত্ত কোরেশগণ হজরত-(সালঃ) কে ত ছাড়িয়া দিল; কিন্তু হজরত আবুবকর সিদ্দিক-(রাজিঃ) কে জড়াইয়া ধরিল; এবং প্রহার করিতে লাগিল। তিনি নীরবে সে অত্যাচার সহ্য করিলেন। একবার কাবাগৃহের ছহনে (সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে) কোরেশগণ হজরতকে ঘিরিয়া (বেষ্টন করিয়া) লইল; এবং তাঁহার সঙ্গে বে-আদবী ও অত্যাচার করিবার উদ্যোগ করিল; এই সংবাদ যখন হজরত হারেস-বিন্-আবিহালাহ্ (রাজিঃ) শুনিত পাইলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ কাবাগৃহে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং অত্যাচারীদিগের অবমাননা এবং অত্যাচার হইতে হজরত-(সালঃ) কে রক্ষা করিলেন। আহা! দুর্ব্যবহার কাকেরগণ হজরত হারেস-(রাজিঃ) কে ঐ স্থানে শহিদ করিয়া ফেলিল। কিন্তু হজরতের প্রতি আর হস্তোত্তোলন করিতে দুর্বৃত্তদিগের সাহসে কুলাইল না। হজরত রাত্রি-

কালে যে পথ দিয়া গমনাগমন করিতেন, অত্যাচারী কোরেশগণ সেইপথে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। উদ্দেশ্য, পারে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তিনি কষ্ট-বহুলা ভোগ করেন। আর একবার হজরত রহুল আকরম (ছালঃ) কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে নমাজ পড়িতেছিলেন, কোরেশদিগের কতকগুলি লোকও সেখানে উপস্থিত ছিল ; হুষ্ট চুড়ামণি আবুজহল বলিল, অমুক স্থানে উষ্ট্র জবেহ্ করা হইয়াছে ; উহার নাড়ী ভুড়ি সেখানে পড়িয়া আছে, কেহ যাইয়া উহা উঠাইয়া আন, এবং (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) উপর প্রক্ষেপ কর। এতচ্ছ বণে ওকুবা-বিন্-আবি-গরতাঃ সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া উষ্ট্রের সেই নাড়ী-ভুড়িগুলি লইয়া আসিল। যখন হজরত নামাজের ছেজদাঃ করিলেন, তখন সেই আতুড়ি উঝুড়ি (নাড়ী-ভুড়ি) গুলি তাঁহার পৃষ্ঠোপরি নিক্ষেপ করিল। হজরত আল্লাহু তা-লার উপাসনায় এমনই নিমগ্ন ছিলেন যে, এ বিষয় কিছুই অসুস্তব করিতে পারিলেন না। কিন্তু কাফেরগণ হাসিয়া লুট পাট হইতেছিল ; তাহাদের আনন্দ ও উল্লাসের সীমা পরিসীমা ছিল না। হজরত আবদুল্লা-বিন্-মসউদ (রাজিঃ) ■ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহস করিয়া কিছু বলিতে বা প্রতিকার করিতে পারিলেন না। ঘটনা বশতঃ ঐ সময় হজরত কাতেমা যোহরাঃ (রাজিঃ আল্লাহ আনহা) তথায় আসিয়া পহুছিলেন ; এবং পিতার (হজরতের) পৃষ্ঠদেশ হইতে সেই উষ্ট্রের নাড়ী ভুড়িগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত অত্যাচারী কোরেশদিগকে ভৎসনাও করিলেন। হজরতের গৃহে দুর্দান্ত কোরেশগণ প্রসুরও বর্ষণ করিত। নানাপ্রকার পঁচা ছড়া দুর্গন্ধময় জিনিষ তাঁহার গৃহে প্রক্ষেপ করিতেও ক্রটি করিত না। একবার হজরত ফরমাইলেন, হে বহু-আব্দে মন্নাফ্ ! তোমরা প্রতিবেশীর বেশ হক আদায় করিতেছ। কেহ হজরত (সালঃ)-কে ‘শারের’ (কবি) বলিয়া

উপহাস করিত ; কেহ তাঁহাকে ‘ছাহের’ : (ঐজ্জালিক বা যাদুকার) বলিয়া সম্বোধন করিত ; কখনও তাঁহাকে ‘কাহেন’ (গণক) বলিয়া উল্লেখ করিত, আর কখনও বা উন্মাদ (পাগল) বলিয়া অভিহিত করিত । শুলকথা, মক্কার কোফ্ফার (খোদাদ্রোহী কাফের)-গণ হজরত রেছালতমাব (সালঃ) এবং তাঁহার হস্তে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে এবং হজরতের আরকু কাজে সর্বপ্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে নাই । পক্ষান্তরে হজরত (সালঃ) জলন্ত উৎসাহে, অতুলনীয় অধ্যবসায় সহকারে এবং দীপ্ততেজে সে কার্য সাধন করিতেছিলেন । কোনও বাধা বিয়ের প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন নাই ; কোনও বাধা-প্রতিবন্ধকতারই তিনি “পরোয়া” করেন নাই । যত বাধা পাইতেছিলেন, তাঁহার সাহস, ধর্মবল ও সহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও উদ্যম ততই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল । অত্যাচারী কোরেশগণ যখন দেখিতে পাইল, আমাদের সর্বপ্রকার যত্ন-চেষ্টা, যোগাড়-যত্ন প্রভৃতি কিছুই কার্যকরী হইতেছে না, তখন তাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিল ।

কোরেশগণের সন্ধির প্রার্থনা ।

কোরেশগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিল এবং ওক্বা-বিন্-রবিয়া-কে আপনাদের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হজরত রচুল আকুরমের (সালঃ) খেদমতে পাঠাইল । তদনুসারে ওক্বা হজরতের নিকট আসিয়া খুব নম্রতার সঙ্গে বলিতে লাগিল, মোহাম্মদ (সালঃ) তুমি শরীফ (ভদ্র) ব্যক্তি, তোমার বংশও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ; কিন্তু তুমি কণ্ডমের

(জাতি বা সম্প্রদায়ের) মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়াছ । তুমি প্রকাশ করিয়া বল, তোমার উদ্দেশ্য কি ? যদি তুমি অর্থ ও ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা কর, তবে বল, আমরা তোমাকে এত ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পত্তি প্রদান করি, যাহাতে তুমি যেকোন নগরীতে সর্বাপেক্ষা ধনী হইতে পার । যদি তুমি ছরদারী ও নেতৃত্ব চাও, তবে আমরা তোমাকে আমাদের সর্বোপরিষ্ট নেতা নির্বাচন করিতে প্রস্তুত আছি । তোমার কর্তৃত্ব ও আদেশ প্রতিপালনে আমরা সর্বদা তৎপর থাকিব । যদি তুমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও সম্মানিত ঘরে, সর্বাপেক্ষা সুন্দরী পাত্রী তোমার জন্য নির্বাচন করিয়া দি । যদি এই সকল বিষয়ে তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা সকলে মিলিয়া তোমার এই সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না । তুমি স্বীয় অভিলাষ আমাদের নিকট জ্ঞাপন কর, আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিব ।

ওক্বাঃ যখন স্বীয় বক্তব্য শেষ করিল, তখন হজরত (সালঃ) উত্তর স্বরূপে পবিত্র কোরআনের সূরা হা-মিম্-সেজদাঃ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন । যাহাতে হজরতের (সালঃ) রেছালতের বর্ণনা, এবং বাহার ইন্সলামে অবিস্বাসী, তাহাদের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন বিষয় উল্লেখ আছে । যখন তিনি দ্বিতীয় ককুর নিম্ন-লিখিত আয়েত পাঠ করিতে লাগিলেন, “ফইয়েন আরাদ্ ফকুন আন্সার তাঁকুম ছায়েফাতান্ মেছলা ছায়েফাতে আদে ও হামুদ” তখন ওক্বার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল । সে হজরতের মুখের উপর হাত রাখিয়া বলিল, তুমি এমন কথা বলিও না । তৎপর হজরত ছেজদাঃ করিলেন ; সেজদা হইতে মন্তকোত্তোলন পূর্বক বলিলেন, তুমি কি আমার উত্তর শুনিয়াছ ? ওক্বা আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া কোরেশ-দিগের নিকট চলিয়া গেল, এবং বলিল, আমার মত এই যে, ঐ ব্যক্তিকে

(হজরত রেছালত পানাহ-কে) তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও । অর্থাৎ তাঁহার বাহা ইচ্ছা হয় করুক, সে বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া দরকার নাই । তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর । যদি (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) আরব দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহাতে বাধা প্রদানের কি প্রয়োজন ? কারণ তিনি ত তোমাদেরই ভ্রাতা । তাঁহার সাফল্য লাভ, তোমাদেরই সাফল্য লাভ বলিয়া মনে করিতে হইবে । আর যদি তিনি অকৃতকার্য হন, ধ্বংস প্রাপ্ত হন, তবে তোমরা অতি সহজেই অভীষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইবে । একথা শুনিয়া কোরেশগণ ওতবাঃকে কহিল, তোমার কথায় বোধ হইতেছে, (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) তোমাকে বাছ (ইন্দ্রজালিক বিজ্ঞায় বাধ্য) করিয়াছে । তচ্ছ বণে ওতবাঃ বলিল, তোমাদের যাহা ইচ্ছা বল এবং কর, আমি আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিলাম ।

আবুতালেবের নিকট কোরেশদিগের

দূত প্রেরণ ।

যখন ওতবার চেষ্টা বিফল হইল, তখন ওতবাঃ, শাইয়েবাঃ, আবুল বখ্তরি, আবুদ, অলিদ ও আবুজহল প্রেরিত একওকদ্ (ডেপুটেশন) আবুতালেবের খেদমতে উপস্থিত হইল । তাঁহার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তোমার ভ্রাতৃপুত্র আমাদের বোত (দেব-প্রতিমা)-দিগকে মন্দ বলিতে ক্রান্ত হইতেছে না । তুমি তাহাকে বুঝাইয়া বল, এবং অন্তায় কার্য হইতে তাহাকে নিবৃত্ত রাখ । আবুতালেবও এই দূত দলকে উপযুক্তরূপে উত্তর প্রদান করিলেন ; তিনি বলিলেন, তোমরাও তাহার প্রতি এবং তাহার দল তুচ্ছ লোকের

প্রতি কঠোর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেছ না। সে দিন ত তাহারা চলিয়া গেল; দ্বিতীয় দিন যুক্তি ও পরামর্শ আঁটিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; উহারা উপস্থিত হইলে আবু-তালেব হজরত (সালঃ)-কে ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে আনিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। কোরেশ ছরদারগণ ঐ সকল কথা হজরতের সম্মুখে উত্থাপন করিল—যে সকল কথা ইতিপূর্বে ওতবাঃ কোরেশদিগের পক্ষ হইতে পেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিল, হে (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)! আমরা এ সময় কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথার তোমাকে ডাকাইয়াছি। স্বীয় সম্পদায়ে উপর একরূপ বিপদ কেহ আনয়ন করে নাই—যে রূপ বিপদ তুমি আনয়ন করিয়াছ। যদি তুমি তোমার এই নূতন দীন (ধর্ম) দ্বারা ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পত্তি উপার্জন করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে আমরা তোমাকে এত ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদ জমা করিয়া দিব যে, অপর কাহারও নিকট তাহা হইবে না। যদি মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা তোমাকে আমাদের ছরদার (নেতা) স্বীকার করিয়া লইতেছি। যদি রাজত্ব ও বাদশাহী লাভের ইচ্ছা থাকে, আমরা তোমাকে সমগ্র আরবের বাদশাহ করিয়া দিতেছি। আর যদি কোনও জেন বা অপদেবতা তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তৎক্ষণাৎ তুমি এরূপ প্রমাণ বকিয়া থাক এবং অস্বাভাবিক খেয়াল তোমার মনে স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা আমাদের ‘কাহেন’ (গণক)-গণ চিকিৎসকগণ দ্বারা তোমার চিকিৎসা করাইতে প্রস্তুত আছি। হজরত রেছালত পানাঃ (ছালঃ) কোরেশদিগের এই সকল কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর স্বরূপ পবিত্র কোরআন শরীফের কতিপয়-আয়েত পাঠ করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, খোদাতায়ালা

আমাকে তোমাদের জন্য রচুল -(পয়গম্বর বা তত্ত্ববাহক) বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। আমি খোদাতা-লার আদেশ সমূহ তোমাদিগকে পৌছাইয়াছি। যদি তোমরা আমার প্রদত্ত শিক্ষা সমূহ গ্রহণ কর; তবে তোমাদের পক্ষে ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গল বিধান হইবে। আর যদি এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন কর, তবে আমি সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশের অপেক্ষা করিব; এবং তোমাদিগকে জানাইব যে, তোমাদের ■ এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কোরেশগণ বলিল, আচ্ছা, যদি তুমি খোদা তা-লার রচুল (প্রেরিত পুরুষ) হও, তবে পাহাড়গুলিকে আরব দেশ হইতে হঠাইয়া দাও, এবং মরুভূমিকে শ্রামল শান্তিক্ষেত্রে পরিণত কর; আর আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে জীবিত করিয়া দাও; বিশেষতঃ কছরী বিন্-কেলাবকে অবশ্য অবশ্য জীবিত কর। যদি কছরী বিন্-কেলাব জীবিত হইয়া তোমাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লন, আর তোমাকে রচুল (নবী ■ পয়গম্বর) বলিয়া স্বীকার করেন, তবে আমরাও তোমাকে রচুল বলিয়া স্বীকার করিব। তচ্ছ বণে হজরত রচুল করিম (ছাল:) ফরমাইলেন, আমি এই সকল কার্যের জন্য রচুল মনোনীত হই নাই। আমার ঐ কার্য এই যে, তোমাদিগকে খোদা তা-লা কর্তৃক অবতারিত আদেশ সমূহ শুনাইয়া, এবং তাহার মর্ম বোধ করিয়া বুঝাইয়া দি। আমি নিজ হইতে—স্বচ্ছাচ্ছসারে কোনও কার্য করিতে পারি না। এইরূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর কোরেশগণ নারাজ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং আবুতালেবকে ধমক দিয়া (ভয় দেখাইয়া) সেখান হইতে প্রস্থান করিল। কোরেশ দলপতিগণ চলিয়া যাওয়ার পর আবুতালেব হজরতর (ছাল:)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রিয় ভাতৃপুত্র! আমি বুদ্ধ হইয়াছি, আমি কোরেশদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে (যুদ্ধ-হাঙ্গামা করিতে) সমর্থ

নহি ; তুমি আমাকে এমন শ্রম-সাধ্যকার্যে বাধ্য করিও না, যাহা আমার শক্তি ■ সামর্থের বহির্ভূত, । আমি কর্তব্য মনে করি যে, তুমি নিজের দীনের (ধর্মের) ঘোষণা করিতে এবং বোত (প্রতিমা) গুলির প্রকাশ্য ভাবে নিন্দাবাদে ক্ষান্ত হও । পিতৃব্যের বক্তব্য শুনিয়া হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, পিতৃব্য ! যদি কেহ আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য এবং বাম হস্তে চন্দ্র আনিয়া রাখিয়া দেয়, তবু আমি স্বীয় কর্তব্য কার্য সাধনে বিরত থাকিতে পারি না । আবুতালেবের কথা শুনিয়া হজরত (ছালঃ) মনে করিলেন, পিতৃব্য এক্ষণে আমার সাহায্য করিতে বিরত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন । আবুতালেব মক্কার ছরদার- (দলপতি) দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন । আবার বনি-হাশেম সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন । তাঁহার জ্ঞাত্য কোরেশবল হজরতের প্রতি আক্রমণ করিতে অনেকটা ভয় ও সঙ্কোচ করিত । তাহার ভাবিত, যদি ইহার প্রতি বেশী অত্যাচার করি, আর সমগ্র বহু-হাশেম তাহার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হয়, তবে ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে । পিতৃব্য আবুতালেবের সহায়তায় হজরতের মনে অনেকটা সাহস ও ভরসা ছিল, এক্ষণে তাঁহার মুখে নৈরাশ্র-জনক কথা শুনিয়া তিনি কিয়ৎ পরিমাণে হতাশ হইলেন । অবশেষে বাষ্পাকুলিত লোচনে এই বলিয়া পিতৃব্যের নিকট হইতে উঠিলেন যে, প্রহেল পিতৃব্য ! আমি স্বীয় কর্তব্য কার্য ঐ সময় পর্যন্ত পরিত্যাগ করিব না, যে পর্যন্ত খোদার আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন না হয় ; আর এই কার্য সমাধা করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমি মৃত্যুর কবলে পতিত না হই । হজরতের (সালঃ) এই দৃঢ়তা ও করুণাব্যঞ্জক উক্তি শ্রবণে আবুতালেবের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল ; তিনি স্নেহাম্পদ ভ্রাতৃপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন ; আচ্ছা ! তুমি তোমার অভিপ্রেত কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন কর, যে পর্যন্ত

আমার দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন আমি তোমার সাহায্য করিতে বিরত থাকিব না এবং তোমাকে কখনও শত্রু হস্তে সমর্পণ করিব না ।

হাবশাঃ অর্থাৎ আবিসিনিয়ার হেজরত ।

। মোসলমানদিগের প্রথম বার জন্মভূমি ত্যাগ)

কাফের কোরেশগণ যখন সর্বপ্রকার চেষ্টা ও যোগাড়-বস্ত্রে বিকল-মনোরথ হইল, আর তওহিদ (একত্ববাদ) ও ইসলাম প্রচার-কার্য্য বধা-নিয়মে চলিতে লাগিল, তখন তাহারা খুব বিচলিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিতে পাইল যে, ইসলাম প্রচারকার্য্যকে তাহারা ছেলেখেলা মনে করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ বদ্ধমূল ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে যে, উহার গতিরোধ করা সহজ ব্যাপার নহে। তাহারা এক্ষণে ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাধা প্রদান প্রস্তুত হইল। তাহারা হজরতের (ছালঃ) কাবাগৃহে প্রবেশ করা বন্ধ করিয়া দিল। নগরের 'আওয়ারা' ও উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগকে বলিয়া দিল, হজরত (ছালঃ) বা তাঁহার শিষ্যগুলীকে যেখানে দেখিতে পাইবে, হাততালি দিতে থাকিবে। তাঁহাদিগকে পালি দিবে, এবং রাস্তায় ও গলি-কুচারে চলিতে ফিরিতে বাধা দিবে। ভিন্ন স্থান হইতে আগত মোসলমানদিগকে মোহাম্মদ (সালঃ)-এর সঙ্গে মিলিতে-মিশিতে বা সাক্ষাৎ করিতে দিবে না। আর যতদূর সম্ভব, তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিবে। তদনুসারে সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল মোসলমানদিগের উপর নূতন ভাবে নানাপ্রকার ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। কোনও প্রকার অত্যাচার উৎপীড়নেই তাহারা ক্ষান্ত হইল না। মুষ্টিমেয় মোসলমানদিগের পক্ষে এই অবস্থা


দাঁড়াইল যে, মক্কা নগরে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল। মোসলমানদিগের জীবন রক্ষা করা দায় হইল। একান্ত নিরুপায় হইয়া হজরত শিব্যদিগকে বলিলেন, তোমরা আপাততঃ মক্কা পরিত্যাগ করিয়া হাবশা রাজ্যে চলিয়া যাও। লোহিত সাগরের অপর তীরবর্তী আফ্রিকা মহাদেশস্থ হাবশা বা আবিশিনিয়া রাজ্য তখন জনৈক খৃষ্টীয়ান ধর্মাবলম্বী নৃপতির দ্বারা শাসিত হইত। হজরতের (ছালঃ) আদেশানুসারে নব্বুত লাভের পঞ্চম বর্ষে—রজব মাসে, ১১ জন পুরুষ এবং ৮ জন স্ত্রীলোক হাবশা রাজ্যে গমন কর্ত্ত মক্কা নগর ত্যাগ করিলেন; এই পনের জন-লোকের ক্ষুদ্র দলটি রাজ্যিকালে, অতি সজোপনে মক্কা-নগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রোপকূলের দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা জেদ্দা বন্দরে উপনীত হইয়াই আবিশিনিয়ায় গমনার্থী একখানি জাহাজ পাইলেন। তাঁহারা সেই জাহাজে আরোহণ পূর্বক হাবশা রাজ্যে পৌঁছিলেন। এই প্রথম হেজরতকারী মহাআগণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ মোসলমান-গণ ছিলেন। (১) হজরত ওসমান-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ), (২) তাঁহার পত্নী হজরত রোকয়া বিস্তে রুহুলোম্মাহ্ (সালঃ), (৩) হজরত আবু হযিকাঃ-বিন্-ওতবাঃ, (৪) হজরত ওসমান-বিন্ ময়যূন (রাজিঃ), (৫) হজরত আবদুল্লা-বিন্ মসযুদ (রাজিঃ), (৬) হজরত আবদুর রহমান-বিন্-অওফ্ (রাজিঃ), (৭) হজরত যোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ), (৮) হজরত মহয়াঃ বিন্-সামীর (রাজিঃ), (৯) হজরত আমের-বিন্-রবিয়াঃ (রাজিঃ), (১০) হজরত সহেল-ইব্নে বদ্রবাঃ (রাজিঃ)। ইহারা প্রধানতঃ কোরেশদিগের শক্তিশালী ও বিখ্যাত গোষ্ঠীর (বংশের) লোক। ইহা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, কাকের কোরেশগণের অত্যাচার কেবলমাত্র দুর্বল শ্রেণীর মোসলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং প্রত্যেক মোসলমানকে, তাঁহারা ষত বড়

বংশের, যেমন প্রসিদ্ধ গোত্রের, যে যত বড় শক্তিশালী গোষ্ঠীর লোকই হউক না কেন, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে অনুমাত্র ও কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহাও প্রমাণিত হয় যে, এই হেজরতকারী লোকদিগের মধ্যে এমন দরিদ্র লোকও ছিলেন, যাঁহারা প্রবাসের উপযোগী জিনিষ পত্রও সংগ্রহ করিতে সক্ষম ছিলেন না। বিধর্মী কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, কতিপয় মোসলমান মক্কা হইতে হাবশাঃ রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন; তখন তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার উহাদের পশ্চাৎগমন করিল, কিন্তু জেদ্দায় পৌঁছিবার পূর্বেই হেজরতকারী (দেশত্যাগী) মোসলমানগণ জাহাজে আরোহণ পূর্বক হাবশাঃ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। মোসলমানগণ আবিশিনিয়ার পৌছিয়া নিশ্চিন্ত মনে ও নিরঙ্কশে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর মোসলমানগণ ক্রমশঃ মক্কা ছাড়িয়া হাবশায় চলিয়া যাইতে লাগিলেন। হজরত জাকর-বিন্-আবিতালেবও হাবশায় গিয়া স্বীয় মোসলমান ভ্রাতাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে দেশত্যাগী মোসলমানদিগের সংখ্যা ৮৩ তিরানি পর্যন্ত পৌঁছিল। মোসলমানগণ হাবশায় পৌঁছিবার কয়েকমাস পরেই এই জনরব শুনিতে পাইলেন যে, মক্কার কোরেশগণের সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে মোসলমানগণের পক্ষে মক্কায় কোনও আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই। এই সংবাদ শুনিয়া কতিপয় মোসলমান হাবশাঃ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর অবশিষ্ট সকলে এই সংবাদের সত্যতা 'তস্দিক্' হওয়ার অপেক্ষায় হাবশায়ই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে সকল মোসলমান মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তাঁহারা মক্কার নিকটস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন, ঐ সংবাদ ভিত্তিশূন্য; কোরেশদিগের অত্যাচার পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। তজ্জ্বলে কতকলোক পুনরায় আবিশিনিয়ার

প্রত্যাবর্তন করিলেন ; আর কেহ কেহ মক্কার কোনও কোনও শক্তিশালী কোরেশের ‘জামানতে’ (প্রতিভূত্বে) মক্কার ফিরিয়া আসিলেন। ইহার মক্কার আসিয়া, অন্তান্ত মোসলমানদিগকে হাব্শা রাজ্যের নিরাপদতা ও সুযোগ-সুবিধা বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আবার হাব্শা রাজ্যে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহাই হাব্শা রাজ্যে মোসলমানদিগের দ্বিতীয় হেজরত নামে অভিহিত হয়।

মক্কার কোরেশদিগের আর একটি অকৃতকার্যতা।

মক্কার কাকের কোরেশগণ যখন দেখিতে পাইল যে, মক্কার অধিবাসিগণ ক্রমশঃ মোসলমান হইয়া হাব্শা রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, এবং সেখানে সুখ-স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্ধে বসবাস করিতেছেন, তখন তাহাদের মনে এই আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল যে, এই অবস্থায় খুব সম্ভব, আমাদের বহু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, বাহিরে কোনও নিরাপদ স্থানে সমবেত ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমাদের উপর কোনও বিপদ আনয়ন করে। উহার প্রতিকারার্থ কোরেশ কাকেরগণ হজরতের (সালঃ) প্রতি ও তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি পূর্বাপেক্ষা ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল ; আর ওমর-বিন-অল আছ ও আবদুল্লাহ-বিন-রবিয়, এই দুইজন সম্ভ্রান্ত লোককে সফির (দৌত্য) পদে নিযুক্ত করিয়া হাবশার বাদশাহ নজাশীর দরবারে পাঠাইয়া দিল। মক্কার কোরেশ ও আবিশিনিয়া গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পূর্ব হইতেই একটি বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপিত থাকাতে সেই সন্ধি-সর্ত্ত অনুযায়ী মক্কার কোরেশ ও হাব্শা রাজ্যের বাণিজ্য ‘কায়েম’ (প্রচলিত) ছিল। কোরেশগণ এই দুইজন ছফিরের (দূতের) হস্তে

হাব্‌শা-রাজের  বহুল্যবান উপচোকন পাঠাইয়াছিল। ছাফরদয় আবিগিনিয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ সকল উপচোকন বা নজরানা বাদশাহের দরবারে পেশ করিল, এবং 'দরবারী' (মন্ত্রী ও পারিষদ)-বর্গকে আপনাদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইল। অতঃপর এই প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদের কতিপয় গোলাম (ক্রীতদাস) বিজ্রোহী হইয়া আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছে; আর আপনাদের পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক এক নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে—যে ধর্ম অন্যান্য প্রচলিত সকল ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব আমাদের প্রার্থনা, ঐ ক্রীতদাসদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। বাদশাহ তাহাদের ঐ প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, আমি প্রথমে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করি, পরে তোমাদের দরখাস্ত (আবেদন পত্র) সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। মন্ত্রী ও সভাসদগণ এই ছফির (দূত)-দ্বয়ের দরখাস্তের অনুকূলে অনেক কথা বলিল; কিন্তু বাদশাহ নজাশী মোগাজের (হেজরতকারী বা দেশত্যাগী) মোসলমানদিগকে স্বীয় দরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; তাহারা উপস্থিত হইলে বাদশাহ বলিলেন, উহা কোন্ মযহব (ধর্ম)—বাহা তোমরা অবলম্বন করিয়াছ? মোসলমানদিগের পক্ষ হইতে জা-ফর তইয়্যার বিন্-আবিতালেব (রাজি:) সকলের অগ্রবর্তী হইয়া বাদশাহ নজাশীর সম্মুখে এই মর্মে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন :—

“হে বাদশাহ্ নাগদার! আমাদের জাতি (মক্কার কোরেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়) পূর্বে অত্যন্ত মূর্থ ও বর্বর ছিল, আমরা বোত-পরস্ত (প্রতিমা-পূজক), চন্দ্র ও সূর্যোপাসক, বৃক্ষ-প্রস্তর, ভূত-প্রেত, পূর্ববর্তী নামজাদা মানুষ ও নানাপ্রকার জড় পদার্থের পূজা ও উপাসনা করিতাম। মৃত জীব জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতাম। সর্বপ্রকার অশ্লীল ও ঘৃণিত কার্য আমাদের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। মায়া-মমতা, স্নেহ প্রীতি, দয়া-

সহানুভূতি প্রতি আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল । প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে অসৌজন্য প্রদর্শন ও নানাপ্রকার দুর্ক্যবহার করা হইত । আমাদের মধ্যে যাহারা শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী হইত, তাহারা দুর্কলের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিত এবং বলপূর্বক তাহাদের বিষয়-সম্পদ কাড়িয়া লইত । আমাদের অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন করুণাময় আল্লাহ তা-লা আমাদের মধ্যে একজন রহুল (পয়গম্বর বা তত্ত্ববাহক) প্রেরণ করিলেন । তাঁহার বংশ-মর্যাদা, সত্যবাদিতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আমরা পূর্ব হইতেই অবগত ছিলাম । তিনি আমাদেরকে পরম কারুণিক আল্লাহর দিকে আহ্বান করিলেন । তিনি আমাদেরকে ‘মওহেদ’ (একেশ্বরবাদী) করিয়া পৌত্তলিকতা হইতে ফিরাইলেন । তিনি আমাদেরকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হইতে এবং আত্মীয়-স্বজনের হিত সাধন করিতে, প্রতিবেশীদিগের প্রতি সদাচার ও সদ্যবহার করিতে আদেশ করিলেন । নরহত্যা, মিথ্যা কথা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, এতিম (পিতৃহীন অনাথ)-দিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং সতী নারীদিগের চরিত্রে অপবাদ প্রদান ইত্যাদি অন্ত্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন । আর অধিতীয় আল্লাহর উপাসনা করিতে আদেশ দিলেন । আমরা ঐ রহুলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি ; এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি । এজন্য আমাদের জাতি আমাদের উপর ‘নারাজ’ (প্রতিকূল) হইয়াছে । আমাদের প্রতি নানাপ্রকার হৃদয়-বিদারক ভীষণ অত্যাচার ও কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেছে । অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে আমরা নিরুপায় হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি । অগত্যা আপনার রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার রাজ্যে আমরা কোনও রূপ উৎপীড়িত হইব না—সম্পূর্ণ-নিরাপদে থাকিব ।

হজরত জাফর তৈয়্যার-বিন্-আবিতালেব-(রাজিঃ) এর বক্তৃতা শ্রবণে হাব্শা-রাজ নাজাশী বলিলেন, তোমার রুচুলের প্রতি খোদা-তা-লার যে কালাম নায়েল (বাক্য অবতীর্ণ) হইয়াছে, উহার কিছু আমাকে পড়িয়া শুনাও । তদনুসারে হজরত জাফর তৈয়্যার (রাজিঃ) কোরআন পাকের সূরা মরিয়ম তেলাওত (পাঠ) আরম্ভ করিলেন । কোরআন করিমের আয়াত শুনিয়া বাদশাহ নাজাশী ও তাঁহার দরবারি-(সভাসদ) বর্গের নেত্র হইতে বারিধারা প্রবাহিত হইল । বগ্ন হজরত জাফর (রাজিঃ) সূরে মরিয়মের প্রথম আয়াত পড়িয়া শেষ করিলেন, তখন বাদশাহ্ নাজাশী বলিলেন, এই কালামে ঐ রং (ভাব) বিদ্যমান, বাহা হজরত মুসা আলায়-হেস্-সালামের তওরাত গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে ; এ উভয় কালাম (বাক্য বা উক্তি) একই প্রকার বলিয়া বোধ হয় । কোরেশদিগের প্রেরিত এল্‌চি-(দূত) গণ বলিল, ইহারা হজরত ইসা আলায়হেস্ সালামেরও বিরুদ্ধবাদী । একথা বলিবার তাহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, হাব্শাধিপতি নাজাশী খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী, সুতরাং এই কথা শুনিলে তিনি মোসলমানদিগের প্রতি নারাজ হইবেন । হজরত জাফর-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন যে, না একথা কখনই নয় ; বরং তচ্ছ্রবণে বাদশাহ্ নাজাশী বলিলেন, তোমাদের এই আকিদা (বিশ্বাস) সম্পূর্ণ ঠিক । ইজিলের ও ইহাই উদ্দেশ্য । নাজাশীর নিকট হইতে কোরেশদিগের এল্‌চি (দূত)-দিগকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইল । তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমি এই লোকদিগকে কিছুতেই তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না । সঙ্গে সঙ্গে কোরেশদিগের প্রেরিত সমস্ত তহফাও হাদিয়া (নবর ও উপঢোকন প্রভৃতি) ফেরত দিলেন । এতদ্বারা তাহারা আরও অবমানিত হইল । এই ঘটনা নবুয়তের ৬ষ্ঠ সালে ঘটিয়াছিল । কোরেশগণ যখন হাবাশ-

রাজ নজ্জাশীর দরবারেও বিফল মনোরথ হইল, তখন মোসলমানদিগের প্রতি শত্রুতা ও বৈরিভাব আরও প্রবল আকার ধারণ করিল ।

হজরত আমীর হামযার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ।

হজরতের সঙ্গে ও নব-দীক্ষিত মোসলমানদিগের সঙ্গে শত্রুতায় কোরেশদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল । একদা হজরত ছফা পর্বত কিংবা উহার প্রান্তদেশে বসিয়াছিলেন । আবুজহল ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল । সে হজরতকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার ভৎসনা ও গালি-গালাজ করিল ; যখন তিনি উহার এই অসঙ্গত বে-আদবীপূর্ণ কথার কোনও উত্তরই দিলেন না ; তখন সে একখণ্ড পাথর তুলিয়া হজরতের গার ছুঁড়িয়া মারিল । প্রস্তরাঘাতে হজরতের (সালঃ) দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া কধির ধারা প্রবাহিত হইল । তিনি সেই অবস্থায় নীরবে গৃহে চলিয়া আসিলেন । আর আবুজহল পবিত্র কাবা-গৃহের প্রাঙ্গণে—যেখানে অন্যান্য লোকেরা বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, সেখানে আসিয়া বসিল । হজরত আমীর হামযাঃ (রাজিঃ) হজরত রেছালত মাবের (ছালঃ) চাচ্চা (পিতৃব্য)—আবার তাঁহারা উভয়ে প্রায় সময়স্বত্বও ছিলেন । ইহাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রণয়ও ছিল । কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি (হামযাঃ) শের্কে (অংশিবাদিতায়) ‘কায়েম’ এবং মোশরেকদিগের সঙ্গী ছিলেন । তাঁহার নিয়ম ছিল, প্রত্যহ সকালে তীর ও ধনুক লইয়া জঙ্গলের দিকে শিকারে বাহির হইতেন, সারা দিন শিকারের সন্ধানে ফিরিতেন, এবং শিকার করিয়া বেড়াইতেন ; সায়াংকালে শিকারের পশুপক্ষী সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, এবং সন্ধ্যার সময় কাবাগৃহের তওয়াফ্ করিতেন, পরে গৃহে

ফিরিয়া আসিতেন। তিনি যথা নিয়মে শিকার হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে, আবুজহলের দাসীর বাচনিক হজরতকে লানি লালাজং ও লাহুনা করা, প্রস্তর নিক্ষেপে আহত করা ইত্যাদি ব্যাপার, এবং সঙ্গে সঙ্গে হজরতের বৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত নীরব থাকা ও শোকর করার বিষয় প্রভৃতি সকল ঘটনাই শুনিতে পাইলেন। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) হজরত রেছালত মাবের চাচ্চা (পিতৃব্য) হওয়া ব্যতীত রেযাই ভ্রাতা (দুধ-ভাই) ও ছিলেন ; একদিকে শোণিত সম্পর্ক, অন্য দিকে দুষ্কের সম্বন্ধ—এই উভয়ের জোশে (উত্তেজনায়) তাঁহাকে অধৈর্য্য করিয়া তুলিল। তিনি প্রথমে কাবা-গৃহে গমন করিলেন ; তথার কাবাগৃহের তওয়াফ্ (প্রদক্ষিণ) কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সোজাসোজি ঐ দলের অভিমুখে গমন করিলেন,—যেখানে আবুজহল বসিয়া সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছিল। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) একজন বড় পাহালওয়ান (ডন্গীর), মহাযোদ্ধা এবং আরবের বীরপুরুষদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়াই আবুজহলের মস্তকে এমন জোরে ধনুকের আঘাত করিলেন যে, তাহার মাথা ফাটিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। পরে বলিতে লাগিলেন, আমি মোহাম্মদের (সালঃ) ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছি, আর আমিও ঐ কথাই বলি, তিনি যে কথা বলিয়া থাকেন। যদি তোমার সাহস থাকে, তবে বাহা বলিবার আছে, আমার সম্মুখে বল। আবুজহলের সঙ্গিগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইল ; আবুজহল হজরত হামযায় শৌর্য্য-বীর্য্য ও বীরত্বে এতদূর প্রভাবান্বিত ছিল যে, সে নিজেই স্বীয় সঙ্গীদিগকে এই বলিয়া বাধা প্রদান করিল, এবং বলিল যে, বাস্তবিক আমি অন্তায় কার্য্যই করিয়াছি ; যদি হামযাঃ আমার নিকট হইতে স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিত,

তবে সে 'বে-হামিএত' বলিয়া গণ্য হইত। হয় ত আবুজহল হজরত আমীর হামযার কথা শুনিয়া তাহার মনে এই আশঙ্কার উদ্ভেদ হইয়াছিল যে, আমার ব্যবহারে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সে মোসলমান না হইয়া যায়। এক্ষণে মহাবীর হজরত আমীর হামযার (রাজিঃ) ক্রোধান্নি নির্বাপিত করণার্থ তাঁহার সম্মুখে এমন নম্রভাব প্রকাশ করিল, যাহাতে এই ব্যাপারের এই স্থলেই পরিসমাপ্তি ঘটে ; আর হামযাঃ (রাজিঃ) মোসলমান হওয়ার দিকে অগ্রসর না হইলেন। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) আবুজহলকে 'শায়েস্তা' করিয়া, হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) নিকটে আগমন করিলেন। এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে যে, আমি আবুজহল হইতে তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। হজরত ফরমাইলেন, পিতৃব্য ! আমি এইরূপ কার্যে সন্তোষ লাভ করি না। হাঁ, আপনি যদি মোসলমান হন, তবে আমি আনন্দ লাভ করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। হজরত আমীর হামযাঃ (রাজিঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে, বিপদগ্রস্ত মোসলমান সম্প্রদায় বিশেষ শক্তি ও সাহায্য লাভ করিলেন। ইহা নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষের ঘটনা। বখন হজরত (সালঃ) দার-আরকমে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ঐ সময় মক্কার কোরেশগণ হজরতের প্রতি নানাপ্রকার গোস্বাখী (অসভ্যতা ও বর্বরতা) প্রকাশ করিতেছিল ; এক্ষণে মহাবীর হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করাতে, তাহারা অনেকটা সংযত ভাব ও সভ্যতা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। তদনুসারে তাহারা হজরতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে ও অত্যাচার করণে অনেকটা সঙ্কোচ ও ভয় করিতে লাগিল।

হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ)

ইসলাম গ্রহণ ।

হজরত হামজার (রাজিঃ) ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শ্রবণে কোরেশ-দিগের দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতাচরণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল । হামযার (রাজিঃ) ভয়ে সে ভাব কতকটা গোপন রাখিল বটে, কিন্তু পবুস্পরের মধ্যে গোপনে যুক্তি-পরামর্শ চলিতে লাগিল । হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) হজরত হামযার (রাজিঃ) ন্যায় প্রসিদ্ধ পাহালওয়ান ও দেশ-বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন । মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে ও হজরতের (সালঃ) বিরুদ্ধাচরণে উৎসাহের সহিত অংশ গ্রহণ করিতেন । তিনি মোসলমানদিগকে ধরিয়া নির্দয়ভাবে মারিতেন (প্রহার করিতেন), মারিতে মারিতে যখন অবসর হইয়া পাড়িতেন, তখন নিরস্ত হইতেন ; অবসাদ ভাব দূর হইলে আবার মারিতে আরম্ভ করিতেন । এইরূপে অত্যন্ত সংখ্যক মোসলমান-দিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকদিগকে বেদম প্রহার করিয়া তিনি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন । শুলকথা, তিনি মোসলমানদিগকে ‘মোরতেদ’ (কাফের বা বিধর্মী) করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন ; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না । অবশেষে একদিন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, এবং কোফ্ফার কোরেশদিগের সভায় প্রতিশ্রুতি দান করিলেন যে, আমি একাই কোরেশদিগের উপর আক্রমণ-কারী বিপ্লবের মূলোৎপাটন করিব—অর্থাৎ এই বিপ্লবের উৎপাদক (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)-কে হত্যা করিয়া সকল গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিব । আবুজহল তাহার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি শুনিয়া বলিল, যদি তুমি এই কার্য্য করিতে পার, তবে তোমাকে ১০০ একশতটি

উষ্ট্র ৷ ১০০০ এক সহস্র আওকিয়া চান্দ (রোপ্য) উপহার স্বরূপ প্রদান করিব। তদনুসারে হজরত ওমর (রাজিঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ঘর হইতে বাহির হইলেন; এবং হজরতের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পশ্চিমধ্যে হজরত সায়াদ-বিন্-আবি ওকাসের (রাজিঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওমর! এরূপ যোদ্ধাবেশে সজ্জিত হইয়া কোথায় বাইতেছ? প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন, (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)-কে হত্যা করিতে বাইতেছি। কেননা, আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আজ কোরেশদিগের বিপদ ও মানসিক অশান্তির ভার লঘু করিব। হজরত সায়াদ (রাজিঃ) বলিলেন, তুমি বনি হাশেমের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় কর না? আর ইহাও কি জাননা যে, (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)-কে হত্যা করা সহজ কার্য্য নহে। হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার হস্তে তরবারি আছে, ততক্ষণ আমি কাহাকেও ‘পরওয়া’ (গ্রাহ) করি না। তৎপর হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) কে বলিলেন, তুমিও তাহার (হজরতের) সাহায্যকারী, এস, প্রথমে তোমারই কার্য্য শেষ করি। হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) তচ্ছবণে বলিলেন, তুমি আমাকেও (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) কে পরে হত্যা করিবে, প্রথমে নিজের ঘরের সংবাদ গ্রহণ কর। তোমার ভগিনী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইসলাম তোমার ঘরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হজরত ওমর (রাজিঃ) এই তীব্র শ্লেষ বাক্য শুনিয়া দ্রুতগতি স্বীয় ভগিনীর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ইতিপূর্বে হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) হত্যা করণোদ্দেশে বাহির হইয়াছিলেন, পশ্চিমধ্যে তাঁহার গতি পরিবর্তিত হইয়া স্বীয় ভগিনীর গৃহাভিমুখে গমন করায় যেন ইসলামের দিকেই তাঁহার অগ্রগতি হইয়াছিল; তিনি যেন পাবত্র

ইসলাম কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই স্বীয় গতি পরিবর্তিত করিলেন । যাহা-
 হউক, হজরত ওমর (রাজিঃ) মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতগমনে ভগ্নীর
 গৃহে গিয়া পৌঁছিলেন । সেখানে হজরত জনাব-বিন্-আল-আরছ
 (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ভগিনী ফাতেমাঃ (রাঃ—
 আঃ) এবং তাঁহার স্বামী হজরত ছয়ীদ-বিন্-বয়েদ (রাজিঃ) কে
 কোরআন শরীফের শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন । হজরত ওমরের
 (রাজিঃ) আগমনের 'আছট' (পদশব্দ) শুনিয়া হজরত জনাব (রাজিঃ)
 তাড়াতাড়ি ঐ গৃহের কোনও নিভৃত কক্ষে আত্ম-গোপন করিলেন ।
 আর কোরআন করিম যে সকল কাগজে বা পাতায় লিখিত ছিল,
 তাহাও লুকাইয়া ফেলিলেন ; হজরত ওমর (রাজিঃ) গৃহে প্রবেশ
 করিয়াই ভগিনী এবং ভগিনীপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি
 পড়িতেছিলে ? সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় ভগিনীপতি ছয়ীদ-বিন্-বয়েদ (রাজিঃ)-
 কে ধরিয়া সজোরে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন ; এবং নির্মমভাবে প্রহার
 করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেন মোসলমান হইয়াছ ?
 তাঁহার ভগিনী স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং ভ্রাতাকে
 লেপ্টাইয়া (জড়াইয়া) ধরিলেন । এই ধবস্তাধবস্তিতে তিনি মস্তকে এমন
 আঘাত পাইলেন যে, নশ্তক হইতে সজোরে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইল ।
 ফলতঃ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ভগিনী ও ভগিনীপতিকে
 খুবই মারিলেন ; যাহার বীরত্বে মক্কা কম্পিত হইত, যাহার ছুঁকায়ে
 বড় বড় বীর পুরুষের শোণিত শুষ্ক হইত, দুইজন নিরীহ নরনারীকে
 প্রহার করিয়া ক্ষত বিক্ষত করা তাঁহার পক্ষে একটা ছেলেখেলা মাত্র ।
 ইসলাম ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত তাঁহার ভগিনী অবশেষে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,
 হাঁ ওমর, আমরা মোসলমান হইয়াছি, আর হজরত মোহাম্মদের (ছালঃ)
 আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি ; এক্ষণে তুমি

যাহা করিতে পার, তাহা কর । হজরত ওমর (রাজিঃ) ভগিনীর এতাদৃশী তেজসম্পন্ন ও সাহসোদ্দীপক উক্তি শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত দেহ শোণিত-রঞ্জিত হইয়াছে, আঘাত প্রাপ্ত স্থান সমূহ হইতে রক্তের ধারা ছুটিয়াছে । এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে একটা প্রতিক্রিয়া হইল । তাঁহার সেই ভীষণ ক্রোধায়ি কতকটা নিস্তেজ হইয়া আসিল । তখন হজরত ওমর (রাজিঃ) ভগিনীকে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি ঐ কালাম (কোরআনের আয়াত বা বাণী) দেখাও কিংবা পড়িয়া শুনাও—যাহা তোমরা এখনই পড়িতেছিলে, আর যাহা পড়ার আওয়াজ গৃহ-প্রবেশ কালীন আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম । হজরত ওমরের (রাজিঃ) এই বাক্য কতকটা সহানুভূতি-সূচক ভাব-ব্যঞ্জক ছিল, ইহাতে তাঁহার ভগিনীর মানসিক শক্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ; তিনি বলিলেন, তুমি প্রথমতঃ স্মান কর, তৎপর আমি আমার ছাহিফাঃ (কোরআনের লিখিতঅংশ) তোমাকে পড়িতে দিতে পারি । হজরত ওমর ফারুক তৎক্ষণাৎ গোছল (স্নান) করিলেন । গোছল শেষ করিয়া কোরআন মজিদের আয়াত কাগজের যে সকল পাতায় লেখা ছিল, তাহা লইয়া পাঠ করিলেন, কয়েকটা আয়াত পড়ার পরই বলিয়া উঠিলেন, কি মধুর কালাম (বাক্য) ; ইহার ক্রিয়া আমার কল্‌বের (হৃদয়ের) মধ্যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে ; ইংগি শুনিবামাত্র হজরত জনাব (রাজিঃ)—যিনি মহাবীর হজরত ওমরের (রাজিঃ) ভয়ে গৃহের এক, কামরায় লুক্কায়িত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া ঐ স্থানে আসিলেন, এবং আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন, হে ওমর (রাজিঃ), মবারক হও, হজরত মোহাম্মদ রচুলোল্লাহ্, ছাল্ল্যালাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লামের দোওয়া (আশীর্বাদ) তোমার জন্ত কবুল (গ্রাহ্য) হইয়াছে । আমি গতকল্য হজরত রচুল (সালঃ)-কে এই প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি,

“হে এনাহি ! ওমর-বিন্-আল্-খেতাব কিংবা আবুজহল এই দুইজনের মধ্যে একজনকে অবশ্য মোসলমান করিয়া দাও ।” অতঃপর হজরত জনাব (রাজিঃ) সুরে তাহার প্রথম ককু পড়িয়া শুনাইলেন ; হজরত ওমর (রাজিঃ) সুরে তাহার আয়াত শুনিতোছিলেন, আর ক্রন্দন করিতেছিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই হজরত জনাব (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমাকে এখনই হজরত রচুল করিম (সালঃ) এর কাছে লইয়া চল । তদনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) কে হজরত রচুল করিম (সালঃ) এর খেদমতে লইয়া চলিলেন । তখনও হজরত ওমরের (রাজিঃ) হস্তে উন্মুক্ত তরবারি ছিল । কিন্তু ঐ তরবারি এক্ষণে ঐ সঙ্কল্পে তাঁহার হস্তে ছিল না, যে সঙ্কল্পে স্বীয় ভগিনীর গৃহাভিমুখে তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়ে গমন করিয়াছিলেন । দারের আরকমের দরওয়াযায় পহুছিয়া হজরত ওমর (রাজিঃ) দরওয়াযায় করাঘাত করিলেন ; যে সকল ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) গৃহ মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দ্বার খুলিয়া, হজরত ওমর (রাজিঃ) কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দেখিয়া দরওয়াজার পাট ভিরাইয়া দিয়া হজরত (ছালঃ) কে জানাইলেন । ওমর (রাজিঃ) উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে ; হজরত রেছালত মাব (সালঃ) আদেশ করিলেন যে, দ্বার খুলিয়া দাও । হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, তাঁহাকে আসিতে দাও, যদি তাঁহার এরাদা (সঙ্কল্প) নেক (সৎ) হয়ত, ভালই ; নচেৎ উহারই হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা উহার মস্তক উড়াইয়া দেওয়া যাইবে । দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল, হজরত ওমর (রাজিঃ) গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ; জনাব হজরত রচুলে মকবুল (সালঃ) তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহার দামন (বস্ত্রের এক প্রান্ত) ধরিয়া খুব জোরে ঝটকা দিলেন, এবং বলিলেন, হে ওমর !

তুমি কি নিরস্ত হইবে না ? হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, ইয়া রহুল্লাহ (সালঃ) । আমি ইমান আনিবার (ইসলাম গ্রহণ করিবার) আপনার খেদমতে আসিয়াছি । এই কথা শুনিবামাত্র হজরত রচুলে আকরম (সালঃ) উচ্চৈঃস্বরে “আল্লাহ্ আকবর” বলিয়া উঠিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ঐ দারুল আরকমে উপস্থিত মোসলমানগণ এত উচ্চ আওয়াযে “আল্লাহ্ আকবর” শব্দ উচ্চারণ করিলেন যে, মক্কার পাহাড় সমূহে তাহার প্রতিধ্বনি হইল । পবিত্র তক্বির ধ্বনিতে চতুর্দিক গুঞ্জরিয়া উঠিল । হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত ওমর (রাজিঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে মোসলমানদিগের খুব শক্তি বর্দ্ধিত হইল । তাঁহারা বেশ শক্তি-সম্পন্ন হইলেন । হজরত ওমর (রাজিঃ) ইসলাম গ্রহণের পর হজরত (সালঃ) ও ছাহাবা (রাজিঃ) গুলীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলিয়া সোজাহুজি আবুজহলের গৃহে উপস্থিত হইলেন । তিনি ঘারে করাঘাত করিবামাত্র আবুজহল ঘর হইতে বাহিরে আসিল ; উৎফুল্ল ভাবে তাঁহার সহিত মিলিল, এবং “সহনান্” “মরহাবান” বলিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল । হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, খোদাতায়ালাকে ধন্যবাদ, আমি মোসলমান হইয়াছি । আর হজরত মোহাম্মদ (সালঃ) কে আল্লার রচুল বলিয়া স্বীকার করিতেছি । ইহা শুনিবামাত্র আবুজহল বিরক্তি সহকারে মুখ-বিকৃত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল । হজরত ওমর (রাজিঃ) ■ তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাঁহার তথায় গমনের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলামের সর্বপ্রধান শত্রুকে আপনার মোসলমান হওয়ার সংবাদ প্রদান পূর্বক তাহার হৃদয় দক্ষীভূত করা । হজরত ওমর (রাজিঃ) ইসলামে দীক্ষিত হইয়াই হজরতকে বলিলেন যে, আমাদিগকে আর গৃহে বসিয়া গোপনে নমাজ পড়া উচিত নহে ; বরং প্রকাশ্যভাবে কাবাগৃহে নমাজ পড়া

চাই। তদনুসারে মোসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে কাবাগৃহে নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম যে সকল কোরেশ কাকের মোসলমানদিগের নমাজে বাধা দিতে লাগিল, হজরত ওমর (রাজিঃ) তাহাদের সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বেগতিক দেখিয়া কোরেশগণ নমাজে বাধা দিতে নিরস্ত হইল; সুতরাং মোসলমানগণ বিনা বাধায় থানা কাবার নমাজ পড়িতে লাগিলেন। অতঃপর ইসলাম সূর্য্য মকায় জলন্তভাবে প্রকাশ পাইল। ইহা নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষ মাস ছিল; হজরত ওমরের (রাজিঃ) বয়ঃক্রম তখন ছিল ৩৩ বৎসর মাত্র। এই সময় মকায় মোসলমানদিগের সংখ্যা ৪০ জন পূর্ণ হইরাছিল। আবিশিনিয়ায় যে সকল দেশত্যাগী মোসলমান ছিলেন, তাহাদের সংখ্যা ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট নহে।

শয়ব আবুতালেব ।

হজরত ওমর ফারুক রাজিঃ আল্লাহ্ আনুহ পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে কোরেশদিগের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। ওদিকে মোসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে পবিত্র কাবাগৃহে নমাজ পড়িতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে বহুসংখ্যক মোসলমান আবিশিনিয়া-রাজ নজ্জাশীর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন—যাহাদের উপর কোরেশদিগের কোনও জোর চলিত না। হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত ওমরের (রাজিঃ) বিত্তমানতায় তাহারা মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচারের হস্ত প্রসারণ করিতে সাহসী হইতেছিল না। এই সকল অবস্থা দর্শনে কোরেশগণ ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণার্থ নবুয়তের ৭ম বর্ষের প্রারম্ভে—মহাবূরম মাসে একটা প্রকাশ্য সভার অধিবেশন করিল, এবং মোসলমান-

দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা ভবিষ্যতে তাহাদের বিরূপ ক্রতির আশঙ্কা আছে, তাহা সমগ্র জাতি ও সম্প্রদায়কে ঐ সভাস্থলে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিল । আর আসন্ন বিপদ হইতে বিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার উপায় বিধান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল । অবশেষে সেই সভায় এই সিদ্ধান্ত হইল যে, বনিহাশেম ■ বনি আবদুল মোস্তালেব যদিও সকলে মোসলমান হয় নাই, কিন্তু তাহার (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) এর সাহায্য করিতে ও তাঁহার প্রতি সহায়ত্ব প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় না । বাহা হউক, প্রথমতঃ আবুতালেবের প্রতি এই দাবী করা হউক যে, সে স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুক । যদি সে এ প্রস্তাবে অসম্মত হয়, তবে বহু হাশেম ও বহু আবদুল মোস্তালেবের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, মেলা-মেশা, খাওয়া দাওয়া, উঠা-বসা, দেখা-সাক্ষাৎ, সালাম-অভিবাদন ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ করা হইবে । কোনও জিনিষ তাহাদের নিকট বিক্রয় করা যাইবে না ; আহাৰ্য্য ও পানীয় কোন দ্রব্য যেন তাহাদের নিকট পৌঁছিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত রূপ ব্যবস্থা করা হইবে । আর এইরূপ কঠোর অসহযোগিতা ঐ সময় পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত জারী রাখা হউক, যে পর্য্যন্ত (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে আমাদের হস্তে সমর্পণ না করা হয় । এই প্রস্তাবানুসারে এই ‘মোকাতেয়া’ অর্থাৎ অসহযোগিতা সম্বন্ধে তাহাদের পরম্পরের মধ্যে এক ‘আহদনামা’ (চুক্তিপত্র) লেখা হইল । কোরেশদলের সমুদয় ব্রহ্ম (নেতা বা দলপতি) মণ্ডলী এই ব্যবস্থা প্রতিপালনার্থ শপথ করিল । অবশেষে সকলে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল । এই স্বাক্ষর যুক্ত চুক্তি-পত্রখানি পবিত্র কাবাগৃহে লটকাইয়া দেওয়া হইল । সঙ্গে সঙ্গেই বহু হাশেম ও বহু আবদুল মোস্তালেবের সঙ্গে অসহযোগিতা আরম্ভ হইল । কোরেশদিগের কার্য-কলাপ দেখিয়া আবুতালেব, বহু হাশেম ■ বনি

আবদুল মোত্তালেবের আত্মীয় স্বজনবর্গকে সঙ্গে লইয়া, মকার নিকটবর্তী এক পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে গিয়া ঐ ক্ষুদ্র উপত্যকায় ঐ সঙ্গে আশ্রয় লইলেন। উত্তর কালে ঐ উপত্যকা "শোয়ব আবুতালেব" নামে অভিহিত হইয়াছে। উহা পাহাড়ের একটি দরিপথ মাত্র। ঐ বংশের কেবলমাত্র একটা লোক ঐ কয়েদ ■ নয়রবন্দী হইতে মুক্ত ছিল। সে আবদুল মোত্তালেবের অন্ততম পুত্র, হজরতের (ছালঃ) ভীষণ শত্রু ইসলাম-বিদ্বেষী আবুলহব। সে কাফের কোরেশ-দিগের সঙ্গী ও তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। অল্প পরিমাণ শয্যাাদি যাহা বহু হাশেম ও বহু আবদুল মোত্তালেব সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন খাদ্য দ্রব্যের অভাবে তাঁহাদের বিবস কষ্ট হইতে লাগিল। পূর্বোক্ত উপত্যকায় প্রবেশ করিবার ■ একটা মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ ছিল; কেহ সেখান হইতে বহির্দেশে বাহির হইতে পারিতেন না। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া ইহাদের যে কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা কল্পনার অতীত। তাঁহাদের ঘর বাড়ী জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল; গৃহপালিত পশুপালের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার। সুদীর্ঘ ৩ বৎসর কাল শোয়ব আবুতালেবে ইহাদিগকে এই কল্পনাভীত ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। সে বিপদ ও কষ্টের কথা স্মরণ করিলেও শরীর কষ্টকিত হয়। কেবলমাত্র বৎসরের মধ্যে হজ্জের সময় তাঁহারা অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেন। ঐ সময় যে কোনও শত্রুর সহিত শত্রুতাচরণ করা তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং ঐ অত্যন্ত সময় মধ্যে যতদূর সম্ভব, অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপত্যকা মধ্যে লইয়া যাইতেন। হজরত (ছালঃ) ■ ঐ সময় বাহিরে আসিতেন;

এক বিভিন্ন দেশ হইতে আগত লোকদিগের মধ্যে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতেন । কিন্তু কাকের কোরেশগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিতে বিরত হইত না । তাহারা লোকদিগকে তাঁহার কথা শুনিতে নিষেধ করিত । তাঁহাকে পাগল ও ঝাড়কর (ব্রজজালিক) বলিয়া প্রচার পূর্বক, লোকদিগকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে দিত না ; নানাপ্রকার গোলমাল করিত । শয়ব আবুতালেবের তিন বৎসর কষ্ট ভোগ ও নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ দ্বারা একথাও বেশ প্রতিপন্ন হয় যে, খান্দানে অর্থাৎ বংশের প্রতি সহানুভূতি ও এক অসাধারণ ও বিস্ময়কর ব্যাপার । আর ঐ বংশগত হামদদী, ও সহানুভূতি প্রভাবে বহু হাশেম ও বনি আব্দুল মোত্তালেবের যে সকল লোক এযাবৎ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না, তাহারাও হজরতের সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল এই দুঃখ কষ্ট, অসুবিধা সহ্য করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই । একদিকে বহু হাশেমের খান্দানী হামিএত (বংশগত সাহায্য-কারিতা) তাহাদিগকে হজরতের সাহায্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল, পক্ষান্তরে শয়ব আবুতালেবের (মক্কার সন্নিকটস্থ পূর্বোক্ত উপত্যকা বা ঘাটির) ৩ বৎসর কয়েদ ও নবরবন্দীতে বহু হাশেম হজরতের (ছালঃ) অতুলনীয় আখলাকের—সচ্চরিত্রতা, সহনশীলতা, সদাশয়তা, স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি সদগুণের—সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল । সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ইসলাম ধর্মের সুনীতি, উহার সত্যতা এবং সার্বজনীন কার্যকারিতা উপলব্ধি করিবারও সুযোগ ঘটিয়াছিল । এই সকল ঘটনা পরস্পরায় হজরত (ছালঃ) এর প্রতি বহু হাশেমের সহানুভূতি ও সমবেদনা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । বহু হাশেমের প্রতি সুদীর্ঘ ৩ বৎসর কাল এইরূপ ভীষণ অত্যাচার, একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখা, খাচ্ছাতাবে তাহাদের অকথ্য ক্লেশ ভোগ করা প্রভৃতি ব্যাপারে কোরেশদিগের মধ্যেও কোন কোন

ব্যক্তির হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। ছোট ছোট বালক বালিকাগণের খাড়াভাবে করুণ আর্তনাদ, তদর্শনে তাহাদের জননীগণের অধীরতা ও ব্যাকুলতা, এই সকল বিষয় বহু হাশেমের সম্পর্কিত কতিপয় কোরেশ-প্রধানকে অস্থির করিয়া তুলিল। সর্ব প্রথমে বাহার হৃদয় বহু-হাশেমের দুর্গতি ও কষ্টে ব্যথিত ও মর্মান্বিত হইয়াছিল, তাহার মাম যহির-বিন্-ওমিয়া-বিন্-মগিরা। আবুতালেব ইহার মাতুল এবং আবদুল মোস্তালেব ইহার মাতামহ ছিলেন; সুতরাং এই হামদদী ও সহানুভূতি আত্মীয়তা-জনিত ছিল। যহির প্রথমে মতয়ম বিন্-আদি-বিন্-নওফল-বিন্-আব্কেদ মনাফ্-কে আত্মীয়তার বিষয় শ্রবণ করাইয়া অতি নিষ্ঠুরতা-মূলক আহদনামা (চুক্তি-পত্র) ভঙ্গ করিবার জন্ত সম্মত করাইল। তৎপর আবুল জত্‌রি-বিন্-হেশাম ও যময়্যা-বিন্-আল-আস্‌দকে ও আপনার ‘হাম-খেমাল’ (একমতাবলম্বী) করিয়া লইল। স্থূলকথা, মকার বিভিন্ন বংশীয় কতিপয় নেতৃস্থানীয় পুরুষ—বাহাদের সঙ্গে বহু হাশেমের ‘করাবত’ (আত্মীয়তা) ছিল, বহু হাশেমকে মজলুম (উৎপীড়িত ও অত্যাচারগ্রস্ত) মনে করিয়া, এই অত্যাচার-মূলক চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিবার জন্ত আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিল। ঠিক ঐ সময়ই হজরত রেছালত মাব (ছালঃ) পিতৃব্য আবুতালেবকে বলিলেন, আমাকে খোদাতা-লার পক্ষ হইতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, কোরেশ-দিগের আহদ-নামার (চুক্তি-পত্রের) সমস্ত লিখিত বিষয় কীট কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে যে যে স্থানে “আল্লাহ্” শব্দ লিখিত ছিল, তাহা যেমন তেমনই আছে। আল্লাহ্ শব্দ ব্যতীত চুক্তি-পত্রের লিখিত সমস্ত এবারত নষ্ট হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আবুতালেব পাহাড়ের ঘাটি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং কোরেশ নেতাদিগের নিকট গিয়া কহিলেন, আমাকে (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) সংবাদ

দিয়াছেন যে, তোমাদের চুক্তি-পত্র কাঁট (সম্ভবতঃ, উইপোকা) কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে । তোমরা ঐ চুক্তিপত্র গিয়া দেখ, যদি বাস্তবিক এই সংবাদ সত্য হয়, চুক্তিপত্রের লিখিত বিষয় নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে এই ‘মোকাতেয়া’ (অসহযোগিতা) ‘বাতেল’ (শেষ বা অগ্রাহ্য) হওয়া উচিত । তচ্ছবণে কোরেশ নেতৃমণ্ডলী দৌড়িয়া কাবাগৃহে উপস্থিত হইল । চুক্তিপত্রখানি লইয়া দেখিল, উইপোকায় উহার লিখিত সমস্ত ‘এবারত’ খাইয়া ফেলিয়াছে । কিন্তু যেখানে যেখানে “ আল্লাহ্ ” শব্দ লিখিত ছিল, তাহা উইপোকা কর্তৃক ভক্ষিত হয় নাই । এই ব্যাপার দর্শনে কোরেশগণ ‘হয়রান-পেরেশান’ ও বিস্ময়াগ্নুত হইয়া গেল ; তখন তখনই চুক্তিপত্র ভঙ্গ হইল বলিয়া কোরেশগণ ঘোষণা প্রচার করিল । বহু হাশেমগণও সমুদয় মোসলমান ৩ বৎসর পরে সেই পাহাড়ের সন্নিধি উপত্যকা হইতে বাহির হইলেন ; এবং মক্কা নগরে প্রবেশ করিয়া ■ স্ব গৃহে বসবাস করিতে লাগিলেন । শয়ব আবুতালেবে (পাহাড়ের উপত্যকা বা ঘাটিতে) বহু হাশেম এবং মোসলমানদিগকে খাদ্যাভাবে অনেক সময় গাছের পাতা খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল । কাহারও কাহারও এই অবস্থা ঘটয়াছিল যে, যদি কোনও স্থানে শুষ্ক চর্ম্মখণ্ড পাইতেন, তাহা তুলিয়া আনিয়া পরিষ্কার ও নরম করিয়া আগুনের উপরে সেকিতেন, আগুণ হইতে তুলিয়া তাহাই চর্ষণ করিয়া গলাধঃ করিতেন ; হকিম-বিন্-খরাম কখন কখন স্বীয় ক্রীতদাসের হস্তে কিছু খাদ্য-দ্রব্য আপনার ফুপ্পি (পিসি) হজরত খোদেজাতুল কোব্রার (রাঃ—আঃ) জন্ত গোপনে ঐ উপত্যকার পাঠাইয়া দিত । এই ব্যাপার যখন একবার আবুজহল জানিতে পারিল, তখন ঐ গোলামের হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইল ; এবং সেই হইতে পূর্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত পাহারার বন্দোবস্ত করিল ।

আম-আল্-হাযন অর্থাৎ নবুয়তের

দশম বংসর।

হজরত রহুল মকবুল (ছালঃ) যখন শয়ব আবুতালের হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার নবুয়তের দশম বংসর আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্বোক্ত ঘটনা সমূহের আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হইতে পারে যে, অতঃপর কোরেশগণ মোসলমানদিগের সঙ্গে নম্র ও কোমল ব্যবহার করিবে, বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বরং মোসলমানদিগের বিপদ ও হজরতের (ছালঃ) প্রতি দুর্জয় কোরেশদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সত্বেই এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, ঐ বংসরের নাম “আম-আল্-হাযন” অর্থাৎ গম (শোম)-এর বংসর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ঐ বংসরের পবিত্র রজব মাসে, ৮০ বংসর বয়সে হজরতের পরম শুভানুধ্যায়ী পিতৃব্য আবুতালের পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আবুতালেবের মৃত্যু হওয়াতে মক্কার কোফ্ফার অর্থাৎ ইসলামের শত্রুদলের সাহস অনেক বৃদ্ধি পাইল। আবুতালেবই এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, এবং বহু হাশেমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তি ও প্রভাবসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, যাহাকে সকলেই ভয় করিত, সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা ভক্তিও করিত। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন বহু হাশেমের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, মক্কায় ঐ বংশের প্রভাব ও প্রাধান্য লোপ পাইল। কোরেশগণ যখন দেখিল, বহু হাশেমের মধ্যে আর প্রভাবসম্পন্ন লোক কেহই নাই, তখন তাহারা মহামান্ত হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিবার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। তৎপক্ষে তাহাদের জন্য এ সময় ময়দান খালি ছিল। এই বংসরই হজরত আবুবকর সিদ্দিক

(রাজিঃ) কাকেরদিগের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হইয়া মক্কা হইতে হেঁসড়া করিবার জন্য রুতসকল হইলেন। তদনুসারে তিনি মক্কা হইতে নির্গত হইয়া ■ মজেল পথ অতিক্রম করিলে, বরক্-অল্ গমাদের নিকট কারা নামক সম্প্রদায়ের ছরদার (নেতা) এব্নে আল্-গনাহ্ র সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাইতেছেন? উত্তরে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) বলিলেন, আমার কওম (জাতি বা সম্প্রদায়) আমার প্রতি এমন ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, এবং করিতেছে যে, আমি ইচ্ছা করিয়াছি, মক্কা পরিত্যাগ পূর্বক অন্য কোনও স্থানে গিয়া বসবাস এবং নিশ্চিন্তে বসিয়া আপনার 'রব' (আল্লাহ্)-এর 'এবাদত' (উপাসনা-আরাধনা) করিব। এব্নে আল্-গনাহ্ বলিল, আপনি এমন একব্যক্তি যে, না আপনার মক্কা পরিত্যাগ করা উচিত, আর না আপনার কওমের আপনার প্রতি এমন ব্যবহার করা সম্ভব যে, যদ্বারা আপনাকে মক্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। আমি আপনাকে নিজের পানাহে (আশ্রয়ে) লইতে প্রস্তুত আছি, আপনি ফিরিয়া মক্কার চলুন। মক্কার বসিয়াই আপনি রবের (আল্লাহ্ র) 'এবাদত বন্দেগী, (উপাসনা-আরাধনা) করিতে থাকুন। তদনুসারে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) মক্কার ফিরিয়া আসিলেন। এব্নে আল্-গনাহ্ কোরেশদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়া, তাহাদের এই অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া তাহাদিগকে খুব লজ্জিত ও অপ্রস্তুত করিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিল যে, তোমরা এমন সচ্চরিত্র ও আদর্শ পুরুষকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য করিতেছ, যাহার বিদ্যমানতা কওমের (গোষ্ঠীর) গৌরবের বিষয়। অতঃপর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) স্বীয় গৃহের আগিনায় একটি ক্ষুদ্র চবুতরাঃ ও মসজিদ নির্মাণ করিলেন; তিনি সেখানে বসিয়া কোরআন শরীফ 'তেলাওত' এবং খোদা তা-লার উপাসনা-আরাধনার

‘মশ্‌গুল’ থাকিতেন। তাঁহার কোরআন শরীফ পাঠের সুমধুর আওয়াজ মহান্নার স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগের হৃদয়ে বিশেষ ক্রিয়া করিত। কোরেশদিগের পক্ষে ইহাও অসম্ভব হইল। তাহারা আল-গনাহ-কে বলিল, আবুবকরের (রাজিঃ) কোরআন পড়াও বন্ধ করিতে হইবে। কিংবা সে যেন উচ্চৈঃস্বরে কোরআন না পড়ে। আল-গনাঃ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পড়িতে নিবেদন করিতে তিনি বলিলেন, আমি তোমার আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্বক আমার খোদার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ; উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি কোনও ক্রমেই কোরআন পড়া বন্ধ করিতে পারিব না।

আবুতালেবের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পরে—নবরত্নের দশম বৎসর রমজান মাসে, হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) ও পরলোক গমন করিলেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রার (রাঃ—আঃ) সঙ্গে হজরতের (সালঃ) গভীর প্রণয় ছিল। সেই পতিগত-প্রাণা মহিয়সী মহিলা হজরতের (ছালঃ) পবিত্র প্রণয়ে তন্ময় ছিলেন। স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি তাঁহারই পদে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। সর্ব প্রথমে তিনিই হজরতের (সালঃ) নবরত্নে (প্রেরিতত্বে—পরগম্বরীতে) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন ; আর তাঁহার সেবার সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। সর্ব প্রকার আপদ-বিপদে, দুঃখ-কষ্টে হজরতের (ছালঃ) সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি হজরত (ছালঃ)-কে সাহস দিতেন, মহা বিপদ কালেও সাহসনা দিতেন, এবং ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে অমুরোধ করিতেন। আবুতালেব ও হজরত খোদেজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) ইহারা উভয়ে হজরতের এমন হিতৈষী ও হিতৈষিণী ছিলেন যে, ইহাদের পরলোক গমনে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোফ্‌ফার কোরেশদিগের অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিল।

একদা তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কোনও দুর্বৃত্ত কতকগুলি কর্কশ লইয়া তাঁহার মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। মস্তক, কেশ, দাড়ি প্রভৃতি কর্কশে প্রাবিত হইল, সমগ্র দেহ ও বস্ত্রাদি কর্কশাক্ত হইয়া গেল, তিনি সেই অবস্থায়ই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। হজরতের কনিষ্ঠা ছাহেববাদী—
 বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমা যোহরা (রা:—আ:) পানী লইয়া হজরতের
 ধোত করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন। তাঁহাকে ক্রন্দন
 করিতে দেখিয়া হজরত (ছাল:) করমাইতেছিলেন, অগ্নি কন্তে। তুমি
 ক্রন্দন করিও না; খোদাতায়ালা স্বয়ং তোমার পিতার রক্ষণাবেক্ষণ
 করিবেন।

একবার হজরত (ছাল:) কাবাগৃহে গমন করিলেন, সেখানে অনেক
 গুলি মেশরেকিন (ধর্মদ্রোহী কাকের) বসিয়াছিল, তন্মধ্যে আবুজহল
 তাঁহাকে দেখিয়া প্লেব-মূচক বাক্যে কহিল, আব্দে মনাক ওয়ালাগণ আইস,
 দেখ, তোমাদের নবী আসিয়াছে। আত্বা-বিন্-রাবরা বলিয়া উঠিল,
 আমাদের তাহাতে অস্বীকৃতি করিবার কি আছে, কেহ নবী হউক বা
 কেহ ফেরেশতা হউক তাহাতে কি আইসে যায়? হজরত রেছালত যাব
 (ছাল:) রবিরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কখনও খোদা এবং রুহুলের
 হেমাএত (সাহায্য বা পক্ষ সমর্থন) কর নাই; আর নিজের যেরূপ
 উপর অটল রহিয়াছ। আবার আবুজহলকে বলিলেন, তোমার জন্ত ঐ
 সময় নিকটবর্তী হইতেছে, যখন তুমি খুব কম হাসিবে, কিন্তু পরিণামে
 তোমাকে অনেক কাঁদিতে হইবে। অবশেষে সমুদয় মোশরেকিন
 (অংশিবাদী)-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঐ দিন নিকটবর্তী, যে দিন
 (ধর্ম) আজ অস্বীকার করিবেছ, উহাতেই দাখেল (প্রবিষ্ট) হইবে।

যাহা হউক কোফ্‌ফার (ধর্মদ্রোহী) কোরেশদিগের জেদ হঠকারিতা
 দিন দিন বাড়িয়া চলিল; হজরত (ছাল:) পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থান

করিবার ■ হইতে কোরেশ ব্যতীত যাহারা বিভিন্ন প্রদেশ ■ বিভিন্ন স্থান হইতে হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কার আসিত, তাহাদের মধ্যেও সত্যতঃ ইসলাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বারা কোনও রূপ সফল কাম হইতে পারেন নাই। এক্ষণে মক্কাবাসীদিগকে সীমাতীত কঠোর-হৃদয় ■ ইসলামের প্রতি তাহাদিগের ■ বিরাগ দেখিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, তায়েফ ■ বাসীদিগকে ইসলামে আহ্বান করিবেন। তায়েফে বনি-সকিফ সম্প্রদায় বাস করিত, “লাত্” নামক দেবতার তাহারা উপাসক ছিল। তায়েফে লাত দেবের মন্দির ছিল; নগরের সমস্ত অধিবাসী উহার পূজারী (সেবাইত-‘খাদেম’) বলিয়া পরিচয় দিত। ১০ম হিজরীর শওয়াল মাসে—অর্থাৎ হজরত খোদেজাতুল কোব্রার (রাজিঃ—আঃ) মৃত্যুর একমাস কাল পরে তিনি যয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ)—কে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তায়েফে পহুছিলেন। সেখানে পহুছার পূর্বে তিনি পথিমধ্যে প্রথমতঃ বহু বকর সম্প্রদায়ের আবাস স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন সেই সম্প্রদায়কেও মক্কার কোক্কার কোরেশদিগের হাম-খেয়াল (একই মত বা সঙ্কল্প বিশিষ্ট) দেখিতে পাইলেন, তখন কহতান বংশীয়দিগের বাসস্থানে গমন করিলেন; উহাদিগকেও কোরেশ-দিগের মতন কঠোর হৃদয় ও একমতাবলম্বী দেখিতে পাইয়া নিরাশ প্রাণে তায়েফে উপস্থিত হইলেন, এবং তখাকার রইস (সম্ভ্রান্ত) মণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; তায়েফের ছরদার (নেতা)-দিগের মধ্যে আব্দু

■ তায়েফ মক্কা হইতে ৩ ‘মঞ্জেল’ অর্থাৎ ৬০ মাইল দূরে-তৎকালে মক্কার ভায়ই একটা বড় শহর ছিল; এখনও অতি উর্বরা, শস্য-শালিনী এবং স্বাস্থ্যকর শহর বলিয়া বিখ্যাত। ১৩৩২ সালে ওহাবী-রাজ্জ এব্নে সউদ তায়েফ-বাসীদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। বহু তায়েফ বাসীকে বর্ষের ওহাবিগণ অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছিল।

এয়ালয়েল-বিন্-ওমর-বিন্-যমির এবং তাহার দুই ভ্রাতা মসুউদ ■ জবিব সর্কাপেকা প্রভাব সম্পন্ন এবং বনি সকিকের সর্বপ্রধান নেতা বলিয়া পরিগণিত হইত। হজরত (ছালঃ) ঐ তিনজনের সহিতই সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাহাদিগকে ইসলামের দিকে 'দাওত' (আহ্বান) করিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অহরোধ করিলেন। ইহারা বড়ই অহঙ্কারী ও আত্মমুগ্ধ লোক ছিল; হজরতের (ছালঃ) কথায় তাহারা কর্ণপাত করিল না; বরং তাহাদের এক ভ্রাতা উপেক্ষিত ভাবে বলিল, তোমাকে যদি খোদা আপনার রহুল করিয়া প্রেরণ করিতেন, তবে তুমি এরূপ ভাবে জুতা চটকাইয়া পদব্রজে চলিতে কিরিতেন না। আর এক ভ্রাতা বলিল, খোদা কি আর কোনও লোক পাইয়াছিলেন না যে, তোমার ন্যায় লোককে রহুল বানাইলেন? তৃতীয় ভ্রাতা বলিল, তোমার সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়; যদি তুমি নিজের কথাহুয়ারী খোদার রহুল হও, তবে তোমার বাক্য রদ (উপেক্ষা) করা বড় ভয়াবহ ব্যাপার। আর যদি তুমি মিথ্যা কথা বল, তবে এমন (মিথ্যাবাদী বা কপট) লোকের সঙ্গে কথা বলা কোনও ক্রমে সঙ্গত নহে।

হজরতের সঙ্গে তায়েফ বাসীদিগের বে-আদবী ।

যখন হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) আব্দু এয়ালয়েল ■ তাহার ভ্রাতাদিগের নিকট নিরাশ হইলেন, তখন তাহাদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, তোমাদের খেয়াল ■ বিশ্বাস তোমাদিগের নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, অন্য লোকের মধ্যে ইহা প্রচার করিও না। সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক তিনি তায়েফের অন্তান্ত লোকের নিকট ইসলাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু আব্দু এয়ালয়েল ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদের গোলাম

(ক্রীতদাস)-গণ, শহরের বেয়েলা-অশিষ্ট ছোকরাগণ ও ভবঘুরে লোকদিগকে হজরত (ছালঃ)-এর পেছনে লাগাইয়া দিল । হজরত (ছালঃ) যেখানে যাইতেন, এই বদমাশ দল, ভবঘুরের দল, ছোকরার দল তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া গালি দিত, তাঁহার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত, হাতে তালি দিত ; ঠিক কোনও পাগল বা ফেপা লোকের পেছনে পড়িয়া শহরের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ভবঘুরে ■ কচকে লোকেরা যেমন আজকালও শহর বন্দরে তাহাদের প্রতি অশিষ্টজনক ব্যবহার করিয়া থাকে ; হজরতের (ছালঃ) সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিল । তাঁহার সঙ্গে কেবলমাত্র তদীয় বিশ্বস্ত ও পরম ভক্ত দাস যারেন্দ-বিন্ হারেছ (রাজিঃ) ছিলেন ; তিনি যথাসাধ্য এই অত্যাচার ও উপদ্রব হইতে হজরত (ছালঃ)-কে রক্ষা করিতেন । হতভাগ্য অশিষ্ট তারেক্ বাসীর প্রস্তর ■ লোষ্ট্র বর্ষণে হজরত (ছালঃ) ও যারেন্দ (রাজিঃ) উভয়েই যথাম (আহত বা ক্ষত-বিক্ষত) হইয়া পড়িলেন । তাঁহাদিগের পক্ষে তায়েফে তিষ্ঠান অসম্ভব হইল । রাজপথ হইতে বখন বাজারে উপস্থিত হইলেন, তখনও শহরের আওবাশ্ (ভবঘুরে ও বদমাশ)-গণ,ও বেআদব ছোকরা-গুলি দল বাধিয়া তাঁহাদের পশ্চাদহুসরণ করিতে লাগিল । অবশেষে হজরত (ছালঃ) যারেন্দ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তারেক্ শহর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন ! কিন্তু বদমাশের দল তখনও তাঁহার পশ্চাদহুসরণে ক্ষান্ত হইল না । এমন কি, শহরের বাহিরে ৩ মাইল পর্যন্ত তাঁহাদের অহুসরণ করিয়াছিল । হজরতের (ছালঃ) পবিত্র ■ প্রস্তর বর্ষণে শোণিতাক্ত হইয়াছিল, শরীর হইতে এত শোণিত-পাত হইয়াছিল যে, পাছুকাছয় শোণিতপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত এবং বস্ত্রাদি শোণিতদ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল । হজরত (ছালঃ) স্বয়ং করমাইয়াছেন, “ আমি তারেক্ হইতে ৩ মাইল

পর্যন্ত পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলাম, ঐ অবস্থায় আমার এমন হোশ (জ্ঞান বা চৈতন্য) ছিল না যে, আমি কোথা হইতে আসিতেছি, এবং কোথায় যাইতেছি।” তারেক্ হইতে ৩ মাইল দূরে মকার একজন প্রধান রইস্ আক্‌বা-বিন্-রবিয়ার একটা বাগান ছিল, হজরত (ছাল:) ঐ বাগানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন তারেকের বদমাশ্ দল তাঁহার অমুসরণে কাস্ত হইয়া তারেকাতিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল। হজরত (ছাল:) ঐ বাগানের প্রাচীরের ছায়ার উপবেশন করিলেন। স্বীয় নিরুপায় অবস্থা ও বিপদ-বিষয় দেখিয়া পরম কলণাময় আল্লাহ্ তা-লার মহাদয়বारे এই বলিয়া দোওয়া (প্রার্থনা) করিতে লাগিলেন যে, হে এলাহি! তুমিই নিরুপায়ের উপায় ও দুর্কলের সহায়, আমি তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। কিন্তু এত উৎপীড়িত ও প্রকরাযাতে জর্জরিত হইয়াও উৎপীড়ক তারেক্‌বাসীর ‘বদ্দোওয়া’ (অভিসম্পাত) প্রদান করেন নাই।

পূর্বোক্ত বাগানের মালেক (অধিকারী) আত্‌বা-বিন্-রবিয়া ঐ সময় বাগানে উপস্থিত ছিল। সে দূর হইতে হজরত (ছাল:)-কে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া, আরবের ভদ্রতা ও অতিথি-পরায়ণতার বশবর্তী হইয়া স্বীয় দাস আদাসের হস্তে, এক বাসনে কতকগুলি তাক্বা আনুয় হজরত (ছাল:)-এর নিকট পাঠাইয়া দিল। ঐ ক্রীতদাস নিউবিয়া দেশের অধিবাসী এবং খৃষ্টীয়ান ছিল। হজরত (ছাল:) ঐ আনুয় থাইলেন, এবং আদাসকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিলেন। আদাসের কলবে (হৃদয়ে) হজরত (ছাল:)-এর কথার ক্রিয়া প্রকাশ পাইল; সে তখন মস্তক অবনত করিয়া হজরতের হস্ত চুম্বন করিল। ওক্‌বা দূর হইতে গোলামের এই কার্য দেখিতে পাইল। যখন আদাস বাসন লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল, তখন ওতবা তাহাকে বলিল, ঐ ব্যক্তির কথা শুনিও

না; উহার দীন (ধর্ম) হইতে তোমার ধর্মই উত্তম । হজরত (ছালঃ) কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ঐ বাগানে বিশ্রাম করিয়া, শান্ত-কান্ত ও অবসন্ন দেহে একটু শক্তিশাল্য করিয়া, বাগান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন । সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি " নখলাঃ " নামক স্থানে পহুছিলেন । একটা স্বর্জুরের বাগানে তিনি হজরত বন্নেদের (রাজিঃ) সঙ্গে নিশাযাপন করিলেন । ঐ স্থানে কতিপয় জেনের ছরদার (নেতা) তাঁহাকে কোরআন শরীফ পড়িতে শুনিল এবং মধুর আওয়াজে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং ঈমান আনিল (পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল) । নখলাঃ হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি কোহ্-হেরায় (হেরাঃ নামক পাহাড়) উপস্থিত হইলেন ; তিনি সেখানে থাকিয়া কোনও কোনও কোরেশ ছরদারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন ; কিন্তু কোনও ব্যক্তিই তাঁহাকে স্বীয় জামানতে (প্রতিভূ-ত্বে) এবং আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইল না । মতরম-আদির নিকট যখন হজরতের (ছালঃ) আশ্রয়-দানের প্রস্তাব উপস্থিত হইল, ঐ ব্যক্তি হজরত (ছালঃ)-কে স্বীয় জামানতে আশ্রয়ে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল । এই ব্যক্তি কাকের থাকিলেও আরবী শরাফৎ (ভদ্রতা) ও জাতীয় সহানুভূতি বশে সমগ্র মক্কাবাসীর বিপক্ষে এই কার্য্যে অগ্রসর হইল । কেবল প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াই কান্ত থাকিল না, তৎক্ষণাৎ হেরা পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক হজরত (ছালঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মকার উপনীত হইল । মতরমের পুত্র উম্মুক্ত তরবারি লইয়া খানাহ্ কাবার (পবিত্র কাবাগৃহের) সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল । হজরত (ছালঃ) কাবাগৃহের তওয়াফ্ (প্রদক্ষিণ-ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ) করিলেন । ইহার পর মতরম ও তাহার পুত্র উম্মুক্ত তরবারি লইয়া হজরত (ছালঃ)-
 ■ নিরাপদে তাঁহার গৃহে পহুছাইয়া দিল । কোরেশগণ মতরমকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) কি

সম্বন্ধ ? মতরম উত্তর করিল, আমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) ‘হেমায়েতি,’—সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা। যে পর্য্যন্ত তিনি আমার আশ্রয়ে থাকিবেন, কেহ চক্ষু তুলিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে না। মতরমের এই সাহস দৃঢ়তা দেখিয়া কোরেশগণ কতকটা নীরবতা অবলম্বন করিল। আর রওয়াকে (বর্ণনার) আছে, যখন হজরত (ছালঃ) তায়েফ্ হইতে পূর্বোক্ত অবস্থায় বাহির হইলেন, তখন এক ফেরেশতা তাঁহাকে আসিয়া বলিল, যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি একটি পাহাড় উঠাইয়া আনিয়া তায়েফের উপর নিক্ষেপ করি, তাহাতে সমুদয় তায়েফ-বাসী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। হজরত (সালঃ) করমাইলেন, না, কখনই না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা আছে যে, যদিও ইহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, কিন্তু উহাদের বংশধরগণ খাদেমে এসলাম (এসলামের সেবক) রূপে পরিগণিত হইবে এবং উহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সকলেই মোসলমান হইবে। আমি উহাদের ধ্বংস-সাধন পছন্দ করি না।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরদিগের অনেকের সামান্য বহু খোদা-দ্রোহী জাতি এইরূপ অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যথা :—আদ-সমুদ-লুৎ ও শূহের সময়ের খোদার নাকরমান জাতি সমূহ, মেছেরের কেয়াউনী দল ইত্যাদি। আমাদের হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) দর্রা ও ফুমার সাগর ছিলেন ; এজন্য তাহার উপাধি ছিল * রহমতুল্লিল-আলামিন ।*

এই সালে—অর্থাৎ হেজরতের দশম বৎসরের শওরাল মাসে হজরত (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) অতি অল্পবয়স্ক কন্যা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ—আঃ) ও হজরত ছুওদা-বিন্তে রময্যা (রাজিঃ—আঃ)-কে বিবাহ করেন। এই বৎসরেই হজরতের (ছালঃ) মেররাজ হইয়াছিল। মেররাজ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক তরির উক্তি এই যে, অহি নাজেল হইবার প্রারম্ভে, নবুয়তের প্রথম বর্ষে মেররাজ হইয়াছিল। অর্থাৎ যে বৎসর নমাজ হয়, মেররাজ ও সেই বৎসরেই হয়। এখানে হযম বলেন, ১০ম হিজরীতে মেররাজ হইয়াছিল। কোনও কোনও ইতিহাসে উল্লেখ আছে, নবুয়তের ১২শ সালে মেররাজ হইয়াছিল। কোনও কোনও রওয়ায়েতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, মেররাজ মদীনার হেজরতের পরে হইয়াছিল; যেমন শক ছদর (হজরতের ছিনা চাক করা বা বক্ষঃ বিদারণ) সম্বন্ধে কতক আলোমের এই মত যে, উহা একাধিকবার হইয়াছিল, সেইরূপ মেররাজ সম্বন্ধে কতক আলোমের মত এই যে, উহাও একাধিক বার হইয়াছিল।

বিভিন্ন-প্রদেশে ও বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচার।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) মক্কাবাসীদিগের নিকট ‘না-ওয়েদ’ (নিরাশ) হইয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তায়েফে গমন করিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরা মক্কাবাসীদিগের অপেক্ষা ঘৃণিত ‘নমুনা’ (আদর্শ) দেখাইয়াছিল। মক্কাবাসীদিগের তাহার প্রতি ও নব-দীক্ষিত মোসলমান-দিগের প্রতি ঘৃণা, ‘যেদ’ ও বিদ্বেষ তাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। উহাদের ষড়যন্ত্র, বিরুদ্ধাচারিতা, ছুরাচারিতা ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু হজরত (ছালঃ)-এর খোদার প্রতি নির্ভরতা, সাহস, দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া লাগিল। তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মক্কার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে গিয়া ইসলাম-প্রচার করিতেন, তাহাদিগকে কোরআনের পবিত্র বাণী শুনাইতেন।

বহু কন্দর ও আবদুল্লা এই দুই সম্প্রদায়ের বাসস্থানে (ছালঃ)-এর পবিত্র প্রচার-বাণী পহঁছিল। বহু-আবদুল্লা সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন ; তোমাদের পিতা (পূর্বপুরুষ) আবদুল্লা ছিল ; তোমরা ও তদনুসারে 'এসমেবা-মোছমা' (নামের সার্থকতা সম্পাদক) অর্থাৎ আল্লাহ তা-লার বান্দা বা দাস হইয়া যাও। বহু হানিকার বস্তিতে (গ্রামে) তিনি গমন করিলেন, তথাকার পাপাচারী দুরাশ্রয় লোকেরা সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও পথোচিত ভাবে হজরতের (ছালঃ) সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা সেই ঘৃণিত আচরণের দ্বারাই আপনাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

মক্কার বহির্দেশ হইতে যে সকল 'মোছাকের' (প্রবাসী) মক্কা নগরে আগমন করিত, কিংবা হজ্জের সময় দূরবর্তী স্থান সমূহ হইতে যে সকল কাকেলা আসিত, হজরত (ছালঃ) তাহাদের ডেরা বা তাঁবু সমূহে গমন পূর্বক ইসলাম প্রচার করিতেন ; এবং পবিত্র কোরআনের মহাবাণী শুনাইতেন। কিন্তু তাঁহার অন্ততম পিতৃব্য আবুলহব, তদীয় শত্রুতাচরণে সর্বাপেক্ষা আমোদ বোধ করিতে। সে সর্বদা হজরতের (ছালঃ) পশ্চাদনুসরণ করিত ; আর প্রবাসী ও দূরদেশ হইতে আগত লোকদিগকে তাঁহার কথা শুনিতে প্রাণপণে বাধা দিত। কিন্তু হজরত (ছালঃ) তাহাতে ক্রোধান্বিত করিতেন না। তিনি বহু কলব, বহু আমের, বহু শয়বান, বহু-মহারেব, বহু-ফযারাঃ, বহু-গচ্ছান, বহু-ছলিম, বহু-আবস, বহু-হারেছ, বহু-আমরাঃ, বহু-যহল, বহু-মবুরা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদিগকেও ইসলামের দিকে আহ্বান করিলেন।

যখন তিনি বহু-আমের সম্প্রদায়ের সম্মুখে ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের মহাবাণী প্রচার করিলেন, ঐ করাছ নামক এক ব্যক্তি বলিল, যদি আমি মোসলমান হই, আর আপনি আপনার শত্রুদের

উপর জরী হন, তবে আপনি আপনার পরে আমাকে খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচিত করিতে রাজী আছেন কিনা? হজরত ফরমাইলেন, এই কার্য ত খোদাতায়ালায় কর্তৃত্বাধীন; তিনি যাহাকে ইচ্ছা, আমার স্থলে খলিফা নির্বাচন করিবেন। শুদ্ধবশে ঐ ব্যক্তি বলিল, কি মজার কথা, সমস্ত আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ পূর্বক সাহায্যকারী হইব, মাথা কাটাইব, আর যখন আপনি সকলকাম হইবেন, আর অল্প লোক হুকুমতের (রাজত্ব বা নেতৃত্বের) আশ্বাদ গ্রহণ করিবে; বান, আপনার নিকট আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

সুয়েদ-বিনু-সামতের কথা ।

নবুয়তের একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। সুয়েদ-বিনু-সামত নামক মদীনার আওস বংশীয় একজন লোক মক্কায় আগমন করিলেন। স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যক্তি “কায়েল” উপাধিধারী ছিল। ঘটনা বশতঃ মক্কায় আসিয়া হজরতের (ছালঃ) সাক্ষাৎ লাভ করিল। হজরত তাঁহাকে ইসলামে দাওত দিলেন—অর্থাৎ তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিলেন। সে বলিল, সম্ভবতঃ আপনার নিকট যাহা আছে, আমার নিকটও তাহাই আছে। হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তোমার নিকট কি আছে, আমাকে শুনাও। সে বলিল, লোকমানের হেকমৎ। হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তুমি পড়, আমি শুনি। সুয়েদ কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইল; হজরত (ছালঃ) বলিলেন, এগুলি বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমার নিকট কোরআন মজীদ আছে, যাহা ইহা অপেক্ষাও উত্তম, বহুগুণ সম্পন্ন এবং হেদায়েতে মূর (সুপদেশের জ্যোতিঃ)। অতঃপর হজরত (ছালঃ) কোরআন মজীদ খানিক পড়িয়া

তাঁহাকে শুনাইলেন । সুয়েদ কোরআন মজীদ শুনিয়া স্বীকার করিল, হাঁ, বাস্তবিক ইহা অমূল্য উপদেশ ও নূর (স্বর্গীয় জ্যোতিঃ) । কোনও কোনও রওয়াকেতে বর্ণিত আছে যে, সুয়েদ তখন তখনই মোসলমান হইয়াছিলেন ; কেহ কেহ বলেন, না সে তখন মোসলমান হয় নাই ; কিন্তু হজরতের বিক্কাচরণ একেবারেই করিয়া ছিল না । মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আওস ও খযরজ জাতিদ্বয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সে নিহত হয় ।

আয়াস্-বিন্-যায়ায্ (রাজিঃ) ।

এই সময়েই আনস্-বিন্-রাফের, স্বীয় সম্প্রদায়—বনি আব্দ-আলা-শহলের কতিপয় লোককে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে মক্কার এই উদ্দেশ্যে আগমন করিল যে, মক্কার কোরেশদের সঙ্গে, খযরজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ধি স্থাপন করে । আর কোরেশদিগকে সন্ধি-শ্রুত্রে আপনাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ধি-বন্ধনে বন্দীভূত করিয়া লয় । এই ‘ওফদ’ (ডেলিগেট বা প্রতিনিধি) আগমনের সংবাদ শুনিয়া হজরত সর্বাগ্রে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাঁহার গমনের পূর্বে তাহারা কোরেশ ছরদারদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে, ও আপনাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতে অবসর বা সুযোগ লাভ করিয়াছিল না । হজরত (ছালঃ) তাহাদের নিকট পহুঁছিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন, আমার নিকট এমন জিনিষ আছে, বাহাতে তোমাদের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে । যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদের নিকট উহা পেশ (উপস্থিত) করিতে পারি । তাহারা বলিল, বেশ কথা, আপনি তাহা পেশ করুন । হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি মনুষ্যদিগের হেমাএত ও সম্পদ প্রদর্শন জন্য রহুল (নবী বা ভবিষ্যদ্বক্তা) হইয়াছি ।

শের্কে (অংশিবাদিতা) হইতে বারণ করি, আর কেবলমাত্র খোদা তা-লার উপাসনা করিতেই আদেশ প্রদান করিয়া থাকি । আমার প্রতি খোদা-তায়ালার কেতাব 'নাযেল' (অবতীর্ণ) করিয়াছেন । তৎপর তিনি ইসলামের অঙ্গুল (বিস্তৃত ব্যাখ্যা) বর্ণনা করিলেন এবং কোরআন মজীদে কতিপয় আয়েত পড়িয়া শুনাইলেন । মদীনার উক্ত দূত সম্প্রদায়ের মধ্যে আনস-বিন্-রাফের-এর সঙ্গে আয়াস-বিন্-মায়্যুয্ নামক এক যুবক ছিল । আয়াস হজরত রেছালত মাবের (সালঃ) পবিত্রবাণী ও কোরআন পাকের আয়েত শুনিয়া উল্লাস ভরে বলিয়া উঠিল যে, " হে আমার কওম (জাতি বা সম্প্রদায়), তোমরা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত মদীনা হইতে মকায় আসিয়াছ, নিশ্চয় এই জিনিষ উহা হইতে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট " দূতদলের নেতা আনস-বিন্-রাফের আয়াস-কে ধমক দিয়া বলিল, আমরা ঐ কাজের জন্ত আসি নাই । আয়াস চুপ হইয়া রহিল ; আর হজরত (ছালঃ) সেখান হইতে নীরবে চলিয়া আসিলেন । ফল এই হইল, উপরোক্ত ওফদ (ডেপুটেশন বা দূত সম্প্রদায়) বিফল মনোরথ হইয়া মক্কা হইতে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিল ; কোরেশদিগের সঙ্গে তাহাদের কোনও প্রকার সন্ধি-বন্ধন হইল না । মদীনার প্রত্যাবর্তন করিবার কয়েক দিন পরে হজরত আয়াস-বিন্-মায়্যার প্রাণত্যাগ করিলেন ; আর যত্নের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ পূর্বক ঈমান আনিয়াছিলেন ।

যমাদ আয্দি (রাজিঃ) ।

যমাদ আয্দি আরবের বিখ্যাত তত্ত্বমন্ত্র বিশারদ এবং এমনেয় অধিবাসী ছিল । সে একবার মকায় আসিল ; মকায় আসিয়া কোরেশ-দিগের বাচনিক শুনিতে পাইল, (হজরত) মোহাম্মদের (সালঃ) উপর

আছর আছে। সে বলিল, আমি পড়িয়া এখনই তাঁহার চিকিৎসা করিব, এবং সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। এই বলিয়া সে হজরতের (ছালঃ) হজুরে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে বলিল, আমি তোমাকে আমার গল্প শুনাইতেছি; হজরত (ছালঃ) বলিলেন, প্রথমে আমার নিকট কিছু শুনিয়া লও, পরে তোমার শুনাইবে। তদনুসারে তিনি স্বীয় খোদ্বার প্রারম্ভিক বাক্য এইরূপে আরম্ভ করিলেন :—“আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে নাহমদহ নাস্তাইনহ মাই ইহ্‌দি আল্লাহ ফালা খোদেজ্জাহ ওমান ইয়ারিদেজ্জাহ ফালাহ হাদিয়ালাহ ও আশ হা দোজান লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো ওরাহদাহ ল-শরিকালাহ ও অশেহাদো আল্লা মোহাম্মাদান আবদাহ ও রাহুলাহ।” হজরত এই পরিমাণ বাক্য মাত্র বলিয়া ছিলেন, যমাদ অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, এই বাক্য আপনি দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করুন। তদনুসারে যমাদ পুনঃ পুনঃ এই বাক্য হজরত (ছালঃ) দ্বারা পড়াইয়া শুনিলেন। তৎপর কহিল, আমি বহুতর মন্তবিদ, যাদুকার, ও কবি দেখিয়াছি, এবং উহাদের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ সহপদেশ পূর্ণ, উন্নত ভাব বিশিষ্ট সুমধুর বাক্য কখনও শ্রবণ করি নাই। তৎপরে হজরত (সালঃ)-কে বলিলেন, আপনার পবিত্র হস্ত বাড়াইয়া দিন, আমি মোসলমান হইতেছি। আমি ইসলামের বারোত করিতেছি। অবশেষে যমাদ (রাজিঃ) হজরতের (ছালঃ) পবিত্র হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

তফিল-বিন্-ওমরু দওসী (রাজিঃ) ।

আরবে প্রদেশে “দওস্” নামক এক সম্প্রদায় বাস করিত। ঐ সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি বা নেতা) তফিল-বিন্ এমন

প্রদেশের একজন প্রধান রইস্ (অভিজাত) বলিয়া গণ্য হইতেন। তাকিল (রাজিঃ) বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ত ছিলেনই, তদ্যতীত একজন বিখ্যাত শায়ের (কবি) বলিয়াও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। এই বৎসর—অর্থাৎ নবুয়তের একাদশ সালে ঘটনা বশতঃ তিনি মক্কায় আগমন করেন। তাকিল-বিন্ ওমরুর (রাজিঃ) আগমন সংবাদ শুনিয়া কোরেশ দলপতিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত মক্কা নগরের বাহিরে উপস্থিত হইল; এবং অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে শহরে লইয়া আসিল। কোরেশদিগের মনে এই আশঙ্কা হইল যে, তাকিল (রাজিঃ) এর সঙ্গে না হজরতের (ছালঃ) সাক্ষাৎ হইয়া যায়, আর তাকিল (রাজিঃ) তাঁহার যাহুমত্বে বশীভূত হইয়া পড়েন। তদুপাসারে তাকিল (রাজিঃ) নগরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার বলিল যে, আজকাল আমাদের এই মক্কা শহরে এমন একজন যাহুকর (ঐজ্জালিক) আবির্ভূত হইয়াছে যে, ঐ লোকটী সমগ্র শহরে একটা ‘ফেৎনা’ (বিপ্লব) উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার কার্য্য-কলাপে পিতা পুত্র হইতে, পুত্র পিতা হইতে, ভাতা ভাতা হইতে, জ্বী স্বামী হইতে, স্বামী জ্বী হইতে ‘জুদা’ (বতন্ত্র) হইয়া পড়িয়াছে। আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত অতিথি, সুতরাং আপনি সতর্ক থাকিবেন। সেই যাহুকরের—(হজরত মোহাম্মদের) (ছালঃ) মুখ-নিঃসৃত কোনও কথাই শুনিবেন না। কোরেশগণের পুনঃ পুনঃ ভীতি-প্রদর্শন ও নিষেধ করার ফল এই হইল যে, তাকিল স্বীয় কর্ণদ্বয়ে তুলা গুঁজিয়া দিলেন; উদ্বেষ্ট এই যে, এমন না হয়, (হজরত) মোহাম্মদের (ছালঃ) কথা আমার কাণে প্রবেশ করে।

একদিন অতি প্রত্যুষে তাকিল (রাজিঃ) কাণে খুব শক্ত করিয়া তুলা গুঁজিয়া পবিত্র কাবা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে হজরত রেছালতমাৰ (ছালঃ) নমাজ পড়িতে ছিলেন। নমাজ পড়িবার প্রণালী

যাহা তফিলের (রাজিঃ) দৃষ্টি-গোচর হইল, তাহা তাঁহার চক্ষে বড় ভাল লাগিল। তিনি তাঁহার নিকটে চলিয়া গেলেন। খুব নিকটবর্তী হইলে কোরআন পাকের পবিত্র ও সুমধুর আওয়াজ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এক্ষণে তাঁহার মনে এই খেয়াল হইল যে, আমিও একজন বুদ্ধিমান লোক এবং কবি; যদি এই ব্যক্তির কথা ভাল হয়, তবে তাহা মানিয়া লইব। যদি মন্দ হয়, তবে উহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিব। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া উভয় কর্ণ হইতে তুলাগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। হজরত রুহুল করিম (ছালঃ) যখন নমাজ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, তখন তফিল (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; এবং হজরত (ছালঃ) কে বলিতে লাগিলেন, আপনি আমাকে আপনার বাণী শুনাইবেন? হজরত (ছালঃ) কোরআন মজীদের কন্ঠিপন্ন আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন; আল্লাহর পবিত্র বাণী শুনিয়া তাঁহার মন এমন স্রবীভূত হইল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত (ছালঃ) কে বলিলেন, আপনি দোওয়া করুন যে, আল্লাহ তা-লা আমার দ্বারা আমার কবীলা (গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়)-কে ইসলামে দীক্ষিত করিবার 'তওকীফ' (শক্তি বা ক্ষমতা) প্রদান করেন। হজরত (ছালঃ) আল্লাহ তা-লার মহাদরবারে দোওয়া করিলেন, পরবর্তী ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, খোদা তা-লা তাঁহার দোওয়া তখনই কবুল (মঞ্জুর, গ্রহণ) করিয়াছিলেন। তফিল (রাজিঃ) মক্কা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'তবলীগ' (প্রচার অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম-প্রচার) আরম্ভ করিলেন। হজরত তফিল (রাজিঃ) হইতে যাত্রা হজরত (ছালঃ) হইতে বিদায় গ্রহণ কালে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, মক্কার কোরেশগণ আপনার প্রতি বড়ই অত্যাচার করিতেছে, আপনি এখান হইতে হেজরত 'ফরমাইয়া' আমার

দেশে চলুন। প্রত্যুত্তরে হজরত (ছালঃ) বলিলেন, খোদা তা-লা আমাকে যখন হেজরত করিতে আদেশ দিবেন, আমি তখনই হেজরত করিব ; আর যেখানে যাইবার জন্ত আদেশ করিবেন, হেজরত করিয়া তথায় গমন করিব। আমি এ যাবৎ হেজরতের জন্ত আদিষ্ট হই নাই।

আবুযর গফ্‌কারি (রাজিঃ) ।

হজরত আবুযর গফ্‌কারি (রাজিঃ) বনি-গফ্‌কার সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। মদীনা শরীফের সান্নিধ্যে তাঁহার বাসস্থান ছিল। মদীনার হজরতের (ছালঃ) প্রোত্‌ভূত হইবার সংবাদ সুয়েদ-বিন্-ছামত ■ আব্বা-বিন্-মায়্যাহ্‌ দ্বারা ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে পহুঁছিয়াছিল ; সঙ্গে সঙ্গেই এই সংবাদ হজরত আবুযর গফ্‌কারির (রাজিঃ) কর্ণগোচর হইল। অবশ-মাত্রেই তিনি এই সংবাদের সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্ত স্বীয় ভ্রাতা উনিসকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। এই উনিস একজন কবি ছিলেন। উনিস মক্কায় উপস্থিত হইয়া হজরত রচুল মকবুলের (ছালঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আর মদীনার প্রত্যাবর্তন করিয়া হজরত আবুযর (রাজিঃ)-কে এইরূপ বলিলেন যে, আমি (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ)-কে এমন একব্যক্তি পাইলাম, যিনি সর্ববিধ সংকার্য্য করিতে উপদেশ দান করেন, এবং অসং-কাজ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। হজরত আবুযর (রাজিঃ) এই বাক্যে তেমন প্রবোধ পাইলেন না, এবং শাস্তিলাভও করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি স্বয়ং মদীনা হইতে পদব্রজে মক্কা পহুঁছিলেন। পহুঁছিয়াই হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেন। সে সঙ্গেই কাবা-গৃহে উপস্থিত হইলেন ; সেখানে তখন কাকের কোরেশদিগের এক প্রকাণ্ড দল ছিল, তিনি ‘বোলন্দ-আওয়াজে’ (উচ্চৈঃস্বরে) কল্যাঃ

তওহিদ পড়িলেন ; এবং কোরআন শরীফের যে আয়াত মুখস্থ করিয়া-
ছিলেন, তাহা পড়িতে লাগিলেন। কোরেশগণ বলিতে লাগিল, এই
বেদীন (ধর্মদ্রোহী)-কে প্রহার কর। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দুর্দান্ত
কোরেশ তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল ; প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে
'বেহোশ' (অচেতন্য) করিয়া ফেলিল। তাঁহাকে বধ করিবার জন্যই
তাহারা কুতসঙ্কল্প হইয়াছিল, ইতিমধ্যে আব্বাস-বিন্-আবদুল—যিনি
এখন পর্য্যন্ত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেননা, সেখানে উপস্থিত
হইলেন ; তিনি হজরত আবুযর গফফারি (রাজিঃ)-কে প্রহাণ করিতে
দেখিয়া কোরেশদিগকে বলিলেন, তোমরা এ কি করিতেছ ?
■ ব্যক্তি গফফার কবিলার (সম্প্রদায়ের) লোক মোস্তালেব—যাহাদের
দেশে তোমরা বাণিজ্যার্থে গমন পূর্বক খেজুর ক্রয় করিয়া লইয়া
আইস। এই কথা শুনিয়া প্রহারকারী দুর্বৃত্ত লোকেরা নিরস্ত হইল।
আবুযর (রাজিঃ) চৈতন্য লাভ পূর্বক কাবাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং
হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা আত্মপূর্বক
বর্ণনা করিলেন। পরদিন আবার কাবাগৃহে গমন করিলেন, এবং পূর্বোক্ত
রূপে ইসলাম সম্বন্ধে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কোরেশ কাকেরগণ
পুনরায় তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। শেষ ব্যাপার এই যে, তিনি
মকায় ইসলাম সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া স্বীয় বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

মদীনার ছয়টি পবিত্র আত্মা ।

নবুয়্যতের ১১শ সনের শেষ মাস ছিল। মদীনাতে আওস ও খযরজ
জাতির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—যাহার সাজ-সজ্জা সংগ্রহ ও সাহায্য লাভার্থ বহু আব্দ
আলা শহর মকায় আসিয়াছিল—এই "বো-আছ" নামে বিখ্যাত।

এই যুদ্ধে আওস ■ খবরজ দলের বড় বড় ছরদার (দলপতি) নিহত হইয়াছিল। অবশেষে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল। খানাহ্ কাবার হজ্জরত সম্পাদনার্থ আরব দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও জনপদ হইতে হজ্জ-যাত্রীদিগের কাফেলা সকল মক্কায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হজ্জরত (ছালঃ) বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রীদিগের শিবির সমূহে গমন পূর্বক ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। আবুজহল ও আবুলহব তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত; উদ্দেশ্য, ভিন্নদেশ হইতে আগত যাত্রীদিগের নিকট হজ্জরত (ছালঃ) প্রচার করিতে গেলে, তাহাতে বাধা দিবে। হজ্জরত (ছালঃ) উহাদের প্রতিবন্ধকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গোপনে শহর হইতে বাহির হইয়া ২৩ মাইল দূরে চলিয়া যাইতেন; এবং যেখানে যেখানে যাত্রীদিগের শিবির (তাম্বু) সকল পড়িয়াছিল, সেখানে সেখানে গিয়া যাত্রীদিগের নিকট বসিতেন; এবং ‘বোতপরস্তির’ (প্রতিমা পূজার) অনিষ্টকারিতা ও ‘তওহিদের’ (একত্ববাদিতার বা আল্লাহ্‌র উপাসনার) সত্যতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে ওয়াজ (বক্তৃতা) করিতেন। একদা মক্কা হইতে কয়েক মাইল দূরে রাত্রিকালে “রক্বা” নামক স্থানে তিনি কয়েক ব্যক্তির পরস্পর কথাবার্তা বলিবার আওয়াজ (শব্দ) শুনিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট পহুঁছিয়া দেখিতে পাইলেন, উহারা ৬ জন লোক। তিনি তাঁহাদের নিকট গিয়া বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহারা যিসরব্ (মদীনা) হইতে হজ্জ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা খবরজ সম্প্রদায়ের লোক। তচ্ছুবণে তিনি তাঁহাদের নিকট ইসলামের তবলীগ (প্রচার) করিতে লাগিলেন; এবং কোরআন মজীদে কতিপয় আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। উহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপরেই তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে ঈমান আনিলেন। যিসরব (যিস্রেথে ব

বা মদীনা) নগরের অধিবাসিগণ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে একদল যিহুদী ও দ্বিতীয় পৌত্তলিক। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে আওস্ ও খয্রজ নামক দুইটি পরাক্রান্ত জাতি ছিল। ইহারা যিহুদীদিগের নিকট সর্বদা গুনিয়া আসিতেছিল যে, তাহাদের ধর্ম গ্রন্থ তওয়াতে এক আজিমখান (মহাশক্তিশালী ও বিখ্যাত) নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হইবার ভবিষ্যণী আছে। তিনি সকলের উপর গালেব হইয়া (প্রভাব বিস্তার করিয়া) থাকিবেন। এই কথাগুলি পূর্ব হইতে তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, এজন্য হজরতের (ছাল:) বাক্য এবং তাঁহার পবিত্র মুখ-নিঃসৃত কোরআন আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহার প্রতি সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই ছয় জন পবিত্র-আত্মা-বিশিষ্ট লোকের নাম এই:—(১) আবু এমামা: আনুয়দ-বিন্ যরারহ:—ইনি বহু-নজ্জার বংশীয় ছিলেন এবং হজরতের (ছাল:) আত্মীয় ও হইতেন। ইনিই সর্বাগ্রে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। (২) অওফ্-বিন্-হারেস্; (৩) রাফেয়-বিন্-মালেক; (৪) কত্বা বিন্-আমের; (৫) আবের বিন্-আবতুল্লা; (৬) ওক্বা-বিন্-আমের-বিন্-নাবী। হজরত রেছালত যাব (ছাল:) এই পবিত্রাত্মা পুরুষদিগের মধ্যে রাফেয়-বিন্-মালেক (রাজি:)—কে, এ পর্য্যন্ত কোরআন শরীফের যে পরিমাণ নাযেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল, তাহার এক লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলেন। এই ক্ষুদ্র দলটি পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন; আর হজরতের (ছাল:) নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিয়া গেলেন যে, আমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া ‘তব্‌লীগ্’ (ইসলাম-প্রচার) আরম্ভ করিব। তদনুসারে তাঁহারা স্বদেশে বাইয়া স্ব-গোত্রের (গোষ্ঠীর) মধ্যে প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই

মদীনায় প্রত্যেক গলি-কুচার ইসলামের চর্চা ও আলোচনা হইতে লাগিল ।

য়ক্বায়্যুন্নৈত্ বাঃ আওলা ।

(যক্বার প্রথম দীক্ষা)

নব্বুত্তের একাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছিল ; ষাদশ নববী ও হজরত (ছালঃ) ঐরূপে দুঃখে-কষ্টে ■ কোরেশদিগের প্রদত্ত অসহ্য যন্ত্রণা সহ করিয়া অতিবাহিত করিলেন । কোরেশদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল । সঙ্গে সঙ্গে হজরত রেসালত যাবের (ছালঃ) এই পূর্ণ (ষাদশতম) বৎসরটা আশা ও নৈরাশ্যের অবস্থায় : অতিবাহিত হইল । কারণ, পূর্বোক্ত ছয়জন মদীনাবাসী নব-দীক্ষিত মোসলমানের বিশেষ খেয়াল ছিল—তঁাহারা ‘তবলীগ ইসলাম’ (ইসলাম প্রচার) সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া গিয়াছিলেন, তঁাহাদের কাব্য-কলাপ সম্বন্ধে । সে বিষয়ের কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত ছিলেন । মদীনায় ইসলাম-প্রচারের কি ফল হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তঁাহার উৎকণ্ঠা বড় বাড়িয়া গিয়াছিল । ষাদশ নববী সালের শেষ মাস—জেলাহজ্জ মাস আসিল ; তিনি মিনার নিকটস্থ পূর্বোক্ত “ যক্বা ” নামক স্থানে প্রত্যহ বাইয়া যিস্রবের (মদীনায়) কাফেলার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; হঠাৎ একদিন তিনি সেই কাফেলা দেখিতে পাইলেন । যঁাহারা গত বৎসর পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, দেখিলেন, তঁাহারা সকলেই আসিয়াছেন । তঁাহারা ও হজরত (ছালঃ)-কে দেখিতে পাইয়া বড়ই ভক্তি এবং আগ্রহের সঙ্গে তঁাহাকে ‘সালাম’ করিলেন এবং তঁাহার সঙ্গে গলায় গলায় মিলিলেন । এবার তঁাহারা ১২ জন লোক ছিলেন ।

তাহাদের ~~কয়েক~~ পূর্ব বংশের দীক্ষিত মোসলমান, এবং কয়েকজন নূতন দীক্ষাপ্রাপ্ত । তাহারা আওস ~~খ~~ খব্রজ উভয় সম্প্রদায়ের লোক । এই ১২ জনের নাম নিয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে । (১) আবু এমাযাঃ ; (২) অওক্-বিন্-হারেছ-বিন্-রফায়া ; (৩) রাকের-বিন্-মালেক-বিন্-আল রেফলান ; (৪) ফতাযাঃ-বিন্-আমের-বিন্-হাদিয়াঃ ; (৫) ওক্বা বিন্-আমের ; এই পাঁচজন পূর্ব বংশ ইসলামের নীতল আশ্রয়ছারার আগমন করিয়াছিলেন ; অবশিষ্ট নবাগত ৭ জনের নাম-এই :—(১) মায়ায্-বিন্-হারেস্ (অওক্-বিন্-হারেছের ভাতা) ; (২) যকওয়ান-বিন্-আবদ কয়েস-বিন্-খালেদ ; (৩) খালেদ বিন্-মখলদ-বিন্-আমের-বিন্-যরিক্ ; (৪) এবাদাঃ-বিন্-ছামত্-বিন্-কয়েস্ (ইনি বহু ইবিব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন) ; (৫) আব্বাহ্ বিন্-এবাদাঃ-বিন্-ফদলাঃ । উপরোক্ত ১০জন খব্রজ বংশীয় লোক ছিলেন (৬) আবু আল হাছলিম-বিন্-আতিহীন (ইনি বহু আবদ আলা সহল সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন) ; (৭) যোএম-বিন্-সারেদাঃ (শেষোক্ত দুইজন আওস বংশীয় লোক ছিলেন) । এই বারজন বোজর্গ হজরত রেজালত যাব (ছালঃ) এর হস্তে বয়্যেত হইলেন । এই বয়্যেত “বায়্যেতে রক্বাঃ আওলা ” নামে প্রসিদ্ধ । বায়্যেত রক্বাঃ আওলে, পূর্বতন ছয় জন মদীনা বাসীর ইসলাম গ্রহণের ‘নতিজা’ (ফল) স্বরূপ ছিল । এই নব দীক্ষিত মোসলমান-গণ হজরত (ছালঃ)-এর হজুর হইতে বিদায় কালীন প্রার্থনা জানাইলেন যে, আমাদের সঙ্গে একজন কারী অর্থাৎ ‘মবল্লগ্’ (কোরআন-শিক্ষা-দাতা) প্রেরণের অনুরোধ হউক । তদনুসারে হজরত (ছালঃ) মছয়ব-বিন্-রমীর (রাজিঃ)-কে তাহাদের সঙ্গে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন । মছয়ব-বিন্-রমীর (রাজিঃ) মদীনায় পহুছিয়া আসন্নদ-বিন্-যরাহ-রাজি আব্বাহ্ আনহর গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । আর ঐ গৃহই ইসলাম প্রচারের

আশ্রমে পরিণত করিয়া, পবিত্র ইসলামের তবলীগ (প্রচার) : আরম্ভ করিলেন । যকবাঃ আওলায় হজরত (ছালঃ) : পূর্বোক্ত ছয়জনের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, (১) আমরা একমাত্র আল্লাহ তা-লার এবাদত (উপাসনা) করিব, কাহাকে তাঁহার শরীক (অংশী) করিব না । (২) আমরা চুরি ও যেনাকারীর (ব্যাভিচারের) নিকটেও বাইব না ; (৩) আপনাদের কন্যাদিগকে হত্যা করিব না ; (৪) কাহারও প্রতি মিথ্যা-‘তহমত’ (দুর্গাম) লাগাইব না ; (৫) ‘চোগলখুরি’ (কোটনামী) করিব না ; (৬) : প্রত্যেক ভাল (সং) কার্যে নবীর (রছুল অর্থাৎ প্রেরিত মহাপুরুষের) বশত (অধীনতা) স্বীকার করিব ।

ময়ছব-বিন্-য়মীরের মদীনায় সাফল্য লাভ ।

ময়ছব-বিন্-য়মীর মদীনায় পহুছিয়া নিতান্ত চেষ্টা, উদ্যোগ, পরিশ্রম ও ষোগ্যতা সহকারে তবলীগ ইসলামের (ইসলাম-প্রচারের) কার্য আরম্ভ করিলেন । খোদা তা-লার ফজল ও করমে মদীনায় অধিবাসীদিগের মধ্যে ইসলামের প্রভাব খুব বিস্তৃত হইল । দেখিতে দেখিতে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । মদীনায় আওস্ নাগক জাতিঃ ও উহার শাখার মধ্যে বহু আবদ-আলা শহলও বহু-জফর গোষ্ঠী খুব বিখ্যাত ও শক্তিশালী ছিল । ছায়াদ-বিন্-য়য়ায, কবিলা (সম্প্রদায়) আবদ আলা শহলের ছরদার এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ছরদার বা নেতা ছিলেন । আসিদ-বিন্-হছির বহু জফর শাখার ছরদার ছিল । উহার পিতা লবাব-যুকে সমগ্র জাতির পক্ষে প্রধান সেনাপতি থাকিয়া ঐ যুদ্ধেই নিহত হয় । তাহার মৃত্যুতে আওস জাতি ছায়াদ-বিন্-য়য়াযকে আপনাদের ছরদার (দলপতি) নির্বাচন করে । ফলতঃ ছায়াদ

ও আসিদ এই দুই ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ঐশ্বর্যশালী ছরদার বলিয়া পরিগণিত হইত। আসিদ-বিন্-যররাহ (রাজিঃ)—যাহার গৃহে মছরব বিন্, যমীর (রাজিঃ) অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি ছায়াদ বিন্-মায়াজের খালা :বাদ (খোলাতো) অর্থাৎ মাস্তুতো ভাই ছিলেন। একদিন মছরব-বিন্-যমীর (রাজিঃ) ও ছায়াদ-বিন্-যররাহ বনি আব্দ আলী শহর মহান্নার (পল্লীর) মরক্ক নামক কূপের পার্শ্বে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। মছরব-বিন্ যমীরের ঐ মহান্নার আইসা এবং তৎকর্তৃক তব্লীগে ইসলাম ছায়াদ বিন্-মায়াজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য ছিল। ছায়াদ, যীসুদ বিন্-হসিরকে ডাকিয়া বলিল, আছয়দ-আমার খালাবাদ ভাই বলিয়া চক্ষু-লজ্জা করি ; তুমি যাও এবং কঠোরতার সহিত বলিয়া দাও যে, আমার মহান্নার তাহার যেন কখনও না আইসে। ইহারা আমাদের লোকদিগকে বিগ্‌ড়াইতে এবং বেদীন (ধর্মভ্রষ্ট) করিবার জন্য আসিয়া থাকে। তদনুসারে ওসয়ীদ তরবারি হস্তে লইয়া চলিল, এবং আছয়দ ও মছরবের (রাজিঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কটু-কাটব্য বলিতে লাগিল। আর নিতান্ত কঠোরতার সহিত তাঁহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিল। মছরব-বিন্-যমীর (রাজিঃ) নিতান্ত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নম্রতার তাহাকে বলিলেন, যদি আপনি এখানে ঋণকালের জন্য বসিয়া যান, এবং আমার দুটি কথা শুনে, তাহাতে আপনার কোনও ক্ষতি হইবে না। তৎপর আপনার বাহা ইচ্ছা সেইরূপ আদেশ প্রচার করিবেন। ওসয়ীদ “বহত আচ্ছা” বলিয়া সেই স্থলে উপবেশন করিলেন। মছরব (রাজিঃ) ইসলামের ‘হকিকৎ’ (বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য) বর্ণনা করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে কোরআন মজীদে কতিপয় আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। রসিদ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন মছরবের (রাজিঃ) বক্তব্য

শেষ হইল, তখনই ওসরীদ বলিলেন, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছি ।
 সুলকথা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইল । ওসরীদ
 বলিলেন, আমাদের আরও এক ব্যক্তি আছেন, তিনি যদি মোসলমান
 হন, তবে আপনাদের শত্রুতাচরণ করিবার লোক কেহই থাকিবে না ।
 আমি এখনই যাইয়া তাঁহাকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি ।
 তদনুসারে ওসরীদ (রাজিঃ) তথা হইতে উঠিয়া সারাদ-বিনু-মারাজের
 নিকট গমন করিলেন । সারাদ প্রথম হইতে ওসরীদের (রাজিঃ)
 অপেক্ষা করিতেছিল, ওসরীদ আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
 বল, তুমি উহাদিগকে কি বলিয়া আসিলে ? ওসরীদ (রাজিঃ) বলিলেন,
 তাঁহারা বলিয়াছেন, তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন
 না । কিন্তু সেখানে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছে । বহু হারেসের
 কতিপয় নব্য যুবক সেখানে আসিয়াছিল ; তাহারা আসরদ-বিনু-
 যরারাঃ কে হত্যা করিতে চাহিতেছিল । এতখানি শুনিবামাত্র সারাদ-
 বিনু মারায় দণ্ডায়মান হইল, এবং তরবার উন্মুক্ত করিয়া অনতি-
 বিলম্বে তথায় পহুছিল ; সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, আসরদ ■ মসূব
 (রাজিঃ) নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন । ইহা দেখিয়া সারাদের সন্দেহ হইল,
 সে মনে করিল, ওসরীদ (রাজিঃ) আমাকে ধোকা দিয়া এখানে পাঠাইয়াছে
 যে, আমি ও উহাদের কথা শুনি । এই খেয়াল মনে উপস্থিত হইতেই
 আসরদ (রাজিঃ) কে বলিল, কেবলমাত্র রেশতা দারীর (আত্মীয়তার)
 খেয়াল রহিয়াছে, নতুবা তোমার কি সাধ্য ছিল যে, আমার মহান্নার
 (পাড়ায়) আসিয়া লোকদিগকে ভড়্কাইতে । মসূব (রাজিঃ)
 তাহাকে বলিলেন, আপনি বসুন, আমি কিছু ‘আরজ’ (নিবেদন) করিতেছি,
 যদি আমার কথা ভাল হয়,—গ্রহণ যোগ্য মনে করেন, গ্রহণ করিবেন ;
 নচেৎ রদ করিয়া দিবেন । সারাদ স্বীয় তরবারি খানি পার্শ্বে রাখিয়া

তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া গেলেন। মসরব (রাজিঃ) ও সরীদ (রাজিঃ)-কে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, সায়াদকেও ঐ কথা বলিলেন। সায়াদও ঐ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মোসলমান হইলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বজাতীয় লোকদিগকে আহ্বান করিলেন; তাহারা সমবেত হইলে, সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে কি মনে কর? সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের ছরদার (নেতা বা দলপতি); আর আপনার রায় (মত) সর্বদাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমরা সম্মানের সহিত গ্রহণ করি। সায়াদ (রাজিঃ) বলিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা মোসলমান না হও, আমার সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই কথা শুনিয়াই সমুদয় বহু আব্দ আলা শহর মোসলমান হইলেন। এই প্রকারে মদীনার অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধীরে ধীরে ইসলাম সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। ইহা নবুয়তের ১৩শ বৎসর ছিল। এদিকে মছরব বিন্-রমীর (রাজিঃ)-এর সাফল্যের উপর সাফল্য লাভ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে মক্কার কাকের কোরেশগণ মোসলমানগণের উপর এমন ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল যে, তাহাদের সেখানে তিষ্ঠান দায় হইয়া পড়িল। নবুয়তের ১৩শ সালের বেল হজ্জ মাস আসিলে মছরব-বিন্-রমির (রাজিঃ) ৭২ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রী-লোকের একে মোসলমান কাকেলা লইয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনার মোসলমানগণ ঐ কাকেলা একত্র ও পাঠাইয়া ছিলেন যে, হজরত রুহুলে আকরম (ছালঃ)-এর বেরারত করিয়া কৃতার্থ হন; আর মদীনাবাসীদের পক্ষ হইতে তাহাকে মদীনার তশরিফ আনিবার জন্য তাহার খেদমতে দরখাস্ত পেশ করা হয়।

য়ক্বার দ্বিতীয় বায য়েত ।

মদীনা হইতে মোসলমানদিগের যে কাকেনা আসিতেছে; হজরত রুহুলে আকরম (ছালঃ) পূর্বেই তাহার সংবাদ পাইয়াছিলেন ; রাত্রিকালে হজরত (সালঃ) গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । হজরত (সালঃ) এর পিতৃব্য হজরত আব্বাস এখন পর্য্যন্ত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না । কিন্তু হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি বিশেষে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন । কোরেশ-দিগের সাধারণ বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার সময় ও তিনি গোপন ভাবে তাঁহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিতেন না ; হজরত (ছালঃ) এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । ঘটনা যশতঃ পথিমধ্যে হজরত আব্বাস এর সঙ্গে হজরত (ছালঃ)-এর সাক্ষাৎ হইল । হজরত তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন ; এবং স্বীয় সঙ্কল্প তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন । কথাবার্তা বলিতে বলিতে উভয়ে রাত্রির অন্ধকারে ওয়াদি যক্বায় গিয়া পহুছিলেন । সেখানে মদীনা হইতে আগত মোমেন মোসলমানগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন । এখানে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মদীনা হইতে কেবলমাত্র মোসলমানগণই হজ্জ্ করিতে আসিয়া-ছিলেন না, প্রাচীন প্রথা অনুসারে বহুসংখ্যক ‘মোশরেক’ (অংশিবাদী) ■ হজ্জ্ করিতে আসিয়াছিল । তাহারা মক্কা শহরের বাহিরে এক স্থানে ডেরা-ডাঙা ফেলিয়াছিল ; কিন্তু মোসলমানদিগের ■ অন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল যক্বাঃ নামক ক্ষুদ্র ঘাটী বা উপত্যকায় তাঁহাদের (মদীনাস্থ মোসলমানদিগের) সঙ্গে হজরত (সালঃ) এর দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল । একান্ত মদীনার মোসলমান এবং অ-মোসলমান যাহারা এমলামকে পছন্দ করিত, এবং এই ধর্মের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল, তাঁহারা এই ঘাটীতে আসিয়া

হজরত (ছালঃ)-এর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । অবশিষ্ট মদীনায় মোশরেক (অংশিবাদী)-গণ রুক্বার এই দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সংবাদই অবগত ছিল না । উহারা আপনাদের নির্দিষ্ট ক্লেয়াগাহ (তাবু বা শিবির) সমূহে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল । হজরত (ছালঃ) রুক্বায় পৌঁছিয়া অপেক্ষাকারী মোসলমানদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন । হজরত (সালঃ), হেজরত (দেশত্যাগ) করিয়া মদীনায় যাইতে স্বীকৃত, একথা জানিতে পারিয়া মহাত্মা আব্বাস্ বিন্-আরহুল-মোত্তালেব একটা সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

“ হে মদীনাবাসিগণ ! (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) স্বকীয় ‘খান্দান’ (বংশীয় বা গোষ্ঠীয় লোকদিগের)-এর মধ্যে আছেন । ইহার ‘খান্দান’ ইহার ‘হেফানৎ’ (তত্ত্বাবধান) করিয়া আসিতেছেন । তোমরা ইহাকে তোমাদের শহরে লইয়া যাইতে চাও ; এ অবস্থার স্মরণ রাখ যে, ইহাকে তোমাদিগকে সর্বতোভাবে হেফায়ৎ (রক্ষণাবেক্ষণ) করিতে হইবে । ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে । যদি তোমরা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও শোণিতপাতের প্রস্তুত থাক, ভাল কথা ; নচেৎ (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কে লইয়া যাইবার নামও লইও না । ”

তচ্ছ বণে রবাঃ বিন্-মছরু (রাজিঃ) বলিলেন, আব্বাহ ! আমরা তোমার বক্তব্য শুসিলাম । এক্ষণে আমরা হজরত রহুলের (ছালঃ) বক্তব্যও কিছু শুনিতে চাই । তদনুসারে হজরত বক্তৃতা করিলেন, এবং কোরআনের কতিপয় আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন । তাহার বক্তৃতায় আব্বাহর ‘হক্’ এবং মনুষ্যের ‘হক্’ সম্বন্ধে বর্ণনা ছিল । হজরত উক্ত ‘জিম্মাদারী’ (দায়িত্বের) কথা উল্লেখ করিলেন । তিনি মদীনায় গেলে মদীনাবাসীদিগের পক্ষে দাবী অবশ্য কর্তব্য ■ পালনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে । বরা-বিন্-মছরু (রাজিঃ) হজরতের বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন,

আমরা প্রস্তাবিত বিষয়গুলি পালনে প্রস্তুত আছি। আবুল হাশিম-বিন-তিহান-(রাজিঃ) বলিলেন, হজরত ! আপনি এই প্রতিশ্রুতি দান করুন যে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও চলিয়া আসিবেন না। প্রত্যুত্তরে হজরত (ছালঃ) বলিলেন, না, আমি আর এখানে প্রত্যাবর্তন করিব না। আমার জীবন এবং তোমাদেরই হইবে। আবদুল্লা-বিন-রওয়াহা (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, হে রহুল্লা ! (ছালঃ) ইহার বিনিময়ে আমরা কি পাইব ? উত্তরে তিনি বলিলেন, জরত (বেহেশৎ অর্থাৎ স্বর্গ) এবং আল্লাহ্ তা-লার 'রেজামনি' (রাজি, থাক বা সমষ্টি-লাভ)। ইহা শুনিয়া আবদুল্লা (রাজিঃ) বলিলেন, বাস, 'সওদা' (ক্রয় বিক্রয় কার্য) হইয়া গিয়াছে। অতঃপর না আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন, না আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিব। ইহার পর সকলে হজরতের (ছালঃ) হস্তে বায়য়েত করিলেন। এই বায়য়েতে:বরাঃ-বিন-মায়কর (রাজিঃ) সর্বাপেক্ষা আগ্রহ সম্পন্ন ছিলেন এই বায়য়েতের নাম " বায়য়েত-রক্বা ছানিয়া " (রকবার দ্বিতীয় বায়য়েত বা প্রভুত্ব স্বীকার) বলিয়া প্রসিদ্ধ। যখন বায়য়েত কার্য সম্পন্ন হইল, তখন বরারাঃ (রাজিঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ ! তোমরা একথা জ্ঞাত হও যে, এই 'কওল-করারের' (প্রস্তাব করা ও উহা গ্রহণের) উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখীন হইতে (প্রয়োজন মতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে) প্রস্তুত। তখন সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন, হাঁ, আমরা বেশ জানি যে, আমাদিগকে সমগ্র দুনিয়ার 'মোকাবেলা' (সম্মুখীন) হইতে হইবে। অতঃপর হজরত (ছালঃ) উপস্থিত লোকদিগের মধ্য হইতে ১২ জনকে নির্বাচন করিয়া লইলেন। আর তাঁহাদিগকে 'তব্‌লীগে এসলাম' (এসলাম প্রচার) সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি প্রদান পূর্বক নিজের পক্ষ হইতে 'নকীব' (ছরদার বা নেতা

কিংবা প্রতিনিধি) নির্বাচিত করিলেন। ইমলামের তব্‌লীগ (ইসলাম ধর্ম প্রচার করা) ইহাদের কর্তব্য কার্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। এই ষাট জন লোক অর্থাৎ ইসলাম-প্রচারকের নাম নিম্নে লিখিত হইল। (১) সায়াদ-বিন্-যরারাহ্ (রাজিঃ); (২) ওসরীদ-বিন্- হছির, (৩) আবু-আল্‌ হাশিম-বিন্-আল্-তিহান্ (রাজিঃ); (৪) বরাঃ-বিন্-মায়রুর (রাজিঃ); (৫) আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহা (রাজিঃ); (৬) এরবাদাঃ বিন্-হামত (রাজিঃ); (৭) ছায়াদ-বিন্-আল্-রবীর (রাজিঃ) (৮) ছায়াদ-বিন্-এবাদাঃ (রাজিঃ); (৯) বাকের-বিন্-খালেক (রাজিঃ); (১০) আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ); (১১) সায়াদ-বিন্-হছিমা (রাজিঃ); (১২) মন্সুর-বিন্-ওমর (রাজিঃ)।

এই ১২ জন নকীবের মধ্যে ৯ জন খব্রজ বংশীয় ও ৩ জন আওস বংশীয় ছিলেন। এই ১২ জন লোকের দিকে 'মখাতের' (লক্ষ্য করিয়া) হইয়া হজরত (ছালঃ) করমাইলেন যে, যেকোন হজরত ইয়া আলারহেম সালামের ১২জম হাওয়ারি (বিশিষ্ট শিষ্য) ধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে 'জিম্বাদার' ছিলেন; সেইরূপ আমি তোমাদিগকে তোমার কওমের (সম্প্রদায় বাংগোষ্ঠীর) ধর্ম-শিক্ষাদান সম্বন্ধে জিম্বাদার নিযুক্ত করিলাম। পক্ষান্তরে আমিও তোমাদের জিম্বাদার। কথিত আছে, যখন রুকবার ঘাটিতে এই বার্ষিক (দীক্ষা কার্য ও প্রতিনিধি নিয়োগ) হইতেছিল, ঐ সময় পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে এক শরতান (পাপ পুরুষ) চীৎকার করিয়া মক্কার কাকেরদিগকে বলিয়া উঠিল, দেখ, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ও তাহার জমারাত (দলভুক্ত লোকেরা) তোমাদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছে। (ছালঃ) স্বয়ং, কিংবা অন্যান্য মুমেনগণ এ [] কোনও মনোযোগই প্রদান করেন নাই; যখন সমুদয় সর্ভ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, তখন তিনি মদীনা যাইবার তারিখ, আল্লাহ্ আদেশের প্রতি নির্ভর করিলেন।

ইহার পরে এক এক জন ও দুই দুই জন করিয়া লোক সেই ঘাটি হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। উদ্দেশ্য, এই ‘জল্‌ছার’ (সভার) সংবাদ কেহ জানিতে না পারে। হজরত রুহুলে আকরম (ছালঃ) ও হজরত আব্বাস উভয়ে রুক্বার গোপনীয় সভা হইতে মক্কার প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র কোরেশগণ উক্ত গুপ্ত জলসার বিষয় জানিতে পারিল। উহারা তৎক্ষণাৎ মদীনাবাসিগণের অবস্থান-স্থানে (নগর বহির্ভাগস্থ খিমা বা শিবিরে) গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মদীনাবাসীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিকালে তোমাদের নিকট (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) আসিয়াছিল ? মদীনাবাসীদিগের মধ্যে তাহারা অ-মোসলমান অর্থাৎ ‘বোত্পরস্ত’ (পৌকলিক) ছিল, তাহারা রাত্রির সেই গোপনীয় জলসারী-বিষয় অবগত ছিল না ; উহাদের মধ্যে আবদুল্লা-বিন্-আবি-বিন্-সলুল ও ছিল—যে ব্যক্তি উত্তরকালে মোনাক্কি (কপট) দলের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া, হজরত (ছালঃ) এর সঙ্গে আজীবন শত্রুতাচরণ করিয়াছিল। সে বলিল, না, না, ইহা কিরূপে সম্ভবপর যে, মদীনাবাসিগণ কোনও গুরুতর কার্য এখানে সম্পন্ন করিবে—আর তাহা আমরা জানিতে পারিব না ? তাহার এই বাক্যে কোরেশদিগের সন্দেহ দূর হইল, তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গেই মদীনাবাসিগণ কুচ্ (যাত্রা) করিবার আয়োজন করিতে লাগিল, এবং কিছুকাল পরেই তাহারা স্বদেশ যাত্রা করিল। কোরেশগণ মক্কার প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় বিশ্বস্ত-শ্রদ্ধে সেই রাত্রির গুপ্ত জলসার বিষয় জানিতে পারিল ; এবং তাহারা অল্প-শব্দে সজ্জিত হইয়া পুনরায় মদীনাস্থ কাকেলার অবস্থান-স্থানে পহুছিল। কিন্তু তখন কাকেলা (যাত্রিদল) রওয়ানা হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র ছান্নাদ-বিন্-এবাদাঃ (রাজিঃ) ও মন্থর-বিন্-ওমর (রাজিঃ) কোনও কারণে কাকেলা হইতে পেছনে

পড়িয়া গিয়াছিলেন। মন্সুর (রাজিঃ) কোরেশদিগকে দেখিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি কোরেশদিগের হস্তে ধরা পড়িলেন না; কিন্তু সারাদ-বিন্-এবাদাঃ (রাজিঃ) উহাদিগের হস্তে 'গেরেক্তার' (ধৃত) হইলেন। দুর্দান্ত কোরেশগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে মকায় লইয়া আসিল। ছারাদ-বিন্-এবাদার (রাজিঃ) বর্ণনা এইরূপ :—

যখন কোরেশগণ আমাকে মকায় আনিয়া 'যদ কোব' (মার-পিট—প্রহার) করিতেছিল, তখন আমি দেখিতে পাইলাম, একজন শেত ও লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট 'খুব ছুরত' (সৌন্দর্য-বিশিষ্ট) ব্যক্তি আমার দিকে আগমন করিতেছে। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, যদি ঐ 'কওমের' (কোরেশদিগের) কোনও ব্যক্তি দ্বারা আমার উপকারের আশা করা যাইতে পারে, তবে তাহা এই ব্যক্তিই হইবে। কিন্তু ঐ লোক যখন আমার নিকট আসিল, তখন সে খুব জোরে আমার মুখে একটা চড় মারিল। তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল: যে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কোনই লোক নাই, বাহার নিকট 'মরওত' (চক্ষু-লজ্জা) ও 'য়েয়ায়েতের' (ক্ষমা-প্রদর্শনের) আশা করা যাইতে পারে। এই সময় আর এক ব্যক্তি সেখানে আগমন করিল; সেই ব্যক্তি আমাকে বলিল, কোরেশদিগের মধ্যে কি কোনও ব্যক্তির সহিত তোমার জানা-শুনা ও পরিচয় নাই? আমি বলিলাম যে, যবির-বিন্-মতয়ম ও হারেছ-বিন্-ওমিয়া—আব্দে মনাফের এই পৌত্রদ্বয়ের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে। সেই ব্যক্তি বলিল, তবে কেন তুমি তাহাদের নাম লইয়া চীৎকার করিতেছ না? আমাকে এই 'তদ্বির' (উপায়) বলিয়া দিয়া সে উহাদের দুইজনের নিকট চলিয়া গেল; এবং তাহাদিগকে বলিল যে মদীনাবাসী খবরজ বংশীয় একজন লোককে কোরেশগণ নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে, আর সে তোমাদের নাম লইয়া দোহাই দিতেছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,

ঐ ব্যক্তির নাম কি ? ঐ ব্যক্তি বলিল, তাহার নাম ছায়াদ-বিন্-এবাদাঃ (রাজিঃ) । তাহার বলিল, হাঁ, ঐ ব্যক্তির আমাদের উপর 'এহ্ সান' (প্রত্যুপকারের দাবী) আছে । আমরা 'হেজরত' (বাণিজ্য) করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিয়া থাকি ; আর তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সেখানে অবস্থান করি । যাহা হউক, তাহার উত্তরে সেখানে আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া গেল । আমি মুক্তি পাইয়াই মদীনা (ইস্রাব) অভিমুখে রওরানা হইয়া গেলাম ।

এস্থলে একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বায়্য়েত ছানিয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় বায়্য়েতের বহুপূর্বে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) কে, আব্বাহ তা-লা হইতে ইহা জানান হইয়াছিল যে, তোমাকে 'হেজরত' (দেশত্যাগ) করিতে হইবে । আবার একবার স্বপ্নেও হেজরত করিবার স্থান পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল ; তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, উহা খজুরের বাগানপূর্ণ অতি সুন্দর ভূখণ্ড ; অর্থাৎ সেখানে অসংখ্য খজুর বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে । এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে " এমামা " প্রদেশের দিকে হেজরত করিতে হইবে । কারণ এমামা প্রদেশে ও বহু খেজুরের বাগান আছে ; এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে খজুর জন্মিয়া থাকে । এক্ষণে উপস্থিত ঘটনা পরম্পরায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে 'ইস্রাবে' (মদীনায়) হেজরত করিতে হইবে ।

মদীনায় হেজরত করিবার

সাধারণ আদেশ ।

সকবার দ্বিতীয় বায়্য়েতের পর কোরেশদিগের ভীষণ অত্যাচারে মোসলমানদিগের পক্ষে মকায় বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল । সেই

অত্যাচারের পরিমাণ অমূল্য করিবার পক্ষে নিম্ন-লিখিত কয়টি ঘটনার বর্ণনাই যথেষ্ট । হেজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিয়াছে দেখিয়া, সমুদয় মোসলমানকে (যাহারা সেই সময় মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন) আদেশ করিলেন যে, কোরেশদিগের ভীষণ অত্যাচার হইতে জীবন রক্ষার্থ তোমরা মক্কা হইতে হেজরত করিয়া মদীনা চলিয়া যাও । উৎপীড়িত ও বিপন্ন মোসলমানগণ এই আদেশ প্রাপ্তিমাତ্রে স্ব স্ব ঘর দ্বার খালি করিয়া, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক মদীনাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন । কোরেশগণ যখন দেখিল, ইহারা এখান হইতে বসবাস পরিত্যাগ করিবার প্রস্তুত হইয়াছে, অতঃপর মদীনা যাইয়া নিকটেগে শান্তির সহিত বাস করিবে, তখন ইহাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল । তাহারা হেজরতকারীদের পথিমধ্যে বাধা দিতে লাগিল । হেজরত ওয়ে ছালমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন, আমার স্বামী আবু সালমা (রাজিঃ) হেজরত করিবার সঙ্কল্প করিলেন ; তিনি গৃহত্যাগ করিবার ‘এরাদার’ (ইচ্ছার) আমাকে উদ্বোধন করিয়া আয়োজন করাইলেন ; আমার ক্রোড়ে আমার দুঃখ-পোষ্য শিশু ছালমাঃ ছিল । যখন আমরা মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, তখন আমার কবীলার (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) লোকেরা আমার স্বামীকে ঘিরিয়া (বেঁটন করিয়া) লইল । তাহারা বলিতে লাগিল, তুমি চলিয়া যাইতে পার, কিন্তু আমাদের বংশের এই মেয়েকে (আমাকে) কিছুতেই যাইতে দিব না । এই সময় আমার স্বামীর গোষ্ঠীর লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহারা বলিতে লাগিল, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার ; কিন্তু আমাদের বংশধর এই ছেলেটিকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না । তাহাদের (কোরেশদিগের) যেই কথা সেই কাজ । তদনুসারে বন্ধু আব্দ-আলা সদ আমার পুত্রটিকে কাড়িয়া লইয়া গেল ; আর বনি-মুগিরাঃ (আমার কবীলার অর্থাৎ গোষ্ঠীর

লোকেরা) আমাকে (ওয়ে ছালমা: [রাজি:—আ:]-কে) লইয়া চলিয়া
 গেল। নিরুপায় হইয়া আবু সালামা: (রাজি:) পত্নী ও পুত্রকে ছাড়িয়া
 একাকীই মদীনা চলিয়া গেলেন। হজরত আবু ছালমা: (রাজি:) স্ত্রী
 ও পুত্র ছাড়িয়া একাকীই হেজরতের ছওয়াব (পুণ্য) লাভ করিলেন।
 হজরত সহিব কুমী (রাজি:) যখন মক্কা হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন
 মক্কাবাসিগণ তাঁহার সমস্ত 'মাল-আসবার' (সামগ্রী-সম্ভার—জিনিষ পত্র)
 কাড়িয়া লইল। সহস্র সহস্র টাকার সামগ্রী-সম্ভার কাড়িয়া লইয়া,
 * কপটকহীন অবস্থায় তাঁহাকে মদীনায় যাইতে বাধ্য করিল। হেশাম-বিন্-
 আহ (রাজি:) হেজরতের সঙ্কল্প করিলেন। মোশ্‌রেকিন (মক্কার
 অংশিবাদী অর্থাৎ পৌত্তলিকগণ) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে
 ধৃত করিল; এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল; আর সঙ্গে সঙ্গে
 নানাপ্রকার শারীরিক যন্ত্রণা দিতে লাগিল। হজরত আয়াস (রাজি:)
 করিয়া মদীনায় গিয়া পহুঁছিয়াছিলেন। সেখানে এই সকল
 মক্কাবাসী-মোসলমান, মদীনাবাসী সহৃদয় মোসলমানদিগের 'মেহমান'
 (অতিথি) রূপে বাস করিতে লাগিলেন। হজরত আয়াস (রাজি:)
 যখন মদীনায় পহুঁছিলেন, আবুজহল-তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়া
 উপস্থিত হইল। তাঁহাকে ধোকা দিয়া (শান্তির আশ্বাস দিয়া) মক্কার লইয়া
 আসিল; কিন্তু তাঁহাকে মক্কায় আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিল। স্থল কথা এই
 যে, ঈদৃশ কঠোর বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়াও একজন দুইজন
 করিয়া মোসলমানগণ জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ পূর্বক মদীনায় উপস্থিত
 হইলেন। যাহারা এইরূপে হেজরত করিলেন, মোট মোসলমান সংখ্যায়
 অল্পপাতে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। মক্কা হইতে আগত
 এই 'মেহমান' (অতিথি)-দিগের নাম "মহাজেরিন", এবং মদীনাবাসী
 অর্থাৎ নবাগত অতিথিদিগের আশ্রয়-দাতা 'মেহমান' (অতিথি সংকার)

কারী)-দিগের নাম “আনুছার” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। আরোপাঃ (ভবিষ্যতে) এই দুই সম্প্রদায়কে এই দুই পবিত্র নামেই অভিহিত করা যাইবে। এক্ষণে ১৪ নববী অর্থাৎ হজরতের (ছালঃ) পয়গম্বরী লাভের ১৪শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। মোসলমানদিগের মধ্যে মকায় এই সময়ে রেহালতমাব (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) হজরত আলী (ক-ওঃ) এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ মাত্র অবশিষ্টে রহিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্টে প্রায় সমুদয় মোসলমানই হেজরত করিয়া মদীনা নগরে গিয়া পহুঁছিয়াছিলেন। কতিপয় দুর্বল, গমনাক্রম, নিরুপায় ব্যক্তি—যাহারা হেজরত করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহারাও মাত্র রহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। মকায় যে সকল গৃহে মোসলমানগণ বাস করিতেন, সেই সকল গৃহ তখন জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল। হজরত (ছালঃ) স্বয়ং এযাবৎ হেজরতের (জন্মভূমি ত্যাগের) ‘এরাবা’ (সকল) করিয়াছিলেন না। কারণ তিনি খোদা তা-লার ওহি অর্থাৎ আদেশ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিলেন। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) তাঁহার ‘রফিক-সফর’ (প্রবাস-সঙ্গী) হইবেন বলিয়া তাঁহাকে এযাবৎ হেজরত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন না। হজরত আলী করমুল্লাহ ওমাজহ ও তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

দারুলদওয়ায় কোরেশদিগের সভা এবং

পরস্পর পরামর্শ।

কোরেশগণ দেখিতে পাইল যে, মোসলমানগণ এক এক করিয়া হইতে চলিয়া গেলেন, আর মদীনার মোসলমানগণ একত্রিত হইয়া, এই নবাগত মোসলমানদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন;

সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহাদের মূল ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে ; এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের শক্তি সঞ্চার এবং তাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে নিজেদের বিপন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষণে তাহাদের (কোরেশদিগের) মনে বাস্তবিকই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কোরেশগণের মনে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার খেয়াল হইল। তাহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল যে, মোসলমানদিগের মদীনায়া গমন এবং সেখানে তাঁহাদের সংখ্যার প্রাচুর্য, ও ভিত্তি মূল দৃঢ়তর হওয়া, কোরেশদিগের অবনতি এবং দুর্গতির কারণ হইতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আমাদের সম্মান, অস্তিত্ব ও আত্ম-রক্ষা ইহার উপর নির্ভর করে যে, মোসলমানদিগের নেতার অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলা চাই। এ সময় মক্কা হইতে হজরতের (ছালঃ) শিষ্যমণ্ডলী সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন, কেবল তিনি একাই অবশিষ্ট ছিলেন ; আর ছিলেন হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজহ। সুতরাং এই সময় হজরতের বিনাশ সাধন খুবই সহজ ব্যাপার। তাঁহার বিনাশ সাধন না করিলে এই বিষতরু ক্রমেই বদ্ধ-মূল হইয়া ও শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আমাদের মহা সর্বনাশ সাধন করিবে। সুতরাং এই নূতন ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতার বিনাশ সাধনে বিলম্ব করা কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) যদি মক্কা হইতে অকত শরীয়ে মদীনায়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে এই নূতন ধর্মের গতিরোধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এই খেয়াল ও এই চিন্তা কোরেশদিগের সকল লোকের মধ্যেই বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহারা মৌখিক ও একথা প্রকাশ করিত ; এবং সকলেই এতৎ কর্তব্য সাধনে 'দেমাগ' (মস্তিষ্ক) চালনা করিত। এমন কি, মকার-কোরেশদিগের এই "খুনী খেয়ালাত" (শোণিতপাতের চিন্তা) সকল দলের লোকের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশেষে সফর মাসের

শেষভাগে, নবুয়তের চতুর্দশ সালে, বহু হাশেম ব্যতীত মক্কার কোরেশদিগের বড় বড় ছরদার (নেতা)-গণ "দারগদওয়া" নামক স্থানে এই বিষয়ে কর্তব্য অবধারণ জন্য সমবেত হইল। এই সভায় সমবেত ছরদারদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম এই :—আবুজহল-বিন্-হেশাম (বহু মখ্‌যম সম্প্রদায়), বইয়াহ্ ■ মলবাহ্ (হেজাজের পুত্রদ্বয়—বহু-সহম), ওম্মিয়া-বিন্-খলফ্ (বহু জোমহ্ সম্প্রদায়), আবুল-বখ্‌তরি-বিন্-হেশাম, বয়র-বিন্-আসুদ, হকীম-বিন্-হবাম (বহু আল-আসদ সম্প্রদায়), নযর-বিন্-হারেছ (বহু আবদুল দার-সম্প্রদায়), নকিবাহ্ সরীছাহ্ (রবিয়ার পুত্র); আবু সুফিয়ান-বিন্-হরব (বহু ওম্মিয়া সম্প্রদায়), তরমা-বিন্-আদি, জরিব-বিন্-মতরম, হারেছ বিন্-আমের (বহু নওকল সম্প্রদায়)। এই সকল উল্লেখযোগ্য নেতৃ-মণ্ডলী ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক ছরদার (নেতা) এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত নজদের অধিবাসী একজন বিচক্ষণ, বহুদর্শী বৃদ্ধ-শয়তান ও এই সভায় যোগ দিয়াছিল। এমন কি, উল্লিখিত নজদী বৃদ্ধ শেখ এই সভায় সভাপতি পদে-অভিষিক্ত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ত সকলেই একমতাবলম্বী ছিল যে, হজরত (ছালঃ) বিজ্ঞমানতা, তাঁহার জীবিত থাকা, ভবিষ্যতে সর্ব বিপদের মূলীভূত কারণ। এক্ষণে বিচার-বিতর্কের বিষয় এই ছিল যে, তাঁহার (হজরতের) সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়। একজন বলিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কে ধরিয়া শৃঙ্খলারুদ্ধ কর ; এবং একটা কুঠরীতে (কামরা বা প্রকোষ্ঠে) বদ্ধ করিয়া রাখ—যাহাতে সে শারীরিক ক্লেশ, অনাহারে ■ পিপাসার্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই বৃদ্ধ থাম্মাহ্ নজদী-শেখ বলিল, এই মত সমীচীন নহে। কারণ উহার আত্মীয়গণ ও তৎকাল অমুগামিবদ্ধ এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াস পাইবে ; এবং তদ্বারা 'কাছাদ' (ঝগড়া বা বিবাদ)

আরও বাড়িয়া যাউবে। আর একজন এই বলিয়া মত প্রকাশ করিল যে (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে ■■■ হইতে নির্বাসিত করিয়া দাও; আর কখনও তাহাকে মক্কার প্রবেশ করিতে দিও না। নজদী বৃদ্ধ শেখ এ প্রস্তাব ■■■ পছন্দ করিল না। এইরূপে এই সভার অনেকেই ■■■ অভিমত ব্যক্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ শরতান প্রত্যেকের অভিমতই অগ্রাহ্য করিল। সে সকলের মতেরই ■■■ একটা খুঁৎ বা দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহা বাতিল করিয়া দিল। অবশেষে মক্কার 'জালেম'-চূড়ামনি আবুজহল স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিল; সে বলিল, আমার মত এই যে, প্রত্যেক কবীলা (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী) হইতে এক একজন 'শমশের বন্' (তরবারি পরিচালনে সুদক্ষ) পুরুষ নির্বাচন করা হউক, এই সকল-অস্ত্রধারী লোক একত্রিত হইয়া (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে একই সময় চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টন পূর্বক আক্রমণ করিবে; এবং তাহার হত্যা সাধন করিবে। এইরূপ ভাবে তাহাকে হত্যা করিলে উহা সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ হইবে। (হজরত) মোহাম্মদের (ছালঃ) শোণিত সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে 'তক্‌ছিম' (বন্টন) হইয়া যাউবে। বহু হাশেম সমগ্র কবীলার (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) সঙ্গে 'মোকাবেলা' (বল পরীক্ষা) করিতে সক্ষম নহে, সুতরাং তাহার 'কাছাছের' (হত্যার বদলে হত্যা) পরিবর্তে 'দিগ্বেত' (হত্যার পরিবর্তে কিছু অর্থ) গ্রহণ করিতে তাহার বাধ্য হইবে; সেই অর্থ সকলে মিলিয়া অতি সহজেই দিতে পারা যাইবে। আবুজহলের এই অভিমত নজদী শেখের খুবই পছন্দ হইল। তদনন্তর সভার সভ্যমণ্ডলী একমতাবলম্বী হইয়া এই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিল। এদিকে হাররদওয়ার এই পরামর্শ স্থির হইতেছিল, ওদিকে আ হজরত ছালাল্লাহ আলায়হে আছালাম-কে খোদা তা-লা অহির দ্বারা 'কোক্‌কার'দিগের সমস্ত যুক্তি

পরামর্শের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতি হেজরতের আদেশও 'নাযেল' : (অবতীর্ণ) হইল ।

খোদাতায়ালা কর্তৃক হজরত (ছালঃ) এর প্রতি হেজরতের আদেশ ।

আ হজরত সালাম্লাহ আলায় হে অ-সাল্লাম-কে আল্লাহ্ অনশানহ হেজরতের আদেশ প্রদান করিয়াছেন । যে দিন ওহিযোগে তিনি এই আদেশ প্রাপ্ত হইলেন ; সেই দিনই ঠিক দুই প্রহরের সময়—যখন নগরের অধিবাসিগণ ভীষণ আতপতাপে সন্তাপিত এবং অগ্নিবৎ উত্তপ্ত “লু” হইতে আত্ম-রক্ষার ■■■ গৃহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; ভীষণ নিদাঘ কালীন প্রচণ্ড রোজে মানুষের গায় ফোঁকা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল ; রাস্তা ■ গলি পথ সমূহ লোক চলাচল শূন্য ছিল ; সেই সুযোগে ■■■ রেছালতমাব (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন । দ্বি-প্রহরের যে ভীষণ গরমে মানুষ ঘরের বাহির হয় না, পশুপক্ষীও চলাচল করে না, সেইরূপ সময়ে হজরতের (ছালঃ) গৃহ পরিত্যাগ করিয়া হজরত সিদ্দিক আকবরের (রাজিঃ) গৃহে উপস্থিত হওয়া এক ‘খেলাফ্ মা-মূল’ (সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত) ব্যাপার ছিল । হজরত (ছালঃ)-কে দেখিতে পাইয়াই হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)-এর মনে এই ধারণা উপস্থিত হইল যে, অবশ্য হেজরতের আদেশ ‘নাযেল’ । (অবতীর্ণ) হইয়া থাকিবে । হজরত (ছালঃ) প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঘরে ত কোনও অন্য লোক নাই ? যখন জানিতে পারিলেন যে, ঘরে বাহিরের কোনও লোক নাই,— হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ও তাঁহার দুই কন্যা হজরত

আসমা: (রা:—আ:) ও হজরত আরেশা সিদ্দিক (রা:—আ:) মাত্র গৃহে
 আছেন, তখন নিশ্চিত হইয়া হজরত (ছাল:) ফরমাইলেন, আমার
 প্রতি ইশব (মদীনা) নগরে হেজরত করিবার আদেশ নাযেল হইয়াছে ।
 তচ্ছবণে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজি:) জিজ্ঞাসা করিলেন, হজুরের
 ‘রফিক-সফর’ (প্রবাস-সঙ্গী বা প্রবাস-বন্ধু) কে হইবে ? হজরত
 (ছাল:) ফরমাইলেন, তুমিই আমার ‘রফিক-সফর’ হইবে । এই সুসংবাদ
 শ্রবণে পরম ভক্ত হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজি:) হৃদয় আনন্দে
 উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; তাঁহার নয়ন প্রান্তে আনন্দাশ্রু দেখা দিল ;
 তিনি বলিলেন, ইয়া বহুলোল্লাহ্ (ছাল:) ! আমি প্রথম হইতেই দুইটি
 হৃদ-পুষ্টা বলিষ্ঠা উদ্বী ক্রয় করিয়া, তাহাদিগকে আহার প্রদানে ‘মোট
 তায়া’ করিয়া রাখিয়াছি । উহার মধ্যে একটি আপনাকে নজর স্বরূপ
 দিতেছি । হজরত (ছাল:) ফরমাইলেন, আমি ঐ মূল্য দিয়া
 গ্রহণ করিব । তদনুসারে তিনি উহার মূল্য সিদ্দিক আকবর (রাজি:)-
 কে প্রদান করিলেন । তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া ঐ মূল্য গ্রহণ করিতে
 হইল । ঐ সময় হইতেই হেজরতের তৈয়ারি হইতে লাগিল । হজরত
 আসমা-বিস্তে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রা:—আ:) ছাতুর খলে (বস্তা)
 ও অন্যান্য ধাতু-সামগ্রী যোগাড় করিয়া দিলেন । হজরত আরেশা সিদ্দিকার
 (রা:—আ:) বয়স ঐ সময় খুব কম ছিল ; স্ততরাং সফরের ছামান
 যোগাড় কার্যে তাঁহার দ্বারা তেমন কিছু সাহায্য হইল না । এক্ষণে যে
 রাজি সমাগত হইতেছিল, ‘মোশ্-রেক’ (অংশিবাদী বা পৌত্তলিক)-দিগের
 ‘এরাদা’ (সঙ্কল্প) ছিল, পূর্বদিনের সভার সিদ্ধান্তানুসারে ঐ রাজিতেই হজরত
 রেছালতমাব (ছাল:)-কে হত্যা করিবে । তদনুসারে সন্ধ্যাকালেই উহার
 দলবদ্ধ হইয়া তাহার গৃহ-অবরোধ করিল । আর তাহারা এইজন্য অপেক্ষা
 করিতেছিল যে, তিনি রাজিকালে যখন নমাজ পড়িবার জন্য গৃহ হইতে

বাহির হইবেন, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্বক হত্যা করিবে। হজরত (ছালঃ) ওহির মর্মান্বয়ী, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহার নিকট লোকদিগের যে সকল টাকা কড়ি ও জিনিষ পত্র ‘আমানত’ (গচ্ছিত) ছিল, সেই সমস্ত উহার মালেকদিগকে প্রত্যর্পণ করা। আলী (কঃ—ওঃ)-কে তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন যে, গচ্ছিত জিনিসাদি উহার মালেকদিগকে প্রত্যর্পণ পূর্বক তুমিও সুযোগক্রমে অনতিবিলম্বে মদীনার চলিয়া যাইবে। এই সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাত্রির অন্ধকারে তিনি গৃহ হইতে নিষ্কাশ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি ছুরা ইয়াহিনের প্রারম্ভে আঘাত “ কাহমল ইয়াব ছেকুন ” পর্যন্ত পড়িয়া এক মুষ্টি যুদ্ধিকার দম্ করিলেন এবং তাঁহার গৃহ অবরোধকারী কাকেরগণের দিকে নিষ্পেষ পূর্বক নির্বিঘ্নে গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। কোক্কার গণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) পূর্বোক্ত উভয় উষ্ট্রকে আবহুলা-বিন্-আরিকতের ‘ জিন্মা ’ করিয়া দিয়াছিলেন; এই লোকটি অ-মোসলমান হইলেও বিশ্বস্ত এবং নির্ভর-যোগ্য ছিল। আর মদীনা পর্যন্ত পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিবার উপযুক্ত পরিমাণ অপেক্ষাও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক তাহাকে দিয়াছিলেন। হজরত (ছালঃ) স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)-এর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) ও তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। হজরত (ছালঃ) তাঁহার গৃহে পহুছিলামাত্র উভয়ে দ্রুতগতি তথা হইতে যাত্রা করিলেন। আরম্ভ নগরের ৪ মাইল দূরবর্তী সুর নামক পাহাড়ের এক গহ্বরে উভয়ে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। উত্তরকালে ঐ গহ্বর “ গারে সুর ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছে । এদিকে মক্কার হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সারারাত্রি হজরতের (ছালঃ) বিছানায় শুইয়া রহিলেন । মক্কার কাফেরগণও সমস্ত রজনী হজরতের (ছালঃ) গৃহ অবরোধ করিয়া রহিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে শয্যায় শয়ান দেখিয়া তাহার মনে করিয়াছিল, হজরত (ছালঃ) ই শয্যায় শুইয়া আছেন । তিনি ঘর হইতে বাহির হইবেন, এই অপেক্ষায় তাহার সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল । যখন রাত্রি অবসান হইল, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফজরের নমাজ পড়িবার জন্য গাত্রোথান করিলেন, এবং ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন গৃহাবরোধকারী কাফেরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কোথায় ? শেরে খোদা (রাজিঃ) বলিলেন, আমি সে সংবাদ রাখি না ; তাঁহার সংবাদ ত তোমাদের জানা থাকা উচিত, কারণ তোমরা সারারাত্রি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত ছিলে ; আমি ত সমস্ত রাত্রি শুইয়া কাটাইয়াছি । তখন কাফেরগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ধৃত করিল, প্রহার করিল, কয়েককাল বন্দী অবস্থায় রাখিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল । অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সমুদয় আমানতি (গচ্ছিত) অর্থ ও জিনিষ পত্র উহার ‘মালেক’ (স্বত্বাধিকারী) দিগকে পহুঁচাইয়া দিলেন । এখানে একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কাফেরগণ এক দিকেত তাঁহার প্রাণবধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল । পক্ষান্তরে ‘দেয়ানত’ ও ‘আমানত’ সম্বন্ধে তাঁহার উপর উহাদের এমন বিশ্বাস আছিল যে, আপনাদের মূল্যবান জিনিষ-পত্র, স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট ‘আমানত’ (গচ্ছিত) রাখিয়া যাইত । হজরত (ছালঃ) মক্কা হইতে ‘রোখুছত’ (বিদায়) হওয়া কালেও সেই বিশ্বস্ততা এমন দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করিলেন যে, স্বীয় ‘চাচ্চাবাদ’ ভাই (পিতৃব্য-পুত্র)—যাঁহাকে তিনি অপত্য নিকর্ষিণে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও

কেবলমাত্র গচ্ছিত জিনিষ পত্র ও 'মাল-আসবাব' উহার অধিকারীদিগকে পহুছাইবার জন্য নিত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় তাঁহাকে স্বীয় গৃহে রাখিয়া মদীনায়া যাত্রা করিলেন । যদি তিনি এরূপ ব্যবস্থা না করিতেন, তবে শূন্য গৃহ হইতে চোর-বাটপাড়গণ ■■■ তাহা আত্মসাৎ করিত ; যাহাদের জিনিষ-পত্র, মাল-আসবাব জমা ছিল, তাহারা কিছুই পাইত না । শত সহস্র ঘোর-বিপদের মধ্যেও তিনি কর্তব্য পালনে ক্ষণকালের ■■■ বিমুখ হন নাই । এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল ।

যাহা হউক, কাকেরগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ছাড়িয়া দিয়া সোজাহুজ্জি হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) গৃহে গিয়া পহুছিল—এবং দ্বারে আওয়াব্ দিল । আওয়াব্ শুনিয়া হজরত আছমাঃ-বিস্তে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ—আঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া আবুজ্জহল জিজ্ঞাসা করিল, অগ্নি মেয়ে ! তোমার পিতা কোথায় ? বালিকা বলিলেন, আমি তাহা জানিনা । তচ্ছুবণে সেই নির্মম পাষণ্ড তাঁহাকে এমন জোরে এক চড় মারিল যে, তাঁহার কাণের বালি (স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ) খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল । ইহার পর কাকেরগণ হজরত (ছালঃ)-কে সমগ্র মক্কা নগরী ও উহার পার্শ্ববর্তী পাহাড়, জঙ্গল, মরদান, গিরিগুহা, উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইল ; কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না । যখন অহুসন্ধান করিয়া নিরাশ হইল, তখন তাহারা ঘোষণা প্রচার করিল যে, যে কোনও ব্যক্তি (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে জীবিত অবস্থায় কি মৃত অবস্থায় আমাদের নিকট পহুছাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে একশতটী উষ্ট্র পারিতোষিক দেওয়া যাইবে । এই ঘোষণাপত্র শুনিয়া মক্কার বহুসংখ্যক লোক পুরস্কারের আশায় চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

সুর গিরি-গহ্বরে সূর্য ও চন্দ্রের

একত্র সমাবেশ ।

রাত্রির গভীর অন্ধকারে দুই বন্ধু, গারুড় অর্থাৎ সুর নামক গিরি-গহ্বরের নিকট পৌঁছলেন। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) হজরত রেছালতমায (ছালঃ)-কে বাহিরে রাখিয়া, স্বয়ং সেই অপরিষ্কার অন্ধকার গিরি-গহ্বরে প্রবেশ পূর্বক গহ্বরটী যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিলেন। গহ্বরটীর যেখানে যেখানে 'ছুরাখ' (ছিদ্র) ছিল, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া স্বীয় পরিহিত বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া তদ্বারা সেই সকল গর্ত বন্ধ করিলেন। এইরূপে সকল গুলি গর্ত বন্ধ করিয়া, হজরত (ছালঃ)-কে গহ্বরের ভিতরে লইয়া গেলেন। এই আক্‌তাব ও মাহতাব (সূর্য ও চন্দ্র) পূর্ণ ৩ দিবস ও ৩ রাত্রি সেই অন্ধকূপ স্বরূপ গহ্বর মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিলেন। কোরেশদিগের বড় বড় ছরদার (নেতা বা লীড়ার অথবা দলপতি) কেবল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করিয়াই নিরন্তর ছিল না; তাহারা স্বয়ংও পদচিহ্ন দ্বারা ইহাদের গমন-পথ নির্ধারণ জন্য সূক্ষ্ম অহুসন্ধানকারী দল লইয়া চতুর্দিকে অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং তাহাদের একদল গারুড় অর্থাৎ সুর নামক গিরি-গহ্বরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গীয় পদ-চিহ্ন দ্বারা অহুসন্ধানকারী লোকেরা (১) বলিল, এই পর্যন্তই পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়; ইহার পরে আর পদ-চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং হয় তঃ ইহার নিকটেই কোনও স্থানে তাহারা লুকায়িত আছে, কিংবা আকাশে উড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, এই গহ্বরের মধ্যে

(১) আরবে—বিশেষতঃ মক্কায় তখন এরূপ একদল লোক ছিল, যাহারা বালির উপর লোকের পদ-চিহ্ন দেখিয়া তাহাদের গতিবিধি নির্ধারণ করিত। মক্কার কাকেরগণ ইহাদেরই একদল লোককে হজরতের

একবার প্রবেশ করিয়া দেখা হউক না কেন ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, এমন অন্ধকার ■ ভয়ঙ্কর গর্ভে মানুষ প্রবেশ করিতে পারে না ; আমরা বহুকাল হইতে এই গহ্বরটাকে এই অবস্থায়ই দেখিতেছি । তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, দেখ, এই গর্ভের মুখে মাকড়সা জাল বুনিয়া রাখিয়াছে ; কোনও লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে এই জাল কদাচ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিতে পারিত না ; উহা নিশ্চয়ই ছিন্ন হইয়া যাইত । চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, ঐ দেখ, ঐ স্থান হইতে কতিপয় কবুতর (পায়রা) উড়িয়া গেল ; এবং গাওর ভিতরে উহাদের আঙা (ডিম) দৃষ্ট হইতেছে—, যাহার উপর ঐ কবুতর বসিয়াছিল । ইহার পরে সকলেরই ধারণা হইল যে, এই গহ্বরে কোনও মানুষ প্রবেশ করে নাই, স্ততরাং উহার ভিতরে আর কেহ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল না । এই কোফ্ফার দল গহ্বরের এত নিকটে পহুঁছিয়া গিয়াছিল যে, হজরত রেহালতমাব (ছালঃ) ও হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) তাহাদের পা দেখিতে পাইতেছিলেন ; আর তাহাদের কথাবার্তাও স্পষ্ট উভয়ের কর্ণগোচর হইতেছিল । এরূপ ‘খতরনাক’ ; (আশঙ্কা-প্রদ) অবস্থায় হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), জনাব হজরত রেহালতমাব (ছালঃ)-কে বলিলেন, হজুর ! কোফ্ফার ত এখানে আসিয়া পহুঁছিয়াছে ; হজরত (সালঃ) ফরমাইলেন, তুমি একটুও ভয় করিও না, আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন । তুমি ঐ দুইজনকে কি মনে করিয়াছ ? যাহাদের সঙ্গে তৃতীয় খোদা আছেন (অর্থাৎ আমরা কেবলমাত্র দুইজন নহি, আমাদের সঙ্গে আর একজন আছেন ; তিনি মহাপ্রতিশালী আল্লাহ তা-লা) । কোফ্ফারগণ (ছালঃ) ও ■ আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) পদচিহ্ন ধরিয়া উহাদের খোঁজ লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল । তাহাদেরই একদল লোক সুর সিরি-গহ্বর পর্যন্ত পহুঁছিয়াছিল ।

আপনাদের অসুস্থতান কার্য, প্রাণপণ চেষ্টা ■ উচ্ছোঙ্গে বিকল মনোরথ হইয়া গহ্বরের নিকট হইতে চলিয়া গেল। তাহারা ৩ দিন পর্যন্ত মক্কা নগরের বিভিন্ন অংশে, পাহাড় ও উপত্যকা সমূহে, পথে, মাঠ-ময়দানে সর্বত্র ইহাদের অসুস্থতান করিয়া নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে অসুস্থতান কার্যে বিরত হইল। হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) প্রথম হইতেই স্বীয় পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ)-কে এই উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কোক্কারদিগের সর্বপ্রকার-কর্যে-কলাপ, এবং তাহাদের সমস্ত দিনের কার্যাবলী রাতে বেন গোপনে আসিয়া তাঁহাদিগকে জানায়। এইরূপে স্বীয় ক্রীতদাস আমের-বিন্-ফহিরাঃ (রাজিঃ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমাদের ছাগলের পাল সারাদিন এদিকে ওদিকে চরাইয়া ফিরিবে, এবং রাত্রিকালে উহাদিগকে হুর গিরি-গহ্বরের নিকটে চরাইতে লইয়া আসিবে; আর স্বীয় কন্যা আসমাঃ (রাঃ—আঃ) এর প্রতি এই ভারার্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন যে, খানা পাকাইয়া রাত্রিকালে অতি সাবধানে "গারহুরে" আমাদের নিকট পহুছাইয়া দিবে। এইটি কত বড় কঠিন কাজ ছিল, চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। হজরত শত্রুদলের মধ্য দিয়া ৪ মাইল দূরবর্তী স্থানে একটি বালিকার খাত্ত দ্রব্য পহুছান কি সহজ ব্যাপার ছিল? আসিতে বাইতে তাঁহাকে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইত। তাঁহার সাহস, নির্ভীকতা, ধর্ম-পরায়ণতা, কর্তব্য জ্ঞান, হজরত (হালঃ) এবং পরম শ্রদ্ধের পিতার প্রতি ভক্তি প্রভৃতির বিষয় নিবিষ্ট মনে আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বর্তমান মোস্লেম মহিলাদিগের পক্ষে ইহাতে শিক্ষণীয় কত বিষয় আছে।

যাহা হউক, হজরত সিদ্দিক আকবরের (রাজিঃ) পুত্র কন্যা প্রত্যহ নিয়মিত রূপে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন। আর তাঁহার

গোলাম (ক্রীতদাস) আমের বিন্-কহিরাঃ (রাজিঃ) রাত্রিকালে ছাত্রী
 ■ দোহন করিয়া উহার হৃৎ সূকারিত-গহ্বরবাসীদ্বয়কে পান
 করাইতেন ; এবং অধিক রাত্রিতে ছাগলের পাল লইয়া মকায় প্রবেশ
 করিতেন । এইরূপে আবদুল্লা (রাজিঃ) ■ আসমাঃ (রাঃ—আঃ)
 এর পদ-চিহ্ন ছাগ পালের গমনাগমনে মুছিয়া যাইত । এরূপ না করিলে
 কাকেরগণ পদচিহ্ন ধরিয়া সূকারিত হজরত দ্বয়ের সন্ধান পাইতে পারিত ।
 বধন হজরত (ছালঃ) ■ হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) জানিতে
 পারিলেন যে, মকাবাসীদিগের ‘জেশে-খরুশ’ (উৎসাহ-উত্তম ■ উত্তেজনা)
 ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে; তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার আশায় নিরাশ হইয়াছে,
 তখন তাঁহাদের পূর্ব নির্দেশিত পথ-প্রদর্শক আবদুল্লা-বিন্-আরিকেতের
 নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে; তুমি উষ্ট্রীদ্বয়কে লইয়া শূর গিরি-গহ্বরের
 নিকট উপস্থিত হও । এহলে আবদুল্লা-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ), আসমাঃ
 (রাঃ—আঃ) ও আমের বিন্-কহিরার (রাজিঃ) কার্য্য-কলাপ, পরিশ্রম,
 চেষ্টা-উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ না করিলেও চলে, কারণ তাঁহারা মহামান্য
 হজরত (ছালঃ), পরম শ্রেষ্ঠ পিতা ও প্রভুস্বয়ম্ভব আপনাদের কর্তব্য
 সাধন করিয়াছেন, কিন্তু আবদুল্লা বিন্-আরিকেত মোসলমানও ছিল না ;
 বরং সাধারণ নিয়মে সে মোসলমানদিগের শত্রুই ছিল । আর সে নিতান্ত
 ‘আজীর’ (শ্রমিক) ছিল । উহার গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করা, বিশ্বস্ততা,
 সহদয়তা, পরোপকার-স্পৃহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় এবং আববজাতির
 সাধারণ গুণ বলিতে হইবে । উহাদের মধ্যে শত শত মারাত্মক দোষ
 থাকিলেও, অনেক গুলি উচ্চ গুণও বিদ্যমান ছিল ।

সংবাদ পাইবামাত্র আবদুল্লা-বিন্-আরিকেত, হজরত আবুবকর সিদ্দিক
 (রাজিঃ) ■ উষ্ট্রী ২টা এবং নিজের উটটী লইয়া রাত্রিকালে শূর গিরি-
 গহ্বরের নিকট :উপস্থিত হইল । রবিওল-আউওল মাসের শুক্লপক্ষ

রক্তনীর এই ঘটনা। হজরত আসমা-বিন্তে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ—আঃ) ও এই সময় প্রবাসীদিগের কত ছাতু এবং অন্যান্য খাণ্ড দ্রব্য প্রভৃতি নইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ~~হজরত~~ রেছালতমাব (ছালঃ) ও হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই 'বেন্দান' বা অঙ্কুশ রূপী গহ্বর হইতে দিবা-রাত্রির পর বাহির হইলেন। একটি উষ্টীর উপর অ' হজরত হাজারাহ আলায়হে ও সালাম আরোহণ করিলেন; এই উষ্টীর নাম "আল-কাছওয়া" ছিল। অপর উষ্টীর পৃষ্ঠে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও তাঁহার ক্রীতদাস আমের বিন্-কহিরাঃ (রাঃ) আরোহণ করিলেন। আর তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক আবছলা-বিন্-আরকেত নিজের উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। এই ৪ জন মোছাকের (প্রবাসী) মদীনার সাধারণ রাস্তা পরিভ্রমণ পূর্বক, উহার এদিক ওদিক (যে দিক দিরা লোক কিংবা কাফেলা চলাচল করে না) দিরা চলিতে লাগিলেন; কারণ এখন পর্যন্ত কাকেরদিগের অনুসরণও পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা ছিল। এই ~~হজরত~~ একটি ঘটনা বর্ণনা যোগ্য। হজরত আসমা-বিন্তে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ—আঃ) ঘর হইতে যে ছাতুর ঠিলিয়া (কলসী বা ঘড়া) আনিয়াছিলেন, তুলক্রমে উহা লটকাইবার তসমা (রজ্জু বা দড়ি) আনিতে তুলিয়া গিয়াছিলেন; যখন উহা উষ্ট্রের হাওদার সঙ্গে বাধিয়া লটকাইতে চেষ্টা করিলেন, তখন দেখিলেন, রজ্জু নাই। তৎকালে অত্ কখনও দড়ীও সেখানে উপস্থিত ছিল না। হজরত আসমাঃ (রাঃ—আঃ) তৎকালে নিজের 'নোতাকে' (কমরে বাধিবার ডুরি বা কমরবন্ধ) অর্দ্ধাংশ নিজের কমরে বাধিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ছাতুর ঠিলিয়া উষ্ট্রের হাওদার বাধিয়া দিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের ও উপস্থিত বৃত্তি দেখিয়া হজরত রেছালত পানাহ (ছালঃ) খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; এবং তাঁহাকে "বাত্ আল নতাকিন" বলিয়া সম্বোধন

করিলেন। তদনুসারে উত্তরকালে তিনি ঐ নামেই অভিহিত হইতেন। ইনি সেই হজরত আসমা:-বিন্তে হজরত আবুবকর সিদ্দিক, (রা:—আ:) মহাবীর হজরত যোবায়ের (রাজি:) যাহার স্বামী, এবং হজরত আবদুল্লা বিন-যোবায়ের (রাজি:) যাহার বীরপুত্র ছিলেন; এবং ওম্মিয়ার বংশীয় ১ম খলিফা আবদুল মালেকের তুর্ক ও নির্দয় সেনাপতি হোজ্জাজ্-বিন্-ইউসফ্ কর্তৃক মক্কা মোরাক্কমার অতি নৃশংস ভাবে শহিদ হন। এক সময় তিনিই মোসলেম-জগতের খলিফা হইবেন বলিয়া সম্ভাবনা হইয়া ছিল। ফলতঃ সে সময় তাঁহার মতন সুযোগ্য ও বীর পুরুষ মোসলমান-দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না।

আরও একটা ঘটনা এই হজরত-ব্যাপারে উল্লেখ যোগ্য। আবুবকর সিদ্দিক (রাজি:) সমস্ত নগদ টাকা—যাহার পরিমাণ ৫১৬ হাজার দরম ছিল—সঙ্গে লইয়া যওয়ানা হইয়াছিলেন; তাঁহার পিতা আবি-কহাকা: তখনও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন না; তিনি তখন অন্ধ ছিলেন। তিনি বাহির হইতে গৃহে আসিয়া উত্তর পোত্ৰীকে কহিলেন, আবুবকর (রাজি:) নিজের চলিয়া গেল, আর সমস্ত আসবাব ও টাকা কড়ি লইয়া গেল? হজরত আসমা (রা:—আ:) বলিলেন, দাদাজান! তিনি আমাদের অল্প অনেক টাকাকড়ি রাখিয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি কতকগুলি পাথরের টুকরা কাপড়ে জড়াইয়া ঐ স্থানে (যেখানে টাকা থাকিত) রাখিয়া দিঘেনা তারপর পিতামহের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া গেলেন; তিনি হাত দিয়া হাত্-ডাইয়া দেখিয়া মনে করিলেন, সত্য সত্যই দরম গুলি সেই স্থানে আছে। তখন বৃদ্ধ পোত্ৰীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এমন আবুবকরের (রাজি:) চলিয়া যাওয়াতে কোন 'গম' (দুঃখ) নাই।

হেজরতের সফর ।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) আল-কাছোয়া উষ্টীর উপর আরোহণ করিবার পূর্বে একবার মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; আর মর্ম-বেদনার সহিত করমাইলেন, অরি মক্কা ! তুমি আমার নিকট সকল শহর হইতে প্রিয় । কিন্তু তোমাতে বাহারা বাস করে, তাহারা আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না । হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) করমাইলেন, ঐ সকল লোকেরা আপনাদের নবীকে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল । এক্ষণে উহারা ‘হালাক’ (ধ্বংস) হইয়া যাইবে । ঐ সময়ই নিম্ন-লিখিত আয়াত ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হইল । :—“ওযেনা লিল্লাযিনা ইউক্কাতেলুনা বেআয়া হুম যোলেমু ও আয়াল্লাহা আলানাছুরেহিম তাকা দিক্কন ।” এই স্থলে গণ্ডর করিয়া (অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া) দেখা যাইবে, এ যাবৎ যত লোক পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি অবস্থায়, কোন ভাবে বিভোর হইয়া ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন ; এবং কি প্রকারে, কোন প্রমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া মোসলমান হইয়াছিলেন । ইহাদিগকে কিরূপ ভীষণ ‘জোলম’ (অত্যাচার) সহ্য করিতে হইয়াছিল ; আর মোসলমান হইয়া তাঁহারা কিরূপ হৃদয় বিদারক ভীষণ বিপদ রাশির সঙ্গে অকুতোভয়ে যুঝিয়া ছিলেন । কিরূপ সূদৃঢ় ধর্ম-বিশ্বাসে ইহাদের মন প্রাণ উজ্জীবিত হইয়াছিল । এই সকল দৃঢ়বিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা মোসলমানদিগের সহক্ষে কি একরূপ ‘গোমান’ (বিশ্বাস বা ধারণা) করা যাইতে পারে যে, ইহারা লোভের বশবর্তী হইয়া, বা কোনও রূপ ভীতি-প্রদর্শনে মোসলমান হইয়াছিলেন ? না, একথা কখনই নয় । এক্ষণে এই আয়াত নাযেল হইবার পর ঐ যামানাঃ (আরস্ত) হইল যে, যখন দুরাচার লোকেরা

‘কাল্মা হক্’ (সত্যবাদী) প্রচারের গতিরোধ করিবার জন্য ‘কতল’ (হত্যা কাণ্ড) ও ‘গারত’ (ধ্বংসকার্য) হইতে নিবৃত্ত না হইল, তখন উহাদিগকে (উপরোক্ত অত্যাচারী ও ধর্মদ্রোহী দিগকে) শাস্তি প্রদানার্থ, আর সত্যবাদী প্রচারের (‘তওহিদ’ বা একেশ্বরবাদ ঘোষণার) পথাবরোধের বাধা প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হওয়া গেল ।

ছরাকা:-বিন্-মালেক-বিন্ জয়শম মক্কার কোরেশদিগের মধ্যে একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ও খ্যাতনামা বোদ্ধা ছিল । ছরাকার বৃত্তান্ত এইরূপ :— সে কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে মক্কার বসিয়া ছিল । অতি প্রত্যুষে কোনও ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে বলিল, আমি ৩ জন উষ্ট্রারোহীকে যাইতে দেখিয়াছি ; তাহারা অমুক দিকে যাইতে ছিল । আমার বিশ্বাস যে, উহারা (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ও তাঁহার বন্ধুবর্গ । ছরাকাঃ এই কথা শুনিয়াই ঐ ব্যক্তিকে চূপ থাকিতে ইঙ্গিত করিল, এবং বলিল আমি জানি, তাহারা অমুক অমুক ব্যক্তি—তাহারা অস্ত্র রজনীতে মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে । ছরাকার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, আমিই উহাদিগকে ‘গেরেক্তার’ (বন্দী) করিব, এখানকার অন্য কেহ না এই কার্যে অগ্রসর হইয়া পলাতক লোকদিগকে বন্দী করে ; তাহা হইলেত আমি একশত উষ্ট্র পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইব । একটু পরে ছরাকাঃ সেই বৈঠক হইতে উঠিল, এবং স্বীয় গৃহে আগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভেজগামী আরবীয় অশ্ব ও অস্ত্র শস্ত্রাদি ভূত্যের দ্বারা শহরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল । আর নিজে ■ লোকের চক্ষু এড়াইয়া শহরের বাহিরে গিয়া পহুছিল । সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উষ্ট্রের পদচিহ্ন ধরিয়া খুব তেজে অশ্ব ছুটাইয়া দিল । কিছু দূর গিয়াই অশ্ব উছট খাওয়াতে ছরাকাঃ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেল । কিন্তু সে তাড়াতাড়ি আবার অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক দ্রুতবেগে ধাবিত হইল । উহার বিশ্বাস ■

ধারণা ছিল যে, আমি (হজরত) মোহাম্মদ (সালঃ) কে 'গেরেক্তার' (বন্দী) অথবা কতব (হত্যা—শহীদ) করিয়া ঘোষণাকৃত ১০০ উষ্ট্র পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিব । যখন অ' হজরত (ছালঃ) এবং তাঁহার বন্ধু ও সহচরগণের উষ্ট্র তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল ; তখন তাহার অশ্ব আবার ঠোকর খাইল (পা হড়্কাইয়া পড়িয়া গেল), এবং উহার আগের পা দুখানি হাঁটু পর্যন্ত মৃত্তিকার (বালু রাশিতে) প্রোথিত হইয়া গেল । ছরাকাঃ বিনপোশ হইতে ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু উঠিয়া আবার অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিল ; এবং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল ; হজরতের (ছালঃ) আরোহিত উষ্ট্রের অতি নিকটে গিয়া পহছিল । নিকটে পহছিবারাত্র উহার ঘোড়াটির পেট পর্যন্ত মৃত্তিকার প্রোথিত হইয়া গেল । সঙ্গে সঙ্গে ছরাকাঃ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ; এই অবস্থা দেখিয়া সে নিতান্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল ; এবং বুকিতে পারিল, আমি ইহার (হজরত [ছালঃ]) এর প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারি না । তদনুসারে সে স্বয়ং আওয়ায্ দিয়া অ' হজরত (ছালঃ) কে তাহার একটি কথা শুনিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল । হজরত (ছালঃ) সওয়ারির (আরোহিত উষ্ট্রের) গতিরোধ করিলেন । তখন ছরাকাঃ বলিল, আমি আপনাকে 'গেরেক্তার' (বন্দী) করিবার আসিয়া ছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে আমি ফিরিয়া যাইতেছি । আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ; আপনি আমাকে একখানি 'আমাল নামা' (শান্তির প্রতিশ্রুত পত্র) লিখিয়া দিন, আর আমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করুন । আমি প্রত্যাবর্তন কালে, যে সকল লোক আমার ন্যায় আপনাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, তাহাদিগকেও বলিয়া কহিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইব । তদনুসারে হজরতের (ছালঃ) আদেশক্রমে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) কিংবা তাঁহার দাস আমের-বিন-ফহিরাঃ(রাজিঃ)

উষ্ট্র-পুষ্ঠে বসিয়া বসিয়াই একখানি আমাল নামা লিখিয়া, তাঁহার প্রতি
নিবেশ করিলেন। সে ঐ লিপিকথানি লইয়া মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন
করিল। পশ্চিমধ্যে আরও কতিপয় লোক (ছালঃ) অহুসরণে
গমন করিতেছিল; পশ্চিমধ্যে ছরাকার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল;
সে তাহাদিগকে বলিল, আমি বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎবর্তিত হইয়া ও পলাতক-
দিগের সাক্ষাৎ পাইলাম না; সুতরাং তাহাদের অহুসরণে তোমাদের
গমন করা বুঝা। তজ্জ্বল্যে ঐ সকল লোকও আর অগ্রসর না হইয়া
মক্কার ফিরিয়া গেল। ছরাকাঃ মকা-বিজয়ের পর পবিত্র ইসলাম ধর্মে
দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

গার শূর (শূর গিরি-গহ্বর) অর্থাৎ মক্কার সন্নিবর্তী স্থান হইতে
বগদাদ হইয়া আবদুল্লা-বিন্-আরিত, হজরত (ছালঃ) কে সমুদ্র
তীরের দিকে লইয়া চলিল। ‘আছকান’ নামক স্থানের ওদিকে কিয়দূর
পর্য্যন্ত গমন করিয়া, সাধারণ রাস্তা অতিবাহিত করিল; তৎপর ‘ওমজের’
নিম্নদিকস্থ ‘কদির’ পর্য্যন্ত ‘সফর’ করিল; পরে সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ
পূর্ব্বক ‘খররার’ এর ময়দান অতিক্রম করিতে লাগিল। ‘ছনাভাল
মব্রাহ্’, ‘লফত্’, ‘মদ-লজাহ’, ‘মহ্ হাজ’ প্রভৃতি স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক,
‘বগদাদর যুন্নীন’ এর এলাকাও পার হইল, তৎপর ‘বিসলম’ অতিক্রম
করিয়া ‘আলয়াবা বিদাঃ আল আরজ’ প্রভৃতি স্থান পরে হইয়া গেল।
‘আল-রাবরজ’ এর নিকটবর্তী ‘ওয়ারী’ তে হজরতের (ছালঃ) এই
কাফেলার একটি উষ্ট্র চলিতে চলিতে অবসর হইয়া পড়িল। ঐ স্থানে
আসলাম সম্প্রদায়ের আযস্-বিন্-হজর হইতে একটি উষ্ট্র চাহিয়া লওয়া
হইল। আযস্-বিন্-হজর স্বীয় একজন গোলাম ■ তাঁহার সঙ্গে দিল।
সেখান হইতে এই কাফেলা ‘সন্তাহ-আল-ফারের’ এর রাস্তা অতিক্রম
পূর্ব্বক ‘ওয়ারী-রিম’ এ পহুছিল। ওয়ারী রিম হইতে যাত্রা করিয়া,

বেলা দ্বি-প্রহরের সময় এই পবিত্র কাকেনা 'কোবার' নিকট গিয়া পহছিল ।

ছরাকা:-বিন্-মালেক বখন হজরত রেছালতমাব (ছাল:) এর নিকট হইতে মকায় চলিয়া গেল, তথা হইতে হজুরের কাকেনা কিছু দূর অগ্রসর হইলে, হজরত যোবের-বিন্-আওয়াম (রাজি:), শাম (সিরিয়া) হইতে ভেজারতি মাল (বাণিজ্য-দ্রব্য) লইয়া মকায় প্রত্যাবর্তন কালে এই পবিত্র কাকেনার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । হজরত যোবের (রাজি:) হজরতের (ছাল:) হজুরে কতক বস্ত্র অর্থাৎ পরিচ্ছদ পেশ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আরজ করিলেন যে, আমিও মকায় পহছিরা বত শীঘ্র সম্ভব মদীনায়া পহছিতেছি । এই সময়ে পথিমধ্যে যে সকল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, তাহারা সকলেই হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজি:) কে চিনিতে পারিত । কারণ তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া সর্বদাই এইপথে গমনাগমন করিতেন । কিন্তু অ' হজরত (ছাল:) কে লোকে চিনিতে পারিত না । একস্থ লোকে হজরত সিদ্দিক আবুবকর (রাজি:) কে জিজ্ঞাসা করিত, ইনি কে—যে আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন ? হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজি:) উহাদিগকে উত্তর দিতেন—ইনি আমার পথ-প্রদর্শক ও তরিকের (ধর্ম-বিষয়ের) হাদী (উপদেষ্টা) ।

হজুরের (প্রবাসের) পরিসমাপ্তি ।

আট দিন পথ ভ্রমণের পর ১৪ই নববীর (পয়গম্বরী বা প্রেরিত স্ব লাভের ১৪শ সালে) ৮ই রবিওল আউত্তল বেলা দ্বি-প্রহরের সময় কোবার নিকটে :এই পবিত্র ■ চিরস্মরণীয় কাকেনা গিয়া পহছিল । যে পবিত্র

ঘটনা স্বরণ করিতে অত্মপি (চৌদ্দশত বৎসর পরে) ■ মোসলেম-হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদ্বেক হয় ; সেই পবিত্র দিনের কথা-স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে ; ধমনীতে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হয় । যাহার হৃদয় ইসলামের পবিত্র আলোকে আলোকিত, তাহার হৃদয়ে:ভাব ■ ভক্তি স্রোত উথলিয়া উঠে ।

কোবা মদীনা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত । উহা মদীনার শহর-তলিই ছিল । এমন কি, উহা মদীনার একটি মহান্না বলিয়াই পরিগণিত হইত । ঐ স্থানে বনি-ওমর-বিন্-সরোফ্, গোষ্ঠীয় (গোত্রের) লোকই অধিক সংখ্যায় বাস করিত । এই স্থানের বহুসংখ্যক লোকই ইতিপূর্বে ইসলামের পবিত্র মহাজ্যোতি: (আলোক) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মক্কা হইতে হজরত রেহালত পানার (ছাল:) রওয়ানা হইবার সংবাদ কয়েক দিন পূর্বেই মদীনায় পহুছিয়া ছিল । একজন মদীনার আনছারগণ প্রত্যহ প্রভাত হইতে বেলা দ্বি-প্রহর পর্যন্ত বস্তির বাহিরে যাইয়া ইসলাম-সূর্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন । বখন দিবাকরের প্রথর উত্তাপ অসহ্য রোধ হইত, তখন তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন । হজরত (ছাল:) বেলা দ্বি-প্রহরের সময় কোবার পহুছিয়া ছিলেন । একজন কোবাবাসী শিষ্যও ভক্তবৃন্দ অপেক্ষা করিতে করিতে উহার একটু পূর্বে স্ব ■ গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন । একজন যিহুদী, মোসলমান জন-সম্মুখে প্রতিদিন এইরূপে বস্তির বাহিরে আসিয়া সমবেত হইতে দেখিত, এবং সে জানিত যে, অ'। হজরত (ছাল:) শীঘ্রই মক্কা হইতে এখানে আগমন করিবেন ; তাঁহার আগমন-জন্ত—তাঁহার অভ্যর্থনার্থই এই সকল লোকেরা একান্ত আগ্রহ সহকারে এইরূপে সমবেত হইয়া থাকেন । ঘটনা বশতঃ ঐ দিন সে আপনার গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়াছিল, সে দূর হইতে ■ রেহালত পানার (ছাল:) ক্ষুদ্র কাকোলাটী কে আসিতে দেখিয়া

বুঝিতে পারিল, ইহাই সেই কাকোলা—যে সঙ্গে [redacted] রেছানত-মাব (ছালঃ) আসিতেছেন। তদনুসারে সে হজরত (ছালঃ)-কে লক্ষ্য-করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, “এয়া মায়ানারল আরব ইয়া নবী কিলদ হাবা জদকুম :কা জায়া ” অর্থাৎ হে আরববাসী (মদীনাবাসী)-গণ, হে ছ-প্রহরে আরামকারিগণ, তোমাদের উদ্দেশিত, তোমাদের সৌভাগ্যের ‘ছামান’ (জিনিষ বা পাত্র) ত আসিয়া পহুছিরাছেন।” এই আওয়ায-শ্রুতিবামাত্র লোকেরা স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আর সমগ্র কোবায় আনন্দের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট ও উল্লাসধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। আনুহার (রাজিঃ)-গণ দেখিতে পাইলেন, হজুর এক খজুরের বাগানের দিকে যাইতেছেন। হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) মনে করিলেন, লোকদিগের হজরত রসুলোত্তাহ (ছালঃ)-কে চিনিতে না সন্দেহ হয়, এই উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ হজরতের পশ্চাদিকে আসিয়া চাদর দ্বারা হজরতের (ছালঃ) উপর ছায়া করিলেন—যদ্বারা প্রভু ও সেবকের পরিচয় সহজেই পাওয়া গেল। হজুর (ছালঃ) ‘কোবা’ মহাল্লায় প্রবেশ করিলেন। আনুহার (রাজিঃ)-দিগের ছোট ছোট বালিকাগণ আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত স্বমধুর [redacted] হজুরের আগমন-জনিত সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। সঙ্গীতের একাংশের মর্ম্মাহুবাদ এই :—

“আমাদের উপর বদর, ছানিয়াত আল ভেদা দ্বারা উদয় করিয়াছে ; (১) যে পর্য্যন্ত কোনও দোওয়া-কারী আছে, আমাদের উপর শোকর (কৃতজ্ঞতা

(১) ছানিয়াতের অর্থ আলভেদা,—রোখুছতের বিদায়ের ঘাটি সমূহ। মদীনাবাসিগণ যখন কাহাকেও মক্কার দিকে বিদায় করিত, তখন ঘাটি সমূহ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে “আলবেদা” বলিবার জন্ত আসিত। এক্ষণে উহা “সানিয়াত-আলভেদা” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

স্বীকার) করা ‘ওয়াজেব’ (কর্তব্য); হে আমাদের মধ্যে যবযুছ হওয়া ওয়াজা নবী, আপনি এমন আদেশ লইয়া আসিয়াছেন যে, ইহা পালন করা একান্ত আবশ্যক ।”

হজরত: (ছাল:) রবিবার দিন কোবার প্রবেশ করিলেন, এবং জুমার দিন পর্যন্ত তথায় থাকিলেন । ইসলামে দৃঢ়-বিশ্বাসী মদীনাবাসীদিগের হৃদয়ে তখন যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা এ সামান্য লেখনীর সাধ্যাতীত । এমন কি, আমাদের কল্পনার অতীত । অঃ হজরত (ছাল:) কলছুম-বিন্-হদমের (রাজি:) গৃহে, আর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজি:) হবিব-বিন্- আছাফের (রাজি:) গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ছায়াদ-বিন্ খছিমজা (রাজি:)-এর গৃহে হজরতের ‘মজলেছ’ (দরবার) হইত ; অর্থাৎ ছায়াদ-বিন্-খছিমা: (রাজি:)-এর গৃহে লোকেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন । সকল সময়েই তাঁহার চতুর্দিকে বিপুল জনতা থাকিত । কোবার এই কয়েক দিন অবস্থান কালে তিনি একটি মসজ্জদের ভিত্তি স্থাপন করেন ; ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রথম মসজ্জদ । ইহার পর ১২ই রবিওল-আউওল জুমার দিন তিনি কোবা হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনায় প্রবেশ করিলেন । হজরত রহুল আকরম (সাল:) কোবার থাকিতে থাকিতেই হজরত আলী (ক:—ও:) মক্কা হইতে কোবার—হজরতের খেদমতে আসিয়া পহুছিলেন । এই সুদীর্ঘ এবং হুরতিক্রম্য পথ তিনি পদব্রজেই অতিক্রম করেন । হজরত রেছালত মাব (ছাল:) যে কয়দিন সুর নামক গিরি-গহ্বরে ছিলেন, সেই কয়দিন পর্যন্ত শেরে খোদা (রাজি:) হজরতের নিকট গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী উহার ‘মালেক’ (স্বত্বাধিকারী)-দিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । আবার ঘটনার সামঞ্জস্য এমনই বিস্ময়কর যে, যে দিন হজরত (ছাল:) এবং সিদ্দিক আকবর (রাজি:) সুর গিরি-

গহ্বরে হইতে মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন, হজরত আলী (রাজিঃ) ও সেই দিনই মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একাকী যাত্রা করিয়াছিলেন; একন্ত তিনি সারারাত্রি পথ চলিতেন, এবং দিনের বেলায় কোনও নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকিতেন। অঁ। হজরত (ছালঃ) সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অনেক স্থলেই উহার এদিক ওদিক দিয়া আগমন করিয়াছিলেন, একন্ত তিনি ৮ দিনে কোবায় পহুঁছিয়াছিলেন, আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সাধারণ রাস্তা দিয়া পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছিলেন; একন্ত হজরতের ৮ দিন কিংবা ৪ দিন পরে তিনি কোবায় পহুঁছিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হজরতের মদীনায় প্রবেশ ।

জুমার দিন হজরত (ছালঃ) কোবা ও বনি ওমর-বিন-বনি-য়রোফ্—অর্থাৎ কোবাবাসিগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক মদীনায় বাস করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। মদীনায় প্রত্যেক মহান্নার—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক বাসনা করিতেন যে, অঁ। হজরত (ছালঃ) আমাদের মহান্নার বাস করুন। হজরত (ছালঃ) বহু সালেম-বিন্ যরোফ্ দিগের মহান্নার থাকিতে থাকিতেই জুমার দিন আসিয়া পড়িল। তিনি ঐ স্থানেই এক ময়দানে শতাধিক লোকের সঙ্গে জুমার নমাজ আদায় করিলেন। ইহাই মদীনায় হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর প্রথম জুমা ও প্রথম খোত্বা ছিল। উত্তরকালে এই স্থানেও একটা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। জুমার নমাজ আদায় করিয়া তিনি খীর উদ্বী কাছোয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বহুসালেহ্-বিন্-য়রোফ্ সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়া, তাঁহার উদ্বীর মোহার (বজা বা রসি) ধরিয়া লইলেন; এবং

তাহাকে সেই স্থানে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। অন্যান্য মহান্নার লোকেরা আপনাপন মহান্নায় লইয়া বাইবার জন্য বিশেষরূপে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন দলের লোকের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ■ বচসা হইতে লাগিল। তদর্শনে হজরত রেহালত পানাহ্ (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমরা আমার নাকার (উষ্টীর) গতিরোধ করিও না। উহার মোহার (নাকের রসি) ছাড়িয়া দাও। উষ্টী খোদা তা-রালা হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে; যেখানে আমার উষ্টী আপনা হইতে বসিয়া বাইবে, আমি সেই স্থানে অবতরণ এবং বাস করিব। তদনুসারে উষ্টীর মোহার (রস) ছাড়িয়া দেওয়া হইল; সে যথেষ্টভাবে চলিতে লাগিল। সমুদর আনুহার ও মহাজেরগণ উষ্টীর অগ্রপশ্চাতে এবং দক্ষিণ ও বামে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। হজরত রেহালত পানাহ্ (ছালঃ) উষ্টীর মোহার একেবারে ঢিলা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। উষ্টী আপন ইচ্ছা মতে আস্তে আস্তে চলিয়া বাইতেছিল। কৌতূহল পরবশ লোকদিগের লক্ষ্য ঐ উষ্টীর দিকেই ছিল; উষ্টী কোথায় বসিয়া পড়ে, তাহাই দেখিবার জন্য সকলের একান্ত আগ্রহ। উষ্টী চলিতে চলিতে যখন বহু-বেয়াবার মহান্নায় (পাড়ায়) পহুছিল, তখন ঐ সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি) বেরাদ-বিন্-লবিদ ও ফরদাঃ-বিন্-ওমর অগ্রসর হইয়া উষ্টীর মোহার ধরিতে চাহিলেন। তদর্শনে হজরত হারওয়ারে কারেনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন,—“দারোহা ফান্হা মা মুরতুন”—উহাকে ছাড়িয়া দাও, সে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর উষ্টী বহু-সায়াদাঃ মহান্নায় পহুছিল; এখানে বহু সায়াদ গোজের (গোষ্ঠীর) ছরদার (দলপতি) সায়াদ-বিন্-আল্ রবির, খারজাঃ-বিন্-যয়েদ, আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ আবার উষ্টীর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। হজরত (ছালঃ) উহাদিগকেও ঐ কথাই বলিলেন।

তথা হইতে রওয়ানা হইয়া উষ্টী বহু আদি-বিন্-আল্-নজারের মহান্নার পহছিল ; এই সম্প্রদায় হজরতের (ছালঃ) পিতামহ আবদুল মোস্তালেবের 'নান্‌হিয়াল' (নানা অর্থাৎ মাতামহের বংশীয় লোক) ছিলেন ; এক্ষণে তাঁহাদের বিশেষ দাওয়া ছিল যে, আবদুল মোস্তালেবের মাতা সন্মি-বিস্তে-ওমরু আমাদের বংশের কন্যা ছিলেন ; সুতরাং অ'। হজরত (ছালঃ) আমাদের মহান্নায়ই অবস্থান করিবেন ; সেই ধারণাফুসারে সলিত-বিন্-করেন্স ও আছিরাত-বিন্-আবি-খারজাহ্ প্রভৃতি বহু আদির দলপতিগণ অগ্রসর হইয়া উষ্টীর মোহার (নাকের রজ্জু) ধারণ করিলেন ; উহাদিগকেও এই আদেশ প্রদত্ত হইল যে, উষ্টীর পথ ছাড়িয়া দাও ; সে খোদা তায়াল্লা হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে । উষ্টী যথেষ্ট ভাবে চলিতে চলিতে বহু-মালেক-বিনু-আল্-নজার মহান্নার এক অনাবাদি পতিত জমিতে গিয়া বসিয়া পড়িল ; কিন্তু সন্ধ্যা সন্ধ্যাই দাঁড়াইয়া গেল । কণ্ঠায়মান হইয়া কিছু দূর চলিয়া গেল, আবার আপনা হইতেই ফিরিয়া আসিল ; এবং ঠিক ঐ স্থানে—যেখানে প্রথমে আসিয়া বসিয়া ছিল, সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল । সন্ধ্যা সন্ধ্যা 'গরদান' বুকাইয়া দিল, এবং পুচ্ছ হেলাইতে লাগিল । তখন হজরত রেহালতমাব (ছালঃ) উষ্টীর পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন । এই জনহীন পতিত বর্মির নিকটেই হজরত আবু আইউব খালেদ বিন্-যয়েদ আনুছারির (রাজিঃ) (১) গৃহ

(১) ইনি একজন অতি উচ্চদের সাহাবী (রাজিঃ) ছিলেন । যখন খলিফা হজরত মোরাবিয়া (রাজিঃ) কনষ্টান্টি নোপল আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণকারী কীরপুরুষদিগের সঙ্গে ইনিও গমন করিয়াছিলেন । এমাম হোসায়েন (রাজিঃ) এবং এযিদ-বিনু-মোরাবিয়া ও এই অভিযানে গমন করিয়াছিলেন । আর ও বহুসংখ্যক ছাহাবার কারাম (রাজিঃ) এই সঙ্গে গিয়াছিলেন । সুদীর্ঘ দুই বৎসরকাল অবরোধের পরও যখন মগর

ছিল। তিনি অতি আনন্দের সহিত হজরত রচুল মকবুল (ছালঃ)-এর আসবাব-পত্র স্বীয় গৃহে উঠাইয়া লইলেন। অতঃপর অ'। হজরত (ছালঃ) তাঁহার গৃহেই বাসস্থান নির্দেশ করিলেন। এই পতিত যমি খণ্ড সহল ■ সহিল নামক দুইটা এতিম (অনাথ) বালকের সম্পত্তি ছিল। এই ভূখণ্ডে কতিপয় খর্জুর বৃক্ষ দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইত ; তদ্ব্যতীত কতিপয় মোশরেকের (অংশিবাদী বা কাকেরের) কবরও ছিল। আর চতুষ্পদ জন্তুর দলও সেই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিত। তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পতিত যমিখণ্ড কাহার সম্পত্তি ? মায়া-বিন্ বফরাঃ আরজ করিলেন, এই ভূখণ্ড আমার আত্মীয় দুইটা 'এতিম' (অনাথ) ছেলের সম্পত্তি। তাহারা উভয়ে আমার গৃহেই প্রতিপালিত হইতেছে। আমি উহাদিগকে 'য়েজামন্দ' (সম্মত) করিয়া লইব ; আপনি ঐ স্থলে স্বচ্ছন্দে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অ'। হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি ঐ যমির উপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি ; বিনামূল্যে লইব না। তদনুসারে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) অধিকার করা গেল না, তখন আরব-বাহিনী অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। এই অবরোধ কালে হজরত আবু আইউব আনহারী (রাজিঃ) শহিদ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নগর প্রাচীরের বহির্ভাগেই কবরস্থ করা হয় ; তুরকের মহামান্ত ছোলতান ২য় মোহাম্মদ কর্তৃক কনষ্টান্টিনোপল অধিকৃত হওয়ার বহুকাল পরে এই পবিত্র সমাধি আবিস্কৃত হয় ; এবং তদানীন্তর মহামান্ত ছোলতান তথায় এক বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন। কনষ্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের মধ্যে অধুনা উহা এক বিখ্যাত মসজিদ ; আর হজরত আবু আইউব আনহারী (রাজিঃ)-
 ■ পবিত্র মাজার শরীফ ঐ মহা নগরীর সর্বপ্রধান 'যেয়াবত্-গাহ্' বা
 তীর্থস্থান।

তৎক্ষণাৎ ঐ যমির মূল্য আদায় করিয়াছিলেন। তৎপর অ' হজরতের (ছালঃ) আদেশে খজুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলা হইল। মোশরেকিনের (অংশিবাদীদিগের) কবরগুলি সমতল করিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা গেল। অ' হজরত (ছালঃ) স্বয়ং মসজিদ নির্মাণ কার্যে যোগ দিতেন। মহাজেরিন ও আনুহার (রাজিঃ)-গণ অতি উৎসাহ ও আনন্দের সহিত এই মসজিদ-নির্মাণ কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। মসজিদের 'দিওয়ার' (প্রাচীর) প্রস্তর ও মৃত্তিকা দিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল; আর ছাদে দেওয়া হইয়াছিল খেজুরের কাঠ এবং খেজুরের পাতা। যে পর্য্যন্ত মসজিদ ও ইহার নিকটে অ' হজরত (ছালঃ) এর বসবাসের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্মিত না হইল, সেই পর্য্যন্ত তিনি হজরত আবু আইউব আনসারির (রাজিঃ) গৃহে, তাঁহার অতিথি রূপে বাস করিলেন। তিনি ১১ মাস কয়েক দিন হজরত আবু আইউব আনসারির (রাজিঃ) গৃহে বাস করিয়াছিলেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই মসজিদই ইসলাম জগতের দ্বিতীয় পবিত্র উপাসনালয়; এবং সম্মান ও 'মর্তব্য' (গৌরবে) ■ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) খেলাফৎ কাল পর্য্যন্ত এই মসজিদ এই অবস্থায়ই ছিল। কিন্তু মুসল্লির (নমাজীর) সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি ইহার আকার বাড়াইয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্ন রাযনের (রাজিঃ) খেলাফৎ কালে ইহার প্রাচীর পাকা করা হয়। তিনি আর কোনও পরিবর্তন করেন নাই; কিন্তু ওম্মির বংশীয় খলিফা ওলিদ-বিন্-আবদুল মালেক ইহার সীমা অনেক বৃদ্ধি করেন, এবং আবু ওয়াজ মোতা হারাত নবুয়ী (ওম্মোল মুমেনিন [রাঃ—আঃ])-দিগের গৃহাবলীও মসজিদের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আব্বাস (রাজিঃ) বংশীয় বিখ্যাত খলিফা মামুনর রশিদ

মদিনা শরিফ ও মসজিদ নববিশিষ্ট



পাক পাজতন ১৪৪ পৃষ্ঠা।

এই মসজ্জাদের অনেক উৎকর্ষ সাধন এবং অতি উন্নতভাবে উহা সুসজ্জিত করেন।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), হজরত আবু আইউব আনুসারি (রাজিঃ) গৃহে থাকিতে থাকিতেই, যয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ) ■ আবু রাফেয় (রাজিঃ)-কে পাঠাইয়া স্বীয় দুহিতা-রত্ন হজরত ফাতেমা (রাঃ—আঃ) ও হজরত উম্মে কুলছম (রাঃ—আঃ), হজরত সওদা বিন্তে যমরা (রাঃ—আঃ), ওসামা-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ) ■ তাঁহার জননী এমিন (রাঃ—আঃ)-কে মক্কা হইতে মদীনায় আনাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আবদুল্লা-বিন্-আবিবকর (রাজিঃ) আপনাদের পরিবার বর্গ ও আত্মীয়-স্বজন লইয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন। তাল্হা-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ) ■ ঐ কাফেলার সঙ্গে মদীনায় আগমন করিলেন। পরিবারবর্গ আগমন করাতে হজরত (ছালঃ) নব-নির্মিত গৃহে গমন করিলেন।

হিজরী সনের প্রারম্ভ ।

এ যাবৎকাল বৎসর গণনার জন্ত সন নববী—অর্থঃ হজরত (ছালঃ)-এর নবুয়ত লাভের সময় হইতে একটি সন গণনা করা হইতেছিল। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) নবুয়ত লাভের এত বৎসর গত হইয়াছে! কিন্তু একথা জানা আবশ্যক যে, চাক্রমাসের নাম উহাই আছে, যাহা আরব দেশে পূর্বে হইতে প্রচলিত ছিল। এজন্ত সন নববীর প্রথম বৎসর কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। এই হেতু হজরত রেছালত পানার (ছালঃ) মদীনায় প্রবেশ রবিওল আউওল মাসে হইলেও, সন নববীর ১৪শ সাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাস গণনার হিসাবে নবুয়তের সাড়ে

বার সাল মাত্র অতীত হইয়াছিল। এইরূপে অ' হজরতের (ছালঃ) মদীনায় হেজরত করিয়া তশ্রিফ আনাতে হিজরী সাল আরম্ভ হয়। তিনি ১২ই রবিওল-আউওল মদীনা শরীফে আগমন করাতে, প্রথম হিজরী সাল মাত্র ৯ মাসেই শেষ হইয়া গেল। আর ১লা মোহাব্বরম তারিখে দ্বিতীয় সাল (সন) আরম্ভ হইল। ইহাও বুঝা চাই যে, অ' হজরত (ছালঃ) দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত হজরত আবু আইউব আনুহারির (রাজিঃ) গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

হেজরতের প্রথম বৎসর

হিজরীর প্রথম বৎসরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে মস্জিদ নববীর নির্মাণ কার্য, হজরতের (ছালঃ) বাসগৃহ নির্মাণ, মক্কার অবিশিষ্ট মোসলমানগণের মদীনায় আগমন প্রভৃতি ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় মধ্যে অ'র একটা বিশেষ ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে, হজরত আবু এমামাঃ-বিন্-আসদ-বিন্-যরা-যরারহ্ (রাজিঃ) হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইহা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হজরত আবু এমামাঃ (রাজিঃ) প্রথম হইতে পাড়িত ছিলেন না; অকস্মাৎ কোনও রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ বখন অ' হজরতের (ছালঃ) নিকট পহুছিল; তখন তিনি ফরমাইলেন 'মোশরেক' (অংশিবাদী)-দিরগ এই কথা : বলিবার সুযোগ ঘটিবে যে, এব্যক্তি কেমন রচুল যে, ইহার বন্ধুবর্গের মধ্যে একব্যক্তি হঠাৎ এইরূপে মরিয়া গেল? হজরত আবু এমামার মৃত্যুর পর বহু-নজ্জার সম্প্রদায়ের লোকেরা অ' হজরতের (ছালঃ) খেদমতে 'হাজের' হইয়া আরজ করিল যে, আবু এমামাঃ (রাজিঃ) আমাদের 'ছরদার' (নেতা বা দলপতি) ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ; এক্ষণে আপনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রূপে অপর কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমাদের দলপতি নির্বাচিত করিয়া দিন । প্রত্যুত্তরে হজরত নবী করিম (ছালঃ) বলিলেন, হে বনি নজ্জার বংশীয়-গণ ! তোমরা আমার মাতুল বংশীয় ; এক্ষণে আমিও তোমাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আমি নিজেই তোমাদের ‘নকীব’ (ছরদার) হইলাম । তচ্ছুবণে বনি-নজ্জার সম্প্রদায় অপরিমিত আনন্দ লাভ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে এই ‘আন্দেশাঃ’ (আশঙ্কা) ও দূর হইল যে, যদি অন্য কোনও ব্যক্তিকে ‘ছরদার’ ‘মকরর’ (নির্বাচিত বা নিযুক্ত) করা হইত, তবে দলের অপর কোনও প্রধান ব্যক্তি—খাহাদের ছরদারী (নেতৃত্ব বা দলপতিত্ব) লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহারা ঘোর শত্রুতাচরণ করিতেন । আর সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর যে একতা আছে, তাহা কিছু দিনের ক্রিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত । অঁ। হজরত (ছালঃ) ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করাতে উক্ত ‘কবীলার’ (গোষ্ঠীর) ‘হেম্মত’ (সাহস), একতা ও ভ্রাতৃত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ।

অঁ। হজরত (ছালঃ) মদীনার পঁহছিয়া সর্ব-প্রথমে যে বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করিলেন—‘কোশে’ (চেষ্টা) ও বস্ত্র প্রদর্শন করিলেন, উহা নগরে শান্তি স্থাপন, অধিবাসীদিগের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব দৃঢ়ীকরণ, পরম্পরের মধ্যে সৌহার্দ বর্ধন প্রভৃতি । তিনি মদীনার পঁহছিয়াই এই বিষয়ে চিন্তা ও খেয়াল করিলেন যে, মহাজেরিনদিগের দল মক্কা হইতে মদীনার আগমন করিয়াছে, উহারা যেন মদীনাবাসীদিগের জন্ত কষ্টকর, দুর্ব্বহ ভারও গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া না দাঁড়ায় ; এবং তদ্রূপ একটা অশান্তির সৃষ্টি না করে । সঙ্গে সঙ্গে একথার ও খেয়াল ছিল যে, মহাজেরিনগণ—খাহারা দিন অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুরোধে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এবং আপনাদের প্রিয় জন্মভূমি, বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-

স্বজন, ধন-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ পূর্বক মদীনায়া আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা অধিকতর 'পেরেশান' (চিন্তাকুল) ও ভগ্নমনাঃ না হইয়া যান। তদনুসারে তিনি সমুদয় আনুহার ও মহাজেরিনদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়া, ইসলামী একতা

■ ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘে এক সুমধুর ও হৃদয়-গ্রাহিনী 'ওয়াজ' (উপদেশ-মূলক বক্তৃতা) প্রদান করিলেন। আর মোসলমানদিগের মধ্যে 'মওয়াখাতা'

■ 'ভাইচারাঃ' (ধর্ম-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন) প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাজের ও আনুহার-দিগের সম্বন্ধ অতি মধুর ও প্রাণস্পর্শী করিয়া দিলেন। তদনুসারে এক এক মহাজের ও এক এক আনুহারের মধ্যে ধর্ম-ভ্রাতার পবিত্র সঙ্ঘ স্থাপিত হইল। হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) দিনি ভ্রাতা হজরত খারজাঃ-বিন্-যবির আনুহারী (রাজিঃ) হইলেন। হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ধর্ম ভ্রাতা হইলেন হজরত সত্বান-বিন্-মালেক আনুহারী (রাজিঃ)। হজরত আবুওবায়দা-বিন্-জাব্রাহ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত সায়াদ-বিন্-মাস্‌আয আনুহারী (রাজিঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইল। এইরূপ হজরত আবদুর রহমান বিন্ রযোফ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সায়াদ-বিন্ আর-রবিয় আনুহারী (রাজিঃ)-এর হজরত যোবের-বিন্-আল্ রাওয়ামের (রাজিঃ) সঙ্গে সালামাঃ-বিন্-ছালামাঃ (রাজিঃ)-এর, হজরত ওসমান-বিন্-আফ্‌ফান (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ছাবেত-বিন্-আল্ মন্যর (রাজিঃ) আনুহারীর, হজরত তান্‌হা-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ)-এর সঙ্গে কায়াব-বিন্-মালেকের (রাজিঃ), হজরত মায়াছব-বিন্-য়মরের (রাজিঃ) সঙ্গে হজরত আবু আইউব আনুহারির (রাজিঃ), হজরত এমার-বিন্ এন্নাছর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত হযিফাঃ আলিমান রাজি আল্লাহ্ আনুহর ধর্ম-ভ্রাতৃ সঙ্ঘ সংস্থাপিত হইল।

মূলকথা, এক একজন মহাজেরের সঙ্গে এক একজন আনুহারের দিনি

ভাত-সম্বন্ধ গঠিত ও দৃঢ়ীকৃত হইল । আনুহারগণ এই পবিত্র ধর্ম-ভাত, সম্বন্ধ একরূপ মনঃ-প্রাণের সঙ্গে—একরূপ উদারতার সহিত স্থাপন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত নাই । সমুদয় আনুহার, মহাজের-দ্বিগকে ঠিক আপনাদের ‘হকিকি ভাই’ (সহোদর ভাতা) রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদের অর্থ ও বিষয়-সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিলেন । কোনও কোনও আনুহার এতদূর ভাতৃত্ব ও উদারতা প্রদর্শন করিলেন যে, যাহাদের দুইটা স্ত্রী ছিল, অকৃতদার বা যাহাদের পরিবার গতানুগত্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এক একটা স্ত্রী তালুক দিয়া, এই সকল ধর্ম-ভাতার সঙ্গে তাঁহাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে মহাজেরিন ভাতাগণও আপনাদের আনুহার ভাতাদিগের মস্তকে সকল বোঝা না চাপাইয়া, নিজেরা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জন করিতে, এবং তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । অনেকে দোকানদারী ও অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন ; এবং আপনাদের দৈনন্দিন খরচপত্র নির্বাহের ভার নিজেরাই বহন করিতে লাগিলেন । ইহা দ্বারা আনুহার ভাতাদের ব্যয়ভার অনেক লঘু হইয়া গেল । মহাজেরগণ সকলেই সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল এবং কর্তব্য জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন । সুতরাং এই ধর্ম-ভাতাদিগের দ্বারা উদার-হৃদয়, কর্তব্য-পরায়ণ আনুহারগণ কোনও রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই বা কোনও রূপ অসুবিধা ভোগ করেন নাই । কষ্ট ও পরিশ্রমী মহাজেরগণ ক্রমশঃ সম্বল গৃহস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন ।

এখানে হেজরতের পূর্ববর্তী একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । সেই ঘটনাটি এই যে, অ’ হজরত (ছাল :) হেজরতের এক বংশের পূর্বে মদীনার অধিবাসীদিগের মধ্যে একটি ‘আহদনামা’ (সন্ধিপত্র) লিখাইয়া দিয়াছিলেন ; তাহাতে মদীনার মোসলমান ব্যতীত সিন্ধী এবং মোশরেক-

গণও 'শরীক' ছিল ; সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দই স্বেচ্ছায় এই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল । সকলেই এই সন্ধি-সর্ত্ত পালন করিতে আগ্রহশীল ছিল । ঐ সন্ধি-পত্রের কয়েকটি বিশেষ সর্ত্ত এই :—(১) মদীনা নগর যদি কোনও বৈদেশিক শক্তি আক্রমণ করে, তবে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মদীনার সমুদয় অধিবাসী একত্রিত হইয়া সেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে ; এবং সেই শত্রুর গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে ; (২) মদীনার যিহুদিগণ মক্কার কোরেশ কিংবা তাহাদের সাহায্যকারিগণকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিবে না । (৩) মদীনায় যে কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত অধিবাসিগণ, তত্রত্য অন্য ধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণের জীবন ও অর্থের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না । (৪) মদীনায় কোনও দুই 'ফরিক' (সম্প্রদায় বা দল) যদি পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়, আর নিজেরা তাহার বিচার-মীমাংসা করিতে না পারে, তবে উহার শেষ 'ফয়সলা' অর্থাৎ হজরত (ছালঃ) করিবেন—বাহা উভয় প্রতিপক্ষ দলের কেহই অমান্য করিতে পারিবে না । (৫) এই সর্ত্ত ও উহাতে ছিল যে, যুদ্ধের ব্যয় বহন এবং সর্বপ্রকার হিতজনক কার্যের খরচবরদারি মদীনায় সমগ্র অধিবাসী সমান ভাবে প্রদান করিবে । যে সম্প্রদায়, দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে মদীনাবাসী যিহুদিদিগের 'মওয়াহেদা' (সন্ধি-বন্ধন) আছে, আর ঐ যিহুদিগণ মদীনাবাসীর বন্ধু বলিয়া পরিগণিত, মদীনায় মোসলমান-গণ উহাদিগকে ও বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন ; এবং বন্ধুর ন্যায় তাহাদিগকে 'রেয়ায়েত' করিবেন । এইরূপে যে কবীলা (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী) মোসলমানদিগের বন্ধু, মদীনায় যিহুদিগণ তাহাদের সঙ্গেও বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবে । মদীনা শহরের মধ্যে 'খুন-খারাবী' করা হারাম (সম্পূর্ণ-নিষিদ্ধ) বলিয়া পরিগণিত হইবে । উৎপীড়িত লোকের সাহায্য করা সকলের পক্ষে ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) বলিয়া মনে করিতে হইবে—ইত্যাদি ।

এই সন্ধিটাকে পাকাপাকি করিবার পরেই হজরত রেছলিতমাব (ছালঃ) বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইলেন যে, মদীনার চতুর্দিকে যে সকল পল্লী আছে, ঐ সকলের অধিবাসীদিগকেও এই সন্ধি-বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয় । উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার অশান্তি ও শোণিতপাত একেবারে বন্ধ হইয়া যায় । তদনুসারে তিনি ‘দোদান’ পর্য্যন্ত (যে স্থান মক্কা ও মদীনার মধ্যপথে অবস্থিত), এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ‘সফর’ ফরমাইলেন এবং কবীলা (সম্প্রদায়)-বনিঃ হামযাঃ-বিন্-বকর-বিন্ আব্দে মনাফ্-কে এই সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ঐ সম্প্রদায়ের ‘ছরদার’ (দলপতি) ওমরু-বিন্-মখ্শী দ্বারা ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইলেন । ফোহ্ বুতাত-এর অধিবাসীদিগকেও এই সন্ধি-বন্ধনে ‘শরীক’ (অংশী) করিলেন । লোহিত সাগরো-কূলবর্তী ইয়ামুর দিকে বি আল-রাসিরত নামক স্থানে তিনি তশরিফ লইয়া গেলেন । আর বনি মদলজদিগের দ্বারাও এই সন্ধি-পত্রে ‘দস্তখত’ (স্বাক্ষর) করাইলেন । অ’ হজরত (ছালঃ) মদীনা মক্কাওয়ার পহুছিয়াই এইরূপ যত্ন-চেষ্টা করিলেন যে, সর্ব-সাধারণের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় ; এবং সাধারণের হিতজনক কার্যের ‘তরক্কি’ (উন্নতি) সাধন হইতে পারে ; সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা দীন এন্সলাম-কে ভালরূপে বুঝি-বার, উহার গভীর তত্ত্ব গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করে । এই মাত্র উপরোক্ত অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, আর মদীনার চতুর্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহের সকল অধিবাসী সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতেও পারিয়াছিল না, এই সময় মধ্যে মদীনা শহরে ‘খুফিয়াঃ’ (গুপ্ত বা গোপনীয়) ও মদীনার বহির্ভাগে প্রকাশভাবে শত্রুগণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল ।

মদীনা নগরে আবদুল্লা-বিন্-আবি-বিন্-সলুল নামক একজন অতি বুদ্ধিমান, বহুদর্শী, ‘হোশিয়ার’, সূচতুর রাজনীতিবিদ ব্যক্তি ছিল । আওস ও খয্রজ সম্প্রদায়ের সকল লোকের উপরই তাহার বিশেষ প্রভাব

দৃষ্ট হইত । লোকেরা ইহার নেতৃত্ব বিনা বাক্য-ব্যয়ে মানিয়া লইত ।
 আওম্ ও খদ্‌রজ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইতিপূর্বে এক গৃহ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইয়া, আপনাদের বহু বীরপুরুষের মাথা কাটাইয়া, বিলক্ষণ দুর্বল হইয়া
 পড়িয়াছিল । আবদুল্লা-বিন্-আবি এই সুযোগে নিজের বিলক্ষণ স্বার্থ
 সাধন করিয়া লইয়াছিল । সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীয় প্রভাব
 খুব বদ্ধমূল করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল । ইতিপূর্বে মদীনাবাসিগণ
 সঙ্ঘর্ষ করিয়াছিল, আবদুল্লা বিন্-আবিকে আপনাদের সর্বপ্রধান দলপতি
 কিংবা বাদশাহ নির্বাচন করিবে । আর একটা বিরাট জন-সভা আহ্বান
 করিয়া উহাতে ‘বা-কায়দা’ (যথা নিয়মে) আবদুল্লা-বিন্-আবিকে ছরদার—
 সর্বপ্রধান দলপতি বা রাষ্ট্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিবে । এমন কি,
 আবদুল্লার জন্য একটা ‘তাজ’ (মুকুট) ও তৈয়ার করা হইয়াছিল । ইতি-
 মধ্যে মদীনায় ইসলামের জলন্ত রশ্মি বিকীর্ণ হইল ; এবং ইসলামের
 প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ্ তা-লার একত্ব বিধোষক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা
 আহ্মদ মোজ্‌তবা (ছালঃ) মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । হজরত
 ‘ছারওয়ায়ে কায়েনাত’ (ছালঃ) মদীনায় প্রবেশ করিলে, মোসলমানদিগের
 শক্তিই মদীনায় প্রবল বলিয়া প্রতিভাত হইল । সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদিগের
 শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব, পূর্বোক্ত ‘আহদ নামায়’ (সন্ধি-পত্রে) স্বাক্ষরিত হওয়ায়,
 মোসলমানদিগের প্রাধান্য ■ প্রতিষ্ঠালাভ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহমাত্র
 রহিল না । সমগ্র মদীনায় ইসলামের জয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল । ইসলাম-
 সূর্য্যের আবির্ভাবে অজ্ঞান-তিমিররাশি তিরোহিত হইল । অধর্ম রূপ
 কুজ্জাটিকা কাটিয়া গেল । মদীনার অধিবাসিগণ ক্রমশঃ সত্যধর্ম ইসলামের
 দিকে আকৃষ্ট হইয়া, সাগ্রহে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । ইহার
 ফল এই হইল যে, আবদুল্লা বিন্-আবি ইব্‌নে-সোলুলের উচ্চ আশা-
 উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সমস্তই ঘোর নৈরাশ্যে পরিণত হইল । উহার বাদশাহী,

উহার ছরদারী বা একাধিপত্যের কল্পনা মাটিতে মিশাইয়া গেল । কিন্তু লোকটি অতি বুদ্ধিমান, অতি চালাক, অতি চালবাজ এবং ‘হোশিয়ার’ ছিল ; এজন্য অ’। হজরত (ছালঃ)-কে যদিও সে আপনার প্রতিদ্বন্দী ও শত্রু মনে করিত, কিন্তু ঐ দোষগীর ভাব প্রকাশ করা ক্ষতিজনক মনে করিয়া প্রকৃত মনের ভাব ও গুঢ় উদ্দেশ্য গোপন রাখিল । আওস ও খযরজ দলের মধ্যে এখনও যে সকল লোক ‘বোত-পরস্ত’ (পৌত্তলিক) ছিল ; উহারা সকলেই আবদুল্লা-বিন্-আবির অমুগত্য ও প্রধান স্বীকার করিত । মক্কার কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে, অ’। হজরত (ছালঃ-আম) এবং তাঁহার বন্ধু বা অমুগামিগণ মদীনার গিয়া নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে দিনাতিপাত করিতেছেন, আর ইসলাম ধর্মের সীমা-রেখা শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত করিয়া লইতেছেন, তখন তাহারা সর্ব প্রথমে ‘এই শরারৎ’ (বদমানী বা দাগাবাজী) এবং শরতানী ‘সাজেস্’ (ষড়যন্ত্র) করিল যে, আবদুল্লা-বিন্-আবি ও মদীনার মোশ্-রেক (অংশিবাদী বা পৌত্তলিক)-দিগের নিকট এই বলিয়া এক অমুযোগ-সূচক পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে, তোমরা আমাদের লোকদিগকে আমাদের ‘মরজির খেলাফ্’ (মতের বিরুদ্ধে) আপনাদের নগরে বসবাস করিতে দিরাছ ; তোমাদের পক্ষে কর্তব্য এই যে, তোমরা উহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর ; এবং উহাদিগকে তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া (বিতাড়িত করিয়া) দাও । যদি তোমরা এই কার্য না কর, তবে আমরা পূর্ণ সাজ-সজ্জার সঙ্গে ভীষণভাবে মদীনা আক্রমণ করিয়া, তোমাদের ‘জওয়ান’ (যুবক বা বীর পুরুষ)-দিগকে হত্যা করিব । তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমরা হস্তগত করিব । এই ‘পরগাম’ (সংবাদ) পঁছছামাত্র আবদুল্লা-বিন্-আবি সমুদয় মোশ্-রেকিন (পৌত্তলিক)-কে ডাকাইল ; এবং মক্কার কোরেশ বেদীন ও অন্যান্য কোফ্-ফারদিগের ‘পরগাম’ তাহাদিগকে অবগত করাইল, সঙ্গে সঙ্গে সকলকে

যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত, উত্তেজিত ও বাধ্য করিল। সৌভাগ্যের বিষয়, অ'। হজরত (ছাল) এই 'মজলেছ' (সভা) আহ্বান ও বড়মন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আর সমবেত জন-সভ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মক্কার কোরেশগণ তোমাদিগকে 'ধোকা' দিতে চাহিতেছে। যদি তোমরা তাহাদের ধমক (ভীতি-প্রদর্শন) ও ধোকায় পড়িয়া যাও, তবে তোমরা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তোমাদের পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করা প্রশস্ততর যে, তোমরা উহাদিগকে পরিষ্কার ভাবে প্রতিকূল উত্তর দাও, এবং আমার সঙ্গে যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তাহাতে অটল থাক ; এরূপ করিলে কোরেশগণ মদীনা আক্রমণ করিলে তাহাদের সম্মুখীন হওয়া ও যুদ্ধ করা খুব সহজ কার্য হইয়া দাঁড়াইবে ; কারণ আমাদের সঙ্গে যে সকল সম্প্রদায় ও যে সকল দল সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। কিন্তু যদি তোমরা মোসলমান-দিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে স্বহস্তে আপনাদের পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনকেই হত্যা করিবে ; সঙ্গে সঙ্গে তোমরা শোচনীয়ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অ'। হজরতের (ছালঃ) এই যুক্তিপূর্ণ উক্তি শুনিয়া সমবেত জন-মণ্ডলী তাহাতে অনুমোদন করিল, সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিপুল জন-সভ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল। আবদুল্লা-বিন্-আবি এই ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া রহিয়া গেল। স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে দারুণ মনোবেদনা পাইল।

এই বৎসরেই মুসল্লিদিগকে মস্জিদে আহ্বান করিবার জন্য আবানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। এই বৎসরেই যিহুদীদিগের একজন বিখ্যাত আলেম (ধর্ম-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত) হজরত আবদুল্লা-বিন্-ছালাম (রাজিঃ) পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। আবার এই বৎসরেই হজরত সল্‌মান

ফারছী—যিনি প্রথমে আতশ-পস্তু (অগ্নীপাসক) ছিলেন, পরে খৃষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন পূর্বক যিহুদী ও খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তৎপরাত ও ইজিপ্তে শেষ ভ্রমণবাহক আঁ হজরতের (ছালঃ) আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—হজরত রচুল আকুরমের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । আর এই বৎসরেই ‘যাকাত’ ফরজ হয় ।

হেজরতের দ্বিতীয় বৎসর ।

আঁ হজরত (ছালঃ) যখন সদলবলে নিরুদ্বেগে, অক্ষতভাবে মদীনায়া চলিয়া যাইতে সক্ষম হইলেন, এবং সেখানে গিয়া ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন কোরেশগণ আপনাদিগকে পরাজিত ও অকৃত-কার্য্য মনে করিতে লাগিল । এক্ষণে তাহাদের ‘সমগ্র কোশেশ্’ (যত্ন-চেষ্টা), সমস্ত উৎসাহ-উত্তেজনা, সমুদয় বাহ্য-অভিলাষ মোসলমানদিগের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইবার ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল । অন্য খেয়াল, অন্য চিন্তা, অন্য কল্পনা-জল্পনা তাহাদের মনে স্থান লাভ করিতেছিল না । আঁ হজরত (ছালঃ) এবং মোসলমানদিগকে হত্যা করা, ধ্বংস করার যোগাড়-যন্ত্র ও প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা, মক্কাবাসী সমুদয় কোরেশ, সর্বাপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছিল । তাহাদের সর্বপ্রকার কার্য্যের মধ্যে এই কার্য্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও অবশ্য কর্তব্য কার্য্যে পরিগণিত হইয়াছিল । এক্ষণে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে মনোবান ও মনোমানিত্ব ছিল, তাহাও দূর করিয়াছিল । সমগ্র কওম (জাতি বা সম্প্রদায়) তাহাদের সমগ্র শক্তি এই একই কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল । মক্কা ও মদীনার দূরত্ব ৩০০ মাইলের

কম ছিল না । সুতরাং, এতটা দূরে অভিযান করিতে হইলে তদুপযোগী সাজ-সজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র, উষ্ট্র-অশ্বতর ও অশ্ব প্রভৃতি পশুর দল এবং উপযুক্ত পরিমাণ রসদের যোগাড় করাও আবশ্যক ছিল । পশ্চিমধ্যে যে সকল জাতির বাস, তাহাদিগকে এবং আরবের অন্যান্য জাতিকে আপনাদের সাহায্যকারী, কমপক্ষে সহায়ভূতি সম্পন্ন করারও একান্ত প্রয়োজন ছিল । এই ভাবী ‘খতরাঃ’ (আশঙ্কা) সম্বন্ধে হজরত (ছালঃ) ও একজন সুপরিপক ছরদার (দলপতি) এবং ভবিষ্যদ্বশী সূদক্ষ সেনাপতির দ্বারা দৃঢ়ভাবে উক্তি ফরমাইয়াছিলেন । খোদা তা-লা হইতে আত্মরক্ষা, ‘খোদ-এখ-তেয়ারি’ (স্বাধীনতা) ও শত্রুর গতিরোধের আদেশ-পূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল । দিন এসলামের প্রচার ও বিস্তৃতি, দিন-এসলামে প্রবেশকারীদিগের রাস্তার অন্তায় রূপে প্রতিবন্ধকতা দূর করাও একান্ত কর্তব্য কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । এই সময় মদীনা শরীফে ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষের সংখ্যা তিন চারি শতের অধিক ছিল না । মোসলমানগণ যদিও সংখ্যায় এবং অস্ত্র শস্ত্রে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন, কিন্তু কাফেরদিগের ‘ফেরেব—ফন্দী’ ‘দাগাবাজী’ ■ অত্যাচার-উপদ্রব দেখিয়া, তাহাদের আরবীয় সাহস ■ ‘সোজায়েত’ (শোখা-বীখ্য) উদ্বেলিত হইয়া উঠিত । আর তাহারা পুনঃ পুনঃ কাফেরদিগের সম্মুখীন হইতে এবং তরবারি ■ তীর দ্বারা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য হজরত রেছালতগাদের (ছালঃ) অনুমতি প্রার্থনা করিতেন । কিন্তু আ হজরত (ছালঃ) সর্বদাই তাহাদিগকে ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে এবং ‘খামুশ (নীরব) থাকিতে উপদেশ প্রদান করিতেন । এক্ষণে যখন জীবন্ত ইসলাম ধর্মের—ঈমানের শক্তি, পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইল, আর মোসলমানগণ সর্বপ্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা, বিঘ্ন-বিপদ সহ্য করিয়া দুনিয়ার (পৃথিবীর) সম্মুখে এই ‘ছবুত’ (প্রমাণ) উপস্থাপিত করিলেন যে, তাহারা এসলামে আসক্ত ও অনুরক্ত, তাহারা কোনও প্রকার

‘খওক (ভয়) ও ‘লালচ্ (প্রলোভন) এর সঙ্গে কোনও রূপ সম্বন্ধ রাখে না । তদনুসারে ঐ সময় দুই লোকদিগকে শাস্তি প্রদান ও আপনাদের হেফাজৎ আপনাদিগকে করিবার জন্য আল্লাহ তা-লার আদেশ অবতীর্ণ হইল । তাহা হইলেও ঘটনার ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) সর্বদাই যুদ্ধ হইতে সন্ধিকে, এবং প্রতিশোধ গ্রহণাপেক্ষা অত্যাচার সহ্য করাকে ‘পছন্দ’ করিতেন ।

করয্-বিন্-জাবের নামক মকার এক কাকের ছরদার (নেতা) একদা একদল লোক লইয়া মক্কা হইতে মদীনা মনুওয়ার পার্শ্ববর্তী এক চেরাগাঃ (পশু চারণ ভূমি) আক্রমণ .পূর্বক, মোসলমানদিগের বহুসংখ্যক উষ্ট্র ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল । মোসলমানগণ যখন এই ‘ছাপ্পা মারার’ (পশু ধরিয়া লইয়া যাইবার) সংবাদ পাইলেন, তখন ঐ লুঠকারিদিগের পশ্চাৎদ্রাবন করিয়া “ ছফ্-ওয়ান ” নামক স্থান পর্যন্ত গমন করিলেন ; কিন্তু উহারা খুব দ্রুতগতি পলায়ন করিয়াছিল ; এজন্য তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া অগত্যা ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন । ইহা মক্কাবাসিদিগের পরিষ্কার ও খোলাখুলি ধম্বকি (ভীতি-প্রদর্শন) এবং মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা ছিল । তাহারা মদীনাবাসাদিগকে ইহা জানাইয়া বা বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, আমরা সুদীর্ঘ ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম পূর্বক তোমাদের পশুপাল কিংবা অন্ত্রাণ ‘মাল-আস্বাব’ (সামগ্রী-সম্ভার) লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারি । তদ্ব্যতীত অন্ত্র ‘তদ্বির’ (যোগাড়) হইতে তাহারা ‘গাফেল’ নিশ্চেষ্ট ছিল না । উহারা একদিকে আবছল্লা-বিন্-আবি ও মদীনাবাসী যিহুদীদিগের সঙ্গে সর্বদা পত্র-ব্যবহার করিতেছিল । আর তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে মোসলমানদিগের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল । এই বৎসরই শাবান মাসে খোদা তা-লার পক্ষ

হইতে কেবলার (কাবাভিমুখীন হইরা নমাজ পড়ার) আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল । আর ইহার কয়েক দিন পরে, শ'বান মাস শেষ হইতে না হইতে রমজানের রোজা 'ফরজ' হইল বলিয়া আদেশ 'নাযেল' হইল । রমজানের প্রারম্ভেই এই সংবাদ মদীনা মনুওয়ার পহুছিল যে, মক্কা-‘ওয়ালা’-দিগের এক ‘কাফেলা’ (বণিক দল) বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া শাম (সিরিয়া) প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে । সেই কাকেলা মদীনা নগরের নিকট দিয়াই চলিয়া যাইবে । অ’ হজরত (ছালঃ) মক্কাবাসী মোশ্-রেক-দিগের উপর ‘দাবাও ডালিবার’ (প্রভাব বিস্তার) জন্ত, এবং করব্-বিন্ জাবেরের পশুপাল লুঠিয়া লইবার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ মহাজেরিন আন্-ছারদিগের একদল যোদ্ধাপুরুষ এই উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন, যেন তাহারা মক্কাবাসীদিগের ঐ কাফেলা অবরোধ করে । উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার পৌত্তলিকগণ বুক, মদীনাবাসিদিগের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করা উহাদের বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি-জনক ; এবং তদ্বারা তাহাদের সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে । এই মোস্লেম-যোদ্ধাপুরুষ-দিগকে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পাঠান হইয়াছিল না ; বরং উদ্দেশ্য ভীতি-প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতের সতর্কীকরণ ছিল । এজন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণকালে সামরিক সাজ-সজ্জার ও কোন বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল না । ফল এই হইল যে, মক্কা-ওয়ালাদিগের কাফেলা, মোসলমানদিগের এই যোদ্ধা দল রওয়ানা হইবার সংবাদ তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিল ; এবং কাফেলার আমীর অর্থাৎ দলপতি আবু হুফিয়ান, রাস্তা পরিবর্তন করিয়া আপনার কাফেলা বাঁচাইয়া ভিন্ন পথে চলিয়া গেল । সে পথিমধ্যে মম্বম্-বিন্-ওমর গফ্ফারিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া মক্কায় কোরেশদিগের নিকট প্রেরণ করিল, এবং বলিয়া পাঠাইল, আমাদিগের কাফেলা মোসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা ; সুতরাং আমাদিগকে সাহায্য করিতে

অগ্রসর হও, এবং আপনাদের বাণিজ্য দ্রব্যগুলি রক্ষা কর । যম্বুম্-বিন্ ওমরু-গফ্ফারি দ্রুতগতি মক্কার গমন পূর্বক এই সংবাদ প্রদান করিল । সংবাদ পাইবামাত্র কোরেশদিগের অন্যতম নেতা ও মোসলমানদিগের পরম শত্রু আবুজ্জহল তাড়াতাড়ি প্রায় ১০০০ এক হাজার পরাক্রান্ত যোদ্ধাপুরুষ—যাহার মধ্যে ৩০০ অশ্বারোহী ও ৭০০ উষ্ট্রারোহী সৈন্য ছিল) লইয়া বড়ই ‘জোশখরুশ’ (উৎসাহ-উত্তেজনা ও আড়ম্বর)-এর সহিত মক্কা হইতে বাহির হইল ; এই সকল যোদ্ধা তৎকালোচিত সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সকলেই ‘যরাহ্-পোষ’ (লোহ-বর্ণাবৃত) ছিল । গানেওয়াল (রণ-সঙ্গীত গায়ক) ও সংবাদ-পাঠক এক এক দল লোকও তাহারা সঙ্গে লইয়াছিল । আব্বাস্-বিন্-আবদুল মোত্তালেব, ওক্বাঃ-বিন্-রাবিয়াঃ, ওম্মিয়া-বিন্খলফ্, নবর-বিন্-হারেছ, আবুজ্জহল বিন্-হেশাম প্রভৃতি তের জন লোক এই প্রবল বাহিনীর খাতিয়াদ প্রস্তুত কারক ও সরবরাহকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল । অবশ্য অন্যান্য পরিচারক ও ক্রীতদাসগণ তাহাদের সাহায্য করিত । ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ানের পরিচালিত তেজস্বতি কাফেলা নির্ঝিল্লৈ সরিয়া গেল, তাহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন জন্য যে সকল মহোজ্জেরিন ও আন্ছার মদীনার বাহিরে গিয়াছিলেন, তাহারাও নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । আবুজ্জহলের মক্কা পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই আবুসুফিয়ান মক্কার উপস্থিত হয় ; এবং তাড়াতাড়ি আবুজ্জহলকে সংবাদ পাঠায় যে, আমরা নির্ঝিল্লৈ মক্কার প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি, তোমরা শীঘ্র ফিরিয়া চলিয়া আইস । কিন্তু আবুজ্জহল স্বীয় পরাক্রান্ত বাহিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া, অহঙ্কারে এমনই মত্ত হইয়াছিল যে, তাহার একথা ‘গওয়ারাঃ’ (মনঃপূত) হইল না যে, এত বড় প্রবল পরাক্রান্ত সেনাদল লইয়া, মদীনাহ মোসলমানদিগকে

সম্পূর্ণ নির্যাতিত না করিয়া প্রত্যাবর্তন করে । প্রকৃত পক্ষে আবুজহল কেবলমাত্র কাফেলা রক্ষার্থেই একরূপ সুসজ্জিত প্রবল বাহিনী লইয়া মদীনাভিমুখে গমন করিয়াছিল না ; বরং ইত্যগ্রে ওমর-বিন-হুযায়িম নামক এক ব্যক্তিকে, কোরেশদিগের শত্রু কতিপয় মোসলমান হত্যা করিয়াছিলেন ; এই ব্যক্তি কোরেশদিগের গুপ্তচর রূপে মদীনার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; এই সংবাদ পাইয়াই হজরত (ছালঃ) কতিপয় মোসলমানকে ঐ গুপ্তচরকে ধৃত বা বিতাড়িত করিবার জন্য " বতন-নখ্‌লার " দিকে পাঠাইয়াছিলেন ; তাঁহাদের হস্তেই ঐ ব্যক্তি নিহত হয় ; আবুজহল ঐ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার 'বাহানা'র যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল । আর সে যখন মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য রওয়ানাই হইতেছিল, ঠিক ঐ সময়ে যম্বম-বিন-ওমর গফ্‌ফারি, কাফেলাওয়াল দিগের পক্ষ হইতে সাহায্য প্রার্থনার সংবাদ লইয়া মকায় পৌঁছছিল । এক্ষণে আবুজহল—যে ব্যক্তি প্রথম হইতেই মদীনার মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল—দ্রুতগতি সসৈন্যে মদীনাভিমুখে ধাবিত হইল । সে সসৈন্যে কূচ করিতে করিতে দ্রুতগতি মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । কোরেশদিগের এই প্রবল অভিযানের সংবাদ হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) জানিতে পারিলেন, এবং ইহাও অবগত হইলেন যে, আবুজহল, ওকবাঃ, শয়েবাঃ, অলিদ, হন্বলাঃ, আবিদাঃ, আছি, হরছ, তারেমাঃ, বমআ, আকিল, আবুল নজ্‌তরি, মসুদ, আবু কায়স, মনবীয়াঃ, মনবাঃ, নওফল, ছায়েব, রফায়া প্রভৃতি সমুদয় বড় বড় ছরদার (দলপতি) কোরেশদিগের ঐ সেনাদলের সঙ্গে আছে ।

বদরের মহাযুদ্ধ ।

হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ পাইবামাত্র এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন ; এবং সেই সভায় ছাহাবায়-কারাম (রাজিঃ) দিগকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, মক্কা আপনার হৃৎপিণ্ড স্বরূপ বাছা বাছা বীরপুরুষদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছে ; তাহাদের সঙ্গে ‘মোকাবেলা’ (যুদ্ধ) করা সম্বন্ধে তোমাদের কি মত ? সর্বপ্রথমে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), পরে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), তৎপর হজরত মেকদাদ (রাজিঃ) অত্যন্ত বীরত্ব-ব্যঞ্জক ও ‘বাহাদুরী’-মূলক বাক্য প্রকাশ পূর্বক বলিলেন, আমরা বনি এশ্রাইলদিগের মতন নহি ; বাহারা মুসা আলায়হেস্ সালামকে বলিয়াছিল যে, “ফায্‌হাব আস্তা ও রাব্বোকা ফাকাতেলা ইম্মাহা হাছনা কামেছুন ” তুমি ও তোমার রব (প্রভু—আল্লাহ্ তা-লা) গিয়া যুদ্ধ কর, আমরা ত এখানে বসিয়া তামাসা দেখিব । ইহার পর হজরত রেছালতমাব্ (ছালঃ) আবার ফরমাইলেন, হে লোক সকল, ঐ কোক্‌ফারদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে তোমরা কি পরামর্শ দান কর ? এই দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, আন্‌ছারদিগের অভিপ্রায়ও ত জানা আবশ্যক । পূর্বোক্ত মত ত কেবলমাত্র তিনজন মহাজেরিনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন । আন্‌ছারগণ হইতে যে বিষয়ে বায়্‌য়েত গ্রহণ করা হইয়াছিল, উহার মর্ম্ম এই ছিল যে, মদীনার উপর যখন কোনও বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হইবে, তখন সেই শত্রুর সঙ্গে তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন ; এরূপ সর্ত্ত ছিল না যে, মদীনা হইতে বাহির হইয়া কোনও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে । আন্‌ছারগণ হজরতের (ছালঃ) উক্তির মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন । তদন্তসারে তাঁহাদের মধ্য হইতে হজরত ছায়াদ-বিন্-মায়াব্ (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া আরজ করিলেন, হজুর সম্ভবতঃ আমাদিগকে

লক্ষ্য করিয়াই শেষোক্ত উক্তি করিয়াছেন ; হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, তোমাদের মতামত জানিবার জন্যই আমি ঐ কথা বলিয়াছি। তখন হজরত ছায়াদ-বিন্-মারাব্ (রাজিঃ) আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ ! আমরা আপনার উপর ঈমান আনিয়াছি ; আপনাকে খোদার রছুল বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেছি, একপ ক্ষেত্রে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, খোদার রছুল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবেন, আর আমরা ঘরে বসিয়া থাকিব ? এই কাফেরগণ ত আমাদের মতনই মানুষ ; আমরা কেন উহাদিগকে ভয় করিব ? আপনি যদি আমাদিগকে আদেশ করেন যে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়, আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিব। বখন হজরত (ছালঃ) এর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সমুদয় ছাহাবা (রাজিঃ) শত্রুদলের সম্মুখীন হইবার জন্য এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত ও প্রস্তুত, তখন তিনি মদীনা হইতে যুদ্ধার্থ রওয়ানা হইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার এবং যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা তিনশত দশ, তিনশত বার, কিংবা তিনশত তের জন মাত্র ছিল। নগরের বহির্ভাগে গিয়া তিনি একস্থানে এই মোস্লেম যোদ্ধাদের সংখ্যা গণনা করিলেন ; তাহাতে সেই তিনশত দশ বার বা তের জনের মধ্যে কয়েকজন অপরিণত বয়স্ক বালক বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা এত অল্প বয়স্ক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার উপযুক্ত নহে। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) উহাদিগকে নিতান্ত তরুণ বয়স্ক দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় বালক বা একেবারে তরুণ যুবক যুদ্ধে যাইবার একান্ত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হজুরে অন্তিমতি প্রার্থনা করাতে, অগত্যা তাহাদিগকে সৈন্যদলে থাকিতে দেওয়া হইল ; অবশিষ্ট কতিপয় বালক গৃহে ফিরিয়া গেল। এই ইসলামী

সৈন্যদলের সাজ-সজ্জা এইরূপ ছিল—দুইটি মাত্র অশ্ব, তাহার একটীতে হজরত যোবের (রাজিঃ) আর একটীতে হজরত মেফদাদ (রাজিঃ) আরোহণ করিয়াছিলেন। সত্তরটি উট ছিল, প্রত্যেক উটে ৩ জন ৪ জন করিয়া যোদ্ধাপুরুষ আরুঢ় ছিলেন। যে উষ্ট্রে হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) আরোহণ করিয়া ছিলেন, উহাতেও আর দুইজন আরোহী ছিলেন। তদ্ব্যতীত কেহ কেহ পদব্রজেও গমন করিতে-
 ছিলেন। এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল " বদর " নামক স্থানে পহুঁছিয়া দেখিতে
 পাইলেন, মক্কার কোফ্ফারগণ প্রথম হইতে এক উচ্চ ভূ-খণ্ড অধিকার
 করিয়া তাহাতে তাহু ফেলিয়া বাস করিতেছে। কাজেই মোসলমানদিগকে
 বালুকাময় নিম্ন-ভূমিতে অবস্থান-স্থান নির্বাচন করিতে হইল। কিন্তু
 বদরে যে সকল চশ্মাঃ (ঝরণা বা নিঝরিণী) ছিল, তাহা মোসলমান-
 দিগের অধিকারে আসিয়া গেল। হজরত (ছালঃ) আদেশ প্রচার
 করিলেন, শত্রুপক্ষের লোকেরা চশ্মাঃ হইতে পানী লইতে আসিলে
 তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিবে না ; অবোধে পানী লইয়া যাইতে দিবে।
 ছাহাবা (রাজিঃ)-গণ হজরত (ছালঃ)-এর অবস্থান জ্ঞাত একটি ক্ষুদ্র
 'ঝুপড়ি' (কুটীর বা পর্ণশালা) প্রস্তুত করিয়া দিলেন ! তিনি তাহাতে
 বসিয়া এবাদৎ এবং প্রার্থনা করিতেন। ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ সংখ্যায়
 কোরেশদিগের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ছিলেন। আর তাঁহাদের যুদ্ধের সাজ-
 সরঞ্জাম কোরেশদিগের একশত ভাগের : একভাগও ছিল না। কোফ্ফার-
 দিগের সকলেই দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ, নামজাদা বীরপুরুষ এবং ঘরাঃপোষ (বর্ষাবৃত)
 ছিল। মোসলমানগণ সাধারণতঃ 'ফাকাঃযাদাঃ' (ক্ষুধাতুর), 'না তোয়ান,' রুগ্ন
 ও দুর্বল ছিলেন। সাধারণ যুদ্ধান্ত্র ও পূর্ণভাবে তাঁহাদের নিকট ছিল না।
 কাহারও নিকট তলোয়ার ছিল না নেযাঃ (বল্লম বা বড়শা) কিংবা তীর-
 ধনুক ছিল না ; কাহারও নিকট কেবলমাত্র তীর ধনুক ছিল, কিন্তু

তরবারি বা নেজা ছিল না। পক্ষান্তরে ‘কোফ্‌ফার’ কোরেশগণ সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তাহাদের কোনও প্রকার অস্ত্রেরই অভাব ছিল না। তাহাদের বলবান্ অশ্বগুলি আরবের উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উষ্ট্র সংখ্যায় যেমন অধিক, তেমনই সবল ও তেজোগামী ছিল। যখন মোসলমানগণ বদরের এক প্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, সেই সময় কোফ্‌ফারগণ মোসলেম সেনাদলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সংখ্যা নির্ণয় জন্য যমির-বিন্-দহব জমহিকে গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করিল। যমির গুপ্তচররূপে মোসলমান যোদ্ধাগণের অবস্থা ও সংখ্যা নির্ণয় করিয়া গিয়া বলিল, মোসলমানদিগের সংখ্যা ৩ শত ১০ জনের অধিক নহে, আর তাহাদের মধ্যে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী। কাফেরদিগের অহংকার ও আত্মস্তম্ভিতার পরিমাণ ইহা দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মোসলমান সৈন্য-সংখ্যার অল্পতা ও যুদ্ধ-সরঞ্জামের অভাবের বিষয় অবগত হইয়া ওক্‌বাঃ-বিন্-রবিয়াঃ বলিয়া উঠিল, এত অল্পসংখ্যক লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দরকার নাই, আমাদের বিনা যুদ্ধেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা উচিত ; কারণ আমাদের সংখ্যা অনেক অধিক। কিন্তু আবুজহল উহার প্রতিবাদ করিয়া কহিল, উহাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অবশেষে আগামী দিবস ১৭ই রমজান অল্-মবারক (২২ হিজরীতে) যুদ্ধক্ষেত্র গরম হইল—উভয় দলে পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইয়া গেল। অঁ। হজরত (ছালঃ) প্রথমতঃ নিজের সেই ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রন্দন করিতে করিতে আল্লাহ্ তায়ালায় মহাদরবারে এই ‘দোওয়া’ (প্রার্থনা) ও ‘আরজ’ (বিনীত নিবেদন) করিতে লাগিলেন :—

হে দয়াময়-করুণা-সিন্ধু-আল্লাহ্ তা-লা যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটির ধ্বংস সাধন কর, তবে পৃথিবীতে তোমার ‘এবাদত’ (উপাসনা) করিবার জন্য কেহই (অবশিষ্ট) থাকিবে না। তৎপর তিনি দুই রেকায়াত নমাজ পড়িলেন।

অতঃপর অলক্ষণের জন্য তাঁহার ভাবাবেশ হইল । ইহার পর তিনি মুচ্ছি হাসির সঙ্গে সেই কুটীর হইতে বাহির হইলেন ; এবং প্রফুল্ল ভাবে ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ)-দিগের নিকট ফরমাইলেন, যুদ্ধে কোফ্ফার সৈন্যদিগের পরাজয় ঘটিবে ; আর তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে ।

অ' হজরত (ছালঃ) মোসলমানদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা প্রথমে যুদ্ধারম্ভ করিবে না । মোসলমানদিগের মধ্যে ৮০ হইতে ৮৩ জন পর্য্যন্ত মহাজেরিন, অবশিষ্ট সকলেই আন্ছার ছিলেন । আব্বাস আন্ছারদিগের মধ্যে ৬১ জন ছিলেন আওস সম্প্রদায় ভুক্ত । আর খব্রজ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন ১৭০ জন । দুই দলের সৈন্যগণই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল । অ' হজরতের (ছালঃ) হাতে একটি তীর ছিল । তিনি তদ্বারা 'এশারা' (ইঙ্গিত) করিয়া স্বীয় যোদ্ধাপুরুষদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছিলেন । ইহার পর আরবীয় যুদ্ধের নিয়মাত্মসারে কোফ্ফার দলের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ রবিয়ার পুত্র ওত্বা ও শয়িয়েবাঃ এবং অলিদ-বিন্-ওত্বাঃ সর্বপ্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল । আর মোসলমান যোদ্ধাপুরুষদিগের মধ্য হইতে ৩ জনকে যুদ্ধার্থে আগমন করিবার অতি দৰ্প সহকারে আহ্বান করিল । ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার আন্ছার দল হইতে যয়োফ্ (রাজিঃ) ও যায়যাব্ (রাজিঃ) নামক আদ্রাআর পুত্রদ্বয় এবং আবদুল্লা-বিন্ রওয়াহা (রাজিঃ) বাহির হইলেন । তদর্শনে ওত্বাঃ বলিল "মান্-আন্তুম" তোমরা কে হও ? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন "দহ তুন্মিনাল্ আন্ছারে"—আমরা আন্ছার অর্থাৎ মদীনাবাসী । ওত্বা নিতান্ত গর্কিত ■ তাচ্ছিল্য ভাবে কহিল, "মাশ্না বেকুম মান্ হাজ্জতাঃ" তোমাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই । পরে উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করিয়া বলিল, "এয়া মোহাম্মদ (ছালঃ)

আখ্‌রজালেনা আক্‌ফা আনা মিন্‌ কওমনা ” হে মোহাম্মদ (ছালঃ)
 আমাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের যাত বেবাদরি (স্বজাতীয়
 ■ স্ববংশীয়)—অর্থাৎ কোরেশদিগের মধ্য হইতে মহাজেরিনদিগকে
 পাঠাও । তচ্ছ্রবণে অঁ। হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, ওত্‌বার সঙ্গে
 যুদ্ধ করিবার জন্য হামযাঃ-বিন্‌-আবদুল মোস্তালেব, (রাজিঃ), ওত্‌বার
 ভ্রাতা শরিবার বিরুদ্ধে ওবাদাঃ-বিন্‌-আল্‌ হরছ (রাজিঃ), আর ওত্‌বার
 পুত্র অলিদের বিরুদ্ধে আলী-বিন্‌-আবিতালেব (রাজিঃ) গমন করুক ।
 এই আদেশ প্রাপ্তিমাতে উপরোক্ত তিনজন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) মহোৎসাহে
 ও মহোন্মাদে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন । ওত্‌বাঃ ইহাদের ■ জনেরই
 নাম জিজ্ঞাসা করিল—যদিও সে ইহাদিগকে বিশেষ ভাবেই চিনিত ।
 তাঁহারা স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিলে সে বলিল, হাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমরা
 অবশ্যই যুদ্ধ করিব । দেখিতে দেখিতে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল ।
 হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত আলী (রাজিঃ)—পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র,
 তরবারির এক এক আঘাতেই ওত্‌বাঃ ও অলিদ—পিতা পুত্র উভয়কেই
 ‘কতল্‌’ (নিহত) করিয়া ফেলিলেন । শরীয়েরার সঙ্গে যুদ্ধে হজরত ওবেদাঃ
 (রাজিঃ) যখ্‌মি (আহত) হইলেন ; তিনি অতি ভীষণ ভাবে আহত হইয়া-
 ছিলেন ; সে আঘাতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না । অল্পকাল মধ্যেই
 তিনি রণক্ষেত্রে শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন । তদর্শনে খোদার শাদ্দুল হজরত
 আলী (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে
 শরীয়েরার মুণ্ডপাত করিলেন ; এবং হজরত ওবেদাঃ (রাজিঃ) কে আনিয়া
 অঁ। হজরতের খেদমতে উপস্থিত করিলেন । ইহার পর কোফ্‌ফার
 শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মোসলমান বোদ্ধপুরুষদিগকে আক্রমণ করিল । ওদিকে
 মোসলমানগণও সাধারণ ভাবে শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন । এক্ষণে
 উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । উভয় সৈন্য দল পরস্পর মিশ্রিত

হইয়া পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল । উভয় প্রতিপক্ষ দলই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কিছুকাল যুদ্ধ করিবার পর কোফ্‌ফার আপনাদের ৭০ জন বীরপুরুষকে নিহত ও ৯০ জনকে বন্দী হইবার সুযোগ প্রদান পূর্বক পলায়ন করিল । যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে অ' হজরত (ছালঃ) একটীছত্র বা শামিয়ানার নীচে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতেছিলেন এবং 'মোজাহেদীন' (ধর্মযোদ্ধা)-দিগকে আবশ্যক মত সময়োচিত আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন । তিনি মোসলমানদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, বহু-হাশেমের মধ্যে বাহারা কোরেশদিগের দলে মিশিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহারা স্বৈচ্ছার যুদ্ধ করিতে আইসে নাই, তাহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া আসিতে হইয়াছে ; সুতরাং উহাদের প্রতি 'রেয়ায়েত' (ক্ষমা) করা চাই । আর আব্বাস বিন্-আবদুল মোত্তালেবকে যেন হত্যা করা না হয় । এইরূপে আবুল বখ্তরি সম্বন্ধে 'দরগোযর' (দয়া প্রদর্শন) এবং 'রেয়ায়েত' করিতে আদেশ দিয়াছিলেন । হজরতের এই আদেশ শুনিয়া আবু হোযায়ফাঃ (রাজিঃ) বলিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, আমি আমার ভ্রাতাকে হত্যা করি, আর আব্বাসকে ছাড়িয়া দিই । যদি আব্বাস যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হয়, আমি তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিব না । পরে এইরূপ উক্তির জ্ঞাত আবু হোযায়ফাঃ (রাজিঃ) বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং এরূপ উক্তি অন্তায় বলিয়া স্বীকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । মখদর-বিন্-যেয়াদ (রাজিঃ) আবুল বখ্তরির 'মোকাবেলা' (সম্মুখীন) হইলে, মখদর (রাজিঃ) তাহাকে বলিলেন, আমাদের প্রতি আদেশ আছে, তোমার সঙ্গে যেন যুদ্ধ না করি, অতএব তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও । আবুল বখ্তরি তাহার একজন সঙ্গীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল—যাহাকে

মখ্‌দর-বিন্-যেয়াদ (রাজিঃ) কতল (হত্যা) করিতে চেষ্টা পাইতে-
 ছিলেন ; সেই উদ্ভূত অস্ত্রের আঘাতে আবুল বখ্তরি ‘মকতুল’ (নিহত)
 হইল । ওম্মিয়া-বিন্-খলফ্ এবং উহার পুত্র আলী-বিন্-ওম্মিয়া যুদ্ধের
 প্রথরতা ও মোসলমানদিগের সাফল্য দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব জীবন রক্ষার
 জন্য রণক্ষেত্রের ইতস্ততঃ দৌড়িয়া ফিরিতেছিল, ওম্মিয়া ও হজরত আবদুর
 রহমান বিন্-য়য়োফের (রাজিঃ) সঙ্গে ইমলামের পূর্ববর্তী অবস্থায় বড়ই
 বন্ধুত্ব ছিল ; হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ) ওম্মিয়াকে বড়
 ব্যস্ত সমস্ত এবং ভীতও আতঙ্কিত দেখিয়া আপনার ‘হেফাযতে’ (তত্ত্বাবধানে)
 গ্রহণ করিলেন ; আর ওম্মিয়ার হস্ত ধারণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন ।
 কিন্তু হজরত বেলাল (রাজিঃ) ইহা দেখিতে পাইয়া কতিপয় আনুহারকে
 উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া নিজের দিকে ‘মতওজ্জ’ (তাঁহার প্রতি তাঁহাদের
 মনোযোগ আকর্ষণ) করিলেন ; তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া ওম্মিয়া
 আলীকে হত্যা করিতে চাহিলেন ; হজরত আবদুর রহমান বিন্-য়য়োফ্
 (রাজিঃ) তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু
 হজরত বেলাল (রাজিঃ), তাঁহার অনুরোধ উপরোধ কিছুতেই রক্ষা করিলেন
 না ; পিতা-পুত্র উভয়কেই কতল করিয়া ফেলিলেন । হজরত রমির-বিন্-
 আল্-হমাম আনছারি (রাজিঃ) খেজুর থাইতে থাইতে আঁ হজরতের (ছালঃ)
 সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আমি কাফেরদিগের
 সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু-মুখে পতিত হই, তবে কি তৎক্ষণাৎ জন্নতে
 (বেহেশতে) চলিয়া যাইব ? আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, হাঁ—নিশ্চয়ই ।
 তিনি তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত অবশিষ্ট খেজুর ফেলিয়া দিয়া, তরবারি নিক্ষেপিত
 করিয়া, সমর-মাগরে বাষ্প প্রদান করিলেন ; আর শত্রুদলের সঙ্গে ভীষণ
 ভাবে যুদ্ধ করিয়া শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন । যখন যুদ্ধ খুব ভীষণভাবে
 চলিতেছিল, সেই সময় আঁ হজরত (ছালঃ) একমুষ্টি মৃত্তিকা হস্তে

লইয়া, এবং উহার উপর 'দম্' করিয়া (কিছু দোওয়া পড়িয়া) কাফেরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, ঐ সময়ই কোরেশ সৈন্যদল পলায়ন আরম্ভ করিল। হজরত মায়ায্-বিন্-ওমরু আনছারী (রাজিঃ) নামক একজন তরুণ বয়স্ক যুবক, কোরেশ দলের প্রধান সেনাপতি সুবিখ্যাত বীর আবু জহলের সম্মুখীন হইলেন। আবুজহল যরাহপোষ (বর্ম পরিহিত) ও দুর্ভেদ্য লৌহ দ্বারা বিমণ্ডিত ছিল ; হজরত মায়ায্-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) সুযোগ পাইয়া এবং তাহার পায়ের নিম্ন-ভাগ বর্মশূন্য দেখিয়া পায়ের গিরার নিম্নভাগে এমন সজোরে তরবারির আঘাত করিলেন যে, তাহার পায়ের গিরা হইতে নিম্ন-ভাগ ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়া পড়িল ; আবু জহলের পুত্র আকরমা এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া মায়ায্-বিন্-ওমরু (রাজিঃ)-কে আক্রমণ করিল ; এবং এমন সবলে তাহার প্রতি তরবারির আঘাত করিল যে, তাঁহার বাম হাতের গোড়া (বাহমূল) পর্যন্ত কাটিয়া গিয়া খানিক চামড়ায় আটকাইয়া বুলিতে লাগিল ; হজরত মায়ায্-বিন্-ওমরু (রাজিঃ) সারাদিন এই অবস্থায় যুদ্ধ করিলেন। অল্প চামড়ার দ্বারা লট-কানো হাতখানা যুদ্ধের বিষম প্রতিবন্ধক এবং অত্যন্ত অসুবিধাজনক বোধ হওয়াতে, তিনি হাতখানি পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া খুব জোরে বাটকা দিয়া 'আলাহেদা' (ছিন্ন) করিয়া ফেলিলেন ; এবং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আবুজহলের ঐ অবস্থার পর মায়ায্-বিন্-গারু (রাজিঃ) নামক একজন আনছার যুবক উহার নিকটে পহুছিয়া এমন সজোরে তরবারির এক আঘাত করিলেন যে, সে ভীষণভাবে আহত হইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থাপন্ন হইল। তখন কাফেরগণ যুদ্ধক্ষেত্র খালি করিয়া মোসলমানদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল—মোস্লেম সেনাদল জয়ী হইলেন, এবং তাঁহারা বিজয়ী বেশে আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকটে পহুছিলেন, তখন তিনি আদেশ করিলেন, আবুজহল সম্বন্ধে এই অনুসন্ধান কর যে, উহার মৃতদেহ

যুদ্ধক্ষেত্রে ‘মওজুদ’ আছে কিনা ? এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র হজরত আবদুল্লা-বিন-মসযুদ (রাজিঃ) নিহত কোরেশদিগের মৃতদেহগুলি দেখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন । আবুজহলের নিকট গিয়া দেখিলেন, সে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে । তদর্শনে আবদুল্লা-বিন-মসযুদ (রাজিঃ) উহার প্রশস্ত বক্ষোপরি চড়িয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, হে খোদার দোস্তগ (আল্লাহ তা-লার শত্রু) দেখ, খোদা তা-লা তোমাকে কেমন ‘বলিল’ (অপদস্থ) করিয়াছেন । আবুজহল জিজ্ঞাসা করিল, যুদ্ধের পরিণাম ফল কি হইয়াছে ? হজরত আবদুল্লা-বিন-মসযুদ (রাজিঃ) বলিলেন, মোসলমানদিগের ‘ফতেহ্’ (জয়) ও কাফেরদিগের ‘হযিমৎ’ (পরাজয়) ঘটিয়াছে । ইহার পর হজরত আবদুল্লা-বিন-মসযুদ (রাজিঃ) বধন উহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উত্তত হইলেন, তখন আবুজহল বলিল, আমার ‘গরদান’ (ঘাড় বা গলা) ধড়ের সঙ্গে মিলাইয়া কাটিবে, বাহাতে অন্যান্য ছিন্ন-মুণ্ড হইতে আমার মস্তক বৃহৎ বোধ হয়, এবং ছরদারের (প্রধান সেনাপতির) মস্তক বলিয়া সকলে চিনিতে পারে । অতঃপর হজরত আবদুল্লা-বিন-মসযুদ (রাজিঃ) উহার মস্তক কাটিয়া হজরতের নিকট আনিয়া ‘হাজের’ (উপস্থিত) এবং তাঁহার পদতলে নিক্ষেপ করিলেন । আ হজরত (ছালঃ) আবুজহলের কর্তৃত মস্তক দেখিয়া খোদা তা-লার নিকট ‘শোকর’ (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করিলেন । এই যুদ্ধে মাত্র ১৪ জন সাহাবী (রাজিঃ) শহিদ হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে ছয়জন মহাজেরিন ও ৮ জন আন্ছার ছিলেন । হজরত রেছালতগাব (ছালঃ) যুদ্ধ হইতে অবসর লাভ করিয়া মোসলমান শহিদগণকে যথানিয়মে দফন করিলেন ; আর মোশরেক (অংশিবাদী—পৌত্তলিক কাফের)-দিগের মৃতদেহ একটা বৃহৎ গভীর কূপে নিক্ষেপ করাইয়া উহার উপরে প্রচুর মৃত্তিকা ঢালাইয়া দিলেন । কেবলমাত্র ওম্মিয়া-বিন-খলাফর-মৃতদেহ-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া

ধাওয়াতে কূপে নিষ্ক্ষেপ করা গেল না, সুতরাং উহার সেই খণ্ডীকৃত মৃত-
 দেহের উপর মৃত্তিকা ফেলিয়া দিয়া উহা ঢাকিয়া দেওয়া হইল । কাফেরগণ
 এমন ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উদ্ধ্বাসে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন
 করিয়াছিল যে, আপনাদের প্রধান সেনাপতির মৃতদেহও সঙ্গে লইয়া
 যাইবার অবসর পাইয়াছিল না । হরছ-বিন্-বনয়া, আবুকয়েস্-বিন্-আল্-
 ফাকাহ, আলী-বিন্-ওম্মিয়া, আছ-বিন্-মনকা—ইহারা তরুণ বয়স্ক যুবক
 ছিল । আর আ হজরত (ছালঃ) যখন মকায় ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে
 ‘মহ্‌বত (প্রণয় বা ভালবাসা) এবং সহস্র রাখিতেন । হরত তাহারা
 গোপনে মোসলমানও হইয়া গিয়াছিল । হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)
 হেজরত করিয়া মদীনায়া আগমন করিলে, উহাদের আত্মীয়-স্বজন, সম্প্রদায়স্থ
 লোক এবং বন্ধু-বান্ধবগণ তাহাদের উপর অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করে,
 ‘মোরভেদ’ (ইসলাম-ধর্মত্যাগী) হইবার জন্য বিশেষ ভাবে বেদ করিতে
 থাকে, তখন তাহারা প্রকাশভাবে ইসলাম ও হজরতের প্রতি ‘নারাজী’
 প্রকাশ পূর্বক মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কাফের
 সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া মদীনায়া আগমন করে । এই দলের
 সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল । মকার বড় বড় ‘ছরদার’ (দলপতি)
 গণ বাহারা এই যুদ্ধে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে
 মারা গিয়াছিল । যখন এই পরাজিত ও উৎসন্ন প্রাপ্ত কোরেশ সেনাদলের
 অবশিষ্টাংশ যুথভ্রষ্ট মেঘপালের ন্যায় মকায় গিয়া পড়ছিল, তখন সেখানে
 ঘরে ঘরে শোকের হৃদয়-বিদারক আন্তনাদ ও ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইতে
 লাগিল । কাফেরগণ এমন ভীত, সন্ত্রাসিত ও আতঙ্কিত হইয়া উদ্ধ্বাসে
 পলায়ন করিয়াছিল যে, তাহাদের বিপুল সামগ্রী-সম্ভার, রসদ-পত্র, অস্ত্র-
 শস্ত্র, অশ্ব-উষ্ট্র প্রায় সমস্তই যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া গিয়াছিল । হজরত (ছালঃ)
 ঐ সকল পরিত্যক্ত সামগ্রী-সম্ভার একস্থানে জমা করাইলেন ; এবং বন্ধু-

নজ্জার সম্প্রদায়ের আবদুল্লা-বিন্-কাসাব (রাজিঃ)-এর হস্তে তৎ সমস্ত সমর্পণ করিলেন । আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) ও নয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ)-কে মদীনার চতুর্পার্শ্ববর্তী পল্লী সমূহে এই বিজয়-সংবাদ ঘোষণা করিবার পাঠাইয়া দিলেন । হজরত আসামা-বিন্-নয়েদ (রাজিঃ)-কে হজরত (ছালঃ) মদীনার স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছেন, আমি ঐ সময় এই যুদ্ধ-বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত হই—যখন আমরা হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) কন্যা ও হজরত ওসমান বিন্ আফ্ফান রাজি আল্লাহ আনহুর ‘যওজ্জার’ (সহধর্ম্মিনী) হজরত রকিয়া (রাঃ-আঃ)-কে দফন করিতেছিলাম । এই বিজয় সংবাদ মদীনা শরীফে ১৮ই রমজান-অল-মবারক পড়েছিল । ঐ হজরত (ছালঃ) বদরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন ; পথিমধ্যে ‘ছফ্-রাঃ’ নামক স্থানে আল্লাহ তাবার আদেশানুসারে ‘মালে গনিমত্’ (যুদ্ধে বিজয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) মোসলমানদিগের মধ্যে সমভাগে বন্টন করাইয়া দিলেন । যুদ্ধে বন্দীদিগের মধ্যে বহু-আব্দে দার বংশীয় নযর-বিন্-হারেছ বিন্ কালাহ-এর ‘গর্দান’ মারিবার (হত্যা করিবার) আদেশ প্রদান করিলেন । এখান হইতে যাত্রা করিয়া ‘আরকষ্ ববিয়াঃ’ নামক স্থানে পহুছিলেন ; এই স্থলে ওক্বাঃ-বিন্-আবি ময়্যিত্-বিন্-আবি ওমর-বিন্-লয়িয়ার মুণ্ডপাত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ; আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল । উপরোক্ত রণবন্দী দুই ব্যক্তি আবুজ্জহলের সম্পূর্ণ মতাবলম্বী ও পদানুসরণকারী কাটা কাফের ছিল ইহারা উভয়ে ঐ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে অত্যন্ত ‘দোখনি’ (শত্রুতাচরণ) করিত । তাঁহাকে সর্বপ্রকারে অপদস্থ, অপমানিত ও উৎপীড়িত করাই এই কয়টি লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । নযর-বিন্-আল্-হারেছ কে সফ্-রায় হজরত আলী (রাজিঃ), আর ওক্বা-বিন্-আবি মহিত কে

আরব্‌ যবিয়ার্‌ য়াছেম-বিন্‌-ছাবেত আন্‌ছারি (রাজিঃ) ‘কতল্‌’ (যত্ন-দণ্ডে দণ্ডিত অর্থাৎ হত্যা) করিয়াছিলেন । অতঃপর আবু হজরত (ছালঃ) বীম আছহার (রাজিঃ)-দিগকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতভাবে গমন করিতে লাগিলেন ; আবু হজরত (ছালঃ) বন্দীদিগকে ও তাহাদের ‘মহাফেজ’ (রক্ষী)-দিগকে পশ্চাতে রাখিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন । হজরতের (ছালঃ) মদীনা পহুছার একদিন পরে বন্দিগণ ও রক্ষিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া মদীনার পহুছিল । বন্দীদিগকে ছাহবাঃ কারামঃ (ছালঃ)-দিগের মধ্যে ‘তক্‌হিম’ (ভাগ) করিয়া, তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, ইহা-দিগের সঙ্গে ‘নেক-ছলুক’ (সদ্যবহার) করিবে । এই রণবন্দী (কয়েদী)-দিগের মধ্যে আবু-য়াযিয্‌-বিন্‌-য়ামর নামক ব্যক্তি কাফের সেনাদলের পতাকা-বাহী ছিল ; ইহার সহোদর ভ্রাতা হজরত মছয়ব-বিন্‌-য়মির (রাজিঃ) একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী (হজরতের শিষ্য) ছিলেন । আবু-য়াযিয্‌-এর বর্ণনা এইরূপ :—যখন আমাকে বন্দী করিয়া বদর হইতে মদীনা লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি একদল আনুছারের তত্ত্বাবধানে ছিলাম । এই আনুছার (রাজিঃ)-গণ যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন আমাকে রুটী খাইতে দিয়া, নিজেরা খজ্জুর খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতেন । আমি লজ্জিত হইয়া ঐ সকল আনুছাবের মধ্যে কাহাকেও সেই রুটী খাইতে দিতাম ; কিন্তু তিনি আবার আমাকেই তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন । মদীনা পহুছিয়া আমি আবু-আযিয্‌ আবি যুছির আনুছারী (রাজিঃ)-এর ভাগে পড়িলাম । আমার ভ্রাতা হজরত মছয়ব-বিন্‌-য়মির (রাজিঃ) আবি-যুছির আনুছারী (রাজিঃ)-কে বলিতে লাগিলেন যে, ইহাকে খুব সতর্কতার সহিত কায়েদ রাখিবেন ; এবং ইহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিবেন ; কারণ ইহার মাতা খুব অর্থশালিনী ; ইহার জন্য প্রচুর ‘ফিদিয়া’ (বন্দীদিগের মুক্তিপণ) পাওয়া যাইবে । আবু আযিয্‌ যখন দেখিতে

পাইল যে, তাহার সহোদর ভ্রাতা, তাহার হেফাজতকারী (জেন্দাদার গ্রহরী)-কে তৎপ্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে অস্বরোধ করিতেছেন, তখন বলিল, ভাই সাহেব ! আপনি কি আমার জন্য ■ ‘খায়েরখানী’ (মঙ্গলাকাজ্জা) করিবেন না ? তখন হজরত মছরব (রাজিঃ) উত্তর করিলেন, এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতা নও ; ঐ ব্যক্তি আমার ভ্রাতা, যিনি তোমাকে নিজের পাহারায় রাখিয়াছেন । যাহা হউক, আবু আবিষের মাতা চারি হাজার দরহম মুক্তিপণ পাঠাইয়া উহাকে ছাড়াইয়া নিয়াছিলেন । বদর যুদ্ধে কোরেশদিগের ভীষণ ভাবে পরাস্ত হওয়ার সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছিল, তাহাতে কাফেরদিগের যেরূপ শোক ও দুঃখ হইল ; পক্ষান্তরে যে মুষ্টিমেয় মোসলমান নানা অত্যাচার সহ করিয়া তখনও মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন । এবং আপনাদের ধর্মবিশ্বাস গোপন রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে সেইরূপ বিমল আনন্দের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল । আবুলহব-বিনু-আবদুল মোত্তালেব (আ হজরত [ছালঃ]-এর অত্যাচারী পিতৃব্য) কোনও কারণ বশতঃ এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারিয়াছিল না, সে যখন মক্কার প্রধান প্রধান ছরদার (দলপতি), প্রধান প্রধান বীরপুরুষের নিহত হইবার, এবং তাহাদের শোচনীয় পরাজয় সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন উহার হৃদয়ে এমনই একটা ধাক্কা লাগিল—এমনই একটা তীব্র বেদনা অনুভূত হইল যে, এই দুঃসংবাদ শুনিবার এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহার জীবনান্ত ঘটিল । যুদ্ধের বন্দীদিগের সম্বন্ধে আ হজরত (ছালঃ) মস্জিদ নববীতে গিয়া ছাহাবা (রাজিঃ)-দিগের সম্বন্ধে পরামর্শ ও কর্তব্য স্থির করিলেন । হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) বলিলেন, আমার মকে বন্দীদিগের যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে যাহার আত্মীয়, সেই ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিবেন । একপ করিবার উদ্দেশ্যে, ‘মোশরেক’ (অংশিবাদি)-গণ বুঝুক যে, আমাদের নিকট খোদা ও রুহুলের ‘মহব্বত’ (প্রণয় বা ভালবাসা) ‘করাবত দারী’

(আত্মীয়তা) অপেক্ষা অনেক বেশী । আর ইসলামের ‘মোকাবেলায়’ (সম্মুখে বা তুলনায়) আত্মীয়তার কোন মূল্যই নাই । হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আমার মতে বন্দীদিগকে ‘ফিদিয়া’ (মুক্তি-পণ) দিয়া ছাাড়িয়া দেওয়া উচিত । তদ্বারা মোসলমানদিগের কতকটা আর্থিক সাহায্য হইবে ; এবং ইহারা তদ্বারা আপনাদের যুদ্ধের ‘সাজ-সরঞ্জাম’ ও ঠিক করিতে পারিবেন । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্ভবপর যে, বন্দীগণ মুক্তিলাভ করিয়া, পবিত্র ইসলামের সুন্নিথ আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করিতে পারে । হজরত রেছালতমান (ছালঃ) হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ)-এর মতই ‘পছন্দ’ (মনোনীত) করিলেন । তদনুসারে বন্দীদিগকে উপযুক্ত ফিদিয়া গ্রহণ পূর্বক মুক্তি প্রদান করিলেন । অনেক গরীব ও নিঃস্ব লোককে বিনা ফিদিয়ায় ও ছাাড়িয়া দিলেন । প্রত্যেক কয়েদীর এক হাজার হইতে চারি হাজার দরহম পর্য্যন্ত ‘ফিদিয়া’ পাঠাইয়া মক্কাবাসীগণ আপনাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল । মোটামুটি ৭০।৭৫ জন বন্দীর অমুন দুই লক্ষ দরহম, মুক্তি-পণ স্বরূপ মোসলমানগণ পাইয়াছিলেন । যে সকল লোক লেখাপড়া জানিত, অথচ ফিদিয়া-দিবার সামর্থ্য ছিল না, তাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা প্রত্যেকে দশ দশটি মদীনাবাসী বালককে লেখাপড়া শিখাইয়া দিয়া মুক্তিলাভ করিবে । হজরত রচুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের কন্যা হজরত যন্নব (রাজিঃ-আঃ) এখন পর্য্যন্ত মক্কার তাহার স্বামী আবুল আছের গৃহেই ছিলেন । আবুল আছ ও এই যুদ্ধে বন্দী হন । হজরত যন্নব (রাঃ-আঃ) নিজের-গলার হার তাহার ফিদিয়ার পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন । ঐ হজরত (ছালঃ) ঐ হার দেখিয়া ছাহাবা (রাজিঃ)-দিগকে বলিলেন, যদি ‘মোনাছেব’ (কষ্টব্য) মনে কর, তবে এই হার গাছা (অঙ্গদ) যন্নব (রাঃ-আঃ)-কে ফেরত পাঠাইয়া দাও, কারণ ইহা স্বীয়

মাতা (হজরত) খোদেজ্বার (রাঃ—আঃ) স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ উহার নিকটে
 রহিয়াছে । সকলেই আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ;
 এবং আবুল আছ-কে বিনা মুক্তি প্রদান করা হইল । আবুল আছ
 মক্কায় গমন পূর্বক হজরত বয়নব (রাঃ—আঃ)-কে মদীনায় আঁ হজরত
 (ছালঃ)-এর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন । আবুল আছ এই ঘটনার ছয় বৎসর
 পরে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । এই শোচনীয় পরাজয়ের
 পর মক্কাহ নিহত ব্যক্তিদিগের ‘ওরারেছ’ (আত্মীয়-স্বজন)-গণ-উচ্চৈঃস্বরে
 ‘নোহা জারী (শোক প্রকাশক ক্রন্দন) করিয়াছিল না, কারণ ঐ রূপ
 শোক প্রকাশের সংবাদে মোসলমানগণ সুখী হইতেন । ছফওয়ান-বিন্-
 ওম্মিয়ার পিতা ওম্মিয়া, পিতৃব্য শয়বাঃ ও ভ্রাতা আলী বদরের যুদ্ধে নিহত
 হইয়াছিল ; এজন্য তাহার হৃদয়ে প্রতি হিংসানলঃপ্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় ;
 তজ্জন্য সে যমির-বিন্-দহবকে অতি সজোপনে এ বিষয়ে রাজী করিয়াছিল
 যে, সে যেন মদীনায় গমন পূর্বক হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-কে
 হত্যা করে । যমির-বিন্-দহব একখানি বিষাক্ত তরবারি সহ মক্কা হইতে
 মদীনায় গমন করিল । তাহাকে দেখিয়া হজরত ওমর রাজিঃ আল্লাহ
 আনুহর মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি যমিরের তরবারির কব্ধাঃ
 (বাঁট) ধরিয়া, তাহাকে আঁ হজরত (ছালঃ) এর হজুরে উপস্থিত করিলেন ।
 তিনি ফরমাইলেন, ওমর ! তুমি যমিরকে ছাড়িয়া দাও । হজরত ওমর
 (রাজিঃ) উহার হাত ছাড়িয়া দিলে, হজরত (ছালঃ) যমির কে নিকটে
 ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিজন্য মদীনায় আসিয়াছ ? সে বলিল,
 আমার পুত্র যুদ্ধে বন্দী হইয়াছে, তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে আসিয়াছি ;
 আপনি আমার প্রতি ‘রহম’ (দয়া) প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে ছাড়িয়া দিন ।
 আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমাকে হত্যা করিবার জন্য ছফওয়ান
 তোমাকে পাঠাইয়াছে, একথা কেন বলিতেছ না ? তৎপর তিনি ছফওয়ান

যমিরের গুপ্ত পরামর্শের সকল ঘটনা প্রকাশ করিলেন ; তচ্ছবণে
 ■ যমির বলিলেন, আমি মোসলমান হইতেছি, আর 'একরার' (স্বীকার) করি-
 তেছি যে, আপনি খোদা তা-লার প্রেরিত 'ছাচ্চাঃ' (সত্য) রচুল, কারণ
 এই বিষয়ের 'খবর' (সংবাদ) আমিও ছফ্ ওয়ান ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি
 কেহই জানিত না।

বদর যুদ্ধে পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লা ফেরেশ্তাদিগের দ্বারা
 মোসলমানদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন ; ফেরেশ্তাদিগের সাহায্য সম্বন্ধে
 কাফেরগণ ও মক্কার প্রত্যাবর্তন করিয়া তদ্বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল।

বদরের যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলেও, কোরেশদিগের
 সৈন্যসংখ্যা, মক্কার প্রসিদ্ধ বোদ্ধ পুরুষদিগের একত্র সমাবেশ, তাহাদের
 সাজ-সজ্জা, উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব ও উষ্ট্রের সংখ্যা, প্রচুর রসদ-পত্র ইত্যাদির
 তুলনায় মোসলমানগণ একেবারে দুর্বল ও নগণ্য ছিলেন। তাহাদের
 সংখ্যা, সাজ-সজ্জা, অশ্ব ও উষ্ট্রের সংখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।
 সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা-লার বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশেষ
 সাহায্য ব্যতীত মোসলমানদিগের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা কোনও
 ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য মক্কার কাফেরদিগের পাশব দৈহিক বলই
 একমাত্র অবলম্বন ছিল ; মোসলমানদিগের আল্লাহর প্রতিঃ পূর্ণ বিশ্বাস,
 আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভৃতি ও যুদ্ধ জয়ের অশ্রুতম কারণ।

বদরের যুদ্ধ শেষ হইবার পর ২২শে রমজান-মবারক, হজরত রেছালত্-
 মাব (ছালঃ) মদীনার প্রত্যাবর্তন করেন। এই পবিত্র রমজান মাসের
 শেষ ভাগে 'ছাদকার ফেতর' (রোজার ফেৎরাঃ) ওয়াজেব হইয়াছিল।
 ঈদের নমাজ ■ কোরবানীর আদেশ ও এই বৎসরেই প্রদত্ত হয়। এই
 বৎসরেই আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় দ্বিতীয়া কন্যা হজরত ওম্মে-কলছুমের
 (রাঃ—আঃ) বিবাহ, হজরত ওসমান গনী (রাজিঃ)-এর সঙ্গে দেন।

এই হইতে তিনি-(হজরত ওসমান গনী [রাজিঃ]) “ যেরু রায়েন ” নামে অভিহিত হন । আবার এই বৎসরই আ-হজরত (ছালঃ) স্বীয় অতিপ্রিয় সর্ব কামিষ্ঠা কন্যা হজরত-খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমা জোহরার (রাঃ—আঃ) শুভ-বিবাহ কার্য্য, স্বীয় স্নেহে পালিত পিতৃব্যপুত্র মহাবীর হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন করেন ।

মক্কার কাফেরদিগের হৃদয়ে ভীষণ প্রতি-হিংসানল অতি প্রবল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল । বদর যুদ্ধের দুই মাস পরে, মক্কার কোরেশদিগের বর্তমান নেতা আবু-সুফিয়ান যুদ্ধের উদ্দেশ্যে দুই শত অশ্বরোহী সৈন্ত লইয়া মক্কা হইতে বহির্গত হইল । এই সৈন্তদল মদীনার সান্নিধ্যে পহুছিলে, আ-হজরত (ছালঃ) সেই সংবাদ পাইয়া, শিষ্যদল সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে বহির্গত হইলেন । আবু-সুফিয়ান মদীনাস্থ শহরতলির খেজুরের বাগান গুলি অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করিতেছিল । আর যে দুইজন নিরীহ ‘কাশুত্কার’ (কৃষক বা উজান স্বামী) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করিল । ইহাদের মধ্যে একজন ত হজরত সরীদ-বিন্-ওমর আনছারী (রাজিঃ) ও আর একজন তাঁহারই সহযোগী ছিলেন । মোসলমানদিগের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র কাফের সৈন্তগণ ভয়ে পলায়ন করিল ; মোসলমানগণের সন্মুখীন হইতে তাহাদের সাহসে কুলাইল না । তাহারা এরূপ ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে পলায়ন করিয়াছিল যে, পলায়ন কালে ভার ‘হাল্কা’ (লঘু) করিবার ■■■ আপনাদের ছাতুর বস্তা (থলিয়া) গুলি পথে ফেলিতে ফেলিতে গিয়াছিল । মোসলমান সৈন্তগণ “ কদর ” নামক স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন । পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সেই নিক্ষিপ্ত ছাতুর বস্তা গুলি তাঁহারা পাইয়া ছিলেন । অতঃপর হজরত (ছালঃ) শিষ্যে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই অভিযান “ গয়্ ওয়ায় সওভিক ” (সাতিক) নামে অভিহিত হইয়াছিল । গয়্ ওয়ায়-

সপ্তমিক ২য় হিজরীর যেলহজ্জ মাসে সম্বটিত হয় । যেলহজ্জ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আ হজরত (ছালঃ) মদীনা শরীফে উপস্থিত ছিলেন ; ঐ সময় পর্য্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই ।

হেজরতের তৃতীয় বৎসর ।

মিহদী ধর্মাবলম্বী আবদুল্লা-বিন্ আবির কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে ; কোথায় সে মদীনার রাষ্ট্রপতি বা বাদশাহ হইবে, রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিবে, সেইস্থলে আ হজরতের (ছালঃ) মদীনায় আগমনে তাহার সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হইল ; একান্ত সে আ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের প্রতি বড়ই বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত । সে অতি বুদ্ধিমান ও সূচতুর লোক ছিল বলিয়া প্রকাশ্যে আ হজরত (ছালঃ), কিংবা মোসলমানদিগের প্রতি কোনও রূপ বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিত না ; কিন্তু মক্কার কোরেশ, মদীনার মোশরেক ও মিহদীদিগের সঙ্গে মোসলমানগণের বিরুদ্ধে সর্বদা গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইত । বদরের যুদ্ধে মোসলমানগণ জয়ী হওয়াতে তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল । এক্ষণে সে প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার অন্তঃকর্ত্ত ও বাধ্য কতকগুলি পৌত্তলিক এবং মিহদীকে লইয়া কপট ভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল । প্রকাশ্যভাবে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে সে এবং তাহার দলের লোকেরা শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করিত না ; একান্ত মোসলমানদিগের দলে ভুক্ত হইয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিতে সে কুতসকল হইল ।

পৌত্তলিক ব্যতীত মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহের প্রবল মিহদী অধিবাসিগণ আ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের প্রতি বিষম বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিল । কারণ তাহারা হজরতের (ছালঃ) নবুয়তে বিশ্বাস করিতে একেবারেই

রাজী ছিল না। মদীনার শহরতলিতে ৩ দল যিহুদী খুব পরাক্রান্ত ও প্রভাব-সম্পন্ন ছিল। উহাদের মহালা গুলি কেলা বেষ্টিত থাকায় শত্রুর পক্ষে এক প্রকার অজ্ঞেয় ছিল; ঐ তিন যিহুদী সম্প্রদায়ের নাম এই :— (১) বনি-কিন্কার; (২) বনি-নযির ও (৩) বনি-করিযাঃ। বদরের যুদ্ধে-ফলে ইহারাও আ হজরত (ছালঃ) এবং মোসলমানদিগের উপর বড়ই বিদ্বেষ-পরায়ণ ও ক্রোধাবিষ্ট হইল। কারাব-বিন্-আশরফ্ নামক একজন যিহুদী কবি, বদর যুদ্ধে মোসলমানদিগের জয়লাভ করিবার ফলে তাহাদের প্রতি এমন বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইল যে, সে মদীনা ছাড়িয়া মক্কা গমন পূর্বক, বদর যুদ্ধে নিহত কোরেশদিগের শোক-গাথা লিখিয়া কোরেশ-দিগকে শুনাইতে লাগিল; এবং তৎকাল তাহাদের বিশেষ সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। কিছুদিন পরে সে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মোসলমান-দিগের নিন্দা ও ঘানি-শূচক কবিতা লিখিয়া বিদ্বেষ ছড়াইতে লাগিল। যিহুদিগণ সুদখোর ছিল বলিয়া, মদীনার আওস ও খয্রজ্ বংশীক মোসলমানদিগের মধ্যে অনেকেই তাহাদের নিকট ঋণী ছিল—যেমন বর্তমান সময়ে ভারতীয় মোসলমানগণ হিন্দু সুদখোর দিগের নিকট ঋণ-জালে আবদ্ধ আছে। যিহুদিগণ উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন বলিয়া, অধমর্ণ অর্থাৎ খাতক মোসলমানগণ তাহাদিগের অনেকটা ‘দাবাও’ তে ছিলেন। যিহুদিগণ আপনাদিগকে উচ্চ সম্মানিত বলিয়া মনে করিত। মোসলমান-দিগের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাহারা জলিয়া পুড়িয়া ‘খাক’ হইতেছিল। যিহুদিগণ আ হজরত (ছালঃ) ও মোসলমানদিগের সঙ্গে বড়ই ‘বে-আদবী’ করিত। অনেক সময় তাহার সভায় আসিয়া ও অসভ্যতা এবং বর্বরতা প্রকাশ করিত। আ হজরত (ছালঃ) নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিলেও, উহারা তাহাতে কর্ণপাত করিত না।

একদা ‘বনি-কিন্কারাঃ’ নামক মহালায় একটি মেলা বসিয়াছিল;

একজন আনুহার মহিলা ও মেলায় দুধ বিক্রয় করিতে গিয়া, একজন যিহুদী স্বর্ণকার কর্তৃক অবমানিতা হন । একজন আনুহার পুরুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অবমানিতা স্বজাতীয়া ও স্বধর্মাবলম্বিনী মহিলার পক্ষ সমর্থন করেন । ঐ সময় কতকগুলি উদ্ধত যিহুদী যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া সেই আনুহারকে আক্রমণ পূর্বক নিহত করে । পরে আরও কতিপয় মোসলমান সেখানে উপস্থিত হন । মোসলমানদিগের সঙ্গে যিহুদিগণের সতর্ক উপস্থিত হয় । মোসলমানদিগের সংখ্যা খুব কম ছিল ; সুতরাং তাহারা যিহুদিদিগের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না । সংবাদ পাইয়া আঁ হজরত (ছালঃ) দল বল হইয়া যুদ্ধস্থলে গমন পূর্বক দেখিতে পাইলেন, যিহুদিগণ যুদ্ধিমের মোসলমানকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে । নবাগত মোসলমানগণ ও আঁ হজরতের (ছালঃ) আদেশে যিহুদিদিগকে মহা পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিলেন । বনি-কিনকার সম্প্রদায়ের যিহুদীদিগের মধ্যে যোদ্ধা পুরুষের সংখ্যা ছিল ৭০০ শত, তন্মধ্যে ৩০০ যোদ্ধা 'যরাপোষ' (বর্মধারী) ছিল ; কিন্তু অত্যল্প সংখ্যক মোসলমানের সঙ্গে তাহারা যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, পলায়ন পূর্বক আপনাদের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল । মোসলমানগণ দৃঢ়ভাবে দুর্গ অবরোধ করিলেন । ১৫।১৬ দিন অবরোধের পর তাহাদের কেহ্না মোসলমানদিগের হস্তগত হইল । বনি-কিনকার সম্প্রদায়ের সমস্ত যিহুদীকে মোসলমানগণ বন্দী করিয়া ফেলিলেন । তৎকালের সাধারণ নিয়মানুসারে এই সকল বন্দী পুরুষদিগকে হত্যা এবং স্ত্রীলোকদিগকে দাসীরূপে বিক্রয় করার ব্যবস্থা ছিল । সকলে মনে করিয়াছিল, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশে যিহুদী যোদ্ধা পুরুষদিগের সকলেই নিহত হইবে । ওদিকে আবদুল্লা-বিন্-আবি (মোনাফেকদিগের দলপতি) ও এই যিহুদী-দিগের প্রাণরক্ষার্থ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট 'ছোফারেশ' (অনুরোধ)

করিল। ঐ হজরত (ছালঃ) প্রাণদণ্ড না করিয়া উহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। তদনুসারে হজরত এবাদা-বিন্-ছামত (রাজিঃ) একদল ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে “ খয়বর ” পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন। “ খয়বরে ” পূর্ব হইতেই যিহুদীদিগের একটি বড় আড্ডা ছিল। এই নির্বাসিত যিহুদীগণের গমনে খয়বরস্থ যিহুদীগণের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইল।

দুইজন দুর্বৃত্তের হত্যা সাধন ।

কায়াব-বিন্-আশরফ্ নামক মোসলেম-বিদ্রোহী যিহুদীর কথা ইতি-পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ; ঐ দুর্বৃত্ত লোকটা মোসলমান মহিলাদিগের প্রেম সম্বন্ধীয় অপমান-সূচক কবিতা লিখিয়া প্রকাশ্যভাবে মদীনার সর্বত্র প্রচার করিতেছিল। ইহাতে মোসলমানগণ আপনাদিগকে যোর অবমানিত মনে করিতে লাগিলেন। কায়াব-বিন্-আশরফ্ কেবল উহা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না ; সে ঐ হজরত (ছালঃ)-এর হত্যা সাধন জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। যখন উহার কার্য্য-কলাপ ও চুরতিসন্ধি সীমা অতিক্রম করিল, তখন মোহাম্মদ-বিন্-মোসলেমাঃ (রাজিঃ) নামক একজন সাহাবাঃ উহাকে হত্যা করিবার জন্য ঐ হজরতের (ছালঃ) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ; অনুমতি প্রদত্ত হইলে তিনি অপর দুইজন লোকের সাহায্যে উহার হত্যা কার্য্য সম্পাদন করিলেন। উহার হত্যা-কাণ্ডের পর ছালাম-বিন্-আবি হকিক নামক আর একটি দুর্বৃত্ত গজাইয়া উঠিল। ইহার মোসলমান-বিদ্বেষ আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল। সে খয়বরে বাস করিত ; কায়াবকে বহু-আওস্ দলের মোসলমানগণ হত্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বহু-খয়রজ দলের মোসলমানগণ এই ২ জন

দুর্ভুক্ত লোকটাকে হত্যা করিবার ■■■ আ হজরতের (ছাগঃ) অহুমতি চাহিলেন । অহুমতি প্রদত্ত হইলে খয়রজ সম্প্রদায়ের ■ জন যুবক প্রচুর-ভাবে খয়বরে গিয়া উহার হত্যা কার্য সম্পন্ন করিলেন । দুইটা বিষম কণ্টক নির্মল হইল ।

বদর যুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাস্ত হওয়াতে এবং তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতি সেই যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, মক্কার কোরেশগণের হৃদয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের ভীষণ বিদ্বেষাগ্নি প্রবল ভাবে জ্বলিতেছিল ; • তাহারা কেবল উপযুক্ত সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিল । ওদিকে মদীনার যিহুদী ■ মোনাফেকগণ প্রতিশোধ গ্রহণ ■ তাহাদিগকে অনবরত উত্তেজিত করিতোছিল । আবার আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার পিতা, পিতৃব্য ■ ভ্রাতা বদর যুদ্ধে নিহত হওয়াতে তাহার হৃদয় ভীষণ প্রতিহিংসানলে দগ্ধীভূত হইতেছিল । সে স্বীয় স্বামী আবু-সুফিয়ানকে প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য অনবরত বিশেষভাবে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করিতেছিল । মক্কার প্রায় সমুদয় দলপতি বদর-যুদ্ধে নিহত হওয়াতে, এক্ষণে আবু-সুফিয়ানই মক্কাবাসিগণের—বিশেষতঃ কোরেশদিগের ছরদার (দলপতি)-এর পদ লাভ করিয়াছিল । বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে আবু-সুফিয়ান যে সিরিয়ায় বাণিজ্য-যাত্রা করিয়াছিল, তাহাতে ৫০ হাজার মেশ্‌কাল স্বর্ণ ■ ১০০০ টা উষ্ট্র লাভ হইয়াছিল ; উহার লভ্যাংশ এ যাবৎ উহার মালেকদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল না । এক্ষণে ঐ লভ্যাংশ দ্বারাই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইল । বহু উত্তেজনাময়ী কবিতা পাঠক ও গুজবিনী ভাষায় বক্তৃতাকারী, লোকদিগকে-যুদ্ধে যোগদান করাইবার অস্ত্র আরবের বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরিত হইল ; তদ্বারা বেশ সুফল ও ফলিল ; বহু জাতি, বহু সম্প্রদায় ও বহু প্রদেশের অধিবাসিগণ এই যুদ্ধে যোগদান করিবার ■ প্রস্তুত হইল । একদল রণ-রঙ্গিনীও যোদ্ধ পুরুষ-

দিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত ■ উত্তেজিত করিবার ■ যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইল । আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দাঃ তাহাদের নেত্রী পদ গ্রহণ করিল ।

ওহদের ভীষণ যুদ্ধ ।

মক্কাবাসি পৌত্তলিকদিগের উত্তোঙ্গে নিজ মক্কা ও বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত যোদ্ধৃপুরুষের সংখ্যা ৩০০০ হইল । তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব-উষ্ট্র ও রসদ-পত্রের কোনও অভাব ছিল না । শওয়াল মাসের প্রারম্ভে এই বিশাল কোফ্ফার-বাহিনী মক্কা হইতে মহাড়ঘরে বাহির হইয়া, মদীনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল । হেন্দাঃ-বিস্তে ওত্‌বাঃ নারীগণের সেনাপতি রূপে মহোচ্চাঙ্গে এই যোদ্ধৃদলের সঙ্গে গমন করিতে লাগিল । জবির-বিন্-মতয়মের ওহসী নামক একজন ক্রীতদাস ছিল ; নেযাঃ (বর্ণা বা বল্লম বিশেষ) নিক্ষেপে তাহার অসাধারণ পটুতা ছিল । জবির-বিন্-মতয়ম উহাকে বলিয়াছিল, যদি তুমি হামযাঃ (রাজিঃ) কে বধ করিতে পার, তবে তোমাকে দাসত্ব হইতে 'আযাদ' (মুক্ত) করিয়া দিব । আবার হেন্দাঃ-বিন্-ওত্‌বাঃ তাহাকে বলিয়াছিল, যদি তুমি আমার পিতার হত্যাকারী হামযাঃ (রাজিঃ) কে বধ করিতে পার, তবে আমার অঙ্গস্থিত এই বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিব ।

এই প্রবল কোফ্ফার সেনাদল যখন মদীনার সমীপবর্তী হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) তাহাদের আগমন সংবাদ পাইলেন ; তিনি ছাহাবা (রাজিঃ)-দিগকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া এক পরামর্শ-সভা (সমর-সভা) আহ্বান করিলেন । আঁ হজরতের (ছালঃ) মত ছিল যে, মদীনায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন । তাঁহার এরূপ মত প্রকাশের আর একটা কারণ এই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি স্বপ্নে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহার

তরবারির ধার খানিকটা ঝরিয়া গিয়াছে ; ইহা দ্বারা অনুমান করিয়া ছিলেন যে, হয় ত এই যুদ্ধে মোসলমানদিগের কতকটা ক্ষতি সাধন হইবে । আর একটা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তিনি যেন স্বীয় হস্ত এক ঘরায় (বর্ষে) নিক্ষেপ করিয়াছেন । ঘরাঃ অর্থে তিনি মদীনা নগরকে বুঝিয়া ছিলেন । যাহা হউক, বহু আলোচনার পর অবশেষে এই স্থির হইল যে, মদীনায় বাহিরে গমন করিয়াই শত্রুর গতিরোধ করিতে হইবে । আঁ হজরত (ছালঃ) তদনুসারে হজরত ওম্মে-মকতুম (রাজিঃ)-কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, মোনাফেকদিগের ৩০০ বোদ্ধপুরুষ সহ ১০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ মদীনা হইতে বাহির হইলেন । কিন্তু দেড় কিংবা দুই মাইল পথ অতিক্রম করার পর, মোনাফেক (কপট) দলপতি আবদুল্লা-বিন্-আবি, স্বীয় অনুগামী ৩০০ বোদ্ধা সহ মোসলমান সেনাদল ছাড়িয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিল । সুতরাং মোসলমান সৈন্য দলে মাত্র ৭০০ সৈন্য অবশিষ্ট রহিল । আবার আঁ হজরত ইহাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় বালককে মদীনায় ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন ; কারণ তাহারা নিতান্তই তরুণবয়স্ক ছিল । সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যের সংখ্যা সাড়ে ছয় শত কিংবা পোণে সাত শত ছিল বলিয়াই অনুমান । যাহা হউক, এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া আঁ হজরত (ছালঃ) প্রায় দিবা অবসান কালে মদীনা হইতে ৩৪ মাইল দূরবর্তী " ওহদ " নামক পাহাড়ের 'দামনে' (পাদদেশে) পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন, কোফ্ফার সৈন্যদল অদূরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আছে । মোসলমান সেনাদল ও ময়দানের এক প্রান্তে, ওহদ পাহাড় পশ্চাদিকে রাখিয়া আপনাদের শিবির স্থাপন করিলেন । রাজি উপস্থিত হওয়াতে কোনও দলই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না । তৃতীয় হিজরীর ১৫ই শওয়াল, শনিবার দিন ভোরে উভয় প্রতিপক্ষ দল ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে আঁ হজরত (ছালঃ) ৫০ জন সুশিক্ষিত

ও হুদক্ষ 'তিরান্নায্' (তীর বর্ষণকারী বা ধনুর্ধারী) সৈন্য, হজরত আবুজহল-বিন্-জবির আনছারির (রাজিঃ) অধিনায়কতায় আপনাদের পশ্চাদিক্কে এই অতি প্রয়োজনীয় ঘাটিতে (গিরিবন্ধে) শিবির স্থাপন করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তির পূর্বে তোমরা এই গিরি-বন্ধ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। যুদ্ধের অবস্থা বাহা হউক না কেন, তোমরা এই আদেশের অন্তথা চরণ করিও না। এই গিরি-বন্ধটি এমনই ভাবে অবস্থিত ছিল যে, শত্রুদল ঘুরিয়া মোসলমানদিগের 'আকবে' (পশ্চাত্তাগে) গিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত। গিরি-সঙ্কটের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই আ হজরত (ছালঃ) এই সঙ্কর্ণ স্থানে ৫০ জন হুদক্ষ ধনুর্ধারী সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; ঐ গিরি-বন্ধ রক্ষার জন্য ঐ পরিমাণ যোদ্ধাপুরুষই যথেষ্ট ছিল। বাহা হউক, আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ ভাগে হজরত বোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ)-কে ও বামভাগে হজরত মন্বর-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। মহাবীর হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে 'মকদমাতল জয়েশ' এর (অগ্রগামী সৈন্যদলের) সেনাপতি 'মকরর' (নিয়োগ) করমাইলেন; আর হজরত ময়ছব-বিন্-মমির (রাজিঃ) হস্তে পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিলেন। হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ)-কে হজরত স্বীয় তরবারি খানি প্রদান করাতে, তিনি সেই পবিত্র তরবারি হস্তে লইয়া বিক্রান্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অপর পক্ষে কোরেশগণ ও আপনাদের সেনাদলকে যুদ্ধার্থ শ্রেণীবদ্ধ করিল। তাঁহারা মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদকে আপনাদের দক্ষিণ বাহর (ডান দিকের) সেনাপতি নিযুক্ত করিল। তাহার অধীনে ১০০ একশত বিক্রান্ত অশ্বরোহী সৈন্য দেওয়া হইল। এইরূপে আকরমা-বিন্-আবুজহল ১০০ একশত অশ্বরোহী সৈন্যসহ বাম বাহর সেনাপতি

পদ লাভ করিল। আবদুল দার বংশীয়গণ যুদ্ধকালে সর্বদাই কোরেশ-দিগের পতাকাধারীর কার্য্য করিত; বহু বাদাম্বাদের পর এবারও তাহাদিগের হস্তেই রণ-পতাকা অর্পিত হইল। পূর্বোক্ত দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য ব্যতীত কোরেশদিগের আরও দুইশত উৎকৃষ্ট ও দুর্দ্বন্দ্ব অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য ‘মহফুয্’ (রক্ষিত রূপে) রাখা হইয়াছিল। কোরেশদিগের ধনুর্ধারী সৈন্যদিগের অধিনায়ক ছিল আবদুল্লা-বিন্ বরবিয়াঃ। কোরেশদিগের সৈন্য সংখ্যা ৩০০০ ছিল, কেবল যে কোরেশদিগের মধ্য হইতে এই পরাক্রান্ত সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল, তাহা নহে; কোরেশ ব্যতীত আরবের বিভিন্ন দলের বিখ্যাত বীরপুরুষদিগের দ্বারা এই বিক্রান্ত সেনাদল গঠিত হইয়াছিল। মোসলমান সৈন্যের সংখ্যা তাহাদের এক পঞ্চমাংশ মাত্র ছিল; তাহাদের অশ্বের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইটা। আবার মোসলমানদিগের অস্ত্র-শস্ত্রাদি এবং যুদ্ধ-সরঞ্জামাদির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোরেশদিগের তুলনায় মোসলমানদিগের ঐ সকল জিনিষ শতাংশের একাংশও ছিল না।

মদীনাবাসী খৃষ্টীয়ান দলের আবু আমের নামক ‘ব্রাহেব’ (সন্ন্যাসী) এই যুদ্ধের প্রথম সূচনা করে। এই লোকটা বিষম মোসলমান-বিষেষী ছিল। সে মনে করিয়াছিল, আমাকে দেখিলে আওস্-বংশীয় মোসলমানগণ, মোসলমান পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। তদনুসারে সে অগ্রবর্তী হইয়া আওস্ দলস্থ মোসলমানদিগকে নিজের দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু আওস্-বংশীয় আনুহারগণ তাহার আহ্বানে সাড়া দিবেন দূরে থাকুক, বরং তাহাকে ধিকার দিতে লাগিলেন। তাহাতে সে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া প্রস্থান করিল। ইহার পরেই উভয় প্রতিপক্ষ দল উভয় দলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। বীরেন্দ্র কেশরী হজরত হামযাঃ (রাজিঃ), হজরত আলী (রাজিঃ) ও হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ)

এবং অন্যান্য মোসলমান বীর পুরুষগণ এমন পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, কোফ্‌কারের সাহস, ধীর্ঘ্যবত্তা ■ উৎসাহাগ্নি ক্ষণকালের মধ্যে নির্ঝাণ প্রাপ্ত হইল ।

উগ্রচণ্ডা নারী হেন্দাঃ, যুদ্ধকালে হজরত আবু দজানার (রাজিঃ) সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল ; আর একটু হইলেই তদীয় প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে উহার মস্তক ভূ-লুপ্তিত হইত । কিন্তু তিনি যখন উহাকে নারী বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন আ হজরতের (ছাগঃ) পবিত্র তরবারি দ্বারা নারীবধ করা অন্ত্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার দিক হইতে ফিরিয়া অন্য দিকে (পুরুষদলের মধ্যে) মহাসংহার কার্য্য আরম্ভ করিলেন । মহিষ-মর্দ্দিনী রূপিনী হেন্দাঃ মৃত্যুর কবল হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইল । হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ক্ষুধিত শাদ্দুলবৎ শত্রুদলে মহাসংহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া কোরেশদিগের পতাকা ধারী তাল্‌হাকে ‘কতল’ (হত্যা) করিলেন । তৎপর ভীম-বিক্রমে দুই হস্তে তরবারি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । এইরূপে প্রচণ্ড ঝড়ের ন্যায় কোরেশ সৈন্তের লাইন ছিন্ন ভিন্ন ■ মথিত করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন । পূর্বোক্ত ‘নেযাবাঃ’ ওহসী নামক ক্রীতদাস, হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে হত্যা (শহীদ) করিবার ■ সুযোগ অব্বেষণ করিতেছিল ; সে হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে ভীমবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া একখানি প্রস্তরের আড়ালে লুকাইল । যখন এই মহাবীর তাহার ‘নেযার’ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন সে তাঁহার প্রতি সবলে ‘হরবাঃ’ (নেজা বা বল্লম বিশেষ) নিক্ষেপ করিল । উহা তাঁহার দেহের একপার্শ্ব দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেল । সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপ্রাণ মহাবীর পুরুষ বিরাট তালতকর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ‘শহীদ’ হইলেন (ইম্মা লিল্লাহে ওয়াইম্মা ইল্লান্নহে

রায়েউন) । ওহসী হজরত হামযা: (রাজি:)-কে শহিদ করিবার সংবাদ, প্রতিহিংসা-পরায়ণা রণ-রঙ্গিণী হেন্দা: কে প্রদান করিল । হজরত হন্বেলা (রাজি:) প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ পূর্বক কাফেরদিগকে নিজের সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিলেন । তিনি আবু-সুফিয়ানের নিকটবর্তী হইয়া তাহাকে তরবারির আঘাত করিলেন, এই সময় মদাদ-বিন্-আশুদ লেছি পশ্চাদ্ধিক হইতে তাঁহাকে তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত করিল, সেই আঘাতেই তিনি শীহদ হইলেন (ইম্মা লিল্লাহে—) । হজরত নযর-বিন্-আনছ (রাজি:) ■ হজরত ছায়াদ-বিন্-রবির (রাজি:) রণক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব-প্রদর্শন পূর্বক, বহু কোক্কারকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন । কোরেশদিগের ১২ জন পতাকাধারী ক্রমান্বয়ে মোসলমানদিগের হস্তে নিহত হইল ; তন্মধ্যে ৮ জনকে 'শেরে খোদা' (আল্লাহ্ তা-লার শাদ্দুল) হজরত আলী (রাজি:) একাই 'কতল' (হত্যা) করিয়াছিলেন । কোরেশদিগের আবদুল দার বংশীয় পতাকাধারী গণের মধ্যে একজন নিহত হইলে, তৎক্ষণাৎ আর একজন সেই পতাকা তুলিয়া খাড়া করিত ; কিন্তু ১২শ তম পতাকাধারী নিহত হইলে আর কেহই সেই পতাকা তুলিয়া খাড়া করিতে সাহসী হইল না । মুষ্টিমেয় মোসলেম সৈন্তের অমানুষিক বীরত্বের সম্মুখে ৩ সহস্র বিক্রান্ত কাফের সৈন্ত রণক্ষেত্রে আর টিকিতে পারিল না । বেলা দ্বি-প্রহরের সময় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । প্রথমতঃ তাহারা শূশ্বল ভাবে পশ্চাতে হটিতে ছিল ; কিন্তু পরক্ষণেই বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল । যে রণ-রঙ্গিণী রমণীগণ উৎসাহ-মুচক রণ-সঙ্গীত গাহিয়া ■ দফ্ বাজাইয়া পুরুষদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল, তাহারা এই সময় পলায়মান সৈন্তদিগের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জলশ্রোতের পশ্চাদ্বর্তী ভূগর্ভগুর গায় ভাসিয়া চলিল । তাহাদের নেত্রী হেন্দারও সেই দশা ঘটিল, সেও নিজের সামগ্রী-

সম্ভার যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এই সময় মোসলমানদিগের জয় ■ কোরেশদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছিল। বেলা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ই কাকেরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া পূর্বোক্ত ঘাটি (গিরি-সকট) রক্ষক ধনুর্ধারী সেনাপণের মনে এমনই ‘জোশ’ ও উত্তেজনা উপস্থিত হইল যে, তাহারা বলিতে লাগিলেন যুদ্ধে ত আমাদের সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটিয়াছেই, এক্ষণে শত্রুদলের পশ্চাৎকাবন করিয়া তাহাদের মহাসংহার কার্য সম্পন্ন করি ; ইহা দ্বারা আমরা যুদ্ধ-বিজয়ীর উচ্চ গৌরব লাভ করিতে পারিব। ঐ দলের সেনাপতি হজরত আবদুল্লা-বিন্-জবির (রাজিঃ) তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, স্থানত্যাগ করিতে প্রাণপণে বাধা দিলেন, এবং বলিলেন, যে পর্য্যন্ত আঁ হজরতের (ছালঃ) আদেশ না পাওয়া যায়, তৎকাল পর্য্যন্ত কোনও প্রকারেই আমাদের এহান ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু বিজয় লাভের আনন্দে, কোফ্কারের পশ্চাৎকাবন এবং তাহাদের হত্যা সাধনের ‘শওকে’ তাঁহারা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না ; তাঁহারা গিরি-সকট ছাড়িয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময় কোরেশদলের দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ, নিজের অধীনস্থ একশত অনারোহী সৈন্য লইয়া পূর্বোক্ত ঘাটি (গিরিপথ) অধিকার করিবার জন্য দ্রুতগতি প্রধাবিত হইল। ঐ প্রয়োজনীয় ঘাটির দিকে তাহার পূর্ব হইতেই লক্ষ্য ছিল ; এবং উহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। মহাবীর খালেদ স্বীয় বিক্রান্ত অনারোহী সৈন্যদল লইয়া, প্রায় ১ মাইল পথ ঘুরিয়া সেই ‘ঘাটির’ (গিরি-সকটের) পশ্চাদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অধিকাংশ (প্রায় সমুদয়) মোসলমান ‘তীরান্দায্’ (ধনুর্ধর) ঘাটি ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন। হজরত জবির (রাজিঃ) এর সঙ্গে যে অত্যল্প সংখ্যক ‘তীরান্দায্’ ছিলেন, তিনি তাঁহা-

দ্বিগুণে লইয়া আপনাদের অপেক্ষা প্রায় ২০ বিংশতি গুণ অধিক সংখ্যক পরাক্রান্ত অখারোহীঃসেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া; অবশেষে সকলেই ‘শহীদ’ হইলেন । গিরি-সঙ্কটের এই আকস্মিক আক্রমণের এই ফল হইল যে, খালেদ-বিন্-অলিদ কর্তৃক পরিচালিত প্রবল অখারোহী সেনাদল গিরি-সঙ্কট অধিকার করিয়া মোসলমানদিগের পশ্চাদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল । তদর্শনে মোসলমানগণ অনেকটা হতবুদ্ধি ■ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন । বিজয়ী মোসলমান সৈন্যদলের মধ্যে হঠাৎ এক বিশৃঙ্খল ভাব উপস্থিত হইল । যে সকল মোসলমান যোদ্ধাপুরুষ কোফ্কারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছিলেন, তাঁহারা ও আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন । মোসলমানদিগের ঈদৃশ অবস্থা, চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা দর্শনে কোরেশদিগের বাম বাহুর সেনাপতি আকরমা-বিন্-আবুজহল ও বীর অধীনস্থ অখারোহী সৈন্যদল লইয়া মোসলমানদিগের প্রতি ধাবিত হইল । সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান সেনাপতি আবু-সুফিয়ান—যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া উদ্ধৃশাসে পলায়ন করিতেছিল—বীর অধীনস্থ বিশৃঙ্খল পদাতি সৈন্যদলকে কতকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল । বাহারা প্রাণভয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতেছিল, আশার বাণী শুনাইয়া তাহাদিগের গতিরোধ করিল । এক্ষণে কোফ্কারগণ নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া প্রবলবেগে মোসলমান যোদ্ধাপুরুষ দিগের উপর আপতিত হইল । কণকালের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল । মোসলমানদিগের উপর চতুর্দিক হইতে ভীষণ ভাবে আক্রমণ আরম্ভ হইল । মোসলমানগণ চতুর্দিক হইতে কোফ্কারদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন । এই সময় যুদ্ধের কোনও শৃঙ্খলা রহিল না । মোসলমানদিগের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল ; তাঁহারা এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় একেবারে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন । তাঁহাদের সামরিক-শৃঙ্খলা নষ্ট হইল । যুদ্ধক্ষেত্রের এই অবস্থা দাঁড়াইল যে, স্থানে স্থানে

অল্পসংখ্যক মোসলমান, বিপুল সংখ্যক কোরেশ সৈন্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একদলের সংবাদ অন্য দল জানিতে পারিলেন না। কোথাও বা একজন মাত্র মোসলমান বীরপুরুষ বহুসংখ্যক কোরফার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধিয়া শহীদ হইলেন। মোসলমানদিগের প্রতি চতুর্দিক হইতে তরবারি ও নেযাঃ বর্ষিত হইতে লাগিল। আ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং ১২ জন মাত্র ছাহাবীর (রাজিঃ) সঙ্গে একস্থানে কোরদিগের ঘেরার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। হজরত মহম্মদ-বিন-রমির (রাজিঃ) মোসলমানদিগের পবিত্র পতাকা ধারণ করিয়া আ হজরতের (ছালঃ) অতি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন। কমিয়া লেছি নামক কোরফারের এক বিখ্যাত অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাকে ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করিয়া শহীদ করিয়া ফেলিল। হজরত মহম্মদ (রাজিঃ)-সঙ্গে হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর দৈহিক কতকটা সৌন্দর্য্য ছিল, একমুহুর কমিয়া লেছি মনে করিয়াছিল, সে আ হজরত (ছালঃ)-কেই হত্যা করিয়াছে। তদনুসারে সে এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, " কদ-কৎলত মোহাম্মাদান "। এই সংবাদে মোশরেকদিগের উৎসাহাগ্নি প্রবল আকার ধারণ করিল। তাহারা আনন্দে পিশাচবৎ নৃত্য ■ দানববৎ আশ্বালন করিতে লাগিল। মোসলমানগণ ঐ আওয়াজ (চীৎকার ধ্বনি) শুনিয়া 'হয়রান-পেরেশান' এবং নিদারুণ শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। ঠিক ঐ সময়ই হজরত কায়াব-বিন-মালেক (রাজিঃ), আ হজরত (ছালঃ)-কে দেখিয়া উল্লাস-ভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তাই মোসলমানগণ ! তোমরা আনন্দিত হও, আশ্বস্ত হও, হজরত বহুলোল্লাহ (ছালঃ) 'যেন্নাঃ' । জীবিত) আছেন। পরে স্বয়ং আ হজরত (ছালঃ) উচ্চ শব্দে করমাইলেন, " ইল্লা এবাদাল্লাহে আনা বহুলুল্লাহে "—" খোদার বান্দাগণ আমার দিকে

আইস, আমি খোদার রহুল।" এই পবিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরম্পর বিচ্ছিন্ন মোসলমানগণ শত্রুদলের সঙ্গে ভীম পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে চতুর্দিক হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন।

আ হজরত (ছালঃ)-এর এই আওয়ায শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কাকেরগণও জানিতে পারিল, তিনি কোন্ স্থানে আছেন। ইহার ফল এই হইল যে, তাহারাও ঐ দিকে বুকিয়া পড়িল; আ হজরত (ছালঃ)-কে শহীদ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং যে স্থানে ~~মুহাম্মদ~~ রেছালতমাক (ছালঃ) দণ্ডায়মান ছিলেন, ঐস্থানই এক্ষণে যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। মোসলমানদিগের কতিপয় বোদ্ধপুরুষ এই স্থান হইতে এত দূরে এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার শত্রু-সমূহ পার হইয়া—

আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকটে পহুঁছিতে পারিতে ছিলেন না; তাহারা পূর্ববৎ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন। এই গোলমাল এবং ব্যর্থ সমস্ততার অবস্থায় আবদুল-বিন্-শাহাব বহরী শাহাব আ হজরত (ছালঃ)-এর খুব নিকট গিয়া পহুঁছিল; এবং ঐ পাখও তাঁহার পবিত্র দেহে তরবারির আঘাত করিল। তাহাতে হজরত (ছালঃ)-এর 'চেহেরা মবারক' (বদন মণ্ডল) 'যখ্মি' (ক্ষত-বিক্ষত) হইল। এখানে কমিয়া: নামক এক দুর্বল আ হজরত (ছালঃ)-এর খুব নিকটে পহুঁছিয়া এমন জোরে তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিল যে, 'খুদ' (লোহ-মুকুট—শিরস্ত্রাণ বা লোহার নির্মিত টুপি) এর দুই টুকরা চেহেরা মবারকে—চক্ষের নিম্ন দেশস্থ হাড়ডিতে (হাড় বা অস্থিতে) প্রবেশ করিল; হজরত আবু ওবায়দা:-বিন্-জারারাহ (রাক্বিঃ) যখন ঐ খুদের অংশ ঘন দাঁত-দ্বারা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহার দুইটা দাঁত ভাঙিয়া গেল। যখন আ হজরত (ছালঃ)-এর চেহেরা মবারকে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তখন তিনি বলিলেন, "ঐ 'কওম' (জাতি বা

সম্প্রদায়) কিরূপে ‘ফলাহ’ (মঙ্গল—শান্তি) পাইতে পারে, যাহারা আপনাদের নবীর চেহেরা এজন্ত রক্তাপ্ত করিতে পারে যে, তিনি তাহাদিগকে খোদার দিকে আহ্বান করেন ।” কাফেরগণ আপনাদের পূর্ণশক্তি, আঁ হজরতের (ছালঃ) হত্যা সাধন প্রয়োগ করিতে লাগিল ; ওদিকে কতিপয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাঁহাকে বেঠেন করিয়া থাকিয়া কাফেরগণের আক্রমণ রোধ করিতে লাগিলেন । হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ) আঁ হজরতের (ছালঃ) দিকে মুখ ফিরাইয়া পৃষ্ঠদেশ ঢাল স্বরূপ করিয়া রহিলেন । উপরোক্ত ব্যবস্থায় শত্রুর তীর-বর্ষম বর্ষণে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ চালুনির আকার ধারণ করিল ; কিন্তু সেই ধর্মগতপ্রাণ, জলন্ত বিশ্বাসী, রচুল ভক্ত ‘জান-নেছার’ (জীবনোৎসর্গকারী) পুরুষ অগ্নান বদনে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন ; একটু মাত্রও বিচলিত হইলেন না । হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাস্ (রাজিঃ), হজরত আবি তালুহা (রাজিঃ), হজরত যোবের-বিন্-আল্-আওয়াম (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্ যয়োফ্ (রাজিঃ) প্রভৃতি পরম ভক্ত ও বিশ্ব-ভ্রাস বীর পুরুষগণ, আঁ হজরতের ‘হেফাযৎ’ (সংরক্ষণ) জন্ত লোহ-প্রাচীরের স্থায় হজুরের (ছালঃ) চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকিলেন । সঙ্গে সঙ্গে তীর, নেযাঃ ও তরবারি চালাইয়া শত্রুদলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন । হজরত তালুহাঃ (রাজিঃ) শত্রুদলের অস্ত্রাঘাত স্বীয় হস্ত দ্বারা রোধ করিতেছিলেন ; বহু অস্ত্রাঘাতে তাঁহার একখানি হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়া একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গেল । হজরত য়েদাদ-বিন্-ছকন আনছারী (রাজিঃ) স্বীয় ■ জন সঙ্গীসহ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হেফাযৎ করিতে করিতে ঐ স্থানেই অতি শোচনীয় ভাবে শহীদ হইয়া গেলেন । হজরত এমার-বিন্-য়েদাদ (রাজিঃ) ■ আঁ হজরত (ছালঃ)-কে রক্ষা করিতে গিয়া ‘শাহাদৎ’ প্রাপ্ত হইলেন । ওস্বে এমারাঃ ■ নসিবাঃ বিস্তে কাসাব) নাম্নী বীরাক্ষণা যুদ্ধ দেখিবার

জম্ম মোসলমানদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন ; যখন
 দ্বি-প্রহরের পর যুদ্ধের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল ; তখন তিনি
 আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খুব নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন । এন্নে-
 কমিয়া যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-কে তরবারির আঘাত করিল, তখন এই
 বীরাক্ষণা তরবারি গ্রহণ পূর্বক এন্নে কমিয়াকে উপযু্যপরি দুইটী প্রচণ্ড
 আঘাত করিলেন ; কিন্তু উহার দেহ ডবল ঘরাঃ (বর্ম) দ্বারা আচ্ছাদিত
 ছিল, এজন্য তাহার গায় তরবারির আঘাত লাগিল না ; কিন্তু সে ওয়ে
 এমারাঃ (রাঃ—আঃ কে) তরবারির এক ভীষণ আঘাত করাতে, তাঁহার
 স্বকদেশের নিকট বাহমূল কাটিয়া গেল ; তিনি ভীষণ ভাবে আহত
 হইলেন । যখন আঁ হজরতের (ছালঃ) চতুর্দিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল,
 ঐ সময় এক পাষণ্ড কাকের নরাধম দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া হজরত (ছালঃ)-
 এর প্রতি একখানি প্রস্তর নিক্ষেপ করে, তাহাতে তাঁহার ওষ্ঠদেশে ভীষণ
 আঘাত লাগে ; সেই আঘাতে তাঁহার নীচের পাটির একটা দাঁত শহীদ
 হয় । এই অবস্থায় তাঁহার পা ‘মবারক’ এক গর্তে গিয়া পড়াতে তিনি
 তাহাতে পতিত হন । তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার
 ধরিলেন ; আর হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) এবং হজরত তাল্হা
 (রাজিঃ) তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন । যখন ছাহাবার কারাম (রাজিঃ)-
 গণ ক্রমশঃ যুদ্ধক্ষেত্রের নানাস্থান হইতে তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইতে
 লাগিলেন, মোসলমানদিগের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল ; এবং যুদ্ধ অতি
 ভীষণ ভাবে চলিতে লাগিল । তখন কোফ্ফারের আক্রমণ ক্রমশঃ শিথিল
 হইতে আরম্ভ হইল । ঐ সময় ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ কাকের
 দিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ পূর্বক দূরে হটাইয়া দিতে লাগিলেন । তখন
 আঁ হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগকে নিকটস্থ শাহাডের
 দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন ; এবং তদনুসারে সকলকে

লইয়া পাহাড়ের একটি টিলার আরোহণ করিলেন। পাহাড়ে আরোহণ করিবার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, কোফ্‌কারের বেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া পারাড়ের দিকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন পূর্বক অন্ততঃ শরীরের পশ্চাদিক কাকের-দিগের আক্রমণ হইতে যেন রক্ষা করিতে পারেন, এবং যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল ঐ স্থানে স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় বড়ই কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হইয়াছিল; মোসলমানগণ পাহাড়ের টিলার শীর্ষদেশে আরোহণ করাতে, কোরেশদিগের প্রধান সেনাপতি আবু-হুফিযান ও কতিপয় বোদ্ধপুরুষ সহ তথায় আরোহণ করিতে চেষ্টা করিল; তদর্শনে হজরত রুহুলে আকরম (ছালঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে আদেশ করিলেন যে, উহাদিগকে পাহাড়ের উপরে উঠিতে বাধা প্রদান কর। তদনুসারে হজরত ওমর (রাজিঃ) কতিপয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া, তাহার দলটিকে আক্রমণ পূর্বক পাহাড়ের নীচে হঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে মোসলমানদিগের সংখ্যা এইস্থলে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিক হইতে তাঁহারা আসিয়া আঁ হজরতের (ছালঃ) চারিদিকে সমবেত হইতে লাগিলেন। সুতরাং কোফ্‌কারের এমন সাহস হইল না যে, সেই স্থলে মোসলমানদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু আবি-বিন্-খলফ্‌ নামক একজন কাট্রা কাকের পূর্ব হইতেই আঁ হজরত (ছালঃ)-কে হত্যা করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। সে অশ্বারোহণে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আঁ (ছালঃ) তাহার আগমনে বাধা দিতে ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে নিষেধ করিলেন; সুতরাং সে বিনা বাধায় আঁ হজরতের নিকটে পহুঁছিয়া আক্রমণার্থ তরবারি উত্তোলন করিবামাত্র, হজুর (ছালঃ) হারেছ-বিন্-ছম্মা (রাজিঃ)-এর হস্ত হইতে নেযাঃ গ্রহণ পূর্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। নেযার ফলা উহার হাসলী অর্থাৎ গরদানের (ঘাড়ের) নীচের

অস্থিতে গিয়া লাগিল। এই আঘাত খুব সামান্য বলিয়া মনে হইয়াছিল ; কিন্তু সে এই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র ভয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবস্থায় মক্কার প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যেই তাহার পাপ জীবনের অবমান হয়। ওহদের যুদ্ধে এই একটা মাত্র কাফের আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে প্রথমে আহত, পরে নিহত হইয়াছিল।

অতঃপর আবু-ছুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কি তোমাদের মধ্যে আছে ? আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তোমরা একথার কোনই উত্তর দিও না। তদনুসারে তাহার কথার কোন উত্তর দেওয়া হইল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে কি (হজরত) আবুবকর (সিদ্দিক—রাজিঃ) আছে ? একথারও কোন উত্তর দেওয়া হইল না। পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে কি (হজরত) ওমর আব্দুল খেতাব (রাজিঃ) আছে ? ইহারও কোন উত্তর প্রদত্ত হইল না। সকলকে নীরব দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, বোধ হইতেছে ইহারা সকলেই ‘কতল’ (নিহত) হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) আর নীরব থাকিতে পারিলেন না ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, হে খোদার দোয়গ (শত্রু)। ইহারা খোদার ফজলে সকলেই জীবিত আছেন ; তুমি অবমানিত ও অপদস্থ হইবে। এই কথা শুনিয়া সে বিস্ময়াপন্ন হইল। কিন্তু একটু পরেই আত্ম-গরিমা-সূচক ভঙ্গী ও ভাষায় বলিতে লাগিল, হবলের জয়, হবলের জয়, (হবল মক্কার কোরেশদিগের একটা উপাস্ত দেবতা, ‘বোত’ বা প্রতিমা)। আঁ হজরতের (ছালঃ) উপদেশানুযায়ী হজরত ওমর (রাজিঃ) বলিলেন, “আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ বোয়গ” (শরীফ্—মহাসম্মানিত)। আবু-ছুফিয়ান হজরত ওমর ফারুকের (রাজিঃ) মুখে এই কথা শুনিয়া বলিল, ‘য়োজ্জ’ আমাদের ‘বোত’ (উপাস্ত দেবতা), তোমাদের নহে।

ওমর ফারুক (রাজিঃ), আঁ হজরতের (ছালঃ) ইঙ্গিত ক্রমে বলিলেন,

“আল্লাহ্ আমাদের ‘ওয়ারী’ (অধিপতি), তোমাদের ওয়ারী নহেন ।”
 তৎপর আবু-ছুফিয়ান বলিল, এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের সমান হইয়াছে,—
 অর্থাৎ আমরা বদর যুদ্ধের ‘বদলা’ (প্রতিশোধ) লইয়াছি । হজরত ওমর
 ফারুক (রাজিঃ) আ হজরতের (ছালঃ) ইঙ্গিত ক্রমে উত্তর দিলেন যে,
 না, তা কখনই নয় ; এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের সমান হয় নাই—হইতে পারে না ।
 কেননা, আমাদের শহীদগণ ‘জন্নত’ (বেহেশত্—স্বর্গ)-বাসী হইয়াছেন,
 আর তোমাদের পক্ষের নিহত লোক গুলি ‘দোষখ্’ (নরক) এ গমন
 করিয়াছে । ইহার পর আবু-ছুফিয়ান কিছুকাল চুপ হইয়া থাকিয়া আর
 কোনও রূপ বাক্যব্যয় করিল না । কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার
 ‘বোলন্দ আওয়াযে’ (উচ্চৈঃস্বরে) বলিল, অতঃপর আগামী বর্ষে ‘বদর
 ক্ষেত্রে’ তোমাদের সঙ্গে আমাদের ‘মোকাবেলা’ (বল-পরীক্ষা) হইবে ।
 আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, বলিয়া দাও, আচ্ছা, আমরা তোমাদের
 এই ‘ওয়ারী’ (প্রতিশ্রুতি) মঞ্জুর করিতেছি । আবু-ছুফিয়ান স্বীয় বক্তব্য
 বলিয়া এবং হজরত রেছালতমাবের (ছালঃ) ইঙ্গিতানুযায়ী হজরত
 ওমর ফারুকের (রাজিঃ) উত্তর শুনিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল ।
 তখন আ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে আবু-ছুফিয়ানের
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইলেন ; তাহাকে বলিয়া দিলেন, মক্কাবাসীদিগের
 যাত্রা করিবার ব্যাপার গোপনে প্রত্যক্ষ করিবে, যদি তাহারা উটের উপর
 হাওদা বা গদি বাঁধে, অশ্বগুলিকে শূন্য-পৃষ্ঠে রাখে, তবে উহারা মক্কাভি-
 মুখে যাত্রা করিবে ; আর যদি অশ্বোপরি আরোহণ করে, আর উটের
 উপর গদি না চড়ায়, তবে উহারা মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা রাখে । যদি
 তাহারা মদীনা আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তবে আমরা প্রথমেই
 উহাদিগকে আক্রমণ করিব । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আবু-ছুফিয়ানের
 পশ্চাদনুসরণ করিলেন ; এবং কিছুকাল পরে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বলিলেন,

উহারা উটের উপর চড়িয়া, অশ্ব গুলিতে জিনপোষ না কষিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সংবাদে আবু হজরত (ছালঃ) নিশ্চিন্ত হইয়া পাহাড়ের টিলা হইতে নিম্নে (যুদ্ধক্ষেত্রে) অবতরণ করিলেন ; ৬৫ জন আনছার ও ৪ জন মহাজেরীন এই ভীষণ যুদ্ধে 'শহীদ' (নিহত) হইয়াছিলেন। কাফেরগণ মোসলমানদিগের কোনও কোনও মৃতদেহ কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়াছিল। হেন্দাঃ-বিস্তে ওতবাঃ (আবু-ছুফিয়ানের স্ত্রী), হজরত আমীর হামযার 'লাশ' (মৃতদেহ) মোছলা করিয়াছিল ; অর্থাৎ তাঁহার নাক কাণ কাটিয়া ফেলিয়াছিল ; চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছিল ; বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া 'জগর' (হৃৎপিণ্ড) কাটিয়া বাহির করিয়াছিল ; এবং নরখাদিকাঃ রাকসীর স্তন উহা চিবাইয়াছিল, কিন্তু গলাধঃ করিতে পারিয়াছিল না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক বৃক্ষতলে তাঁহার পবিত্র বীরদেহে পড়িয়াছিল। আবু হজরত (ছালঃ) স্বীয় পরম ও জীবনোৎসর্গকারী, সিংহের বিক্রান্ত পিতৃব্যের মৃতদেহের এরূপ শোচনীয় দুর্দশা দেখিয়া রোদন করিয়াছিলেন। হেন্দাঃ এই সময় 'জগর-থার' (হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ কারিণী) নামে অভিহিত হইয়াছিল। মোসলমানদিগের 'আলম-দরদার' (পবিত্র পতাকাধারী) হজরত মছম্ব-বিন্-য়মির (রাফিঃ) এই যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন ; তাঁহার কাফনের জন্তু মাত্র একখানা চাদর ছিল ; সেই চাদর থানা এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকিলে পা খোলা থাকিত ; আর পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকিত ; অবশেষে চাদরখানা দিয়া মাথা ঢাকিয়া, ঘাস দ্বারা পদদ্বয় আচ্ছাদিত করা হইল। সমুদয় 'শোহাদা' (শহীদগণ)-কে বিনা গোছলে, শোণিত-রঞ্জিত অবস্থায়, প্রত্যেক কবরে দুই দুইটি করিয়া সমাধিস্থ করা হইল। আবু হজরত (ছালঃ) শহীদগণের জানাযা ও দফন কার্য সমাধা করিয়া সদল বলে মদীনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই যুদ্ধ—যাহা মদীনা হইতে ■ মাইল দূরে ওহদ ক্ষেত্রে সম্মুখিত হইয়াছিল, তাহাতে ‘আহদ-নামা’ (সন্ধিপত্র) অনুসারে মদীনার মুহাদ্দিনগণ মোসলমানদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মক্কার কাফেরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাধ্য ছিল। মোনাকেক দলপতি আবদুল্লা-বিন্-আবি যখন পশ্চিমধ্য হইতে ৩০০ শত সহগামী সহ মোসলমানদিগের সঙ্গে পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেল, এবং মোসলমান যোদ্ধাপুরুষদিগের সংখ্যা ১০০০ হইতে ৭০০ ■ দাঁড়াইল, তখন কোনও কোনও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-কে বলিয়াছিলেন, এ ■ সন্ধি-শর্ত অনুসারে মুহাদ্দিনদিগের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তিনি মুহাদ্দিনগণের সাহায্য গ্রহণ করা সঙ্গত বোধ করিলেন না; সুতরাং মুহাদ্দিনগণ নিশ্চিত মনে স্ব ■ গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। হারেছ বিন্-ছোয়েদ নামক একজন ‘মোনাকেক’ (কপটী), মোসলমানদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া ওহদে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল; যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ঐ পাশও মোনাকেক লোকটা মজযর-বিন্-যেয়াদ (রাজিঃ) ও কয়েস্-বিন্-যেয়াদ (রাজিঃ) নামক দুইজন মোসলমান-কে ‘শহীদ’ করিয়া মক্কাতিযুখে পলায়ন করিল। যুদ্ধের কিছুকাল পরে সে আবার মদীনায় ফিরিয়া আসিল; তৎপর সে ধৃত হইয়া হজরত ওসমান-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ)-এর হস্তে ‘কতল’ (নিহত) হইল।

আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায় পহুছিয়া পরদিন (৩য় হিজরীর ১৬ই শওরাল, রবিবার) আদেশ জারী করিলেন যে, যাহারা ওহদের যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল, কেবল তাহারাই এবার কোফ্ফারের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ■ যাত্রা করিবে। যাহারা ওহদ যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহার আগামী যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র জাবের-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ) নামক একজন ছাহাবাকে তিনি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। হজরতের আদেশানুসারে ওহদের যুদ্ধে যে সকল

ছাহাবাঃ (রাজিঃ) যোগ দিয়াছিলেন, তাহারা, এমন কি—আহত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ ও মহা উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । আ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনা হইতে বাহির হইয়া “ হামরা-আলু-আছদ ” নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, এবং ■ দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন । ঘটনাক্রমে মায়বদ-বিনু-আবি মায়বদ খ্যায়ী নামক এক ব্যক্তি মক্কায় বাইবার সময় ঐ দিক দিয়া গমন করিতেছিল । ‘মোশ্-রেকীন’ প্রত্যাবর্তন কালে “ কহা ” নামক স্থান পর্য্যন্ত গহছিল যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার প্রবৃত্ত হইল । এই যুদ্ধে যে তাহারা জয়ী হয় নাই, বরং পরাজিত হইয়াছে, আলোচনার দ্বারা তাহা স্থির হইল । এই যুদ্ধে তাহাদের ১৭ জন খ্যাতনামা বীরপুরুষ এবং কোরেশ দলপতি, আর ৫৬ জন অপর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাপুরুষ নিহত হইয়াছিল ; তাহারাই প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল ; মোসলমান পক্ষের একজন লোককেও তাহারা বন্দী করিতে পারিয়াছিল না, তাহাদের কোনও জিনিষ-পত্র হস্তগত করিতেও সক্ষম হইয়াছিল না ; মোসলমানগণ তাহাদের পরেও যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া স্বপক্ষীয় শহীদ লোকদিগের সমাধি কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, সুতরাং কোরেশদিগের জয়ী হইবার দাবী সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছিল । এক্ষণে তাহারা “ মারিব, কিংবা মরিব ” এইরূপ সঙ্কল্পাক্রম হইয়া, পুনরায় মদীনায় দিকে প্রধাবিত ও যুদ্ধ করিবার ■ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । তদনুসারে প্রধান সেনাপতি আবু-ছুফিয়ান এই সমগ্র সেনাদল লইয়া আবার কহা হইতে মদীনায় দিকে অভিযান করিতে প্রস্তুত হইল ; উদ্দেশ্য, এইবার বিপুল বিক্রমে মদীনা নগর আক্রমণ পূর্বক মোসলমানদিগকে নিশ্চূর্ণ করিবে । এই অবস্থায় পূর্বোক্ত মায়বদ-বিনু-আবি মায়বদ মদীনায় দিক হইতে কহায় আসিয়া গহছিল । ঐ ব্যক্তি আবু-ছুফিয়ান-প্রমুখ কোরেশ দলপতিগণকে এই সংবাদ শুনাইল যে, (হজরত)

মোহাম্মদ (ছালঃ) সদলবলে মদীনা হইতে বাহির হইয়া তোমাদের 'তায়াক্বব' (পশ্চাদ্ধাবন) করিবার জন্য ক্রতগতি আসিতেছেন। আমি ঐ মোসলমান সেনাদলকে " হামরায়ল-আসদে " দেখিয়া আসিয়াছি : আর সম্ভবতঃ তাহারা অতি সত্বরেই তোমাদের নিকট আসিয়া পহুঁছিব। এই সংবাদ শুনিবামাত্র কোরেশ সৈন্যদল ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া, উর্কখাসে মক্কাভিমুখে পলায়ন করিল। তাহাদের যত দর্প-গর্ব—যত দস্ত-বড়াই, মুহূর্ত্ত মধ্যে লোপ পাইল। ভীত ও আতঙ্কিত কোরেশ দল মক্কার পহুঁছিয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিল। আ হজরত (ছালঃ) যখন বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, কোরেশ ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় মক্কার দিকে পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে সদলবলে মদীনার প্রত্যাগমন করিলেন। এই অভিযানের ফলে মক্কার কোরেশদিগের হৃদয়ে মোসলমানদিগের ভয় দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। আবার এই অভিযানের ফলে মদীনা নগর কোরেশদিগের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

এই অভিযানের পর " বেলাহজ্জ " মাস পর্যন্ত আর কোনও উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। এই বৎসর রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে হজরত হাসান এব্নে আলী (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

হেজরতের চতুর্থ বৎসর।

৪র্থ হিজরীর ১লা মোহররম আ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন যে, " কতন " নামক স্থানে " বনি-আসদ " সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক বিপ্লববাদী সমবেত হইয়াছে ; তাহারা বিন্-খোয়েল্দ এবং সলমাঃ-বিন্-খোয়েল্দ তাহাদের নেতা বা পরিচালক। সংবাদ পাইবামাত্র আ হজরত (ছালঃ)

আবু-হালমাঃ-যখ্‌যোমি (রাজিঃ)-কে ১৫০ দেড়শত যোদ্ধাপুরুষ সহ তাহাদের দমন ■ পাঠাইলেন । হজরত আবু-হালমাঃ (রাজিঃ) “কতনে” পহুছিয়া জানিতে পারিলেন যে, বিপ্লববাদিগণ মোসলমানদিগের রওয়ানা হইবার সংবাদ শুনিয়া, তাহাদের পহুছিবার পূর্বেই পলায়ন করিয়াছে । তাহাদের কতকগুলি পালিত পশু মোসলমানদিগের হস্তগত হইল ; ঐ পশুপাল সহ হজরত আবু-হালমাঃ (রাজিঃ) মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

ওয়াদি আরফাতের নিকট “আরনাঃ” নামক একটি স্থান আছে, ঐ স্থানে ছফিয়ান-বিন্-খালেদ যিয্লী নামক একজন কাটো কামের বাস করিত । সে অন্তান্ত কাফেরদিগকে সমবেত করিয়া মদীনা আক্রমণের ■ রণ-সজ্জা করিতে লাগিল । উহার যুদ্ধ-সজ্জার সংবাদ ঐ হজরত (হালঃ)-এর নিকট ক্রমাগত আসিতেছিল । তদনুসারে তিনি ৪র্থ হিজরীর ৫ই মোহররম তারিখে আবদুল্লা-বিন্-আনিছ (রাজিঃ)-কে একদল সৈন্যসহ “আরনাঃ” অভিমুখে রওয়ানা করিলেন । আবদুল্লা-বিন্-আনিছ (রাজিঃ) দিবাভাগে সসৈন্তে কোথাও লুকাইয়া থাকিতেন ; এবং রাত্রিকালে পথ চলিতেন ; এইরূপে আরনার গিয়া পহুছিলেন ; এবং কোনও কোশলে বিপ্লববাদীদিগের নেতা ছফিয়ান-বিন্-খালেদ যিয্লীর মুণ্ডপাত করিলেন ; তিনি যুদ্ধ-হাঙ্গামার দিকে গেলেন না ; উহার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া অতি সতর্কতার সহিত সরিয়া পড়িলেন ; রওয়ানা হইবার ১৮ দিন পরে—২৩শে মোহররম তিনি মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং বিপ্লবপন্থী নেতার ছিন্ন মুণ্ড ঐ হজরতের (হালঃ) পদতলে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ মাসের সফর মাসে যক্ষার কোরেশগণ বনি-য়জল ও কারা- (বনু-আসদের ভাতা সম্পর্কিত) ■ ব্যক্তিকে ‘ফেরেব’ (চক্রান্ত) করিয়া ঐ হজরতের (হালঃ) সমীপে পাঠাইয়া দিল । উহারা মদীনার পহুছিয়া

‘হজুরের’ (ছালঃ) খেদমতে ‘আরজ’ করিল, আমাদের সমগ্র সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে ; অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে ধর্ম সঙ্কীর সর্ব প্রকার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান জন্য কতিপয় উপযুক্ত শিক্ষাদাতা মোসলমান পাঠাইয়া দিন, তাঁহারা আমাদের ইসলামের সর্ব-প্রকার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন । তদনুসারে আ হজরত (ছালঃ) সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, দশজন উপযুক্ত শিক্ষাদাতা মোসলমানকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন । এই ধর্মগ্রাণ মোসলমানগণ যখন বিশ্বাস ঘাতকদিগের সঙ্গে “ রজিয় ” নামক একটি কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন উহাদের ইঙ্গিত ক্রমে হযিল সম্প্রদায়ের ২০০ দুই শত গোন্ধপুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল । মোসলমানগণ আপনাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন ; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মোসলেম-বীরগণ আদর্শ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুর নিপাত সাধন পূর্বক ৮ জন সেই স্থানেই শহীদ হইলেন । কেবল খবিব-বিন্-আদি (রাজিঃ) ও যয়েদ-বিনল্-দহনাঃ (রাজিঃ)-কে কাকেরগণ ধৃত করিয়া মক্কায় লইয়া গেল ; কোরেশগণ এই দুইজন ধর্মগ্রাণ আদর্শ মোসলমানকে তরবারির আঘাতে ও শূলবিদ্ধ কাবয়া অতি নৃশংস ভাবে ‘শহীদ’ (হত্যা) করিল । ইহারা যে ভাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের রক্ষার্থে পরম ককণাময় আল্লাহ তা-লার এবং তাঁহার প্রিয় রচুলের আদেশ পালন পূর্বক নির্ভীক ভাবে জীবন দান করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল । ইহাদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে আ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) মণ্ডলী বড়ই দুঃখিত এবং মর্ষাহত হইলেন । ৪র্থ হিজরীর ‘সফর’ মাসে আবু-বরযা-বিন্-আমের নজদী, আ হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিলেন ; সে আপাততঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হইয়া বলিল, আমাকে আমার

সম্প্রদায়ের 'খেরাল' রহিয়াছে ; আপনি কতিপয় উপযুক্ত লোক আমায় সঙ্গে দিন, তাহার নজদে গমন পূর্বক আমার জাতির মধ্যে-ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করাবেন, এবং যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করিবেন। আ হজরত (ছাব:) করমাইলেন, নজদ বাসিদিগের সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ হইতেছে ; তাহারা আমার লোকদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। আবু-বরযাঃ বলিল, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন, আমি ইহাদিগকে নিজের হেফাজতে (তত্ত্বাবধানে) রাখিব। আ হজরত (ছাল:) তচ্ছুবণে নিশ্চিত হইলেন, এবং মন্থর-বিন্-ওমর-ছাদী (রাজিঃ)-কে ১০ জন ছাহাবীর (রাজিঃ) সঙ্গে নজদে রওজানা করিলেন ; এই ১০ জন ছাহাবাঃ সকলেই "কারি" (১) এবং "হাকেক" (২) ছিলেন। যখন ইহারা "আবুজ্-বহু-আমের" এবং "হরযাঃ-বহু-ছলিমের" মধ্যবর্তী "বীর-মউনায়" পৌঁছিলেন, তখন আ হজরত (ছাল:) একখানি পত্র হরাম-বিন্-মজান (রাজিঃ)-এর হস্তে আমের-বিন্-আল-তফিলের নিকট পাঠাইলেন। এই আমের-বিন্-আল-তফিল, পূর্বোক্ত আবুল বরার ভ্রাতৃপুত্র ছিল। সে এই পত্রখানি পড়িয়া ও দেখিল না ; হরাম-বিন্-মজান (রাজিঃ)-কে শহীদ করিয়া ফেলিল। পরে স্বীয় সম্প্রদায় বনি-আমেরকে উত্তেজিত করিয়া বলিল, এই সকল মোসলমানের হত্যা সাধন কর। কিন্তু বহু-আমের এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। তখন ঐ পাষণ্ড বহু-ছলিম সম্প্রদায়কে ঐ ভাবে উত্তেজিত করিল। তদনুসারে তাহাদের 'ছরদার' (দলপতি) রয়ল, যকোয়ান ও আছিয়াঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। আর বিনা দোষে ও বিনা কারণে ঐ সকল পাষণ্ড বর্বরগণ উপরোক্ত ১০ জন মোসলমানকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে 'শহীদ'

(১) বিস্তৃত উচ্চারণের সঙ্গে বিস্তৃত ভাবে কোরআন পাঠকারী।

(২) সম্পূর্ণ কোরআন পাক কর্তৃক (মুখস্থ) কারী।

(হত্যা) করিল। আবু-বরাঃ-বিন্-আমের বিন্-মালেকের হৃদয়ে, এই নির্দয়তা-মূলক ব্যাপারে নিদাক্ষণ আঘাত লাগিল। সে যাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবে বলিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল, তদীয় দানব প্রকৃতির ভাতৃপুত্র তাহাদিগকে অস্তি নির্দয় রূপে হত্যা করিল। বহুসংখ্যক নির্দোষ কারী, হাকেম, এবং আদর্শ মোসলমান অতি নৃশংস ভাবে শহীদ হইলেন। এই মানসিক যন্ত্রণায় আবু বরাঃ অতি অল্প দিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমের-বিন-তফিল, হজরত ওমর-বিন-ওমিয়া যমিরি (রাজিঃ)-কে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; সে তাঁহার দাড়ি মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। তিনি মদীনার পহুছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-কে সমুদয় ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) একমাস কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল দুর্দান্ত হত্যাকারিদিগের জন্ত বদ-দোওয়া (অভিশাপ) প্রদান করিয়া ছিলেন। পাশ্চ আমের-বিন-তফিল একমাস পরে শ্বেগ জাতীয় মহামারীতে শমন সন্নে প্রেরিত হইল। হত্যাকারী অন্যান্য বহুলোকও অচিরে জাহান্নম-বাসী হইল। বলা বাহুল্য, নজদী লোক চিরদিনই দুর্দ্বন্দ্ব, দুর্দান্ত ও কঠোর হৃদয়। ওহাবী নজদী আমীর এব্নে ছউদের ওহাবী ভক্তবৃন্দ ও সৈন্যদল গত ১৩৩১ বঙ্গাব্দে “তায়েফ্ ” শহরে ১৩১৪ শত মক্কা ওতায়েফ্ বাসী নির্দোষ মোসলমানকে অতি নির্দয় ভাবে হত্যা করিয়াছিল। উহারাই মক্কা-মোরাব্বিয়া ও মদীনা-তৈয়বাঃ এবং ওহদের সমুদয় আহলে বয়েত, খোল্ফায় রাশেদীনদিগের মধ্যে হজরত ওসমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ), হজরত এমাম হাসান (রাজিঃ), স্বর্গের রাজা হজরত ফাতেমা যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), মহাবীর হজরত হামযাঃ শহীদ (রাজিঃ), ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) গণ, প্রভৃতি শত শত বোষণের পাকা কবর ভাঙ্গিয়া ‘মেছমার’ করিয়াছে; মোসলমানদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই জালেম-চুড়ামণি এব্নে ছউদ আজ পবিত্র হেজাজের রাজা ও মক্কা-মদীনার খাদেম (?)।

হজরত ওমর-বিন-ওমিয়া (রাজিঃ) নজদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে শক্র-
 ভ্রমে বহু-আমেরের দুই ব্যক্তিকে কতল (হত্যা) করিয়াছিলেন। বহু-আমের
 সম্প্রদায় অ'। হজরত (ছালঃ) এর সঙ্গে সন্ধি-স্বত্রে আবদ্ধ ছিল ; সুতরাং
 উক্ত দুই ব্যক্তির 'খুনবহাঃ' (মৃত্যুপণ বা মৃত্যুর পরিবর্তে ধন দান) করা
 একান্ত কর্তব্য মনে করিয়া, অ'। হজরত (ছালঃ) এতৎ সম্বন্ধে বনি-নযির
 দলের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্তব্য মনে করিলেন । তদনুসারে হজরত আবু-
 বকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ■ হজরত আলী
 (কঃ—ওঃ) কে সঙ্গে লইয়া তিনি বনি-নযিরদিগের মহান্নার গমন করিলেন,
 এবং উপরোক্ত রূপ মৃত্যু-পণ দানের প্রস্তাব করিলেন ; তাহারা প্রকাশ্যে ■
 সেই ব্যাপারে যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইল ; ও আপনাদের দুর্গ প্রাচীরের
 ছায়ায় তাঁহাদিগকে বসিতে আসন দিল ; এবং অন্যান্য লোককে ডাকিয়া
 আনিবার 'ওছিলার' (ছলে) এদিক ওদিকে চলিয়া গেল । উহারা অ'।
 হজরত (ছালঃ) ও প্রধান ছাহাবা (রাজিঃ)-র কে বেস্থানে বনাইয়া
 ছিল, দুর্গের উচ্চ শীর্ষে স্থাপিত একখণ্ড একাঙ প্রস্তর তাঁহাদের উপর
 গড়াইয়া দিবার বেশ সূযোগ ছিল । তাহারা ইহাদের হত্যা সাধন জন্যই
 প্রস্তরখানি যথাস্থানে স্থাপন করে । ওমর-বিন-মহাছন নামক একজন যিহুদী
 ঐ প্রস্তর গড়াইয়া ফেলিবার জন্য দুর্গ শীর্ষে আরোহণ করিল ; প্রস্তর গড়াইয়া
 দিবার মুহূর্তকাল পূর্বেই পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লা " ওহী " দ্বারা
 অ'। হজরত (ছালঃ)-কে যিহুদি দিগের এই দুর্বৃত্তিসন্ধির বিষয় জ্ঞাপন
 করিলেন ; তদনুসারে ■ (ছালঃ) ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ত্রয়কে সঙ্গে
 লইয়া তৎক্ষণাৎ মদীনা প্রস্থান করিলেন । তাঁহাদের স্থান ত্যাগের
 ■ সময়েই সেই বৃহদাকার প্রস্তরখানি ভীষণবেগে নিম্নে পতিত হইল ।
 অ'। হজরত (ছালঃ) মদীনা পহুঁছিয়াই উহাদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন যে,
 তোমরা ২য় বার আহদ নামা (সন্ধিপত্র) লিখিয়া দাও । তাহা না হইলে ১০

দিনের মধ্যে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও । গর্বোন্মত্ত যিহুদিগণ ইহার কোনও প্রস্তাবেই সম্মত হইল না ; বরং ঔদ্ধত্য সহকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং তাড়াতাড়ি যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল । তদর্শনে অ'৷ (ছালঃ) হাশাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে লইয়া অনতিবিলম্বে উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর যিহুদিগণ পরাজিত হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল । মোসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিলেন ; ১৫ দিন অবরোধের পর তাহারা অ'৷ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট আশ্রয়-সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল । তদনুসারে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত সমগ্র গৃহ-সামগ্রী লইয়া বাইতে হজুর (ছালঃ) তাহাদিগকে অহুমতি দিলেন । তাহারা চিরদিনের জন্য জন্মভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক, কতক খরবের ও কতক শামে (সিরিয়ায়) চলিয়া গেল । উহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন যিহুদী পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । এই যুদ্ধ "গেয়-ওয়-বনি-নযির" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । ৪র্থ হিজরীর রবিওল-আউওল মাসে—অর্থাৎ ওহদ যুদ্ধের ছয়মাস পরে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল । ইহার পর বনু-মহারব এবং বনু-ছয়লবাঃ সম্প্রদায় বিপ্লব উপস্থিত করিবার উদ্যোগ করাতে, অ'৷ হজরত (ছালঃ) ৪০০ হাশাবাঃ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন ; কিন্তু অ'৷ হজরতের আগমন সংবাদ পাইয়াই তাহারা একান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল, সুতরাং মোসলমানদিগকে আর যুদ্ধ করিতে হইল না । অ'৷ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন । আবু-ছুফিয়ান আগামী বর্ষে বদর-ক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ আসিবে বলিয়া গিয়াছিল । মদীনার মোনাফেকগণ কোরেশদিগকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উত্তেজিত করিতে লাগিল । নসীম নামক মোনাফেক মক্কায় দূত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল । কোরেশদিগের

নিকট হইতে পুরস্কার লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়া, মদীনায় আসিয়া যোষণা করিতে লাগিল যে, কোরেশগণ বিরাট আয়োজনের সঙ্গে মদীনা আক্রমণ করিতে আসিতেছে ; এই সংবাদে মোসলমানগণ চিন্তিত ও ভীত হইলেন ; কিন্তু আবু হজরত (ছালঃ) তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া ১৫০০ ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) সহকারে বদরাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন । এই অভিযানে তিনি স্বীয় যুদ্ধ-পতাকা হজরত আলী (রাজিঃ)-এর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন । তাহার সেনাদলে অখারোহী সৈন্য ছিলেন মাত্র ১০ জন, অবশিষ্ট সকলেই পদাতি সৈন্য ছিলেন । কোরেশদিগের এ সময় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, আবু হজরতের (ছালঃ) সসৈন্তে বদর যাত্রার সংবাদে আবু-ছুফিয়ান অগত্যা সসৈন্তে বদরাভিমুখে অগ্রসর হইল । তাহাদের সৈন্ত-সংখ্যা ছিল ২০০০ দুই হাজার, তন্মধ্যে অখারোহীর সংখ্যা ছিল ৫০ । তাহারা ‘ম্যাছফান’ নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ভয়ে এই বলিয়া মকায় প্রত্যাবর্তন করিল যে, এবার মকায় বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত ; এই দুর্ভিক্ষের সময় যুদ্ধ সঙ্গত নহে । এই যোদ্ধাদল যখন মকায় প্রত্যাবর্তন করিল, তখন তত্ৰত্য বীর রমণীগণ তাহাদিগকে ধিকার দিয়া বলিল, তোমরা ত কেবল ছাতু খাইতে গিয়াছিলে ; যদি যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যাইতে, তবে কাপুরুষের ন্যায় বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিতে না । কোরেশগণ রসদের অল্প কতকগুলি ছাতুর বস্তা মাত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, এজন্য এই যুদ্ধ “জরেশ-আস্-সজিক ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । আবু হজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের আগমন প্রতীক্ষায় ৮ দিন পর্য্যন্ত বদরে অবস্থিতি করিলেন ; যখন শুনিতে পাইলেন যে, কোরেশগণ “ম্যাছফান ” নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া মকায় ফিরিয়া গিয়াছে, তখন তিনিও সসৈন্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । ৪র্থ হিজরীর রজব মাসে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ।

• আবু হজরত (ছালঃ) শাবান মাসের প্রারম্ভে মদীনা-মক্কায়

ফিরিয়া আসিলেন। এই বৎসরেই হজরত আলীর (রাজিঃ) ২য় পুত্র
 [redacted] এমাম হোসাইনে (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আর এই বৎসরেই
 ‘শরাব’ (সুরা) হারাম হওয়া সহস্রীয় আয়াত ‘নাযেগ’ (অবতীর্ণ) হয়।
 আবার এই বৎসরেই ওসমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ)-এর পুত্র আবদুল্লা
 ৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই বৎসরেই জয়নব-বিন্-
 খয়মাঃ পরলোক গমন করিয়াছিলেন; আর আবদুস্-সালাম মখ্‌মূরী
 (রাজিঃ) মৃত্যু হওয়াতে; তাঁহার বিধবা পত্নী ওম্মে-ছালমাঃ (রাঃ—আঃ)
 কোঁ আঁ হজরত (ছালঃ) পরিণয়-শূত্রে আবদ্ধ করেন। আবার হজরত
 কাতেমাঃ—বিস্তে-আছিন (রাঃ—আঃ) অর্থাৎ হজরত আলী করমুলাহ
 ওরাজহর ‘ওয়ালেদা-মাজেদা’ (জননী) ও এই ঐশ্ব ফিজরীতেই পরলোক
 গমন করেন।

হেজরতের ৫ম বৎসর ।

(৫ম হিজরী)

বদরের দ্বিতীয় অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ),
 ৩।৭ মাস মদীনা-মক্কাওয়ার ‘কেয়াম ফরমাইলেন’ (অবস্থান করিলেন)।
 এই কয়েক মাস সম্পূর্ণ শান্তির সহিতই অতিবাহিত হইয়াছিল। ৫ম
 হিজরী—রবিওল-আউওল মাসের প্রারম্ভে আঁ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ
 পাইলেন যে, সিরিয়া-সীমান্তস্থিত দোমতল জনদের শাসনকর্তা খৃষ্টীয়
 ধর্মাবলম্বী আকিদর-বিন্-আল্-মালেক, মদীনা-মক্কাওরা আক্রমণ করিবার
 [redacted] এক বিরাট বাহিনী সম্বিষ্ট করিয়াছে। আর যে সকল তেজস্বী
 কাফেলা (বণিক দল) মদীনা হইতে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া শামে (সিরিয়ার)

গমন করে, সে পশ্চিমধ্যে তাহাদের সামগ্রী-সত্তার লুণ্ঠিমা হয় । এই মুকুন শত্রু ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে ; আর উহারা মদীনা তৈয়বাঃ আক্রমণ করিলে এ রূপ আশঙ্কা ও আছে যে, মোনাফেকগণ, যিহুদিগণ, আশপাশের আরব সম্প্রদায় (যাহারা তখনও পৌত্তলিক ছিল) মোসলমান-দিগের বিপদ আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিবে ; এজন্য আ হজরত (ছালঃ) উচিত মনে করিলেন যে, প্রবল আকার ধারণ করিবার পূর্বেই এই বিপ্লবের মূলোৎপাটন করা কর্তব্য । তদনুসারে তিনি দোমতল জন্মলের শাসনকর্তাকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ছবার-বিন্-আরফতাহ্ গফ্ ফারি (রাশিঃ)-কে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োগ পূর্বক, স্বয়ং এক হাজার যোদ্ধাপুরুষ সঙ্গে লইয়া দোমতল জন্মল অভিযুখে অভিযান করিলেন । দোমতল-জন্মল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন নগরী “ দামেশ্‌ক্ ” শহর হইতে দক্ষিণে ৫ মণ্ডেল, ও মদীনা-তৈয়বাঃ হইতে উত্তরে ১০ মণ্ডেলের পথ— ‘শামের’ (সিরিয়ার) দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত । অর্থাৎ হেজাজ প্রদেশের উত্তর ও শাম দেশের দক্ষিণ দিকে এই স্রবাটী তখন অবস্থিত ছিল । আ হজরত (ছালঃ), বিন্-আরফ্‌ হ্ এর এক ব্যক্তিকে পথ-প্রদর্শক রূপে সঙ্গে লইয়াছিলেন । যখন দোমতল-জন্মল এক রাত্রির পথ দূরে রহিল, তখন পথ-প্রদর্শক বলিল, শত্রুদলের ‘চেরাগাহ্’ (পশু-চারণ-ভূমি) অতি নিকটেই অবস্থিত, উহাদের পশুপাল এই স্থযোগে হস্তগত করা উচিত মনে করিতেছি । তদনুসারে আ হজরত (ছালঃ), মোসলমান দিগকে শত্রুদলের পশুদল হস্তগত করিতে আদেশ দিলেন । আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মোসলমানগণ অগ্রসর হইয়া শত্রুদিগের বিরাট পশুদল হস্তগত করিলেন । এই সংবাদ যখন দোমতল-জন্মলের শাসনকর্তার নিকট পৌঁছিল, তখন এত শীঘ্র মোসলমান সেনাদলের তথায় উপস্থিত হইবার ব্যাপারে [redacted] ভীত ও [redacted] হইয়া সে পলায়ন করিল । শত্রুদল

‘ফেরার’ (পলারন পর) হওয়ার্তে ঐ হজরত (ছালঃ) কিসদিবস সেখানে অবস্থান পূর্বক, যোদ্ধাপুরুষদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু শত্রুপক্ষ হইতে কেহই তাঁহাদের সম্মুখীন হইল না । এইরূপে শামের (সিরিয়ার) সীমান্ত প্রদেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া, তিনি সদলবলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে পাঁচ মাস কাল পর্যন্ত কোনও প্রকার উল্লেখযোগ্য ‘আহম’ (গুরুতর) ঘটনা ঘটিয়াছিল না । এই অবসরে ঐ হজরত (ছালঃ)-ছাহাবার কারাম (রাজিঃ)-দিগের ‘তরবিয়ত’ (শিক্ষা-দীক্ষা কার্য) এবং তবলিগলু-ইসলাম (ইসলাম-ধর্ম-প্রচার কার্য) আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন । ৫ম হিজরীর শাবান মাসে সংবাদ পৌছিল যে, “ বহু-আলু-মহতালক ” সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি) হারেছ-বিন্-জরার বিপুল আয়োজনের সহিত সমর-সজ্জা করিতেছে । আর সে আরবের অন্তান্ত ‘কবায়েল’ (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী)-কে আপনার ‘শরীক’ (দলভুক্ত) করিয়া লইতেছে । ঐ হজরত (ছালঃ) প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার ■■■ বরিদাঃ-বিন্-হাছিব (রাজিঃ)-কে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠাইলেন । তিনি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যে অবস্থা জানিতে পারিলেন, প্রত্যাবর্তন পূর্বক ঐ হজরত (ছালঃ)-কে তাহা বলিলেন । তিনি বলিলেন, হারেছ-বিন্-জরার মোসলমানদিগের জড়-মূল উৎপাটিত করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, এবং তৎক্ষণাৎ যতদূর সম্ভব, নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে । সে বহু বিভিন্ন সম্প্রদায় (দল বা গোষ্ঠী)-কে আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে । সন্ধ্যা সন্ধ্যাই সংবাদ পৌছিল যে, হারেছ অতি সম্বরে বিপুল বাহিনী লইয়া মদীনা আক্রমণার্থ অগ্রসর হইবে । তদনুসারে ঐ হজরত (ছালঃ) ■ তৎক্ষণাৎ মোসলমান বীরপুরুষদিগকে সজ্জিত হইবার ■■■ আদেশ দিলেন । মদীনায় যয়েদ-বিন্-হারেছাঃ (রাজিঃ)-কে

শীঘ্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া — ‘লশ্-কর-এম্-সাম’ (মোসলমান সেনাদল) সহকারে ক্রতবেগে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । মহাজেরিন ও আনুহার দিগের দুইটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ‘আলম’ (যুদ্ধ-পতাকা) ছিল । আনুহার দিগের যুদ্ধ-পতাকা হজরত ছায়াদ-বিন্-এবাদার (রাজিঃ) হস্তে, আর মহাজেরিন দিগের যুদ্ধ-পতাকা হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাজিঃ) হস্তে দেওয়া হইয়াছিল । হজরত ওমর-কাকক (রাজিঃ)-কে “মকদমাতুল-জয়েশ্” অর্থাৎ অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন । প্রত্যেক যুদ্ধে মোসলমানদিগকে সাফল্য মণ্ডিত দেখিয়া, যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার লাভের আশায় ‘মোনাকেক’ (কপটাচারী)-দিগের দলপতি আবদুল্লা-বিন্-আবি ও, তাহার দলের মোনাকেক দিগকে সঙ্গে লইয়া এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল । এই মোনাকেক দল প্রকাশ্য ভাবে আপনাদিগকে মোসলমান বলিয়া পরিচয় দিত, একান্ত মোসলমানদিগের সর্বপ্রকার ‘হক্-হকুক’ (স্বত্ব ও অধিকার) উহারা লাভ করিত । সুতরাং যুদ্ধে যোগদান করিতে তাহাদিগকে নিষেধও করা যাইত না ; আবার মোসলমানগণ এখন পর্য্যন্ত এমন শক্তিশালী হইয়াছিলেন না যে, প্রকাশ্য-ভাবে উহাদিগের সঙ্গে শত্রুতা ও যুদ্ধাদি করিয়া এই প্রবল দলটির যুলোৎপাটন করিতে পারেন ।

হারেছ-বিন্-জরার এক ‘জাহুছ’ (গোয়েন্দাঃ বা গুপ্তচর) পাঠাইয়াছিল, ঘটনাক্রমে সে মোসলেম সৈন্যদলের সম্মুখে পতিত হইয়া ধৃত হয় ; তাহাকে তৎক্ষণাৎ আ হজরত (ছালঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল ; সে যখন গুপ্তচর বলিয়া ‘দাব্যন্ত’ (প্রমাণিত) হইল, এবং ইসলাম-ধর্মগ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল, তখন তদানীন্তন ‘জকী-কানুন’ (সামরিক আইন) অনুসারে উহাকে ‘কতল’ (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা হত্যা) করা হইল । হারেছ যখন জানিতে পারিল, তাহার গুপ্তচর ধৃত ও নিহত হইয়াছে, এবং আঃ হজরত

(ছালঃ) সসৈন্তে—ক্রম গমনে অতি নিকটে পহুছিয়া গিয়াছেন, তখন সেনিতান্ত 'পেরেশান' (চিন্তাযুক্ত) ও 'বদ-হাওয়াছ' (ভীত ও সম্বস্ত) হইয়া পড়িল। অ' হজরত (ছালঃ) অগ্রসর হইয়া 'চশমা' (বারণা) মরহিমির তটে গিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। অগত্যা হারেছ ও নিজের সেনাদল লইয়া ঐ চশমার (ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর) অপর তটে আসিয়া পহুছিল। অ' হজরত (ছালঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে আদেশ করিলেন, তুমি অগ্রসর হইয়া হারেছকে ইসলামের 'দাওত' দাও (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ জন্য প্রস্তাব বা অনুরোধ কর) ; তদনুসারে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) অগ্রসর হইয়া উহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ জন্য আহ্বান করিলেন ; কিন্তু সে অতি বে-আদবীর সহিত ক্রটভাবে উহাতে এন্কার (অস্বীকার) করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই উভয় প্রতিপক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ করিল। ঘোরতর যুদ্ধের সম্মুখ কোফ্ফারের 'আলম-বরদার' (পতাকা-ধারী), হজরত আবু-কেতাদাঃ (রাজিঃ)-এর হস্তে নিহত হইল। হারেছের পতাকা-ধারী নিহত হওয়াতে, কাকের সেনাদলের পদ-স্থলন হইল, তাহারা ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া মোসলমান যোদ্ধাপুরুষদিগের সম্মুখ হইতে উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। বহু-সংখ্যক কাকের নিহত, আহত ও বন্দী হইল। বন্দীদিগের মধ্যে জোবেরিয়া নামী কাকের সেনাপতির এক কন্যাও ছিলেন। 'মালে গনিমত' (যুদ্ধে জয়-লব্ধ দ্রব্য-সামগ্রী) ■ বহু পরিমাণে মোসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মরহিমি নামী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তটে—যে স্থানে বনি-মছতলক সম্প্রদায়স্থ যিহুদিদিগের সঙ্গে অ' হজরতের (ছালঃ) যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, উহা মদীনা-মহুওরাঃ হইতে ৯ ■ পথ দূরে অবস্থিত।

অ' হজরত (ছালঃ)-এর এই অভিযান ও এই ছফরে আর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে ঘটনাটি এই :—

এই অভিযানে ওম্মোল-মুমেনি (মোসলেম-মাতা) হজরত আরশা-
সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), আ হজরত (ছাগঃ)-এর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন ।
“মক্কেল” রাত্রিকালে মোসলমান সৈন্যগণ শিবির স্থাপন করিলেন । সেখান
হইতে রওয়ানা হইবার সময় হজরত আরশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর
‘হোদজ’ (হাওদা) উটের উপর স্থাপন করা হইল ; কিন্তু একথা জানিতে
পারা গিয়াছিল না যে, তিনি হোদজের মধ্যে আছেন কিনা ? কারণ তিনি
কীর্ণাঙ্গিনী ছিলেন বলিয়া উষ্ট্র-চালক তাঁহার অসুপস্থিতি বুঝিতে পারিয়া
ছিল না । ফলতঃ তিনি “ রফায়ে-হাজত ” জন্ত শেষ রাতে মরদানের
দিকে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন । হঠাৎ এক ছড়া হার ছিঁড়িয়া যাওয়াতে
উহা কুড়াইয়া লইতে তাঁহার কিছু বিলম্ব ঘটয়াছিল । তিনি প্রত্যাবর্তন
পূর্বক শিবির-সন্নিবেশ স্থানে আসিয়া দেখিলেন, সে স্থান শূন্য পড়িয়া
আছে ; সেনাদল তাম্বু-কানাৎ তুলিয়া সশস্ত্র পন্থাদি চলিয়া গিয়াছেন ।
তখন ওম্মোল মুমেনি (রাঃ—আঃ) বড়ই উৎকণ্ঠিত ও চিন্তাযুক্ত হইয়া
পড়িলেন । এই অবসরে ছফ্-ওয়ান-বিন্-মরতল (রাজিঃ)-কে স্বীয়
উষ্ট্র লইয়া পশ্চাদিক হইতে আসিতে দেখা গেল । ছফ্-ওয়ান-বিন্-মরতল
(রাজিঃ), এই বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন যে, তিনি পশ্চাত্তাপে
(সেনানিবাসের শেষ প্রান্তে) অবস্থান করিবেন ; আর কাফেলা রওয়ানা
হইয়া গেলে, সর্বশেষে পরিত্যক্ত ‘কেয়ামগাহ’ (শিবির-সন্নিবেশ-স্থান)
বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক পরে কাফেলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিবেন । যদি কাফেলার কাহারও কোন জিনিষ ভ্রমক্রমে সেখানে
পড়িয়া থাকে, তাহা যেন উঠাইয়া লইয়া আইসেন । এই বন্দোবস্তে
কাহারও কোন জিনিষ হারাইবার বা পরিত্যক্ত হইবার সন্দেহনা ছিল না ।
‘হাছবে-দস্তুর’ (যথা নিয়মে) ছফ্-ওয়ান (রাজিঃ), শিবির সন্নিবেশ-স্থান
পরিদর্শন করিতে করিতে স্বীয় উষ্ট্র সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ;

এবং অদূরে বোরকাবৃত ওম্মোল-মুয়েনিন (মোস্লেম-মাতা)-কে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে হইতে [] পূর্বক মহামাননীয়া মোস্লেম-মাতাকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আর [] উষ্ট্রের 'মহার' (নাসিকা-রজ্জু) ধরিয়া [] অগ্রে চলিতে লাগিলেন ; এবং অনতিবিলম্বে মূল সেনাদলে গিয়া পহুছিলেন ; আর মোস্লেম-মাতা হজরত আরেশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) কে কাকেলার পহুছাইয়া দিলেন । যখন তিনি সেনাদলে আসিয়া পহুছিলেন, তখন ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং আ হজরত (ছালঃ) [] মোসলমানগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন ; আর ছফ্-ওয়ান (রাজিঃ) এর কার্যের সকলেই প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন । তিনি না থাকিলে মোস্লেম-মাতার (রাঃ—আঃ) কি অসুবিধা ও কি বিপদ ঘটিত, সে বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল । কিন্তু ছরাচার মোনাফেক (কপটা-চারী)-দিগের পক্ষ হইতে একটা দুর্গাম রটনা করিবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিল । তাহার পবিত্র চরিত্র মোস্লেম-মাতার (রাঃ—আঃ) প্রতি কলঙ্কারোপ করিয়া, মোসলমান সেনাদলের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল । আ হজরত (ছালঃ) এ সম্বন্ধে 'খামুশী' (নীরবতা) অবলম্বন করিলেন ।

ওম্মোল-মুয়েনিন হজরত আরেশা সিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) প্রতি মোনাফেকগণ যে কলঙ্কারোপ করিয়াছিল, তাহার ফল এই হইল যে, তিনি সুদীর্ঘ দেড়মাস কাল পিতৃ-গৃহে থাকিতে বাধ্য হইলেন । ইহাতে তাঁহার, তাঁহার পিতা হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ) এবং তদীয় পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের যে কি মানসিক যন্ত্রণা হইয়া ছিল, তাহা বর্ণনাতীত । মোসলমান দিগের মনে সাধারণ ভাবে মোস্লেম-মাতার (রাঃ—আঃ) চরিত্রের পবিত্রতা, নির্দোষিতা [] 'মজলুমী' (অত্যাচারগ্রস্ত) হওয়া

সময়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; তাঁহার প্রতি মোসলমান মাতেরই সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। মাসাধিক কাল পরে পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার পক্ষ হইতে, মোসলেম-মাতা সিদ্দিকার (রাঃ—আঃ), পবিত্রতা নির্দোষিতা সম্বন্ধে আদেশ 'নাযেল'—অর্থাৎ কোরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হইল। খোদা তা-লা সিদ্দিকার "সিদ্দিকা" হওয়া সম্বন্ধে 'গাওয়াহী' (সাক্ষ্য) প্রদান করিলেন। আ হজরত (ছালঃ) তখন মোসলেম-মাতা (রাঃ—আঃ)-কে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। এই ঘটনার বহুপূর্বে আর এক সিদ্দিকার প্রতি ও যিহদিগণ মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন হজরত ঈসা আলায়হেস্—সালামের জননী পবিত্রচরিত্রা বিবী মরিয়ম। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যিহদিগণ অবস্থা কলঙ্কারোপ করিয়া, মহা বিচারক আল্লাহ তা-লা কর্তৃক সমুচিত দণ্ডভোগ করিয়াছিল। এই সিদ্দিকার প্রতি কলঙ্কারোপকারী মিছদী অর্থাৎ মোসল-মান নামধারী কপট মোনাফেকগণ ও বিশেষ দণ্ডভোগ করিয়া পাপের সমুচিত প্রতিফল লাভ করিয়াছিল।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনি-মন্তলক সম্প্রদায়ের ছরদার (দল-পতি) হারেছের কন্যা জোয়েরিয়াঃ মোসলমানদিগের বন্দি হইয়া-ছিলেন; বন্দী বন্টনকালে তিনি ছাবেত-বিন্-কয়েস (রাজিঃ)-এর ভাগে পড়িয়াছিলেন। হারেছ কিছুদিন পরে মদীনার আসিল, এবং স্বীয় কন্যাতীর 'আযাদ' (মুক্তি) প্রদানের প্রার্থনা জানাইল। আ (ছালঃ) তাঁহার প্রার্থনামুসারে নিজ হইতে ফিদিয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম-প্রাণা বুদ্ধিমতী কন্যা পিতার সঙ্গে যাওয়া অপেক্ষা, আ হজরত (ছালঃ) এর 'হেফযতে' (তত্ত্বাবধানে) থাকাই পছন্দ করিলেন। তখন আ হজরত (ছালঃ) তাঁহার অভিপ্রায় ও হারেছের অহুমোদনামুসারে এই ইসলামের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন

ধর্ম-প্রাণী বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে ■■■ বিবাহ করিলেন; সুতরাং তিনি মোসলমানদিগের মাতা হইবার গৌরব লাভ করিলেন; এই বিবাহে এই সুফল ফলিল যে, ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) গণ বনি-মন্তলক সম্প্রদায়ের যে সকল লোক বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এই বলিয়া মুক্তি প্রদান করিলেন যে, যে সম্প্রদায় ঈ। হজরতের (ছালঃ)-এর 'রেশ-তাদার' (বৈবাহিক সংঘে আবদ্ধ) হইয়াছে, আমরা সেই সম্প্রদায়ের কোরেশদিগকে গোলাম (ক্রীতদাস) করিয়া রাখিতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে যে সকল 'মালে-গণিমত' (যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) লইয়াছিলেন, ■ ভাগে পাইয়াছিলেন, সে সকল ■ বনি-মন্তলক সম্প্রদায়কে ফেরত দিয়া দিলেন।

খন্দক অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধ।

অতঃপর কতিপয় ছোট ছোট মোস্লেম,-সেনাদল, কতিপয় মোস্লেম-বিষেবী বা বিপ্লববাদী কিংবা বিদ্রোহোন্মুখ জাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হওয়াতে, তাহারা দমিত হইল। বনি-নযীর দলের হাই-বিন্-আখ-তব সর্বাধিকার বড় 'মোফ্-ছেদ' (বিবাদ-প্রিয়—বিপ্লববাদী) ছিল; সে এবং বনী নযীরের প্রধান অংশ বা বৃহৎ দল মদীনা হইতে নির্বাসিত হইয়া "খয়বরে" বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিল। হাই-বিন্ আখ-তব, ছালাম-বিন্-আবিল হকিক্, ছালাম-বিন্-মশকম, কেনানা-বিন্-আল্-রবীয় প্রভৃতি বনি-নযীরের ছরদার (দলপতি) গণ, এবং হদ-বিন্-কয়েস ও আবুল এমারাঃ প্রভৃতি বহু-ওয়ারেলের ছরদার (নেতা) গণ ■ মতাবলম্বী লইয়া প্রথমতঃ মক্কায় প্রযমন করিল। সেখানে গিয়া কোরেশদিগকে মদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহার্থে চাঁদার 'কেহরেস্ত'

(লিষ্ট বা খাতা) ■ খুলিল ; তদনুসারে কোরেশগণ বিপুল মাল ও অর্থ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রদান করিল । তৎপর পূর্বোক্ত বিপ্লব বাদিগণ কোরেশদিগের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ আটুয়া, প্রবল গংফান সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিকট গমন করিল ; সেখানেও ইহাদের বিশেষ সাফল্য লাভ ঘটিল । তাহারাও মহোৎসাহে ইহাদের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকৃত হইল । বহু-কেনানাঃ সম্প্রদায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে, এবং তাহাদের মূলোৎপাটন করিতে রাজী হইল । তৎপর মদীনাবাসী অবশিষ্ট রিহদিগণের (বহু-করিজার) সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিল । যদিও বহু-করিজার সঙ্গে এতাবৎ কাল আ হজরত (ছালঃ)-এর সন্ধি-বন্ধন ছিল ; কিন্তু তাহারা সে সন্ধি-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল । আর বহু-ছলিম ছত্তারাঃ, সজর, বহু-ছায়াদ, বহু-মররাহ প্রভৃতি সম্প্রদায় ও উপজাতির লোকদিগকেও এই যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য বাধ্য করিল । এই ‘তহরিক’ (প্রস্তাব এবং আন্দোলন) যখন উন্নতির চরম সীমায় উঠিল, দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইল, তখন কোরেশ জাতি, বহু-নজীর, বহু-গংফান প্রভৃতি প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের ৫০ জন ছরদার (দলপতি বা নেতা), কাবাগৃহে গিয়া শপথ করিল যে, আমরা যতদিন জীবিত থাকিব, মোসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হইব না । আর ইসলামের তিত্তি উপাড়িয়া ফেলিতে,—উহার অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যোগের কিছুমাত্র ক্রটি করিব না ।

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে কোরেশ দলপতি আবু-ছুফিয়ান মকার কোরেশ ও অন্যান্য বংশীয় যোদ্ধ-পুরুষ এবং সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ■ চারি সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য লইয়া, মক্কা হইতে মদীনাতিমুখে রওয়ানা হইল । ‘মরান-তহরান’ নামক স্থানে বনি-ছলিমের যোদ্ধদলও এই সেনাদলে আসিয়া যোগদান করিল । এইরূপে এই সেনাদল যতই

মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোদ্ধাপুরুষগণ আসিয়া এই অভিযানকারী বিরাট বাহিনীর দলপুষ্টি করিতে লাগিল। বনি-নজ্জীরের ছরদার হাই-বিন্-আখ্-তব ■ গৎফান সম্প্রদায়ের ছরদার আইনিয়া:-বিন্-জহিন, ■ স্ব সেনাদলের সেনাপতি নির্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সেনাদলের সর্বপ্রধান সেনাপতি ছিল কোরেশ দলপতি আবু-তুফিয়ান। এই প্রবল সেনাদল যখন প্রচণ্ড বাত্যাবর্ষের স্থায় অগ্রসর হইয়া মদীনার সম্মিধ্যে উপস্থিত হইল, তখন অনেক ঐতিহাসিকের মতে উহাদের সংখ্যা ২৪ হাজার ছিল; আর কোনও কোনও ইতিবৃত্ত লেখক ঐ সৈন্যদলের নিম্নতম সংখ্যা ১০ হাজার নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং মাঝামাঝি একটা সংখ্যা ধরিলেও এই সংখ্যা ১৫।১৬ হাজারে দাঁড়ায়। মূলকথা, হীতপূর্বে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে এরূপ বিরাট সেনাদল আর কখনও অভিযান করে নাই। এই বিশাল সেনাদলের সঙ্গে ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার উষ্ট্র ও ৩০০ শত অশ্ব বা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এই বিরাট সেনাদলের মক্কা হইতে রওয়ানা হইবার সংবাদ যখন আবু হজরত (ছাল:) প্রাপ্ত হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ একটা পরামর্শ-সমিতি বা সমর-সভা আহ্বান করিলেন। পরামর্শ সভায় স্থির হইল যে, মদীনা নগরের মধ্যে থাকিয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই সময় হজরত ছলমান ফারহী (রাজি:) পরামর্শ দিলেন যে, আমাদের দেশে (পারস্তে) 'হাম্লা-আওর' (আক্রমণকারী) সৈন্যদল হইতে 'মহ্-ফুহ' (নিরাপদ) থাকিবার জন্য 'মহ্-ছুর' (অবরুদ্ধ) অধিবাসী ও সৈন্যগণের সম্মুখে (সীমান্ত স্থলে) 'খন্দক' (পরিখা বা নাল) খনন করা হয়; এবং তদ্বারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া থাকে। হজরত ছলমান ফারহী (রাজি:) পারস্ত দেশবাসী ছিলেন বলিয়া, এইরূপ পরিখা খনন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। আবু হজরত (ছাল:) তাঁহার প্রস্তাব খুব 'পছন্দ'

(মনোনীত) করিলেন। মদীনা নগরের একদিকে পাহাড়-শ্রেণী ছিল ; সেদিকে মদীনা-মহুওয়রার গৃহাবলী, প্রাচীর সমূহ, নগরের রক্ষা-প্রাচীরের কার্য্য করিতেছিল। আর নগরের যে দিক খোলা ■ অরক্ষিত ছিল ; এবং যে দিক দিয়া শত্রুদলের আক্রমণ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, অতি সতর্কতা ■ সত্বরতার সহিত ঐ দিক দিয়া পরিখা খননের কার্য্য আরম্ভ করা হইল। পাহাড়ের ‘ছেল-ছেলা’ (লাইন বন্দী পাহাড়-শ্রেণী) ■ পরিখার ভিতরস্থ ভূখণ্ড অগ্নাকৃতি ময়দানের আকার ধারণ করিল। ইহাই যেন মোসলমানদিগের কেল্লা (দুর্গ—আশ্রয়-স্থান) ছিল। এই সুরক্ষিত ময়দানের মধ্যস্থলে আঁ হজরতের ‘খিমা’ (তাম্বু বা শিবির) সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ‘খন্দক’ (পরিখা) ৫ গজ চওড়া ও ৫ গজ গভীর ছিল। পরিখার দৈর্ঘ্য (লম্বাই) পরিমাণ করিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক ‘টুকরা’ (খণ্ড) করা হইয়াছিল ; উহার প্রত্যেক ‘টুকরায়’ (অংশে) দশ দশ জন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) খননকারী রূপে, খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং একখণ্ড বা টুকরার খনন কার্য্যে যোগ দিয়া, নিজে ও অন্যান্যের সঙ্গে পরিখা খননে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই পরিখা খনন করিতে করিতে একস্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন এবং সূক্ষ্ম প্রস্তরময় থাকাতে, খনন কার্য্যে প্রবল বাধা উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া এই প্রস্তর কাটিবার জন্য বিশেষ বল-প্রয়োগ ও চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সেই কঠিন প্রস্তর খণ্ড কিছুতেই কাটিতে পারিলেন না ; তখন খনন কারিগণ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে ‘হাজের’ হইয়া এই বিষয়ের আরজ করিলেন ; ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের কথা শুনিয়া তিনি কোদাল ও শাবল প্রভৃতি লইয়া সেই কঠিন প্রস্তর যুক্ত স্থানে গিয়া পহুছিলেন ; এবং স্বহস্তে শাবল ধারণ পূর্বক ■ জোরে সেই বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর আঘাত করিলেন যে, তাহা বিদীর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই

সেই স্থান হইতে এক 'রওশনি' (জ্যোতিঃ) বিকীর্ণ হইল; তদ্বর্ণনে
 'আ হজরত (ছালঃ) " আল্লাহ আকবর " বলিয়া তক্বির ধ্বনি করিলেন।
 সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছাহাবাঃ মণ্ডলী ঐ পবিত্র শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ
 করিলেন। তখন 'আ হজরত (ছালঃ)' ফরমাইলেন, আমাকে শামদেশের
 চাবি অর্পণ করা হইয়াছে। তৎপরে 'আ হজরত (ছালঃ)' খুব জোরে
 সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর দ্বিতীয় বার আঘাত করিলেন; এই আঘাতে
 সেই প্রস্তর খণ্ড আরও অধিক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল; এবং
 পূর্ববৎ অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। আবার " আল্লাহ আকবর " বলিয়া
 তক্বির ধ্বনি করা হইল। 'আ হজরত (ছালঃ)' ফরমাইলেন, আমাকে
 পারস্ত সাম্রাজ্যের চাবি অর্পিত হইল। আবার সেই স্বদৃঢ় প্রস্তর খণ্ডের
 উপর হজরত (ছালঃ) তৃতীয় বার আঘাত করিলেন, প্রস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ
 হইয়া পূর্ববৎ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল; 'আ হজরত (ছালঃ)' সজোরে
 " আল্লাহ আকবরঃ " বলিয়া তক্বির ধ্বনি করিলেন। ছাহাবাঃ (রাশিঃ)
 গণ ও ঐ পবিত্র শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাতে সেই আওয়ায্ চতুর্দিকে
 প্রতিধ্বনিত হইল; অতঃপর 'আ হজরত (ছালঃ)' ফরমাইলেন, আমাকে
 ইমনের 'কুজিয়া' (চাবি গুচ্ছ) দেওয়া হইল। অবশেষে তিনি ফরমাইলেন,
 আমাকে জিব্-রাইল আমীন (আলাঃ) সংবাদ দিলেন যে, উপরোক্ত সমস্ত
 দেশ ও সাম্রাজ্য (সমুদ্রেই) আপনার ■ আপনার ওম্মতদিগের অধিকারে
 আসিবে। চিন্তা ও খেয়াল করিবার বিষয়, এই ঘোর বিপদ কালে, সর্ব-
 শক্তিমান্ মহান্ আল্লাহ তা-লা, 'আ হজরত (ছালঃ)'-কে, ইরান (পারস্ত
 সাম্রাজ্য), রুম (রোমক-সাম্রাজ্য), শাম, ইমন প্রভৃতি সাম্রাজ্য, রাজ্য এবং
 দেশ সমূহে আধিপত্য লাভের 'খোণ্-খবরী' (সুসংবাদ) প্রদান করিলেন।
 এই ভবিষ্যদ্বাণী খোদা তা-লা ভিন্ন মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া কিছুতেই মনে
 করা যাইতে পারে না।

খুব তাড়াতাড়ি খন্দক খনন কার্য শেষ হইয়া গেল। যখন কোফ্ফার পরিখার তটে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা উহা দেখিয়া ‘হয়রান’ ও বিস্ময়াপন্ন হইল। কারণ, আরবগণ ইতিপূর্বে এরূপ পরিখা কখনও দেখিয়াছিল না। কোফ্ফারের পক্ষপাল সদৃশ অগণিত সৈন্যদল মদীনা-মহুওরা অবরোধ করিল। এই আক্রমণ কোফ্ফারের শক্তি ‘শওকতের’ (আড়ম্বরের) ‘এস্তেহা’ (শেষ) দৃষ্ট ছিল। কাফের সৈন্যদল কয়েকবার বিপুল বিক্রমে পরিখা পার হইতে চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু একবারও তাহাতে সফলকাম হয় নাই। যে স্থানে পরিখার ‘চওড়াই’ (পরিসর—প্রশস্ততা) কিছু কম ছিল, একবার শত্রুদলের তিনজন মহা বিক্রমশালী বীরপুরুষ অশ্ব ধাবিত করিয়া সেই স্থানে পরিখার মধ্যে অবতরণ করিয়াছিল; তন্মধ্যে ওমর-বিন্-আবদ নামক একজন বীরপুরুষ শৌর্য-বীৰ্য্যে দুই হাজার অশ্বারোহীর সমান বলিয়া গণ্য হইত; তাহার বীরত্ব সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ~~বীরের~~ ~~কেশরী~~ ~~অসমর্থ~~ আলী (রাঃ) তাহাকে ‘কুতল’ (নিহত) করিয়াছেন; অপর দুইজন পলায়ন করিয়া কোনও রূপে জীবন রক্ষা করিল। এই অবরোধ কার্য প্রায় একমাস পর্যন্ত ‘জারী’ ছিল। অবরোধকারী কাফেরগণ বাহির হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য পাইত, তাহাদের রসদ-পত্রের অভাব ছিল না; যোদ্ধাদের ■ অভাব দৃষ্ট হইত না। নানানিক্ হইতে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অনবরত যোদ্ধাদল আসিয়া বিপক্ষগণের দলপুষ্টি করিতেছিল। পক্ষান্তরে মোসলমানদিগের এই অবস্থা ছিল যে, তাহারা বাহিরের কোনও স্থান হইতে কিছুমাত্র রসদ আনয়ন করিতে পারিতেন না। তাহাদিগকে অনেক সময়ই অনাহারে থাকিতে হইত। একবার এক ছাহাবাঃ (রাঃ) ক্ষুধার ‘শেকায়েত’ (অভিযোগ) করিলেন, এবং ‘কুরতা’ (পিরাহান) তুলিয়া অঁ। হজরত

। ছালঃ)-কে দেখাইলেন যে, তিনি পেটে একখানি পাথর বাঁধিয়া রাখিয়া-ছেন ; যেন অনাহার জনিত দুর্বলতায় কোমর ঝুকিয়া না পড়ে । অ'। হজরত (ছালঃ) কুরতা উঠাইয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার পেটে দুইখানি পাথর বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে ।

যখন অবরোধের ২৭ সাত্তাইশ দিন গত হইয়া গেল ; ঐ দিবাগত রাত্রিকালে অতি প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল । ঐ বায়ু ক্রমশঃ প্রচণ্ড ঝটিকাবর্তে পরিণত হইল । ঝড়ের প্রকোপে কাফেরদিগের তাম্বুর খোঁটাগুলি খুলিয়া যাইতে এবং তাম্বুগুলি উড়িয়া যাইতে লাগিল । ‘চুল্‌হার’ (উনানের) উপর হইতে ‘দেগ্‌চি’ গুলি পড়িয়া গিয়া ভূতলে গড়াইতে লাগিল ; ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :—“ফা আর ছালনা আলায়হিম রিহাও ও জরুদা লাম তারাওহা ” (ভাবার্থ) “ আমি উহাদের উপর ‘হাওয়া’ (বাতাস) পাঠাইলাম, আর এমন একদল সৈন্য প্রেরণ করিলাম, যাহাদিগকে তুমি দেখিতে পাইতেছিলে না । ” ভীষণ ঝড়-তুফানে কাফেরদিগের অনেক শিবিরেরই অগ্নি নির্বাণ হইয়া গেল ; এই আণ্ডণ নির্বাণ ব্যাপারকে তাহারা একটা বিশেষ দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিল । তদনুসারে তাহারা সেই রাত্রিকালেই অতি ব্যস্ত-সমস্ততার সহিত ‘ডেরা-ডাণ্ডা’ তুলিয়া (শিবির ও তাম্বুগুলি গুটাইয়া) সেখান হইতে ‘ফেরার’ (পলায়ন-পর) :হইল । কোফ্‌ফারের পলায়ন-সংবাদ খোদা তা-লার পক্ষ হইতে অ'। হজরত (ছালঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল । তিনি তৎক্ষণাৎ হযিফাঃ-বিন্-আল্-জৈমান (রাজিঃ)-কে, অবরোধকারী শত্রু-দলের অবস্থা জানিবার জন্ত পরিখার পর পারে পাঠাইলেন ; তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন, কোফ্‌ফারের ‘লশুকর-গাহ্’ (সেনাদলের অবস্থান-স্থান) খালি পড়িয়া আছে, তাহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছে । তখন অ'। হজরত (ছালঃ) ক্রমাইলেন, অতঃপর কোফ্‌ফার কোরেশগণ আমা-

দিগকে আর কখনও আক্রমণ করিবে না। অতঃপর মোসলমানগণ
 পরমানন্দে পরিখার নিকট (শহরতলি) হইতে খাছ মদীনা-মহুওয়ার
 (শহরে) প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনা ৫ম হিজরীর জেলুদ মাসে
 সম্ভটিত হইয়াছিল। আ হজরত (ছাল:) মদীনায় প্রবেশ করিয়া
 অতি অল্পকাল মাত্র তথায় অবস্থিতি করেন। তিনি জোহরের নমাজ
 আদায় করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোনও যোদ্ধাপুরুষ
 জোহরের নমাজ এখানে না পড়ে, বরং জোহরের নমাজ 'বনি-করিজার'
 মহান্নায় গিয়া আদায় করা চাই। কোনও কোনও ছাহাবা: (সাহাবা:)
 এ পর্য্যন্ত 'হাতিয়ার' (যুদ্ধাস্ত্র) ও খুলিয়া ছিলেন না, আ হজরত (ছাল:)—এর
 আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে ঐ অবস্থায়ই-বনি-করিজা:—সম্প্রদায়ের সিহদি-মহান্নার
 দিকে মহোৎসাহে ধাবিত হইলেন। হজরত ছাহাবা:—বিন্-মায়্য (সাহাবা:)—
 বিনি পরিখার যুদ্ধের প্রারম্ভ কালে, বনি-করিজাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া
 সুপথে আনয়ন করত, আ হজরত (ছাল:) কর্তৃক তাহাদের কেজায় প্রেরিত
 হইয়াছিলেন; কিন্তু বনি-করিজা: গর্বমদে মত্ত হইয়া নানাপ্রকার 'বে-
 আদবী' পূর্ণ কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্বক তাহাকে কেরত পাঠাইয়া ছিল,
 তিনি বনি:—করিজার সঙ্গে সন্ধি-শর্তে আবদ্ধ, এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি-
 সম্পন্ন ছিলেন। তিনি পরিখার যুদ্ধে আহত হওয়াতে বনি-করিজার যুদ্ধে
 যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন না। আ হজরত (ছাল:) এই অভিযানে
 হজরত আলী (ক:—ও:)-কে 'আলম-বরদার' (পতাকাধারী) নিযুক্ত
 করিয়াছিলেন, এবং অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি রূপে অগ্রসর হইতে
 আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বনি-করিজার মহান্নার নিকট উপস্থিত
 হইয়া শুনিতে পাইলেন, উহারা আ হজরত (ছাল:)—এর প্রতি (নউব্
 বেজাহে মেন্হা) গালি বর্ষণ করিতেছে। যাহা হউক, সমগ্র মোসলেম
 সেনাদল আসিয়া বনি-করিজার মহান্না দৃঢ়ভাবে অবরোধ করিলেন।

কিয়দ্বিস পর্যন্ত অবরোধ কার্য চলিলে, বনি-করিজা: সম্প্রদায় আত্ম-
 রক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া এই প্রস্তাব লইয়া আঁ হজরত (ছাল:)-
 এর খেদমতে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিল যে, আমরা নিম্ন-লিখিত
 শর্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি ; সেই শর্ত এই যে, ছায়াদ-বিন্-
 মারায্ (রাজি:) আমাদের প্রতি বেরূপ দণ্ড বিধান করেন, ঐরূপ শাস্তি
 আমাদের দিগকে দেওয়া হউক । আঁ হজরত (ছাল:) তাহাদের এই প্রার্থন
 মঞ্জুর করিলেন । তৎক্ষণাৎ বহু-করিজা সম্প্রদায় মোসলমানদিগের
 আত্ম-সমর্পণ করিল । হজরত ছায়াদ-বিন্-মারায্ (রাজি:) আহত অবস্থায়
 মদীনায় চিকিৎসাধীন ছিলেন ; তাঁহাকে পান্‌কি বা ঐ শ্রেণীর কোনও
 বানে চড়াইয়া মোসলেম-সেনাদলে আনয়ন করা হইল । তিনি তথায়
 উপস্থিত হইলে আনুহার (রাজি:)-গণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি
 সম্মান-প্রদর্শন করিলেন । অতঃপর হজরত ছায়াদ-বিন্-মারায্ (রাজি:)
 আপন 'কওমের' (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া
 বলিলেন, তোমরা খোদা তা-লাকে 'হাজের' ও 'নাহের' জানিয়া প্রতিশ্রুতি
 দান ■■■ যে, আমার 'করসলা' (মীমাংসা) খুশীর সঙ্গে কবুল করিবে ।
 তখন সকলে একমতাবলম্বী হইয়া প্রতিশ্রুতি দান করিলেন যে, আমরা
 আপনার বিচার ও মীমাংসা শিরোধার্য করিব । তৎপর ছায়াদ-বিন্-
 মারায্ (রাজি:), ঐরূপ প্রতিশ্রুতি আঁ হজরত (ছাল:) এবং মহামান্ন
 মহাজেরিন দিগের নিকট হইতেও গ্রহণ করিলেন । অতঃপর হজরত ছায়াদ-
 বিন্-মারায্ (রাজি:) করমাইলেন, আমি আদেশ প্রদান করিতেছি যে, বহু-
 করিজার সমুদয় ■■■ পুরুষ (যুবক, প্রৌড়) কে কতল্ (নিহত), এবং উহাদের
 স্ত্রী-পুত্র দিগের সঙ্গে 'আছিরানে জকের' (যুদ্ধে বন্দী লোকদিগের) স্ত্রীর
 ব্যবহার করা হউক ; আর তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি মোসলমানদিগের মধ্যে
 ভাগ-বন্টন করিয়া দেওয়া হউক । এই আদেশ জারী হইবার পর, বহু-

করিহার লোকদিগকে কেবল। হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলা হইল ; তাহারা দুর্গ হইতে বাহির হইলে, সকলকে বন্দী করিয়া মদীনায আনয়ন করা গেল । অতঃপর উহাদের বয়স্ক পুরুষদিগকে হত্যা করা হইল ; আর তাহাদের গৃহাদি মোসলমানদিগের বস-বাসের ভাগ-বণ্টন করিয়া দেওয়া গেল । এই দিন হইতে মদীনা-মছুওয়ার অন্তর্বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটিল ।

৫ম হিজরীর জেলহজ্জ মাসে হজরত আবু-ওবায়দাঃ বিন্-জাবরাহ্ (রাজিঃ), আ হজরতের (ছালঃ) আদেশক্রমে ৩০০ মহাজেরিন যোদ্ধ-পুরুষ লইয়া " ছায়েক্-অল্-বহর " এর দিকে রওয়ানা হইলেন । হজরত আবু-ওবায়দা (রাজিঃ) ছায়েক্-অল্-বহরে পহুছিয়া সংবাদ পাইলেন যে, উহার অধিবাসিগণ বিপ্লবান্নি প্রজ্জলিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক । তাহাদের দমনার্থ মোহাম্মদ বিন্-মোসলেমা (রাজিঃ)-কে ৩০ জন যোদ্ধপুরুষ সমভিব্যাহারে ঐ দিকে রওয়ানা করিলেন । বনি-কেলাব সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের ১০ জন লোক নিহত হইল ; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঐ সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিল । এই যুদ্ধে ৩০টা উষ্ট্র ও ৩০০০ ছাগল বা দুধা মোসলমানদিগের হস্তগত হয় ।

এইরূপে আকাশাঃ-বিন্-মহজ (রাজিঃ), 'কোরেশদিগের ভাব-গতিক পর্যবেক্ষণ জন্য মকায় প্রেরিত হইলেন । আর অল্পসংখ্যক ছাহাবা (রাজিঃ)-এর একটি ক্ষুদ্র দল 'নজদ' প্রদেশাতিমুখে পাঠান হইল । তাঁহারা ইসিদ্ধ বিপ্লববাদী শামায়াঃ-বিন্-আছালকে বন্দী করিয়া আনিলেন ; শামায়াঃ-বিন্-আছাল ভক্তি-প্রবণ পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । আ হজরত (ছালঃ) ঐ বৎসরেই হাবশ রাজ্যাধিপতি নজ্জাশার আশ্রিত অবশিষ্ট হেজরতকারী মোসলমানদিগকে মদীনা-মছুওয়ায়

ডাকিয়া পাঠাইলেন । অনেকে চলিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তখনও বহু সংখ্যক মহাজ্ঞেয় তথায় থাকিয়া গেলেন ।

হেজরতের ৬ষ্ঠ বৎসর ।

গব্বা দোমতল-জন্দল হইতে আ হজরত (ছালঃ) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, ঐ সময় পথিমধ্যে য়েন্নিরা-বিন্-হুইন নামক একজন ছরদার তাঁহার খেদমতে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমাদের পশুপাল মদীনায় সান্নিধ্যে চরাইতে অনুমতি দিন । দয়ার সাগর আ হজরত (ছালঃ) তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে, সে স্বীয় সম্প্রদায়স্থ লোকের পশুপাল মদীনায় নিকটস্থ চারণ-ভূমিতে পাঠাইয়া দিল । এক বৎসর কাল তাহাদের পশুপাল সেখানে উদর পূরিয়া ঘাস খাইল এবং বেশ দৃষ্ট-পুষ্ট হইল ; অবশেষে প্রত্যাগমন স্বরূপ ঐ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়, আ হজরত (ছালঃ)-এর উষ্ট্রগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল, এবং বহু-গফ্-কারের একজন লোককে হত্যা করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া গেল । সঙ্গে সঙ্গে একদল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে, উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধে উষ্ট্রোপহারী দুর্বৃত্ত দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, মোসলমানগণ আ হজরতের (ছালঃ) উষ্ট্র দলের উদ্ধার সাধন ত করিলেনই, তদ্ব্যতীত তাহাদের পশুপাল ও ইহাদের হস্তগত হইল । আ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং এই অভিযানে গমন করিয়াছিলেন । এক দিবা-রাতি সেখানে থাকিয়া মদীনা-মহুওয়ার প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

এই বৎসরেই আ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন যে, বহু-বকর সম্প্রদায় খয়বরের যিহুদীদিগের সঙ্গে ‘ছাজেশ্’ (যড়যন্ত্র) করিয়া মদীনা আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে । তিনি সংবাদ পাইয়াই হজরত আলী

(রাজিঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া, ২০০ হুই শত যোদ্ধা পুরুষের সঙ্গে তাহাদের 'ছরকোবি' (দমন) কন্যা পাঠাইলেন । পশ্চিমধ্যে বহু-বকরের একজন 'জাছুছ' (গুপ্তচর) মোসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইল । গুপ্তচর বলিল, যদি আমার প্রাণরক্ষা করেন, তবে আমি বহু-বকরের সমবেত হইবার স্থান আপনাদিগকে বলিয়া দিতে পারি । তদনুসারে হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহ উহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন ; এবং বহু-বকরের একত্র সমাবেশ-স্থান জানিয়া লইয়া প্রতিশ্রুতি অমুখ্যারী গুপ্তচরটিকে মুক্তি প্রদান করিলেন । অতঃপর ইহার " কদক " নামক স্থানে গিয়া পহুছিলেন ; এবং ক্রতগতি অগ্রসর হইয়া অতর্কিত ভাবে শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন । উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল ; কিন্তু মোসলমানদিগের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, শত্রুদল বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিল । এই যুদ্ধে ৫০০ উষ্ট্র ও ২০০০ ছাগ-মেবাদি পশু মোসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল । এই 'মালে-গনিমত' (যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) লইয়া হজরত আলী (রাজিঃ) বিজয়ী-বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

উক্ত হিজরীর শা'বান মাসে আবু হজরত (ছানঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-রয়োফ্ (রাজিঃ)-কে, ইসলাম-ধর্ম প্রচার 'দোমতল-জন্মলে' প্রেরণ করিলেন । তাহার প্রচার-কালে আছিগ-বিন্-ওমর কলবী নামক তথাকার একজন খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী ছরদার প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ; সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক আগ্রহের সহিত লোক মোসলমান হন । ঐ জাতির যে সকল ছরদার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল না, তাহারা 'জজিরা' নামক কর দিতে রাজী হইল । ছরদার আছিগের কন্যা তমাছর (রাঃ—আঃ) এর সঙ্গে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-রয়োফ্ (রাজিঃ)-এর গুহ-পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইল । এই কন্যার গর্ভে আবু-ছলমাঃ (রহঃ) নামক প্রসিদ্ধ ফকীহের (ফেকাহ, শাস্ত্র-বিদ মহাপণ্ডিতের) জন্ম হয় । তিনি

‘আকাবেরে-তাবেয়ীন্’ অর্থাৎ প্রাথমিক তাবেয়ীদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলিয়া গণনীয় ।

‘আরনিয়াঃ’ নামক প্রাক্তরময় জনপদের ‘আকল’ বংশীয় কতিপয় লোক মদীনার আগমন পূর্বক প্রকাশভাবে মোসলমান হইল । তাহারা কিছুকাল মদীনার বাস করিয়া এই ‘লেকায়েত’ (অভিযোগ) করিতে লাগিল যে, আমাদের :পশু-দুগ্ধ পান করার অভ্যাস, শস্ত-জাত খাদ্য খাইবার তত অভ্যাস নাই ; মদীনার বাস করিয়া ও অনভ্যস্ত দ্রব্য আহার করিয়া আমাদের গায়ে চর্মরোগ হইয়াছে ; তজ্জন্য আমরা শারীরিক বড় কষ্ট ভোগ করিতেছি । ঐ হজরত (ছালঃ) তাহাদিগের এই অভিযোগ শুনিয়া কোবার নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চলে—যীর উষ্ট্রাদির চারণ ভূমি ও বাথানে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন । তাহারা কিছুদিন সেখানে থাকিয়া পশু-দুগ্ধ পান করিয়া যখন বেশ মোটা-তাজা হইল, তখন ঐ তও অকৃতজ্ঞের দল, ঐ হজরতের (ছালঃ) উষ্ট্র গুলির রক্ষক ইছার নামক ব্যক্তিকে একাকী পাইয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল । দুরাআগণ উহার হাত-পা কাটিয়া ফেলিয়াছিল ; চক্ষুদ্বয়ে বাবুলের কাঁটা বিদ্ধ করিয়াছিল ; উহার হস্ত-পদ কলিত যতদেহ এক বৃক্ষের শাখায় লটকাইয়া দিয়াছিল, তৎপর নিশ্চিন্ত মনে উষ্ট্রগুলি হাঁকাইয়া লইয়া চলিয়া গেল । যখন এই সংবাদ মদীনার পৌছিল, ঐ হজরত (ছালঃ) তৎক্ষণাৎ করম্-বিন্-খালেদ-আল্-ফহরি (রাজিঃ)-কে ২০ জন অশ্বারোহী যোদ্ধা সহকারে ঐ দুরাচারদিগের পশ্চাদ্ধাবন জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । তাহারা অতি দ্রুতগতি গমন পূর্বক পথিমধ্যেই উহাদিগকে অপহৃত উষ্ট্রগুলি সহ ‘গেরেফ্-তার’ (বন্দী) করিলেন । যখন উহারা ধৃত হইয়া মদীনার আনীত হইল, তখন ঐ হজরত (ছালঃ) উহাদিগকে ‘কতল্’ (মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত—হত্যা) করিতে আদেশ দিলেন ; আদেশ অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত হইল ।

৬ষ্ঠ হিজরীর শ'ওয়াল মাসে, হজরত (ছালঃ) 'খাবে' (বন্ধে) দেখিলেন, ছাহাবার কারাম (রাজিঃ)-দিগের সমভিব্যাহারে তিনি পবিত্র কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। অতঃপর হজরত (ছালঃ) ও ছাহাবা কারাম (রাজিঃ)-দিগের ও কাবার 'তওয়াফ' এবং 'যেয়ারত' করিবার ইচ্ছা ■ অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। এই স্বপ্ন দর্শনে সেই ইচ্ছাও আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইল। তখন ঐ হজরত (ছালঃ) রোমরাঃ ও কাবা যেয়ারত করিবার জন্য বন্ধপরিবর হইলেন। তদনুসারে ৬ষ্ঠ হিজরীর 'যেলুদ' মাসে তিনি ১ হাজার ■ শত ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) কে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন—রোমরার এহ্রাম বাধিলেন—এবং কোরবানীর জন্য ৭০ ■ উষ্ট্র সঙ্গে লইলেন। এহ্রাম বান্ধা ও কোরবানীর উষ্ট্র সঙ্গে লওয়া দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতেছিল যে, তিনি যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মক্কা যাইতেছেন না, বরং কেবলমাত্র 'বারতোজার' (কাবা-গৃহের) 'যেয়ারত' করাই তাহার 'মক্কা' (উদ্দেশ্য) ছিল। মক্কার কোরেশদিগের এমন কোন হুক (অধিকার) ছিল না যে, কাহাকেও কাবার যেয়ারত করিতে বাধা দিতে পারে। কারণ, সমগ্র আরবের অধিবাসিগণই (যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন) হজ্জ্ করিবার অধিকারী ছিল ; এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কেহ কখনও বাধা দিতে পারে নাই।

'যিল-হলিফা' নামক স্থানে পহুছিয়া ঐ হজরত (ছালঃ), এক ব্যক্তিকে 'জাহুছ' (গুপ্তচর) নিযুক্ত করিয়া অগ্রে রওয়ানা করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি পশ্চিমদিকে 'আছফান' নামক স্থানে আসিয়া ঐ হজরত (ছালঃ) কে সংবাদ দিল যে, কোরেশগণ আপনার আগমন সংবাদ পাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী সম্বলিত করিয়াছে ; তাহারা আপনাকে মক্কা ও খানাঃ কাবার প্রবেশ করিতে প্রাণপণে বাধা দিবে। তখন ঐ

হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের পয়গম্বার করিয়া, সকলের অনুমোদন ক্রমে খীর কাফেলা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন । মোসলমানদিগের অগ্র-গমনে বাধা দিবার কোরেশগণ মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদের নেতৃত্বাধীনে একদল অশ্বারোহী সৈন্য “ করাম-আল-গমিম ” নামক স্থানে পাঠাইল । আ হজরত (ছালঃ) আছকান হইতে রওয়ানা হইয়া, রাত্তা হইতে কিছু ডান দিকে সরিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন ; এই অবস্থায় হঠাৎ খালেদ-বিন্-অলিদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন । খালেদ-বিন্-অলিদ মোসলমানদিগের এই আকস্মিক ক্রত আগমনে কিৰ্কুত্বা-বিমূঢ় হইয়া পড়িল, এবং অতি ক্রতগতি অশ্বারোহণে মক্কার গমন পূর্বক, কোরেশদিগকে আ হজরতের (ছালঃ) আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিল ; এই অবসরে আ হজরত (ছালঃ) অগ্রসর হইয়া মক্কার খুব নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার উদ্ভী এই স্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল । ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ বলিতে লাগিলেন, উদ্ভী আমাদিগকে ধোকা দিল । আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ধোকা দেয় নাই, বরং যে খোদা তা-লা হতীর গতিরোধ করিয়াছিলেন (আছহাব-ফিলের ঘটনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত), সেই আল্লাহ্ তা-লাই উদ্ভীর গতিরোধ করিয়াছেন । মক্কার যুদ্ধ-হাদায়া করিলে কোবার অসম্মান হয়, কোবার অসম্মান করা খোদা তা-লার ইচ্ছা নহে ; এই জন্য তিনি তোমাদিগকে বাধা দিতেছেন । তৎপর তিনি উদ্ভীকে ধম্কাইলেন, উদ্ভী গাত্রোত্থান পূর্বক আবার চলিতে লাগিল । আ হজরত (ছালঃ) হোদিবিয়ার কূপের নিকট পহুছিয়া, সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশিত করিলেন । যখন হোদিবিয়ার আ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে ‘মকিম’ হইলেন (অস্থায়ী বাসস্থান নির্দেশ করিলেন), তখন মক্কার কোরেশদিগের পক্ষ হইতে বোদিল-বিন্-ওরকায়া খযরী স্ব সম্প্রদায়স্থ কতিপয় লোক সম্মে

তাইরা তাঁহার হজুরে উপস্থিত হইল, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তদন্তরে তিনি বলিলেন, ঐ দেখ, আমার কাফেলার অগ্রভাগে কোরবানীর উষ্ট্র সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে, আর আমরা এহরাম বান্ধিয়া আছি। বোদিল এই কথা শুনিয়া মক্কার চলিয়া গেল, এবং কোরেশদিগকে বলিল, তোমরা বৃথা গোলমাল করিতেছ, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ত কেবলমাত্র বরতুয়ার যোয়ারত করিতে আসিয়াছেন, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসেন নাই। তদ্রূপে কোরেশদিগের উগ্রচণ্ড চরমপন্থী গোঁয়াড়-গোবিন্দ লোকেরা বলিতে লাগিল, আমরা উহাদিগকে বরতোজার যোয়ারত করিতেও আসিতে দিব না। কিন্তু বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও ভবিষ্যদর্শী বরঃ লোকেরা নীরব থাকিল, এবং এ সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। আলোচনাও বিবেচনার পর, মক্কাহ আশাবিন্ সম্প্রদায়ের প্রধান হোলিহ-বিন্-আলমাঃ কেনানীকে আপনাদের পক্ষ হইতে দূত নিযুক্ত করিয়া তাঁ হজরতের খেদমতে পাঠাইল। এই বিচক্ষণ পুরুষ আঃহজরতের (ছালঃ) খেদমতে না পঁছছিয়া, কেবলমাত্র কোরবানীর উষ্ট্রগুলি দেখিয়াই প্রত্যাঘর্তন করিল, এবং কোরেশদিগকে বাইরা বলিল (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) এবং মোসলমানগণ যুদ্ধ করিবার 'এরাদায়' (সঙ্কল্প) আইসেন নাই, কেবলমাত্র যোমরা-ব্রত পালন ও কাবা যোয়ারত জন্ম আসিয়াছেন। কাবার যোয়ারত করিতে বাধা দেওয়ার কাহারও অধিকার নাই। ইহা শুনিয়া উগ্রচণ্ড কোরেশগণ তাহাকে কটু-কাটব্য বলিতে লাগিল; আর বলিল, আমরা মোসলমানদিগকে কিছুতেই মক্কার প্রবেশ করিতে দিবনা; প্রবেশ করিতে দিলে আমাদের অপমান হইবে। ছরদার হোলিহ, এই উক্ত লোক গুলির অন্ত্যায় ■ অসদ্বত কথা শুনিয়া বলিল, যদি তোমরা মোসলমানদিগকে যোমরা-ব্রত সম্পন্ন করিতে না দাও, তবে আমি আমার

মলের সকল লোক লইয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব । তাহার কথা শুনিয়া কোরেশগণ প্রমাদ গণিল, এবং নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া ও প্রবোধ দিয়া তাহার ক্রোধানল নির্বাপিত করিল । অতঃপর আবু হজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের নিকট দূত পাঠাইলেন, কোরেশগণ দূতের প্রস্তাব শুনিবে দূরে থাকুক, বরং তাঁহার উদ্বেষ্টী যবেহ করিয়া দিল, এবং তাঁহাকে গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে উত্তত হইল । কিন্তু ছরদার হোলিও তাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে মক্কার কোরেশদিগের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, নিরাপদে ফেরত পাঠাইয়া দিল । অতঃপর কোরেশদিগের একদল চরম-পন্থী উগ্রস্বভাব যুবক মক্কা হইতে বাহির হইয়া ওয়াদিতে—মোসলমান-দিগের শিবির শ্রেণীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল ; সুযোগ বুঝিয়া মোসলমান-দিগকে আক্রমণ করিবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ দেখিতে পাইয়া ক্ষিপ্ৰকারিতার সহিত আক্রমণ পূর্বক তাহাদিগকে ধৃত ও বন্দী করিয়া ফেলিলেন । কিন্তু পরে আবু হজরত (ছালঃ)-এর আদেশে সকলকে ছাড়িয়া দিলেন । অতঃপর অনেক আলোচনার পর আবু হজরত (ছালঃ), হজরত ওসমান গনী (রাজিঃ)-কে দূত স্বরূপ মক্কা পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার গমনেও কোন ফল হইল না ; বরং কোরেশগণ তাঁহাকে মক্কা আটক (নঘরবন্দী) করিয়া রাখিল । হজরত ওসমান গনী (রাজিঃ)-এর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে এইরূপ একটা জনরব উঠিল যে, কোরেশগণ হজরত ওসমান গনী (রাজিঃ)-কে শহীদ করিয়াছে । এই সংবাদ শুনিয়া আবু হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি যে পর্য্যন্ত ওসমানের (রাজিঃ) কতলের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিব না । তদনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, সমুদয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর নিকট হইতে ‘জান-নেছারীর’ (জীবনোৎসর্গ

করিবার) বায়্য়েত্ গ্রহণ করিলেন । এই বায়্য়েত্, বায়্য়েতে-রেদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ । এই বায়্য়েতের উল্লেখ পবিত্র কোরআন শরীফে এইরূপ আছে :—‘লাকাদ রাদি আল্লাহ আনিল মুমেনিনা ইয়্ ইয়্ বায়ে যুনা'কা তাহ্ তাশ্ শাজারাত ’ ; অনুবাদ :—হে রচুল, যখন মোসলমানগণ তোমার হাতের উপর বৃক্ষতলে বসিয়া বায়্য়েত করিল, তখন থোলা তা-লা তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন । ”

এই ঘটনার অত্যন্তকাল পরেই হজরত ওসমান গণি (রাজিঃ), মক্কা হইতে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনিও আ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে ঐরূপ ‘বায়্য়েত’ করিলেন । মক্কার কোফ্-কারের প্রবীণ, বুদ্ধিমান ও ভবিষ্যদর্শী লোকেরা যুদ্ধ-হাদ্যমাকে ‘না-পছন্দ’ করিতে-ছিল ; কিন্তু অধিকাংশ উদ্ধাম যুবক ও ‘গঁওয়ারাড’ প্রকৃতির লোকই-‘ফাছাদ’ (বিবাদ-বিসম্বাদ) এবং যুদ্ধের একান্ত পক্ষপাতী দৃষ্ট হইল । একপক্ষে মোসলমানদিগের যুদ্ধ-সম্ভার কথা শুনিয়া, এবং যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, তাহাদের মনেও কতকটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া ছিল ; সেই জন্য তাহারা ‘সোলেহ্’ (সন্ধি) স্থাপন সম্বন্ধে অনেকটা আগ্রহান্বিত হইল । তদনুসারে মক্কাবাসিগণ বন্স-ছকিফ্ দলের ছরদার মোক্কাহ্-বিন্-মছউদকে আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করিল । মোক্কাহ্ আসিয়া হজুরের (ছালঃ) সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলিল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাহাদুরীর হাঁক ও কতকটা হাঁকিল । আ হজরত ও তাহার কথার খুব দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক উত্তর দিলেন । মোক্কাহ্ যখন মক্কার কোরেশদিগের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল, তখন অন্ত্যান্ত কথার সঙ্গে কোরেশদিগকে ইহাও বলিল যে, হে কোরেশ দলপতিগণ ! আমি ক্রমের হারকল্ (রোমক সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্) এবং পারস্ত-সম্রাট্ কেছরার দরবার দেখিয়াছি, এবং আরও অনেক বাদশাহের রাজ-দরবারে গমন করিয়াছি, কিন্তু কোনও সম্রাট্

বা বাদশাহকে তাঁহার 'হামরাহী' (সঙ্গী—সভাসদ-পারিষদ) দিগের এমন প্রিয়পাত্র দেখি নাই—যেমন (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর আছহাব শিষ্য মণ্ডলী, তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করেন। যখন তিনি কথা বলেন, তখন আর সকলে চুপ করিয়া থাকেন। আর তাঁহাকে এতদূর 'তায়জিম' (সম্মান-প্রদর্শন) করেন যে, তাঁহার দিকে কেহ চক্ষু তুলিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। ইহারা কোনও ক্রমেই (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি তোমাদের সম্মুখে যে প্রস্তাব 'পেশ' করিয়াছেন, তোমরা তাহা বিনাপ্রতিভে 'কবুল' (স্বীকার) কর; এইরূপ সন্ধি-স্থাপন মঙ্গল জনক ও যথেষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত। অতঃপর কোরেশগণ বিশেষভাবে যুক্ত পরামর্শ করিয়া ছিল-বিন্-রোমরকে সর্বক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইল। আর তাহাকে বলিয়া দিল যে, 'ছোলেহ্' (সন্ধি) কেবলমাত্র এইরূপে হইতে পারে যে, এ বৎসর (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) আপনার সঙ্গী (ছাহাবাঃ)-দিগকে লইয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইবেন, আর আগামী বৎসর আসিয়া রোমরাঃ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। যাহা হউক, ছিল, আ হজরতের (ছালঃ) হজুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধির শর্ত সকল পেশ করিল; আ হজরত (ছালঃ) উহার সকল শর্তই 'কবুল' (গ্রহণ) করিলেন। তৎক্ষণাৎ 'ছোলেহ্-নামা' (সন্ধি-পত্র) লিখিবার জন্য হজরত আলী (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া উহা লিখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আ হজরতের (ছালঃ) কথানুযায়ী হজরত আলী (রাজিঃ) সন্ধি-পত্র লিখিলেন। ঐ সন্ধি-পত্রের শর্ত সমূহ নিম্নে লিখিত হইল।

১। মোসলমানগণ এ বৎসর রোমরাঃ-অনুষ্ঠান করিবেন না; আগামী বর্ষে আসিয়া রোমরাঃ কার্য সম্পন্ন করিবেন। মকায় প্রবেশ কালে তরবারি ব্যতীত অন্য কোনও 'হাতিয়ার' (যুদ্ধাস্ত্র) তাহাদের নিকট

থাকিবে না। তরবারিও 'নিগ্রাম' (কোষ—খাপ)-এর ভিতর থাকিবে। আগামী বর্ষে ও তাহার ৩ দিনের অধিক কাল মক্কার থাকিতে পারিবে না।

২। সন্ধির মেয়াদ ১০ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে। এই (নির্দিষ্ট) সময় মধ্যে কোনও 'ফরিক' (দল) অপর দলের 'জান ■ মালের' (জীবন ও অর্থ-সম্পত্তির) একেবারেই বিক্রয়চরণ করিতে পারিবে না। পরস্পর 'আমন' ■ 'আমান' (নিরঙ্করোধ ও শান্তি)-এর সহিত বাস করিবে।

৩। আরবের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 'এখ্তেয়ার' (অধিকার) থাকিবে, তাহার এই উভয় দলের মধ্যে যে দলের সঙ্গে ইচ্ছা, সন্ধি-স্থাপন করিতে পারিবে। উক্ত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ জাতির শর্ত সমূহ এই প্রকারেই (এই সন্ধি-পত্রের মতনই) লিপিবদ্ধ হইবে। উভয় 'ফরিক কবায়েল' (স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়) আমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইতে ও বন্ধু বানাইতে বা বন্ধুত্ব স্থাপনে স্বাধীন থাকিবে।

৪। যদি কোরেশ (বা মক্কাবাসী) দিগের মধ্য হইতে কোনও ব্যক্তি ওলীর (অভিভাবকের—মুরকির) বিনামূল্যে (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বা আশ্রয় লাভার্থ) মোসলমানদিগের নিকট চলিয়া যায়, তবে তাহাকে কোরেশদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি কোনও মোসলমান কোরেশদিগের নিকট আইসে (তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে), তবে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

এই সন্ধি পত্রের (শেষ—চতুর্থ) শর্তটি ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের নিকট বড়ই কঠোর ■ 'নাগওয়ার' (অপপ্রীতিকর) বোধ হইতেছিল। ঘটনা বশতঃ সন্ধি-পত্র লিখিবার সময়ই কোরেশ-পক্ষের প্রতিনিধি ছহিলের পুত্র আবু-জন্দল (রাজিঃ)—যিনি ইতিপূর্বে মোসলমান হইয়াছিলেন, আর এই অপরাধে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল—কোনও রূপে বন্দি হইতে পলায়ন পূর্বক ■ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আবু জন্দল (রাজিঃ) মোসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া মক্কার কাফেরগণ তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার শারীরিক শাস্তি প্রদান করিয়াছিল । তাঁহার দেহে নানাপ্রকার ক্ষত-চিহ্ন ও ‘তাযা যখম’ (টাট্কা) তখনও বিদ্যমান ছিল । তিনি সেই সকল ক্ষত ও ক্ষত-চিহ্ন সকল দেখাইয়া ‘করিয়াদ’ (প্রার্থনা) করিলেন যে, আমাকে অবশ্য অবশ্য সঙ্গে মদীনার লইয়া চলুন । ছহিল বলিল, সন্ধি-পত্রের শর্ত অনুযায়ী আমরা আবু-জন্দলকে ফেরত পাইতে চাই । ঈ হজরত (ছালঃ) ছহিল কে অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু সে কিছুতেই পুত্রকে ছাড়িয়া বাইতে রাজী হইল না । অবশেষে আবু-জন্দল (রাজিঃ)-কে তাঁহার পিতা ছহিলের হস্তে সমর্পণ করা হইল । ছহিল প্রহার করিতে করিতে আবু-জন্দল (রাজিঃ)-কে মক্কার লইয়া চলিল । এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল ; কিন্তু হজরত ওমর (রাজিঃ) সর্বাপেক্ষা ‘বেতাব’ (অধৈর্য) হইয়া পড়িলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ ঈ হজরতের (ছালঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি-পত্রের শেষ দফার প্রতিবাদ করিলেন । তৎকালে ঈ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি আল্লাহর রচুল, সুতরাং আল্লাহর আদেশের বিপরীতাচরণ ও সন্ধি-ভঙ্গ করিতে পারি না । তিনি আমাকে কখনও ‘বলিল’ (অবমানিত ও অপদস্থ) করিবেন না । ইহার পর হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল, তখন এইরূপ ‘গোস্তাখী’ (অনিষ্টকার—‘বে-আদবীর) জন্ত তিনি বড়ই লজ্জিত ■ অমৃতপ্ত হইলেন । এই অপ্রীতিকর কার্যের জন্ত তিনি আজীবন ‘তওবা’ ও ‘আস্তাগ্‌ফার’ করিয়া গিয়াছেন ।

সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরীত হওয়ার পর ঈ হজরত (ছালঃ) ■ মোসলমানগণ হোদিবিরায়ই কোরবানী কার্য সম্পাদন করিলেন, এবং এহরাম খুলিলেন,

‘হাদামত’ বানাইলেন (কৌরকার্য সম্পন্ন করিলেন) । হজরত (ছাল:) যখন হোদিবিয়াঃ হইতে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন পশ্চিমধ্যে “ছুরা কত্ হ” ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হইল । আর খোদা তা-লা এই সন্ধিকে—ছাহাবাঃ কারাম রাজিঃ)-গণ বাহাকে আপনাদের প্রকার পরাভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—প্রকৃত ‘কত্ হ’ (বিজয় লাভ) বলিয়া প্রকাশ করিলেন । পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা জানা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে কোরেশদিগের সঙ্গে এই সন্ধি-স্থাপন, মোসলমানদিগের পক্ষে গৌরব-জনক বিজয় লাভেই পরিণত হইয়াছিল । এসলামের অল্প সর্বাঙ্গের বড় বিজয় লাভ এই হইয়াছিল যে, ধারাবাহিক যুদ্ধের গতিরোধ হইয়া, শান্তি নিশ্চিততার যুগ আসিয়াছিল । এসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ পৃথিবীতে নিরঙ্কিরোধে, সুখ-শান্তির সঙ্গে বাস করিতে পারে ; সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র একেশ্বরবাদ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে । কলতঃ দুনিয়াতে সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা শান্তি স্থাপনের নিত্য বাধ্য হইয়া মোসলমানদিগকে নানা যুদ্ধ-হাদামাত ব্যাপ্ত হইতে হইয়াছিল । হোদিবিয়ার সন্ধি-পত্র দ্বারা ভবিষ্যতে যে সুফল ফলিয়াছিল, উহা দ্বারাই বেশ অসুমান করা যাইতে পারে যে, উক্ত সন্ধি-স্থাপনের মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে, মোসলমানদিগের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল । সন্ধি-পত্রের চতুর্থ শর্ত ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের নিকট বড়ই কঠোর ও কষ্টদায়ক বোধ হইতেছিল ; এক্ষণে সেই সন্ততির একবার দেখুন :—সন্ধি-বন্ধনের কিছু দিন পরেই আবু-বছির (রাজিঃ) নামক একজন নব-দীক্ষিত মোসলমান—যিনি মক্কার এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; মক্কার কাকেরগণের দারুণ উৎপীড়নে অস্তিত্ব হইয়া, সেখান হইতে পলায়ন পূর্বক মদীনার আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই কোরেশগণ আপনাদের দুইজন লোককে এই উদ্দেশ্যে আ হজরত (ছাল:)—এর খেদমতে

পাঠাইল যে, সন্ধিসূত্র অনুসারে আবু-বহির (রাজিঃ)-কে যেন তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হয়। আবু-বহির (রাজিঃ) মকায় ফিরিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে যত্ন অপেক্ষাও 'বদতর' ('খারাব' ঘৃণিত ও কষ্টকর) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু কি করিবেন, নিরুপায়। আবু-হজরত (ছালঃ) আবু-বহিরের অপেক্ষা সন্ধি-পত্রের শর্ত পালন অধিকতর গুরুতর ও কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহাকে কোরেশদিগের প্রেরিত লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আবু-বহির (রাজিঃ) " যিল-হলিকাঃ " নামক 'মঞ্জেল' পর্য্যন্ত বন্দী রূপে ঐ লোক দ্বয়ের সঙ্গে গমন করিলেন। এই স্থলে তিনি একজন প্রহরীর তরবারি খানির খুব প্রশংসা করাতে, দ্বিতীয় প্রহরী তরবারি খানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিবামাত্র তিনি অতি ক্ষিপ্ৰকারিতার সহিত একজন প্রহরীর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া, দ্বিতীয় প্রহরীর পশ্চাদ্ধাবন পূর্বক, মদীনা শরীকে আবু-হজরতের (ছালঃ) সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; আবু-হজরত (ছালঃ) তাঁহার কার্য্যে বিস্মিত প্রকাশ করাতে, তিনি মদীনা হইতে প্রস্থান করিলেন। কোরেশদিগের প্রেরিত অপর লোকটী মকায় গমন পূর্বক আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা কোরেশদিগের নিকট বর্ণনা করিল। আবু-বহির (রাজিঃ) মদীনা হইতে গমন পূর্বক লোহিত সাগরের তীরবর্তী " অয়িছ " নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। আবু-জন্দল (রাজিঃ) বিন্-ছহিল, আবু-বহির (রাজিঃ)-এর ঘটনা শ্রবণ পূর্বক, সুযোগক্রমে মক্কা চইতে পলায়ন করিলেন, এবং সোজা-সুজি আবু-বহির (রাজিঃ)-এর নিকট গিয়া পৌঁছিলেন। ইহার পর ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইল যে, মকায় যাহারা মোসলমান হইতেন, তাঁহারা সেখান হইতে পলায়ন পূর্বক পূর্বোক্ত " অয়িছ " নামক স্থানে আবু-বহির (রাজিঃ) ■ আবু-জন্দল (রাজিঃ)-এর ■ গিয়া সম্মিলিত হইতেন। ■ আয়িছে এই নব-দীক্ষিত

মোসলমানদিগের একটি প্রবল সঙ্ঘ সংগঠিত হইল। এইক্ষণে এই দলের লোকেরা কোরেশদিগের শামের (সিরিয়ার) বাণিজ্য-যাত্রী 'কাফেলা' সকল আক্রমণ পূর্বক তাহাদের বাণিজ্য-দ্রব্য গুলি কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। মক্কার কোরেশদিগের পক্ষে এই নব-গঠিত মোসলমান-দলটি এমন ভয়াবহ ও ভীতি-প্রদ হইয়া দাঁড়াইলেন যে, তাহারা (কোরেশগণ) নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অতি কাতরভাবে আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল যে, সন্ধি-পত্রের ওর্থ শর্তটি আমরা 'মনুহুথ' ('বাতেল'—অগ্রাহ—'রদ') করিয়া দিতেছি। এক্ষণে বাহারা মক্কার মোসলমান হইয়া মদীনার চলিয়া যাইবে, আমরা তাহাদিগকে আর কখনও কিরাইয়া আনিব না। আর দয়া করিয়া আশিচ্ছ মোসলমানদিগকে মদীনার আপনার নিকট ডাকাইয়া লউন। আ হজরত (ছালঃ) কোরেশদিগের এই 'দরখাস্ত' (প্রার্থনা—আবেদন) 'মঞ্জুর' করিলেন। ওদিকে আবু-বছির (রাজিঃ)-কে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তুমি সত্বরে সদলবলে মদীনা চলিয়া আইস। যখন আ হজরত (ছালঃ)-এর এই আদেশ আবু-বছির (রাজিঃ)-এর নিকট পহুছিল, তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়ীত; তিনি সেই অবস্থায় আবু-জন্দল (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমার ত আসন্ন সময় উপস্থিত। তুমি আ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশ কার্যে পরিণত কর। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপর আবু-জন্দল (রাজিঃ) স্বীয় দল বল লইয়া মদীনা-মসুওরায় আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হোদিবিয়াঃ সন্ধির 'ছেলছেলায়' (ধারাবাহিক বর্ণনায়) এই ঘটনা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল বটে, কিন্তু এই ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীতেই ঘটিয়াছিল। হোদিবিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক আ হজরত (ছালঃ) ওমর-বিনু-ওমিয়া কসরী (রাজিঃ)-কে একখানি পত্র লিখিয়া হাবশের

বাদশাহ্ নব্বাশীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য, যে সকল মহাজেরিন তথায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, জাকর-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে সেই সকল মোসলমানকে যেন মদীনার পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই পত্রে তিনি বাদশাহ্ নব্বাশীকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ■■■ 'দাওত' দিয়াছিলেন। হাবশ-পতি এই পত্র পাইবামাত্র পরম ভক্তি সহকারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; আর নানাপ্রকার 'তহকা' ও 'হাদিয়া' (নব্বর এবং উপঢৌকন) সঙ্গে দিয়া আশ্রিত মোসলমানদিগকে মদীনার রওয়ানা করিয়া দিলেন। আবু হজরত (ছালঃ) হোদিবিয়াঃ হইতে রওয়ানা হইয়া যেলহজ্জ মাসে মদীনার পহুঁছিয়াছিলেন। ৭ম হিজরীর শেষ পর্য্যন্ত তিনি মদীনায়াই অবস্থান করিলেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আরেশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) ওম্মালেদাঃ মাজেদা (গর্ভধারিণী—মাতা) এই বৎসর এসেতকাল করিয়াছিলেন। আর প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মহাপণ্ডিত হজরত আবু-হোরেয়াঃ (রাজিঃ) এই বৎসরেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

৭ম হিজরীর ঘটনাবলী

হোদিবিয়াঃ সন্ধির পর আবু হজরত (ছালঃ) মক্কার মোশরেকদিগের ■■■ নিশ্চিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মদীনার আগমন পূর্বক জানিতে পারিলেন, খয়বরের যিহুদিগণ মোসলমানদিগের মূলোৎপাটন জন্য, ও মদীনা আক্রমণার্থ মহা ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিতেছে। এমন কি, তাহাদের যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে মদীনা হইতে বহু-নজীর ■■■ বহু-করিযাঃ নামক যিহুদী সম্প্রদায় ■■■ 'জালাওতন' (নির্বাসিত) করা হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ নির্বাসিত হইয়া

খয়বরেই আপনাদের বাসস্থান নির্দেশ করে। এই যিহুদিগণের মধ্যে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্বেষানন অতীব প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। মক্কার পরে, মোসলমানদিগের শত্রুতা ■ বিরুদ্ধাচরণ করিবার কেন্দ্র স্থান ছিল যিহুদী অধিবাসী পূর্ব এই খয়বর। যিহুদীদিগের সমুদয় শক্তিশালী 'কবায়েল' (গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়) খয়বরে একত্র সম্মিলিত হইয়া, প্রথমতঃ মক্কার 'মোশরেক' (অংশীবাদী বা পৌত্তলিক)-গণ, ■ আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষমতাশালী দল সমূহকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-পরায়ণ ও উত্তেজিত করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা পাইতেছিল। সমুদয় যোগাড়-যন্ত্র ঠিক হইলে, তাহারা মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে—মহাডঙ্করে সমরসজ্জ করিতে লাগিল। আরবের 'গংফান' নামক সম্প্রদায়কে এই বলিয়া স্বপক্ষাবলম্বী করিল যে, যুদ্ধে জয়ী হইলে মদীনার যে পরিমাণ শস্ত উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধাংশ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। কেবল তাহাই নহে, তাহারা মদীনার মোনাফেক দিগকেও আপনাদের গুপ্ত সাহায্যকারী রূপে দাঁড় করিয়াছিল। এই মোনাফেক গুপ্তচরদিগের সাহায্যে তাহারা মদীনার দুই মাইল দূরবর্তী খয়বরে বসিয়া, মদীনাহ মোসলমানদিগের ছোট বড় সকল সংবাদই গ্রহণ করিতেছিল। আব্ব হজরত (ছালঃ) যিহুদীদিগের এই সমর-সজ্জার সঠিক সংবাদ জানিতে পারিয়া, ৭ম হিজরীর মহররম মাসে ১৫০০ পনের শত ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ—যাহাদিগের মধ্যে ২০০ দুই শত অশারোহী ছিলেন)—সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে খয়বরাভিমুখে 'কুচ্' (যাত্রা) করিলেন। আব্ব হজরত (ছালঃ) খয়বরের নিকটে পৌঁছিয়া খয়বর ও বনি-গংফান সম্প্রদায়ের বাস পল্লীর মধ্যস্থলবর্তী 'রজিয়' নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন; তদর্শনে বনি-গংফান সম্প্রদায়ের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভেক হইল যে, মোসলমানগণ আমাদের বাস-পল্লী আক্রমণ করিবে। এই মনে করিয়া তাহারা আপনাদের

পক্ষী সমূহে সুসজ্জিত অবস্থায় থাকিয়া, মোসলমানদিগের আক্রমণের গতি-
 রোধ করিতে প্রস্তুত রহিল ; সুতরাং খয়বরের যিহুদিগণের সাহায্যার্থ গমন
 করিতে পারিল না । খয়বরের এলাকার যিহুদীদিগের পরস্পর নিকটবর্তী ৩৮
 কুহুৎ, সুদূত ও অজের কেলা ছিল । এসলামী সেনাদল খয়বরে পৌঁছিলে যিহুদি-
 গণ বিপুল উৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল, এবং গর্কের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী
 আত্মা আত্মা করিতে লাগিল । বাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী বোকা চাহিতেছিল,
 তাহাদের মধ্যে মরহব ও এয়াছর—এই দুই ব্যক্তি দেশ-বিখ্যাত বীরপুরুষ
 বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল । তাহাদের দর্প-পূর্ণ আত্মানে মোসলমান পক্ষ
 হইতে মহম্মদ-বিন্-মোছলেমাঃ (রাজিঃ) ও যোবের বিন্-আল্-
 রোয়াম (রাজিঃ) খদল হইতে বাহির হইলেন ; এবং মোহাম্মদ-বিন্-
 মোছলেমাঃ (রাজিঃ) মরহবকে ও হজরত যোবের বিন্-আল্ রোয়াম
 (রাজিঃ) এয়াছরকে ‘কতল’ (নিহত) করিলেন । ময়দানী ও সম্মুখ
 মোসলমানদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠা অসম্ভব দেখিয়া, যিহুদিগণ
 ‘কেলাবন্’ হইয়া যুদ্ধ করা ফল-দায়ক বলিয়া মনে করিল । খয়বরের
 যিহুদী কেলা গুলির মধ্যে ছয়ব্-বিন্-ময়ায্ এর কেলা (দুর্গ) তা সর্বাপেক্ষা
 ‘মজবুৎ’ । সুদূত) অজের এবং এমন উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত ছিল যে, তথা
 হইতে অন্যান্য কেলা গুলির ‘মদদ’ (সাহায্য) করা বাইতে পারিত ।
 মোসলমান যোদ্ধাপুরুষগণ সর্ব প্রথমে “ নায়ম ” নামক কেলাটি আক্রমণ
 পূর্বক ধোর যুদ্ধের পর উহা অধিকার করিয়া লইলেন । এই কেলাটি
 আক্রমণ কালে কেলাস্থ যিহুদিগণ কেলায় উপর হইতে একটা পাথরের
 চাকি হজরত মহম্মদ-বিন্-মোছলেমাঃ (রাজিঃ)-এর উপর নিক্ষেপ করাতে
 তিনি শহীদ হইলেন (ইয়া লিল্লাহে—) । অতঃপর আবুল হকিক্ যিহুদীর
 কেলা “ কমুছ ” ভীষণ যুদ্ধের পর মোসলমানদিগের অধিকৃত হইল ।
 এই দুর্গে সফিয়াঃ-বিস্তে হাই-এব্-নে-আখ্-তব আরও অন্যান্য বহু

সংখ্যক যিহুদী মোসলমানদিগের বন্দী হইল। সফিয়া:-বিস্তে-হাই
 বিবাহ কেনানা:-বিন্-আল যিয়-বিন্-আবিল হকিকের সঙ্গে হইয়াছিল।
 বন্দী হওয়ার পর যখন কয়েদিগণকে মোসলমানদিগের মধ্যে ভাগ-বন্টন
 করিয়া দেওয়া হইল, তখন তিনি হজরত ওহিয়া: (রাজি:)-এর অংশে
 পড়িয়াছিলেন। আ হজরত (ছাল:) তাঁহাকে করিয়া 'আযাদ'
 (স্বাধীন—মুক্ত) করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর আ হজরত (ছাল:)
 তাঁহাকে পরিণয়-পুত্রে আবদ্ধ করিয়া মোসলেম-মাতার গৌরব প্রদান ।
 কমুছের পর ছয়ব-বিন্-ময়াবের কেদা মোসলমানদিগের দ্বারা অর
 অধিকৃত হইল। ইহার পর খয়বরের চতুর্থ কেদা মোসলমানগণ
 বাহুবলে অধিকার করিয়া লইলেন। এক্ষণে " ওতিহ " ও " ছলালম "
 নামক দুইটা কেদা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই দুইটা কেদা মোসলমানগণ
 ১০ দিন পর্য্যন্ত " মহাছেরা: " (অবরোধ) করিয়া রহিলেন। " মহছুর "
 (অবরুদ্ধ) যিহুদিগণ যখন অবরোধের দৃঢ়তা ও খাল দ্রব্যাদির অভাবে
 নিরুপায় হইয়া পড়িল, তখন আ হজরত (ছাল:)-এর নিকট 'পরগান'
 (সংবাদ) পাঠাইল যে, যদি উৎপন্ন শস্তের অর্দ্ধেক গ্রহণে আমাদের
 আমাদের ভূমিনের (বাগান ও শস্তক্ষেত্রের) উপর 'কাবেজ' (অধিকারী)
 থাকিতে দেন, তবে আমরা আপনার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য
 আছি। দয়ার সাগর আ হজরত (ছাল:) তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর
 করিলেন,—বাগান ও শস্ত-ক্ষেত্রের অর্দ্ধেক ফসল গ্রহণের শর্তে অর্থাৎ
 তাহাদিগকে প্রজা রূপে রাখিয়া ঐ সকল বাগান ও কৃষিক্ষেত্র তাহাদিগকে
 ভোগ দখল করিতে দিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ফারুক
 (রাজি:)-এর খেলাফৎ কাল পর্য্যন্ত তাহারা ঐ শর্তে খয়বরের বাগ-
 বাগিচা শস্তক্ষেত্র সকল ভোগ দখল করিয়া আসিয়াছিল।

খয়বরের এই যুদ্ধে ১৫ জন মাত্র মোসলমান শহীদ হইয়াছিলেন।

আর যিহুদিদিগের পক্ষে ১৩ জন বোকা সমরশাস্ত্রী হইয়াছিল। মোসলমান-দিগের মধ্যে ■ জন মহাজেরিন ■ ১১ ■ আন্হার ছিলেন। এই যুদ্ধের সময় 'হেমার আহলির (গাধার) 'গোশ্‌ত্' (মাংস) মোসলমানদিগের জন্য হারাম হয়। আর এই যুদ্ধে 'মোতরা' (মেয়াদী নেকাহ) চিরদিনের জন্য হারাম করা হইয়াছিল।

আ হজরত (ছাল:) খয়বর হইতে মদীনায়া প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিতে ছিলেন, এই সময় হাবশ্ (আবিশিনিয়া) রাজ্য হইতে মহাজেরিন (রাজি:) দল, হাবশ্-পতির পত্র এবং তৎপ্রদত্ত 'তহ্‌ফা' (উপঢৌকন) সহ আ হজরত (ছাল:)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সাক্ষাৎ লাভে এবং সম্মিলনে হজুর (ছাল:) এবং মহাজেরিন ও আন্হার (রাজি:)-গণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই দূরদেশস্থ মহাজেরিন (রাজি:) গণের জন্য আ হজরত (ছাল:) বিশেষ চিন্তাযুক্ত ছিলেন; ইহাদের আগমনে মোসলমানদিগের শক্তি ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল। খয়বর হইতে প্রত্যাগমন কালে "ফদক্" নামক স্থানের যিহুদিগণ, আ হজরত (ছাল:)-এর খেদমতে প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদের কেবলমাত্র প্রাণরক্ষা করা হউক, 'মাল-আম্বাবে' আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। হজুর (ছাল:) তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সুতরাং 'বেলা-তক্‌হিম (ভাগ বন্টন ব্যতিরেকে)—বেরূপ খোদা তা-লার আদেশ ছিল,—উহা খোদা ■ তাঁহার রুহুলের 'মাল' (সম্পত্তি) বলিয়া পরিগণিত হইল। ফদক্ পরিত্যাগ পূর্বক মোসলেম সেনাদল ■ ওয়াদি-অল্-কোরা " এর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা সেখানে পহঁছিলে তত্রতা যিহুদিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া খয়বরস্থ যিহুদিগণের ন্যায় উৎপন্ন ফল-শস্ত্রের অর্দ্ধাংশ দিতে রাজী এবং আ হজরত

(ছালঃ)-এর আশুগত্য স্বীকার করিল । ওয়াদি-অল্-কোরার হজরত মদয়ম (রাজিঃ) নামক একজন ছাহাবার কারাম মাত্র শহীদ হইয়াছিলেন । ওয়াদি-অল্-কোরার নিকটস্থ “তিমা” নামক মিহদী পল্লীর অধিবাসিগণ ও ওয়াদি-অল্-কোরার মিহদিগণের পদাশুসরণ করিয়া, তাঁহাদের শর্তাশুধারী আ হজরত (ছালঃ)-এর আশুগত্য স্বীকার করিল । ফলতঃ খয়বর হইতে মদীনা পর্যন্ত সমস্ত :হানের-মিহদিগণ, আ হজরত (ছালঃ)-এর অধীনতা-স্থত্রে আবদ্ধ হইল ।

খয়বর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে এক মঞ্জেলের পথে, একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে । রাত্রিকালে সকলে শিবিরে নিদ্রিত ছিলেন ; কিন্তু প্রত্যুষে আ হজরত (ছালঃ), কিংবা ছাহাবার কারাম (রাজিঃ) গণের মধ্যে কাহারও নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না । এমন কি, পূর্ব গগনে সূর্য্য উদয় হইল । সর্ব প্রথমে আ হজরত (ছালঃ)-এর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি উঠিয়া সকলকে জাগাইলেন ; তাড়াতাড়ি ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কিছু দূরে গিয়া, সমুদয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে লইয়া ফজরের নমাজ আদায় করিলেন ; নমাজ শেষ করিয়া তিনি করমাইলেন, আর কখনও যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে,—ঘুম না ভাঙ্গে, তবে জাগরিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নমাজ আদায় করিবে ।

মিহদিগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও সুদখোর থাকাতে, প্রায় সকলেই ‘মান-দার’ (ধনী বা অর্থশালী) ছিল । আজকালও পৃথিবীর নানাদেশে—বিশেষতঃ ইউরোপ ■ আমেরিকার—এদেশে ও বোম্বাই এবং কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে বহু বড় বড় ধনী ■ ক্রোড়পতি মিহদী রহিয়াছেন ; খয়বরের মিহদিগণের অধিকার ভুক্ত ‘যমিন’ (ভূ-সম্পত্তি) উর্বরা ও শস্য-শালিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল । খয়বর বিজয়ের পর, বিজয় লব্ধ-প্রচুর সামগ্রী-সম্ভার, আর কৃষির-যমিন ■ বাগ-বাগিচা যাহা ভাগে

পাইয়াছিলেন, তদ্বারা এককাল পরে ~~নবাব~~ (রাজিঃ) গণের অর্থাভাব একেবারে দূর হইল। এক্ষণে নিরুপায় মহাজেরগণ ‘হাহেবে-জায়দাদ’ (ভূ-সম্পত্তির অধিকারী) হইলেন। খয়বর ■ তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের যমি সমূহের মধ্যে ফৈদকের জায়দাদ (ভূ-সম্পত্তি—চাষের যমিন ও বাগ-বাগিচাঃ) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ভাগে পড়িয়াছিল। উহার উপস্থিত হইতে একদিকে তিনি স্বীয় সাংসারিক ও পারিবারিক খরচ-পত্র নির্বাহ করিতেন, পক্ষান্তরে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করিতেন; তদ্ব্যতীত ‘এতিম’ (অনাথ) বালক বালিকা ও নিঃস্ব-নিরুপায় মহতায়’ (পর মুখাপেক্ষী) লোকদিগের ভরণ-পোষণ ও তদ্বারা নির্বাহ করিতেন।

মক্কার মোশরেক (অংশিবাদি) গণ যখন খয়বরের উপর মোসলমান-দিগের ‘চড়্‌হাই’ (অভিযান ও অবরোধ)-এর সংবাদ পাইল, তখন তাহারা বড়ই উৎকণ্ঠার সহিত এই যুদ্ধের পরিণাম-ফল জানিবার ■ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হোজাজ-বিন্-আলাত ছলমী নামক একজন অর্থ-সম্পদ শালী লোক ‘হজর’ (প্রবাস-যাত্রা)-এর নাম করিয়া, মক্কা হইতে বাহির হইয়া, মদীনা-মহুওরায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ করিয়া-ছিলেন; খয়বরের যুদ্ধে তিনি আঁ হজরতের (ছালঃ) সঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি, ‘হজর’ (ছালঃ)-এর আদেশ গ্রহণ পূর্বক মক্কার গিয়া দেখিলেন, মক্কাবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ খয়বরের ‘খবর’ (সংবাদ) জানিবার ■ বড়ই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। তিনি খয়বরের প্রকৃত অবস্থা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন না; বরং নিজের পাওনা টাকা কড়ি আদায় কার্যে সকলের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। সমুদয় টাকা-কড়ি আদায় করিয়া লইয়া, মক্কা পরিত্যাগ কালে তিনি কেবল-মাত্র আব্বাহ বিন্-আবদুল মোতালেব কে খয়বর-বিজয়ের সংবাদ বলিয়

গেলেন । ইহার পর মক্কার কাফেরগণ হোজাজের ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ, এবং মোসলমানদিগের দ্বারা খরবর 'কতেহ্' (জয়) হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইল । এই সংবাদ শ্রবণে তাহারা বড়ই মর্শ্ব-পীড়িত হইয়াছিল ।

আ হজরত (ছালঃ) খরবর হইতে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিয়া, যে সকল সম্প্রদায় মোসলমানদিগের মূলোৎপাটন করার জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে এক এক দল সৈন্য পাঠাইলেন । উদ্দেশ্য, বাহাতে তাহারা ■■■ পায়, এবং তাহাদের উপর ইসলামের 'রোয়ব' (প্রভাব) প্রতিষ্ঠিত হয় ; আর ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা কোনও ভীষণ বড়যন্ত্র ■■■ বিদ্রোহ-বিপ্লবের আশঙ্কা না থাকে । তদনুসারে নজদের ক্বারাঃ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন । তাঁহার সঙ্গে ছালমাঃ-বিন্-আলা কোর (রাজিঃ) এবং অন্যান্য কতিপয় ছাহাবাঃ রওয়ানা হইলেন । হওয়ারেয়ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হজরত ওমর-বিন্-খাত্তাব (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় ৩০ জন অশ্বারোহী যোদ্ধাপুরুষ গমন করিলেন । হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ), ৩০ জন উষ্ট্রারোহী সৈন্যের সঙ্গে, বশির-বিন্-দারাম নামক যিহুদীকে 'গেরেক্তার' (ধৃত) করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন । এই লোকটি খরবরের যিহুদীদিগকে বিদ্রোহী হইবার ■■■ উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতেছিল । বশির বিন্-ছামাদ আনুছারি (রাজিঃ) ৩০ জন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া বনি-মরুরাহ সম্প্রদায়কে দমন করিবার ■■■ প্রেরিত হইলেন । হজরত ওছামাঃ বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে এক প্রবল বাহিনীর সঙ্গে, জহনিয়া সম্প্রদায়ের এক শাখা কবীলার (গোষ্ঠীর) বাসস্থান হরকার দিকে পাঠাইলেন । হজরত গালেব (রাজিঃ) বিন্-আবদুল্লা কলিনী, একদল যোদ্ধাপুরুষের সঙ্গে, বনি-আল্-মলুহ্ সম্প্রদায়কে 'শায়েস্তা' (সোজা) করিবার ■■■ প্রেরিত হইলেন । হজরত আবু-হদর আছলমী

(রাজিঃ)-কে মাত্র ■ ■ ■ ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে, জশম-বিন্-মোয়াবিয়া সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি বা নেতা) রফায়-বিন্-কয়েস ■ ■ ■ দমন করিবার ■ ■ ■ পাঠাইলেন । হজরত আবু-কেতাদাহ্ (রাজিঃ) ও মহলম (রাজিঃ) বিন্-জছামকে, মকাম " আজম " (আদম)-এর দিকে রওয়ানা করিলেন । এই সকল সামরিক অভিযান সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত অবস্থায় মদীনা-তৈয়্যাব, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে ফিরিয়া আসিল । প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মোসলমানগণ সম্পূর্ণ বিজয় ও সাফল্য লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন ।

আঁ হজরত (ছালঃ) এই বৎসরেই আরব দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, এবং আরবের বাহিরে ■ কতিপয় সাম্রাজ্য ■ রাজ্যের অধিপতি ■ সম্রাট্, দিগের নিকট পত্র সহ 'এলুচি' (দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাঁহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ■ ■ ■ অনুৰোধ ও আহ্বান করা হয় । আবিশিনিয়ার (হাবশের) বাদশাহ নজ্জাশার নিকট যে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহা ইতি-পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । আবিশিনিয়াধিপতি আনন্দের সহিত পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । এক্ষণে আঁ হজরত (ছালঃ) ক্রমের বাদশাহ (কনষ্টান্টিনোপলস্থ গ্রীক-সম্রাট্) হরকল, মেছেরের বাদশাহ্ লহকুকল, বাহরায়নের অধিপতি মন্বর-বিন্-ছাওবী, ওমানের বাদশাহ, এমামার অধিপতি হোয়াঃ-বিন্ আলী, দেমেশ্‌কের ইসারী শাসনকর্তা হারেস্-বিন্-আল্ শমর গচ্ছানী, জবুলাঃ-বিন্-আরিহম, এমনের বাদশাহ হরছ-বিন্-আবদ কালান হমিরী ও ফারেছের বাদশাহ (পারস্ত-সম্রাট্)-কেছরী (কেছরাঃ)-এর নিকট চিঠি-পত্র দিয়া, উপযুক্ত দূতগণকে রওয়ানা করিলেন । কনষ্টান্টিনোপলস্থ গ্রীক সম্রাট্ হরকল, আঁ হজরতের (ছালঃ) প্রেরিত দূতের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ■ সম্মান প্রদর্শন করিলেন ; কিন্তু রাজ্যের লোভে ও খৃষ্টীয়ানদিগের ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন না । মেসেরের

শাসনকর্তা লহকুকশ, আ হজরতের পত্র ■ তাঁহার এল্‌টির প্রতি খুব ভক্তি ■ সম্মান প্রদর্শন করিলেন ; তিনি আদরের সহিত পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন ; আর একটি খেলয়ত, একটি বহুমূল্য অশ্বতর (খচ্চর) এবং দুইজন ক্রীত দাসী 'হাদিয়া' (নঘর) স্বরূপ পত্রের সঙ্গে আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে রওয়ানা করিয়াছিলেন । ওখানের নরপতি আ হজরত (ছালঃ)-এর পত্র পাইয়া পরম ভক্তি সহকারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন । মন্বর বিন্-সাওনী, আ হজরতের (ছালঃ) পত্রখানি পাইয়া, প্রেরিত এল্‌টি ও পবিত্র পত্রখানির প্রতি পরম ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন । কারেছের বাদশাহ (পারস্ত-সম্রাট) কছরী, (কেছরাঃ) আ হজরত (ছালঃ)-এর পত্রখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; আর আ হজরত (ছালঃ) এর এল্‌টি হজরত আবছুলা-বিন্-হবাকাঃ (রাজিঃ) এর 'গোস্তাখানা' (অভদ্রতা ও অশিষ্ট জনক) ব্যবহার করিয়াছিলেন । আ (ছালঃ) এই সংবাদ শ্রবণে বলিয়াছিলেন, কছরীর 'ছোলতানৎ' (রাজ্য বা সাম্রাজ্য) ঐরূপ (ছিন্ন পত্রখানির স্তায়) টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে । ফলতঃ কিছুকাল (কয়েক বৎসর) পরেই, আ হজরত (ছালঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল । মহামাণ্ড্ব দ্বিতীয় খোলাফায়ে রাশেদীন হজরত কারক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ-কালে বিশাল পারস্ত-সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ইসলামী খেলাফতের (সাম্রাজ্য বা গণতন্ত্রের) অন্তর্ভুক্ত হয় ।

৭ম হিজরীর শওয়াল মাসের শেষ পর্য্যন্ত আ হজরত (ছালঃ) মদীনা-তৈয়বায়ই তশরিফ্ রাখিয়াছিলেন । ৭ম হিজরীর জেবদ মাসের প্রারম্ভে তিনি ঐ সকল ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-কে 'ছফর' (প্রবাস বা মোছাফেরী)-এর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন—যাহারা গত বৎসর হোদবিয়ার সন্ধির সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন । তদনুসারে ঐ সকল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং আরও বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ছফরের

হইতে লাগিলেন । ২০০০ দুই হাজার ছাহাবাঃ (রাজিঃ), হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে যোমরা-অযুঠান আদায় করিবার জন্য মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে যাত্রা করিলেন । গতবার হোদিবিয়ায় যে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরীত হইয়াছিল, তাহাতে এই শর্ত ছিল যে, এ বৎসর যোমরা আদায় করা ব্যতীত আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে চলিয়া যাইবেন, আর আগামী বৎসর আসিয়া যোমরা-অযুঠান সম্পন্ন করিবেন । সুতরাং এই শর্ত অনুযায়ী আঁ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে সদলবলে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । মক্কার খুব নিকটে পহুঁছিয়া কোষবদ্ধ তরবারি এবং হেমারেল মাত্র সঙ্গে রাখিলেন ; অবশিষ্ট সর্বপ্রকার ‘হাতিয়ার’ (অস্ত্র-শস্ত্র) খুলিয়া রাখিয়া দিয়া, তৎপর মক্কার প্রবেশ করিলেন । বয়তোল্লার সম্মুখে পহুঁছিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) মোসলমানদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা স্বক্কেদে ‘বরু-আহ্নাঃ’ (অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত) কর, আর এহরামের কাপড় বগলের নীচে দিয়া বাহির করিয়া, ‘গরদানের’ (ঘাড়ের) ‘গেদ্ব’ (চতুর্দিক) লেপ্টাইয়া লইয়া ‘মস্তয়দীর’ (দৃঢ়তার) সঙ্গে দোড়িয়া ‘ছবুগরমীর’ (মহোৎসাহের) সঙ্গে ‘বায়তোল্লার’ (পবিত্র কাবা-গৃহের) ‘তওয়াফ্’ (প্রদক্ষিণ) কার্য সম্পন্ন কর । মোসলমানদিগের এই আড়ম্বর পূর্ণ তওয়াফ্ কঠোর পরিশ্রম, অসাধারণ শক্তি ■ ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা দর্শনে বিধর্ম্মিগণ অভিভূত হইল ; অনেকে মনের দুঃখে নিকটস্থ ওয়াদী ও পাহাড় অঞ্চলে চলিয়া গেল ।

আঁ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-গণ গত বর্ষের সন্ধি-শর্তানুসারে ৩ দিবস মাত্র মক্কা-মোয়াজ্জমায় অবস্থিতি করিলেন । ‘আরকানে-ওমরা’ কার্য সম্পাদন পূর্বক আঁ হজরত (ছালঃ), খ্বীর পিতৃব্য আব্বাস-বিন্-আবদুল-মোত্তামেবের বিবী (পত্নী) ওশ্মে-ফজলের ভগিনী ময়মুনাঃ বিস্তে হারেসের সঙ্গে পরিণয়-শূভ্রে আবদ্ধ হইলেন । তাঁহার ইচ্ছা

ছিল ‘ওলিমার ঘেরাকং’ (বিবাহের পর বরপক্ষ হইতে যে ভোজ দেওয়া হয়) করিয়া মক্কাবাসীদিগকে আহার করান ; কিন্তু কোরেশগণ ■ দিনের বেশী কিছুতেই মোসলমানদিগকে মক্কার থাকিতে দিতে রাজী না হওয়াতে, অগত্যা তিনি ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে, সদলবলে মক্কা পরিত্যাগ করিলেন । ওয়াহি ছরফের মধ্যস্থিত ময়দানে মোসলমানদিগের শিবির সন্নিবেশিত হইল । এই স্থানে আবু হজরত (ছালঃ)-এর নব-পরিণীতা পত্নী হজরত মরমুনাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার ‘খেদমতে’ আসিয়া উপস্থিত এবং সন্মিলিত হইলেন । যখন তিনি মক্কা হইতে রওয়ানা হইতেছিলেন, ঐ সময় বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আমীর হামযাঃ শহীদ (রাজিঃ)-এর অতি অল্পবয়স্ক কন্যা এমারাঃ দৌড়িতে দৌড়িতে আসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, আমাকেও মদীনায়া লইয়া চলুন । হজরত আলী (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া স্বীয় ‘হোদজে’ (উষ্ট্রের পৃষ্ঠোপরিস্থ হাওয়ার) তুলিয়া লইলেন । হজরত জাকর-বিন্-আবি-তালেব (রাজিঃ) ও হজরত জয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ), ঐ বালিকার অভিভাবকত্ব গ্রহণ জন্ত দাবীদার হইলেন । আবু হজরত (ছালঃ) তাঁহাদের দাবী-দাওয়ার কথা শুনিয়া, এমারাঃ কে হজরত জাকর (রাজিঃ)-এর হস্তে এই বালিকা অর্পণ করিলেন যে, তাঁহার পত্নী এই বালিকার আপন খাল ; খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত ; সুতরাং ইহার ‘পরওরেশ’ (লালন পালন) জাকরঃ (রাজিঃ)-এর গৃহেই হওয়া চাই । আর সকলকে তিনি বুঝাইয়া সুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন ।

মদীনা-মহুওরায়া প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই ওমর-বিন্-অল-আস, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে, এবং মক্কা হইতে মদীনায়া হেজরত করিতে ইচ্ছুক হইলেন । নানা কারণে ওমর-বিন্-অল-আসের হৃদয় ইসলামের দিকে এমন সবলে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি সে আকর্ষণ হইতে কিছুতেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না । মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ-

তাঁহার অকপট বন্ধু ছিলেন । হোদিবিরার ‘ছফরে’ (প্রবাসে) “ গজবান ” নামক স্থানে, রাত্রিকালে এশার নামাজের সময় আ হজরত (ছালঃ)-এর মুখে কোরআন মজীদেয় সুমধুর কেবরাত শুনিয়া খালেদ-বিন্-অলিদের একান্ত বিচলিত ও দ্রবীভূত হইয়াছিল । ঐ দিন হইতে তাঁহার ইসলামের প্রতি ‘মোহক্কত’ (ভালবাসা) জন্মিয়াছিল ।

ওমর-বিন্-অল্-আস, খালেদ-বিন্-অলিদের নিকট স্বীয় এয়াদাঃ সঙ্ঘ) প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় অমুকুল অভিমত জ্ঞাপন করিলেন । তচ্ছুবণে খালেদ-বিন্-অলিদ তাঁহার ‘হামরাহী’ (সঙ্গী—প্রবাসের সাথী) হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন । অতঃপর ইহারা উভয়ে আপনাদের অমৃতম বন্ধু ওসমান-বিন্-তালাহাকে আপনাদের অভিমত জানাইলেন । তিনিও বিনা আপত্তিতে—বরং ভক্তি-ভরে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সঙ্গী হইতে প্রস্তুত হইলেন । তদনুসারে এই জন প্রসিদ্ধ কোরেশ ছরদার ও দেশ-বিখ্যাত বীরপুরুষ মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনা তৈয়বায়, আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন ; এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন । ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে আ হজরত (ছালঃ) অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ; পক্ষান্তরে ইহাদের ইসলাম গ্রহণে ইসলামের শক্তি অজের হইল ।

হেজরতের অষ্টম বৎসর ।

এক্ষণে আরব দেশে প্রকাশ্যতঃ ইসলামের কোনও ‘খংরাঃ’ (আশঙ্কা) ছিল না । ইসলাম গ্রহণ করিলে ‘জান’ (প্রাণ) ■ ‘মালের’ (আর্থিক) ক্ষতির কোনও ছিল না । আরব দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহ একে একে আপনাদের শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া অকৃতকার্যও

‘যাহুজ্জ’ (নিরাশ) হইয়াছিল । ইসলাম এক্ষণে বিশাল আরব দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন ও জয়যুক্ত হইয়াছিল । ইসলাম আরবে যেমন শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল ; তেমনই তথাকার সর্বপ্রকার বিদ্রোহ-বিপ্লব, বাদ-বিসংবাদ দূর হইতে আরম্ভ হইল । এতদ্ স্বত্বেও মক্কার কোরেশগণ—যাহারা আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানিত ছিল—এখন পর্য্যন্ত কোফর ও শেরকীতে ‘কায়েম’ (অবিচলিত) এবং মোসলমানদিগের শত্রুতাচরণে পূর্ববৎ অটল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল । ধরবরের যিহুদিগণ নিশ্চেষ্ট হইবার পর মদীনার মোনাফেক দল এবং মক্কার কোরেশ দল,—মোসলমানদিগের এই ঘোরশত্রু সম্প্রদায় দুই, আরবের অভ্যন্তরীণ ‘কবায়েল’ (জাতি এবং উপজাতি) দিগকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়া বখন তাহার ফল অকৃতকার্য ও অসাফল্য দর্শন করিল, তখন তাহারা ইরান (পারস্ত) ও রুমের ‘শাহান্ শাহ’ (সম্রাট), এবং ইরানী ও রোমীয় ‘ছরদার’ (দলপতি এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা) দিগকে মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার নিমিত্ত বিশেষ ‘কোশেশ্’ ও ‘শাজেশ্’ (চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র) আরম্ভ করিল । ঐ (ছালঃ) এই সকল ভাবী বিপদের বিষয় অবিদিত ছিলেন না । তিনি আরবদেশের অভ্যন্তরস্থ এবং ইহার আশে পাশে অবস্থিত ৩ সংলগ্ন রাজ্য সমূহের নৃপতি ও শাসনকর্তা দিগের নামে ‘দাওতি খৎ’ (নিমন্ত্রণ-বা আহ্বান পত্র) রওয়ানা করিয়াছিলেন, ঐ সকল দাওতি-পত্রে, অনেক দরবারে বেশ সফল প্রসব করিয়াছিল । তদ্রূপ শত্রুদলের ছরভিসন্ধি ষড়যন্ত্র এবং ছুটে কল্পনা-জল্পনা অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল । কিন্তু কোনও কোনও সম্রাট্ বা শাসনকর্তা, ঐ হজরত (ছালঃ)-এর পত্র প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে-দূরে থাকুক, বরং মোসলেম শত্রুদলের প্ররোচনার মোসলমানদিগের মূলোৎপাটন করিবার জন্য বন্ধ-

পরিকর হইলেন । ██████ কেহ মদীনা আক্রমণ করিবার জন্ত যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে ও উৎসাহ সহকারে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । এক্ষণে বহিরাক্রমণ হইতে আরব দেশ—বিশেষতঃ মদীনা-তৈয়বা নগরীকে রক্ষা করা—আ হজরত (ছালঃ) এবং মোসলমানদিগের পক্ষে একান্ত কর্তব্য হইয়া পড়িল । এই সময় কোনও বৈদেশিক শক্তি মদীনা আক্রমণ করিলে, সমগ্র আরবের বিভিন্ন জাতি সমূহ আবাক মন্তকোত্তোলন করিয়া, মোসলমানদিগের যুলোৎপাটন করিতে পূর্ণোচ্চমে প্রবৃত্ত হইত ।

আ হজরত (ছালঃ) যে সকল তব্‌লিগী দাওত পত্র বিভিন্ন সম্রাট্‌ বাদশাহ ও শাসনকর্তাদিগের নামে লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানি পত্র হজরত হারেছ (রাজিঃ) বিন্‌-য়মির আব্দীর হস্তে, শাম (সিরিয়া) দেশের অন্তর্গত বোছরার (বজ্‌রা) শাসনকর্তার নামে রওয়ানা করিয়াছিলেন । হারেছ (রাজিঃ) বিন্‌-য়মির-আব্দি মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া বোছরার পহুছিবার পূর্বে, শামের সীমান্তবর্তী 'যুতা' নামক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, তথাকার খৃষ্টীয়ান শাসনকর্তা শরজিল-বিন্‌-য়মর গাচ্ছানী তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার (ধৃত) করিয়া বন্দী, এবং পরে তাঁহার হত্যা সাধন (শহীদ) করিল । হারেছ-বিন্‌-য়মির (রাজিঃ)-এর বিনা কারণে—অস্ত্রাঘাত ভাবে কতল হইবার সংবাদ যখন মদীনা-মহুওরায় পহুছিল, সহযোগী ভ্রাতা ও বন্ধুর অতি শোচনীয় ভাবে শাহাদৎ প্রাপ্তিতে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল । আ হজরত (ছালঃ) ও এই শোচনীয় ব্যাপারে নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন ।

মুতার অভিযান ও তথায় ভীষণ যুদ্ধ।

মুতার শাসনকর্তার অন্ত্রায় ও অবৈধ আচরণের প্রতিকার-কল্পে-
কর্তব্য-নির্ধারণ জন্য অনতিবিলম্বে এক পরামর্শ-সভা আহূত হইল।
আ হজরত (ছালঃ) এই ব্যাপারের ভীষণ পরিণাম ছাহাবাঃ (রাজিঃ)
মণ্ডলীকে এই বলিয়া বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই অত্যাচারী
বিধর্মী শাসনকর্তাকে দমন না করিলে, সে সাহসী হইয়া মদীনা আক্রমণ
করিতে পারে; এবং অন্তান্ত শত্রুগণও সেই সুযোগে মস্তকোত্তোলন
করিয়া, মোসলমানদিগের অস্তিত্ব ধরা-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা
পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্যাপারের গুরুত্ব সকলেই বুঝিতে পারিলেন।
মুতার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরণ করা একান্ত কর্তব্য;
তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন; তদনুসারে সকলেই আ
(ছালঃ)-এর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

আ হজরত (ছালঃ) অনতিবিলম্বে এক ‘মহম’ (অভিযান) মুতার
মদ-গর্ভিত শাসনকর্তার বিরুদ্ধে রওয়ানা করিলেন। যদি ‘মহম’ প্রেরণে
কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিত, তবে শামের (শিরিয়ার) দিক হইতে মদীনা
আক্রান্ত হওয়া ‘একিনী’ (স্থনিশ্চিত) ছিল। আ হজরত (ছালঃ)
যয়েদ-বিন্ হারছাঃ (রাজিঃ)-কে এই সেনাদলের সেনাপতি পদে বরিত
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ফরমাইলেন যে, যদি যয়েদ-বিন্-হারছাঃ
(রাজিঃ) যুদ্ধে শহীদ হয়, তবে জাফর-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ)
সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবে; যদি জাফর (রাজিঃ) শহীদ হইয়া
যায়, তবে আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) সেনাপতি পদে বরিত
হইবে; যদি সেও শহীদ হইয়া যায়, তবে উপস্থিত মোসলমানগণ যাহাকে
উপযুক্ত মনে করে, তাহাকেই সেনাপতি পদে বরণ করিবে। এই সেনাদল

রওয়ানা করিয়া, আ হজরত (ছালঃ) কিয়দূর পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন । পরে তাঁহাদিগকে অগ্নী হওয়ার জন্য দোওয়া করিয়া মদীনা-মহুওয়ার ফিরিয়া আসিলেন । হজরত যয়েদ-বিন্-হারছাঃ (রাজিঃ) স্বীয় সেনাদল লইয়া ‘মায়ান’ নামক স্থান পর্যন্ত গমন করিলেন । মায়ানে পহুছিয়া সংবাদ পাইলেন, মৃত্যুর শাসনকর্তা শরজিল-বিন্-ওমর, মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার এক লক্ষ বিক্রান্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে ; আর এক লক্ষ মহাপরাক্রান্ত সুশিক্ষিত রোমক সৈন্য লইয়া মৃত্যুর কিছু দূরে—ওয়ারদি বলজায়, স্বয়ং ক্রমের কারছর (কনষ্টান্টিনোপলস্থ রোমক সম্রাট্ হরকল) শিবির সম্মিলে পূর্বক অবস্থান করিতেছেন । এই সংবাদ শ্রবণে মুষ্টিমের মোসলমান সৈন্তের মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাও ভীতির সঞ্চার হইল । তাঁহারা ২ দিন পর্যন্ত মায়ানে অবস্থান পূর্বক কর্তব্য অবধারণে ব্যাপ্ত রহিলেন । কিন্তু এযাবৎ কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন না । অবশেষে আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) অগ্নিময়ী ভাষায় একটা বক্তৃতা প্রদান পূর্বক, মোসলমানদিগের হৃদয়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন ।

হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহার এই ইসলাম-ধর্ম-সম্মত বীরত্ব-ব্যঞ্জক বক্তৃতা শ্রবণে হজরত যয়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ), এক হস্তে নেযাঃ (বড়শা বিশেষ) ও অপর হস্তে পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন । সমগ্র মোসলমান সেনাদলে ‘জোশ্’ (উত্তেজনা) ও ‘শাহাদতের শওক’ (শহীদ হইবার আকাঙ্ক্ষা) বিশেষ রূপে আত্ম-প্রকাশ করিল । অতঃপর মোসলমান সৈন্তগণ মহোৎসাহে ‘মায়ান’ হইতে রওয়ানা হইলেন । ‘মাস্-রফ্’ নামক এক গ্রামের নিকটবর্তী বিস্তৃত ময়দামে বিপক্ষের বিশাল সেনাদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত দৃষ্ট হইল । কিন্তু মোসলমানগণ ঐ স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য বোধ করিলেন না ; তাঁহারা সেখান হইতে পাশ কাট্রিয়া

মৃত্যু নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত প্রাথমিক
 ময়দান হস্তগত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ; তদনুসারে তাঁহারা মৃত্যুর
 উপস্থিত হইলে, কোফ্‌কার সেনাদল সেই ময়দানের দিকে অগ্রসর
 করিয়া মোসলমানদিগের সম্মুখীন হইল। দেখিতে দেখিতে উক্ত
 প্রতিপক্ষ সেনাদলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রে
 সম্বিষ্ট সিরীয় ■ রোমক সৈন্তের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল, আর
 মোসলমান যোদ্ধা পুরুষের সংখ্যা ছিল ৩ সহস্র—তেরিশ ভাগের এক ভাগ
 মাত্র। এই মোসলেম সেনা দলের সঙ্গে মক্কার সুপ্রসিদ্ধ বীর, নব-দীক্ষিত
 মোসলমান বীরেন্দ্র কেশরী হজরত খালেদ-বিন্-অলিদও ছিলেন। মোসল-
 মান হওয়ার পর, স্বীয় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের পক্ষে তাঁহার এই
 প্রথম সুযোগ ছিল। আবার মোসলমান ও খৃষ্টীয়ান দিগের মধ্যে ইহাই সর্ব
 প্রথম ও সর্ব প্রধান যুদ্ধ। হজরত য়েদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ) যুদ্ধ-
 পতাকা হস্তে ধারণ পূর্বক মোসলমান সেনাদলের মধ্যস্থলে—সকলের
 ■ অগ্রে অগ্রসর হইতেছিলেন। দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি পদে কংঃ
 (রাজিঃ) বিন্-কেতাদাহ্‌ আযরী, এবং বাম বাহুর সেনাপতি পদে আবাইয়া
 (রাজিঃ) বিন্-মালেক আনছারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হজরত য়েদ-
 বিন্-হারেছ (রাজিঃ) মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে মূল সৈন্তদল
 হইতে অনেকটা অগ্রবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সুবোলে পক্ষ-
 সেনাদল তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টিত করিয়া, অস্ত্র ধারায় অস্ত্রবর্ষণ
 করিতে লাগিল। তিনি সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শহীদ হইলেন।
 অতঃপর হজরত জাফর-বিন্-আবিতালেব (রাজিঃ) দৌড়িয়া অগ্রসর
 হইলেন, এবং পবিত্র রণ-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ
 করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাণিত তরবারি, মুখে শতশত কোফ্‌কার,
 ঝড়ে নিপতিত কদলী গাছের স্তায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল।

প্রত্যেক মোসলমান বীরপুরুষ "আল্লাহ আকবর" বলিয়া তকবির ধ্বনি করত কোঙ্কারের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর মোসলেম সেনাপতির অশ্ব আহত হওয়াতে, তিনি অশ্ব পরিত্যাগ পূর্বক পদাতি রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শত্রুদল তাঁহা কও বেষ্টন করিয়া লইল। শত্রুর তরবারির আঘাতে তাঁহার ডান হাতখানি ছিন্ন হইল; তিনি বাম হাতে রণ-পতাকা ধারণ করিলেন। যখন বাম হাতও কঠিত হইয়া ভূপতিত হইল, তখন তিনি 'গরদানের' (ঘাড়ের) সঙ্গে পতাকা ঠেকাইয়া বুকের আশ্রয়ে পতাকা খাড়া রাখিলেন। এই অবস্থায়ই তিনি অল্পকাল পরে শহীদ হইয়া গেলেন। তাঁহার শাহাদতের পর হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) ভূ-পতিত রণ-পতাকা তুলিয়া লইলেন। অল্পকাল মাত্র যুদ্ধ করিয়া ইনিও শাহাদতের শরবৎ পান করিলেন। হজরত ছাবেত-বিন্-আকরম (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রণ-পতাকা তুলিয়া লইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন :—
 "মোসলমান ভ্রাতৃগণ! আমাদের মধ্যে কাহাকেও আমীর (প্রধান সেনাপতি) নির্বাচনে সকলে এক মতাবলম্বী হও।"

মোসলমানগণ চতুর্দিক হইতে 'আওয়ায্ বলন্দ' করিলেন (উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন), আমরা তোমাকে নেতৃত্ব প্রদানে রাজী আছি। তচ্ছবণে হজরত ছাবেত-বিন্-আকরম (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, "আমার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইবে না, তোমরা খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-কে 'ছরদার' (সেনাপতি) বলিয়া মানিয়া লও।" সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিক হইতে 'আওয়ায্' উখিত হইল, আমরা খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতি বলিয়া গ্রহণ করিতে সর্বতোভাবে রাজী আছি। এই কথা শুনিবামাত্র হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া, হজরত ছাবেত-বিন্-আকরম (রাজিঃ)-এর হস্ত হইতে পবিত্র

পতাকা গ্রহণ পূর্বক, ভীমতেজে সিরীয় ও রোমক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। হজরত খালেদ-বিন্ অলিদ (রাজিঃ) যুদ্ধ-পতাকা হস্তে ধারণ পূর্বক, গভীর নিনাদে মোসলমানদিগকে নব বলে—পূর্ণ সাহসে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিলেন। চতুর্দিক হইতে “আল্লাহ আকবর” ধ্বনি উখিত হইয়া, রণস্থলের সর্বত্র উহা প্রতিধ্বনিত হইল। নব-নির্বাচিত প্রধান সেনাপতি এমন সুশৃঙ্খল ভাবে, ভীষণরূপে বিশাল রোমক সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন, যেন ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র ছাগ বা মেঘদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মূণ্ডপাত করিয়া থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের অবস্থা ফিরিয়া গেল। বিশাল রোমক বাহিনী বিক্ষুব্ধ, বিভ্রাসিত এবং ভীত ও সম্বৃত্ত হইয়া পড়িল। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) স্বীয় ভীত, সম্বৃত্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সেনাদলকে অত্যল্প কাল মধ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইলেন; এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে এক বৈদ্যুতিক শক্তি আনয়ন করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দলে উপযুক্ত সেনাপতি সকল নির্বাচিত হইলেন। মোসলমানদিগের দুর্বীর পরাক্রমে সিরীয় ও রোমীয় বিশাল সেনাদল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) এমন যোগ্যতার সহিত স্বীয় সেনাদল পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষ দলের সৈন্য ও সেনাপতিগণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহাদের জাঁক-জ্বনক পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে কোনও ফলোদগম হইল না। মোসলেম সেনাপতি একবার স্বয়ং অগ্রবর্তী হইতেন, আবার নিজের বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন দিক দিয়া অগ্রসর করিতেন। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় সমরাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। স্বীয় বাহিনীর প্রত্যেক দলের সম্মুখে তিনি বিজলীর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া, তাহাদের সাহস উৎসাহ বর্ধন করিতেন। প্রত্যেক বিভিন্ন সেনাদল মনে করিতেন, প্রধান সেনাপতি আমাদের

দলেই বিদ্যমান আছেন। শত্রু-সৈন্য অগণিত, অসংখ্য; সে তুলনায় মোসলমান সৈন্য মুষ্টিমেয় মাত্র। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য ইসলামের পবিত্র শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন। হজরত খালেদ-বিন-অলিদ (রাজিঃ) স্বীয় তিন সহস্র সৈন্য লইয়া, একলক্ষ সিরীয় ও রোমক সৈন্যের সঙ্গে অসম সাহসে—বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। বেলা অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশাল রোমক ■ সিরীয় বাহিনী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বিজয়ী মোসলমানগণ কিয়দূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎদ্বার করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে মাত্র ১২ জন মোসলমান শহীদ হইয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছিল। অতঃপর শাহাদৎ প্রাপ্ত মোসলমান বীরশূর্যদিগকে যথানিয়মে সম্মানে সমাধিস্থ করা হইল। হজরত খালেদ-বিন-অলিদ (রাজিঃ)-এর অসাধারণ বীরত্ব, সামরিক যোগ্যতা ■ সেনাপতির উপযুক্ত সর্বপ্রকার গুণ-গ্রাম সম্বন্ধে সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গৌরব ■ সম্মানের বিষয় ইহাই ছিল যে, স্বয়ং খোদা তায়ালা ও তাঁহার রচুল (ছালঃ)-এর পক্ষ হইতে তিনি ‘হুস্বে-আল্লাহ্’ (আল্লাহ্ তা-লার তরবারি)—এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যখন হজরত খালেদ-বিন-অলিদ (রাজিঃ), স্বীয় বিজয়ী সেনাদল লইয়া মদীনার নিকটে আসিয়া পৌঁছাইলেন, তখন ঐ হজরত (ছালঃ) মদীনা হইতে বাহির হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য কিয়দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আর হজরত খালেদ-বিন-অলিদ (রাজিঃ)-কে “সয়ফো-আল্লাহ্” উপাধী লাভের সুসংবাদ শুনাইলেন। এই সময় এক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) স্বপ্নে দেখিলেন যে, হজরত জাফর (রাজিঃ) জন্নতে (মোসলেম-স্বর্গে) দুই বায়ু (বাহ্ব বা হুত্ব) দ্বারা উড়িতেছেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম ‘জাফর তইয়্যার’

বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । যুতার স্বনাম-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর জমাদিয়ল-আউওল মাসে সম্বটিত হইয়াছিল ।

যুতার-যুদ্ধের একমাস পরে মদীনা শরীফে সংবাদ পৌঁছিল যে, শামের সীমান্তস্থিত "কজার্যা" নামক সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণের অনেক সৈন্য সমবেত করিয়াছে । আবু হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ শ্রবণে হজরত ওমর-বিন-আছ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে ৩০০০ তিন হাজার মোহাজের ও আনছার সৈন্য তথায় প্রেরণ করিলেন ; তিনি শত্রুদলের নিকটবর্তী হইয়া জানিতে পারিলেন, তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক । তৎক্ষণাৎ তিনি এই সংবাদ লইয়া মদীনায় একজন দূত প্রেরণ করিলেন । সংবাদ পাইবামাত্র আবু হজরত (ছালঃ), হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন-জাবরাহ (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় একদল যোদ্ধা পূর্বোক্ত গাজীদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন । তিনি শাম-সীমান্তে পৌঁছিবামাত্র শত্রু সেনা দলকে আক্রমণ করা হইল । বিপক্ষ দল মোসলমানদিগের সে ভীষণ আক্রমণের গতিরোধ করিতে পারিল না ; তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে চতুর্দিকে পলায়ন করিল । মোসলমান বীরপুরুষগণ বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

মদীনার পশ্চিম দিকে, ■ মঞ্জেল দূরে, লোহিত-সমুদ্র তটের অধিবাসী "জোহনিয়া" সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া মদীনা আক্রমণের জন্য যুদ্ধ-সামগ্রী জমা করিয়াছে ; এই সংবাদ শুনিবামাত্র আবু হজরত (ছালঃ), হজরত আবু-ওবেদাঃ-বিন-জাবরাহ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে ৩০০ তিন শত মোহাজের ও আনছার বীরপুরুষকে ঐ বিদ্রোহীদিগের দমন জন্য পাঠাইয়া দিলেন । এই অভিযানকারী দিগকে শত্রু-দলের সম্মুখীন হইতে বা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় নাই । শত্রুদল এই অভিযানের সংবাদ পাইয়াই ভয়ে একান্ত জড়সড় হইয়া

পড়িয়াছিল ; এবং আপনাদের ছরভিসন্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিল ।

অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে মক্কা নগরে একটা নূতন ঘটনা সজ্জাটিত হয় । মক্কা নগরস্থ "বহু-খয্য্যা ও "বহু-বকর " নামক দুইটা সম্প্রদায় হোদেবিয়ার " ছোলেহ্-নামা " (সন্ধি-পত্র) অমুদারী আপনাদের চিরন্তন শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া, আ হজরত (ছালঃ) ও কোরেশদিগের আশ্রিত বা বশীভূত হইয়া গিয়াছিল । এরূপ অবস্থায় তাহাদের একদল, অন্য দলের বিরুদ্ধাচরণ বা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে পারিত না । কিন্তু বহু-বকর সম্প্রদায়ের 'ছরদার' (নেতা বা দলপতি) নওফল-বিন্-মোয়াবিয়া, বহু-খয্য্যা দলের নিকট হইলে পূর্ববত্তী সময়ের 'বদলা' (প্রতিশোধ) গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল । ওদিকে হোদেবিয়ার সন্ধি দশ বৎসরের জন্ত হইয়াছিল, এরূপ অবস্থায় কোরেশ দল, বহু-বকর সম্প্রদায়কে তাহাদের অন্তায় কার্যে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া তাহাদের সাহায্য করিল । কেবল তাহাই নহে, কোরেশদিগের মধ্য হইতে ছফ্-ওয়ান-বিন্-ওয়িয়া, আকুরমা-বিন্-আবুজহল, ছহিল-বিন্-ওমর প্রভৃতি কোরেশ যোদ্ধাদল বহু-বকর দলের সঙ্গে, আক্রমণে তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল । বহু-বকর, কোরেশ ছরদারদিগের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া একদা রাত্রিকালে অকস্মাৎ বহু-খয্য্যা দলকে আক্রমণ পূর্বক নৃশংসভাবে বধ করিতে লাগিল । বহু-খয্য্যা দল রাজনীতে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, বহু-বকর সম্প্রদায়ের এরূপ অতর্কিত নৈশ-আক্রমণের গতিরোধ করিতে অসমর্থ ও নিরুপায় হইয়া তাঁহারা অনেকে পবিত্র কাবা-গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল । 'জালেম' (অত্যাচারি) গণ সে অবস্থায় ও তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিল না ; সেই পবিত্র গৃহ মধ্যেই অনেককে হত্যা করিল । এই অতর্কিত নৈশ-আক্রমণে বহু খয্য্যার ২০।২৫ জন লোক নৃশংসভাবে নিহত

কর ; তন্মধ্যে কয়েক জন পবিত্র কাবা-গৃহ মধ্যে নিহত হইয়াছিল । বাদিল-বিন-ওরকাও ওমর-বিন-ছালেম, খবার্যা সম্প্রদায়ের কতিপয় লোককে লইয়া অনতিবিলম্বে এই উদ্দেশ্যে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইল যে, আ (ছালঃ)-এর খেদমতে বহু-বকর ■ কোরেশদিগের এই সন্ধি-ভঙ্গ ■ নির্মম অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিবে । যে রাত্রিতে সন্ধি-পত্রের এইরূপ শোচনীয় অবমাননা করা হইতেছিল, সেই সময় বহু-খবার্যার কতিপয় লোক আ হজরতের (ছালঃ)-এর নাম লইয়া ফরিয়াদ (প্রার্থনা বা আবেদন) করিল যে, হে খাতেমুন্নবীয়েন ! আমাদের সাহায্য করুন, আর আমাদের 'ফরিয়াদ' (প্রার্থনা) শ্রবণ করুন—বহু-বকর আমাদের প্রতি কি 'জোলাম' (অত্যাচার) করিয়াছে । ঐ সময় আ হজরত (ছালঃ) মদীনা তৈয়বার ওম্মোল-মুমেনিন হজরত মায়মুনাঃ (রাঃ—আঃ)-এর হজরায় বসিয়া ওজু করিতেছিলেন । বহু-খবার্যার লোকেরা মক্কার বসিয়া যে 'ফরিয়াদ' করিতেছিল, আ হজরত (ছালঃ) মদীনা বসিয়া তাহা শুনিতে পাইলেন, এবং উত্তরে " লাক্বায়েক—লাক্বায়েক " শব্দ ফরমাইলেন । হজরত মায়মুনাঃ (রাঃ—আঃ) "আরজ" করিলেন, হজরত ! আপনি কাহার কথার উত্তরে " লাক্বায়েক " বলিতেছেন ? উত্তরে আ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, এ সময় মক্কার বহু-খবার্যা সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের 'ফরিয়াদ' আমার কাণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে ; উহারই উত্তর আমি দিয়াছি । পরদিন সকাল বেলা আ হজরত (ছালঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা হিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইলেন, গত রাত্রিতে বহু-বকর ও কোরেশ দল মিলিয়া বহু-খবার্যাগকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে । ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) বলিলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন, কোরেশগণ সন্ধি-শর্ত ভঙ্গ করিবে ? উত্তরে আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, কোরেশগণ নিশ্চয়ই সন্ধি-শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে, আর আল্লাহ তা-লা

শীঘ্রই উহাদের সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করিবেন । এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বদিল-বিন্ ওরকা ■ ওমর-বিন্-ছালেম খযরী প্রমুখ-বহু-খযরার প্রতিনিধিগণ মদীনায় পহুছিল ; এবং আবু হজরত (ছালঃ)-এর হজুরে কোরেশদিগের সন্ধি-শর্ত ভঙ্গ ■ তাহাদের প্রতি যে বহু-বকর দল, কোরেশ-দিগের সঙ্গে মিলিয়া ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল ।

আবু হজরত (ছালঃ) বহু-খযরার ঐ সকল প্রতিনিধিকে নানা প্রকার প্রবোধ, সাধনা এবং সাহস প্রদান করিলেন, আর ইহাও করমাইলেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যার্থ অতি শীঘ্রই মকায় পহুছিব । তাহাদিগের প্রতি যথোচিত রূপ অতিথি-সংকার করিয়া, তাহাদিগকে মদীনা হইতে মকায় রওয়ানা করিয়া দিলেন । ওদিকে মকাবাসী কোরেশগণ যখন আপনাদের অবৈধ, অসঙ্গত ও নির্দয় কার্য সম্বন্ধে চিন্তা এবং বিবেচনা করিবার অবসর পাইল, তখন তাহারা এই অপকার্যের পরিণাম ফল ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হইল । অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর তাহারা আপনাদের প্রবীণ দলপতি আবু-ছুফিয়ানকে এই বলিয়া মদীনায় পাঠাইল যে, সে সেখানে গিয়া সন্ধি-পত্রের শর্ত সমূহ যেন মূতন ভাবে কায়েম (স্থির) করে । এদিকে আবু হজরত (ছালঃ) মোসলমানদিগকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হও । সূত্রে সূত্রে এই যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় গোপন রাখিতেও বলিয়া দিলেন ।

আবু-ছুফিয়ান মদীনায় পহুছিয়া আবু হজরত (ছালঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ■ হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর সঙ্গে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সাক্ষাৎ করিল ; এবং সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিল ; কিন্তু তাহার কথায় কেহই উত্তর দিলেন না, তদর্শনে সে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িল । অবশেষে হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহ তাহাকে পরিহাস-

চ্ছলে বলিলেন তুমি বহু-কানানার ‘ছরদার’ (নেতা) ; অতএব তুমি মসজিদ-নববীতে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর যে, আমি ‘সোলেহ’-এর (সন্ধির) ‘মেয়াদ’ (সময়) বৃদ্ধি করিতেছি, এবং সন্ধি-পত্রের প্রতিশ্রুতি ‘মজবুৎ’ দৃঢ় করিয়া যাইতেছি । আবু-ছুফিয়ান তদনুযায়ী মসজিদ-নববীতে দাঁড়াইয়া ঠিক ঐরূপ ঘোষণা করিল, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিল । যখন সে মক্কায় পহুছিল, এবং সকল ঘটনা আত্মপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল ; তচ্ছ বণে কোরেশগণ তাহাকে খুব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিল । তাহারা ইহাও বলিল, (হজরত) আলী (রাজিঃ) তোমার সঙ্গে পরিহাস করিয়াছে, তুমি তাহা বুঝিতে পারিলে না, সন্ধি-বন্ধন কি কখনও এইরূপে হইয়া থাকে ? আবু-ছুফিয়ান স্বীয় কৃত কার্য্যের জন্য বড়ই লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইল ।

আবু-ছুফিয়ান মক্কায় প্রস্থান করিলে, আবু হজরত (ছালঃ), ছাহাবার কারাম (রাজিঃ)-দিগকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন । এই সময় পর্য্যন্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ জানিতেন না যে, ইসলামী সেনাদল কোন্ দিকে অভিযান করিবেন, এবং কোন্ দেশ বা কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করা হইবে । এইরূপ গোপন ভাবে যুদ্ধ-সজ্জা করা সম্বন্ধে, আবু হজরত (ছালঃ) এর এই উদ্দেশ্য ছিল যে, কোরেশগণ যেন পূর্ব্ব হইতে এই অভিযানের সংবাদ জানিতে না পারে ।

৮ম হিজরীর ১১ই রমজানুল-মবারক—আবু হজরত (ছালঃ) দশ হাজার ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । আবু-ছুফিয়ান বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসাতে কোরেশগণ বড়ই ‘পেরেশান’ (চিন্তাকুল) ছিল । তাহাদের ‘জাছুছ্’

(গুপ্তচর) গণ, বা তাহাদের পক্ষাবলম্বী জাতি সমূহ ■ তাহাদিগকে এই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রদান করিয়া ছিল না । আ হজরত (ছালঃ) মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া দ্রুতগতি মক্কার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন । তিনি যখন সসৈন্তে “ জহফাঃ ” নামক স্থানে পহুছিলেন, তখন তাহার পিতৃব্য আব্বাস-বিনু-আবদুল মোত্তালেব (রাজিঃ) মোসলমান হইয়া, স্বীয় পরিবার বর্গ সহ হেজরত করিয়া মদীনায় যাইতেছেন, দেখিতে পাইলেন । তিনি পিতৃব্যের ‘আহ্লে ও আয়াল’ (পরিবার বর্গ) কে ত মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া চলিলেন । এসলামী সেনাদল দ্রুতগমনে অগ্রসর হইয়া মক্কার নিকটবর্তী “ ওয়াদী-মরুরাজ-জহরান ” নামক স্থানে (বাহা মকা-মোয়াজ্জমা হইতে ৪ ক্রোশ—৮ মাইল মাত্র দূরবর্তী) পহুছিলেন । এ পর্য্যন্তও মক্কাবাসিগণ ‘বে-খবর’ ছিল ; তাহারা ইহাও অবগত ছিল না যে, মোসলমানগণ তাহাদের ‘আহদ-শকনীর’ (সন্ধি-শর্ত-ভঙ্গের) জন্য কিরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন । বিরাট মোসলমান বাহিনী সন্ধ্যার সময় “ মরুরাজ-জহরানে ” পহুছিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন । রাত্রিকালে ঐ স্থানের পশুপালকদিগের দ্বারা মক্কায় সংবাদ পহুছিল যে, “ ওয়াদী মরুরাজ-জহরানে ” এক বিরাট সৈন্যদল আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে (ডেরা-তাম্বু ফেলিয়াছে) । এই সংবাদ অবশে মক্কার অধিবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ বড়ই উৎকণ্ঠিত ■ চিন্তাকুল হইয়া পড়িল ; আর তাহাদিগের নেতা আবু-ছুফিয়ান প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য নগর হইতে বাহির হইল । ও দিকে আ হজরত (ছালঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে এক ‘দস্তাঃ’ (দল) সৈন্যসহ শত্রুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য সম্মুখের দিকে (মক্কাভিমুখে) পাঠাইয়াছিলেন । উদ্দেশ্য, শত্রুপক্ষ যেন ‘শবখুন’ মারিতে (অতর্কিতভাবে নৈশ-আক্রমণ করিতে) না পারে ।

হজরত আব্বাস (রাজিঃ) এর মন স্বীয় 'কওমের' (স্বজাতি বা স্ব সম্প্রদায়ের) জন্য 'বেচরেন' (বিশেষ উৎকর্ষায়ুক্ত) ছিল। তিনি জানিতেন যে, 'ছোবেহ' সময় (প্রাতঃকালে) যখন বিরাট এসলামী সেনাদল মক্কা আক্রমণ করিবে, তখন হয় ত কোরেশ জাতি এবং মক্কা নগরের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকিবে না। তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, 'আহ্লে মক্কা' (মক্কার অধিবাসিগণ) কোনও রূপে মোসলমান হইয়া যায়, এবং উপস্থিত ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অগত্যা তিনি আব্বাস হজরত (ছালঃ)-এর স্বনামখ্যাত অশ্বতর (খচ্চর) 'দুল-দুল' এর উপর আরোহণ করিয়া 'লশ্-করগাহ' (সেনা-নিবাস) হইতে গোপনে বাহির হইলেন, এবং মক্কার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে রাত্রির অন্ধকারে হজরত আব্বাস (রাজিঃ), আবু-ছুফিয়ানকে দেখিতে না পাইলেও, তাহার গলার আওয়াযে তদীয় উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে 'আওয়ায' দিলেন (ডাকিলেন); সে নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, সম্মুখে এই যে বিশাল সেনাদলের শিবির শ্রেণী দেখিতেছ, ইহা হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর সৈন্যদল। রাত্রি অবসান হইবামাত্র তাঁহার মক্কা আক্রমণ করিবেন। এই সংবাদ শ্রবণে আবু-ছুফিয়ানের 'হোশ ও হাওয়াছ' উড়িয়া গেল (বুদ্ধি-ভুদ্ধি লোপ পাইল)। তখন সে হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-এর খুব নিকটে আসিয়া বলিল—বল, এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করি? হজরত আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, তুমি আমার পশ্চাভাগে এই অশ্বতরে আরোহণ কর; আমি তোমাকে হজরত রহুলোল্লাহ (ছালঃ) খেদমতে লইয়া যাইব। তাঁহার নিকটেই তুমি 'আমান' (শান্তি) পাইবে। আবু-ছুফিয়ান বিনা বাক্য-ব্যয়ে তৎক্ষণাৎ হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-এর পশ্চাভাগে দুলদুলে আরোহণ করিল; তিনি আবু-ছুফিয়ানকে স্বীয় অশ্বতরের পশ্চাভাগে

বসাইয়া, যখন ‘এসলামী লশ্-করগাহের’ (মোসলেম-সেনা নিবাসের) দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন, ঐ সময় পশ্চিমধ্যে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি আবু-ছুফিয়ানকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাহাকে ‘কতল’ (হত্যা) করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হজরত আব্বাস (রাজিঃ) স্বীয় অশ্বতর অতি দ্রুতগতি এসলামী সেনা-নিবাসের দিকে চালাইয়া দিলেন; হজরত ওমর (রাজিঃ) ‘শায়দল’ (পদাতি) ছিলেন, এজন্য দ্রুতগামী অশ্বতর-আরোহী আবু-ছুফিয়ানকে ধরিতে পারিলেন না; কিন্তু উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হজরত আব্বাস (রাজিঃ), আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে পূর্বেই পহুছিয়া গেলেন: তাহার একটু পরে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও সেখানে পহুছিলেন। আবু-ছুফিয়ান ইসলামের ধর্ম গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প হইলেন; এবং তদনুসারে তিনি আ হজরত (ছালঃ)-কে সম্বোধন করিয়া আবেদন করিলেন, ইয়া রুহুলোত্তাহ (রাজিঃ), এই কাফের (আবু-ছুফিয়ান) বিনা শর্তে আমাদের ‘কাবু’তে (হাতে) আসিয়া গিয়াছে; আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি এখনই উহার গব্দান উড়াইয়া দি। হজরত আব্বাস (রাজিঃ) বলিলেন, আমি আবু-ছুফিয়ানকে ‘আমান’ (প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি) দিয়াছি; এই বিষয় লইয়া হজরত আব্বাস (রাজিঃ) ও হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হইবার পর, আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আচ্ছা, আবু-ছুফিয়ানকে এক রাত্রির অবসর দেওয়া গেল। আবু-ছুফিয়ানকে অল্প রাত্রে আপনিই স্বীয় ‘খিমায়’ (তাম্বুতে) লইয়া গিয়া রাখুন। তদনুসারে হজরত আব্বাস (রাজিঃ) অবশিষ্ট রাত্রি তাহাকে নিজের খিমায় রাখিলেন, ঐ ■■■ মধ্যে উক্তরের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, তাহার ফলে আবু-ছুফিয়ান ইসলাম ধর্ম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প

হইলেন, এবং প্রাতঃকালে আ হজরত (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' উপস্থিত হইয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । অতঃপর হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন, আবু-ছুফিয়ান একজন 'জা-পছন্দ' (উচ্চ সম্মানিত বা উচ্চপদস্থ) ব্যক্তি, আপনি ইহাকে কোনও 'খাছ এয্-যত্' বখ্শুন' (বিশেষ সম্মান দান করুন) । তচ্ছবণে আ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, আচ্ছা, যেমন যাহারা 'খানাঃ কাবায়' (পবিত্র কাবা-গৃহে) 'পানা' (আশ্রয়) লইবে, তাহাদিগকে 'আমান' (নিরাপদতা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি) দেওয়া যাইবে ; সেইরূপ যাহারা আবু-ছুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকেও আমান দেওয়া হইবে । আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ) ঈদৃশ সম্মান লাভ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন । ঐ সময়ই ইসলামী সৈন্যদল সম্বিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মহা উল্লাসের সহিত মক্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ইসলামী সৈন্যদলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (জাতি বা গোষ্ঠীর) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পতাকা ছিল ; আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ) ওয়াদীর প্রবেশ-দ্বারে, এক উচ্চ টিলার উপর দাঁড়াইয়া ইসলামী সেনাদলের অগ্রগমন কালীন আড়ম্বর পূর্ণ অরূপম দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন ; পরে সর্ব-প্রথমে মক্কার প্রবেশ পূর্বক এই বলিয়া ঘোষণা প্রচার করাইয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি খানা কাবায় কিংবা আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সে 'মহ্-ফুয্' (নিরাপদ) থাকিবে ।

আ হজরত (ছালঃ)-এর এই 'খাহেশ' (বাসনা বা ইচ্ছা) ছিল যে, মক্কার যেন কোনও ক্রমেই শোণিতপাত না হয় । অতঃ এক বিজয়ী সত্ৰাই বেগে বিশাল সেনাদল লইয়া মক্কা প্রবেশের এই মহা আড়ম্বর পূর্ণ ব্যাপার ঈহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হওয়াতে, তিনি পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্ তা-লায় মহাদরবারে 'শোকরিয়া আদায়' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করিতে লাগিলেন । আ (ছালঃ) বিনা বাধায়—মহা জাঁক-জমকে পবিত্র মক্কা নগরে

প্রবেশ পূর্বক খানাঃ কাবার দিকে ‘তশরিফ্’ লইয়া গেলেন । ‘ছওয়ারির’ (আরোহিত উষ্ট্রের) উপর থাকিয়া সপ্তবার পবিত্র কাবা-গৃহের ‘তওয়াফ্’ (প্রদক্ষিণ) করিলেন । ঐ পবিত্র গৃহে যতগুলি ‘বোত’ (দেব-প্রাতিমা) ছিল, সেগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়াইলেন । পরে ওসমান-বিন-তাল্‌হার নিকট হইতে ‘কা-বা’ গৃহের ‘কুত্বি’ (চাবি) গ্রহণ পূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং চাপ্তের নামাজ (প্রহরেক বেলার সময় এক বিশেষ উপাসনা) পড়িলেন । পরে কাবা-গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটি সুমধুর বক্তৃতা প্রদান করিলেন ; তাহার ঐ খোত্বার (বক্তৃতার) কতক উক্তি এইরূপ ছিল ; যথা :—

“আল্লাহ্ এক, কাহার কোনও শরীক (অংশী) নাই ; তিনি নিজের ‘ওয়াদা’ (প্রতিশ্রুতি) সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন । তিনি নিজের ‘বান্নাঃ’ (দাস)-এর ‘মদদ’ (সাহায্য) করিয়াছেন ; আর সমস্ত বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়কে ‘শেকস্ত’ দিয়াছেন (পরাজিত করিয়াছেন) । যে সকল লোক খোদা ও রুচুলের উপর ইমান আনিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও পক্ষে ‘জায়েয্’ (সিদ্ধ) নহে যে, যকা নগরে ‘খুনরেযি’ (শোধিতপাত) করে । কোনও ‘ছরুহ্-বয্ দরখত্’ (সবুজ পত্র, বিশিষ্ট সজীব বৃক্ষ) কাটাও এখানে সিদ্ধ নহে । আমি ‘যমানাঃ’ জাহেলিয়াতের (অন্ধকার যুগের বা অসভ্যতা-মূলক প্রাচীন কালের) সমুদয় ‘রুহ্ম’ (ক্রিয়া-কলাপ) পদতলে মর্দিত করিয়াছি, কিন্তু কাবার ‘যেয়ারত’ ■ হাজী দিগকে ‘আবে-যম্-যম্’ (যম্‌যম্ নামক পবিত্র কূপের পানী) পান করাইবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হইলে । হে কোরেশগণ ! তোমাদিগকে আল্লাহ্ তোলা ‘জাহেলিয়াত’ (অসভ্যতা বা বর্বরতা) এর প্রতি অহকার প্রকাশ ও ‘ফখর’ (গর্বানুভব) করিতে নিষেধ করিয়াছেন । সমুদয় মরুয্য আদম (আলাঃ) হইতে, এবং আদম (আলাঃ) মাটি হইতে ‘পয়দা’ হইয়াছেন (জন্মিয়াছেন) । খোদা তা-লা

ফরমাইয়াছেন :—ইয়া আইয়োহান্নাছো আনা খালাক না কম - (আয়াত শেষ পর্য্যন্ত) । তৎপর আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন :—“ হে কোরেশ গণ ! তোমরা কি অবগত আছ, আমি তোমাদের সঙ্গে কিরূপ ‘ছলুক’ (ব্যবহার) করিব ? ”

এই প্রশ্ন-বোধক পবিত্র উক্তি শুনিয়া কোরেশ—অর্থাৎ মক্কার অধিবাসিগণ বলিয়া উঠিল, “ আমরা আপনার নিকট ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার পাইতে আশা করি ; কেন না, আপনি আমাদের ‘বোযর্গ’ (সম্মানিত) ও ভক্তি-ভাজন ভ্রাতা এবং “বোযর্গ” ভ্রাতার পুত্র । ” তচ্ছবণে হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন :—

‘আচ্ছা, আমিও আজ তোমাদিগকে ঐ কথাই বলিতেছি,—যাহা হজরত ইউছফ (আলাঃ) স্বীয় ভ্রাতাদিগকে বলিয়াছিলেন :—“ আজ তোমাদের উপর কোনও ‘মালামত’ (নিগ্রহ বা নিগ্রহ-সূচক বাক্য) নাই, তোমরা সকলেই ‘আযাদ’ (সম্পূর্ণ স্বাধীন) । ”

এই বক্তৃত্তা প্রদানের পর আ হজরত (ছালঃ) ‘কোহ্-ছফাঃ’ (ছফাঃ পাহাড়)-এর উপর গিয়া বসিলেন । আর লোকদিগের নিকট হইতে খোদা ও রহুলের ‘য়েতায়াত’ (আদেশ পালন—অধীনতা স্বীকার) সম্বন্ধে ‘বয়্যত্’ লইতে লাগিলেন । পুরুষদিগের নিকট হইতে বয়্যত্ গ্রহণের পর, তিনি হজরত ওমর (রাযিঃ)-কে স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে বয়্যত্ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন ; আর অয়ং উহাদিগের জন্য ‘আস্তাগ্ ফার’ (খোদার দরগায় ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে লাগিলেন ।

পবিত্র কাবা-গৃহের ‘বোত’ (প্রতিমা—পুতুল) গুলি চূর্ণীকৃত হওয়াতে, সমগ্র আরবের প্রতিমা (মূর্তি) গুলিই যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল । এইরূপে মক্কার কোরেশদিগের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া যেন সমগ্র আরব জাতিরই ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া ছিল । কারণ, মক্কার

পবিত্র কাবা-গৃহ প্রধান ‘বোতখানায়’ (পৌত্তলিক মন্দিরে) পরিণত হইয়াছিল। আর হজরত ইসমাইল (আলাঃ)-এর বংশধর বলিয়া আরব দেশের মধ্যে কোরেশদিগের একটা বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং সমগ্র আরব জাতি কোরেশদিগের মতিগতির প্রতি—তাহাদের ধর্ম বিশ্বাস ■ ধর্মাহুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। তাহারা কোন ধর্মাহুশাসনের অধীন হয়, তাহাই সকলে অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছিল। মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বহুসংখ্যক কোরেশ মোসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বহু মক্কাবাসী ‘বোত-পরস্ত’ (প্রতিমাপূজক) রহিয়া গিয়াছিল। অবশ্য এক্ষণে মক্কার অশান্তি-উপদ্রবের আশঙ্কা আর ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে আপাততঃ মক্কাবাসীদিগের ‘ময়্‌হবি-আযাদী’ (ধর্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা) লাভ হইল। এই ধর্ম-বিষয়ক ‘আযাদী’ (স্বাধীনতা) প্রভাবে ‘বোত-পরস্ত’ (অংশীবাদী—পৌত্তলিক)-দিগের, ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিবার এবং উহার গূঢ়ত্ব ও প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিল। তদনুসারে অল্প দিনের মধ্যেই পৌত্তলিকগণ দলে দলে ইসলামের পবিত্র শীতলচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এমন কি, অতি অল্প দিনের মধ্যেই মক্কার সমুদয় অধিবাসী (নানা-সম্প্রদায় ও নানা বংশীয়) পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; তথায় পৌত্তলিকের অস্তিত্ব একেবারেই রহিল না।

মক্কা-বিজয়ের কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া আ হজরত (আলাঃ) ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাহারা মোসলমান (ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত) হইয়াছে, তাহারা স্ব ■ গৃহে কোনও ‘বোত’ (দেব-প্রতিমা) রাখিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি মক্কার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানের বিখ্যাত দেব-মন্দির গুলি ধ্বংস করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন।

হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-কে ৩০০০ তিন হাজার অধারোহী সৈন্যসহ বনু-কানানার উপাস্ত দেবতা 'আব্বনী' কে ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। উহার মন্দির মরুভূমির মধ্যস্থ এক 'নখলস্তানে' (ওয়েলিশ্ বা মরুতানে) অবস্থিত ছিল। হজুর (ছালঃ)-এর আদেশানুসারে হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) সসৈন্যে ঐ স্থানে গিয়া উক্ত দেবতা এবং দেব-মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন। মন্দিরটিকে ভাঙ্গিয়া একেবারে সমভূমি করিয়া ফেলিলেন; উহার কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রহিল না। হজরত ওমর-বিনল্-আছ (রাজিঃ) কে বনি হযিলের উপাস্ত দেবতা ছওয়াঃ এর প্রতিমা ■ মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য পাঠাইলেন, তিনি উক্ত মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক উক্ত উপাস্ত বিগ্রহ (দেবমূর্তি) টিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উহার পূজারীও পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। হজরত ছায়াদ-বিন্-যয়েদ আব্বাহলি (রাজিঃ), " মনাত " নামক প্রসিদ্ধ 'বোত' (দেব-বিগ্রহ) চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য " কাদিদ " নামক স্থানে প্রেরিত হইলেন, তিনি তথায় পহুছিয়াই দেব-বিগ্রহ ও দেব মন্দির ভাঙ্গিয়া চূর্ণমার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে আরও বহুতর 'বোতখানা' (দেব-মন্দির) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করিয়া উহার অস্তিত্ব একেবারে মুছিয়া ফেলা হইল। মক্কার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানের দেবমূর্তি ও দেব মন্দির গুলি ধ্বংস করিবার পর, আ হজরত (ছালঃ) কতিপয় জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য 'ওফুদ' (প্রচারক-প্রতিনিধি) প্রেরণ করিলেন। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) 'বনু-খামিমাঃ' সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

মক্কা-বিজয়ের পর আ হজরত (ছালঃ), ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি করিলেন।

হিনিন বা হোনারনের ভীষণ যুদ্ধ।

মক্কা-বিজয় এবং মক্কার অধিকাংশ কোরেশ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া, আরবের ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে একটা 'খল্ বলি' (ছলস্থল) পড়িয়া গেল—যাহারা ইতিপূর্বে মোসলমানদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল না—বরং তাহাদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। উহাদের মধ্যে 'হওয়াযন' ও 'ছকিফ্' সম্প্রদায়ের লোক—যাহারা মক্কা ও তারেকের মধ্যে বাস করিত, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা না কোরেশদিগের প্রতি অনুরক্ত, না মোসলমানদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। ইহারা কতকটা নিরপেক্ষভাবেই এযাবৎ কাল কাটাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদিগকে কিয়ৎ-পরিমাণে কোরেশদিগেরই পক্ষপাতী বলিয়া মনে করা হইত। মক্কা-বিজয়ের পর তাহারা মনে করিত, এইবার মোসলমানগণ আমাদেরকে আক্রমণ করিবে। তদনুসারে বহু-হওয়াযনের 'ছরদার' (নেতা) মালেক-বিন-রয়োক্, বনি-হওয়াযন ও বনি ছকিফ্ এবং সমগ্র জাতি অর্থাৎ ঐ উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাকে যুদ্ধের জন্য 'আমাদাঃ' (আগ্রহান্বিত) করিয়া, স্বীয় পতাকা-মূলে সমবেত করিল। নহর, জহম, ছায়াদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও উপরোক্ত দলে যোগদান করিয়া তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিল। এই বিরাট বাহিনী "আওতাপ" নামক স্থানে সমবেত হইল। আ হজরত (ছালঃ) যখন মক্কায় থাকিয়া এই বিরাট শত্রু-বাহিনীর একত্র সমবেত হইবার সংবাদ পাইলেন, তখন আবদুল্লাহ-বিন-আবি হদর আছলমীকে 'জাছুছ' (গুপ্তচর) রূপে এই বিষয়ের সঠিক সংবাদ আনয়ন জন্য প্রেরণ করিলেন; তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, শত্রুদল যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত ও প্রস্তুত হইয়া

আছে । তচ্ছবণে হজুর (ছালঃ) ছাহাবাঃ রাজিঃ) দিগকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ দিলেন ; ১০ হাজার মহাজেরিন ও আনুহার (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে মদীন। হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং ২ হাজার ইসলাম ধর্মে নব-দীক্ষিত মক্কাবাসী মোসলমান সেই সঙ্গে যোগদান করাতে, মোসলমান যোদ্ধাপুরুষদিগের সংখ্যা ১২ হাজার হইল । এই বিরাট 'জানবায়্' (জীবনোৎসর্গকারী) সেনাদল লইয়া তিনি মহাডঙ্করে মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন । কিন্তু শ্বেবোস্ত দুই সহস্র সৈন্তের মধ্যে এমন লোকও অনেক ছিল, যাহারা পৌত্তলিকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়াছিল না । ৮ম হিজরীর ১লা শওরাল তারিখে এই বিরাট মোসলেম-বাহিনী থামার " ওয়াদী " (বনভূমি বা মরদান) সমূহ অতিক্রম পূর্বক, 'ওয়াদী হনিন' বা "হোনায়নে" পহুছিলেন । শত্রুগণ মোসলমান বাহিনীর যাত্রা করিবার সংবাদ পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়া, ওয়াদী হোনায়নের উত্তর দিকে একটি 'বাতের' জায়গায় (সুবিধাজনক স্থানে) গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে ছিল ; মোসলমান বাহিনী ঐ স্থানে পহুছিলে, তাহারা নৈশ-অন্ধকারের সুযোগ লাভ করিয়া হঠাৎ ঐ স্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল ; অকস্মাৎ এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া মোসলেম সেনাদল বিষম বিপন্ন ও কির্জব-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন । সুতরাং এই নৈশ-আক্রমণ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল । অন্ধকার রজনীতে অপ্রস্তুত মোসলমানগণ চতুর্দিকে ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পড়িলেন । এই যুদ্ধে আবু হজুরত (ছালঃ) যে অপূর্ণ সামরিক নৈপুণ্য, অসাধারণ সাহস ও অমাহুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এক অভূতপূর্ব ■ অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার । যাহা হউক, পরব কক্কাগময় আল্লাহ্ তা-লার দয়া ■ অহুগ্রাহে মোসলমানগণ অবশেষে মহা গৌরবজনক বিজয়-লাভ করিলেন ।

হওয়াধনের যুদ্ধক্ষেত্রে বহু শত্রু-সৈন্তের নিপাত সাধন হইয়াছিল।
 উহারা (হওয়াধন সম্প্রদায়) ত প্রথমেই পরাজিত হইয়া পলায়ন-পন্থা
 হইয়াছিল, সক্ষিফ্ সম্প্রদায়ের যোদ্ধাপুরুষগণ আরও কিছুকাল যুদ্ধক্ষেত্রে
 তিষ্ঠিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিল ; কিন্তু অবশেষে উহারাও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক
 পলায়ন করিল। এই ভীষণ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বড় বড় ছরদার এবং খ্যাতনামা
 বীরপুরুষগণ সমরশায়ী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রধান সেনাপতি
 ঝালেক-বিন্-য়রোফ, কতিপয় যোদ্ধাপুরুষ সহ তায়েফ্ অভিমুখে উর্কখাসে
 পলায়ন করিল। তায়েফ্ বাসিগণ এই পলায়িত লোকদিগকে আশ্রয়
 প্রদান পূর্বক নগরের প্রবেশ-দ্বার (কটক) ■ করিয়া দিল। এই
 পলায়মানও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সেনাদলের একাংশ "আওতাস" নামক স্থানে, এবং
 আর এক দল "নখ্‌লাঃ" এজ মা (সমবেত) হইল। আ হজরত (ছালঃ)
 ঐ দুইস্থানে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করিলেন, ভীষণ যুদ্ধের পর উভয়
 স্থানে মোসলমানগণ জয় ও শত্রুদল সম্পূর্ণরূপে 'শেকস্ত্' (পরাজিত)
 হইল ; বহুসংখ্যক শত্রু রণক্ষেত্রে পতিত ও হতাবশিষ্টগণ অতি শোচনীয়
 ভাবে—উর্কখাসে পলায়ন করিল। তাহাদের বিপুল সমগ্রী-সম্ভার হস্তগত
 করিয়া মোসলমানগণ বিজয়োল্লাসে আ হজরত (ছালঃ)-এর সমীপে
 প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই যুদ্ধে বহুতর শত্রু মোসলমানদিগের হস্তে বন্দী
 হইয়াছিল। আ হজরত (ছালঃ) 'মালে-গনিমৎ' (যুদ্ধ-জয়লব্ধ সামগ্রী-
 সম্ভার) ■ বন্দীদিগকে 'জয়র আতা' নামক স্থানে হজরত মসউদ-বিন্-
 ওমর-গফ্‌ফারি (রাজিঃ)-এর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, একদল যোদ্ধাপুরুষ
 উহাদের প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন ; এবং হজুর (ছালঃ) স্বয়ং বিপুল
 সৈন্যদল লইয়া তায়েফ্ অভিমুখে অভিযান করিলেন। এই যুদ্ধে ৪৪
 হাজার উষ্ট্র এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাগল ও মেঘ (দোষা) মোসলমান-
 দিগের হস্তগত হইয়া-ছিল। এই যুদ্ধ "হোনাযনের যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ।

তায়েফ্ অবরোধ ।

ছকিফ্ সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন পূর্বক তায়েফে গিয়া সমবেত হয় ; তায়েফ বাসিগণ তাহাদের প্রতি হামদর্দ (সহানুভূতি সম্পন্ন) ছিল ; এজন্য তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে ■ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল । আ হজরত (ছালঃ) ওয়াদি-হনিন হইতে তায়েফে যাইবার পথে মালেক-বিন্-রয়োফের ‘কেলা’ (দুর্গ) টা একেবারে ভূমিসাৎ ও বিধ্বস্ত করাইলেন । পরে বিপ্লববাদীদিগের ‘আতম’ নামক কেলাটি পথে পড়িলে উহাও ধ্বংস করাইয়া ফেলিলেন । তৎপরে তিনি তায়েফের নিকট পহুছিয়া তায়েফ বাসিদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিতে পাইলেন । তদর্শনে তিনি তায়েফ নগর দৃঢ়ভাবে অবরোধ করিলেন ; ২০ দিন পর্য্যন্ত এই অবরোধ কার্য চলিয়াছিল ; এই সময় মধ্যে তায়েফের চতুর্পার্শ্ববর্তী বহু সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন ; আর কোনও কোনও সম্প্রদায় ‘ওফুদ’ (প্রতিনিধি বা ডেলিগেট্) পাঠাইয়া মোসলমান হইলেন । হনিনের ভীষণ যুদ্ধে মাত্র ৪ জন মোসলমান শহীদ হইয়াছিলেন ; কিন্তু তায়েফের অবরোধ কালীন যুদ্ধে ১২ জন মোসলমান শহীদ হন । নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে তাহাদিগকে কবরস্থ করা হয় । তায়েফের অবরোধ কার্যে বড় সফল ফলিয়াছিল ; এই অবরোধ কাল মধ্যেই উহার চতুর্পার্শ্ববর্তী বহুজনপদের বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ অধিবাসিগণ, অতীব আগ্রহের সহিত পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । আ হজরত (ছালঃ) আপাততঃ তায়েফ জয় করা ■■■ প্রয়োজনীয় মনে করিলেন না, উহা ভবিষ্যতের জন্য ‘মুলতবি’ (স্থগিত) রাখিয়া, অবরোধ পরিত্যাগ পূর্বক “ ■■■ আনায় ” প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং তথায় বন্দী ■ যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার মোসলমানদিগের মধ্যে যথাযোগ্য

ভাবে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিলেন । ঐ স্থানে হওয়াযন সম্প্রদায়ের একদল প্রতিনিধি আঁ হজরতঃ (ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' [উপস্থিত] হইল ; তাঁহার ধাত্রী হালিমা ছায়া-দিয়ার 'ওয়াল্লাঃ' (সম্বন্ধ) প্রদর্শন পূর্বক কয়ার 'দরখাস্ত' (আবেদন) করিল ; তিনি উহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কোহরের নমাজের সময়—যখন সমুদয় মোসলমান নমাজের সময়বেত হইবে—আমার নিকট দরখাস্ত 'পেশ' করিও ; তদনুসারে প্রতিনিধিগণ তাহাই করিল । তখন আঁ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, তোমাদের যে পরিমাণ করেনী আমার এবং বহু-আবদুল মোস্তালেবের অংশে পড়িয়াছে ; তাহাদিগকে 'আবাদ' (স্বাধীন—মুক্ত) বলিয়া মনে কর । তচ্ছ বণে সমুদয় মহাজোরন ও আন্হার (রাজিঃ)-গণ বলিয়া উঠিলেন, " যাহা আমাদের অংশ, উহা রুহুলোলাহ (ছালঃ)-এর ও অংশ । " এই কথা বলিয়া তাঁহারা হওয়াযন সম্প্রদায়ের সমুদয় করেদীকেই ছাড়িয়া দিলেন । এইরূপে প্রায় ৬০০০ 'করেদী' এই অল্প সময় মধ্যে মুক্তি লাভ করিল । এই বন্দীদিগের মধ্যে শিমা-বিস্তে হালিমা ছায়া দিয়া :—আঁ (ছালঃ)-এর 'রেজারী হামশিরাঃ (দুখ-ভগিনী) ও ছিলেন । ঐ মহিলা যখন বলিলেন, আমি আপনার দুখ-ভগিনী ; তখন হজুর (ছালঃ) করমাইলেন ; তোমার নিকট ইহার কি 'ছবুত' (প্রমাণ) আছে ? শিমাঃ বলিলেন, আমার কোমরে আপনার দাঁতের চিহ্ন বর্তমান আছে ; আপনি বাল্যকালে একদা আমাকে দাঁত দিয়া কাটিয়া ছিলেন । ইহা শুনিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, তুমি একথা ঠিকই বলিতেছ । ইহা বলিয়া তিনি নিজের চাদর বিছাইয়া দিয়া, তদুপরি তাঁহাকে বসাইলেন । তৎপর তিনি বলিলেন, তুমি যদি আমার নিকট থাকিতে চাও, তবে আমি তোমাকে 'য়েয্-যতের' (সম্মানের) সঙ্গে—স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত আমার কাছে রাখিব ; আর যদি স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট যাইতে

তাঁও, তবে তাহা তোমার ইচ্ছা। শিমা শেষোক্ত প্রস্তাবই 'পছন্দ' করিলেন—নিজের দেশে, স্বজাতির মধ্যেই থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে বহু অর্থ, পরিচর্য্যার ■■■ একটি দাস এবং একটি দাসী দিয়া বিদায় করিলেন। শিমাঃ ঐ দাস-দাসীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন করিয়া দিলেন। শুনা যায়, উহাদের দ্বারা তাঁহার 'নছল' এখনও হওয়াবন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

আঁ হজরতের (ছালঃ)-এর মক্কা হইয়া

মদীনায় প্রত্যাবর্তন ।

অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) হজরআনা হইতে মক্কার রোমরার নিয়ন্ত করিলেন, এবং তিনি সদলবলে-মক্কার পঁহুছিলেন। মক্কার 'দাখেল' হইয়া (প্রবেশ করিয়া) রোমরার আরকান হইতে 'কার্বেগ' হইলেন (অবসর লাভ করিলেন)। তৎপর য়েতাব-বিন্-আছিদ (রাজিঃ) নামক বিংশতি বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক এক তরুণ যুবক কে মক্কার 'আয়েল' (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করিলেন। আর হজরত মাযায্-বিন্-জবল (রাজিঃ)-কে কোরআন শিক্ষা এবং আহ্ কামে দীন (ধর্ম-বিষয়ক আদেশ)—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দানাদি কার্যের জন্য শাসনকর্তার নিকটে থাকিতে আদেশ করিলেন। হজরত মাযায্-বিন্-জবল (রাজিঃ) একজন বিখ্যাত আলেম এবং ইসলাম ধর্মশাস্ত্রবিদ শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) মহাজেরিন (রাজিঃ) ■ আন্হার (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনায় রওয়ানা হইলেন। মক্কার নব নিযুক্ত

শাসনকর্তা য়েতাব-বিন্-আছিদ (রাজিঃ)-এর ■■■ দৈনিক এক দরম
‘জজিকাঃ’ (বৃত্তি বা বেতন) নির্ধারিত করিলেন । ৮ম হিজরীর ২৪শে
■■■ তারিখে আব্বা হজরত (ছালঃ) স্বীয় প্রিয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে
সঙ্গে লইয়া মদীনা-মহুওরায় প্রবেশ করিলেন । এই বৎসর মোসলমানগণ
এসলামী নিয়মে ও পৌত্তলিকগণ আপনাদের নিয়মামুযায়ী হজ্জ্-কার্য্য
সম্পন্ন করিয়া ছিলেন ; ইহাতে না মোসলমানগণ পৌত্তলিকদিগকে কিছু
বলিরাহিলেন, না পৌত্তলিকগণ মোসলমানগণ দিগের কার্য্যে কোনও
রূপ বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছিল । এই ‘মিল-জুলে’ (মেলা-মেশায়)
এই সফল ফলিল যে, মক্কার পৌত্তলিকদিগের পক্ষে, মোসলমানদিগের
আদর্শ ধর্ম্মানুষ্ঠান, আদর্শ কার্য্য-কলাপ ও উৎকৃষ্ট ‘আখ্-লাক্’ (সুনীতি-
পরায়ণতা বা শিষ্টতা) সম্বন্ধে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়ার বিশেষ সুযোগ
ঘটিল ; ইহার ফলে পৌত্তলিকগণের মুখে মোসলমানদিগের প্রশংসাবাদ
বিষেযিত হইতে লাগিল ।

৮ম হিজরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, আব্বা হজরত (ছালঃ)
যখন মক্কা হইতে মদীনায় রওয়ানা হইলেন, তখন তায়েফের যরুহ-বিন্-
মছউদ নামক একজন ছরদার পথিমধ্যে তাঁহার নিকট ইসলাম ধর্ম্মে
দীক্ষিত হইলেন । ঘটনার বিবরণ এই যে, যখন আব্বা হজরত (ছালঃ)-এর
নেতৃত্বে মোসলমানগণ তায়েফ্ অবরোধ করেন, তখন যরুহ-বিন্-মছউদ
তথায় উপস্থিত ছিলেন না, কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন ;
আর অবরোধ পরিত্যাগের পর তায়েফে আসিয়া সকল ব্যাপার অবগত
হইয়াছিলেন । তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, আব্বা হজরত (ছালঃ)
সদলবলে মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে যাইতেছেন ; তখন তিনি তায়েফ্
হইতে দ্রুতগতি মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । তদনুসারে পথিমধ্যে
আব্বা হজরত (ছালঃ)-কে পাইয়া ভক্তি-প্রবণ ■■■ তাঁহার হস্তে পবিত্র

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । সবে সবে অরজ করিলেন, আমাকে 'এজাযত' (অনুমতি) প্রদান করুন, আমি তায়েফে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচার করি । আ হজরত (ছালঃ) তাঁহার জীবন নাশের আশঙ্কায় প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন না ; পরে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধে, তাঁহাকে তায়েফে ইসলাম-প্রচারের অনুমতি প্রদান করিলেন । তদনুসারে তিনি তায়েফে পহুঁছিয়া, এক উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, তায়েফ বাসিদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । দুর্দান্ত তায়েফ বাসিগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়াই ক্রোধাক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি তীব্র বর্ষণ করিতে লাগিল । এই তীব্র বর্ষণে জর্জরিত হইয়া তিনি সেই স্থানেই শহীদ হইলেন । মূর্খ অবস্থায় তিনি তাঁহার স্বংশীয় লোকদিগকে বলিলেন, আমার এই একমাত্র কামনা যে, আমাকে হজরত রছুলোলাহ্ (ছালঃ)-এর ঐ 'রফিক' (বন্ধু) দিগের কবরের নিকট দফন করিবে, যাহারা তায়েফ অবরোধ কালে এখানে শহীদ হইয়াছিলেন । তদনুসারে তাঁহার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করা হইল । আ হজরত (ছালঃ) যখন রুহ-বিন্-মসউদ (রাজিঃ)-এর শাহাদত-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি করমাইলেন, রুহ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরূপই ছিল,— যেমন 'ছাহেবে ইয়াহিন' আপনার 'কওমের' (সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর) মধ্যে ছিলেন ।

এই বংশরেই হজুর (ছালঃ)-এর ছাহেববাদাঃ এব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি ওম্মোল মুমেনিন (বিশ্বাসীদিগের মাতা বা মোস্লেম-মাতা) হজরত মারিয়াঃ কতবাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন । আবার এই বংশরেই হজুর (ছালঃ)-এর ছাহেববাদী হজরত য়ুনব (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করেন । এই বংশরের শেষভাগে হজরত (ছালঃ)-এর জন্ম মহজেদে ব্যবহারার্থ কাঠ নির্মিত 'মিম্বর'

ভৈরার করা হয়—যাহার উপর বসিয়া তিনি খোত্বা: ‘এরশাদ ফরমাই-
তেন’। এই বৎসরেই বাহরায়েনের শাসনকর্তা মনঘর-বিন্ হারী পবিত্র
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ইতিপূর্বে আবু হজরত (ছাল:) তাঁহাকে
ইসলামের দিকে আহ্বান পূর্বক একখানি পত্র লিখিয়া ছিলেন; পত্রখানি
পাইয়াই তিনি ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হজুর (ছাল:)
এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট একখানি অনুজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন, তদনুসারে
ঐ শাসনকর্তা ‘মিছদী ও আতশ-পরস্ত’ (অগ্ন্যুপাসক) দিগের নিকট
হইতে ‘জজিয়া’ নামক কর আদায় করিতে লাগিলেন।

হেজরতের নবম বৎসর।

মক্কা-বিজয় ও হনিনের যুদ্ধের পর যখন আবু হজরত (ছাল:) মদীনা-
মক্কাওয়ার প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন আরবের বিভিন্ন প্রদেশের লোক
স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দলে দলে মদীনায় আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত
হইতে লাগিলেন। ৯ম হিজরী আরম্ভ হইবামাত্র বিশাল আরব দেশস্থ
বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন জনপদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের
নির্বাচিত উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক, আবু হজরত (ছাল:)-এর
আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন; এবং ‘দায়েরায়-এছলামে’ (এছলাম
ধর্মের গভী বা আবেষ্টনীর মধ্যে) ‘দাখেল’ হইতে লাগিলেন। এই জন্য এই
পবিত্র ৯ম হিজরী ‘আম-আল-ওফুদ’ নামে অভিহিত হইয়াছিল; এবং
এখনও ঐ নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই সময় পর্যন্ত যাহারা ইসলাম
ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল না, তাহাদের নিকট হইতে অতি অল্পমাত্রায়
‘জজিয়া:’ নামক কর আদায় করা হইত। এই ‘জজিয়া’ ও ‘যাকাত’
ই ‘খেরাজ’ (খাজানা বা রাজকর) ছিল—যাহা আবু হজরত (ছাল:)-এর

শাহান্ শাহীতে জন-সাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইত । যাকাত আদায় করিবার জন্য ঐ হজরত (ছালঃ) বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন সম্রাট-দ্বয়ের মধ্যে 'আমেল' (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন । প্রথম প্রথম যাকাত আদায়ের পক্ষে নানাপ্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা জন্মিয়াছিল । কোনও কোনও আমেল—(যাকাত আদায়কারী শাসনকর্ত্তা, দেশবাসী কর্ত্তক শহীদও হইয়াছিলেন । নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নের পর, অবশেষে আরবের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল ।

মৃত্যুকে পরাজয়-জনিত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ ■■■ শামের ইসারী বাদশাহ (খৃষ্টীয়ান শাসনকর্ত্তা) বিরাট সেনাদল গঠন করিয়া, কনষ্টান্টিনোপলস্থ গ্রীক সম্রাট্ হরকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল । তদনুসারে সম্রাট্ হরকল (হিরাক্লিয়াস্) ৪০ সহস্র সুশিক্ষিত ও বিক্রান্ত সৈন্য শামের (সিরিয়া বা সুরিয়ার) শাসনকর্ত্তার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন । আর নিজেও এক বিরাট বাহিনী লইয়া প্রেরিত সেনাদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রওয়ানা হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন । আবু-আমের নামক যে খৃষ্টীয়ান 'রাহেবের (সন্ন্যাসীর) কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, সে মোসলমানদিগকে সমূলে উৎসন্ন দিবার সঙ্কল্পে, কয়েক কায়সরের নিকট কনষ্টান্টিনোপলে গমন করিয়াছিল । সে এই উদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছিল যে, কায়সারকে উত্তেজিত করিয়া তাহার দ্বারা মদীনা আক্রমণ করাইবে, এবং ইসলাম ধর্ম ও মোসলমান জাতির 'বনিয়াদ' (ভিত্তি-মূল) পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিবে । ওদিকে মদীনার মোনাকেকদিগের সঙ্গে তাহার গুপ্ত বড়বড়-মূলক পত্র ব্যবহার এবং গুপ্তচর আইমা যাওয়া চলিতে ছিল । মূলকথা, শাম-সীমান্তে ইসারী (খৃষ্টীয়ান) সৈন্যদলের সমবেত হওয়া, ও কায়সরের মদীনা আক্রমণের জন্য আগমনের 'গরুম-গরম' সংবাদ অনবরত পহুঁছিতে লাগিল । ঐ হজরত (ছালঃ) ব্যাপারের

শুরুত বুদ্ধিয়া এই খৃষ্টীয়ানী আক্রমণ শামের (সিরিয়ার) সীমান্নই রোধ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন । কারণ, গ্রীক সম্রাট্ হরকলের বিরাট ইসারী বাহিনী আরবের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সমগ্র আরবে এক ‘বদ-আমনির’ (অশান্তির) সৃষ্টি হইবে ; বিশেষতঃ আরবের সীমান্ত-প্রদেশে এক বিরাট শত্রু সৈন্যদলের সমাবেশ এমন একটা ‘মামুলী’ (সাধারণ) ব্যাপার ছিল না যে, আ হজরত (ছালঃ) এ বিষয়ে নিশ্চেষ্টে অবস্থায় চূপ করিয়া থাকিতে পারেন । তিনি সকল সম্প্রদায়ের আরবদিগের মধ্যে সাধারণ ভাবে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, কায়সারের আক্রমণের গতিরোধ জন্য সকলে যুদ্ধ-সজ্জার সজ্জিত হইয়া মদীনায় উপস্থিত এবং আমার পতাকা-মূলে সমবেত হও । ঘোষণা প্রচারিত হওয়ামাত্র মোসলমানগণ চতুর্দিক হইতে দলে দলে আসিয়া মদীনায় সমবেত হইতে লাগিলেন । মোনাফেকদিগের যে দলটা মদীনায় ‘মওজুদ’ (বিদ্যমান) ছিল, উহারা সর্বদাই মোসলমানদিগকে ভড়্কাইত, কায়সারের মদীনা আক্রমণ সম্বন্ধে বিষম ভীতি প্রদর্শন করিত, এবং মোসলমানদিগকে সর্ব-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইত । ইতিপূর্বে আ হজরত (ছালঃ) যখন কোনও যুদ্ধে গমন করিতেন, মোনাফেকদিগকে তৎসম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রদান করিতেন না ; অতি মতর্কভার সহিত গোপচন যুদ্ধ-সজ্জা করিতেন । উদ্দেশ্য, মোনাফেকগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ‘য়েত্-রাজ্’ (প্রতিবাদ) করিতে, এবং মোসলমানদিগকে ‘বদদেল’ (ভয়মনাঃ বা উৎসাহ হীন) করিতে না পারে । ঠিক যুদ্ধযাত্রা করিবার সময়ই মোসলমানগণ বুঝিতে ও জানিতে পারিতেন যে, তাঁহারা কোন্ দিকে—কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন । এবার অতি বৃহৎ সেনাদল সমবেত করিবার প্রয়োজন ছিল, আর উহার সাজ-সজ্জা, রসদ-পত্র সংগ্রহ করাও ব্যাপার ছিল না ; এজন্য তিনি পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়া দিয়া-

ছিলেন যে, সম্রাট্ হরকলের সেনাদলের প্রতিরোধ করিবার জন্য মোসলমানদিগকে যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া শামের সীমান্ত প্রদেশে গমন করিতে হইবে। গত বৎসর 'খোশক-ছালী': (অনাবৃষ্টি জনিত শস্যভাব) ছিল, এজন্য লোকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না—আংশিক দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যভাব ছিল। এ বৎসর যথা সময়ে স্রৃষ্টি হওয়াতে ফসল বেশ ভাল জন্মিয়া ছিল, আবার শস্ত কাটিবার সময় ও উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য শস্ত ছেদনের কার্য ফেলিয়া যুদ্ধে গমন করা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর ও অন্ববিধাজনক বোধ হইতেছিল।

গ্রীক-সম্রাট্ হরকল ও তাঁহার মন্ত্রিগণ পূর্ব হইতেই মোনাফেকদিগকে মদীনা আক্রমণের সঙ্কে আপনাদের সাহায্যকারী ও সহায়ভূতি-সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিল। মদীনার মোনাফেকগণ যখন দেখিল, মোসলমানগণ যুদ্ধ-সজ্জা ও 'ছফরের' (প্রবাসের) বোগাড়-যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং এই কার্যে বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তখন 'হেন্মত শকন' (সাহস ■ উৎসাহ নাশক) কথা-বার্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। আর ভীষণ গ্রীষ্মকালের এই প্রাণান্তকর 'সফরের' (প্রবাসের) ভীষণতা মোসলমানদিগের মধ্যে বর্ণনা করিয়া, তাঁহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহাদের (মোনাফেকদিগের) এই উদ্দেশ্য ছিল যে, মোসলমানগণের শামের দিকে অভিযান করিবার পূর্বেই যেন গ্রীক সম্রাট্ হরকল দ্রুতগতি আসিয়া মদীনা আক্রমণ করিতে পারেন। আ হজরত (ছালঃ) ইতিপূর্বেই মদীনার সমুদয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে, এবং স্বীয় অঙ্গগামী হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সঙ্কে সঙ্কে রসদ, ছওয়ারি ও ভারবাহী পশুদল, উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এজন্য মোসলমানদিগের মধ্যে সাধারণ ভাবে চাঁদা প্রদানের ও

আদেশ করমাইয়া ছিলেন । এই স্বযোগে দুর্ঘটি মোনাকেকগণ মোসল-মানদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিতে, ভড়কাইতে, তাঁহাদের মধ্যে নানা বিপদ ■ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে কোনও রূপ চেষ্টা, উদ্দেশ্য এবং যোগাড়-■ ক্রটি করিতেছিল না । হজরত ওসমান গণী (রাজিঃ) খ্রীষ বিপুল বাণিজ্য-দ্রব্য শামের দিকে রওয়ানা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই সকল পরিত্যাগ পূর্বক, সেই সকল মাল-পত্র যুদ্ধের চাঁদা স্বরূপ দান করিলেন । উহার 'মেকদার' (পরিমাণ) ৯০০ নয় শত উষ্ট্র, ১০০ শত ঘোড়া—মায় উহাদের সাজ-সজ্জা এবং ১০০ এক হাজার 'তালারী' (স্বর্ণ) 'দিনার' (স্বর্ণ মুদ্রা) ছিল । হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) খ্রীষ গৃহের সমস্ত মাল-আসবাব, নগদ টাকা কড়ি চাঁদা স্বরূপ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'বাল-বাচ্চাঃ' (পুত্র ■ ইত্যাদি সম্মান-সম্বতি) দিগকে খোদাতা-লার নিকট 'ছোপদ' (সমর্পণ) করিয়া আসিলাম । হজরত ■ ফারুক (রাজিঃ), খ্রীষ অর্দ্ধেক 'মাল-আছবাব' (জিনিষ-পত্র ও টাকা-কড়ি) আল্লার নামে চাঁদা স্বরূপ প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পরিবারবর্গের ■ রাখিলেন । যাহারা নিতান্ত গরীব, 'মেহনত-ময়্‌তুরী' (শ্রমজীবির কার্য) করিয়া দিনাতিপাত করিতেন, তাঁহারাও নিতান্ত 'দেলেরীর' (উচ্চ হৃদয়তার—সংসাহসের) সঙ্গে যতদূর সাধ্য চাঁদা প্রদান করিলেন । অনতিবিলম্বে ৩০০০ তিন হাজার এছলামী সৈন্য মদীনায় সমবেত হইলেন । অতঃপর ঐ • হজরত (ছালঃ) ৯ই রজব তারিখে ৩০০০ তিন হাজার 'লশ্‌কর' (সৈন্য) লইয়া পূর্ব উৎসাহে মদীনা হইতে তবুকাভিমুখে রওয়ানা হইলেন ।

তবুকের বিরাট অভিযান ।

তবুক, আরব ■ শামের সীমান্তে অবস্থিত । অধুনা উহা একটা ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হইয়াছে । শাম (সিরিয়া) হইতে মদীনা-মক্কা পর্য্যন্ত যে 'হেজাজ-হামিদিয়া' (ওসমানীয় খেলাফত-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই ওয়ে লাইনের পূর্ব নামও মিটিয়া গিয়াছে) রেল-লাইন আছে, তবুক উহার একটা প্রধান স্টেশন । হজুর (ছালঃ) মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া, 'হনিয়াতুল-ভেদা' নামক অশুচ পাহাড়ের উপর শিবির সন্নিবেশ করিলেন । আর মোহাম্মদ ছলমাঃ আনুহারী (রাজিঃ)-কে মদীনায় 'আয়েল' (শাসন-কর্তা বা স্বীয় প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিলেন । আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় পরিবার-বর্গের 'হেফাজত' (তত্ত্বাবধান) করার ■ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে মদীনায় রাখিয়া গেলেন । মদীনায় দুর্ভিক্ষ মোনাকেকগণ হজরত আলী (রাজিঃ) সম্বন্ধে একরূপ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল যে, আ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ) সম্বন্ধে কোনও 'পরেওরা' করেন না ; বরং তাঁহাকে 'খত্‌রা'-জনক (ক্ষতি-কারক—ভীতিপ্রদ) বলিয়াই মনে করেন ; এজন্য তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া মদীনায় রাখিয়া গিয়াছেন । হজরত আলী (রাজিঃ) এই সকল কথা শুনিয়া 'বরদাশ্‌ত' (সহ) করিতে পারিলেন না । তিনি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন । আর মদীনা হইতে এক ক্রোশ দূরবর্তী 'আল-জরক' নামক স্থানে আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার হজুরে আরজ করিলেন, মোনাকেকগণ এই সকল কথা বলিয়া থাকে ; এজন্য আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিবার উদ্দেশ্যে 'খেদমতে হাজের' হইয়াছি । আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, উহার 'ঝুটা' (মিথ্যাবাদী) ; আমি আমার বাড়ী কর ■ পরিবার বর্গের

তত্ত্বাবধান জন্য তোমাকে মদীনার রাশিয়া আসিয়াছি ; তুমি মদীনার ফিরিয়া যাও । আর তাঁহার মনস্তষ্টির ইহাও ফরমাইলেন যে, তোমার সঙ্গে আমার সেই 'নেছ বত্' (সম্বন্ধ) — হজরত মুছা (আলাঃ) — এর সঙ্গে হজরত হারুণ (আলাঃ) — এর যে সম্বন্ধে ছিল । কেবল 'ফরক' (পার্থক্য) এই মাত্র যে, আমার পরে আর কোনও পয়গম্বর (নবী, রুছল — তত্ত্ববাহক) হইবেন না । আ হজরত (ছালঃ) — এর উক্তি ■ আদেশ শ্রবণে হজরত আলী (রাজিঃ) বিনা বাক্যব্যয়ে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন । কোনও কোনও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) কোনও বিশেষ কারণে আ হজরত (ছালঃ) — এর সঙ্গে মদীনা হইতে একত্রে যাত্রা করিতে পারিয়াছিলেন না, তাঁহারা পরে মদীনা হইতে দ্রুতগতি যাত্রা করিয়া পশ্চিমধ্যে ক্রমশঃ ইসলামী সেনাদলে যোগ দিতে লাগিলেন । মোনাকেকদিগের প্রতিবন্ধকতা, দুর্ভিতসন্ধি ও শত্রুতাচরণে এই অভিযানে কোনও বাধা জন্মিল না । আ হজরত (ছালঃ) সৈন্তে দ্রুতগতি সিন্নিয়াতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অভিযান-পথে, খোদা তা-লার 'গযবে' (ক্রোধাগ্নিতে) ধ্বংসপ্রাপ্ত "সমুদ" জাতির নগর ও পল্লী সমূহ পতিত হইল ; ঐ এলাকা — বিশ্বস্তীকৃত জনপদ তৎকালে "হজর" নামে অভিহিত হইত । যখন ইসলামী সৈন্যদল ঐ এলাকায় প্রবেশ করিলেন, তখন আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমরা 'আত্তাগ্ফার' পড়িতে পড়িতে অতি দ্রুতগতি খোদা তা-লার গযবে নিপতিত এই জনপদ অতিক্রম কর ; এখানকার কোনও কূপের পানী ও তোমরা পান করিও না । এই হজরের এলাকায় মোসলেম সেনাদলকে একরাত্রি বাস করিতে হইয়াছিল । আ হজরতঃ (ছালঃ) মোসলমানদিগকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন রাত্রিকালে শিবির হইতে বাহির না হয় । যখন তিনি ধ্বংস প্রাপ্ত নগর ■ পল্লী সমূহ, এবং বিশ্বস্তীকৃত গৃহাবলীর নিকট দিয়া গমন করিতে ছিলেন, তখন চাঁদের দ্বারা স্বীয়

পবিত্র বদন মণ্ডল ঢাকিয়া ছিলেন ; আর ছওয়ারির উষ্ট্র খুব দ্রুতগতি
চালাইয়া গিয়াছিলেন । যখন মোস্লেম সেনাদল এই এলাকা অতিক্রম
পূর্বক অগ্রসর হইতে হইতে ‘চশমাঃ’ তবুকে—শামের (সিরিয়ার)
সীমায় পৌঁছিলেন, তখন সেই স্থানে ‘কায়াম’ (শিবির সন্নিবেশ) করিলেন ।

কনষ্টান্টিনোপলের গ্রীক সম্রাট্ হরকল, আ হজরত (ছালঃ)-কে
“পয়গম্বর বরহক্ ” (সত্য নবী বা রহুল) বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ;
সম্রাট্ যখন আ হজরত (ছালঃ)-এর আগমন সংবাদ শুনিতে পাইলেন,
তখন ভয়ে সসৈন্তে পশ্চাতে হঠিয়া গেলেন । ইসরাইী সেনাদলও ইসরাইী
‘শাহান্শাহ্’ (সম্রাট্), আ হজরত (ছালঃ)-এর পরিচালনাধীনে ইসলামী
সেনাদলের দ্রুত আগমন-সংবাদে এমন আতঙ্কিত ও ভীতি-বিহ্বল হইয়া-
ছিলেন যে, মোসলমান সৈন্তগণের সম্মুখীন হইতে তাঁহার সাহসে কুলাইল
না । তাহার ময়দান শূন্য করিয়া চলিয়া গেল । “ তবুক ” মদীনা-মক্কাওরা
হইতে ১৪১৫ মঞ্জেলের পথ ; শত্রুদল ভয়ে পলায়ন করাতে আ হজরত
(ছালঃ) তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে তবুকে প্রায় ২০ দিন অবস্থিতি
করিলেন । ইত্যবসরে আয়েলার (শাম অর্থাৎ সিরিয়ার একটি খুবা)
শাসনকর্তা ইয়াহিনাঃ-বিন্-রোবতাঃ, আ হজরত (ছালঃ)-এর অধীনতা
স্বীকার জন্ত তাঁহার ‘খেদমতে’ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আ হজরত
(ছালঃ) জযিয়াঃ প্রদানের শর্তে তাঁহার সঙ্গে সন্ধি-বন্ধন করিলেন ।
আয়েলার শাসনকর্তা তখন তখনই জযিয়াঃ আদায় করিয়া দিলেন । ইহার
পর ‘জরবা’ এর অধিবাসিদিগের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ আসিল । তাহারা
ও জযিয়াঃ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইল ; আ হজরত (ছালঃ) তাহাদিগকে
‘ছোলেহ-নামা’ (সন্ধি-পত্র) লিখিয়া দিলেন । ইহার পর ‘আব্-কুহ’ এর
প্রতিনিধিগণ হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল ; তাহারাও
জযিয়াঃ প্রদানের শর্তে সন্ধি-পত্র লাভ করিল । তবুকের নিকটেই

“মোমতল জন্দল” এলাকা অবস্থিত ছিল। তথাকার বর্তমান শাসনকর্তা (গবর্নর) আকিদর-বিন্-আবদুল মলক, বনু-কন্দা: ‘কবিলার’ (সম্প্রদায়ের) লোক এবং খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী ছিল। সে আ হজরত (ছাল:)—এর খেদমতে উপস্থিত হইল না। উহার কার্য-কলাপে ‘ছরকশি’ (অবাধ্যতা) প্রকাশ পাইল। তদর্শনে আ হজরত (ছাল:) হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজি:)—এর অধিনায়কতায় তাহার বিরুদ্ধে এক ‘দস্তা:’ (দল) সৈন্য পাঠাইলেন। হজরত (ছাল:), খালেদ (রাজি:)—কে ইহাও ফরমাইলেন যে, তুমি আকিদরকে নীল গাই শিকার করিতে দেখিতে পাইবে; উহাকে ‘গেরেফ্তার’ (বন্দী) করিয়া আনয়ন কর। মহাবীর হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজি:), আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে স্বীয় সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী সেনাদল সহ দ্রুতগতি অগ্রসর হইলেন। যাহা হউক, ঠিক নীল গাই শিকার কালেই আকিদর ও তাহার ভ্রাতা, মহাবীর সায়ফোজ্জা: (রাজি:) কর্তৃক ধৃত হইল। হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজি:) তাহাকে বন্দী করিয়া আ হজরত (ছাল:)—এর খেদমতে ‘হাজের’ করিলেন। আকিদর, হজুর (ছাল:)—এর বশত স্বীকার পূর্বক, জয়িয়া প্রদানে প্রতিশ্রুত হওয়াতে, তাহার জীবন রক্ষা করিয়া স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা হইল। পরে সে নিজের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দুই হাজার উষ্ট্র, আটশত ঘোড়া, চারি শত ‘যরা:’ (বর্ম), চারি শত ‘নেযা:’ (বড়শা বা বল্লম বিশেষ), আ হজরত (ছাল:)—এর খেদমতে ‘পেশ্-কশ্’ (নজরানা) স্বরূপ পাঠাইয়া দিল, এবং সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া নির্ভয় ও নিশ্চিত হইল। শামের সীমান্তবর্তী স্থানের সমুদয় শাসনকর্তা, রইস, সাম্প্রদায়িক নেতা অর্থাৎ দলপতি দিগকে বশতাপন্ন করিয়া আ হজরত (ছাল:), ছাহাবা: (রাজি:) দিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, অতঃপর কি করা উচিত। সকলে এক মতাবলম্বী হইয়া

বলিলেন যে, অতঃপর আমাদের পক্ষে এখানে বেশী দিন অবস্থান করা উচিত নহে । কায়সার ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, স্থানীয় শাসনকর্তা, সামন্ত নরপতি ও সাম্প্রদায়িক ছরদার (নেতা) গণ বশুতা স্বীকার ও জজিয়া প্রদানে প্রতিশ্রুতি দান পূর্বক সন্ধি-বন্ধন করিয়াছে, এবং কেহ কেহ উহা দিয়াও দিয়াছে, সিরিয়া-সীমান্তে আর কোনও আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই ; সুতরাং আমাদের সত্বরে মদীনার প্রত্যাবর্তন করা উচিত । যদি কায়সারের যুদ্ধ করিবার 'হেস্ত' (সাহস) ও 'তাকত' (শক্তি) থাকিত, তবে তিনি তাঁহার বিরাট সেনাদল লইয়া অবশুই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন । সুতরাং এখানে আর কোনও আশঙ্কার কারণই বিদ্যমান নাই । আ হজরত (ছালঃ) ও এই মত সমীচীন বোধ করিলেন ; এবং তদনুসারে শিবির তুলিয়া লইয়া তবুক হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । কয়েক দিন ক্রমাগত গমন এবং 'মঞ্জেল-মঞ্জেল' অবস্থান পূর্বক, ৯ম হিজরীর পবিত্র রমজান মাসে, সদল বলে, মহাসমারোহে মদীনার প্রবেশ করিলেন । এই অভিযানে—তবুক যাত্রাতে ৯ তথায় অবস্থানে সর্বশুদ্ধ দুই মাস সময় অতিবাহিত হইয়াছিল ।

আ হজরত (ছালঃ) যখন তবুকের 'গয্ ওরা' (যুদ্ধ বা অভিযান) হইতে বিজয়ী বেশে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন, সেই সংবাদ তায়েক্-বাসিগণ শুনিতে পাইল, এবং তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আমাদের এমন শক্তি নাই যে, মোসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারি । হজরত ব্রহ্ম-বিন্-মসুউদ (রাজিঃ) ইতিপূর্বে যে তায়েক্-বাসীদিগের হস্তে অতি নির্দয় ভাবে শহীদ হইয়াছিলেন, তদীয় পুত্র আবুল মলিহ, ইতিপূর্বেই তায়েক্ হইতে মদীনার আসিয়া পবিত্র ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; আ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলে, তায়েক্-বাসীদিগের পক্ষ হইতে আব্দু এন্না লয়েল-

বিন্-ওমর উকীল নিযুক্ত হইয়া, আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত তায়েফ্ বাসীর সঙ্গে, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। হজুর (ছালঃ) এই নবাগত লোকদিগের জন্ত মছজেদে একটা ‘খিমা নছব’ করাইয়া (তাখু খাটাইয়া) দেওয়াইলেন। আবদ্-এরা-লয়েল ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকেরা সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। আর আপনাদের ‘কওমের’ (সম্প্রদায় বা জাতির) পক্ষ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ‘দস্ত-মবারকে’ (পবিত্র হস্তে) ‘বয়্য়েত’ করিলেন। তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ), ওস্মান-বিন্-আবিল আছ (রাজিঃ)-কে তায়েফের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। আর মগিরা-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ)-কে, তায়েফ্ নগরস্থ “লাত” দেবের মূর্তি ও মন্দির ভগ্ন এবং নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। তিনি তায়েফে পহুছিয়া লাতের ‘বোত’ (প্রস্তর নিশ্চিত প্রতিমা) এবং উহার মন্দির ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করিলেন। উহার স্মৃতি ভিত্তি পর্যন্ত উপাড়িয়া ফেলিলেন। মন্দিরের ধনাগার হইতে যে অর্থ বাহির হইল, উহার কিয়দংশ দ্বারা হজরত যক্বহ-বিন্-মহউদ শহীদ (রাজিঃ)-এর খণ পরিশোধ করা হইল। অবশিষ্ট অর্থ মোসলমানদিগের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। যে তায়েফ্ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) একদিন নিতান্ত উৎপীড়িত ও লাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন : যে তায়েফের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া “হজুর ছারওয়ায়ে কায়েনাত” (ছালঃ) একদিন প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ; যে তায়েফ্ বাসিগণ, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-কে গ্রাহ্যই করিত না ; আজ তাঁহার একজন ‘ছাহাবাঃ’ (শিষ্য)— (রাজিঃ) বাইয়া তাহাদের উপাস্ত দেবতা লাত ও উহার মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিলেন ; তায়েফ বাসিগণ তাহাতে চুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিল না।

আ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে মদীনায়া প্রত্যাবর্তন করিবার পর, আরবের চতুর্দিকস্থ বিভিন্ন জাতি ■ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ‘ওফদ’ (ডেপুটেশন—প্রতিনিধি) সকল আসিতে লাগিল । এক এক প্রদেশ, এক এক জনপদ, এক এক নগর এবং এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উকীল বা প্রতিনিধি আসিতেন, ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করিতেন, এবং আপন আপন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা দেশবাসীর পক্ষ হইতে ‘বয়্যেত’ করিতেন, এবং পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিধান শিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষাদাতা সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন ।

অতঃপর আ হজরত (ছালঃ) একদল যোদ্ধাপুরুষ সহকারে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ‘বেলাদ তয়’ (তয় প্রদেশ) অভিযুখে প্রেরণ করিলেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তয় প্রদেশে পহুঁছিয়া, ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন । তয় সম্প্রদায়ের প্রধান ‘ছরদার’ (নেতা বা দলপতি) আদি-বিন্-হাতেম-তায়ী (প্রসিদ্ধ দাতা ও পরোপকারী হাতেম তায়ীর পুত্র) ‘ফরার’ (পলায়ন-পর) হইয়া শাম প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যুদ্ধে জয়ী হইয়া বহুসংখ্যক বন্দীসহ মদীনায়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । বন্দী দলের মধ্যে হাতেম তায়ী এর কন্যা ■ ছিলেন । হাতেমের কন্যা আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘খেদমতে’ ‘আরজ’ করিলেন যে, আপনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন—আমাকে মুক্তি দিন । হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি তোমার প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিতেছি—অর্থাৎ তোমাকে বন্দিত্ব হইতে ‘আযাদ’ (স্বাধীনতা ■ মুক্তি প্রদান) করিলাম । ইতিমধ্যে শাম দেশ হইতে কতিপয় সজ্জা লোক আগমন করিলে, আ হজরত (ছালঃ) হাতেমের কন্যাকে ঐ সঙ্গে তাঁহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন । কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে উপযুক্ত বস্ত্র ও প্রচুর প্রচুর অর্থও দিলেন এই হাতেম-দুহিতা যখন তাঁহার

ভাতা আদি-বিন্-হাতেম তায়ী এর নিকট পহছিলেন, তখন ভাতা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ঐ ব্যক্তিকে (ঈ। হজরত [ছালঃ] কে) কেমন পাইলে এবং কেমন দেখিলে ? হাতেম-দুহিতা (ছালঃ)-এর বিস্তর প্রশংসাবাদ ■ গুণ-কীর্তন করিয়া বলিলেন, ঐ মহান ব্যক্তি সাক্ষাৎ-করিবার উপযুক্ত পাত্র । তিনি নিতান্ত 'খলিক' ('খোশ্-আখলাক'—বিনয়ী) এবং 'আলা দরজার মহছেন'-(উচ্চ শ্রেণীর পরোপকারী ■ জন-হিতৈষী) । আদি এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর উদ্দেশে মদীনাতিমুখে রওয়ানা হইলেন । তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের (গোষ্ঠী বা গোত্রের) প্রতিনিধি স্বরূপ হজুর (ছালঃ)-এর 'খেদমতে 'হাজের' হইলেন । ঈ। হজরত (ছালঃ) তাঁহার প্রতি খুব সম্মান ও সহায়ত্ব প্রদর্শন করিলেন ; আর মজ্জেদ-নববী হইতে সবে লইয়া স্বীয় গৃহে আগমন করিলেন । গৃহে আনিয়া তাঁহাকে সমাদর পূর্বক বিছানায় বসাইলেন । আদি-বিন্-হাতেম, ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর বিনয় ও সৌজন্য দর্শনে মোহিত হইলেন । গৃহে বসাইয়া (ছালঃ) তাঁহাকে কতিপয় সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন । অতঃপর আদি-বিন্-হাতেম তায়ী হাত বাড়াইয়া দিলেন—ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর বস্ত্রেত করিলেন—অতীব ভক্তি সহকারে মোছলমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । সবে সবে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা (তর প্রদেশ বাসিগণ) সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্মে-দীক্ষিত হইলেন ।

তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 'ওফুদের' (ডেপুটেশনের—বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি বা প্রদেশের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিবর্গ আগমনের) স্রোত এমন ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর মদীনা হইতে কিছুকালের 'জুদা' হওয়া (অস্থগ্নিত থাকা)

ব্যাপার ছিল । সুবিশাল আরব দেশের বিভিন্ন প্রদেশস্থ, বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত লোক দলে দলে আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে-দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । যখন হজ্জের সময়—জেলহজ্জ মাস আসিল ; হজুর (ছালঃ) হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি ও হজ্জের ‘আমীর’ নিযুক্ত করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা করিলেন । নিজের পক্ষ হইতে কোরবানী দেওয়ার জন্য ২০ টা উট তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন । ৩০০ তিন শত হজ্জ যাত্রীর ‘কাফেলা’ হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর হজ্জ যাত্রার পরই চুরা-বরআতের ৪০ টা আয়াত এককালীন অবতীর্ণ হইয়াছিল ; উহাতে এই আদেশ ছিল যে, ‘মোশ্‌রেকিন’ (পৌত্তলিক বা অংশিবাদী) গণ এ বৎসরের পর যেন মস্‌জিদ হরামের নিকটে না যায়, এবং ‘বরআহানা’ (উলঙ্গ) হইয়া যেন বরতোয়ার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ কার্য) না করে । আর যাহাদের সঙ্গে (হজরত) রুহুলোম্মাহ (ছালঃ) কোনও ‘আহদ’ (সন্ধি বন্ধন) করিয়াছেন, উহা ঐ ‘মুদত’ (সময়) পর্যন্ত পূরা করিয়া দেওয়া হউক । স্থলকথা, এরূপ ‘য়েলান’ (ঘোষণা) প্রচার করা অতি প্রয়োজনীয় ছিল । তদনুসারেই হজরত (ছালঃ) অবতরিত আয়াত সমূহ সহ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে, স্বীয় ক্ষতগামিনী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করিলেন, এবং তাঁহাকে আদেশ দিলেন যে, হজ্জ পরিসমাপ্তির পর দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে কোরআনের এই আদেশ শুনাইয়া দিবে । তদনুসারে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ক্ষতগতি গমন করিয়া ‘যোল-হালিকা’ নামক স্থানে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর কাফেলার গিয়া সম্মিলিত হইলেন । অতঃপর তাঁহারা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা-মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইলেন । আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) আমীর ছিলেন বলিয়া তিনি ‘আরকানে হজ্জ’

আদায় করিলেন। তৎপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ছুয়া বর্ষান্তের
আয়াত সমূহ, সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া ছিলেন।

এই বৎসরেই আ হজরত (ছালঃ)-এর ছাহেব্বাদীঃ ওম্মে-কুলছুম
(রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করিলেন। এই বৎসরেই হজ্জ্ করজ্
বলিয়া আব্বাহ্ তা-লার আদেশ অবতীর্ণ হয়। এই বৎসর হজ্জ্ মোসল-
মানদিগের 'যেব্-এহ্ তেমামে' (তজ্জাব্বাহানে) সম্পন্ন হইয়াছিল, বিধর্মী
দিগের তাহাতে আর কোনও রূপ কর্তৃত্ব ছিল না। অবশ্য এ সময় মক্কার
পৌত্তলিকদিগের সংখ্যা একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। হজরত আবু-
বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) মোসলমানদিগকে হজ্জের 'আরকান' (নিয়মাবলী)
শিক্ষা দিলেন। এই হজ্জ্-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে সমুদয় 'মোশ্-রেকিন'
(পৌত্তলিক—অংশীবাদী)-কে 'ছেরেফ্' (কেবলমাত্র) ৪ মাসের 'মহলৎ'
(অবকাশ বা সময়) দেওয়া গেল, এবং ঘোষণা প্রচার করা হইল যে,
৪ মাস পরে খোদা ও তাঁহার রচুল 'মোশ্-রেক' দিগের আর 'জিন্মাদার'
থাকিবেন না—অর্থাৎ তাহাদের জীবন-মরণের জন্ত কোনওরূপ দায়ী
হইবেন না। এই ঘোষণা শুনিয়া মক্কার যে সকল অধিবাসী এ যাবৎ
পৌত্তলিকতা (অংশীবাদিত্ব) পরিত্যাগ করিয়া মোসলমান হইয়াছিল না,
তাঁহারাও পবিত্র ইসলাম ধর্মে-দীক্ষিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন
প্রদেশ, বিভিন্ন জনপদও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরব অধিবাসিগণ দলে দলে
আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

হেজরতের দশম বৎসর।

দশম হিজরীর মহব্বরম মাস হইতে বৎসরের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন
প্রদেশের প্রতিনিধিগণের আগমন এবং আরবের বিভিন্ন জনপদ, বিভিন্ন

জাতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের ইসলাম-ধর্ম গ্রহণার্থ মদীনায়াঃ আগমনের ‘ছেলছেলাঃ’ (স্রোত) বরাবর জারী ছিল। রবিয়স-সানী মাসে আবু হজরত (ছালঃ), হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-কে ৪০০ চারি শত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্ব পদ প্রদান পূর্বক “নজরান” প্রদেশাভিমুখে রওয়ানা করিলেন; তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তদ্রূপ লোকদিগকেও ৩ বার ইসলামের দিকে আহ্বান করিবে। যখন তাহারা ইসলাম ধর্মে-দীক্ষিত হইবে, তখন তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে যথোচিত শিক্ষা দিবে, তাহাদের সঙ্গে পার্শ্বমাণে যুদ্ধ করিবে না। নজরান প্রদেশের লোকেরা হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-এর পঁছহার সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই নব-ইসলাম ধর্মাবলম্বী দিগের মধ্যে বহু-হরছ-বিন্-কায়াব সম্প্রদায়ের (গোষ্ঠীর) লোকেরাও ছিলেন। আবু হজরত (ছালঃ), হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) ও তাঁহার সঙ্গীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন, তদনুসারে তাহারা মদীনায়াঃ ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ওমর-বিন্-খরম (রাজিঃ)-কে, নব-দীক্ষিত মোসলমানদিগকে ইসলামী শিক্ষা প্রদানার্থ ‘নকীব’ (ছরদার বা নেতা) নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইলেন। ঐ বৎসর রমজান মাসে গাছ্ ছান জাতির “ওফদ” (ডেপুটেশন বা প্রতিনিধি দল), আবু হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আগমন করিলেন। এই প্রতিনিধি দলে ৩ ব্যক্তি আসিয়া-ছিলেন; তাহারা হজুর (ছালঃ)-এর ‘খেদমত-আকুদছে’ (পবিত্র খেদমতে) উপস্থিত হইয়াই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং তৎপর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তাহাদের সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ঐ সময় পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। শওরাত মাসে ছলামান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ১ জন প্রতিনিধি আগমন করিলেন।

ঐ ৭ জনের মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়ের ‘ছরদার’ (দলপতি) হবিব-বিন্-ওমরুও ছিলেন ; ইহারা সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় মোটামুটি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন । এক দিবস হবিব-বিন্-ওমরু (রাজিঃ), আব্বা হজরত (ছালঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আফজালল-আমাল’ (সর্বোত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠান) কি ? উত্তরে হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, “ ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে নমাজ্ আদায় করা । ” ঐ সময়ই “আযদ ” হইতে ১০ জন প্রতিনিধির এক ‘ওফদ’ আব্বা হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয় । ওফদের প্রতিনিধিগণ সকলেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে সমগ্র ‘ক্ববীলা’ (জাতি বা সম্প্রদায়) ইসলামের পবিত্র আশ্রয়চ্ছায়ার আগমন করিলেন । ইহার পর তাহাদের প্রতিবাসী জরখ্ সম্প্রদায়ও পরম ভক্তি সহকারে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । হজরত (ছালঃ) এই বৎসরেই হজরত আলী (রাজিঃ)-কে এমন (ইমন) প্রদেশে প্রেরণ করিলেন । উদ্দেশ্য, তদ্দেশ বাসীকে ‘বোত-পরস্তির’ (পৌত্তলিকতার) দোষ-প্রদর্শন এবং ‘তওহিদেব’ (একেশ্বরবাদিতার) সৌন্দর্য্য, বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয় । মূলকথা, তিনি যেন সেখানে ইসলামের ‘তব্লীগ্’ (প্রচার কার্য) করেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রচার কার্যের এই ফল হইল যে, এমনের সুবিখ্যাত ও খ্যনাম-প্রসিদ্ধ ‘হমদান’ জাতির সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই এমনের অন্ত্যান্ত জাতিও দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । তাহাদের প্রতিনিধিগণ মদীনা-মক্কায় আসিয়া, আব্বা হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চরিতার্থ হইতে লাগিলেন । এই বৎসরই মোরাদ সম্প্রদায়, মুলুক কন্দাঃ জাতি হইতে ‘আলাহেদা’ (স্বতন্ত্র) হইয়া হজরত

(ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । আবার এই বৎসরেই আব্দে কয়েসের ওফদ, জারদ-বিন্-ওমরর :নেতৃত্বে, আব্দ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, ইহারা খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন ; ইহারা সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ইহারা স্বদেশে গিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের সকল লোককেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিলেন । এই বৎসরেই “এমামাঃ” প্রদেশ হইতে বহু-হানিফাঃ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ, আব্দ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন । এই প্রতিনিধি দলে মোস্লেমাঃ-বিন্-হবিব—(যে ব্যক্তি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক [রাজিঃ]-এর খেলাফৎ কালে নবুয়তের দাবী করিয়াছিল ; পরে মহামান্য খলিফা প্রেরিত সেনাপতি “খোদা তা-লাক তরবারি” নামে অভিহিত হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ [রাজিঃ] কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও হজরত হামযার (রাজিঃ) শহীদকারী ওহশী কর্তৃক নিহত হইয়াছিল), জরজান-বিন্-আন্ হনহম, তলক্-বিন্-আলী, হলমান বিন্ হনজলাঃ শামেল ছিল । ইহারা মদীনা-মহুওরায় পহুঁছিয়াই পবিত্র ইসলাম ধর্ম কবুল করিলেন । তৎপরে কিয়দিবস তথায় বাস করিলেন ; এবং ওবি-বিন্-কায়াব (রাজিঃ)-এর নিকট কোর-আন শরীফের শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন । এই বৎসরেই ১০ কিছা ১২ জন লোকের এক ডেপুটেশন ‘বন্দুকন্দাঃ’ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আসিল । আবার এই বৎসরেই বহু-কনানার ওফদের সঙ্গে বিখ্যাত “হজরত মুত” (দক্ষিণ-পূর্ব আরবের অন্তর্গত বিশাল জনপদের অধিবাসী) সম্প্রদায়ের ‘ওফদ’ ■ আগমন করিল । এই সকল দলের প্রতিনিধিবর্গ সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । এই ‘যমানায়’ (সময়) প্রসিদ্ধ জন-নেতা ওয়ায়েল-বিন্ হজর, আব্দ হজরত

(ছালঃ)-এর খেদমতে 'হাজের' (উপস্থিত) হইয়া, পরম ভক্তি সহকারে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । ইহার ইসলাম-ধর্ম গ্রহণে আ হজরত (ছালঃ) বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন । আবার এই বংশেরই মহারব এর দশজন লোকের, আর নদহজের ১৫ জন লোকের 'ওফদ' আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আগমন করিল । ইহারা সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন ; ইহারা মদীনা-মক্কায় থাকিয়া কোরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা করিলেন, এবং 'ফরায়েজ্জ ইসলামের তোলিন' (ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সর্ববিধ শিক্ষা) প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন । এই বংশেরই "নজরান" প্রদেশস্থ অবশিষ্ট খৃষ্টীয়ান দিগের পক্ষ হইতে এক "ওফদ" আসিল—যাহাতে ৭০ জন, কাহারও কাহারও মতে ১৪ জন প্রতিনিধি ছিল ; এই সম্প্রদায়ের ছরদার আবুল মসৌহ এবং তাহার সহযোগী আবুল হারছাঃ ছিল । ইহারাঃমহজেদ নববীতে প্রবেশ পূর্বক ধর্ম সম্বন্ধে "বাহাছ-মবাহেছাঃ" (তর্ক-বিতর্ক) আরম্ভ করিল ; এই সময়েই ছুরে 'আল-এমরান' এর শুরুস্থ আয়াত ও আয়াত 'মোবাহেলা' নাযেল হইল । আ হজরত (ছালঃ) উহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিলেন । কিন্তু উহারা নিতান্ত 'গোস্তাখীর' (বে-আদবীর—অশিষ্টতার) সঙ্গে 'পেশ' আসিল ; আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, (হজরত) ইচ্ছা (আলাঃ) খোদা তায়ালার নিকট এইরূপই ছিলেন—যেমন (হজরত) আদম (আলাঃ) ; কারণ তাঁহাকেও খোদা তায়ালার মাটি দ্বারাই বানাইয়া ছিলেন । ইচ্ছারী (খৃষ্টীয়ান) গণ বলিল, না—তা নয় ; বরং ইচ্ছা (আলাঃ) খোদার 'বেটা' (পুত্র) ছিলেন । আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি তোমরা আপনাদের 'কওলে ছাচ্চা' (উক্তিভে সত্যবাদী) হও, তবে আমার সঙ্গে ময়দানে চল । আর আমার প্রিয় 'আকারেব' (রেশ্তাদার—মর্যাদাপেক্ষা ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন) ও আমার সঙ্গে থাকিবে, উভয় সম্প্রদায়

(পক্ষ) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বসিয়া বলিবে, :“ যে বুটা’ (মিথ্যাবাদী) হয়, তাহার উপর আল্লাহর ‘আযাব’ (শাস্তি) অবতীর্ণ হউক । এই কথা শুনিয়া খৃষ্টীয়ানগণ চুপ হইয়া রহিল । পর দিবস ‘ছোবেহ’ (প্রভাত) কালে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (রাজি), হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) হজরত এমাম হাছেন (রাজিঃ) ■ হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন ; এবং পূর্বোক্ত ‘দৈছারী’ (খৃষ্টীয়ান) দিগকে গিয়া বলিলেন, আমি যখন এই ‘দোওয়া’ (প্রার্থনা) করিব যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, উহার উপর খোদা তা-য়ালার ‘আযাব’ (শাস্তি) অবতীর্ণ হউক ; তখন তোমরা ও “ আমিন ” বলিও । আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এইরূপ দৃঢ়তা দর্শনে খৃষ্টীয়ানগণ ‘খওফ্ বাদাঃ’ (ভীত ও আতঙ্কিত) হইয়া বলিতে লাগিল, আমরা ‘মবাহেলা’ করিতেছি না । আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি ‘মবা হেলাঃ’ করিতে না চাও, তবে ইসলাম ধর্ম দীক্ষিত হও ; এবং অন্য মোসলমানদিগের মতন হইয়া যাও । তাহারা বলিল, আমাদের ইহাও ‘মঞ্জুর’ নয় (আমরা ইসলাম ধর্ম দীক্ষিত হইতেও ইচ্ছুক নহি) ; তচ্ছুবণে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তবে তোমরা আমাকে ‘জযিয়া’ দাও, কিংবা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর । তখন তাহারা বলিল, আমরা জযিয়া দিতে সম্মত আছি । এই খৃষ্টীয়ানগণ বিদায় গ্রহণ কালে আপনাদের অন্য একজন ‘আমীন’ (বিচারক) প্রার্থনা করিল ; তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আবু-ওবেদাঃ (রাজিঃ)-কে তাহাদের আমীন নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন । কিছু দিনের মধ্যে নজরান প্রদেশের প্রায় সমুদয় খৃষ্টীয়ানই পবিত্র ইসলাম ধর্ম দীক্ষিত হইলেন ।

ইতিপূর্বে “ এমন ” প্রদেশের সমুদয় অধিবাসী এবং তথাকার বাদশাহ পারস্ত-সম্রাটের সর্ব ক্ষমতাপন্ন ভূতপূর্ব প্রতিনিধি বাযান পবিত্র ইসলাম

ধর্ম্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; আ হজরত (ছালঃ) বিশাল এমন প্রদেশের শাসনকর্ত্ত্ব পদে বাযানকেই বহাল রাখিয়াছিলেন । এই বৎসরে (হিজরী দশম সালে) বাযান পরলোক গমন করেন । এক্ষণে আ হজরত (ছালঃ) বিশাল এমন প্রদেশটিকে কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন সুবার বিভক্ত করিয়া শহর-বিন্-বাযান, আমের-বিন্-শহর হামদানী, হজরত আবু মুসা আশয়ারী- (রাজিঃ), আলী-বিন্-ওমিয়া, হজরত মারায়-বিন্-জবল (রাজিঃ) প্রভৃতি খ্যাতনামা ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ■ ব্যক্তিদিগকে ঐ সকল সুবার শাসনকর্ত্ত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন । আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে ও এমনে প্রেরণ করিলেন । তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, যে পর্য্যন্ত কেহ তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত তোমরা কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিও না । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে প্রধানতঃ এমন প্রদেশের ‘যাকাত’ ও ‘ছাদকাঃ’ ইত্যাদি আদায় করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন ।

হজ্জতল্-ভেদা বা হজ্জ্-অল্-বালাগ্ ।

এই সকল ঘটনার পর বেল্কদ মাস আসিল ; আ হজরত (ছালঃ) ১০ম হিজরীর ২৫শে বেল্কদ, হজ্জ্ বায়তোল্লার জন্য মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন ; তাঁহার সহিত মহাজেরিন ■ আনুহার এবং আরবের বিভিন্ন প্রদেশের এক বিরাট জন-সম্মত হজ্জে গমন করিলেন । তাঁহাদের সঙ্গে কোরবানীর ■ ১০০ এক শত উষ্ট্র লইয়া ছিলেন । ৪ঠা বেলহজ্জ রবিবার দিন তাঁহারা মহাড়ক্বরে মক্কা-মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করিলেন । হজরত আলী (রাজিঃ) ও এমন হইতে আসিয়া আ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন ; এবং তাঁহার সঙ্গেই পবিত্র হজ্জ্-

কার্য সম্পন্ন করিলেন। ঐ হজরত (ছালঃ) এই বৎসর লোকদিগকে “ মনাছক ” হজ্জের ‘তৌলিম’ (শিক্ষা) দিয়াছিলেন। উহার ‘তরিকাঃ’ (নিয়মাবলী) বিশেষ রূপে ‘বাতাইয়াছিলেন’ (শিক্ষা দিয়াছিলেন)। তৎপর আরফাতে দাঁড়াইয়া একটি হৃদয়াকর্ষণী ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ফরমাইলেন, “ হে জন-মণ্ডলি ! আমার কথা (নিবিষ্ট মনে) শ্রবণ কর। কারণ আমি ‘আরেকাঃ’ (আগামী) সালে (বৎসরে) এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবার ‘একিন’ (ভরসা—বিশ্বাস) রাখিনা। হে লোক সকল ! যেমন এই দিন, এই মাস ‘হারাম’ মাস ; সেইরূপে অন্তরে ‘জান’ ও ‘মাল’ (জীবন এবং সম্পত্তি) তোমাদের পক্ষে হারাম—অর্থাৎ মোসলমানদিগের জান ও মালের হেফাজৎ করা প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে উচিত। ‘আমানত’ অর্থাৎ গচ্ছিত ধন উহার ‘মালেক’ (অধিকারী) দিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রতি ‘যোলম’ (অত্যাচার) করিও না—যাহার পরিবর্তে যেন তোমার প্রতি ‘যোলম’ (শাস্তি প্রদান) না করা হয়। সুনুত হান্নাম ; শয়তান ‘মাযুছ’ (নিরাশ) হইয়া গিয়াছে ; কারণ তাহার ‘পরশুশ্’ (পুজা) এই ‘ছরযমিনে’ (আরব দেশে—মক্কার) আর করা হইবে না। কিন্তু এই টুকু হইবে—ছোট ছোট ব্যাপারে উহার (শয়তানের) ‘এতারত’ (অধীনতা স্বীকার) লোকেরা করিবে ; সুতরাং তোমরা শয়তানের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কর। হে লোক সকল ! তোমাদের উপর জ্বীলোকদিগের (দাবী—প্রাপ্য) আছে—যেমন তোমাদের হক তাহাদের উপর রহিয়াছে। জ্বীলোকদিগের সঙ্গে ‘ভালাই’ (সম্ব্যবহার) কর। আমি তোমাদের মধ্যে ২টি ‘চিয়’ (জিনিষ) ছাড়িয়া যাইতেছি ; এক (প্রথম) আল্লাহর কেতাব (পবিত্র কোরআন মজীদ) ; দ্বিতীয়—তাহার নবীর (আমার) ছোন্নত। যে পর্য্যন্ত তোমরা আল্লাহর কেতাব ও ছোন্নতের প্রতি ‘আমল’ করিবে (এতদুভয়ের আদেশ

■ উপদেশ ■ চলিবে), তত্তাবৎ কাল 'গোমরাহ' (পঞ্চলষ্ট—বিপথগামী) হইবে না ; প্রত্যেক মোসলমান অপর মোসলমানের ভ্রাতা ; কোনও মোসলমানের পক্ষে 'জায়েব্' (সিদ্ধ) নহে যে, সে অন্য মোসলমানের মালের (ধন-সম্পত্তির) উপর তাহার বিনামূল্যে 'দখল' (আধিপত্য বিস্তার) করে । তোমরা একে অন্যের উপর 'জোলম' (অত্যাচার) করিও না । " পরে লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " বল, আমি আল্লাহর আদেশ তোমাদের মধ্যে পঁহুঁছাইয়াছি কিনা ? " সকলে সম্মিলিত ভাবে—সম্মুখে উত্তর করিলেন, হাঁ ! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর আদেশ আমাদের মধ্যে পঁহুঁছাইয়াছেন । তৎপর ঐ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন " হে খোদা ! তুমি (এ বিষয়ের) 'গাওয়াহ্' (সাক্ষী) থাক । "

ঐ হজরত (ছালঃ)-এর এই 'খোত্বাঃ' (বক্তৃতা) টা এই ভাবের ছিল, এবং ইহাতে এইরূপ উক্তি সকলের উল্লেখ ছিল—যদ্বারা বোধ হইয়াছিল, যেমন কেহ কাহারও নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, কিংবা কাহাকেও বিদায় প্রদান করিতেছেন । এজন্য এই হজ্বের নাম " হজ্বতল ভেদা " বলিয়া 'মশ্হুর' (প্রসিদ্ধ) । আর এই বক্তৃতায় ঐ হজরত (ছালঃ) ইসলামের 'খুছ-তবলীগ' (বিশেষ-প্রচার কার্যের বিষয়) বর্ণনা করিয়া ছিলেন, এজন্য ইহা " হজ্ব-আল-বালাগ্ " নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । এই খোত্বা শেষ হইবামাত্র, হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) এর 'ওয়ালেদা' (জননী) এক পেয়ালা দুধ পাঠাইলেন ; ঐ হজরত (ছালঃ) ঐ দুধ পান করিলেন । এই হজ্জে একলক্ষ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মোসলমান যোগদান করিয়াছিলেন । ঐ হজরত (ছালঃ) ঐ দিন করমাইয়াছিলেন যে, " আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সমুদয় পয়গম্বর (আলাঃ) যাহা কিছু বলিয়াছেন, এবং বলিয়াছি, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা আচ্ছা কালাম' (উৎকৃষ্ট বাক্য বা বাণী) " লায়লাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহ্ লাশরীকালাহ্ লাঃ

মোক্ষ ■ লাহল হাম্ম ও হুয়া আলা-কুয়ে শারেন কাদীর । * আরবান দিন যখন আ হজরত (ছালঃ) মক্কায় উপস্থিত ছিলেন, তখন কোরআনের যে পবিত্র আয়েতটি নাযেল হয়, তৎপ্রবণে বহু ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এই বলিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে, আজ ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ করিল । কিন্তু কোনও কোনও ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)—বিশেষতঃ হজরত আবু বকর চিদ্দিক (রাজিঃ)—যিনি প্রত্যেক বিষয়ের গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটনে অভ্যস্ত ছিলেন—উপরোক্ত আয়াত প্রবণে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । এই আয়াতে ‘করাকের’ (পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইবার) গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল । কারণ, যখন ‘দীন’ (ধর্ম) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন পৃথিবীতে নবীর জীবিত থাকার আবশ্যকতা রহিল না ।

‘আরকানে হক্ক’ আদায় করিবার পর আ হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনা-মক্কুরার রওমানা হইলেন । আ হজরত (ছালঃ)-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর, তদীয় ছাহাবাঃ (পুত্ররত্ন) এব্রাহিম পরলোক গমন করিয়াছিলেন ।

হিজরীর একাদশ সাল ।

আ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমন ।

১১শ হিজরীর মহররম মাসে আ হজরত (ছালঃ)-এর জর হইল ; এবং সেই জর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল । হজুর (ছালঃ)-এর অসুস্থতার সংবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত হইল ; ইহাতে তাঁহার পরম ভক্ত ও অমুরক্ত, তাঁহার নামে জীবনোৎসর্গকারী ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের মনে কিরূপ চিন্তা ও উদ্বেগের আবির্ভাব হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । কিন্তু এই সুযোগে কোনও কোনও ‘মোক্ষ্ছেদ’ (বিপ্লব-

বাদী) মন্তকোত্তোলন করিল । মোছলেমাঃ, তলিয়াঃ, খোয়েন্দ, আছদ, সতাহ-বিস্তে হাদেস্— স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নবুত্তের (পরগধরীর) দাওয়া করিল । তাহার মনে করিয়াছিল, যেক্ষেপে (হজরত) মোহাম্মদ (ছালাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম) পরগধরীর নামে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আমরাও তদ্বিসয়ে সেইরূপ সাফল্য লাভিত হইব । কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা, আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘ছদাকতের’ (সত্যতার) আর এক ‘মোহর’ করিয়া দিলেন ; তদ্বরণ উপরোক্ত ভণ্ড ও প্রতারক লোকগুলি পরিণামে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য, নিম্নিত লাভিত হইল । ইহাদের মধ্যে মোছলেমাঃতুল কায্যাব এমামায়, আছদ বিন্-কায্যাব এমানে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । আ হজরত (ছালঃ) পীড়িত অবস্থায় একদিন ‘হজরা’ হইতে বাহিরে তশ্রিফ আনিলেন । তিনি ‘এরশাদ করমাইলেন’, আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, আমার দুই ‘বাজু’তে (বাহুতে—হস্তে) দুইগাছি সোণার ‘কাজিণ’ (বলয়) রহিয়াছে । আমি উহা ‘নামত্বুর’ (অশুভকর—‘মন্তুহ’) মনে করিয়া-খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম । আমি ঐ স্বপ্নের এইরূপ ‘তায়বির’ করিয়াছি (অর্থ বা ফল নির্দেশ করিয়াছি) যে, এই উভয় স্বর্ণ নির্মিত ‘কাজিণ’ (বলয়), ঐ উভয় ‘কায্যাব’ (ভণ্ড)—অর্থাৎ এমামাঃ নিবাসী মোছলেমাঃ কায্যাব, আর এমানের আছদ কায্যাব ; স্বপ্নের ‘তায়বির’ যে ঠিক ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । আছদ কায্যাব আ হজরত (ছালঃ)-এর জীবিত কালেই, ফিরোয্ নামক এক বীরপুরুষের হস্তে নিহত হয় ; আর মোছলেমাতুল কায্যাব, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে, হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-এর হত্যাকারী ওহশী কর্তৃক মৃত্যু-পথের পথিক হইয়াছিল । ওহশা বলিতেন, আমি কোকরের অবস্থায় একজন ‘বেহ্তরিন’ (উত্তম—আদর্শ) পুরুষকে শহীদ, এবং

মোসলমান অবস্থায় একজন 'বদতরিন' (দুষ্ট-দুরাচার) লোককে হত্যা করিয়াছি ।

একাদশ হিজরীর ২৬শে ছফর তারিখে, আবু হজরত (ছালঃ)-এর ব্যারাম একটু হ্রাস বোধ হইল ; তখন তিনি 'সিরিয়া' (শাম) ■ 'ফলস্তিন' (প্যালেষ্টাইন)-এর সীমান্ত প্রদেশে অশান্তির সংবাদ পাইয়া, মোসলমান দিগকে 'জঙ্গে-কম' (রোমক সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ) করিবার জন্য প্রস্তুত ■ সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন । কারণ, এমামাঃ ■ এমনেবর অন্তবিধিতে এবং আরব দেশস্থ খৃষ্টীয়ানদিগের বড়বড় প্রভাবে, রোমক জাতি এবং সিরীয়গণ আবার আরব দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল । হজুর (ছালঃ) দ্বিতীয় দিবস হজরত ওসামা-বিন্-জয়েদ (রাজিঃ) কে প্রধান সেনাপতি পদ প্রদান পূর্বক করমাইলেন যে, তুমি স্বীয় পিতার স্থায় এমন কৃতগতি (এখানে মৃত্যু যুদ্ধে হজরত যয়েদ-বিন্-হারেছ [রাজিঃ] এর কৃত গমন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে) গমন কর, যেন তথাকার (শামের) লোকেরা তোমার গমন সংবাদ পূর্বাঙ্কে জানিতে না পারে । ইন্শাআল্লাহ তা-লা তুমি জয়লাভ করিবে । একাদশ হিজরীর ২৮শে ছফর তারিখে, আবু হজরত (ছালঃ)-এর পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইল । এই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর যুদ্ধ-পতাকা স্বহস্তে 'দোরস্ত' করিয়া, সেনাদল যুদ্ধার্থ রওয়ানা করিলেন । আর সমুদয় 'জলিলল-কদর' (মহা-সম্মানিত) ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতে আদেশ করিলেন । তদনুসারে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত ওসমান জিন্নুরায়েণ (রাজিঃ), হজরত আলী মরতুজা (রাজিঃ)—ভাবীকালের খোন্কায়ে রাশেদিনগণ, আশ্-রায়-মোবাশ্-শরাগণ ■ অন্যান্য সমুদয় ছাহাবাঃমওলীকেই তরুণ যুবক ■ ■ ■ ■ ■ ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর অধীনে

যুদ্ধ-যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । কিন্তু নিজের অসুস্থতা নিবন্ধন হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর সম্মতি গ্রহণ পূর্বক, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত আব্বাস (রাজিঃ)-কে আপনার নিকটে রাখিয়া দিলেন । কারণ, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে তখন এই দুই জনই প্রধান ছিলেন ; একজন পিতৃব্য এবং একজন পিতৃব্যপুত্র ■ জামাতা । যাহা হউক, উপরোক্ত দুই মহাত্মা ব্যতীত আর সকল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ই মদীনা হইতে শামের দিকে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন । হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) মদীনা-মহুওরা হইতে রওয়ানা হইয়া, এক ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্বক “জরফ্” নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন । সেখান হইতে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), প্রধান সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্বক, প্রত্যহ মদীনায় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া পুনরায় সেনানিবাসে প্রত্যাবর্তন করিতেন । হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) স্বীয় বিশাল সেনাদল লইয়া জরফেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । আঁ হজরত (ছালঃ)-
■ পীড়ার আক্রমণ ক্রমশঃ গুরুতর হইতে দেখিয়া, তিনি আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না । হজুর (ছালঃ) ■ এ অবস্থান তাঁহাকে ‘কুচ’ (যাত্রা) করিতে অনুমতি দিতেছিলেন না ; অবশেষে প্রধান সেনাপতিকে তাঁহার সৈন্যদল সহ জরফে ‘মকীম’ থাকা সম্বন্ধে তিনি অনুমোদন করিলেন ।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, একত্র ‘আয্-ওরাজ্ মত্-হরাত্’ (অন্তান্ত ওম্মোল-মুসেনিন) দিগের নিকট, হজরত আয়েশা (রাঃ—আঃ) এর গৃহে অবস্থান করিবার ■ ‘এজায়ত তলব’ করিলেন (অনুমতি চাহিলেন) ; তাঁহার সকলেই স্বেচ্ছামুসারে এই প্রস্তাবে অনুমোদন করাতে, হজুর (ছালঃ) তাঁহার গৃহে আগমন

করিলেন । ■■■ মোসলেম-মাতাগণ সেই গৃহে আসিয়া তাঁহার সেবা-
 ■■■ করিতে লাগিলেন । এই পীড়ার অবস্থায়ই তিনি অন্তর হইতে
 বাহিরে আসিয়া সমবেত মোসলমানদিগের মধ্যে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা
 প্রদান করিলেন । ঐ পবিত্র বক্তৃতার মর্ম্ম এই :—“ আমি তোমাদিগকে,
 আল্লাহকে ভয় করিবার ■■■ ‘হেদাএত’ (উপদেশ দান) করিতেছি ।
 আল্লাহ্, তা-লা তোমাদিগকে ‘হেদাএত’ করুন । আমি তোমাদিগকে
 তাঁহার (আল্লাহ্, তা-লার) নিকট ছাড়িয়া বাইতেছি, আর তোমাদিগকে
 তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি । আমি তোমাদিগকে ‘দোযখ’ হইতে,
 ‘ডরানেওয়াল’ (ভীতি-প্রদর্শনকারী), এবং ‘জন্নতের’ (বেহেশ্ত, ■■■
 মোছলেম-স্বর্গের) সুসংবাদ প্রদানকারী হিলাম । আল্লাহর ‘বান্দাঃ’
 (দাস বা সৃষ্ট মনুষ্য) দিগের নিকট ‘তকব্বর’ (গর্ব বা অহঙ্কার) প্রকাশ
 করিও না । ‘জন্নত’ (বেহেশ্ত) ঐ সকল লোকের জন্ত—বাহার
 অহঙ্কার প্রকাশ ■■■ ‘ফছাদ’ (বিবাদ-বিসম্বাদ—বিপ্রব) উপস্থিত না করে ।
 পরকালের ‘ভালাই’ (মঙ্গল) ‘মুত্তকি’ (‘পরহেজগার’—মন্দ কার্য হইতে
 বিরত—ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী) দিগের জন্ত । অহঙ্কারী ■■■ গর্ব প্রকাশকারী
 দিগের ‘ঠেকানা’ (স্থান) জাহান্নমে (দোযখ্ বা নরকে) । ” পুনরায়
 করমাইলেন, “ (আমার মৃত্যু হইলে) আমার ‘করীবি রেশ্তাদার’ (ঘনিষ্ঠ
 আত্মীয়) গণ যেন আমাকে ‘গোছল’ ■■■ (শবদেহ ধোত করে—
 স্নান করায়) ; আমার ‘জানাযাঃ’ (জানাযার নমাজ পড়াস্তে) আমার
 কবরের নিকট রাখিয়া, সকলে এক ‘ছায়েত’ (অতি অল্পমাত্র সময়)—এর
 জন্ত ‘আলগ্’ (স্বতন্ত্র) হইয়া যাইবে—কারণ ‘মালায়েক’ (ফেরেশ্তা) ■■■
 আমার জানাযার নমাজ যেন পড়িয়া লইতে পারে । পরে সকলে দলে
 দলে আমার জানাযার নমাজ পড়িবে । প্রথমে আমার ‘খান্নান’ (বংশ)—
 এর—বনি-হাশেমী পুরুষগণ নমাজ পড়িবে ; তৎপর তাহাদের স্ত্রীলোকগণ—

আর আর সকলে জানাযার নমাজ আদায় করিবে। ■ তাঁহার এই শেষ বিদায়-সূচক বাণী শ্রবণে পরম ভক্ত, অহুরক্ত ও তাঁহার নামে জীবনোৎসর্গকারী ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

ব্যারামের সময় শেষ ■ দিন তিনি 'ছাহেবে ফরাশ' (শয্যাশায়ী) ছিলেন। আবু হজরত (ছালঃ), হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে মহজেদে তাঁহার নিজের জায়গায় এমামতি করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তজ্জ্ববে হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) 'আরজ' করিলেন, এরা রহুলোলাহ (ছালঃ)! আমার পিতা এই 'খেদমত' (আপনার স্থানে এমামতি) 'আজাম' দিতে পারিবেন না। কারণ তিনি একজন অত্যন্ত 'রফিকুল-কল্ব' (নরম দেল—কোমল হৃদয়) মানুষ। আপনি হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে এমাম 'মকবর' (নিযুক্ত) করুন। আবু হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, না, আবুবকর (রাজিঃ) হই এমামতি করিবেন। সেই দিন হইতে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) এমাম হইয়া, যথা-নিয়মে নমাজ পড়াইতে লাগিলেন। এই অবসরে আবু হজরত (ছালঃ) একটু 'এফাকাঃ' (হুস্থতা) বোধ করিলেন; এবং ঐ অবস্থায় মহজেদে 'তশ-রিফ্' আনিলেন।

নমাযের অবস্থায়ই, আবু হজরত (ছালঃ)-এর আগমানে, হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), এমামের স্থান তাঁহার জন্ত খালি করিয়া, স্বয়ং পশ্চাতে হটিয়া আসিবার উত্তোপ করিলে, তিনি তাঁহাকে ধরিয়া এমামের জায়গায় 'কায়েম' রাখিলেন, এবং তাঁহার 'এক্কেদার' (মোক্তাদি হইয়া) নমাজ শেষ করিলেন। হাদীছ ছহিহ্ বোখারী ■ ছহিহ্ মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, হজুর (ছালঃ) হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে একদা ফরমাইলেন, তুমি তোমার পিতা ও ভাতাকে ডাকাইয়া আনাও, আমি তোমার পিতার জন্ত খেলাফৎ-নামা লিখিয়া দি ; পরক্ষণেই ফরমাই-

লেন, ইহার আবশ্যকতা নাই, কেননা—মোসলমানগণ তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও আপনাদের ‘ছরদার’ (নেতা—খলিফা) মনোনীত করিবে না ; আর খোদা তা-লার ও ইহাই ইচ্ছা । এইরূপ ‘ছহীহীনে’ উল্লেখ আছে যে, আ হজরত (ছালঃ) একদা জীবিত অবস্থায় কাগজ, কলম ও দোয়াত আনিতে আদেশ করিলেন ; তখন পীড়ার প্রকোপ খুব বেশী ছিল ; হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, এ সময় আপনাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, আমাদের জন্য কোরআন মজীদই ‘কাকি’ (বথেষ্ট),—আপনি ইতিপূর্বে ইহা ফরমাইয়াছেন । কোনও কোনও ছাহাবাঃ (রাজিঃ) বলিলেন, তা নয়, হজুর (ছালঃ)-কে ‘মতওজ্জা’ (মনোযোগ আকর্ষণ) করা হউক, এবং জিজ্ঞাসা করা যাউক, আপনি কি লিখাইতে চাহিতেছেন । লোকদিগের কথার ‘আওরায়্’ আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট ‘না-গওরাব’ (বিরক্তি-জনক) বোধ হইল । লোকেরা আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজুর কি লিখাইতে চান, বলুন । তখন আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমরা আমাকে এই অবস্থায়ই থাকিতে দাও—যে অবস্থায় আমি এক্ষণে রহিয়াছি । আর তোমরা কণকালের ■■■ একটু বাহিরে যাও । এই সময় তাঁহার বেদনার ভয়ানক প্রকোপ ছিল, এবং তিনি তৎক্ষণ অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেছিলেন । এক্ষণেই হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) চাহিতেছিলেন যে, এই কষ্টজনক অবস্থায় তাঁহাকে কোনও প্রকার ‘তকলিফ্’ (ক্লেশ) দেওয়া না হয় । কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেই ভীষণ যাতনা-প্রদ বেদনার কিছু উপশম হইল, তিনি আবার সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; তাঁহারা উপস্থিত হইলে হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, “ যখন কোনও ‘ওফুদ’ (প্রতিনিধিদল—ডেপুটেশন) কোনও স্থান হইতে আসিবে, তখন তাহাদিগকে সম্ভাবহার দ্বারা ■ ‘এনাম’ (পুরস্কার) প্রদানে অবশ্যই সক্ষম করিবে । ‘মোশরেক’ (অংশীবাদী)

দিগকে ‘অজিবাতল আরব’ (আরব উপদ্বীপ) হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে । ওসামাঃ (রাজিঃ)-এর সেনাদলকে বুদ্ধার্থ শামের (সিরিয়ার) দিকে অবশ্য বরণানা করিয়া দিবে । আনুছার দিগের সঙ্গে ‘নেক-ছলুক’ (সহ্যবহার) করিবে । তাহার। যদি কোনও রূপ ফুল-ভ্রান্তি করে, তবে তাহাতে ‘দর-গোযর’ করিবে । সেদিকে লক্ষ্য করিবে না—সে বিষয় ধর্তব্য বলিয়া মনে করিবে না) । আপনাদের মধ্যে আবু- (রাজিঃ) অপেক্ষা আর কাহাকেও ‘আফ্জল’ (শ্রেষ্ঠ—উত্তম) বলিয়া মনে করিও না ।”

ইহার পরেই আবার বেদনা প্রবল আকার ধারণ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হজুর (ছালঃ) ‘বেহোশ্’ (অচেতন) হইয়া পড়িলেন । হজরত আলী (রাজিঃ), হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত ফজল বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই ব্যারামের অবস্থায় সর্বদা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত থাকিতেন । পাচটি কি ছয়টি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) হজরত (ছালঃ)-এর নিকটে ছিল । উহা হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর তহবিলে রাখিয়া দিয়াছিলেন । এই অবস্থায় তিনি তাহা “ ছদকা ” দিবার আদেশ করিলেন । উদ্দেশ্য, তিনি নিজের বলিয়া কোনও অর্থ-সম্পদ ছুনিয়াতে রাখিয়া না যান । হজুর (ছালঃ)-এর আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল ; পূর্বোক্ত ৫৬টি দীনার ফকীর ও ‘মহতাজ’ (মিছকিন—দীন-দরিদ্র-পরমুখপেক্ষী) লোকদিগের মধ্যে ছদকা স্বরূপ বিতরণ করা হইল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে তিনি এই বলিয়া ‘ওছিয়ত’ করিলেন, “ নমাজ ■ ‘মোতোয়্যারেকীন’ (আত্মীয়-স্বজন) সম্বন্ধে ‘গাফেল’ (অমনোযোগী) থাকিও না ।”

আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজুর (ছালঃ)-এর পীড়িত

অবস্থায় ক্রমায় ১৩ তের ওয়াক্তের নমাজে এমামতি করিয়াছিলেন। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল-আউওল সোমবার ফজরের নমাজের হজরত (ছালঃ) মাথায় পটি বাঁধিয়া মছজেদে গমন করিলেন, তখন হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) এমাম হইয়া নমাজ পড়াইতেছিলেন। আতও তিনি পশ্চাতে হটিয়া আসিতে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু আঁ হজরত (ছালঃ) হাত দিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন—অর্থাৎ যথা নিয়মে এমামতি করিয়া নমাজ পড়াইতে ইচ্ছিত করিলেন ; এবার তিনি জামাতের ডান দিকে বসিয়া নমাজ পড়িলেন। নমাজ পড়া শেষ হইলে আঁ হজরত (ছালঃ) উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে সংক্ষেপে কিছু ‘ওয়াজ’ করাইলেন। আহা ! ইহাই হজুর (ছালঃ)-এর শেষ মছজেদে আগমন ও শেষ উপদেশ দান ছিল। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ হইলে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) বলিলেন, আমি দেখিতেছি, খোদা তোমার ফজলে আপনি আজ ‘খোশ্’ ও ‘খোব্বরম’ (আনন্দিত ও স্তুতি সম্পন্ন) আছেন। ইহার পরেই হজুর (ছালঃ) মছজেদ হইতে ‘হজরার’ (গৃহে) প্রবেশ করিলেন ; এবং ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্বক শয়ন করিলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), আজ আঁ হজরত (ছালঃ)-কে একটু স্থান দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, স্মরণ্য তিনি এই অবসরে খীর গৃহে—পরিবার বর্গের নিকটে গমন করিলেন। ইত্যবসরে হজরত আবু-হুর রহমান-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), একখানি ‘তবু’ (আর্দ্র) ও নরম ‘মেছওয়াক’ (দাঁতন) হাতে লইয়া হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যেন কতকটা আগ্রহের সহিত সেই ‘মেছওয়াক’ খানি দেখিতে ছিলেন। হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ - আঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি মেছওয়াক খানি চাহিতেছেন। তিনি ভাতার হজ

হইতে মেছওয়াক খানি গ্রহণ পূর্বক উহা দাঁত দিয়া চিবাইয়া খুব নরম করিলেন, এবং হজুর (ছালঃ)-এর হাতে দিলেন। তিনি উহা স্বীয় পবিত্র [redacted] গ্রহণ পূর্বক যথানিয়মে দাঁতন করিলেন। পরে উহা রাখিয়া দিয়া স্বীয় 'ছের মবারক' (পবিত্র মস্তক), ওয়োল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্বক পবিত্র পা দুখানি বিস্তৃত (প্রসারিত) করিয়া দিলেন। হজুর (ছালঃ)-এর সম্মুখে পানী পূর্ণ একটি পেয়ালা ছিল, স্বীয় পবিত্র হস্ত ঐ পানীতে দিয়া (হাত খানি পানীতে ভিজাইয়া), পবিত্র 'চেহরা মবারকে' (বদন মণ্ডলে) ফিরাইতে (ভিজা হাতে মুছিতে) লাগিলেন, এবং 'ফরমাইলেন,' " আল্লাহ্মা আলী আলা ছাকরাতিল মওতে " (হে আল্লাহ, ছাকরাতিল মওতে হইতে আমাকে 'মদদ' (সাহায্য) কর। হজরত ওয়োল মুমেনিন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার চেহেরা মবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; অকস্মাৎ হজুর (ছালঃ)-এর পবিত্র চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। তাঁহার পবিত্র 'যবান-মবারকে' (মুখে) তখন কেবল " আবু রফিকুল আলা মিনাল জাহাতে " শব্দ উচ্চারিত হইতে ছিল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল-আউওল সোমবার, বেলা দ্বি-প্রহরের সময় হজুরের পবিত্র অম্বর আত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্বক 'জন্নতল-ফেরদওছে' (স্বর্গ-রাজ্যে বা আল্লাহ সদনে) চলিয়া গেলেন (ইয়ালিল্লাহে ওয়া ইয়া ইলায় হে রাযেউন)। সন্ধ্যা সন্ধ্যাই হজুর (ছালঃ)-এর পরিবার বর্গের মধ্যে, ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের মধ্যে এবং সমগ্র মদীনা নগরীতে শোকের প্রচণ্ড বাত্যা প্রবাহিত হইল। মোসলমানদিগের—মদীনা বাসিগণের মধ্যে সে দিনটা কেয়ামত বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। শোকাব্রতে সকলেই গণ্ডেশ [redacted] বক্ষঃস্থল প্রাবিত হইতে লাগিল। নর-নারী, বালক-বালিকা, প্রোড়, বৃদ্ধ, যুবক—সকলের হৃদয়েই বিষম শোক-শেল বিদ্ধ হইল। পরবর্তী দিবস—মঙ্গলবার প্রায় বেলা

দ্বি-প্রহরের সময় তাঁহার পবিত্র দফন কার্য সম্পন্ন হইল। হজুর (ছালঃ)-
 একে কাল-কালে (দেহত্যাগের সময়ে), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক
 (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ; আ হজরত (ছালঃ)-এর
 গৃহ ও মহজেদ নববী হইতে কিছু দূরবর্তী “ ছবখ্ ” নামক মহাজার,
 স্বীয় বাস-গৃহে—পরিবার বর্গের মধ্যে ছিলেন। হজরত ওমর ফারুক
 (রাজিঃ) এই ভীষণ সংবাদে এরূপ স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ■ অধৈর্য হইয়া
 পড়িলেন যে, তিনি বলিয়া ফেলিলেন, “ কতিপয় মোনাফেক ব্যক্তি
 এরূপ মনে করিতেছে যে, জনাব হজরত রহুল মকবুল (ছালঃ)
 একে কাল ফরমাইয়াছেন ; বাস্তবিক কিন্তু তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত
 হন নাই। তিনি আপন ‘রবের’ (প্রভুর) নিকট ঐ ভাবে গিয়া-
 ছেন—যে প্রকারে হজরত মুছা (আলাঃ) ‘কোহতুরে’ গিয়াছিলেন।
 তিনি অবশ্যই ফিরিয়া আসিবেন, এবং লোকদিগের হস্ত ■ পদ কাটিয়া
 ফেলিবেন। ” হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) শোকাতিশয্যে, উত্তেজনা
 বশে, হৃদয়ের ব্যাকুলতায় এইরূপ প্রলাপ পূর্ণ কথা বলিতে ছিলেন। আ
 হজরত (ছালঃ)-এর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইবার অব্যবহিত কাল
 পরেই হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) সেখানে আসিয়া পহুছিলেন,
 এবং সোজা-সুজি ‘হজরা মবারকে’ প্রবেশ করিলেন। তিনি হজরত
 (ছালঃ)-এর পবিত্র মস্তক, ওম্মোল-মুমেনি হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার
 (রাঃ—আঃ) ক্রোড় হইতে তুলিলেন এবং ‘গওর’ করিয়া (অভিনিবেশ
 সহকারে) দেখিয়া বলিলেন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর ‘কোরবান’
 হউক ; ‘বেশক’ (নিশ্চয়—নিঃসন্দেহ) আপনি ঐ মৃত্যুর ‘ষায়েকা চিখিয়াছেন
 (স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন)—যাহা—আল্লাহ তা-লা আপনার জন্য ‘মকরর’
 (নির্দিষ্ট) করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়াই “ ইয়া লিল্লাহে ওয়া
 ইয়া ইলায়হে রাযেউন ” পড়িতে পড়িতে ‘হজরা’ হইতে বাহির হইয়া

আসিলেন। বাহিরে আসিয়া ~~কিন্তু~~ ফারুক (রাজিঃ)-কে ধ্বন
উপরোক্ত ~~প্রমাণ~~ প্রমাণোক্তি বলিতে শুনিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন,
চূপ থাক। কিন্তু শোকে একান্ত অভিভূত, বাহু-জ্ঞান বিরহিত, হজরত
ওমর ফারুক (রাজিঃ) সে কথাই কোনও 'পরওয়া' করিলেন না। তদর্শনে
হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) তাঁহার নিকট হইতে একটু দূরে
গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চতুর্দিকে যে সকল লোক সমবেত হইয়া-
ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একাকী রাখিয়া আসিয়া হজরত ছিদ্দিক আকবর
(রাজিঃ)-কে বেটন করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সকলের হৃদয়ই তখন
শোকে একান্ত অভিভূত। তাঁহাদের উপর যেন বজ্রাঘাত হইয়াছে; কিংবা
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) 'হাম্দো'
ও 'ছানাঃ' (আল্লাহ্ তা-লার প্রশংসা ও রছুলের গুণ-কীর্তন) করিয়া
'ফরমাইলেন'—হে উপস্থিত জন-সংগ! (মোসলমান ভ্রাতৃগণ!)—
যদি তোমরা হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর উপাসনা (পূজা) করিতে,
তবে তিনি ত 'ফওত' হইয়া গিয়াছেন (দেহত্যাগ করিয়াছেন); আর
যদি সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লার পূজা ('বন্দেগী'—উপাসনা) করিতে,
তবে আল্লাহ্ তা-লা 'বেশক' (নিঃসন্দেহ) 'যেন্দা' (জীবিত) আছেন;
আর তাঁহার কখনও মৃত্যু হইবে না। অতঃপর তিনি কোরআন মজীদে
যে আয়াতটি পাঠ করিলেন, তাহা এই:—“ওমা মোহাম্মাদান ইন্না
রছুল কাদখালাং মিন্ কাব লিহির রোছুলে আফা ইম্ মাতা আও
কোতেলান্ কালাবতুম আলা আকাবেকুম ওমা ইয়ান্ কালেব আলা
আকে বায়হে ফালাই ইয়া দোর রোস্তাহা শায়্ আন ও ছায়াজ্ বিদ্বা
হোশ্ শাকেরীন।” ইহার মর্ম্মানুবাদ—“আর মোহাম্মদ (ছালঃ),
(সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহ্ ছিল না, কিন্তু (তাঁহার রছুল) ছিল। তাহার
পূর্বে আরও (বহু) রছুল গত হইয়া গিয়াছে” এরূপ ক্ষেত্রে

যদি মোহাম্মদ (ছালঃ) মৃত্যু-মুখে পতিত হন, কিংবা (কাহার ও হস্তে) 'শহীদ' হন (মারা যান), তবে কি তোমরা আপনাদের পুরাতন অবস্থা কাকেরের দিকে কিরিয়া যাইবে ? গেলে উহার দ্বারা আল্লাহ্ তোলা কোনও রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না । আর বাহারা ইসলামে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ; আল্লাহ্ তোলা, উহাদিগকে : তাহার প্রতিদান (প্রতিফল) প্রদান করিবেন । হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর মুখ হইতে এই পবিত্র আয়াত উচ্চারিত হইবামাত্র সমবেত জন-মণ্ডলী চমকিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারা যেন হঠাৎ স্থপ্তোখিত হইলেন, তাঁহাদের যেন চৈতন্যোদয় হইল । হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) পরে বলিয়াছেন যে, আমি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর পূর্বকথিত বাক্যে কিছুমাত্র 'অন্ধেপ' করি নাই—সেদিকে আমার মাত্রই মনোযোগ আকৃষ্ট নাই ; কিন্তু যখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, সে সময় আমার বোধ হইল, এই আয়াত যেন এখনই 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হইয়াছে । (আল্লাহর) ভয়ে আমার পদস্বয় কম্পিত হইতে লাগিল । তখন যেন আমার চমক ভাঙ্গিল ;—আমি বুঝিতে পারিলাম, সত্য সত্যই আঁ হজরত (ছালঃ) 'এন্তেকাল' (মৃত্যু) হইয়াছে ।

এখানে মহজেদ নববীতে এই সকল ব্যাপার ঘটতেছিল, ঐ সময়েই সংবাদ আসিল যে, "ছকিফাঃ-বহু-ছায়েদাঃ" নামক স্থানে আনুহারগণ সমবেত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা হজরত ছায়াদ-বিনু-য়েবাদাঃ (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্যেত করিতে (তাঁতাকে খলিফার পদে অভিষিক্ত করিতে) চান । আবার কোনও কোনও আনুহার বলিতেছেন, "মনা আমীর ওয়া মন কোরেশ আমীর"—(আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন, এবং কোরেশদিগের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন) । এই সংবাদ শুনিবামাত্র হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর

ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু-ওবায়দাঃ-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)—
 মাত্র একদল প্রধান প্রধান মহাজেরিন (রাজিঃ) এই ‘না-মোনাছের’
 (অপ্রীতিকর) অবস্থার পরিবর্তন এবং ‘রোখ্-খাম’ (গতিরোধ) করণার্থ
 “ ছকিফাঃ বহু-ছায়েদাঃ ” অভিযুখে ধাবিত হইলেন । আর হজরত আলী
 (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাস (রাজিঃ) ও হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ)
 এরকম হজরত ফজল-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ)-কে, আ হজরত (ছাল)-এর
 ‘ওছিয়ত’ (অস্তিম-নির্দেশ) অনুযায়ী, তাঁহার ‘তজ্জহিয্’ ও ‘তক্ফিন’
 (শ্রান ■ কাফনাদি শেষ অনুষ্ঠান) এর জন্য, হজুর (ছালঃ)-এর গৃহে
 রাখিয়া গেলেন । তাঁহারা চলিয়া গেলে, আ হজরত (ছালঃ)-এর গোছল
 দেওয়ান আরম্ভ হইল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাস
 (রাজিঃ) ও তাঁহার দুই পুত্র (হজরত ফজল-বিন্-আব্বাস ও
 আবদুল্লা বিন্-আব্বাস [রাজিঃ]) ‘করওট’ কিরাইতে (পার্শ্ব-পরিবর্তন
 করাইতে) ও গাত্র মার্জনা দি করাইতে, আর হজরত ওসামাঃ [রাজিঃ]
 পানী-চলিয়া দিতে লাগিলেন । যখন গোছল দেওয়াইয়া তাঁহার ‘তজ্জহিয্’
 কার্য সমাধা করিলেন, তখন উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে
 এই বলিয়া ‘এখ্-তেলাফ্’ (মতভেদ) উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে কোথায়
 দফন (কবরস্থ) করা যায় । কেহ কেহ বলিতে ছিলেন, মহজেদেই তাঁহাকে
 দফন করা হউক ; কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, তাঁহার গৃহ বা ছজরায়
 (অর্থাৎ হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাজি আল্লাহ আনহার ঘরে—যে স্থানে
 তিনি একে কাল ফরমাইয়াছিলেন) ই হজুর (ছালঃ)-এর দফন কার্য সমাধা
 করা হউক । হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) “ ছকিফাঃ বনি-ছায়েদাঃ ”
 হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি হজরত বহুলোজ্জাহ্ (ছালঃ)-এর
 মুখে শুনিয়াছি, প্রত্যেক নবী (বহুল—পরগণ্যর)-কে ঐ স্থানে দফন
 করা হইয়াছে—যেখানে তাঁহারা ‘এন্তেকাল’ (দেহত্যাগ) করিয়াছেন ।

উপস্থিত ছাহাবাঃ গণ এই কথা শুনিবামাত্র হজুর (ছালঃ)-এর সেই শব্দে
জুলিয়া গেলেন - যে শব্দটির তিনি শেষ বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।
■ সবেই ঐ স্থানে কবর খনন করা ■ হইল । ‘বগলী’ কবর
(কবরের ভিতর হইতে পার্শ্ব দেশ খনন করিয়া শব্দ সেই স্থানে রাখা হয়)
‘খোদা’ (খনন করা) হইয়াছিল । যখন কবর খনন কার্য সমাধা হইল,
তখন জানাযার নমাজ পড়া আরম্ভ হইয়া গেল । প্রথমতঃ পুরুষগণ, পরে
মহিলাগণ, অবশেষে বালকগণ জানাযার নমাজ আদায় করিলেন ; কেহ
কাহারও এমামতি করিলেন না । হজুরের (ছালঃ) পীড়ার আধিক্য,
পরে পরলোক গমন সংবাদ শ্রবণ মাত্র হজরত ওসামাঃ (রাজিঃ) ও তাহার
বিশাল সেনাদল মদীনা চলিয়া আসিয়াছিলেন ; আর পবিত্র রণ-পতাকা
■ হজরত (ছালঃ)-এর গৃহের দ্বারদেশে খাড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ।

জানাযার নমাজ হজরত আরেশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) হজরার—
যেখানে ঐ হজরত (ছালঃ) ‘এন্তেকাল করমাইয়া ছিলেন’, সেই স্থানেই
পড়া হইয়াছিল ; একত্র একবারে কিংবা দুই চারি বারে এই জানাযার নমাজ
পড়া শেষ হয় নাই, বরং বহুবারে—বহু জমাতের জানাযার নমাজ পড়া
হইয়াছিল । হজরার বেশী স্থান ছিল না ; অথচ মদীনা তৈয়বার তখন
লোকসংখ্যাও বহু সহস্র ছিল ; আর পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক প্রভৃতি
সকলেই জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন ; হুতরাং কতবারে—কত সময়
মধ্যে এই জানাযার নমাজ পড়ার কার্য সমাধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই
বুঝা যাইতে পারে । এই জানাযার নমাজ পড়ার কার্য পরদিন (মঙ্গলবার)
পর্যন্ত জারী থাকা সম্পূর্ণ সম্ভবপর । কম পক্ষে ২৫ হাজার লোক জানাযার
নমাজ পড়িলে, গড়ে ১০০ করিয়া লোক ২৫০ বারে কিংবা তাহার কিছু কম
বা বেশী বারে এই জানাযার নমাজ আদায় করিয়া থাকিবেন । ■ মিনিটে
এক এক জমাত শেষ হইলেও কেবলমাত্র জানাযার নমাজ পড়িতে ১৫১৫

ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হওয়া সম্পূর্ণ লক্ষ্যপর। সোমবার দিন বেলা দুই সময় আ হজরত (ছালঃ) এসে কাল ফরমাইয়াছিলেন ; মঙ্গলবার প্রায় ঐরূপ সময়ে দফন কার্য সমাধা হয় ; সুতরাং এসে কাল করিবার ঘণ্টা পরে দফন হওয়ার বিষয় বিশ্বস্ত ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। হয় ত সোমবার দিবাগত রাত্রি হইতে মঙ্গলবার বেলা পর্যন্ত লোক জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন।

আঁ। (ছালঃ)-এর “হলিয়া মবারক”

অর্থঃ আকৃতি এবং শারীরিক গঠন।

আঁ হজরত (ছালঃ) না ‘তবিলল-কামৎ’ (দীর্ঘাকার) না ‘পস্তু-কদ’ (খর্বাকার—বেঁটে) ছিলেন ; তাঁহার কদ “মিয়ানা” (মধ্যমাকার) ছিল ; কিন্তু বিপুল জন-সংখ্যার মধ্যে দাঁড়াইলে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ‘বালা’ (উচ্চ) বলিয়া বোধ হইত। শরীরের বর্ণ ‘গন্দমী’ (গোধূমের রং বিশিষ্ট), কিন্তু তাহা ‘ছোরখী মারেল’ (লাল বর্ণ আভা বিশিষ্ট) এবং চাকচিক্যশালী ছিল। ‘ছের-মবারক’ (পবিত্র মস্তক) বৃহৎ এবং দাড়ি ঘন সন্নিবিষ্ট ও তরপুর ছিল। কেশ রাজি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—কিন্তু কিঞ্চিৎ ‘পেঁচিদা’ (তরঙ্গ বিশিষ্ট বা ঢেউ তোলা) ; অক্ষিধ্বজ গোলাকার, বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, ‘পোর-রওনক’ (সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট) ছিল, এবং কেশগুচ্ছ কাণের ‘লো’ (নতি) পর্যন্ত বিস্তারিত। কখন কখন দেশ পর্যন্ত বিলম্বিত হইত ; আবার কখনও বা কাণের ‘নতি’ (নতি) হইতে উপর পর্যন্তও থাকিত। ভুরুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত, একটি ‘বারিক’ (সর) ‘রগ’ (শিরা) উভয় ভুরু ঠিক মধ্যস্থলে দৃষ্ট হইত। আঁ (ছালঃ) কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত

হইতেন, তখন এই শিরাতী স্পষ্ট হইয়া উঠিত । চক্ষের খেতাংশের মধ্যে ‘ছোবুখ’ (লালবর্ণ) ডোরা বিরাজিত ছিল । ‘বোখে-ছারে’ (গণ্ডায়) মাংসল ও কোমল ছিল । মস্তকে তেল এবং চক্ষে ‘ছোরমাঃ’ (কুন্দা) ব্যবহার করিতেন । ■■■ সমূহ মুক্তার স্তায় ‘ছফেদ’, সাদা ও ‘চমকমার’ (চক্চকে—উজ্জল) ছিল । মুচ্চিক হাসি ব্যতীত তাঁহার পবিত্র মুখে উচ্চহাস্য কখনও প্রকটিত হইত না,—অর্থাৎ তিনি কখনও খল খল করিয়া হাসিতেন না । কিন্তু তাঁহাকে সর্বদাই প্রসন্ন বদন (প্রফুল্ল আনন) দৃষ্ট হইত । হজুর (ছালঃ)-এর ‘কালাম শিরিন’ (বাক্য সুসধুর), এবং বক্তৃতা ■■■ প্রাণম্পর্শী ছিল । পক্ষান্তরে আদর্শ সাহসী আদর্শ বীর, আদর্শ রাজনীতিক পুরুষ এবং সর্বপ্রকার সমুদ্রে বিভূষিত আদর্শ মহুয্য ছিলেন । ■■■ (ছালঃ)-এর উভয় শানের (পৃষ্ঠদেশস্থ বাহু-যুলের) ঠিক মধ্যস্থলে ‘মোহর-নবুয়ত’ বিরাজমান ছিল । তিনি নিজের কাজকর্ম অহস্তেই সম্পাদন করিতেন ; দাস-দাসী এবং শিষ্য-সেবক থাকিলেও, তাঁহাদিগকে নিজের কোনও কাজের জন্য ‘হুকুম’ (আদেশ) দিতেন না । তিনি কোনও প্রার্থীর ‘ছওয়াল’ (প্রার্থনা) ‘রদ’ করিতেন না (অপূর্ণ রাখিতেন না) । কোনও ভিক্ষা-প্রার্থী, তাঁহার নিকট হইতে কখনও যিক্ত :হস্তে ফিরিয়া যায় নাই ।

হজরত এব্রাহিম (যিনি মোস্লেম-মাতা-গারিয়া কব্‌তিয়া [রাঃ—আঃ]-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) ব্যতীত, আর সকল পুত্র কন্যাই মহামাননীয়া মোস্লেম মাতা হজরত :খদিজাতুল কোব্রার (রা—আঃ) গর্ভে জন্মিয়াছিলেন । সর্ব প্রথমে হজরত কাছেম জন্মগ্রহণ করেন ; চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মক্কাই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । তাঁহার নামানুসারে আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘কুনিয়তে’ “ আবুল কাছেম ” হইয়াছে । ইহার পর হজরত য়ুনব (রাঃ—আঃ), তৎপর হজরত

আবদুল্লাহ—যাহার ‘লকব’ (উপাধী) তৈয়ব ও তাহের ছিল—জন্মগ্রহণ করেন । **আবদুল্লাহ** আতি শৈশবেই প্রাণত্যাগ করেন । অতঃপর হজরত রুকিয়া (রাঃ—আঃ) তৎপর হজরত ওম্মে-কুলছম (রাঃ—আঃ) সর্বশেষে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করেন । হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ব্যতীত, হজুর (ছালঃ)-এর আর সকল (হজরত আব্রাহিম (উর) সকল সন্তানই তাঁহার পরগম্বরী লাভের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । **আ** (ছালঃ)-এর পুত্রগণ শৈশবেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কন্তাগণ সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । সকলেরই শাদা (বিবাহ) হইয়াছিল । কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ব্যতীত, আর কাহারও ‘নছল’ চলে নাই, অর্থাৎ আর কাহারও বংশ বর্তমান থাকে নাই । **আ** খাতুনে জন্মত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) গর্ভে ৩টি পুত্র-বড় ও ২টি **আ** জন্মিয়াছিলেন ; কনিষ্ঠ পুত্র মহছেন শৈশবকালেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন ; প্রথম পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও দ্বিতীয় পুত্র হজরত এমাম হোছাইন (রাজিঃ)-এর বংশধরগণই **আ** হজরত (ছালঃ)-এর বংশ-তরু জীবিত রাখিয়াছেন । কারবালার ভীষণ সংগ্রামে এমাম বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলে, পবিত্র সৈয়দ বংশ পৃথিবীতে আরও অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিত । হজরত বড় এমাম হাছন (রাজিঃ) এর পুত্র সৈয়দ হাছান মোসরা (রাজিঃ) ও কনিষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) হাছেবের পুত্র হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) হইতে জগতে, খাঁটি ছৈয়দের খান্দান চলিয়া আসিতেছে । আবার হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অন্যান্য পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের বংশধরগণ “উলভী ছৈয়দ” নামে জগতে বিরাজ করিতেছেন । কিন্তু এক্ষণে ছৈয়দদিগের “কুরছি নামার” অভাবে, অনেক খান্দানেরই প্রকৃত বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়

না। সর্ব শ্রেণীর মীরগণই আজকাল ছৈয়দ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিমা-
থাকেন ।

অ। হজরত (ছালঃ) সম্বন্ধে কতিপয়

জ্ঞাতব্য বিষয় ।

আ হজরত (ছালঃ)-এর জীবন-চরিত পাঠ করিলে জানিতে পারা
যায় যে, তিনি মাতৃ-গর্ভেই 'এতিম' (পিতৃহীন) হইয়াছিলেন । তাঁহার
জীবন 'এতিম' (অনাথ) ও 'বেকছি' (নিরাশ্রয়) অবস্থায় ~~হইয়া~~ হইয়া-
ছিল । কিন্তু তিনি যখন পরলোক-গমন করেন, তখন সমগ্র আরবদেশের
'শাহানশাহ্' (সম্রাট্) ছিলেন । আরবের এমন কোনও ছুবা, কোনও
প্রদেশ এবং কোনও জনপদ এমন ছিল না, যেখানে তাঁহার 'মিসরী হুকুমৎ'
(ধর্ম-বিষয়ক প্রাধান্ত বা ধর্ম-বিষয়ক রাজত্ব) স্থাপিত হইয়াছিল না ।
আরবের শত শত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এমন কোনও জাতি বা সম্প্রদায়
ছিল না—যাহারা সেই সময় পবিত্র ইসলাম ধর্মের সিক্ত শীতলচ্ছায়ার
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন না । উত্তরে সিরিয়া ■ এরাকের সীমান্ত ■
হইতে দক্ষিণে আরব সাগর, আর পূর্বে পারস্ত ■ ওমান উপসাগর হইতে
পশ্চিমে 'বাহরে আছওয়ান' (রেড্-সী বা লোহিত সাগর) এবং মিহরের
সীমান্ত-রেখা পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামের জয়ডঙ্কা বাজিয়াছিল—প্রাধান্ত ঘোষিত
হইয়াছিল ; লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের আত্মা ইসলামের সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল ।
ইসলামের পবিত্র জ্যোতিঃতে উপরোক্ত বিশাল ভূভাগ সম্পূর্ণরূপে জ্যোতি-
মাণ হইয়াছিল ; এমন কি, লোহিত সাগর পার হইয়া আফ্রিকার আবি-
শিনিয়া বা হাবেশ রাজ্যেও ইসলামের পবিত্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল ।

আরব দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী (পৌত্তলিক, যিহুদী, খৃষ্টীয়ান) ■ বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া একটা মহাবল পরাক্রান্ত মহাজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল । যে আরব জাতি শত শত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও শত শত বিভিন্ন শাখায় (উপজাতিতে) বিভক্ত ছিল ; তাঁহারা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া ইসলামের পবিত্র পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । আরবের সর্বত্রই পবিত্র 'তওহিদ' ■ (একেশ্বরবাদ ধর্মের) জয় নিনাদ শ্রুত ও ■ বিধোষিত হইতে ছিল ।

আ হজরত (ছালঃ)-এর জীবনে এরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল সত্য ; একজন নিরাশ্রয় ■ নিঃসহায় পুরুষ কেবলমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই আদেশ ও ইচ্ছাক্রমে, সর্ব প্রকার ভীষণ বিপদ আপদের ■ মুকিয়া, জীবনের সারাক্ষণে উন্নতির সর্বোচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন ; নিতান্ত দীন-দরিদ্র ও অসহায় অবস্থা হইতে একজন মহাশক্তি শালী সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ; দীনি উন্নতির কথা—পরগণ্ডারী মহা গৌরবাবিত পদ-মর্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও, তিনি পার্থিব জীবনেও অসাধারণ এবং অতুলনীয় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । একদিন বাহারা তাঁহার প্রাণবধ করিতে সমুৎসুক ছিলেন, হুনিয়া হইতে তাঁহার অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে ■ ছিলেন, আজ তাঁহারা একান্ত অহুগত, একান্ত আত্মবহ দাসের ভায় তাঁহার আদেশ পালনে তৎপরে হইয়াছিলেন । আ হজরত (ছালঃ) সৌভাগ্যের এরূপ উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও অতি 'সাদা-সিদ্দে' ভাবেই জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন । বিলাসিতা ও আড়ম্বর-প্রিয়তার নাম গন্ধ ও তাঁহার মধ্যে ছিল না । যবের মোটা কুটি ও খেজুর-মাহার এবং সাধারণ মোটা বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ পূর্বক আল্লাহ্ তালার 'শোকর-গোজার' হইতেন । পরিবার বর্গের মধ্যেও

কোনও রূপ বিলাসিতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না । যে অর্থ তাঁহার হাতে আসিত, তাঁহার অধিকাংশই (প্রায় সমস্তই) দীন-দরিদ্রের দুঃখ-বিমোচনে পর্য্যবসিত হইত । বিপুল " বরতুল-মাণ " তহবিল হইতে তিনি অতি সামান্য মাত্র অংশ গ্রাসাচ্ছাদনের ■■■ গ্রহণ করিতেন, দান-খায়রাত করিয়া উহার অল্পমাত্র অংশ বাহা অবশিষ্ট থাকিত, তদ্বারাই কষ্টে-শ্রুটে তাঁহার ■■■ তদীয় পরিবারবর্গের জীবন-মাত্রা নির্বাহ হইত । তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিলেন না ; কিন্তু তিনি সে অবস্থায় ■■■ কখন আর্থিক অভাব অনুভব করেন নাই । " শোকর " ও " ছবর " তাঁহার নিত্য সহচর ছিল । মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা—তাহাদের ইহকাল পরকালের মঙ্গল কামনা, মানুষকে সৃষ্টিকর্তা আজ্ঞাহ তা-লার আদেশ পালনে ■■■■■ ইত্যাদি কার্য্যেই তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন । 'তওহীদের' বাণী শুনাইতে তিনি ছুনিয়ায় আসিয়াছিলেন ; সেই বাণী তিনি ■■■■■ নির্যোষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং স্বীয় জীবনেই তাহা সাফল্য-মণ্ডিত দেখিয়া গিয়াছেন—বাহা অপর কোনও পরগণার ভাগ্যে ঘটে নাই । প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সহীহ্-বোখারীতে বর্ণিত আছে, মোছলেম-মাতা ■■■■■ আয়েশা হিন্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, আ হজরত (ছালঃ) কখনও 'ছুনিয়াবী' (পার্থিব—সাংসারিক) কাজ কর্ণে ■■■■■ উপর আপনায় 'কাজলত' দেন নাই—অর্থাৎ ক্রীতদাস, ভৃত্য বা অচ্যুত শিষ্য-সেবকগণ তাঁহার ব্যক্তিগত কাজ কর্ণ করিয়া দিতে বাধ্য, একথা তিনি কখনও মনে স্থান দান করেন নাই । বরং তোমরা যেমন নিজ নিজ গৃহে আপনাপন কাজ কর্ণ স্বহস্তে সম্পাদন কর, তিনিও ঠিক সেইরূপই করিতেন । তিনি নিজেই নিজের 'বকরী' (ছাগী) গুলির দুগ্ধ দোহন করিতেন, আর নিজের 'খিনায়া' (পাছকা—জুতা) নিজেই সেলাই করিয়া লইতেন । মদীনা-মহুওয়ার ■■■■■ নিশ্চিত হইতেছিল, সেই ■■■■■ তিনি মহজেদ-নির্মাণ

সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার কার্যেই আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এমন কি, 'মামুলী' (সাধারণ) 'মজুর' (কুলি) দিগের দ্বারা তিনিও ইষ্টকগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। 'জম্ম আখরাব'এ (খন্দক অর্থাৎ পরিবার যুদ্ধে) তিনিও পরিখা খননকারীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিখা খনন কার্য সম্পাদন করিয়া ছিলেন। ঐ কার্যে তিনি নিজে মাটি উঠাইতেন, এবং প্রস্তর ভগ্ন করিতেন। তাঁহার খাদ্য সাধারণ বগ (যব)-এর রুটি ছিল। তাঁহার গৃহে আটা চালিবার জন্ত চালুনী পর্য্যন্ত ছিল না; ফুংকার দিয়া আটার ভূমি উড়াইয়া দেওয়া হইত। কখনও কখনও ক্রমাগত ২১৩ দিন পর্য্যন্ত এই ■■■ এর রুটি ■■■ তাঁহার এবং তদীয় পরিবার বর্গের পেট ভরিয়া মিলিত না। এমনও অনেক সময় পিয়াছে, একমাস পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে উনান জলে নাই। কেবলমাত্র পানীও গৃহে অল্প বিস্তর খেজুর বাহা 'মওজুদ' থাকিত, তদ্বারাই অঠরানল নির্বাপিত করিতেন। ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ-আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার গৃহে আ হজরত (হালঃ)-এর কিসের বিছানা ছিল? তিনি বলিলেন, উধুরির বিছানা হইত—যাহার তিতর খেজুরের ছাল পরিপূর্ণ থাকিত। এই প্রশ্ন হজরত হাক্‌সা (রাঃ—আঃ) কেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; তিনি করমাইয়াছিলেন, একখানি টাটের (চটের) টুকরা ছিল, যাহা আমি তাঁহার ■■■ দুই ভাঁজ করিয়া লইতাম। একরাত্রে আমি মনে করিলাম, উহা যদি চার ভাঁজ করিয়া দি, ■■■ হইলে তিনি শুইয়া একটু আরাম পাইবেন। তদনুসারে চটখানি ■■■ ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হইল। যখন 'ছোবেহ' (রাত্রি প্রভাত) হইল, তখন আ হজরত (হালঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গত রাত্রে আমার জন্ত কি বিছাইয়া দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আপনার সেই চটখানিই ছিল, কেবলমাত্র উহা ২ ভাঁজ স্থলে ৪ ভাঁজ করিয়া দিয়াছিলাম; উদ্বেষ্ট, যাহাতে আপনি শুইয়া একটু আরাম পান। ■■■ (হালঃ)

করমাইলেন—না, উহার [] হই তাঁজ ছিল, তুমি তাহাই করিয়া দাও;
 [] তাঁজ [] দরুণ উহা আমাকে রাজির নমাজ (শেষ-রাজির উপাসনা—
 সম্ভবতঃ তাহাজ্জদের নমাজ) হইতে ‘বাব্’ রাখিয়াছে (বাধা জন্মাইয়াছে)—
 অর্থাৎ চটখানি ৪ তাঁজ করাতে আরামে নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, এজন্য শেষ
 রাজির উপাসনার জন্য বখা [] আগরিত হইতে পারিয়াছিলেন না।
 ‘ওকাতের’ (পরলোক গমনের) পূর্বে তিনি করমাইরাছিলেন, আমার
 ‘ওরছা’ (উত্তরাধিকারী) দিগকে ‘তরকা’ (উত্তরাধিকারী-মুদ্রে []
 বিষয় প্রাপ্ত) তে নগদ যেন কিছু দেওয়া না হয়। এক যিহদীর নিকট
 তাঁহার ‘যরাঃ’ (বর্ষ) জিণ দরহমে বন্ধক ছিল; হজুর (ছালঃ)-এর
 নিকট এ পরিমাণ নগদ টাকা ছিল না যে, সেই বন্ধকী বর্ষটি টাকা দিয়া
 ছাড়াইয়া লইতে পারেন। ঈ। হজরত (ছালঃ) ‘তরকার’ (ত্যজ্য-
 সম্পত্তির) মধ্যে স্বীয় হাতিয়ার (যুদ্ধাস্ত্র), একটা ‘খচ্চর’ (অশতর)
 [] পরিমাণ ‘যমিন’ (ভূ-সম্পত্তি—সম্ভবতঃ ‘বাগে-কদক’) [] ছাড়াইয়া
 গিয়াছিলেন। উহার সম্বন্ধে [] ‘ওছিরত’ (অন্তিম নির্দেশ) করিয়া গিয়া-
 ছিলেন যে, (ভূ-সম্পত্তি ব্যতীত) ঐ সকল জিনিস ‘খায়রাত’ করিয়া দিও।
 [] তিনি পার্থিব ধনৈশ্বর্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন নাই,
 এবং উহাতে একেবারেই লিপ্ত হন নাই। হজরত আনস্ (রাজিঃ) বর্ণনা
 করিয়াছেন যে, যখন আমি ঈ। [] (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত
 হইরাছিলাম, তখন আমার বয়স [] বৎসর মাত্র ছিল। তৎপরে দশ বৎসর
 কাল বরাবর হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে ‘হাজের’ (উপস্থিত) ছিলাম।
 এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি আমাকে স্বীয় পরিচর্যা সম্বন্ধে কখন একটা
 [] বলেন নাই, কিংবা ইহাও বলেন নাই যে, তুমি এই কার্য কেন
 করিলে, বা এই কার্য কেন করিলে না? সারা জীবনে তাঁহার পবিত্র মুখ
 হইতে কোনও ‘কোন্-কালার’ (অশ্লীল বাক্য) বা অন্তার অসঙ্গত কথা

প্রকাশ ~~নাই~~ নাই। প্রসিদ্ধ হাদীসবিধ পণ্ডিত ~~আবু-হোয়েরাঃ~~ আবু-হোয়েরাঃ (রাজিঃ) করমাইয়াছেন, ~~এক~~ সময় লোকেরা হজুর (ছালঃ)-কে বলিলেন, আপনি 'মোশ্‌রেকীন' (অংশীবাদী—পৌত্তলিক) দিগের ~~আল্লাহ্~~ আল্লাহ্, তাঁলার দরবারে 'বদ-দোওয়া' (অভিসম্পাত) করুন। ~~আ~~ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, আমি 'লান্নত' (অভিসম্পাত) করিবার জন্য আসি নাই; বরং আল্লাহ্, তাঁলা আমাকে 'রহমত' (দয়া-প্রদর্শন) জন্য পাঠাইয়াছেন। হজরত আদেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) করমাইয়াছেন, ~~আ~~ হজরত (ছালঃ) এর 'তবিরতে' 'বেহদগী' (বুখা কার্য-কলাপের প্রবৃত্তি) এবং 'লগোরিত' (মিথ্যা কথা-বার্তার অস্তিত্ব) আরো ছিল না। জীবনে তিনি এ সকল কখনও করেন নাই। তিনি যে কোনও 'বাচ্চা' (ছোট ছোট বালক-বালিকা)-কে স্নেহের সহিত স্বীয় কোড়ে তুলিয়া লইতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। রোগীদিগের 'খবরগিরী' (তথ্য গ্রহণ) ~~তিনি~~ তিনি শহরের দূরবর্তী মহান্না সমূহে ~~গমন~~ গমন করিতেন—সাধ্যানুসারে রোগীদিগের ঔষধ-পথ্যাদির যোগাড় করিয়া দিতেন; তাহাদিগকে সাহস ও সাহসনা প্রদান করিতেন, তাহাদিগকে পরম করুণাময় খোদা তাঁলার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি ঈহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে যাইতেন, প্রথমেই তাঁহাকে 'ছালাম' (অভিবাদন) করিতেন। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই যে, তাঁহার সঙ্গে কেহ 'মোছাফাঃ' (করমর্দন) করিয়াছেন, আর সেই ব্যক্তি ~~পরিভ্রমণ~~ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে, তিনি নিজের হাত 'খি'চিয়া' (টানিয়া) লইয়াছেন; অর্থাৎ 'মোছাফাঃ'কারী ব্যক্তি যে পর্যন্ত হজুর (ছালঃ)-এর হাত না ছাড়িতেন, সে পর্যন্ত তিনি স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইতেন না। হজুর (ছালঃ) সম্মান প্রদর্শন পূর্বক স্বীয় 'ছাহাবাঃ' (শিষ্য) দিগের নাম সাধারণ ভাবে উচ্চারণ করিতেন না; বরং কোনও 'হুনিরত' (উপাধি) দ্বারা সম্বোধন করিতেন।

আর 'মোহাক্কত-আমেষ্' (স্নেহভাব-ব্যঞ্জক) 'পহম্বিদাঃ' (মনঃপুত)
 ■■■■■ দ্বারা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন। হজর (ছালঃ) কাহারও
 'কেতারে-কালাম' (কথা বলিবার সময় তাঁহার [কথকের] কথা শেষ
 হইবার পূর্বে নিজে কথা বলা বা তাঁহার কথার স্রোত বন্ধ করা) করিতেন
 না। 'আলুবক্তা' (অবশ্য) যদি কেহ 'নাযেবাঃ' (অন্তায়—অসম্বদ্ধ)
 কথা বলিত, তবে তাহাকে ঐরূপ কথা বলিতে নিষেধ করিতেন; কিংবা
 এই ক্ষণ দণ্ডায়মান হইতেন—যাহাতে ঐ ব্যক্তি নিজেই বাক্যস্রোত
 বন্ধ করে। হজরত আবদুল্লা-বিন্-হারেছ (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,
 আমি কোনও ব্যক্তিকেই হজরত রচুলে খোদা (ছালঃ) হইতে
 (বা তাঁহার দ্বার) 'যেরাদাঃ খোশ-খলুক' (অধিকতর নম্র গুণ
 বিশিষ্ট) দেখি নাই। আ হজরত (ছালঃ)-এর উক্তি এই যে, ঐ
 ব্যক্তি 'পাহালওয়ান' (মল্ল বা বীরপুরুষ নহে)—যে ব্যক্তি লোককে
 'পাহড়ায়' (ভূপাতিত করে)—বরং 'পাহালওয়ান' (মল্ল বা কুস্তিগীর) ঐ
 ব্যক্তি, যে ব্যক্তি 'গোখার' (ক্রোধের) সময় স্বীয় 'নক্ছ' এর উপর কর্তৃত্ব
 করিতে পারে। হজরত আনছ (রাজিঃ) এর একটি বর্ণনা এই যে,
 হজর (ছালঃ) 'আসজয়রাছ' ছিলেন। একেবারের একটি ঘটনা এই যে,
 একদা মদীনা বাসিগণ একাএক বিষম ঘাব্‌রাইয়া উঠিলেন—যেমন কোনও
 'দোয়গ' (শত্রু) দল অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এইরূপ একটা 'শোর-গোল'
 উঠিল। নগরের অধিবাসিগণ যে দিক্ হইতে 'শোর-গোল' উঠিতে
 ছিল, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন; পশ্চিমধ্যে দেখিতে
 পাইলেন, ■■■■■ (ছালঃ) সেই দিক্ হইতে চলিয়া আসিতেছেন।
 হজর (ছালঃ) 'শোর-গোল' শুনিবামাত্র অশ্বের খালি পৃষ্ঠে আরোহণ
 পূর্বক ঐ দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ■■■■■ লোকদিগকে
 বলিলেন, তোমরা ঘাব্‌রাইও না, কোনও আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই।

বরা-বিন্-আযবের বরান এই বে, হোনাযনের যুদ্ধের দিন রাত্রিকালে অত্যন্ত ভাবে আক্রান্ত হইয়া মোহলমানগণ পলায়ন করিতেছিলেন : ঐ সময় আ হজরত (ছালঃ) এই ‘রজব্’ পড়িতেছিলেন “ আনা-আন্-নবী লা কব্-র আনা এব্-নে আবদুল মোস্তালেব । ” ঐ দিবস হজরত (ছালঃ) অপেক্ষা ‘যেরাদাঃ’ (খ্রেষ্ট) বাহাদুর ■ ‘শোবাঃ’ (অসাধারণ বীরপুরুষ) আর কাছাকেও দৃষ্ট ■ নাই । যখন যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া-ছিল, ভীষণভাবে শোণিতপাত হইতেছিল, বহু লোক হত এবং আহত হইতেছিল, তখন আমরা হজুর (ছালঃ)-এর ‘পানাঃ (আশ্রয়) অনুসন্ধান করিতেছিলাম । আমাদেরকে সর্বাপেক্ষা খ্রেষ্ট বীরপুরুষ তাঁহাকেই মনে করা হইতেছিল—এই ভীষণ সঙ্কট কালে বিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘বরাবর’ (নিকটে) স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন । ■

আনছ (রাজিঃ) ‘বরান’ করিয়াছেন, একদা আমি হজুর (ছালঃ)-এর ‘হামরেকাব’ (পাশাপাশি) যাইতেছিলাম, তখন একখানি মোটা কেনার (পুরু-পাড়) ওয়াল চাদর তাঁহার গায় ছিল । একজন ‘বদবী’ (বদু—বাযাবর) অকস্মাৎ তাঁহার সেই চাদরের কেনার (এক প্রান্ত) ধরিয়া এমন জোরে ঝটকা (হেঁচকা টান) দিল যে, চাদরের সেই মোটা কেনারের রক্তক্ষানীতে (ঘর্ষণ বা ঘসায়), ‘হজুর’ (ছালঃ)-এর ‘গরদানে’ (বাড়ে) দাগ বসিয়া গেল । তিনি যখন তাহার দিকে ‘মতওয়জ্’ হইলেন (তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন), তখন সে বলিল, হে (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) ! আমার যে মাল তোমার নিকট আছে, আমার উষ্ট্র দুইটীর উপর ■ তাহার কিয়দংশ ‘লাদ’ (তুলিয়া দাও) । কেননা, ঐ মাল হইতে তুমি আমাকে বাহা দিবে, তাহা তোমার কিংবা আমার বাপের মাল নহে । এইরূপ অশিষ্ট জনক রুচ বাক্য শুনিয়া তিনি ■ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা গুণে চুপ হইয়া থাকিলেন । একটু পরে ঐ বদবীকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন, 'বেশক' (নিঃশব্দেহ) মাল ত খোদারই বটে, আমি
 বান্দাঃ ; কিন্তু তুমি আমাকে একথা বলিয়া দাও যে, তুমি আমার
 প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিলে, আমিও কি তোমার সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার
 করিব ? সে বলিল, না, তা নয়। হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, তা নয়
 কেন ? সে বলিল, তুমি 'বুর্হাইর' (মন্দের) পরিবর্তে মন্দ করনা। এই
 কথা শুনিয়া তিনি মুচ্কি হাসি হাসিয়া বলিলেন, উহার এক উষ্ট্রে জড়
 (যব) আর এক উষ্ট্রে খেজুর বোঝাই করিয়া দাও। একদা যমদ বিন্দু
 হরনাঃ নামক রিহদী (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে) হজরত (ছালঃ)
 নিকট তাঁহার কজ্জা টাকার (বাহা হজুর [ছালঃ] ধার লইয়া ছিলেন),
 'তাকাদার' আসিল,—সে বড়ই 'বক্বক' করিতে লাগিল, এবং
 অবশেষে বলিল, তোমরা—বনি আবদুল মোস্তালেব বড়ই 'নাদেহেন্দাঃ'
 (খণ শোধ করিতে অপারক বা অনিচ্ছুক), এবং 'ওয়ারাদার খেলাক'কারী
 (প্রতিশ্রুতি পালনে অনভ্যস্ত)। উহার এইরূপ অনিষ্ট পূর্ণ বাক্য
 (ছালঃ) ত নীরবে শুনিতে ছিলেন ; কিন্তু হজরত ওমর (রাজিঃ)
 তাহা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, তিনি রিহদী যমদকে ধমক দিয়া
 ঐরূপ অনিষ্টোচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন ; তখন আ হজরত
 (ছালঃ), হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে বলিলেন, হে ওমর ! তুমি আমাদের
 উভয়ের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার কর নাই, বাহা করা তোমার পক্ষে উচিত
 ছিল ; তোমার কর্তব্য এই ছিল যে, তুমি উহাকে 'ঝড়ক' (ধমক)
 না দিয়া বরং শিষ্টতা ও নম্রতার সহিত 'তাকাজা' করিতে উপদেশ
 প্রদান করিতে, আর আমাকে স্বীয় 'ওয়ারাদা' : (প্রতিশ্রুতি) অনুসারে
 খণ শোধ করিতে বলিতে। অতঃপর হজুর (ছালঃ) আদেশ করিলেন,
 উহার কজ্জা টাকা আদায় করিয়া দাও। আর উহার 'ঝড়কানীর'
 (ঝিকি দেওয়া কট-কাটব্য বলার) আর ২০ ছার (১০/

১৭) জব প্রদান কর—যদিও কর্ত্ত পরিশোধের সময় মধ্যে এখনও ৩ দিন বাকী আছে। হজরত (ছালঃ)-এর ঈদুশ ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, নম্রতা, শিষ্টতা, সৌজন্য ক্রমা গুণের এই কল হইল যে, সেই যিহদী তৎক্ষণাৎ পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। আবু ছয়ীদ খোদরী (রাজিঃ) করমাইয়াছেন যে, একদা কতিপয় আনুছার, আ (ছালঃ)-এর হজুরে কোনও জিনিষের প্রার্থনা করিলে; তিনি তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিলেন; তাঁহারা আরও চাহিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে আরও প্রদান করিলেন। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায়, হজুর (ছালঃ)-এর নিকট যাহা ছিল, তাহা সমস্তই দিয়া ফেলিলেন। তৎপর তিনি করমাইলেন, আমার নিকট যাহা কিছু আইসে, তাহা তোমাদিগকে না দিয়া আমার ঘরে জমা করিয়া রাখি না। একথা নিঃসন্দেহ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তালার নিকট এই প্রার্থনা করে—আমাকে ‘ছওয়াল’ (ভিক্ষা—প্রার্থনা) হইতে বাঁচাও, তিনি (আল্লাহ্ তালার) ঐ ব্যক্তিকে ভিক্ষা রূপ ‘যেদ্বত’ (অপমান—অপদস্থতা) হইতে বাঁচাইয়া লয়েন; আর যে ব্যক্তি ধনী হইতে চায়, আল্লাহ্ তালার তাহাকে ‘গনী’ (ধনবান্—অর্থশালী) করিয়া দেন। যে ব্যক্তি ‘ছবর’ (ধৈর্য্য—অল্পে সন্তুষ্ট) ‘এখ্তেয়ার’ (অবলম্বন) করে, আল্লাহ্ তাহাকে ‘ছাবের’ (ধৈর্য্যশীল—অল্পে সন্তুষ্ট) করিয়া দেন। হজরত আবু হোরেরা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আ হজরত (ছালঃ) বারংবার করমাইয়াছেন যে, যদি আমার নিকট “ওহদ” পাহাড়ের সমান সোণা হয়, তবুও আমাকে ঐ সময় ‘খুশি’ (আনন্দ লাভ) হইবে যে, ৩ দিন গত হইবার পূর্বেই উহা সকলের মধ্যে ‘তব্‌ছিম’ (ভাগ—বন্টন) করিয়া দিতে পারি। আর আমার নিকট ঐ পরিমাণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহা কেবল আমার ঋণ পরিশোধার্থ আবশ্যক। অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, যখন আ (ছালঃ)-এর হস্তে কিছুই থাকিত না; অথচ

যদি কোনও লোক আসিয়া ভিক্ষা চাহিত, তখন তিনি ঋণ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। আর তাঁহার ধার-কৰ্জ্জ যাহা হইত, তাহা ঐ দানাদি কার্যের জন্যই হইত। জাবের-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি এক ‘গেব্-ওয়ার’ (ধর্মযুদ্ধে) আঁ হজরত (ছালঃ)-

■ সঙ্গে ছিলাম, প্রত্যাবর্তন কালে আমার উষ্ট্রে একটু অবসন্ন হইয়া পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল। এমন ■ ■ ■ হজরত (ছালঃ) সেখানে আসিয়া পহুছিলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জাবের! বল তোমার কি অবস্থা? আমি আরজ করিলাম, হজুর! আমার উট ‘খকিয়া’ গিয়াছে (অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে); তচ্ছুবণে তিনি আমার উষ্ট্রকে এক ‘তছমা’ (চর্ম-রজ্জু) মারিবামাত্র উষ্ট্র দ্রুতগতি চলিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর আমরা পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিলাম। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, জাবের! তুমি তোমার এই উটটি কি বিক্রয় করিবে। আমি বলিলাম, ইহা হজুর, বিক্রয় করিব। তখন তিনি উচিত মূল্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানে আমার উষ্ট্রটী ক্রয় করিলেন, পরে তিনি আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন; আমি একটু বেলা হইলে মদীনার পহুছিলাম; মহজেদ-নববীতে গিয়া দেখিলাম, হজুর (ছালঃ) উষ্ট্রটী মহজেদের ‘দরওয়ারায়’ (দারদেশে) বাধিয়া রাখিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, জাবেব তুমি উটটী ছাড়িয়া যাও, এবং মহজেদে আসিয়া তুই ‘রাকায়াত’ নমাজ পড়। তদনুসারে আমি যখন নমাজ পড়িয়া অবসন্ন হইলাম, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) বেলাল (রাজিঃ)-কে বলিলেন, জাবেরের ঐ উষ্ট্রটির মূল্য আদায় করিয়া দাও। আমি যখন উষ্ট্রের মূল্য লইয়া বাইতে লাগিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন; আমি মনে করিলাম, আমাকে বুঝি উষ্ট্রটী ■■■ দিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমি যখন হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি করমাইলেন, তুমি

উষ্ট্রটীও লইয়া যাও । আর যে মূল্য তোমাকে দেওয়া হইয়াছে, উহা তোমারই হইয়াছে ; উষ্ট্রটীও তুমি গ্রহণ কর । একদা তিনি কোথাও আরণ্য প্রদেশে (জঙ্গলে) গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আর একজন লোক ছিলেন । ঐ হজরত (ছালঃ) ‘যমিন’ খুঁদিয়া (মৃত্তিকা খনন করিয়া) দুইখানি ‘মেছওয়ারক’ (দাঁতন) টানিয়া বাহির করিলেন । তদ্ব্যধা একখানি ‘সিধা’ (সোজা) ও একখানি ‘টেড়্‌হী’ (বক্র—বাঁকা) ছিল । হজুর (ছালঃ) বাঁকা (বক্র) দাঁতন খানি গ্রহণ করিলেন, এবং সোজা খানি সঙ্গীয় লোককে দিলেন । সেই লোক আরজ করিলেন, হজুর এই সোজা মেছওয়ারক খানি আপনি গ্রহণ করুন । কিন্তু ঐ হজরত (ছালঃ) তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না ; আর তিনি করমাইলেন, যে ব্যক্তি কাহারও ‘ছহবতে’ (সঙ্গে—সংসর্গে) থাকে,—সেই ছহবত ‘যড়িত্তর’ (এক দণ্ড কাল)-এর অন্তর্গত হউক না কেন ? কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হইবে, ‘ছহবতের’ (একত্র থাকার) হক পালন করিয়াছ কিনা ?

হজরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাহ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন যিহুদীও বশর নামক একজন মোনাফেক মোসলমানের মধ্যে কোনও বিয়র লইয়া কিছু ঝগড়া ছিল ; তাহারা উভয়ে বিচার-প্রার্থী হইয়া ঐ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল । হজুর (ছালঃ) উভয়ের ‘যবানবন্দী’ গ্রহণ পূর্বক সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, যিহুদীকে ‘হক-বজানিব’ (স্মার পথাবলম্বী) পাইলেন, তদনুসারে যিহুদীর অন্তরকূলেই বিচার-মীমাংসা করিলেন । যিহুদীর পক্ষে ডিক্রি দেওয়াতে মোনাফেক মোহলমান বশর এই বিচারে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না । যখন উভয়ে ঐ [ছালঃ]-এর বিচারালয় হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন বশর যিহুদীকে বলিল, এ ফয়ছলাঃ ঠিক হয় নাই । চল আমরা হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর নিকট যাই । যিহুদী তাহার প্রস্তাবে সন্মত হইলে, উভয়ে

হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিল। যিহুদী সেখানে পৌঁছিয়াই হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে বলিল, আমরা উভয়ে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলাম, তিনি আমার অস্থুলে ‘ফয়ছলা ছাদের’ (বিচার-ফলের ‘হকুম’ প্রচার) করিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যক্তি সে ‘ফয়ছলা’ মানে না, আর আপনার নিকট (পুনর্বিচারের জন্য) আমাকে লইয়া আসিয়াছে। উহার উদ্দেশ্য, আপনি যে বিচার-মীমাংসা করিবেন, তাহাই মানিয়া লইবে। হজরত ওমর (রাজিঃ) বশরকে জিজ্ঞাসা করাতে সেও বলিল, হাঁ, এ ব্যক্তি (উক্ত যিহুদী) সত্যই বলিতেছে। আমরা উভয়ে বিচার-প্রার্থী হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সমীপে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাঁহার ফয়ছলার উপর আপনার ফয়ছলার ‘তরজিহ্’ দিতেছি (প্রাধান্য স্বীকার করিতেছি) ; তচ্ছুবণে হজরত ফারুক (রাজিঃ) বলিলেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই ইহার বিচার-মীমাংসা করিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ; আর তরবারি আনয়ন পূর্বক মোনাকেক বশরের ‘গদদান’ উড়াইয়া দিলেন (যুগপাত করিলেন)। তৎপর বলিলেন, যে ব্যক্তি মোছলমান হইয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রচুলের ‘ফয়ছলা’ না মানে, আমি তাহার ফয়ছলা এইরূপেই করিয়া থাকি। ইহাতে বশরের সঙ্গী মোনাকেক গণ মহা ‘শোর-গোল’ উপস্থিত করিল ; কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা ওহি দ্বারা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর কার্যের অমুমোদন করিলেন ; আর ঐ দিন হইতেই তিনি “ফারুক” উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

মক্কা-বিজয়ের পরের একটা ঘটনা এই :—ফাতেমা-বিন্-আল-আছদ নামী বনি-মখ্যুমের একটা স্ত্রীলোক চুরির অভিযোগে ধৃত হয়। বিচারে তাহার দোষ প্রমাণিত হইলে, আঁ হজরত (ছালঃ) শরিয়তের বিধানানুযায়ী

তাহার হাত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। শরীফ কোরেশগণের পক্ষে এই আদেশ বড়ই ‘নাগওয়ার’ (অগ্রীতিকর—আপত্তি জনক) বোধ হইল। তাহারাই ইচ্ছা করিল যে, ‘ছোফারেশ’ (অনুরোধ) করিয়া জ্বীলোকটাকে হাত কাটার শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু ঐ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট এ বিষয়ের অনুরোধ করিতে তাহাদের সাহসে কুলাইল না। অবশেষে হজরত ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে বলিয়া কহিয়া ছোফারেশ করাইতে বাধ্য করিলেন; তদনুসারে ওছামাঃ (রাজিঃ), হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া, জ্বীলোকটাকে হাত কাটার কঠোর শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদান জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ বাক্য শুনিয়া ঐ হজরত (ছালঃ) বলিলেন, হে ওছামাঃ, তুমি আল্লাহ্ তা-লার নির্দেশিত শাস্তি প্রদান কার্যে দখল দিতেছ (নির্দিষ্ট শাস্তি যাহাতে করা না হয়, তদনুসারে ‘ছোফারেশ করিতেছ’) ? তৎপর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত জন-মণ্ডলীর সম্মুখে একটি মারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন, ঐ বক্তৃতার মূল মর্ম এই :—‘আয় লোগো’ ! (হে লোক সকল !) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সকল (কিয়ৎ পরিমাণে), এই কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, যখন উহাদের মধ্যে কোনও উচ্চ বংশীয় লোক চুরির অভিযোগে ধৃত হইত, লোকেরা বড় লোক বলিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিত ; আর যখন কোনও গরীব—দুর্বল লোক চুরি করিত, তখন উহাকে শাস্ত প্রদান করিত। খোদা সাক্ষী, যদি কাতেমাঃ বিস্তে-মোহাম্মদ (ছালাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম) চুরি করিত, তবে ‘একিনানু’ (নিশ্চয়ই) আমি তাহারও হাত কাটিয়া ফেলিতাম।”

এক সময় ঐ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, তোমরা আমার প্রশংসায় ‘যেদাঃ’ (অধিক) ‘মোবালেগাঃ’ (অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি) করিও না—যেমন নাছারা (ঈছায়ী বা খৃষ্টীয়ান) গণ (হজরত) ঈছা-বিন্-মরিয়ম

(আলা)-কে সীমাতীত রূপ বাড়াইয়াছে । আমি ত আব্বাহর বান্দাঃ
দিগের মধ্যে একজন ; এজন্য আমাকে আব্বাহ্ ও বহুলোয়াহ (ছালঃ)
বলিবে । একদা তিনি অস্তঃপুর বা ‘হজরা’ হইতে বাহিরে আগমন করাতে,
উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ সকলেই ‘তাজ্জিমান’ (সম্মান-প্রদর্শনার্থে)
দণ্ডায়মান হইলেন, ইহাতে আ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, যেমন
‘আজমী’ (পারস্ত বা আরবের বহিঃস্থ দেশের অধিবাসী)-গণ একজন অপর
জন্য প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ আমাকে দেখিয়া
তোমাদের দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে (শকা কাজী আয়াজী) । আ
হজরত (ছালঃ) স্বীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া
থাকিতেন ; আর ‘মজলেছে’ (সভায়) যেখানে ‘জায়গা’ (স্থান) পাইতেন,
সেই স্থানেই বসিয়া যাইতেন । তিনি ‘চাকর-নওকর’ দিগের সঙ্গে কাজ
কর্মে ‘শরীক’ হইয়া যাইতেন ; এবং তাহাদিগকে আপনার নিকটে বসাই-
তেন । ‘বারুহা’ (পুনঃ পুনঃ—অনেকবার) এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যে,
কোনও লোক যিহদী মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন ; আর যিহদীর
কড়া তাকাদায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহার আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট
আসিয়াছেন, ; যদি তাঁহার নিকট টাকা-কড়ি কিছু থাকিত, তবে তিনি
নিজেই তাঁহার দেনা শোধ করিয়া দিতেন ; যদি হজুর (ছালঃ)-এর হস্তে
কিছু না থাকিত, তবে স্বয়ং যিহদী মহাজনের নিকট গমন পূর্বক, উহাকে
আরও কিছু সময় দিতে (কিছু দিন অপেক্ষা করিতে) অনুরোধ করিতেন ;
যদি যিহদী সে অনুরোধ পালন করিত, তবে ত কোন কথাই ছিল না,
অন্যথা হজুর (ছালঃ) কোনও স্থান হইতে যোগাড় করিয়া বা ধার
করিয়া ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করিয়া দিতেন । কোনও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিই
তাঁহার নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান নাই ।

আ [ছালঃ] করমাইয়াছেন, ক্ষুধার্ত ও ‘মিছকিন’ অতি

দয়িত্ব) লোকদিগের সাহায্যার্থ বাহারা 'কোশেশ্' (চেষ্টা) করে, তাহারা "মজাহেদ কি ছবিগিজাহ্", "কারেমল-লারেল" এবং "দারেমমাহার" এর 'বরাবর' (সমান) 'দরজাঃ' লাভ করে ।

একদা এক ব্যক্তি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিল, 'এয়া রুহুলোজ্জাহ্ (ছালঃ) ! 'জরত' (বেহেশ্-ত্—মোছলেম-দুর্গ) লাভের উপায় কি ? তদুত্তরে হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, 'ছদ্ক্' (সত্যবাদিতা), কেননা, মানুষ যখন সত্যবাদী হয়, তখন 'নেকী' (পুণ্যাকুষ্ঠান) করিয়া থাকে । আর মানুষ যখন পুণ্যাকুষ্ঠান করে, তখন তাহার মধ্যে 'নুরে ইমান' (ধর্মের জ্যোতিঃ) উৎপন্ন হয় ; (সেই লোক) 'ইমানদার' (ধার্মিক) হয়, তখন সে 'জরতের' (বেহেশ্-ত্ বা মোছলেম-দুর্গের) অধিকারী হইয়া থাকে । আর এক 'মওকার' (স্থলে—বিশেষ ঘটনায়) তিনি ফরমাইয়াছিলেন, 'খবরদার ! তোমরা 'ছাচ্চা' (সত্যবাদী) থাক—সেই সত্যবাদিতার জন্য তোমাদের প্রাণের আশঙ্কাই হউক না কেন ? কারণ, 'বেলা শোবাহ্' (নিঃসন্দেহ) 'নাজাত' (মুক্তি) উহাতেই আছে ।

মক্কা হইতে বদরে আগমন কালে (বদরের যুদ্ধ-যাত্রায়) পথিমধ্যে আখ্-নছ-বিন্-শরিক্, আবুজহলাকে বলিল, হে আবুল হকম ! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি । এখানে তুমিও আমি ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই যে, আমাদের কথোপকথন শুনিবে । তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল ত । হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) 'ছাচ্চা' (সত্যবাদী) না 'ঝুটা' (মিথ্যাবাদী) ? উত্তরে আবুজহল বলিল 'ও আল্লাহ্' (আল্লার কহম—আল্লার শপথ) 'বেশক' (নিঃসন্দেহ) (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) সর্বদাই সত্য কথা বলিয়া থাকেন ; আর তিনি কখনও 'গলৎ-বয়ানী' (মিথ্যা কথা) বলেন নাই । আঁ হজরত (ছালঃ) এর অমন ভীষণ

চিরশত্রু আবুজহল ■ তাঁহার সত্যবাদিতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

হজরত আবু ছয়ীদ খদরি (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আ হজরত (ছালঃ) ‘শরীফ’ (সম্ভ্রান্ত) ‘পরহা নিশিন’ (পর্দা-প্রথা পালন কারিণী—অবরোধ বাসিনী) কুমারী বালিকা হইতেও অধিক ‘হাশাদার’ (সলজ্জ ভাব সম্পন্ন—শরমেন্দাঃ—লজ্জাশীল) ছিলেন। আর যখন কাহারও কোন কথা তাঁহার ‘না-পছন্দ’ (অমনোনীত—মত-বিরুদ্ধ) হইত, ■■■ তৎক্ষণাৎ তাঁহার ‘চেহেরাঃ’ (বদন মণ্ডল) দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিতাম। যদি হজুর (ছালঃ)-কে কাহারও কোন কথা ভাল বোধ না হইত, ■■■ ‘এশারা-কেনারার’ (ইঙ্গিত ক্রমে) উহা তাহার গোচরীভূত করিতেন,—যেন সে ব্যক্তি লজ্জিত ও অপ্রস্তুত না হয় ; কিন্তু ‘কালাম এলাহী’ (আল্লাহ্-তা-লার বাক্য, ও ‘আলা কালামাতুল হক্’ তিনি কাহারও ‘রেবাবেত’ (কমা) করিতেন না। অর্থাৎ সে কেবল অসহ্যচিত চিন্তে—স্পষ্ট ভাবে—গুরু-গভীর ভাষায় সে অন্তর ও অসহ্যত বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন।

ওম্মোল-মুমেন্নিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) করমাইয়া-ছেন, আ হজরত (ছালঃ) যদি কাহারও ‘না-পছন্দাঃ’ (অমনোনীত—মত-বিরুদ্ধ) কার্যের বিষয় জানিতে পারিতেন, ■■■ তিনি তাহার নাম লইয়া ‘তখ্-ছিহ্’ এর সঙ্গে (নাম উল্লেখ করিয়া বা অন্তে বুঝিতে পারে যে অমুক লোককে এই কথা বলিয়াছেন) এরূপ কোন কথা করমাইতেন না, (বলিতেন না) ; বরং এইরূপ বলিতেন, ঐ ব্যক্তি কেমন বাস্তব যে এমন কথা বলে ? আ হজরত (ছালঃ) অধিকাংশ সময় ‘খামুশ’ (নীরব) থাকি- : তেন ; আর বিনা প্রয়োজনে কোনও কথা বলিতেন না। হজুর (ছালঃ)-এর কথা ‘ছাক্’ (পরিষ্কার—প্রকাশ) ছিল ; কথা এত ‘লখা-চওড়া’ হইত না, বাহাতে নিরর্থক বাজে কথা থাকিতে পারে, এবং লোকের কিছুমাত্র

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ; কিংবা এমন সংক্ষিপ্ত হইত না, যাহাতে প্রয়োজনীয় কথার কিয়দংশ থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা, বা সে কথার অর্থবোধে বা মর্ম্মোদঘাটনে লোকের অসুবিধা হইতে পারে ।

আ হজরত (ছালঃ)-এর 'চাল' (গমনাগমন) 'ময়তদল' (মধ্যম রকম) ছিল ; না তিনি খুব ক্ষতগতি চলিতেন—যাহাতে সঙ্গীয় লোকদিগের পক্ষে অসুবিধা হয় ; না এমন ধীর-মহীর গতিতে চলিতেন, যাহাতে অলসতাও দুর্বলতা প্রকাশ পায় । এক এক সময় তিনি 'খোশ-তবরী' (আমোদজনক) বাক্য ও 'করমাইতেন' । উদাহরণ :—একদা তিনি এক ব্যক্তিকে একটা উষ্ট্র দিতে চাহিয়াছিলেন ; যখন সেই ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উষ্ট্র লইতে আসিলেন, তখন 'হজুর' (ছালঃ) করমাইলেন, আমি তোমাকে একটা উষ্ট্রের 'বাচ্চাঃ' (ছানা—শাবক) দিতেছি । এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিলেন, হজুর ! আমি উষ্ট্রের শাবক দিয়া কি করিব ? আ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, উষ্ট্রের বাচ্চা উট হয় না ত কিসের বাচ্চা উট হয় ? হজুর (ছালঃ) 'খোশ-তবরী' প্রভাবে (নির্দোষ পরিহাসচ্ছলে) উটকে উট্‌নীর বাচ্চাঃ বলিয়াছিলেন । উষ্ট্র-প্রার্থী মনে করিয়াছিলেন, উষ্ট্রের বাচ্চা অর্থে উটের অল্প বয়স্ক ছানা আমাকে প্রদানে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন । হজুর (ছালঃ) নির্দোষ পরিহাস করিলেও তাহা সত্যতা-বর্জিত হইত না । সত্যতা ও 'রাস্তি' ব্যতীত তিনি ভুল বা মিথ্যা কথা কখনও বলিতেন না । ব্যারাম-চর্চায় তিনি উৎসাহ দিতেন । বীরত্ব-ব্যঙ্গক অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল । তিনি যখন শিষ্য-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বসিতেন, তখন সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এমন ভাবে থাকিতেন যে, নবাগত কোনও লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিত না । অবশেষে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইত, আপনাদের মধ্যে 'নবী' (রুচুল—পয়গম্বর) কে ? যে তিনি থাকিলে মুখে দুর্গন্ধ (যথা—কাঁচা পেয়াশ্), উহা তিনি

‘পছন্দ’ করিতেন না। তিনি ‘পয়গম্ব’ (তালি দেওয়া) কাপড় পরিধান করিতেন, কিন্তু ভাল কাপড় পাইলে তাহারও সদ্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। উহা নিজে কখনও পরিধান করিতেন, কখনও বা পরিবার বর্গের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন। আর যদি কোনও গরীব লোক আসিয়া প্রার্থনা করিত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতেন। আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘লেবাছ’ (পরিচ্ছদ) আড়ম্বর শূন্য—সম্পূর্ণ সাদা-সিঁদে রকমের হইলেও, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল।

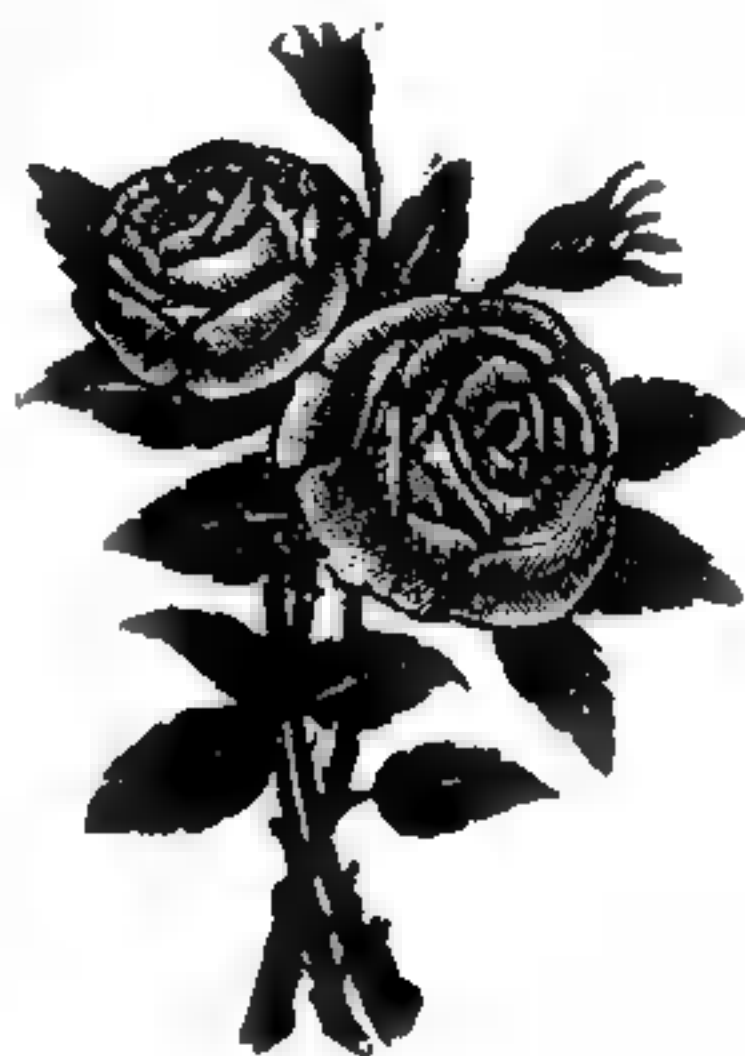
আ হজরত (ছালঃ) দিবা রাত্রির মধ্যে কয়েকবার ‘মেছওয়াক’ (দাঁতন) করিয়া দস্ত পরিষ্কার করিতেন। প্রত্যেক বার অঙ্কু করিবার সময়ই দাঁতন করার অভ্যাস ছিল। ‘গোছল’ (স্নান)-এর সময় যে মেছওয়াক করিতেন, সে কথা ত বলাই বাহুল্য। যে সকল ছাহাবাঃ (সান্নিধ্য) সর্বদা তাঁহার সঙ্গে উঠা-বসা করিতেন, তাঁহাদের উক্তিতে প্রকাশ, হজরত (ছালঃ)-এর শরীর, পোষাক ও মুখ হইতে কখনও কোন রূপ গন্ধ বাহির বাহির হয় নাই। যে স্থলে ‘আফু’ (কমা) প্রদর্শন করিলে সুফল কলিত, সে স্থলে তিনি কমা করিতেন; কিন্তু যে ক্ষেত্রে ‘ছাযা’ (শাস্তি) দেওয়ার প্রয়োজন হইত, সে স্থলে অপরাধীকে শরিয়ত অনুযায়ী শাস্তিই প্রদান করিতেন। কারণ, যে সকল লোক চরিত্রের ছিল, তাহাদিগকে উপযুক্ত রূপে শাস্তি প্রদান না করিলে অশান্তি কার্যের প্রশংসা দেওয়া হইত। মোছলমানদিগের ‘খয়রাত’ (দান কার্য) কেবল মোছলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন না—খ্রিস্টান, খুদীয়ান, ‘বোত-পরস্ত’ (পৌত্তলিক) প্রভৃতি সর্ব ধর্মাবলম্বী লোককেই দান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যত বড় ভীষণ বিপদই হউক না কেন, তিনি তাহাতে অশ্রদ্ধাও বিচলিত হইতেন না। অসাধারণ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে অকাতরে—নির্ভরে সেই বিপদের সম্মুখীন হইতেন। কিন্তু অন্তের বিপদ দেখিলে তিনি ‘বে-চমেন’ (অস্থির—

বিচলিত) হইয়া পড়িতেন। তিনি 'আছবাব' হইতে 'কাম' (কাজ) লইতেন এবং তাঁহার 'নতিজাঃ' (ফলাফল) খোদার উপর ছাড়িয়া দিতেন— অর্থাৎ আল্লাহ্ তাবার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। কার্যের ফল, আশাও ইচ্ছার বিপরীত হইলেও 'যাব্-রাইতেন না' (বিচলিত ও বিস্মৃ-চিন্ত হইতেন না)। তাঁহার মধ্যে 'হয়বত' (ভীতি-ব্যঙ্গকতা) ছিল, কিন্তু কঠোরতা ছিল না; 'ছাখাওয়াত' (দানশীলতা) ছিল, কিন্তু 'এহরাফ্' (অপব্যয়িতা) ছিল না। যে ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িত, সে 'হয়বত্-যদাঃ' (আতঙ্কিত—ভীত) হইয়া বাইত, কিন্তু সেই লোকই যখন তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিত (বাক্যালাপ করিত), তখন 'কৈদারী' (পরম ভক্ত বা তাঁহার — জীবনোৎসর্গকারী) হইয়া বাইত। 'এম্-রাফ্' (ব্যাধি সমূহ) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'তন্দোরস্ত' (স্বস্থকায়— স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্পন্ন) থাকিবার নিমিত্ত লোকদিগকে 'হোসিয়ার' (সতর্ক) করিতেন। আর 'নাদান' (মূখ) 'তবিবের' (চিকিৎসকের) দ্বারা রোগের চিকিৎসা করাইতে নিষেধ করিতেন। হারাম জিনিষ ঔষধ রূপে ব্যবহার করিতেও 'না-পছন্দ' করিতেন। যখন কোন 'মোয়ামেলায়' (বৈবয়িক ব্যাপারে—পার্থিব কার্যে) ছুই 'ছুরত' (ছুই প্রকার অবস্থা) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইত, সেরূপ ক্ষেত্রে যে পস্থা সহজ, তাহাই তিনি অবলম্বন করিতেন। 'আছিরানে অক্' (যুদ্ধে বন্দী—সামরিক কয়েদী) দিগের 'খবরগিরী' (তত্ত্বাবধান)—'মেহমান' (আতিথি) দিগের ভ্রাম্য বস্ত্র করাইতেন। 'তীর-আন্দাযী', লক্ষ্য ভেদ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি বীরত্ব-ব্যঞ্জক ব্যাপারে ■ 'শরীক' হইতেন (যোগদান করিতেন)।

আ হজরত (ছালঃ)-এর কার্য-কলাপ, ■ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম। হে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোলা ! হে অদ্বিতীয় দয়ার সাগর ! তুমি তোমার এই দীন-হীন অধম

হাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তাহার দুর্বল লেখনী-প্রসূত, তোমার প্রিয় নবী—
 প্রিয় বন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পরগণ্যর আ হজরত (ছালঃ)-এর এই ক্ষুদ্র
 জীবনীখানি 'কবুল' (গ্রহণ) কর । আর হজুর (ছালঃ)-এর পবিত্র চরণ-
 তরীর আশ্রয় প্রদানে, তোমার অতি দীন-হীন অধম বান্দাকে মুক্তি পথের
 পাশ কর । সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত মোছলমানের প্রতি 'রহমৎ-বারি' বর্ষণ
 কর, এবং তাঁহাদের 'দীনি' ■ 'দুনিয়াবী' সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধন কর—
 তাহাদের ইহকাল এবং পরকালের সর্বপ্রকার সুপথ পরিষ্কার কারিয়া দাও ।
 আমিন—হুম্মা আমিন । !





দ্বিতীয় ভাগ।

হজরত আলী মন্নতুজ্জা

(কঃ ওঃ) এর জীবন চরিত ।

সর্বশক্তিমান্ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা শ্রীর অপার মহিমা বলে, ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এক অতুলনীয় ও অনির্বচনীয় পবিত্র নূরের (জ্যোতির) সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা আদিম, কিন্তু অনাদি নহে। এই পবিত্র নূর হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, উচ্চ-পিণ্ড, ধূমকেতু, আর্শ, কুরছি, লওহ-কলম, বেহেশত, দোজখ, পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সাগর-মহাসাগর, পর্বত, নদ-নদী, যক্ষভূমি, বন-জঙ্গল, এবং সর্ব-প্রকার জীব ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর ইচ্ছাময় আল্লাহ্ তা-লা মানব জাতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আদি পুরুষ বা মানব জাতির আদি পিতা হজরত আদম (আলাঃ) এবং মানব জাতির আদি মাতা হজরত হাওয়া কে সৃজন করেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে জম্মতে (বেহেশতে) রাখিয়া-ছিলেন, পরে তাহারা শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্ তা-লার নিষিদ্ধ গন্ধম খাইয়া স্বর্গভ্রষ্ট এবং পৃথিবীতে নিপতিত হন। হজরত আদম (আলাঃ) ‘ছরন্দীপে’ (সিংহল, সিলন বা লঙ্কাদীপে) এবং হজরত মা হাওয়া আরব দেশে পতিত হইয়াছিলেন। আদম (আলাঃ), আল্লাহ্ তা-লার আদেশ অমান্য করিয়া, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ এবং তজ্জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হন, এবং

স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়া বহুকাল 'তওবা' (অমৃতাপ) করেন। অবশেষে আরবের হেজাজ প্রদেশে উভয়ে সম্মিলিত হন, কালক্রমে তাঁহাদের বহু সন্তান-সন্ততি জন্মে। ঐ ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট। তওরাত গ্রন্থে ইহা অনেক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল গ্রন্থ যিহুদী এবং খৃষ্টীয়ান দিগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হওয়াতে, আসল ও নকলের পার্থক্য করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহা ইউক, হজরত আদম (আলা:) একজন পরগম্বর ছিলেন। তিনি যেমন আদি পুরুষ (প্রথম মানব), তেমনই প্রথম পরগম্বর। তিনি একেশ্বরবাদ ধর্ম-প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র হজরত শিশ্ (আলা:) একজন শ্রেষ্ঠতমঃ পরগম্বর ছিলেন। বহুপুরুষ পরে হজরত মুহ্ (আলা:) একজন শ্রেষ্ঠ পরগম্বর হন; তাঁহার সময়ে মানব জাতি পৌত্তলিকতা ও নানাপ্রকার ভীষণ পাপাচারে লিপ্ত হওয়াতে, আল্লাহ্ তা-লা মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাজল-প্লাবন দ্বারা পৃথিবীর মনুষ্যাদি জীব জন্তু সমস্ত ধ্বংস করেন। কেবল আল্লাহ তা-লার আদেশে হজরত মুহ্ (আলা:) এক প্রকাণ্ড জাহাজ নির্মাণ পূর্বক তাহাতে খোদা তা-লা ভক্ত ও আদেশ-পালক (এছলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ একেশ্বরবাদী) কতিপয় মানুষ ও সর্বপ্রকার জীব জন্তুর এক এক জোড়া সঙ্গে লইয়া তাহাতে আরোহণ করেন। তৎপর এই ভীষণ জল-প্লাবনে সগম্য পৃথিবী—এমন কি বড় বড় পাহাড় পর্যন্ত পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। মনুষ্যাদি সমস্ত জীব সেই মহাজলপ্লাবনে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। :অবশেষে পানী শুকাইয়া যায়, জাহাজ খানি রক্ষা পাইয়া উহাতে অবস্থিত মনুষ্য এবং জীব জন্তু দ্বারা আবার ক্রমশঃ পৃথিবী পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এই ঘটনার পরেও মনুষ্যেরা একমাত্র অধিতীয় খোদা তা-লার অস্তিত্ব উপাসনা-আরাধনা ভুলিয়া কল্পিত দেব দেবী এবং মানুষ বা পশুপক্ষীর উপাসনা-আরাধনা আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে বহু পরগম্বরের—

আবির্ভাব হইলেও, মানুষের 'গোমরাহী' (সত্যপথ-ভ্রষ্টতা) দূর হয় না । 'হুনিয়া' আবার অনাচার ও পাপাচারে পরিপূর্ণ হয় । মানুষ্য জাতির সৃষ্টি হইতেই দেখা গিয়াছে যে, পৌত্তলিকতার দিকে তাহারা অতি সহজেই আকৃষ্ট হয় । অসার আমোদ-প্রমোদ, আরাম-‘আয়েশ’, নানা প্রকার অসৎ কার্য্য ■ অসদহুষ্ঠানের দিকেই মানুষের মন প্রধানতঃ গড়াইয়া পড়ে । সহস্র সহস্র পরগম্বর (নবী—রহুল—প্রেরিত মহাপুরুষ), প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও মানুষকে একমাত্র খোদা তা-লার অস্তিত্ব স্বীকারে বা তাঁহার এবাদৎ-বন্দেগীতে বাধ্য করিতে পারেন নাই । অতি অল্পসংখ্যক লোকের হৃদয়ই ‘তওহিদে’র পুত রশ্মিতে আলোকিত হইয়াছিল । অবশেষে আল্লাহ্ তা-লা একজন মহা-শক্তিশালী পরগম্বর (আলাঃ) কে ‘তওহিদ’ প্রচারের জন্য হুনিয়াতে প্রেরণ করেন । তাঁহার নাম হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) । তিনি “খলিলুল্লাহ্” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । সেই সময় বেবিলন (বাবুল) সাম্রাজ্যের পূর্ণ প্রতাপ । বেবিলনের সম্রাট্ নমরুদ (কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে কায়াণী বংশীয় কায়-কাউদসই নমরু) একজন প্রবল প্রতাপাধ্বিত বাদশাহ ছিল, সে স্বয়ং খোদাই দাবী, এবং প্রজাদিগকে তাহার পূজা করিতে বাধ্য করিত । হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ‘তওহিদে’র—একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তায়ালায় একত্ববাদের ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তখন এই খোদা-দ্রোহী সম্রাট্ তাঁহার প্রতি নানা প্রকার ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল । অবশেষে তাঁহাকে ■ অনল-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল । পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা-লা তাঁহাকে সেই ভীষণ অগ্নির মধ্য হইতে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা করিলেন । অবশেষে খোদা তা-লার ‘গযবে’ নমরুদের বিনাশ সাধন হইল । হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) প্যালেষ্টাইন, কেনয়ান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ পূর্বক মেহের দেশে উপনীত হইলেন । সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কেন-

স্থানে আসিলেন— দুইটি বিবাহ করিলেন । প্রথমা স্ত্রী হজরত ছারার গর্ভে প্রথমে কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন না ; দ্বিতীয় পত্নী হজরত হাজেরার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম ইছ্মাইল (আলাঃ) । হজরত ছারার ইচ্ছানুসারে, এবং আল্লাহ্ তা-লার আদেশে সপুত্র বিবী হাজেরাকে তিনি মরুময় আরব দেশের হেজাজ প্রদেশে বর্তমান সময়ে মক্কা নগর যে স্থানে অবস্থিত,—নির্বাসিত করিতে বাধ্য হন । ইহার পর হজরত ছারার গর্ভে ও তাঁহার অতি বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র-বৃত্ত জন্মগ্রহণ করেন ; ইহার নাম এছহাক (আলাঃ) রাখা হয় । এই নবীর বংশই কালক্রমে ‘বনি ইস্রাইল’ নামে অভিহিত হইয়াছিল । হজরত এছহাক (আলাঃ)-এর পুত্র হজরত ইয়াকুব (আলাঃ), তাঁহার পুত্র হজরত ইউছক্ (আলাঃ) মেহের দেশে রাজত্ব লাভ করেন । ইহার পর মেহেরের ফেরাউন বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং তাহারা বনি-এস্রাইলের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে । ইহারই এক ফেরাউন খোদা-দ্রোহী হইয়া নিজে খোদাই দাবী করে । এই সময় আল্লাহ্ তা-লা বনি-এছরাইলের মধ্যে মহাশক্তিশালী পয়গম্বর হজরত মুছা (আলাঃ)-কে আবির্ভূত করেন ; তাঁহার ভ্রাতা হারুন (আলাঃ) ও পয়গম্বর ছিলেন । হজরত মুছা (আলাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তা-লা জল্পশানহু ‘তওরাত’ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন । ইহাই আছমানী প্রধান কেতাব চতুষ্টয়ের প্রথম কেতাব । এই বনি-এছরাইলের মধ্যে (এছরাইল বংশে) অসংখ্য নবী আবির্ভূত হইয়া, ক্রমাগত তওহিদের মহাবানী ঘোষণা করেন । তন্মধ্যে হজরত দাউদ (আলাঃ) একজন প্রধান পয়গম্বর । তাঁহার নিকট জব্বুর গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়—ইহা আছমানী দ্বিতীয় কেতাব । হজরত দাউদ (আলাঃ)-এর পুত্র হজরত ছোলেমান (আলাঃ) একজন বিশ্ব-বিস্তৃত দ্বিখিজয়ী সম্রাট, ■ পয়গম্বর ছিলেন ; তিনিও প্রাণপণে তওহিদের বানী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ।

অবশেষে এই বংশে হজরত ঈছা-মহীহ্ (আলা:) জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার নিকট " ইঞ্জিল " গ্রন্থ নাজেল হয় ; ইহা আছমানী তৃতীয় কেতাব । ইনি এছরাইল বংশের শেষ পরগম্বর । হজরত এছমাইল (আলা:)—এর বংশে ইতিপূর্বে কোনও পরগম্বর জন্মগ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু এই বংশে এমন এক নবী (পরগম্বর — তদ্বাহক — রছুল) শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিলেন যে, তাঁহার তুলনা নাই । তাঁহার পবিত্র নাম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (ছান্নান্নাহো আলায়হে ওয়ান্নাহাম) । তিনি দুনিয়াতে তওহিদের যে বিজয় ডকা বাজাইয়া গিয়াছেন, কেয়ামত পর্যন্ত তাহা 'জারী' থাকিবে । পূর্ববর্তী লক্ষাধিক পরগম্বর (আলা:) যাহা করিতে পারেন নাই—তওহিদের (একেশ্বরবাদিদের পূতবাণী:অক্ষর রাখিতে সক্ষম হন নাই ; আ হজরত (ছাল:) ও তাহার মহানক্তিশালী শিষ্য মণ্ডলী তাহা করিয়া গিয়াছেন । পূর্ববর্তী গ্রন্থধারী প্রধান পরগম্বরগণের প্রতি, অবতারিত সমূহ ঐ মতাবলম্বী লোকেরা পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও পরিবর্জিত এবং বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে—সুতরাং খাঁটি একখানিও তওরাত, জব্বুর ও ইঞ্জিল পৃথিবীতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই । পরবর্তী কালের রিহদীও ঈছারী পণ্ডিতগণ স্ব স্ব বুদ্ধি ও কৃতি অহুসারে উহা বাড়াইয়া ও ঘাটাইয়া সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন ; সুতরাং ঐ দুইটা কেতাবী (গ্রন্থধারী) আতির মধ্যেও একেশ্বরবাদিতার পূর্ণ অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । কিন্তু প্রায় ১৪ শত বৎসর পূর্বে জনাব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা ছান্নান্নাহ আলায়হে ওয়া ছান্নাম আবির্ভূত হইয়া তওহিদের বে পবিত্র বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজ দুনিয়ার ৪০ কোটি মনুষ্য তাহা উচ্চারণ ও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক আত্মা-চরিতার্থ করিতেছেন । তওহিদের— একেশ্বরবাদিতার প্রবল স্রোত পৃথিবীতে সজোরে প্রবাহিত হইতেছে । আর আ (ছাল:)—এর প্রতি পবিত্র গ্রন্থ " কোরআন মজীদ "—

“কোরকান হামিদ” অবতীর্ণ হইরাছিল, এই চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে তাহার একটা শব্দ, একটা অক্ষর, এমন কি—একটা ‘যের-যবর’ ও পরিবর্তিত ■ নাই। আবার লক্ষ লক্ষ হাফেজ উহা এমন বিস্তৃত ভাবে কণ্ঠস্থ (স্থখস্থ) করিয়া রাখিয়াছেন যে, কোনও ঘটনার দুনিয়ার লিখিত বা মুদ্রিত সমুদয় কোরআন পাক নষ্ট হইয়া গেলেও, উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। লক্ষ লক্ষ হাফেজ দ্বারা তাহা আবার অবিকল ভাবে বর্ণিত ও লিখিত হইতে পারিবে। স্বয়ং খোদা তা-লা কোরআন শরীফের ‘মহাফেজ’ (সংরক্ষক)। এছলাম যে সত্য ধর্ম, ইহা তাহার একটা জায্বল্যমান ■ প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোরআনের এক একটা শব্দ কোটি কোটি কোহেমুর অপেক্ষা মূল্যবান। কোরআনের অপূর্ব মাহাত্ম্য ও এছলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে আজ ইউরোপ ও আমেরিকার শত শত উচ্চ শিক্ষিত খৃষ্টীয়ানও নাস্তিক এই পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত হইতেছেন। মোছলমানদিগের মধ্যে নিয়মিত প্রচার কার্য নাই। খৃষ্টীয়ান পাদরীদিগের দ্বারা কোটি কোটি টাকা মূলধন, খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার কার্যে ব্যয় হইলেও, তদ্বারা আশাহুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছে না; লক্ষ লক্ষ পাদ্রী যেমন নানাদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার কার্যে নিযুক্ত আছেন; মোছলমানদিগের মধ্যে কোন ব্যবস্থা তাহার শতাংশের একাংশও নাই; অথচ সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের কোটি কোটি পৌত্তলিক ও জড়োপাসক অধিবাসী দলে দলে এছলামের পবিত্র ছায়াতলে আগমন করিতেছেন। সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যে ও জাপানে পর্যন্ত দিন দিন এছলাম ধর্ম আশাভীত রূপে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

এই এছলামের বাণী যিনি সর্বশেষে—সকল নবীর পরে ঘোষণা করিয়া সর্বতোভাবে সাফল্য মুণ্ডিত হইয়াছেন, পাক-পাঞ্জতন প্রথম ভাগে তাঁহার জীবনী লিখিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার স্বযোগ্য পিতৃব্যপুত্র ও জামাতা, প্রথম এছলাম ধর্ম গ্রহণকারীদিগের

মধ্যে অন্ততম প্রধান পুরুষ, ৪র্থ খোন্ফারে রাশেদিন, জগতের অধিতীয় বীরপুরুষ এবং তাপস অর্থাৎ সাধক ছুফী (দরবেশ) দলের প্রধান পথ-প্রদর্শক হজরত আলী মরতুজা করমুল্লাহ ওয়াজহর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র লিপিবদ্ধ করা হইল ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) বীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এছমাইল (আলাঃ)-কে, তাঁহার জননী বিবী হজরত হাজেরার সঙ্গে আরবের বর্তমান পবিত্র নগরী মক্কা যেখানে অবস্থিত, ঐ স্থানে নির্বাসিত করিয়া ছিলেন । কালক্রমে জম্জম্ কূপের নিকটে লোকের বসবাস হইতে লাগিল ; এবং খোদা তাঁহার আদেশে পিতা-পুত্র মিলিয়া এই স্থানে একমাত্র অধিতীয় আল্লাহ্ তা-লার উপাসনার জন্য কাবা-গৃহ নির্মাণ করিলেন ; এই স্থানেই হজরত এছমাইল (আলাঃ) বংশ-তরু রোপিত হয় । মক্কা একটা সুন্দর নগর রূপে গড়িয়া উঠে ।

হজরত আদম (আলাঃ) হইতে হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ পর্যন্ত অধঃস্তন ১৮ পুরুষ ধরা হয় । হজরত এছমাইল (আলাঃ) পর্যন্ত ১৯ পুরুষ । তাঁহার পুত্র কেদর । হজরত আদম (আলাঃ) হইতে অধঃস্তন ৭৮ পুরুষ, এবং হজরত এছমাইল যবিহুল্লাহ্ (আলাঃ) হইতে ৬৯ পুরুষ নিম্নে ফহর (ফেহের) বা কোরেশ জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার নাম হইতে মক্কার কোরেশ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে । এখান হইতে নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ৮৫ তম অধঃস্তন পুরুষে আব্দে মনাফ্ জন্মগ্রহণ করেন । এখান হইতে আবার দুইটা শাখা বাহির হয়, আব্দে মনাফের পুত্র হাশেম হইতে “ বনি-হাশেম ” এর উৎপত্তি । আর আব্দে মনাফের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্ ছমদ বা আব্দে শমছ ; তাঁহার পুত্র ওমিয়া হইতে বনি-ওমিয়া বা ওমিয়া বংশের সৃষ্টি । হাশেমের পুত্র (হজরত আদম [আলাঃ] হইতে ৮৭ তম অধঃস্তন পুরুষ) আবদুল মোত্তালেব ।

আবদুল মোস্তালেবের বহুসংখ্যক পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে আবুতালেব, মহাত্মা আবদুল্লা, ■■■■■ আকাছ (রাজিঃ), হজরত হামজা (রাজিঃ) বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ । আর অন্ততম পুত্র কাটা কাফের আবুলাহাব নবী-বিদ্বেষের ■■■■■ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । কোরআনের তাব্বাৎ এদা ছুরায় ইহার বিষয় বর্ণিত আছে ।

হজরত আদম (আলাঃ) হইতে ৮৮তম অধঃস্তন পুরুষে মহাত্মা আবদুল্লা ও আবুতালেব । মহাত্মা আবদুল্লার ঔরসে (৮৯তম অধঃস্তন পুরুষে) হজরত ছরওয়ারে কাসেনাত রছুলে আকরম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (ছালঃ) জন্মগ্রহণ করেন । পক্ষান্তরে ৮৮তম অধঃস্তন পুরুষ আবু-তালেব হইতে ৮৯ তম নিম্নতম পুরুষে হজরত আলী মরতুজা করমুজাহ-ওয়ারজহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত মহাজ্যোতিঃ হজরত আদম (আলাঃ) হইতে পুরুষ পরম্পরায় মহাত্মা আবদুল্লার ললাটে স্থাপিত হয় ; হজরত রছুল করিম (ছালঃ) সেই পবিত্র জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ মাত্র ।

হজরত আলী মরতুজার (কঃ—৩ঃ)

জন্মকথা ।

হজরত আলী মরতুজা (কঃ—৩ঃ)-এর ‘ওয়ারেদ মাজেদ’ (পিতা) আবুতালেব, ইহা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । আর তাঁহার মাতা হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বিস্তে-আসদ বিন্-হাশেম-বিন্-আব্দে মনাফ্ । হাশেম বংশীয়া মহিলাদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম—যিনি খাটি হাশেমী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহার সন্তানগণের পিতৃ ■■■■■ মাতৃ উভয় কুলই হাশেমী ছিলেন । এই গৌরবান্বিতা মহিলা মক্কার জন্মগ্রহণ ও মদীনায়া

পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ৪র্থ হিজরীতে, ৭০ বৎসর বয়সে ইনি মদীনা-তৈয়বায়ই পরলোক গমন করেন ; মৃত্যুকালে ইহার ৩ পুত্র বর্ষ ১ন ছিলেন, ১। হজরত ওয়াকিল (রাজিঃ), ২। হজরত জাফর তইয়্যার (রাজিঃ), ৩। হজরত আলী মরতুজা করমুল্লাহ্ ওয়াজহ্ । ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তালেব, কোরেশদিগের সঙ্গী হইয়া বদরের যুদ্ধে আসিয়া-ছিল, সে সেই যুদ্ধেই মারা পড়ে ।

আবুতালেবের প্রকৃত নাম আব্দে মনাফ্ ছিল, আবু-তালেব তাঁহার কুনিয়ত নাম ; অর্থাৎ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তালেবের পিতা বলিয়া এই নামে অভিহিত হইতেন ; এবং এই নামেই সাধারণতঃ তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর ওয়ালেদ মাজেদ মহাত্মা আব্দুল্লাহ জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন ; এজন্য ‘এতিম’ ও ‘এছির’ (পিতৃ মাতৃ-হীন) হজরত রহুল আকরম (ছালঃ)-এর ‘জদে-আমজহ্’ (পিতামহ) আবদুল মোত্তালেব, তাঁহার প্রতিপালনের ভার আবু-তালেবের প্রতি অর্পণ করিয়া যান । আবু-তালেবও তাঁহার সে কর্তব্য যথাযথ রূপে পালন করিয়াছিলেন । ভ্রাতৃপুত্রকে পুত্রদিগের অপেক্ষাও যত্নে লালন পালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই । আ হজরত (ছালঃ)-কে বিপদের শত্রুতাচরণ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই ।

হজরত আলী মরতুজা করমুল্লাহ ওয়াজহ্ ভ্রাতাদিগের কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তাঁহার দুইটা ভগিনীও ছিলেন ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম ওম্মেহানী (রাঃ—আঃ) ■ কনিষ্ঠার নাম জমানাঃ । জ্যেষ্ঠা ভগিনী পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । জমানাঃ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে ।

হজরত আলী (রাজিঃ)-এর নাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে—উভয় সময়েই আলী (রাজিঃ) ছিল । তাঁহার কয়েকটা ‘কুনিয়ত’

ছিল ; বধা :—আবুল হাসান, আবু তোরাব, আবুল আশ্বা, আবুল কহফ
 ■ আবু রায়হান। আবু রায়হানের অর্থ দুই ফুলের পিতা—অর্থাৎ হজরত
 এমাম হাছান (রাজিঃ) ■ হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)-এর জনক।

হজরত আলী (রাজিঃ)-কে “আবু-তোরাব” উপাধী, হজরত
 রেছালতমাব (ছালঃ) ই প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ উপাধী প্রদানের
 ২টী কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; ঐতিহাসিক এবনে এছহাক (রহঃ)
 কর্তৃক বর্ণিত আছে, প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত এমার-ইবনে-এয়াছর (রাজিঃ)
 এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি এবং হজরত আলী (রাজিঃ)
 আছিরের ‘গয়্ ওয়ায়’ (যেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে), হজরত রছুল করিম (ছালঃ)
 এর সঙ্গে একই স্থানে অবস্থিত ছিলাম ; তখন ‘মদলজ’ সম্প্রদায়ের
 একদল লোক এক ‘চশ্মায়’ (বরণায়) কাজ করিতেছিল ; হজরত আলী
 (কঃ—ওঃ) আমাকে বলিলেন, চল দেখি, এই সকল লোকেরা চশ্মায়
 কিরূপে কাজ করিতেছে। তদনুসারে আমরা উভয়ে চশ্মায় নিকটে
 গিয়া দেখিতে লাগিলাম, লোকেরা সেখানে কি ভাবে কাজ কর্ষ করে।
 চশ্মায় নিকটেই ছোট ছোট খেজুর গাছ পূর্ণ একটা বাগান ছিল, আমরা
 সেই বাগানে ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া অল্প কাল মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইলাম।
 একটু জোরে বাতাস বহিতেছিল ; স্ততরাং বালুক। রাশি উড়িয়া আসিয়া
 আমাদের বস্ত্রাদি ঢাকিয়া ফেলিল। অল্পকাল পরে জনাব হজরত রছুল করিম
 (ছালঃ) সেখানে আসিয়া আমাদেরকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন ;
 এবং আমাদের উভয়কে জাগাইলেন। যখন আমরা নিদ্রা হইতে জাগিয়া
 উঠিলাম, তখন তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে সম্বোধন করিয়া
 বলিলেন, “হে আবু তোরাব (মৃত্তিকার পিতা) ! আমি তোমাকে এমন
 দুই ব্যক্তির সন্ধান দিতেছি, যাহারা দুনিয়ার সমস্ত লোকের মধ্যে ‘বদ-
 বখ্ত’ (হতভাগ্য) ; তন্মধ্যে একব্যক্তি আহমির ছমুদ—যে ব্যক্তি

(হজরত) ছালেহ নবী (আলাঃ)-এর উষ্ট্রকে হত্যা করিয়াছিল, ২য় ঐ ব্যক্তি—যে তোমাকে শহীদ করিবে । ”

দ্বিতীয় রেওয়াজেত এই যে, একদা হজরত রুহুল করিম (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে তশরিক্ আনিলেন । তিনি স্বীয় হুহিতা-রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ! আলী (কঃ—ওঃ) কোথায় ? উত্তরে তিনি বলিলেন, তিনি আমার সঙ্গে রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন । ঐ হজরত (ছালঃ) একথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিলেন ; এবং হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সন্ধান করিতে করিতে মহজেদে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি দেখিতে পাইলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মহজেদ—প্রাচীরের গা ঘেসিয়া ভূতলে শুইয়া আছেন ; তাঁহার বস্ত্রে ও শরীরে ধূলা বালি আসিয়া উড়িয়া পড়িয়াছে । ইহা দেখিয়া তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর গায়ের ধূলা বালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন “ কয় এয়া আব্বা তোরাব’ (উঠ হে মুস্তিকার বাপ উঠ) ! ” এই সময় হইতেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কুনিয়তে “ আব্ব-তোরাব ” হইয়াছিল । এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর যে সকল ‘লকব’ (উপাধী) ছিল, তাহা এই :—বদয়াতুল বলদ, ২ । আমীন শরীফ, ৩ । হাদী, ৪ । মহতদি, ৫ । খিল-আওয়লন-ওয়াবিয়া, ৬ । হারদার কাররি, ৭ । লায়ীবরল আমাতা, ৮ । যোল-কারনিন, ৯ । ছিদ্দিক ।

এমাম আহমদ (রহঃ) মহনদ গ্রন্থে, বাবুল মোনাকাবে, আব্ব-লায়লাঃ (রহঃ) হইতে রেওয়াজেত করিয়াছেন যে, হজরত রুহুলে করিম (ছালঃ) করমাইয়াছেন, ছিদ্দিক ■ জন ; তন্মধ্যে প্রথম ছিদ্দিক ফেরাউনের বংশীর খরকিল নামক ইসলাম ধর্মাবলম্বী (একেশ্বরবাদী—তৌহিদ-পন্থী) মোমেন ব্যক্তি । যখন খোদা-দ্রোহী মেছের-রাজ হুরাচার ফেরাউন ■ তাহার ষড়যন্ত্র লোকেরা হজরত মুছা (আলাঃ) কে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল,

তখন এই ধরকিল দুর্দান্ত ফেরাউনের ■■■ কিকিয়াত্র ভীত না হইয়া
স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, কি, তোমরা ■■■ ব্যক্তিকে হত্যা করিবে,
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কে আপনার 'পরওয়ার দেয়ার' (সৃষ্টিকর্তা প্রভু)
বলিয়া অভিহিত করেন? দ্বিতীয় ছিদ্দিক আল ইয়াছিনে হবিব-বিন্-
মরি আলনেজার ছিলেন; পবিত্র কোরআন শরীফে ছুরে ইয়াছিনে
ইহার উল্লেখ আছে। আর তৃতীয় ছিদ্দিক আলী (রাজিঃ) বিন্-
আবিতালেব। ইনি পূর্বোক্ত দুইজন ছিদ্দিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আছহাবে কিল ঘটনার ৭ বৎসর পরে,
১২ই রজব তারিখে, পবিত্র মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সময় হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর
■■■ ছিল, তৎসময়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়।
প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবনে জওবি (রহঃ) লিখিয়াছেন, ৭ বৎসর, ■ বৎসর,
১০ বৎসর কিংবা ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া-
ছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সেই
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এ বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয় যে, কে প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। কোনও কোনও ইতিহাস-বেত্তা বলেন, হজরত রেছালত মাব
(ছালঃ)-এর 'আত্-লিয়া' (সহধর্মিণী) হজরত খোদারজাতুন-কোব্রা
(রাঃ—আঃ) সর্ব প্রথমে পবিত্র ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন।
কাহারও কাহারও মতে হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) আর কাহারও
কাহারও মতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্ব প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বালকদিগের মধ্যে হজরত আলী
(কঃ—ওঃ), বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক
(রাজিঃ), স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মোস্লেম-মাতা হজরত (খোদারজাতুল

কোব্রা (রাঃ—আঃ), আর ক্রীত দাসদিগের মধ্যে হজরত জুয়েদ-কিন্-হারছাঃ (রাজিঃ) সর্ব প্রথমে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একমাত্র তবুকের যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে (জেহাদে)ই হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত রুছল করিম (ছালঃ)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এবং শত্রুদলের সঙ্গে মহা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নামযাদাঃ বড় বড় বিদগ্ধ বীরপুরুষ তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একজন অস্বাভাবিক বীরপুরুষ ছিলেন; তাঁহার দেহ সুগঠিত ও সুডোল সম্পন্ন এবং মস্তক বৃহৎ ছিল। তিনি মস্তক মুণ্ডন করাইতেন। দাড়ি ঘন এবং সুদীর্ঘ ও কেশরাশি ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি খেজাব ব্যবহার করিতেন, কিন্তু ইহার রেওয়াজেত খুব দুর্বল। হয় ত জীবনে একবার খেজাব ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর কখনও খেজাব লাগান নাই। সমুদয় 'রাবি (বর্ণনা-কারী) রেওয়াজেত করিয়াছেন যে, তাঁহার দাড়ি সুদীর্ঘ, ঘন সন্নিবিষ্ট এবং 'ছফেদ' (শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ সাদা) ছিল; এই দাড়ির বর্ণনা বোধ তাঁহার বার্কাক্যের (শেষ জীবনের)। তাঁহার চক্ষুর বৃহৎ এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাঁহার উদরদেশ বৃহৎ এবং তাহাতে ও বক্ষঃস্থলে এবং সর্বাবয়বে প্রভূত লোমরাজি বিরাজ করিত।

আবু-সয়ীদ ওমিমি (রাজিঃ) হইতে রেওয়াজেত আছে যে, বাল্যকালে একদা আমরা মক্কা শরীফের বাজারে কাপড় বিক্রয় করিতেছিলাম। ঐ সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঐ বাজার দিয়া গমন করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার বৃহৎ পেট দেখিয়া "বোযর্গ শেকম—বোযর্গ শেকম" (বৃহৎ উদর, বৃহৎ উদর) বলিয়া লালাইতে ছিলাম। তচ্ছুবশে তিনি আমাদেরকে বলিলেন, "তোমরা ইহা কি কথা বলিতেছ?" তদুত্তরে আমরা বলিলাম, আমরা বলিতেছি যে আপনি বৃহৎ পেট-ওয়ালা। আমাদের কথা শুনিয়া তিনি

জৈয়ৎ হাসিয়া বলিলেন, “ ইহা, উহার উপরে ‘এলেম’ (বিজ্ঞা) ও ভিতরে খালি দ্রব্য আছে । তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ■ উভয় ‘শানের’ (স্বচ্ছদেশের) মধ্যস্থলে ব্যবধান বেশী ছিল । গ্রীবদেশ লম্বা ছুরাইয়ের আকার বিশিষ্ট ■ ‘হাথলী’ মাংসল ছিল । তিনি একটু, ‘পস্তুকদ’ (বেঁটে আকারের) ছিলেন ; চেহেরা হাস্তোন্মুখ এবং শরীরের বর্ণ উজ্জল (চাকচিক্য বিশিষ্ট) ছিল ।

অনেক আরবীয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ১লা রজব শুক্রবারে আবুতালেবের সহধর্মিণী বিবী ফাতেমা একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন । ■ দিনে শুভক্ষণে অল্পময় রূপ-লাবণ্য বিশিষ্ট পুত্ররত্ন লাভ করিয়া প্রমুখিত অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । তিন পুত্রের পর ইহা তাঁহার শেষ বা চতুর্থ পুত্র । প্রিয় দর্শন হজরত আলী (রাজিঃ) মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই একজন পরিচারিকা গিয়া আবুতালেবকে এই ■ সংবাদ দিল । আবুতালেব এই শুভ সংবাদ শ্রবণে উৎফুল্ল-চিত্তে নবজাত শিশুর বদন কমল দর্শনাভিলাষে প্রসব গৃহে আগমন পূর্বক, পুত্রের অলোক সামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে স্নেহরসে পরিপ্লুত হইলেন । পরে যথাসময়ে তাঁহার নাম আলী (রাজিঃ) রাখা হইল । অনেক ঐতিহাসিকের মতে আবু হজরত (ছালঃ) ই এই শিশুর “ আলী ” (রাজিঃ) নাম রাখিয়া ছিলেন ।

আবুতালেবের পরিবারে লোক সংখ্যা অনেক, কিন্তু তদনুযায়ী আয়ের পরিমাণ কম ছিল, কাজেই সচ্ছলতার সহিত তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্বাহ হইত না । আবু হজরত (ছালঃ) এই সময় বিবাহ করিয়া মোছলেম-মাতা ■ খোদায়জাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে বাস করিতেছিলেন । ঐ সময় মকায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মহামতি আবুতালেব আরও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন । তদর্শনে আবু হজরত (ছালঃ) স্বীয় অন্ততম পিতৃব্য হজরত আব্বাহ (রাজিঃ) কে বলিলেন, দেখুন, বড় পিতৃব্য ছাহেব বির্যট সংসারের

ব্যয়-ভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন ; আত্মন আমরা উভয়ে তাঁহার দুইটা পুত্রের প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করি । পিতৃব্য সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, উভয়ে গিয়া আবৃত্তালেবের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন । তিনি দ্বিতীয় পুত্র আকিল ব্যতীত আর যাহাকে যাহার লইতে ইচ্ছা, তাহা-দিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য লইতে সম্মতি দান করিলেন । তদনুসারে হজরত আব্বাহ (রাজিঃ) তৃতীয় পুত্র হজরত জাফর তইয়্যারকে, এবং আঁ হজরত (ছালঃ) সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র হজরত আলী (রাজিঃ) কে প্রতিপালন-জন্ত গ্রহণ করিলেন । সেই সময় হইতে হজরত আলী (রাজিঃ) আঁ হজরত (ছালঃ) কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন । মোসলেম-মাতা হজরত খোদায়জাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) ■ তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন করিয়াছিলেন । এই সময় আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বয়স ■ বৎসর ও হজরত আলী (রাজিঃ)-এর বয়স ■ বৎসর মাত্র ছিল । সুতরাং এই হিসাবে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আঁ হজরত (ছালঃ) হইতে ৩০ বৎসর বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন । আর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পয়গম্বরী লাভের ■ বৎসর পূর্বে তিনি হজরত আলী (কঃ ওঃ)-এর প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং এই হিসাবে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যখন আঁ হজরত (ছালঃ) পয়গম্বরী লাভ করিয়া-ছিলেন, তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়স ১০ বৎসর ছিল ; এবং ইহার প্রায় ১৩ বৎসর পরে যখন আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনা তৈয়বায় করেন, তখন হজরত আলী (রাজিঃ)-এর বয়ঃক্রম ২২ বৎসরের উপর—অর্থাৎ প্রায় ২৩ বৎসর হইয়াছিল । এই বয়সেই তিনি আরব দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন ।

হজরত আলী (রাজিঃ)-এর জীবনকাল ■ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ■ পর্য্যন্ত প্রথম অংশ ;

আ হজরত (ছালঃ)-এর 'এস্তেকাল' পর্যন্ত তৃতীয় অংশ ; তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় অংশ ; এবং স্বীয় খেলাফত কাল, অর্থাৎ শাহাদৎ-প্রাপ্তি পর্যন্ত চতুর্থ বা শেষ অংশ । তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ শৈশবে ও যৌবনের প্রারম্ভ কালে অতিবাহিত হইয়াছিল । এই সময় মধ্যে তিনি প্রথমতঃ মামুলী শিক্ষা লাভ, যুদ্ধ বিজ্ঞা শিক্ষা এবং আ হজরত (ছালঃ)-এর সাহচর্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন ; [] (ছালঃ)-এর পদানুসরণ করিয়া সর্বপ্রকার গুণ-গ্রামে বিতুষিত হইয়াছিলেন । এই সময় মধ্যে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয় ; এবং তাঁহার মাতৃ-সমা মোস্লেম-মাতা হজরত খোদায়জাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করিয়াছিলেন ; তিনি স্বয়ং পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইসলামী রীতি-নীতি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করেন । সেই সময় আ হজরত (ছালঃ) মক্কার কোরেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় [] তায়েক বাসীদিগের দ্বারা নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হন । এই সকল ঘটনা তাঁহার চক্ষের উপর ঘটিয়াছিল । তাঁহার পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে এই সময়ের বিস্তৃত বিবরণ তেমন কিছু পাওয়া যায় না । তবে এইটুকু বেশ জানা যায় যে, তিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর একান্ত অনুরক্ত [] সম্পূর্ণ পদানুসরণ কারী ছিলেন, এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সদগুণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন । মোটের উপর ২২।২৩ বৎসর বয়সেই তিনি একজন আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন ; আল্লাহ তা-বার পরম ভক্ত মহাসাধকের পদলাভ করিয়াছিলেন । আ হজরত (ছালঃ) যে 'হেরা' নামক নির্জন গিরি-গুহার একাগ্রচিত্তে পরম করণাময় আল্লাহ তা-বার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, এবং সুদীর্ঘ ৯।১০ বৎসর কাল সেই অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, উহাও [] আলী (রাজিঃ)-এর হৃদয়ে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিল । তাঁহার হৃদয়েও আল্লাহ তা-বার পবিত্র প্রেম বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল । পিতার

জীবিত অবস্থায় ■ তিনি আ ■■■■■ (ছালঃ)-এর কাছ-ছাড়া হইতেন না।

আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় প্রতিপালিত ভাতাকে কেবল সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত ছিলেন না; স্বীয় সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য প্রাথমিক মোছলমান, নানাবিদ্যা ও নানাশুণের আধার হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) কে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শিক্ষা দানের অন্য নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। ওরূপ উপযুক্ত ও আদেশ শিক্ষা-গুরু তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পবিত্র কোরআনের তফ্‌হির, কোরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় অতি উন্নত ধরণে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আবার হজরত আলী (রাজিঃ)-এর নিকট পূর্ণভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার 'চাচাবাদ' ভাই (পিতৃব্য-পুত্র) হজরত আবদুল্লা-বিন-আব্বাহ (রাজিঃ), মোস্লেম-জগতে তদানীন্তন কালের বিদ্বান যুগলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সমগ্র জীবন কাল ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ—আ হজরত (ছালঃ)-এর মদানা শরীফে হেজরত করা পর্যন্ত প্রধানতঃ বিদ্যা শিক্ষা ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষায়ই পর্যাবসিত হইয়াছিল। আ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহ ■ ভালবাসায় তিনি পিতার অভাব ■ অনুভব করিতে পারেন নাই। মাতা জীবিত থাকিলেও মাতৃ সম স্নেহ-কারিণী ভ্রাতৃ-জন্মার স্নেহের একান্ত বশীভূত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। আ হজরত (ছালঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রয়ের ও ইতিমধ্যে পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। হজরত আলী (রাজিঃ) আ হজরত (ছালঃ)-এর পরিবারেরই একজন ছিলেন। মোছলেম-মাতা হজরত খোদারজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যুতে, আ ■■■■■ (ছালঃ)-এর সোণার সংসার কিরূপ

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । ঐরামী গৃহে গমন করাতে একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ—খাঃ)ই তাঁহার সংসারের 'চেরাগ' (প্রদীপ) স্বরূপ ছিলেন । আর স্নেহের লাভা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও পরম ঐক্যদাস হজরত জয়েদ (রাজিঃ) বিন্-হারেছা (রাজিঃ) তাঁহার সহকারী স্বরূপ ছিলেন । অবশ্য অন্য শিষ্য-সেবক অনেকেই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন ; তন্মধ্যে হাবশী ক্রীতদাস হজরত বেলাল (রাজিঃ)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । হজরত জয়েদ (রাজিঃ) বিন্ হারেছা ■ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে একত্রে, হজরত হিন্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ।

আ হজরত (ছালঃ) ও অন্যান্য ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের মদীনায হেজরত করিবার সময় হইতে হজরত আলী (রাজিঃ) কক্ষক্ষেত্রে সর্ব প্রথমে আবির্ভূত হন । আ হজরত (ছালঃ) যে দিন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোলা কর্তৃক অহিযোগে মদীনায হেজরত করিতে আদিষ্ট হইলেন, সেই দিনই তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায যাইবার প্রস্তুত হইলেন । অন্যান্য প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ ইতিপূর্বেই ক্রমশঃ মদীনায চলিয়া গিয়াছিলেন । হজরত ছারওয়ারে কারেনাত (ছালঃ), হজরত আবুবকর হিন্দিক (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন, এদিকে মক্কার কোরেশগণ ঐ দিবাগত রাত্রেই তাঁহাকে হত্যা করিবার যোগাড়-যন্ত্র করিয়াছিল । কিন্তু খোদা তোলা যাহার সহায়, কাহার সাধ্য তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করে ■ কাকেরগণ তাঁহার গৃহের চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া থাকিলেও, তিনি রাত্রিযোগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন, তাহা তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না । হজুর (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ) কে গৃহে রাখিয়া গেলেন ; কাকেরগণ মনে করিল, তিনি গৃহেই

আছেন ; অতি প্রত্যুষে গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিবে । যখন রাত্রি অবসান হইল, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফজরের নমাজ পড়িবার জন্য গাছোথান করিলেন, এবং 'রফায় হাজত' ■ ওজু করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইলেন, তখন গৃহাবরোধকারী কাফেরগণ তাঁহাকে রুঢ় ঘরে জিজ্ঞাসা করিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) কোথায় ? হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমি তাঁহার সংবাদ জানি না । সে সংবাদ ত তোমাদেরই জানা থাকা উচিত, কারণ তোমরা সারারাত্রি এই গৃহের পাহারায় নিযুক্ত ছিলে । এইস্থলে অন্য রূপ রেওয়াজেত ও দৃষ্ট হয় । সেই বর্ণনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) চাদরে সর্বাপেক্ষা ঢাকিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, কাফেরগণ ঘরে প্রবেশ পূর্বক তাঁহাকে জাগাইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কথা জিজ্ঞাসা করিল । তিনি পূর্বোক্ত রূপ উত্তর করাতে চূর্বৃত্ত কাফেরগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া প্রহার করিল ; এবং কিস্তকাল বন্দী অবস্থায় রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিল ।

আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি কোরেশ এবং মক্কা বাসিগণ ভীষণ শত্রুতা ও অমানুষিক অত্যাচার করিলেও, তাঁহাকে " আল-আমীন " বলিয়া ডাকিত, এবং তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত 'আমানতদার' বলিয়া জানিত ; তদনুসারে বহু লোকের অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী তাঁহার নিকট 'আমানত' (গচ্ছিত) ছিল । সেই সকল আমানতকারী লোক দিগকে তাহাদের টাকাকড়ি ও জিনিষ-পত্র বুঝাইয়া দেওয়ার জন্যই তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে স্বীয় গৃহে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন । নচেৎ ■ ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতেন ; কিংবা অন্ত্যস্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের সঙ্গে পূর্বেরই মদীনার পাঠাইয়া দিতেন । বাহা হউক, অতঃপর ■ আলী (কঃ—ওঃ) সমুদয় 'আমানতি' (গচ্ছিত) অর্থ ■ দ্রব্য-সামগ্রী উহার মালেক (স্বত্বাধিকারী) দিগকে বুঝাইয়া বা পঁছাইয়া দিলেন ।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব তাঁহার প্রণীত “ মোস্তফা চরিত ” হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সম্বন্ধে এই ব্যাপার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, “ ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা প্রথমে হজরত আলীকে গ্রেপ্তার করিয়া কাবার লইয়া যায় এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার ‘পুষিদ’ করিয়া জিজ্ঞাসা করে,—‘বল, মোহাম্মদ কোথায় ?’ আলী কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন, ‘তাঁহার গতি বিধির উপর নজর রাখিবার জন্য তোমরা আমাকে চাকর রাখিয়াছিলে নাকি ?—যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ।’ বাহা হউক, কতকক্ষণ উৎপীড়ন করার পর, তাহারা সকল দিক্ চিন্তা করিয়া আলী কে ছাড়িয়া দিল । ”

আ হজরত (ছালঃ) মক্কা হইতে মদীনার রওয়ানা হইয়া, হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে, প্রথমে মদীনার শহরতলি “ কোবা ” নামক স্থানে রবিবার দিন পঁহুঁছিয়াছিলেন ; পরবর্তী জুমার দিন (শুক্রবার) পর্যন্ত তিনি কোবার অবস্থান করিলেন । হজরত রচুলে আকরম (ছালঃ) কোবার থাকিতে থাকিতেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মক্কা হইতে কোবার—আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিয়া পঁহুঁছিলেন । এই সুদীর্ঘ এবং দুরতিক্রম্য পথ তিনি পদব্রজেই অতিক্রম করেন । তিনি শত্রুদল কর্তৃক ধৃত বা নিহত হওয়ার আশঙ্কায় দিবাভাগে কোনও গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিতেন, এবং রাত্রিকালে যথাসাধ্য দ্রুতগতি পথ অতিক্রম করিতেন । এই কয়েক দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে একাকী গমন পূর্বক তিনি কোবার আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন । আ হজরত (ছালঃ) যে কয় দিন ছুর বা ছুর গিরি-গহবরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সেই কয় দিনে, হজরত (ছালঃ)-এর নিকট গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী উহার ‘মালেক’ (স্বত্বাধিকারী) দিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । আবার ঘটনার সাময়িক্য এমনই বিস্ময়কর যে,

যে দিন আ হজরত (ছালঃ) এবং ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) সুর (ছওয়) গিরি-গহ্বর হইতে মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সেই দিনই মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। আ হজরত (ছালঃ) ও হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) উষ্টারোহণে গমন করিয়া ছিলেন বলিয়া ৮ দিনে কোবায় পহুঁছিয়াছিলেন। অসুসরণকারী শত্রুর ভয়ে তাঁহারা অনেক স্থলেই সাধারণ পথ পরিত্যাগ পূর্বক, সাধারণ পথের দক্ষিণ কিংবা বামদিকে সরিয়া গমন করিয়া ছিলেন ; আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ‘পায়দল’ (পদব্রজে) গমন করাতে, ৩৪ দিন পরে কোবায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাঠক ! এই স্থলেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের প্রথম পর্ব শেষ হইল। হিজরীর প্রথম সাল হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব বা দ্বিতীয় ‘দওড়’ আরম্ভ হইয়াছিল।

হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব।

(তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ, আ হজরত (ছালঃ)-এর
সঙ্গে বিভিন্ন জেহাদে অপূর্ব বীরত্ব প্রকাশ)।

এইবার তাপস শ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের ২য় পর্ব আরম্ভ হইল। ইহার স্থিতিকাল একাদশ বৎসরের কিছু উপর। এ সময় তিনি তরুণ যুবক, তখনও বিবাহ হয় নাই। আ হজরত (ছালঃ)-এর সর্ববিধ আদেশ পালনই তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। আ হজরত (ছালঃ) সদলবলে সুদূরবর্তী মদীনার আসিয়াও খোদা-দ্রোহী

পৌত্তলিক কোরেশদিগের বৈরাচরণ হইতে অব্যাহতি পান নাই। উহারা তাঁহাকে এবং মুষ্টিমেয় মোছলমানকে বিধ্বস্ত করিতেও তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর। তাহারা গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাঁধাইতে সম্পূর্ণ ভাবে সমুৎসুক। কত ঘড়ঘস, কত কুটিলতা, কত দাগা-কেরেব তাহারা করিতেছিল। আ হজরত (ছালঃ) কে হত্যা (শহীদ) করা তাহাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। এতৎ সম্বন্ধে মদীনায় পৌত্তলিক, যিহুদী ও মোনাফেক (কপট) গণ মোছলমানদিগের তাহারা অতি গোপনে ঘড়ঘস পাকাইত।

বদরের মহাযুদ্ধ।

যাহা হউক, কোরেশ দলের অন্যতম নেতা, আ হজরত (ছালঃ)-এর প্রচণ্ড শত্রু আবুজহল এক প্রবল সেনাদল লইয়া মোছলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য মদীনাভিমুখে আগমন করিল। তাহাদের দলে নিম্ন-লিখিত খ্যাতনামা কোরেশ এবং মক্কার অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছরদার (দলপতি) গণ ছিল ; যথা :—আবুজহল, ওক্বাঃ, শয়বাঃ, অলিদ, হন্থলাঃ, আবিদা, আছি, হরহ, তায়েমাঃ, যমআঃ, আবুল নজ্জতরি, মসুউদ, আবু কায়েস, মনবীয়াঃ, মনবাঃ, নওফল, ছায়েব, রফায়া প্রভৃতি। আ হজরত (ছালঃ)-এর পিতৃব্য আব্বাস-বিন্-আবদুল মোত্তালেব, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান, আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ■ আকিল ও এই কোরেশ সেনা দলের সঙ্গে ছিল। আ হজরত (ছালঃ) যথাপময়ে এই প্রবল অভিযানের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি আব্ররক্ষা এবং শত্রুদলের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ ৩১০ হইতে ৩১২ বা ৩১৩ জন বোদ্ধপুরুষ মাত্র সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে

বদরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । আবার ইহাদের মধ্যে কয়েকজন অতি
 অল্প বালক ছিল বলিয়া তাহাদিগকে গৃহে বিদায় দেওয়া হইল । এই
 সৈন্যদলে দুইজন মাত্র অস্বারোহী ছিলেন ; হজরত যোবের (রাজিঃ) ও
 হজরত মেকদাদ (রাজিঃ) । আর উষ্ট্র সংখ্যা ছিল ৭০টি, তন্মধ্যে ৩৮ জন
 করিয়া যোদ্ধা পুরুষ প্রত্যেক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছিলেন । যে উষ্ট্রে স্বয়ং
 আ হজরত (ছালঃ) আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও আরও দুই জন
 অস্বারোহী ছিলেন ; তদ্ব্যতীত কতিপয় যোদ্ধা পদব্রজেও গমন করিয়াছিলেন ।
 এই ক্ষুদ্র-সৈন্যদল “ বদরে ” উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন ; মকার
 “ কোফ্ফার ” গণ প্রথম হইতেই এক উচ্চ ভূ-খণ্ড অধিকার করিয়া,
 তাহাতে তাম্বু খাটাইয়া বাস করিতেছে । সুতরাং মোছলমানদিগকে
 বালুকাভূমি নিম্নভূমিতেই আপনাদের “ ডেরা-তাম্বু ” কেলিতে হইল ।
 কিন্তু বদরের পাহাড় হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ‘চশমাঃ’ (নিখারিণী বা ঝরণা)
 বাহির হইয়া নিম্নদিকে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা মোছলমানদিগের আশ্চর্য
 আশিয়া গেল । আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের
 মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন, শত্রু পক্ষীয় লোকেরা চশমাঃ হইতে পানী
 লইতে আসিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিবে না । ছাহাবাঃ
 (রাজিঃ) গণ আ হজরত (ছালঃ)-এর অবস্থান জন্য একটি বুপড়ি (পণ-
 শালা বা পাতার কুটীর) নির্মাণ করিয়া দিলেন ; তিনি তাহাতে বসিয়া
 ‘এবাদত’ ও প্রার্থনা করিতেন । শত্রুসৈন্য এক সহস্র এবং মোছলমান যোদ্ধা
 পুরুষ ৩০০ তিন শত (এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও কম) ছিলেন । আবার
 তাহাদের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কোরেশদিগের একশত ভাগের একভাগও
 ছিল না । কোফ্ফারদিগের সকলে মকার বাছা বাছা যোদ্ধাপুরুষ, দৃঢ়কায়,
 বলিষ্ঠ, যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং ‘যরাঃপোষ’ (বর্ম্মাবৃত) ছিল ।
 মোছলমানগণ সাধারণতঃ ‘ফাকা বাদাঃ’ (ক্ষুধাতুর), ‘নাতোয়ান’ জীর্ণ-শীর্ণ

দুর্বল ছিলেন । আবার তাঁহাদের মধ্যে মহাজের সংখ্যা খুব অল্প । আনুহার সংখ্যা বেশী ছিল । মক্কাবাসীর তুলনায় মদীনাবাসিগণ শৌর্য-বীৰ্য ও পরাক্রমে অনেক হীন ছিলেন । সাধারণ যুদ্ধাঙ্গণ নিয়মিত রকম সকলের নিকট ছিল না । কাহারও নিকট কেবল তরবারি ছিল, 'নেযাঃ' (বস্ত্র বা বড়শা বিশেষ) কিংবা তীর ধনুক ছিল না ; কাহারও নিকট কেবল তীর-ধনুক ছিল, তরবারি বা নেযাঃ ছিল না । পক্ষান্তরে কোরেশ কোফ্ফারগণ সর্ব-প্রকার উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল ; তাহাদের কোনও অস্ত্রেরই অভাব ছিল না । আরবের সর্বোৎকৃষ্ট জাতীয় বিশ্ব-বিশ্রুত অশ্বই তাহাদের ছিল ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) অসম সাহসী ও যুদ্ধ বিজ্ঞান বিশেষ পারদর্শী হইলেও, এতাবৎ কাল তিনি সেই বীরত্ব প্রকাশের কোনও সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন না । কারণ ইতিপূর্বে মোছলমানদিগের সঙ্গে কাফেরদিগের কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই । এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ১৭।১৮ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে ছিল । যাহা হউক, ২য় হিজরীর ১৭ই রমজানুল মবারক প্রাতঃকালে এই পবিত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল । আ হজরত (ছালঃ) যুদ্ধারম্ভের পূর্বে, স্বীয় সেই ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে প্রবেশ করিলেন । আর করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে আল্লাহ্ তা-লার মহাদয়বारे এই বলিয়া 'দোওয়া' (প্রার্থনা) করিতে লাগিলেন, হে করুণা সিদ্ধ আল্লাহ্ তোলা, যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটির ধ্বংস সাধন কর, তবে পৃথিবীতে তোমার 'এবাদত' (পূজা—উপাসনা) করিবার জন্ত আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না । তৎপর তিনি দুই রেকায়াত নমাজ পড়িলেন । অতঃপর অল্প সময়ের জন্ত তাঁহার ভাবাবেশ হইল । ইহার পর তিনি মুচ্কি হাসির সঙ্গে সেই কুটীর হইতে বাহিরে আসিলেন, এবং প্রফুল্ল বদনে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের নিকট ফরমাইলেন, এই যুদ্ধে কোফ্ফার সৈন্যদিগের পরাজয়

যদিবে ; আর তাহারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে ।

মোছলমান সৈন্য দলে ৮০ জন মহাজেরিন, অবশিষ্ট সকলেই আনুছার (মদীনাবাসী) ছিলেন । আবার আনুছার দিগের মধ্যে আওস সম্প্রদায় ভূক্ত ছিলেন ৬০ জন ; আর খজ্রয় বংশীয় ছিলেন ১৭০ জন । এক্ষণে দুই প্রতিপক্ষ সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল । অাঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে একটা তীর ছিল ; তিনি তদ্বারা ‘এশারা’ (ইদিত) করিয়া-সৈন্যদিগকে প্রেরণা করিতে ছিলেন । ইহার পর তদানীন্তন আরবীর যুদ্ধের নিয়মানুসারে কোফ্‌কার দলের পক্ষ হইতে রবিয়ার পুত্র ওতবাঃ ■ জদীর ভ্রাতা শরিয়েনাঃ এবং অলিদ-বিন্-ওতবাঃ সর্ব প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল ; আর অতি দর্প সহকারে মোছলমান যোদ্ধাপুরুষদিগের মধ্য হইতে ■ জন প্রতিদ্বন্দ্বী-বোকা তলব করিল । ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আনুছার দল হইতে মরোক্ (রাজিঃ), ■ ময়োজ (রাজিঃ) নামক আদরাআর দুই পুত্র এবং আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন ; তদর্শনে ওতবাঃ বলিল, “মান্-আনুতুম” তোমরা কে হও । তদুত্তরে তাহারা বলিলেন, “দাহতুন্ মিনাল্ আনুছারে” আমরা আনুছার অর্থাৎ মদীনাবাসী । ওতবা নিতান্ত গর্বিত ও তাচ্ছিল্য ভাবে বলিল, “মাল্না বেকুম মান হাজতাঃ” তোমাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই । পরে উক্কেঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, “এরা মোহাম্মদ (ছালঃ) আখ্ রজালেনা আকুফা আনা মিন্ কওমেনা” হে মোহাম্মদ (ছালঃ) আমাদের সঙ্গে হৃদয়যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের ‘যাত-বেরাদরি’ (স্বজাতীয় ও স্ব-বংশীয়) অর্থাৎ কোরেশদিগের মধ্য হইতে মোহাজেরিনদিগকে পাঠাও । তচ্ছ বণে অাঁ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, ওতবার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য

হামযাঃ-বিনু-আবদুল যোস্তালেব (রাজিঃ), ওত্বার
 আতা শায়ীয়েবার যুদ্ধ করিবার জন্য যোবায়দা-বিনু-
 আল হরহ (রাজিঃ), আর ওত্বার পুত্র অলিদের
 বিরুদ্ধে আলী-বিনু-আবিতালেব (রাজিঃ) গমন করুক ।
 এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র উপরোক্ত ৩ জন ছাহাবাঃ—বিখ্যাত গীরপুরুষ
 মহোৎসাহে ■ মহোন্মাদে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন, আর পূর্বোক্ত আনছার
 (রাজিঃ)-ওর ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন । ওত্বাঃ ইহাদের ৩ জনের
 নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—যদিও সে ইহাদিগকে বিশেষভাবেই
 চিনিত । তাঁহারা স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিলে সে বলিল, হাঁ, তোমাদের
 সঙ্গে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিব । অতঃপর উভয় প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে
 যুদ্ধ বাধিয়া গেল । হজরত হামযাঃ (রাজিঃ) ও হজরত
 আলী (রাজিঃ), তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বা যোদ্ধা ওত্বা ও
 অলিদ—পিতা-পুত্র উভয়কেই তরবারির এক এক
 আঘাতে ‘কতল’ (নিহত) করিয়া ফেলিলেন । শায়ীয়ে-
 বার সঙ্গে যুদ্ধে হজরত যোবেদাঃ (রাজিঃ) এমন ভীষণ
 ভাবে আহত হইলেন যে, সে আঘাতে তাঁহার প্রাণ
 রক্ষা হইল না ; তিনি অল্পকাল মধ্যেই সেই স্থলে
 শাহাদত প্রাপ্ত হইলেন । তদর্শনে শেরে খোদা—
 আল্লাহ্ তীলার শাদ্দুল হজরত আলী (কঃ—৩ঃ)
 তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে
 শায়ীয়েবার মুণ্ডপাত করিলেন ; এবং হজরত যোবেদাঃ
 (রাজিঃ)-এর মৃতদেহ আনিয়া অঁা হজরত (চামঃ)
 এর খেদমতে উপস্থিত করিলেন, ইহার পর কোন্‌ফার শ্রেণী
 বদ্ধভাবে মোছলেম যোদ্ধাপুরুষদিগকে আক্রমণ করিল । পক্ষান্তরে

মোহলমানগণ ■ তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের ■ সবে
 "আব্বাহ আকবর" ধ্বনিতে রণক্ষেত্র কাঁপাইয়া, তাহাদিগকে :ভীম
 ■ আক্রমণ করিলেন। এক্ষণে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
 উভয় সৈন্য দল পরস্পর মিশিয়া গিয়া, পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ
 করিতে লাগিলেন। উভয় প্রতিপক্ষ দলই বীরত্বের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে
 কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর কোফ্ফার
 আপনাদের ৭০ জন বীরপুরুষকে নিহত ■ ২০ জনকে বন্দী হইবার
 সুযোগ প্রদান পূর্বক, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি দুর্দশার সহিত
 পলায়ন করিল। এই পবিত্র যুদ্ধে মোহলমানগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া
 ছিলেন। মক্কার কোফ্ফারদিগের বড় বড় 'ছরদার' (দলপতি), বড়
 বড় 'নামযাদাঃ' বীরপুরুষ নিহত হইয়াছিল। আর মোহলমানদিগের
 পক্ষে মাত্র ১৪ জন ছাহাবাঃ কারাম (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন, ■
 ৬ জন মোহাজেরিন ■ ৮ ■ আনুহার। ২০ জন মক্কাবাসী বন্দী হইয়া-
 ছিল; তদানীন্তন যুদ্ধ-নীতি অনুসারে ইহাদিগকে বধ করাই সাধারণ প্রথা
 ছিল; কিন্তু আব্বাহ হজরত (ছালঃ) দয়া-পরবশ পূর্বক 'কিদিয়া (মৃত্যু-পণ)
 গ্রহণ পূর্বক ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অম্যান ২ লক্ষ দরহম মুক্তিপণ
 মোহলমানগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত পলায়িত কোরেশদিগের
 বিপুল রণ-সম্ভার, অশ্ব, উষ্ট্র, ডেরা-তাম্বু, রসদ প্রভৃতি মোহলমানদিগের
 হস্তগত হইয়াছিল। বন্দীদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে 'কতল' (হত্যা)
 করিবার ■ আব্বাহ হজরত (ছালঃ) আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন;
 তন্মধ্যে একজন বহু-আব্দে-দার বংশীয় নবর বিন্-আল্-হারছ-বিন্-
 কালাহ, আর একজন স্বকবাঃ-বিন্-আবি মায়ত, বিন্-আবি ওমর-
 বিন্-লয়িয়াঃ। ইহারা উভয়ে আবুজহলের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, আব্বাহ
 হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি বিশেষ রূপ শত্রুতাচরণে ও তাঁহার প্রাণবধ ■

বিশেষ উচ্চোগী এবং কাষ্টা কাফের ছিল। তন্মধ্যে নযর-বিনু-
আল হারেছকে হত্যা করিবার ভার হজরত আলী
(রাজিঃ)-এর প্রতি অর্পিত হয়। তিনি উহার যুগপাত
করেন। এই যুদ্ধে তরুণ বয়স্ক হজরত আলী (রাজিঃ)
যে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার
পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক ছিল। কোরেশ দলের অতি
প্রসিদ্ধ বীর ওতবার পুত্র অলিদ ও ওতবার ভ্রাতা
শায়য়েবাকে অতি অল্প আয়াসেই হজরত আলী (রাজিঃ)
নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধেই
হজরত আলী (রাজিঃ) বীরেন্দ্র সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শুভ-বিবাহ ।

দ্বিতীয় হিজরীতে—বদর যুদ্ধের পরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর
সঙ্গে, আবু হজরত (ছালঃ)-এর প্রিয়তমা সখ্যকনিষ্ঠা কন্যা, হজরত কাতোমাঃ
জোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের
তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, ইহা নিশ্চিত
যে, পবিত্র রমজান মাসে এই শুভ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমে
হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে
বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন ; হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি
আল্লাহ তায়ালার ওহীর অপেক্ষা করিতেছি। পরে হজরত ওমর ফারুক
(রাজিঃ) বিবাহের প্রস্তাব করেন, তাঁহাকেও আবু হজরত [ছালঃ] ঐ
উত্তরই দেন। অবশেষে আলী (কঃ—ওঃ) হজুরের খেদমতে
উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আদরের সঙ্গে বিবাহের ‘পরগাম’ দেন (প্রস্তাব

করেন)। এক রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এই প্রস্তাব শ্রবণে আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় দুহিতা-রত্ন হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে আসিয়া বলিলেন, যা ফাতেমাঃ ! আলী তোমাকে বিবাহ করিতে চায়। জনাব ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এই কথা শুনিয়া চূপ হইয়া রহিলেন।

যাহা হউক, আ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (রাজিঃ)-এর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন—বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে রমজান মাসে বিবাহ ছফর মাসে ‘খলুত্’ হইল। জাকর-বিন্-মোহাম্মদ (রহঃ) হইতে রওয়ায়েত হইয়াছে যে, রজব মাসের শেষভাগে বিবাহ ও বেলহজ্জ্ মাসে ‘খলুত্’ হয়। ৪৮০ দরহম মোহর (দেন-মোহর) নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বিবাহের সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর ও হজরত ফাতেমাঃ জোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বয়ঃক্রম ৬ মাস—মতান্তরে ১৮ বৎসর ছিল; এই বিবাহ সম্বন্ধে মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খান ছাহেব স্ব-প্রণীত “মোস্তফা-চরিতে” যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, হজরত তাঁহার প্রাণ প্রাণীম কন্যা বিবি ফাতেমাকে হজরত আলীর সহিত বিবাহিত করিলেন। হজরত আলীর সম্বলের মধ্যে ছিল একটা বর্ষ—বদর যুদ্ধের ‘গণিমত্’ হইতে এই বর্ষটী তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল। এইটি বিক্রয় করিয়া যে কয়টা টাকা পাওয়া গেল—তাহাই-মোহররূপে প্রদত্ত হইল। স্বয়ং হজরত খোৎবা পড়িয়া আলি ও ফাতেমাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই দম্পতি যুগলের বিশেষত্ব ও মহিমা বর্ণনা করিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করার আবশ্যক। এখানে ঐতিহাসিক হিসাবে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহারাই ছৈয়দ বংশের

আদি জননী, এবং এমাম হাছন ও এমাম হোছেন ইহাদিগেরই
হুলাল । (১)

মদীনার উপকণ্ঠে—শহরতলিতে প্রধানতঃ ৩ সম্প্রদায়ের যিহুদী
বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং প্রভাব-সম্পন্ন ছিল । উহাদের নাম এই—
(১) বনি-কিন্কার, (২) বনি-নযির, (৩) বনি-করিয়াঃ । আবদুল্লা-
বিন্-আবি ইহাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল । একদা বনি-
কিন্কার বস্তিতে একটি মেলা উপলক্ষে, একটি মোছলমান মহিলাকে
অপমান করার দরুণ মোছলমানদিগের সঙ্গে তাহাদের বিবাদ ও মারামারি
আরম্ভ হইয়া, পরে উহা একটি যুদ্ধের আকার ধারণ করে । অল্পসংখ্যক
মোছলমানকে যিহুদিগণ খুব নির্যাত্তিত করাতে, সেই সংবাদ আ হজরত
(ছালঃ) প্রাপ্ত হইয়া সশিষ্যে সেই মহান্নার উপস্থিত হন ; এবং অত্যাচারী
যিহুদীদিগকে ভীম বিক্রমে আক্রমণ করেন । বনি-কিন্কার যিহুদীদিগের
মধ্যে যোদ্ধা পুরুষের সংখ্যা ১০০ শত ছিল, কিন্তু মোছলমানদিগের ভীষণ
আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা আপনাদের কেল্লার গিয়া
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল । মোছলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিলেন ।
অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইল । ১০০ যিহুদী
যোদ্ধা পুরুষকে বন্দী করা হইল । তৎকালীন সামরিক প্রথা অনুসারে
তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করাই কর্তব্য ছিল । কিন্তু দয়ার সাগর আ হজরত
(ছালঃ) তাহাদিগকে নিরাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন । তদনুসারে হজরত
এবাদাঃ বিন্-ছামত (রাজিঃ) তাহাদিগকে খয়বর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া
আসিলেন । এই যুদ্ধে ও তরুণ বীর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)
যোগদান করিয়াছিলেন ।

আবু-ছুফিয়ানের বিক্রমে অ' হজরত

(ছালঃ)-এর অভিযান ।

বদরের মহাযুদ্ধের পর, আবু-ছুফিয়ানের উগ্রচণ্ডা স্ত্রী হেদ্দাঃ, স্বীয় পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতার বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া-ব্যাপারে একান্ত শোকাবলিতা হইয়াছিল । তাহার হৃদয়ে ভীষণ বৈর-নির্যাতন-স্পৃহা প্রচণ্ড নরকাগ্নির স্তায় প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল । সে স্বীয় স্বামী আবু-ছুফিয়ানকে, হজরত হামজা (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হত্যা সাধন জন্য বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল । অগত্যা আবু-ছুফিয়ান এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমি বত দিন পর্যন্ত মদীনা নগর লুণ্ঠন ও বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিব, ততকাল সর্বপ্রকার লুপ্ত-ভোগ ■ বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিব ।

অনন্তর আবু-ছুফিয়ান ২০০ দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, মদীনা আক্রমণার্থ মক্কা হইতে যাত্রা করিল । প্রথমে সে সৈন্যদল দূরে রাখিয়া, স্বয়ং মোছলমান-বিদ্বেষী বনি-নযির-দলহু হাই-বিন্-আখ্-তব নামক যিহদীর গৃহ-পার্শ্বে গিয়া তাহাকে ডাকিল । হাই তাহার আছানে সাড়া দিল না, কিংবা স্বীয় গৃহ হইতে বাহির ■ হইল না । পরে সে ছালাম বিন্ মছকাম নামক যিহদীর গৃহে অতিথি রূপে রাত্রি যাপন করে । পর দিন প্রত্যুষে মদীনার শহরতলির একস্থানে সদলবলে উপস্থিত হইয়া, আন্ছারদিগের খজুর বাগান গুলি অগ্নি-সংযোগে পোড়াইতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে হজরত ছয়ীদ আন্ছারী (রাজিঃ) এবং তাঁহার সহযোগী আর একজন আন্ছার 'কাশ্-ত্কার' (কৃষক)-কে শহীদ করে । এই সংবাদ পাইবামাত্র অ' হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে

বাহির হইলেন । তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইবামাত্রই কাকের সৈন্যদল পলায়ন করিল ; মোছলমানদিগের সম্মুখীন হইতে তাহাদের সাহসে কুলাইল না । তাহারা এরূপ ভীতি-বিহ্বল হইয়া দ্রুতগতি পলায়ন করিল যে, সন্দের ভার হালকা (লঘু) করিবার জন্য রসদ স্বরূপ আনীত ছাতুর বস্তা গুলি পথে পথে ফেলিয়া গেল । মোছলমান সৈন্যগণ "কদর" নামক স্থান পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন । পথিমধ্যে কোরেশদিগের পরিত্যক্ত সেই ছাতুর বস্তা গুলি তাহারা পাইয়াছিলেন । অতঃপর আবু হজরত (ছালঃ) মদীনার প্রত্যাবর্তন করেন । এই অভিযান "গয্ ওয়ায় ছাবিক" নামে অভিহিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয় হিজরীর যেলহজ্জ মাসে এই অভিযান গিয়াছিল ।

তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী ।

বনি-কিন্কায়ের যুদ্ধ ।

আবু হজরত (ছালঃ) মদীনার এক প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, এবং তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে, মদীনার যিহুদী ও পৌত্তলিক-গণ প্রমাদ গণিল । তাহারা আবু হজরত (ছালঃ) এবং মোছলমানদিগের উচ্ছেদ সাধন মানসে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল । এই সময় তৃতীয় আর একটি দলের সৃষ্টি হয় । যিহুদী ধর্মাবলম্বী আবদুল্লা-বিন্-আবি-বিন্-ছলুল নামক একব্যক্তি মদীনার মধ্যে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ছিল । সে অত্যন্ত সূচত্বর, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিল বলিয়া, মদীনাবাসিগণ তাহাকে আপনাদের দলপতি বা রাজা করিতে মনস্থ করিয়াছিল ; কিন্তু আবু হজরত (ছালঃ)-এর মদীনার আগমানে তাহার প্রভাব

একেবারে মাটি হইল। ইতিপূর্বে মদীনা বাসিগণ তাহার জন্য একটি রাজমুকুট ও তৈয়ার করিয়াছিল ; কিন্তু সে সবই ব্যর্থ হইল । উল্লিখিত কারণে সে আ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানগণের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া, একটি মূতন দল গঠন করিল । তাহার পরম ভক্ত কতকগুলি রিহদী ও পৌত্তলিককে লইয়া এই মূতন দলটি গঠিত হইল ; বদরের যুদ্ধে মোছলমানদিগের গৌরবান্বিত বিজয় লাভ দেখিয়া তাহার হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল । এইবার সে কপটতার সহিত নিজের মোছলমান হইয়া, নিজের দলভুক্ত লোকগুলিকেও ঐরূপ প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাইয়া, গোপনে আ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানদিগের সর্বনাশ সাধন ■■■ বড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিল । এমন কি, মক্কার কোরেশদিগের সঙ্গেও বড়যন্ত্র চালাইতে ক্রটি করিল না । আ হজরত (ছালঃ) এবং মোছলমানদিগকে অপদস্থ করিবার——এমন কি, একেবারে উৎসন্ন দিবার জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল ।

ওহদের ভীষণ যুদ্ধ ।

বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য মক্কার কোরেশগণ—বিশেষতঃ আবু-ছুফিয়ান-প্রমুখ তাহাদের নেতাগণ নিতান্তই আগ্রহান্বিত ছিল । কারণ তাহা-
■■■ প্রধান প্রধান দলপতি ■■■ শ্রেষ্ঠতম বীরপুরুষগণ বদর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, বন্দীদিগকে ‘ফিদিয়া’ (মুক্তি-পণ) দিয়া ছাড়াইতে (মুক্ত করিতে) হইয়াছিল । আ হজরত (ছালঃ) ও মোছলমানদিগের ক্রমোন্নতি ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, ঈর্ষানলে তাহাদের ■■■
■■■ শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল । তাহারা আর একটা ভীষণ
■■■ মোছলমানদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য ‘মংলব’ আঁটিতে-

ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহার মদীনার যিহদী, মোনাফেক এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রসিদ্ধ কবি, উত্তেজনাকারী বক্তা বাহিয়া বাহিয়া, আরবের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণ করিল; তদ্বারা বিলক্ষণ সফলও ফলিল। বহু সম্প্রদায়ের যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মদীনার যিহদী এবং মোনাফেকগণ ও তাহাদিগকে খুব উৎসাহিত করিল।

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের যোদ্ধাসংখ্যা ৩০০০ ছিল বলিয়া অধিকাংশ ইতিহাস-বেত্তার এক মত। কিন্তু কেহ কেহ কোরেশ সৈন্য-সংখ্যা ৫০০০ নির্দেশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রকৃত যোদ্ধা-সংখ্যা ৩০০০ এবং সঙ্গী স্ত্রীলোক, শিক্কা-নবীস্ যুবক, সর্ব প্রণীর ভৃত্য (পরিচারক বা চাকর-নওকর), উষ্ট্র চালক, ঘোড়ার সহিস, 'বেহেশ্‌তি' (ভিত্তি), রসদ সংগ্রাহক ক্রীতদাস প্রভৃতি ২০০০ দুই হাজার, এই সর্বমুদ্র ৫০০০ লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে উৎসাহ, উত্তেজনা ও উন্মাদনার কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

আ হজরত (ছালঃ) ১০০০ এক হাজার মাত্র শিষ্য (যোদ্ধা) লইয়া মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। আবদুল্লা-বিন্-আবির নেতৃত্বাধীনে মোনাফেক যোদ্ধাগণ ■ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল, কিন্তু মদীনা হইতে দেড় কিংবা দুই মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর, মোনাফেক দলের নেতা আবদুল্লা-বিন্-আবি স্বীয় অধীনস্থ ৩০০ যোদ্ধাপুরুষ সহ মদীনায় ফিরিয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, আমার মতামুযায়ী যখন মদীনা নগরের মধ্যে থাকিয়া প্রতিপক্ষের গতিরোধ করা হইল না, এরূপ অবস্থায় আমি মদীনায় বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। ১০০০ মোছলেম যোদ্ধার মধ্যে ৩০০ চলিয়া যাওয়াতে, ৭০০ মাত্র যোদ্ধা অবশিষ্ট রহিলেন; আ হজরত (ছালঃ) ইহাদের মধ্য হইতেও একেবারে ■■■■■ বালকদিগকে মদীনায়

কিরাইয়া পাঠাইলেন; সুতরাং মোছলমান যোদ্ধাপুরুষের সংখ্যা ৬০০ শতের কিছু উপর ছিল। আ হজরত (ছালঃ) এই অল্পসংখ্যক ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া দিবা অবসান কালে, মদীনা হইতে ৩৪ মাইল দূরবর্তী “ ওহদ ” নামক পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্বেই বিরাট কাকের সেনাদল ঐ প্রান্তরের একদিকে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়াছিল। আ হজরত (ছালঃ) ওহদ পাহাড় পশ্চাতে রাখিয়া ছাউনী ফেলিলেন। তৃতীয় হিজরীর ১৫ই শ’ওয়াল শনিবার দিন উভয় প্রতিপক্ষ দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোছলেম সেনাদলের পশ্চাত্তাগে একটি অতি প্রয়োজনীয় গিরি-বঅ’ ছিল; আ হজরত (ছালঃ) উক্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, হজরত আবদুল্লা-বিন্-জবির আনছারী (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় ৫০ জন সুদক্ষ ‘তীরন্দায্’ (ধনুধারী) যোদ্ধা সেখানে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তির পূর্বে তোমরা এই গিরি বঅ’ (ঘাটি) কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। যুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয় বাহাই হউক না কেন? তোমরা এই গিরি-বঅ’ অতি সতর্কতার সহিত অবরোধ করিয়া থাকিবে; শত্রুদলের কাহাকেও এই গিরি-বঅ’ অতিক্রম করিতে দিবে না। এই গিরিবঅ’টি এমন ভাবে অবস্থিত ছিল যে, শত্রুদল বহুদূর ঘুরিয়া মোছলমান সৈন্যদলের ‘আকবে’ (পশ্চাত্তাগে) গিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত। ৫০ জন ধনুধারীর পক্ষে এই সঙ্কীর্ণ ঘাটিটা রক্ষা করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। তাঁহারা অতি বড় প্রবল সৈন্য দলের গতিও অবাধে রোধ করিতে পারিতেন। আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় সেনাদল অতি সূক্ষ্ম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ ভাগে হজরত যোবের-বিন্-আওয়াম (রাজিঃ)-কে এবং বামভাগে হজরত মন্যর-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন; আর মহাবীর হজরত হামযাঃ (রাজিঃ)-কে ‘মকদমাতুল জয়েশ্’ এর (অগ্রবর্তী

সেনা দলের) সেনাপতি 'মকারর' (নিয়োগ) করাইলেন । হজরত
 ময়ছর-বিন-মির (রাজিঃ)-এর হস্তে পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিলেন ।
 হজরত আবু দজানাঃ (রাজিঃ) কে হজুর (ছালঃ) স্বীয় তরবারি খানি প্রদান
 করিলেন । তিনি সেই পবিত্র তরবারি গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রান্ত
 সিংহের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । কোরেশ পক্ষ ও ১০০ শত
 অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া মহাবীর খালেদ বিন-অলিদকে
 দক্ষিণ বাহুর, এবং ১০০ অশ্বারোহীর নেতৃত্ব প্রদান পূর্বক আকরমাঃ-বিন-
 আবুজহলকে বাম বাহুর সেনাপতি পদে বরিত করিল । আর আবদুল
 মার বংশীয় কীরপুরুষগণ চিরকন প্রথানুসারে কোরেশগণের পতাকা-বাহী
 নিযুক্ত হইল । অনতিবিলম্বে উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । রণ-
 চণ্ডী রূপিনী হেন্দাঃ, স্বীয় দলস্থ রণরঙ্গিনী নারীগণ সহ কোরেশ সেনাদলের
 সঙ্গে থাকিয়া রণ-সঙ্গীত গাহিয়া, যোদ্ধাপুরুষদিগকে উত্তেজিত করিতে
 লাগিল । উভয় প্রতিপক্ষ দল ভীম পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
 দেখিতে দেখিতে কোরেশদিগের ১২ জন রণ-পতাকাধারী একাধিক্রমে এই
 যুদ্ধে নিহত হয় ; তন্মধ্যে একা খোদাতালাব শার্দ ল হজরত
 আলী (কঃ—ওঃ) ১ জনকে নিহত করেন । ১২শ তম
 পতাকাধারী নিহত হওয়াতে, কোরেশদিগের মধ্য হইতে আর কেইই সাহসী
 হইয়া সেই পতাকা তুলিয়া লইল না, সুতরাং সেই পতাকা ভূতলে গড়াইতে
 লাগিল । বেলা দ্বি-প্রহরের সময় কোরেশগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিশৃঙ্খল
 ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল । যে সকল কোরেশ বীরঙ্গনা সৈন্যদলের
 পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া 'দফ্' বাজাইতে, এবং রণ-সঙ্গীত গাহিয়া পুরুষদিগকে
 উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছিল, পলায়মান সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে,
 প্রবল জলশ্রোতের পশ্চাদ্ভাগে তৃণখণ্ডের ন্যায় তাহারা ও ভাসিয়া চলিল ।
 নারী দলের সেনাপত্নী উগ্রচণ্ডাঃ হেন্দাঃ ও আতঙ্কিত হৃদয়ে—উর্দ্ধ্বাসে

পলায়ন করিতে লাগিল, এবং নিজের ■■■ 'আছবাব' (সামগ্রী-সম্ভার) যুদ্ধক্ষেত্রে ছাড়িয়া গেল। সুতরাং যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় কোরেশদিগের সম্পূর্ণ পরাজয়ই ঘটিল। কোরেশদিগের ভীষণ পরাজয় এবং পলায়ন-ব্যাপার দর্শনে পূর্বোক্ত গিরি-সঙ্কটে অবস্থিত ধনুর্ধারিগণের মনে এই বাসনা ও 'জোশ্' (উত্তেজনা) উপস্থিত হইল যে, যুদ্ধ ■ জয় হইয়াছেই, এক্ষণে আমরা ও শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, যুদ্ধ-বিজয়ের গৌরব লাভ করি। ঐ তীরান্ধা দলের সেনাপতি হজরত আবদুল্লা-বিন্ জবীর (রাজি:) তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকারে বাধা প্রদান করিলেও, তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এই অবসরে মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ স্বদলের শোচনীয় পরাজয় দর্শনে বহুদূর ঘুরিয়া, পূর্বোক্ত গিরি-সঙ্কটের পশ্চাদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন তত্রত্য ধনুর্ধারিগণের প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন; মোস্লেম সেনাপতি কয়েকজন মাত্র সঙ্গীসহ সেই প্রবল শত্রুদলের সম্মুখীন হইয়া—বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইলেন। বিজয়ী মোছলমানগণ হঠাৎ পশ্চাদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পলায়িত কোরেশবল ও ফিরিয়া দাঁড়াইল, আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে মহাবীর হজরত আমীর-হামযা: (রাজি)-কে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া, ওহসী নামক একজন ক্রীতদাস নেকার (বল্লম বিশেষ) অব্যর্থ সন্ধানে ভূপাতিত করিল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহীদ হইলেন (ইম্মা লিল্লাহে ওয়া ইম্মা ইলায়হে রাযেউন)। তৎপর প্রতিহিংসা-পরায়ণা হেন্দা: রাফসী মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক তাঁহার নাক কাণ কাটিয়া চক্ষুঃ উৎপাটন ■ বক্ষ: বিদীর্ণ করিল, এবং হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া চর্কণ পূর্বক স্বীয় পৈশাচিক প্রতিহিংসানল নির্বাপিত করিল। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে তখন খণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আ হজরত (ছাল:)—এর.হত্যা সাধন জন্য কোক্ফার চতুর্দিক হইতে পঙ্গপালের স্তায় ছুটিয়া আসিতে

লাগিল । মহাবীর হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) বিক্রান্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুর বিনাশ সাধন করিলেন । এক দুর্দান্ত পাষণ্ড আ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি একখণ্ড ~~নিষ্ফেপ~~ নিষ্ফেপ করাতে, তাঁহার নীচের পাটির একটি পবিত্র ~~শহীদ~~ শহীদ হয় । এই সময় তাঁহার কদম মবারক এক গর্ভে পতিত হওয়াতে, তিনি ভূতলে পড়িয়া যান ; তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (কঃ -ওঃ) তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন ; এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত তায়্যুহা (রাজিঃ) তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন । এই সময় বহু সংখ্যক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) চতুর্দিক হইতে আসিয়া সেখানে সমবেত হইলেন ; হজুর (ছালঃ) তাঁহাদিগকে লইয়া নিকটবর্তী পাহাড়ের এক টিলায় আরোহণ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে কোরেশদিগের আক্রমণের গতি ও মন্দীভূত হইয়া আসিল । অবশেষে তাহারা আপনা হইতেই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল । মোছলমানগণ যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, তাঁহাদের পরাজয় ঘটে নাই । তাঁহারা রণস্থল পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করেন নাই ; শত্রুগণ তাঁহাদের পশ্চাৎদাবন করিবার সুযোগ পায় নাই ; কোনও মোছলমানকে তাহারা বন্দী করিতে পারে নাই ; তাঁহাদের কোনও সামগ্রী-সম্ভার হস্তগত করিতে সমর্থ হয় নাই । এই ভীষণ যুদ্ধে ■ জন মহাজেরিণ ও ৬৫ জন আনুহার শহীদ হইয়াছিলেন । আ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দফন কার্য সম্পন্ন করিলেন । আজিও (প্রায় ১৪ শত বৎসর পরেও) ওহদ ক্ষেত্রে সেই শহীদ মোছলমানদিগের কবর হাজিগণ ভক্তিভাবে যেয়ারত করিয়া থাকেন । আ হজরত (ছালঃ) ঐ দিনই মদীনার পহুছিয়া, ৩য় হিজরীর ১৩ই শওয়াল রবিবার দিন ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাহারা ওহদের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, কেবল তাহারাই কোফ্ ফারের সঙ্গে যুদ্ধ করণার্থ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও । যাহারা

যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা এই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না । কোক্ষার পুনরায় মদীনা আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি এই যুদ্ধযাত্রা করেন । তাঁহার আদেশে আহত যোদ্ধৃবৃন্দ মহোৎসাহে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন । মদীনা তৈয়বা হইতে ৮ মাইল দূরবর্তী “ হামরায়ল-আছদ ” নামক স্থানে গিয়া তিনি শিবির সন্নিবেশ, এবং ৩ দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন ; কিন্তু কোক্ষারের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না । কোরেশগণ যক্ষার প্রত্যাবর্তন কালে “ কহা ” নামক স্থান পর্য্যন্ত পহুঁছিয়া পরস্পর পরামর্শ দ্বারা স্থির করিল যে, এ যুদ্ধে ত আমাদের জয়লাভ ঘটে নাই ; সুতরাং চল আমরা পুনরায় গিয়া মদীনা আক্রমণ করি । প্রধান সেনাপতি আবু-ছুকিয়ানও তাহাদের সঙ্গে এক মতাবলম্বী হইয়া পুনরায়াত্রার জন্য প্রস্তুত হইল ; এই সময় মায়াবদ-বিনু-আবি মায়াবদ মদীনায় দিক্ হইতে আসিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিল যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছালঃ) মদীনা হইতে সদলবলে বাহির হইয়া তোমাদের ‘তারকব’ (পশ্চাদ্ধাবন)-দগ্ধ আসিতেছেন । আমি ঐ মোহলমান সৈন্যদলকে “ হামরায়ল-আছদে ” দেখিয়া আসিয়াছি ; আর সম্ভবতঃ তাহারা অতি সত্বরেই তোমাদের নিকটে আসিয়া পহুঁছিবেন । এই সংবাদ শ্রবণে কোরেশ যোদ্ধৃপুরুষগণ ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুতগতি মক্কাভিমুখে পলায়ন করিল । আ হজরত (ছালঃ) যখন তাহাদের পলায়ন-সংবাদ বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলেন, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া সশিষ্য মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই অভিযান “ গেবুওয়া হামরায়ল আছদ ” নামে প্রসিদ্ধ । হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—৩ঃ) এই অভিযানেও গমন করিয়াছিলেন । এই অভিযানের পর তৃতীয় হিজরীর বেলহজ্জ মাস পর্য্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই ।

৪র্থ হিজরীর ঘটনাবলী।

৪র্থ হিজরীর ১লা মোহররম তারিখে আ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন, “ কতল ” নামক স্থানে তালুহা-বিন্-খোয়েলুদ ■ ছলমাঃ-বিন্-খোয়েলুদের নেতৃত্বাধীনে “ বনি-আছদ ” সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক বিপ্লববাদী ■■■■■ হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তে আ হজরত (ছালঃ) তাহাদের দমনার্থ হজরত আবু-ছালমাঃ নখ্বোমী (রাজিঃ)-কে ১৫০ শত যোদ্ধ-পুরুষ (ছাহাবাঃ-কারাম ■ সহ পাঠাইলেন। কিন্তু মোহলমানদিগের আগমন সংবাদ শুনিয়াই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের কতকগুলি পশু হস্তগত করিয়া মোহলমানগণ বিজয়োল্লাসে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ওয়াদি আরফাতের নিকটস্থ “ আরনাঃ ” নামক স্থানেছফিয়ান-বিন্-খালেদ রিয়লী নামক একজন কাট্টা কাকের বাস করিত; সে অশ্রুাশ্রু কাকেরেরঃসঙ্গে যোগ দিয়া মদীনা আক্রমণের যোগাড়-বন্দ করিয়াছিল। আ ■■■■■ (ছালঃ) এই সংবাদ পাইয়া, ৪র্থ হিজরীর ৫ই মোহররম তারিখে, আবদুল্লা বিন্ আনিছ (রাজিঃ)-কে একদল সৈন্যসহ উহাদিগের দমনার্থ পাঠাইলেন। আবদুল্লা-বিন্-আনিছ (রাজিঃ) তথায় গমন পূর্বক যুদ্ধ না করিয়া কোনও কৌশলে বিপ্লববাদীদিগের নেতা ছুফিয়ান-বিন্-খালেদের মৃত্যুপাত করিলেন; তিনি উহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া ২৩শে মোহররম মদীনার প্রত্যাবর্তন হইলেন। এই সালের ছফর মাসে মকায় কোরেশগণ বনি-গয়ল ও কারা সম্প্রদায়ের ৭ ব্যক্তিকে ‘ফেরেব’ (চক্রান্ত—‘দাগাবাজী’) করিয়া ■■■■■ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট পাঠাইল; সেই কপটগণ মদীনার পহুছিয়া ■■■■■ [ছালঃ)-এর ‘খেদমতে আরজ’ করিল যে, আমাদের সমগ্র ‘কওম’ (সম্প্রদায়) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে,

অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে কতিপয় উপযুক্ত শিক্ষাদাতা মোছলমান পাঠাইয়া দেন—তাহারা আমাদের ইল্লামের সমুদয় নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন। ঐ হজরত (ছালঃ) তাহাদের কথা সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়া, ১০ জন শিক্ষা-দাতা উপযুক্ত মোছলমান তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। মরহুম-বিন্ আবি-মরহুম গম্বুজী কিংবা আছম-বিন্-ছাবেত্-বিন্-আবি আলী ফলহ (রাজিঃ) কে এই সম্মানিত দলের নেতা করিয়া পাঠাইলেন। আহা! ঐ বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডগণ তাহাদিগকে আপনাদের সুবিধাজনক স্থানে লইয়া গিয়া, পূর্ব সঙ্কেত অনুসারে ২০০ যোদ্ধা পুরুষ দ্বারা ঘেরাইয়া ফেলিল। তখন এই ১০ জন মাত্র মোছলমান ২০ গুণ অধিক সশস্ত্র যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ৮ জন শহীদ ও ২ জন তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। যে দুইজন ধর্মপ্রাণ জলন্ত বিশ্বাসী মোছলমান যুদ্ধে বন্দী হইলেন, তাহাদের নাম খবিব-বিন্-আদি (রাজিঃ) এবং মরহুম-বিন্-মরহুম (রাজিঃ) ; এই দুইজন ছাহাবাকে কাকেরগণ মর্দ্য লইয়া গেল, এবং চূর্ণাক্ত কোরেশগণ অতি নির্দয় ভাবে তাহাদিগকে শহীদ (হত্যা) করিল। সেই অবস্থায় তাহারা যে জলন্ত ধর্ম-বিশ্বাস এবং ঐ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি অপূর্ব ভক্তি-শ্রদ্ধা বেধাইয়া গিয়াছেন, ইল্লামের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। তাহাদের অন্ত্যায় রূপ নৃশংস হত্যা-কাণ্ডে ঐ হজরত (ছালঃ), এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) মণ্ডলী ব্যাধিত ও মর্দ্যহত হইয়াছিলেন। এইরূপে নজদের অধিবাসিগণ হজরত মন্বব-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ও তৎ সঙ্গীয় ৬৮ জন ছাহাবাঃ কে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছিল ; ইহারা সকলেই হাকেক এবং কারী ছিলেন। কেবল-মাত্র ওমর-বিন্-ওমিয়া যমিরি (রাজিঃ) এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইহার পর ঐ হজরত (ছালঃ) কোনও কার্য-সূত্রে বনি-নজীর

সম্প্রদায়স্থ সিহদীদিগের মহান্নার গমন করিয়াছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), [redacted] ওমর ফারুক (রাজিঃ) এবং [redacted] আলী (কঃ—ওঃ) গিয়াছিলেন। সিহদিগণ তাঁহাদিগকে আপনাদিগের কেন্দ্র প্রাচীরের নিকট বসাইয়া, একথণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দুর্গ-শীর্ষ হইতে তাঁহাদের উপর গড়াইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল ; উদ্দেশ্য, যাহাতে তাঁহারা পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আল্লাহ তীলা কর্তৃক সতর্কতা-সূচক ওহী নাজেল হওয়াতে, আলী হজরত (ছালঃ) ছাহাবাঃ ত্রয়কে সঙ্গে লইয়া মদীনার প্রস্থান করিলেন ; তৎপরে আলী হজরত (ছালঃ), ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া এই বিশ্বাসঘাতক বিপ্রবাদী সম্প্রদায়কে, আক্রমণ করিলেন, তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আপনাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোছলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই অবরোধ কার্য ১৫ দিন কাল স্থায়ী ছিল ; তৎপরে সিহদি-
[redacted] নিরুপায় হইয়া আলী হজরত (ছালঃ)-এর প্রস্তাবানুসারে স্বীয় অস্ত্রভূমি হইতে নির্কাসিত হইতে রাজী হওয়াতে, অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত আর সমস্ত জিনিষ-পত্র সহ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করা হইল ; তদনুসারে তাহাদের অধিকাংশ খয়বরে এবং কতকাংশ সুদূর সিরিয়ায় চলিয়া গেল। এই ঘটনায় মদীনার সিহদী-বড়বস্ত্রের ভিত্তি অনেকটা শিথিল হইল। এই যুদ্ধ “ গেয়্ ওয়া বনি-নযির ” নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধকালেই কোরআন পাকের ছুরে “ হশর ” নাজেল হয়। এই যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর রবিওল-আউওল মাসে সম্ব্যটিত হইয়াছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া স্বীয় অদ্বুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার এক মাস কাল পরে বনু-মহাযেরও বনু-ছয়লবাঃ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আলী হজরত (ছালঃ) সৈন্তে অভিযান করেন ; এই অভিযানেও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার সঙ্গী

হইয়াছিলেন। এই অভিযান “গণ্ডা-যাতার যাকার” নামে প্রসিদ্ধ। বিপক্ষ দল যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করিল। এই স্থানটো নজদের এলাকা ভুক্ত ছিল।

ওহদের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে আবু-ছুফিয়ান মোহলমানদিগকে বলিয়া গিয়াছিল, আমরা আগামী বর্ষে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। ঐ হজরত (ছালঃ)-এর বিষম বিক্রমচারী মোহলমানদিগের পরম শত্রু মোনাফেকগণ ও মকার কোরেশদিগকে যুদ্ধের বিশেষভাবে উত্তেজিত করিতেছিল; তদনুসারে কোরেশগণ যুদ্ধের বিরাট আয়োজন করিয়া, মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইল; হজরত (ছালঃ) ও এই সংবাদ শুনিয়া ১৫০০ যোদ্ধা পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি হজরত আলী (কঃ — ওঃ)-এর হস্তে যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিয়াছিলেন। উপযুক্ত হস্তেই যুদ্ধ পতাকা অর্পিত হইয়াছিল। এই অভিযানে মোহলমানদিগের অশারোহী সৈন্তের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ জন; অবশিষ্ট সকলেই পদাতিত ছিলেন। আবু-ছুফিয়ানের এ বংশের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাই ছিল না; একশে বখন শুনিতে পাইল, ঐ হজরত (ছালঃ) বদরের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন, তখন অগত্যা তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া ২ হাজার ‘জারার’ (বিক্রান্ত) সৈন্ত লইয়া মহাড়ম্বরে হইতে যাত্রা করিল। মকার ছুর্ভিক্ষের প্রকোপ থাকাতে রসদের কেবলমাত্র ছাতুর বস্তা লইয়াছিল; এজন্য এই অভিযান “জয়েশ্ছ ছাবিক” নামে অভিহিত হইয়াছে।

আবু-ছুফিয়ানের সৈন্যদলে এবার ৫০ মাত্র অশারোহী সৈন্ত ছিল। পূর্ববর্তী যুদ্ধ সমূহে মোহলমান-যোদ্ধার সংখ্যা কোফারের এক তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ হইলেও, যুদ্ধে মোহলমানগণ জয়ী কিংবা আংশিক জয়ী

হইয়াছিলেন । এবার মোছলমানদিগের সংখ্যা তাহাদের চারি ভাগের তিন ভাগ, সুতরাং এবারকার যুদ্ধে সাফল্য লাভের আশা একেবারেই নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের উৎসাহ ■ উত্তেজনা একেবারে লয় প্রাপ্ত হইল । তাহারা “ ম্যাছফান ” নামক স্থানে হইতে লাকুল গুটাইয়া প্রস্থান করিল । এই রণ-বিমুখ সৈন্তগণ বখন মক্কার প্রত্যাবর্তন করিল, তখন মক্কার বীর রমণীগণ তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিল, তোমরা ত কেবল ছাত্তু খাইবার ■ গিয়াছিলে, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধের জন্ত যাইতে, তবে কাপুরুষের স্থায় বিনা যুদ্ধে চলিয়া আসিতে না ।

আ হজরত (ছালঃ) আট দিন পর্য্যন্ত বদরে শিবির-সন্নিবেশ পূর্বক কাকেরদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিলেন ; কিন্তু বখন বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলেন, কোরেশগণ “ ম্যাছফান ” হইতে কিরিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি বদর হইতে সশিষ্যে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন । ইহা ৪র্থ হিজরীর রজব মাসের ২টনা । এই বৎসরই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন । আর হজরত আবদুল্লাহ-ছালাম নখ্বুন্নী (রাজিঃ)-এর মৃত্যু হওয়াতে, তাহার বিধবা-পত্নী ওম্মে ছালামাঃ (রাঃ—আঃ)-কে আ হজরত (ছালঃ) পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন । আবার এই বৎসরই হজরত ফাতেমাঃ-বিন্তে আছিদ (রাঃ—আঃ)—অর্থাৎ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ‘ওয়ালেদা-মাজেদাঃ’ (গর্ভধারিণী)—এই চতুর্থ হিজরীতেই পরলোক গমন করেন । আ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং তাহার জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন ।

৫ম হিজরীর ঘটনাবলী।

দোমতল-জন্মলের অভিযান।

বদরের দ্বিতীয় অভিযানের ৬৭ মাস পরে ঐ হজরত (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন, সিরিয়া-সীমান্তস্থিত দোমতল-জন্মলের খৃষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বী শাসনকর্তা আকির-বিন্-আলমালেক এক বিরাট বাহিনী, মদীনা-মহুওরা আক্রমণ করিবার সজ্জিত করিয়াছে ; আর আরবের—বিশেষতঃ মদীনা অঞ্চলের যে সকল তেজস্বী কাকোলা সিরিয়ার দিকে যায়, সে পথিমধ্যে তাহাদের বাণিজ্য-দ্রব্যাদি লুণ্ঠিয়া লয়। এই মতন শত্রুদল ক্রমে তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করিতে পারে, এবং উহার সাহায্য হইয়া মদীনা-তৈয়বা আক্রমণ করিলে যিহুদী, মোনাফেক এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জনপদের পৌত্তলিক প্রভৃতি জাতিগণ কর্তৃক মোছলমানদিগের বিপদ আরও বনৌদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং পূর্বাভেদে ইহার প্রতিকার করা কর্তব্য মনে করিয়া ঐ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং দোমতল জন্মলাভিমুখে অভিযান করিলেন ; তাহার সঙ্গে ১০০০ যোদ্ধাপুরুষ গমন করিলেন। এই অভিযানেও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গমন করিয়াছিলেন। ঐ হজরত (ছালঃ)-এর আগমন সংবাদ অবগেই দোমতল জন্মলের শাসনকর্তা ও তাহার সেনাদল ভয়ে পলায়ন করিল। ঐ (ছালঃ) কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া, শামের সীমায় সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন পূর্বক মদীনায়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী ৮ মাস কাল আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ৫ম হিজরীর শাবান মাসে সংবাদ পাইল যে, বনু-মুত্তালক সম্প্রদায়ের দলপতি হারেছ-বিন্-জরার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে যুদ্ধ-সজ্জা করিতেছে ; আর সে আরবের বিভিন্ন বহু সম্প্রদায়কে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। অনুসন্ধানে সংবাদ সঠিক বলিয়া জানিয়া

আ হজরত (ছালঃ) অনতিবিলম্বে এই বিপ্লববাদীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন । চশমাঃ মরহিরির তটে শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধ হইল ; যুদ্ধে কাফের-গণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল । বহুসংখ্যক কাফের নিহত বন্দী হইল ; উন্মধ্যে বহু-মহতালকের ছরদার হারেছের এক তন্তাও ছিলেন । বহু-মহতালক সম্প্রদায়ের সিন্ধীদিগের বাসস্থান মদীনা হইতে ৮ পথ দূরে অবস্থিত ছিল । আ হজরত (ছালঃ) এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বন্দী ও যুদ্ধ-জয়লব সামগ্রী-সম্ভার লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই যুদ্ধেও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিশেষ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

ইহার পর অমেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান নানা দিকে প্রেরিত হয় ; সেই সমুদয় অভিযানেই শত্রুদল পর্য্যদস্ত হইয়াছিল । বনি-নবির দলস্থ সিন্ধীদিগের দলপতি হাই বিন্-আকতব সর্কাপেকা বড় 'মোফ্ছেদ' (বিপ্লববাদী) ছিল ; সে এবং বনি-নবিরের প্রধান অংশ খয়বরে বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিল ; ইহাদের সমুদয় প্রধান প্রধান দলপতি এবং আরও কতিপয় সম্প্রদায়ের নেতা মকার কোরেশদিগের নিকট গমন করিল ; সেখানে গিয়া কোরেশদিগকে যুদ্ধের জন্য খুব উত্তেজিত করিয়া তুলিল । কোরেশগণও তাহাদের প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দান পূর্ব্বক, যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ আপনাদের মধ্যে টাকা সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিল ।

খন্দক অর্থাৎ পরিবার যুদ্ধ ।

মকার কোরেশ এবং খয়বরের সিন্ধীদিগের যোগাড়-যয়ে আরবের আরও বহু সম্প্রদায়ের লোক মোছলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন দিবার

যুদ্ধ বন্ধ-পরিষ্কার হইল। তদনুসারে আবু-ছুফিয়ান ৪০০০ চারি হাজার সৈন্য লইয়া মদীনাভিমুখে অগ্রসর হইল; পশ্চিমধ্যে আরও বহু সম্প্রদায়ের যোদ্ধাদল আসিয়া কোরেশ সেনাদলে যোগদান করিতে লাগিল। বনি-নখির ■ বনি-গৎফান সম্প্রদায়—অর্থাৎ খয়বরের যিহদী এবং অপর পরাক্রান্ত যিহদী সম্প্রদায় এই বিরাট সেনাদলে যোগদান করিতে, মদীনার নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত ইহাদের সংখ্যা ১০ বা ১৫১৬ হাজার হইয়াছিল। কোরেশ দলপতি আবু ছুফিয়ান ছিল এই বিরাট সেনাদলের সর্বপ্রধান সেনাপতি। ইহাদের সঙ্গে ৪১০ সাত্বে চারি হাজার উষ্ট্র ও ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। আবু হজরত (ছালঃ)—এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অত্যন্ত বড় প্রচণ্ড সৈন্য-দলের সঙ্গে নগরের বাহিরে গিয়া, কিরূপে তাহাদের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ ও তাহাদের গতিরোধ করিবেন, তৎসম্বন্ধে একটা পরামর্শ-সভায় কর্তব্য স্থির হইল। হজরত ছলমন কারছী (রাজিঃ) পারশ্ব দেশ-বাসী ছিলেন, তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আমাদের দেশে এইরূপ অবস্থায় ‘খন্দক’ (পরিখা) খনন করিয়া, তাহার বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা হয়। আবু হজরত (ছালঃ) এবং প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে তাড়াতাড়ি পরিখা খনন কার্য আরম্ভ হইল। আবু হজরত (ছালঃ) স্বয়ংও খন্দক খননে প্রবৃত্ত হইলেন। অবিশ্রান্ত ভাবে খনন কার্য করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিখা খনন শেষ করা হইল। কোফ্ফার পরিখার তটে উপস্থিত হইয়া অবাক হইয়া গেল। আরব দেশে পরিখা খনন দ্বারা আক্রমণকারী দিগের গতিরোধ ব্যাপার, তাহারা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিয়াছিল না। কোফ্ফারের পক্ষপাল সদৃশ অগণিত সেনাদল মদীনা-তৈয়বা অবরোধ পূর্বক কয়েক বার বিপুল বিক্রমে পরিখা পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু একবার ও তাহাতে কৃতকার্য ■ নাই। একবার ২১৩ ■ মহা পরাক্রান্তশালী

খ্যাতনামা বীরপুরুষ, সর্বাপেক্ষা কম চণ্ডা স্বাম দিয়া পরিখা পার হইবার মানসে অশ্বারোহণে পরিখা মধ্যে অবতরণ করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে ওমর-বিন্-আবদ নামক আরবেব একজন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ, দুই হাজার অশ্বারোহী বীরের সমান বলিয়া গণ্য হইত; বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) তাহাকে কতল (হত্যা) করিলেন; অপর দুইজন পলায়ন করিয়া কোনও রূপে রক্ষা করিল। এই অবরোধ কার্য প্রায় একমাস কাল 'জারী' ছিল। অবরোধকারী কাকের গণের সাহায্যার্থ অনবরতদলে দলে যোদ্ধাপুরুষ ও প্রচুর পরিমাণ রসদ-পত্র আসিতেছিল; কিন্তু অবরুদ্ধ মোছলমানদিগের কোনও দিক দিয়া কিছুমাত্র সাহায্য পাইবার আশা ছিল না। তাঁহাদিগকে অনেক সময় অনাহার বা অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। অনেকে পেটে পাথর বাঁধিয়া যুদ্ধের ■■■ থাকিতেন। এক সময় আ হজরত (ছালঃ)-এর পেটে ২ খানি পাথর বাঁধা ছিল। অবরোধের ২৭ সাতাইশ দিন গত হইয়া গেলে, রাত্রিকালে এক প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হইল; বাতাসের জোরে কোফ্ফারের তাম্বুর খোটাগুলি খুলিয়া বাইতে লাগিল, 'চুল্‌হার' (উনানের) উপর হইতে দেগ্‌চি গুলি নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়;—“ফারহালনা আলায়হিম রিহাও ওজ্জুদাকুম্ তরাওহা” আমি উহাদের উপর হাওয়া (বাতাস) পাঠাইলাম, আর এমন একদল সৈন্য পাঠাইলাম, যাহাদিগকে তুমি দেখিতে পাইতেছিলে না। উপরোক্ত প্রবল ঝড় ■ অলক্ষিত সৈন্যদল দ্বারা মোছলমানদিগের অশুকুলে অনেক কাজ হইল; তাম্বু সমূহের অনেক স্থলে অগ্নি নির্বাণ হইয়া গেল। কোফ্ফার এই ঘটনা এবং অগ্নি-নির্বাণ হওয়াকে একটা ছলক্ষণ বলিয়া মনে করিল। তদনুসারে তাহারা সেই রাত্রিকালেই ডেরা-ডাণ্ডা তুলিয়া (শিবির ও তাম্বুগুলি গুটাইয়া) সেখান হইতে 'ফেরার' (পলায়নপর) হইল।

কোফ্‌কারের পলায়ন সংবাদ খোদা ভীমার পক্ষ হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) কে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হজ্জিফা-বিন্-আলিমান (রাজিঃ) কে 'খন্দকের' (পরিখার) পরপারে পাঠাইলেন; তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন, কোফ্‌কারের 'লশ্‌কর-গাহ্' (সেনাদলের অবস্থান-স্থান) খালি পড়িয়া আছে; তাহার সন্ধান করিয়াছে। তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, অতঃপর কোফ্‌কার কোরেশগণ আর কখনও আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না। অতঃপর মোছলমানগণ নিশ্চিন্ত মনে পরিখার নিকট হইতে মদীনাহ্ শহর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বনি কুরিজার সঙ্গে

আঁ হজরত (ছালঃ) অতি অল্পকাল মাত্র মদীনার অবস্থান করিয়া ছাহাবাতি (রাজিঃ) দিগকে বনি-কুরিজার মহান্নার অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। পরিখার যুদ্ধের পূর্বে ইহাদিগকে শান্তির সহিত বসবাস করিবার জন্ত, ইহাদিগের আত্মীয় ও বিশেষ হিতৈষী হজরত ছানাদ-বিন্-মাসায্ (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ) কর্তৃক ইহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই গর্বোন্মত্ত যিহুদিগণ নানাপ্রকার বে-আদবী পূর্ণ কথা বলিয়া তাঁহাকে ক্রোধে পাঠাইয়াছিল। পরে কোরেশদিগের সহিত এই দুর্বৃত্তগণ বড়যন্ত্র পাকাইয়াছিল। আঁ হজরত (ছালঃ) এই অভিযানে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে 'আলম-বরদার (পতাকা-ধারী—সেনাপতি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইহাদের মহান্নার নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন; এই পাষণ্ডগণ (নউজ বেলাহে মিন্‌হা) আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি অকথ্যগালি বর্ষণ

করিতেছে । খুলকথা, এশার নমাজ পর্য্যন্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের আগমন-স্রোত চলিয়াছিল । মোছলমানগণ বনি-করিজার কেয়া ২৫ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া থাকিলেন । অগত্যা তত্রত্য যিহদিগণ এই শর্ত লইয়া একদল প্রতিনিধি (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' পাঠাইল যে, আমাদের মহাত্মা ছারাদ-বিন্-মারাব্ (রাজিঃ) যে দণ্ড বিধান করিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব । ঐ হজরত (ছালঃ) তাহাদের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া আহত ও চিকিৎসাধীন হজরত ছারাদ-বিন্-মারাজ (রাজিঃ) কে শিবিকারোহণে মদীনা হইতে সেখানে আনাইলেন । তিনি আসিয়া আদেশ দিলেন, বহু-করিযার সমুদয় পুরুষকে 'কতল' (হত্যা) করা হউক ; এবং উহাদের স্ত্রী-পুত্রগণের সঙ্গে 'আছিয়ানে জজের' (যুদ্ধে বন্দী লোকদিগের) জ্ঞান ব্যবহার করা যাউক ; আর তাহাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মোছলমান দিগের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দেওয়া হউক । তদনুসারে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মদীনায় আনা হইল, উহাদিগের পুরুষদিগকে হত্যা করা হইল, আর তাহাদের গৃহাদি মোসলমানদিগের বস-বাস করিবার ভাগ-বন্টন করিয়া দেওয়া গেল । এই দিন হইতে মদীনা-মহুওয়ার অন্তর্বিপ্লবের পথ কতকটা হইল । ইহার পর ঐ হজরত (ছালঃ) কয়েকটি অভিযান নানাদিকে পাঠাইলেন । ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ ঐ সকল অভিযানে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী ।

এই বৎসর ঐ (ছালঃ) সংবাদ পাইলেন যে, বহু-বকর সম্প্রদায় খয়বরের যিহদিগণের সঙ্গে 'ছাযন্' (যড়যন্ত্র) করিয়া, মদীনা-আক্রমণের যোগাড়-যন্ত্র করিতেছে । ঐ (ছালঃ) আলী

(রাজিঃ) কে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দুইশত যোদ্ধ-
 পুরুষ, বহু-বকর সম্প্রদায়ের ‘ছরকোবির’ (দমন)
 পাঠাইলেন। পশ্চিমধ্যে বহু-বকর সম্প্রদায়ের
 এক ‘জাছুছ’ (গুপ্তচর) মোছলমানদিগের হস্তে বন্দী
 হইল। গুপ্তচর ধৃত হইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)
 এর হজুরে আনীত হইলে সে বালক, যদি আমার প্রাণ
 ভিক্ষা দেন, তবে আমি আপনাদিগকে বহু-বকর
 সম্প্রদায়ের সমবেত হওয়ার স্থান দেখাইয়া দিতে পারি।
 তদনুসারে হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) তাহার
 প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন, এবং বহু-বকরের একত্র
 সমাবেশ হইবার স্থান জানিয়া লইয়া গুপ্তচরটিকে মুক্তি-
 প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেনাপতি অতি দ্রুত-পদে
 অগ্রসর হইয়া ‘কদক্ক’ নামক স্থানে পঁহুছিলেন, এবং
 শত্রুদলকে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করিলেন ;
 তাহারা যুদ্ধে শোচনীয় রূপে পরাজিত হইয়া বিশৃঙ্খল-
 ভাবে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে ৫০০ উরু ও ২০০০
 ছাগ-মেষাদি পশু মোছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল।
 ‘মালে-গনিমৎ’ (যুদ্ধে জয় লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার) লইয়া
 হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিজয়ী-বেশে মদীনার
 প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর শওরাল মাসে ঐ হজরত (ছাল) ‘খাবে’ (স্বপ্নে)
 দেখিলেন যে, তিনি ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের সঙ্গে পবিত্র কাবা-গৃহে
 প্রবেশ করিয়াছেন ; এই সময় ঐ হজরত (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ)
 দিগের, কাবার তওয়াফ্ করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল ; এই

স্বপ্ন দর্শনের কলে সেই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আরও অধিকতর বলবতী হইল। তখন আ (হাল:) কাবা: যেকারত্ করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে ৬ষ্ঠ হিজরীর জেহাদ মাসে তিনি ১ হাজার ৪ শত ছাহাবা: কারাম (রাজি:) কে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনাভিমুখে রওজানা হইলেন—রোমরার 'এহরাম' বাধিলেন; এবং কোরবাণীর জন্য ৭০টা উষ্ট্র সঙ্গে লইলেন।

“ যিল-হলিকা: ” নামক স্থানে পঁহুঁচিয়া আ হজরত (হাল:) কোরেশ-দিগের ভাব-গতিক জানিবার জন্য একটি লোককে 'জাহুছ' (গুপ্তচর) রূপে মক্কার প্রেরণ করিলেন। সেই ব্যক্তি 'আহকান' নামক স্থানে আসিয়া হজুর (হাল:) কে সংবাদ দিল যে, কোরেশগণ আপনার আগমন-সংবাদ পাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী সম্বলিত করিয়াছে; তাহারা আপনাকে মক্কার এবং থানা: কাবার প্রবেশ করিতে সাধ্যানুসারে বাধা দিবে। আ হজরত (হাল:) এই সংবাদ প্রাপ্তে ছাহাবা: কারাম (রাজি:) দিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাকেলাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। এই কাকেলার সঙ্গে ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গমন করিয়াছিলেন। বাহা হউক, এতৎসম্বন্ধে উভয় পক্ষ হইতে কয়েকবার দূত যাতায়াত করিবার পর, উভয় পক্ষ হইতে নিম্ন-লিখিত শর্তে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইল :—

(১) মোছলমানগণ এ বৎসর মক্কার প্রবেশ ও 'রোমরা:' অনুষ্ঠান করিবেন না; আগামী বৎসর আসিয়া 'রোমরা' কার্য সম্পাদন করিবেন। মক্কার প্রবেশ :কালে তরবারি ব্যতীত অন্য 'হাতিয়ার' (যুদ্ধাস্ত্র) তাহাদের নিকট থাকিবে না; তরবারি ও 'নিয়াম' (কোষ—খাপ্)-এর মধ্যে থাকিবে; আর আগামী বর্ষে ও তাহারা ৩ দিন অপেক্ষা বেশী সময় মক্কার থাকিতে পারিবে না।

(২) সন্ধির 'যেয়াদ' (সময়) ১০ বৎসর হইবে । এই (নির্দিষ্ট) সময় মধ্যে কোনও 'ফরিক' (দল) অপর 'জান' ■ 'মালের' (জীবন ■ ধন-সম্পত্তির) কোনওরূপ বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবে না । পরস্পর 'আমন' 'আমান' (নির্বিরোধ ও শান্তি)-এর সহিত বাস করিবে ।

(৩) আরব দেশের প্রত্যেক জাতি ■ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 'এখুতেয়ার' (অধিকার) থাকিবে, তাহারা এই উভয় দলের মধ্যে যে দলের সঙ্গে ইচ্ছা সন্ধি-স্থাপন করিতে পারিবে । উক্ত সন্ধি-পত্রে আবদ্ধ জাতির শর্ত সমূহ এই প্রকারেরই (এই সন্ধি-পত্রের অনুরূপই) লিপিবদ্ধ হইবে । উভয় 'ফরিক-কবায়েল' (উভয় দল বা সম্প্রদায়) আপনাদের সন্ধিবদ্ধ ও 'হলিফ্' ('হান মুহম্মদ'—বন্ধু) বানাইতে স্বাধীন থাকিবে ।

(৪) যদি কোরেশদিগের মধ্যে হইতে কোনও ব্যক্তি 'ওলীর' (অভিভাবকের) বিনামূল্যে মোহলমানদিগের নিকট চলিয়া যায়, তবে তাহাকে কোরেশদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে । কিন্তু যদি কোনও মোহলমান কোরেশদিগের নিকট আইসে (তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে বা মোরতেদ হয়), তবে তাহাকে মোহলমানদিগের হস্তে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না ।

৪র্থ দৃষ্টিতে এই সন্ধির শর্ত (বিশেষতঃ ৪র্থ শর্ত) মোসলমানদিগের পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল ছিল ; কিন্তু পরিণামে এই সন্ধি-বন্ধন মোহলমানদিগের পক্ষে বিশেষরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল ; এবং ৪র্থ শর্তটি দ্বারা কোরেশগণ মহা বিপন্ন হইয়া, আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে প্রার্থনা করিয়া, আপনা হইতে উহা 'বাতেল' করাইয়া লইয়া ছিল । সন্ধি-বন্ধনের পর আ হজরত (ছালঃ) মদীনায়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । কোরবানী সম্পাদন, এহরাম ভঙ্গ, ফোর কার্য সম্পন্ন প্রভৃতি অমুষ্ঠানে হোদায়বিয়ায়ই সম্পন্ন করিয়াছিলেন ;

এই সন্ধি “ হোদায়বিয়ার সন্ধি ” নামে প্রসিদ্ধ । ঐ হজরত (ছালঃ) যখন হোদায়বিয়া হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন । সেই সময় পথ-
মধ্যে “ ছুরে ফৎহ ” নামের (অবতীর্ণ) হয় ।

এই ৬ষ্ঠ হিজরীতে ঐ হজরত (ছালঃ) আবিশিনিয়াধিপতি বাদশাহ নজ্জাশীর নিকট পত্রসহ দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে, এবং তাঁহার রাজ্যে যে সকল মোছলমান হেজরত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইতে অহুরোধ করিয়া পাঠাইলেন । তদনুসারে হাবেশ-পতি-ভক্তি-প্রবণ হুদয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক, ঐ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে নানাপ্রকার ‘তহফাঃ’ ও ‘হাদিয়া’ (নজর এবং উপঢৌকন) পাঠাইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে হেজরতকারী মোছলমানদিগকেও মদীনা রওয়ানা করিয়া দিলেন । ওয়াল মুমিন হজরত আরেশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ এই ৬ষ্ঠ হিজরীতেই ‘এন্তেকাল’ (পরলোক গমন) করিয়াছিলেন ; আর হাদিছ বর্ণনাকারী মহাপণ্ডিত হজরত আবু-হোরেরাঃ (রাজিঃ) এই বৎসরে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন ।

৭ম হিজরীর ঘটনাবলী ।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ঐ হজরত (ছালঃ) কিছুদিন শান্তির সহিত অবস্থান করিয়া, পবিত্র ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ এবং নব-দীক্ষিত মোছলমানদিগের শিক্ষাদি কার্যের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিলেন । কিন্তু ইত্যবসরে সংবাদ পাইলেন, খয়বরের সিহদিগণ মোছলমানদিগের মূলোৎ-পাটন, এবং মদীনা আক্রমণ জন্য মহাবড়বদ্ধ যুদ্ধের আয়োজন প্রবৃত্ত হইয়াছে । এমন কি, তাহাদের যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণতা লাভ

করিয়াছে । ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মদীনা হইতে বহু-মজীর ও বহু-করিবাঃ নামধেয় সিন্ধী সম্প্রদায় দ্বয়কে ‘জালাওতন’ (নির্বাসিত) হইয়াছিল ; তাহাদের অধিকাংশই গিয়া বসতি স্থাপন করে । এই সিন্ধিগণের মধ্যে মোছলেম-বিষেবানল পূর্ণ ভাবেই প্রজ্জলিত হইতেছিল । পরে মোছলমানদিগের শক্রতা বিরুদ্ধাচরণ করিবার কেন্দ্রস্থল ছিল সিন্ধী অধিবাসী পূর্ণ এই ধরবর । তাহারা চতুর্দিকবর্তী আরও বহু সম্প্রদায়কে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল ; সুতরাং তাহাদের বোগাড়-যন্ত্রটা মাথুলী রকমের ছিল না । সিন্ধী পৌত্তলিক ব্যতীত মদীনার মোনাফেক সম্প্রদায়ও তাহাদের সঙ্গে বড়বন্ধে লিপ্ত ছিল । তাহারা ধরবরে ৬টি অজেয় কেল্লা (দুর্গ) নির্মাণ করিয়া আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছিল । আ হজরত (ছালঃ) ৭ম-হিজরীর মহররম মাসে ১৫০০ শত ছাহাবাঃ কারাম (তাহাদের মধ্যে ২০০ অখারোহী যোদ্ধা ছিলেন) কে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে ‘কুচ্’ (যাত্রা) করিলেন । আ হজরত (ছালঃ) ধরবরে পৌছিলেই ঐ ভয় প্রতিপক্ষ দলে যুদ্ধারম্ভ হইল । কয়েক দিনের ধরবরের সকল দুর্গই মোছলমানদিগের হস্তগত হইল ; কিন্তু সুদূর ও দুর্ভেদ্য ‘কমুস্’ দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল না ; হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও অগ্ন্যান্ত প্রথিতনামা বীর-পুরুষগণ মহাপরাক্রমের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিয়াও উহা অধিকার করিতে পারিলেন না ; তখন আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, আগামী কল্য বাহার হস্তে যুদ্ধ-পতাকা প্রদান করিব, তাহার হস্তে দুর্গ হইবে ।

বীরেন্দ্র-কেশরী হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) চকের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে আ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে ধরবর-যুদ্ধে আগমন করিতে পারিয়াছিলেন না । কিন্তু তিনি যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য বড়ই

‘বে-চয়েন’ (উদ্বিগ্ন) ছিলেন। অগত্যা সেই পীড়িত অবস্থায়ই কয়েক দিন পরে ধরবরে গিয়া পঁহছিলেন। অ’ (ছালঃ) সেই রাত্রিতেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) চক্ষের যন্ত্রণার কাতর ছিলেন যে, ছালাম-বিন্ ওক্বা (রাজিঃ) তাঁহার হাত ধরিয়া অ’ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে লইয়া আসিলেন। আর সেই মুহর্ত্তেই অ’ হজরত (ছালঃ)-এর দোওয়া বা পবিত্র করম্পর্শে তাঁহার চক্ষের যন্ত্রণা দূর হইল—রোগ নিরাময় হইয়া গেল। তৎপর অ’ হজরত (ছালঃ) তাঁহার “যোলফোকর” নামক তরবারি এবং পবিত্র পতাকা প্রদান করিয়া বলিলেন, “অচ্ছ তোমার হস্তে ‘কমুস্’ দুর্গ জয় হইবে।

হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ), মোছলেম-সৈন্যগণ সহ কমুস্ দুর্গের নিকটে পবিত্র পতাকা স্থাপন পূর্বক, প্রবল পরাক্রমের সহিত সিহদীদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সিহদী সেনা পতি হারেছ সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে স্তম্ভিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, বীরেন্দ্র কেশরী আলী (কঃ—ওঃ)-এর তরবারির এক আঘাতেই শমন সদনে গমন করিল। হারেছের পতনে তদীয় ভ্রাতা বিপুল বল-বিক্রমশালী দীর্ঘকায় মারহাব ভ্রাতৃ-হস্তার প্রাণ বিনাশার্থ ডবল শিরজ্ঞাণ ও ডবল উরজ্ঞাণ পরিধান পূর্বক প্রত্যেক যুদ্ধাঙ্গ দুই দুইখানি লইয়া, বীর শ্রেষ্ঠ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতি আশ্চর্য্যের সহিত হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিতে লাগিল “আমার নাম মারহাব, আমি শত্রু দমনে সিদ্ধহস্ত, আমি

সর্ববিধ যুদ্ধক্ষেত্রে সম্বিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।” তৎকালে আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, “আমার নাম আলী, আমি ভূমিষ্ঠ হইলে আমার জননী আমার নাম “আলী-অলু-হায়দার ” অর্থাৎ সিংহ রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর মারহাব প্রচণ্ড বিক্রমে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি ‘নেযাঃ’ (বঙ্গম বা বড়শা বিশেষ) নিক্ষেপ করিল। কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় হস্তস্থিত জোলকোকার নামক তরবারির এক ভীষণ আঘাতে তাহার অভ্যন্তর লোহ মুকুট ভেদ করিয়া মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বিরাট তালতরুবৎ তাহার উন্নত দেহ ধরাতলে বিলুপ্তিত হইতে লাগিল। এইরূপে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শত্রু পক্ষীয় ৭ জন নামযাদাঃ বীরপুরুষকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন যিহুদিগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অমানুষিক বীরত্ব দর্শনে ভয়ে একান্ত জড়সড় হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অতঃপর কমুস ও অন্যান্য দুর্গের যিহুদিগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাঁহার খেদমতে প্রস্তাব করিল যে, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশ গ্রহণান্তর তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা নিজেদের সমুদয় সামগ্রী-সম্ভার সহ দুর্গ পরিত্যাগ কর। যিহুদিগণ বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। ঐ সময় আত্ম-সমর্পণ ব্যতিরেকে যিহুদিগণের আর গত্যন্তর ছিল না। আ হজরত (ছালঃ) কমুস দুর্গ জয়ের সংবাদ পাইয়া খোদাতায়ালাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন, এবং হজরত আলী (রাজিঃ)-কে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

কানানা-বিন্-আবি হকিক কমুস দুর্গের অধিপতি ছিল। মোছলমানগণ সেই বিজিত দুর্গে ১০০ বর্ষ, ৪০০ তরবারি, ১০০০ নেযাঃ (বঙ্গম বা

বড়শা বিশেষ), ৫০০ ধনুক ■ অস্ত্রাত বহু সামগ্রী-সম্ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে আবু হজরত (ছাল:) কানানাকে বলিলেন, তোমার আর অর্থ কোথায় আছে, বলিয়া দাও।" সে বলিল, "আমার সমুদয় অর্থ খরচ হইয়া গিয়াছে।" হজুর (ছাল:) বলিলেন, "যদি তুমি আর কোন ধন-সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তবে 'আমান' (শান্তি—রক্ষা) পাইবে না। অতঃপর ■ হজরত (ছাল:) আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে তাহার গুপ্ত-ধনের সম্বান পাইয়া, হজরত জোবায়ের (রাজি:) কে সেই নির্দিষ্ট স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। সেই যায়গা খোঁড়া হইলে তথায় প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহাতে রিহদিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইলেও, আবু হজরত (ছাল:) খীর ঔদাখ) গুণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে "নাতাত" দুর্গে সমুদয় সামগ্রী-সম্ভার একত্রিত করা হইলে, তিনি উহার এক পঞ্চমাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্টাংশ শিষ্যদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে ১৫ জন মোছলমান শহীদ হন; রিহদিদিগের মধ্যে ৯০ জন নিহত হইয়াছিল। শাহাদত-প্রাপ্ত মোছলমানদিগের মধ্যে ■ জন মহাজেরিন ও ১১ জন আনছার ছিলেন। উৎপন্ন শস্তের অর্ধেক প্রদানের বন্দোবস্তে রিহদীদিগকে স্বয়ংসে বসবাস করিতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাদের কেহাগুলি সমভূমি করিয়া ফেলা গেল।

যখন আবু হজরত (ছাল:) ষষ্ঠবর হইতে মদীনার প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিতে ছিলেন, ঐ সময় আবিশিনিয়া (হাবশ্) রাজ্য হইতে তত্রত্য মহাজেরিন দল, হাবশ-পক্ষির প্রদত্ত পত্র ও 'তহ্ফা' (উপঢ়োকন বা নয়রানা) লইয়া হজুর (ছাল:) এর খেদমতে আসিয়া পহুছিলেন। সুদীর্ঘ কাল পরে ইহাদের আগমন এবং সম্মিলনে আবু হজরত (ছাল:), এবং ছাহাবা: (রাজি:) গণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাজেরিন দিগের জন্য আবু হজরত (ছাল:) অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন।

ইহাদিগের আগমনে মোছলমানদিগের শক্তিও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল। অতঃপর আ হজরত (ছালঃ) সশিষ্যে মদীনাতিমুখে রওয়ানা হইলেন। হজুরের প্রত্যাবর্তন কালে খয়বরের নিকটস্থ "ফদক" নামক স্থানের যিহুদিগণ তাঁহার খেদমতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া এই প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদিগের কেবলমাত্র প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হউক, মাস-আসবাবেরও কোন প্রয়োজন নাই। আ হজরত (ছালঃ) তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন; ফদক বাসিগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেল। এই স্থানে কোনও রূপ যুদ্ধ-হাঙ্গামা হইয়াছিল না; হুতরাং 'বেলা-তক্‌হিম' (ভাগ-বন্টন না করিয়া) যেরূপ খোদাতোলার আদেশ ছিল; উহা খোদা ■ তাঁহার রহুলের 'মাল' (সম্পত্তি) বলিয়া পরিগণিত হইল। ফদক হইতে মোছলেম-বাহিনী " ওয়াদি-অল-কোরা " নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য যিহুদিগণ আপনাদের 'বস্তি' (গ্রাম বা বাসস্থান) হইতে বাহির হইয়া মোছলমানদিদের প্রতি 'নেবাঃ' (লেবাঃ—বড়শা বা বঙ্গম বিশেষ) বর্ষণ আরম্ভ করিল। মোছলমানগণ ঐ স্থান দৃঢ়ভাবে অবরোধ করিলে, তাহারা নিরুপায় হইয়া খয়বরস্থ যিহুদিগণের স্তায় উৎপন্ন শস্তের অর্দ্ধাংশ দিতে রাজী হইল; আ হজরত (ছালঃ) তাহাদের সেই প্রস্তাবে অস্বীকৃতি করিলেন। ওয়াদি-অল-কোরার যুদ্ধে একজন মাত্র ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। ওয়াদি অল-কোরার নিকটস্থ তিমা নামক যিহুদী পল্লীর অধিবাসিগণ ও পূর্বোক্ত রূপ ব্যবস্থায় আবদ্ধ হইয়া তথায় বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ মদীনা হইতে খয়বর পর্যন্ত সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণই আ হজরত (ছালঃ)-এর বশত স্বীকার করিল।

আরবের যিহুদিগণ খুব ধনী ছিল; ইহারা বাণিজ্য-ব্যবসায় এবং হুদের কারবার চালাইত। অতীতি ও পৃথিবীর নানাদেশে ইহারা খুব ধনী—কোড়পতি। খয়বরের যিহুদিদিগের অধিকারভুক্ত যমিন গুলি খুব

উর্কর ও শত্রু-শালিনী ছিল। খয়বর-বিজয়ের পর, বিজয়-লব্ধ প্রচুর সামগ্রী-সম্ভার, আর চাষের যমিন ■ বাগ-বাগিচা বাহা ভাগে পাইয়া ছিলেন, তদ্বারা এতকাল পরে মহাজের (রাজিঃ) দিগের অর্থাতাব দূর হইল। এক্ষণে নিঃস্ব মহাজেরগণ 'হাহেবে জায়দাদ' (ভূ-সম্পত্তির অধিকারী) ও হইলেন।

মকার কোরেশ ■ অন্তান্ত মোশ্‌রেক (অংশিবাদি) গণ যখন খয়বরের উপর মোহলমানদিগের 'চড়্‌হাই' (অভিযান বা অবরোধ)-এর সংবাদ পাইল, তখন তাহারা নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত যুদ্ধের কলাকল জানিবার জন্য উৎগ্রীব রহিল। আ হজরত (ছালঃ) যে খয়বরের যুদ্ধে জয়ী হইলেন, মকাবাসী বিখ্যাসিগণ সে সংবাদ অনেকটা বিলম্বে পাইয়াছিল; পরে তাহারা যখন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাদের উৎকণ্ঠা ও দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না। মদীনার অতি নিকটেই খয়বরে যিহুদীদিগের একটা প্রধান আড্ডা ছিল; খয়বরের ও নবাগত যিহুদি অধিবাসিগণ, এবং আশপাশের যিহুদি অধিবাসিগণ মিলিয়া এক অতি প্রবল শক্তিশালী দল ছিল; মকার কোরেশগণের ধারণা ছিল যে, তাহারা মোহলমানদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে; কিন্তু ফল তাহার বিপরীত হইল।

আ হজরত (ছালঃ) মদীনার প্রত্যাবর্তন করিয়া, আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল জাতি বা সম্প্রদায় মোহলমানদিগের উচ্ছেদ সাধন জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, তাহাদের বিভিন্ন ■■■ বিক্কে বিভিন্ন বোদ্ধদল দ্বারা গঠিত অভিযান পাঠাইলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), ■■■ ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওরাহাঃ (রাজিঃ), হজরত বশির-বিন্-হায়াদ আনুহারী (রাজিঃ), হজরত ওছায়াঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), হজরত গালেব-বিন্-আবদুল্লা-কলিনী (রাজিঃ), ■■■ আবু

হুসু আছলমী (রাজিঃ), হুসুত আবু কেতাদাহ্ (রাজিঃ)-প্রমুখ প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ কারার ও বিখ্যাত বীরপুরুষগণ ঐ সকল অভিযানে সেনাপতি রূপে গমন করিয়াছিলেন ; আর প্রত্যেক অভিযানই সাফল্য যুক্ত হইয়া মদীনার প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল ।

হুসু (ছালঃ) এই বৎসরেই আরব দেশের বিভিন্ন রাজ্য আরবের বাহিরেও কতিপয় সাম্রাজ্য এবং রাজ্যের অধিপতিদিগের নিকট পত্র সহ দূত প্রেরণ করেন । তাঁহাদিগকে পবিত্র ইসলাম (একেশ্বরবাদ) ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য অহুরোধ আহ্বান করা হয় । আবিশিনিয়া-ধিপতি নজাশীর নিকট তিনি যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, সে বিষয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । অন্যান্য স্থানের অধিপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ মোছলমান হইয়াছিলেন, কেহ কেহ মোছলমান না হইলেও, ভক্তি এবং সহানুভূতি-সূচক লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার খেদমতে ‘হাদীয়া’ (উপঢৌকন) পাঠাইয়াছিলেন ; কেবলমাত্র গর্বোন্মত্ত পারস্ত সম্রাট, পরবেজ, আবু হুসুত (ছালঃ)-এর প্রেরিত দূত মনযর-বিন্-সাওনীরা প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার এবং তাঁহার প্রেরিত পত্রখানির অবমাননা করিয়াছিলেন । আবু হুসুত (ছালঃ) এই সংবাদ শুনিয়া ক্রমাইয়াছিলেন ; কছরী (কেছরাঃ) যেমন আমার পত্রখানি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়াছে, তাহার ছোলতান ও ঐক্লপ টুকরা টুকরা (খণ্ড-বিখণ্ড) হইয়া যাইবে । কয়েক বৎসর পরেই আবু হুসুত (ছালঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল । দ্বিতীয় খোন্-কারে রাশেদীদ মহামান্ন খলিফা হুসুত ওমর কারক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে সমগ্র পারস্ত সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ইসলামী সাধারণত্বের অন্তর্নিবিষ্ট হয় । বিশাল পারস্ত সাম্রাজ্যের সর্বত্রই অর্ধ চন্দ্র-বিখচিত মোছলেম-বিক্রম-পতাকা উজ্জ্বল হইয়াছিল ।

১ম হিজরীর শওয়াল মাসের শেষ পর্যন্ত ঐ হজরত (হালঃ) মদীনা-তৈয়বায়ই 'তশ্রিফ' রাখিয়াছিলেন। ঐ সালের ~~.....~~ তিনি ঐ সকল ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-কে—বাহারী গত বৎসর হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—'ছফরের' মোছার্কেরির) ~~.....~~ প্রস্তুত হইতে : আদেশ দিলেন। তদনুসারে ঐ সকল ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং আরও অনেকে হজ্জ-যাত্রার ~~.....~~ হইতে লাগিলেন। ২০০০ ছুই হাজার ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে 'রোমরাঃ' আদায় করিবার ~~.....~~ মদীনা হইতে মহোতৎসাহে ~~.....~~ মক্কাস্থে যাত্রা করিলেন। গত বৎসর হোদায়বিয়ারবে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইয়াছিল, তাহাতে এই শর্ত ছিল যে, মোছলমানগণ এ বৎসর রোমরাঃ আদায় না করিয়া চলিয়া যাইবেন, আর আগামী বৎসর আসিয়া রোমরাঃ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। সুতরাং সন্ধি-পত্রের এই শর্ত অনুযায়ী ঐ হজরত (হালঃ) সদলবলে মক্কাস্থে যাত্রা করিলেন। মক্কার নিকটে বাইরা হেমায়েল (কোরআন পাক) ও তরবারি যাত্রা সঙ্গে রাখিলেন, অবশিষ্ট সর্বপ্রকার 'হাতিয়ার' (অস্ত্র-শস্ত্র) তথায় খুলিয়া রাখিয়া দিলেন ; তৎপর সকলে পরন ভক্তি-সচকারে মক্কার প্রবেশ করিলেন। 'বায়তোজ্জার' (কাবা-গৃহের) সম্মুখে গাঁহিয়া ঐ হজরত (হালঃ) মোছলমানদিগকে যথানিয়মে কাবার তওয়াফ্ করিতে আদেশ দিলেন। যথানিয়মে সর্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। ঐ হজরত (হালঃ) এবং ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)গণ গত বর্ষের হোদায়বিয়া সন্ধির শর্তানুসারে ~~.....~~ দিবস যাত্রা মক্কা-মোয়াজ্জমার অবস্থিতি করিলেন। 'আরকানে রোমরাঃ' সম্পাদন পূর্বক ~~.....~~ (হালঃ), আব্বাস-বিন্-আবদুল মোত্তালেবের বিবী (স্ত্রী) ওম্মে-ফজলের ভগিনী ময়মূনা বিস্তে-হারেছ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে পবিত্র পরিণয়-শূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তৎপর তিনি সশিষ্যে মক্কা হইতে বাহির

হইয়া 'ওয়াদী ছরফ' ■ শিবির সজ্জিবদ্ধ করিলেন, সেই স্থানে ■
 মহাপরিণীতা 'আহ লিয়াম' (পত্নী) মোছলেম-মাতা হজরত ময়মুনাঃ (রাঃ—
 আঃ) তাঁহার খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; ঐ সময়ে বীরেন্দ্র-কেশরী
 ■ হামযাঃ শতীদ (রাজিঃ)-এর বালিকা:কন্যাঈ তাঁহাদের সঙ্গে ঘাইতে
 ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে স্বীয়
 উক্তের হাওদায় তুলিয়া লইলেন, পরে ঐ বালিকাকে তাঁহার
 খালু হজরত জাফর (রাজিঃ) বিন্-আবি তালেবের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় ।

আ হজরত (ছালঃ) মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন
 পরে ওমরু-বিনলু-আছ (রাজিঃ), মহাবীর খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)
 এবং অন্ততম কোরেশ বীর ওহমান-বিন্-তাল্হা (রাজিঃ), পবিত্র ইসলাম
 ধর্ম গ্রহণ করেন । ইহাদের ইসলাম গ্রহণে আ হজরত (ছালঃ) ও
 হাবাবাঃ (রাজিঃ) গণ যেমন আনন্দ লাভ করিলেন, তেমনই তদ্বারা
 মোছলমানদিগের শক্তি ও অনেক বৃদ্ধি হইল । উত্তরকালে ইহাদের বাহুবলে
 ■ রাজ্যে ও বহুদেশে মোছলমানদিগের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল ।

হেজরতের ৮ম বৎসর ।

একুণে আব্বদদেশের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম ধর্ম-প্রচারে আর
 কোনও বাধা-বিঘ্ন ছিল না । ইসলামের বড় বড় শত্রুগণ ■ ■
 (ছালঃ) এবং মোছলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, একে একে অকৃতকার্য
 ■ নিহত হইয়া পড়িয়াছিল । মোছলমানদিগের শত্রুতাচরণ করিতে
 এ সময় আর তাহাদের সাহসে কুলাইতে ছিল না । পক্ষান্তরে দিন দিন
 বহুজাতি, বহু সম্প্রদায়, বহু জনপদবাসী ইসলামের শাস্তিময় পবিত্র শীতল-
 জ্বালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন । মক্কার কোরেশও অন্যান্য সম্প্রদায়ের

পৌত্তলিকগণ পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হইয়া, একপ্রকার 'মায়ুছ' (নিরাশ) হইয়া পড়িয়াছিল ; মদীনা ■ উত্তর আশ-পাশ ■ ধর্মবরের সিহদিগণ সম্পূর্ণ-রূপে দমিত হইয়াছিল । শাম (সিরিয়া)-সীমার খৃষ্টীয়ানগণ আর মতকোত্তোলন করিতে সাহসী হইতে ছিল না । মদীনায় মোনাকেকগণ ও শত চেষ্টা করিয়া আপনাদের চরিত্রসিদ্ধি সিদ্ধ করিতে পারিতেছিল না । ইহা ■ পৌত্তলিক কোরেশ, সিহদী, মোনাকেক এবং খৃষ্টীয়ানগণ মোহলেম-বিশেষ প্রকাশে ■ মোহলমানদিগের মূলোৎপাটন সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ■ নিরস্ত ছিল না । এইবার তাহারা আরবের নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি-সম্পন্ন রোমক সম্রাট ও পারস্ত সম্রাট দ্বারা মোহলমানদিগের মূলোৎপাটন করাইবার জন্য একটা বিরাট ■ প্রবৃত্ত হইল । ইতিপূর্বে ঐ হজরত (ছালঃ) যে সকল সম্রাট, বাদশাহ ও শাসনকর্তা গণের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ■ দাওত-পত্র পাঠাইয়া ছিলেন, ■ একখানি পত্র হারেছ (রাজিঃ) বিন-রমির আব্দুর হস্তে, শাম (সিরিয়া) দেশের অন্তর্গত বোছরার শাসনকর্তার নামে রওয়ানা করিয়াছিলেন । তিনি মদীনা চাইতে রওয়ানা হইয়া বোছরার পহুছিবার পূর্বে, শামের সীমান্তবর্তী "মুতা" নামক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, তথাকার খৃষ্টীয়ান শাসনকর্তা শরজিল-বিন-রমর গাচ্ছানী (কনষ্টান্টিনোপলস্থ রোমক সম্রাটের অধীনস্থ শাসন-কর্তা), হারেছ (রাজিঃ)-কে 'গেরেফ্তার' করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে বন্দী, পরে শহীদ (হত্যা) করিল । এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে, ঐ (ছালঃ) এবং ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ ■ শোকাবুলিত হইয়াছিলেন ।

মৃত্যুর অভিযান ■ তথায় ভীষণ যুদ্ধ ।

মৃত্যুর শাসনকর্তার বর্করোচিত অবৈধ আচরণের প্রতিকার-কল্পে, কর্তব্য-নির্ধারণ ■ অনতিবিলম্বে ■ পরামর্শ-সভা আহূত হইল। সর্ববাদিসম্মতি ■ মৃত্যুর শাসনকর্তার বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান হইয়া গেল। কারণ তাহাকে দমন না করিলে, সিরীয় এবং গ্রীক সৈন্য কর্তৃক আরব দেশ—বিশেষতঃ মদীনা নগরী আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আবু হজরত (ছালঃ), হজরত য়সেদ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ)-কে সেনাপতি করিয়া, হজরত জাফর বিন্-আবিভালেব (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ), হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) প্রভৃতি মহারথীগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট, ৩০০০ তিন সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য দ্বারা গঠিত এক অভিযান মৃত্যুর প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে (হজরত) য়সেদ (রাজিঃ) শহীদ হইলে (হজরত) জাফর (রাজিঃ), তিনি শহীদ হইবে (হজরত) আবদুল্লা-বিন্-রওয়াহাঃ (রাজিঃ) সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবেন; তিনি শহীদ হইলে মোহলমান-গণ সমবেত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে একজন সেনাপতি নির্বাচন পূর্বক যুদ্ধ করিবেন। তদনুসারে এই সৈন্যগণ মৃত্যুর পহুছিয়া জানিতে পারিলেন, ■ লক্ষ সিরীয় সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে; আবার মৃত্যুর অদূরে ওয়াসি বণ্ণকার স্বয়ং রোমক সম্রাট ■ লক্ষাধিক প্রশিক্ষিত ■ পরাক্রান্ত সৈন্যসহ অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু পবিত্র ইসলামধর্ম অল্পপ্রাণিত ধর্ম-প্রাণ মোহলমানগণ আপনাদের অপেক্ষা ■ গুণ অধিক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে ■ কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত এবং কুণ্ঠিত হইলেন না। যুদ্ধ ■ হইল, প্রথমোক্ত সেনাপতির এক শহীদ হইলেন। অবশেষে ■ সম্মতিক্রমে মহাবীর খালেদ :বিন্-অলিদ (রাজিঃ) পবিত্র

রণ-পতাকা হস্তে ধারণ পূর্বক রণ-সাগরে বাষ্প প্রদান করিলেন । তিনি এমন যোগ্যতা এবং এমন বীরত্বের সহিত শত্রু সৈন্যদলকে, স্বীয় মুষ্টিমের সৈন্যদল সহকারে আক্রমণ করিলেন যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সিরীয় সৈন্যদল ভীষণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল । অসংখ্য সিরীয় সৈন্তের দেহ-পরম্পরায় রণক্ষেত্র আচ্ছাদিত হইল । পক্ষান্তরে মোছলমানদিগের মধ্যে ১২ জন মাত্র যোদ্ধাপুরুষ শহীদ হইয়া-
 ছিলেন । যখন যুতার ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন আবু হজরত (ছালঃ) মদীনায় মহজেদ-নববীর মিশরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের অবস্থা ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের নিকট বর্ণনা করিতে ছিলেন । তিনি "এল্হাম-এলাহী " ধারা যুদ্ধের অবস্থা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন । এই যুদ্ধে হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) যেক্ষণ যোগ্যতার সহিত সেনাপতির কর্তব্য পালন, এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন, এবং অমাত্যবিক বীরত্ব-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা নাই ; কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং আব্বাহ্ তায়ালা তাঁহাকে হুয়েক্-আব্বাহ্, (আব্বাহ্ তায়ালায় তরবারি) উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন । হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ) যখন যুতার যুদ্ধে জয়ী হইয়া সসৈন্তে মদীনায় নিকটে আসিয়া পহুছিলেন, ঐ সময় আবু হজরত (ছালঃ) প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে বাহির হইলেন, এবং বিজয়ী যোদ্ধাপুরুষদিগের অত্যর্থনার্থ নগর হইতে কিয়দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন । বিজয়ী সেনাদল যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-কে " সয়কোআহ্ " উপাধী লাভের " খোশ্-খবরী " (সুসংবাদ) শুনাইলেন । এক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যুতা-যুদ্ধে শাহাদত-প্রাপ্ত

হজরত জাফর (রাজিঃ) ‘জয়তে’ (মোসলেম—স্বর্গে) ছই ‘বায়ু’ (বাহ বা হস্ত) বিস্তার পূর্বক উড়িতেছেন (মৃত-যুদ্ধে তাহার ছই বাহই কাটা গিয়াছিল) । সেই দিন হইতে তাহার নাম “ জাফর-তইয়্যার ” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ; আ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং ও এবিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন ।

মৃত্যু যুদ্ধের পর শামের সীমান্ত বাসী কজায়া সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পাইছিল । আ হজরত (ছালঃ) এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে ৩০০০ মহাজেরিন ■ আনুহার বীরপুরুষ সহ প্রথমে হজরত ওমর-বিনন্ আহ (রাজিঃ)-কে, পরে শত্রু সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া সংবাদ পাইবাআত্র আর একদল সৈন্যসহ হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জাব্বরাহ (রাজিঃ)-কে পাঠাইলেন । এই সম্মিলিত সৈন্যদল ঐ বিপ্লববাদী দিগকে আক্রমণ পূর্বক পরাজিত ■ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া বিজয়ীবেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । অতঃপর আরও ১৫০ অভিযান হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জাব্বরাহ (রাজিঃ)-এর অধীনে সমুদ্র তটবর্তী “ জোহ্নিয়াঃ ” সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, ৩০০ বোদ্ধ পুরুষ সহ গমন করিলেন । তাহাদের আগমন সংবাদে ঐ বিপ্লববাদীর দল ছত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল ।

অষ্টম হিজরীর শা’বান মাসে মক্কা নগরে একটি অভিনব ঘটনা ঘটিল । কোরেশদিগের সঙ্গে আ হজরত (ছালঃ)-এর যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছিল, তাহাতে মক্কার বহু-বকর ও বহু-খযায়া নামক দুইটি সম্প্রদায় পূর্বতন বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া, বহু-বকর কোরেশদিগের ও বহু-খযায়া আ হজরত (ছালঃ)-এর দলভুক্ত হইয়াছিল । কিন্তু ইতিমধ্যে বহু-বকর দলের মতি-গতি বিগ্ড়াইয়া গিয়াছিল ; তাহাদের দলপতি নওফেল বিন্-মোয়াবিয়া, বহু-খযায়া সম্প্রদায়কে উৎসন্ন দিবার জন্য কতিপয় কোরেশ নেতার সঙ্গে

বড়বড় পাকাইল, এবং একদা রাজিকালে হঠাৎ বহু-খযায়্যা সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া নির্ধর ভাবে হত্যা করিতে লাগিল। তাহারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া একেবারে কিছর্তুব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল, অনেকে পবিত্র কাবা-গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল; দুর্কৃতগণ সেখানেও তাহাদিগকে হত্যা করিল। এই বিপন্ন ভীষণভাবে উৎপীড়িত বহু-খযায়্যাগণ মক্কার থাকিয়া ঈ। (হাল:) -এর নামে যে 'করিয়াদ' করিয়াছিল, তিনি তাহা মদীনায় থাকিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর বহু-খযায়্যার কতিপয় প্রতিনিধি মদীনায় ঈ। হজরত (হাল:) -এর খেদমতে পহুছিলে, তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আমি শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করিতেছি।

কোরেশ প্রধানগণ বুঝিতে পারিল, এই সন্ধি-ভঙ্গের একটা বিষয় ফল ফলিবে; তদনুসারে তাহারা আপনাদের প্রবীণ নেতা আবু-ছুফিয়ানকে মদীনায় পাঠাইল; কিন্তু সে অকৃতকার্য হইয়া মক্কার ফিরিয়া আসিল। ঈ। হজরত (হাল:) মক্কা আক্রমণ গোপন ভাবে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ যাহাতে পূর্বাঙ্কে যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় জানিতে না পারেন, তৎকাল খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি, ছাহাবা: (রাজি:) গণও জানিতেন না যে, কোন্ দিকে অভিযান করিতে হইবে। হাতেক-বিন্-আবি বলতয়া (রাজি:) নামক একজন ছাহাবা:, স্বজাতিকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার একজন স্ত্রীলোকের হস্তে একখানি পত্র দিয়া এই যুদ্ধ-সজ্জার সংবাদ মক্কার পাঠাইলেন। কিন্তু ঈ। হজরত (হাল:) "এলুহাম-এলাহী" দ্বারা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, হজরত জোবের-বিন্-আওয়াম (রাজি:) কে, ঐ স্ত্রীলোককে ধৃত করিবার জন্ত পাঠাইলেন; স্ত্রীলোকটি ধৃত হইল, তাহার নিকট পত্র পাওয়া গেল, হাতেফ্ (রাজি:) আহূত হইয়া অপরাধ স্বীকার করাতে, ঈ। হজরত (হাল:) তাহার অপরাধ মার্জনা করিলেন।

অতঃপর ৮ম হিজরীর ১১ই রমযানুল মবারক ঐ হজরত (ছালঃ) ১০ হাজার ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) কে সঙ্গে লইয়া মক্কাতিমুখে রওয়ানা হইলেন। এছলামী সেনাদল ক্ষতগতি অগ্রসর হইয়া মক্কার ৪ কোশ দূরবর্তী “ ওয়াহী-মর্রাজ্-জহরান ” নামক স্থানে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন ; তখন পর্য্যন্তও মক্কাবাসিগণ এই অভিযানের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিল না। পরে ঐ স্থানের পশু-পালকদিগের দ্বারা এক বিরাট সেনাদলের আগমন-সংবাদ কোরেশগণ হইল। কোরেশ দলপতি আবু-ছুফিয়াদ তৎক্ষণাৎ তথ্যাস্থসন্ধানার্থ বাহির হইয়া, হজরত আব্বাহ (রাজিঃ) কর্তৃক ঐ হজরত (ছালঃ)-এর সম্মুখে নীত, এবং ঐ রাত্রেই পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। পরদিন ঐ হজরত (ছালঃ)-এর পরিচালনাধীনে এই বিরাট এছলামী সৈন্যদল মহাড়ম্বরে মক্কার প্রবেশ করিলেন। যাহারা কাবা-গৃহে কিংবা হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কিংবা যাহারা নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিবে, তাহাদিগের নিরাপদতা সম্বন্ধে ঐ হজরত (ছালঃ) ইতিপূর্বেই হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। মক্কার কোনও রূপ শোণিত-পাত না হয়, ঐ হজরত (ছালঃ)-এর ইহাই ঐকান্তিক কামনা ছিল ; তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল ; তাহার বিরুদ্ধে কেহই অস্ত্রধারণ করিল না। তিনি আব্বাহ তা-লার দ্বারায় শোকরিয়া আদায় করিয়া খানাঃ-কাবার প্রবেশ করিলেন, এবং তত্রত্য ‘বোত’ (দেব-প্রতিমা) গুলি ঐ পবিত্র গৃহ হইতে বাহির করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়াইলেন। অতঃপর একটি সারগর্ভ বস্তৃত প্রদান করিলেন। আজ অধর্মের উপর পবিত্র ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। অতঃপর দলে দলে পৌত্তলিক মক্কাবাসী পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, ঐ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে বার্ম্মেত হইতে লাগিলেন। এই বার্ম্মেত এর অর্থ সর্বশক্তিমান আব্বাহ

তারালা ৩. তাঁহার রহস্যের 'রোভারাত' অর্থাৎ অধীনতা স্বীকার । ঐ (ছালঃ)-এর আদেশে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), জীলোক-
দিগের নিকট হইতে বার্ষিক গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; আর তিনি
এই নব-দীক্ষিত মোছলমান নরনারীর সকলের ধোয়া তারালা
দরগায় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন ।

মক্কার কোরেশগণ সম্মান ৩ আরবদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ
ছিল । আবার মক্কাই পবিত্র কাবা-গৃহকে অধিকাংশ আরববাসী মহা-
সম্মানের চক্ষে দেখিত । মক্কার কোরেশগণ নব-প্রচারিত ইসলাম ধর্ম
সবকে কোন পক্ষা অবলম্বন করে, আরব দেশের বিভিন্ন জাতি
বিভিন্ন সম্প্রদায় সেই দিকে লক্ষ্য করিতেছিল । এই মক্কা-বিজয়ের
পর মক্কার কোরেশগণ প্রায় সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত
হওয়াতে, আরবের অন্যান্য জাতিগণ ও ইসলাম ধর্মের প্রতি
অনুরাগী ও আকৃষ্ট হইল । অতঃপর মক্কার নিকটস্থ অন্যান্য স্থানের
বিখ্যাত দেব মন্দির ও দেবমূর্তিগুলিও ঐ হজরত (ছালঃ)-এর প্রেরিত
হাযাযাঃ (রাজিঃ) গণ কর্তৃক ধ্বংসও চূর্ণীকৃত হইল । সঙ্গে সঙ্গে
পৌত্তলিকতার ভিত্তি পর্যন্ত উৎসাদিত হইয়া গেল ।

মক্কার অনতিদূরবর্তী তায়েফের নিকটস্থ " হওয়াযন " ও " ছকিফ্-
সম্প্রদায়ের প্রবল পরাক্রান্ত অধিবাসিগণ, ঐ হজরত (ছালঃ) ও
মোছলমানগণের সাফল্য দর্শনে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যদল
সজ্জিত করিতে লাগিল । তদনুসারে বহু-হওয়াযনের 'ছরদার' (নেতা
বা দলপতি) মালেক-বিন্-য়য়োফ্, উপরোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বা
সেনাপতির পদ গ্রহণ করিল । নিকটবর্তী আরও বহু সম্প্রদায়ের লোক-
তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল । ঐ (ছালঃ) লোক পাঠাইয়া
প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলেন ; তাঁহার প্রেরিত আবদুল্লা-বিন্-আবি

হদরু আহলমী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, এই বিরাট বাহিনী “ আওতাস্ ” নামক স্থানে সমবেত হইয়াছে । এই সংবাদ প্রাপ্তে তিনি স্বীয় সঙ্গীয় ১০ হাজার মহাজেরিন ও আন্হার, এবং ১ হাজার নব-দীক্ষিত মক্কাবাসী মোছলমানকে সঙ্গে লইয়া, এই বিপ্লববাদিগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন ।

শুরশ্রেষ্ঠ হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) ■ এই সৈন্যদলে ছিলেন । এই বিরাট বাহিনী “ ওয়াদী হোনায়নে ” গাঁহিলে, বিপ্লববাদিগণ পূর্ব হইতে এই অভিযানের সংবাদ জানিতে পাইয়া, হঠাৎ তাহাদিগকে নৈশ-আক্রমণ করিল । রাত্তিকালে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া, অপ্রস্তুত মোছলমান বীরগণ মহা বিভ্রাটে পতিত হইলেন । স্বাভাবিক মক্কার নব-দীক্ষিত মোছলমানগণ সর্বাত্মে পলায়ন করাতে, মোছলমানদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল । কিন্তু এই দিন আ হজরত (ছালঃ)-এর অল্পম সাহস, বীরত্ব, রণ-পাণ্ডিত্য, দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল । অবশেষে আল্লাহ তা-লার অসীম করুণাবলে বিধর্মীগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল ; তাহাদের শত শত যোদ্ধা রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল ; কিন্তু মোছলমান পক্ষে মাত্র ৪ জন বীর-পুরুষ শহীদ হইয়াছিলেন । এই গৌরবান্বিত জয়লাভে ৪৪ হাজার উষ্ট্র ও তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাগল ও মেঘ (দোহা) এবং ৪০০০ আওকিয়া (প্রায় ১৭/ মণ) চান্দ্রি (রৌপ্য) বিজয়ী মোছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল ।

শত্রুপক্ষের অধিকাংশ লোকও তাহাদের সেনাপতি মালেক-বিন-য়রোক্ তায়েফে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল ; আ হজরত সৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন পূর্বক, মালেকের কেল্লা এবং “আতম ” নামক আর একটি কেল্লা ধ্বংস করিয়া, তায়েফ্ নগর অবরোধ করিলেন । ২০ দিন কাল তায়েফ্ অবরোধের পর উহা জয় করা ভবিষ্যতের জন্য ‘মুলতবি’ (স্থগিত) রাখিয়া, সৈন্যে মক্কার প্রত্যাবর্তন করিলেন । তায়েফের অবরোধ কালীন

যুদ্ধে ১২ জন মোছলমান শহীদ হইয়াছিলেন । ঐ হজরত (ছালঃ) যুদ্ধজয়-লব্ধ সামগ্রী সম্ভার মোছলমানদিগের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়া পহুছিলেন ; এবং তথা হইতে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই সময় মধ্যে আরবের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন জনপদবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ।

৯ম হিজরীর ঘটনাবলী ।

৯ম সালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী এই :—

মক্কা-বিজয় ও হোনারনের যুদ্ধের পর ৯ম হিজরীর প্রারম্ভ হইতে, বিশাল আরব দেশের প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক জনপদ ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে মদীনার আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । বহুস্থান হইতে ‘ওফুদ’ (প্রতিনিধি বা ডেলিগেট) গণ আগমন করিলেন । সমগ্র আরবে ছলছুল পড়িয়া গেল । ইতিপূর্বে যাকাত ফরজ হইয়াছিল, সেই যাকাত “বায়তুল-মাল ” তহবিলে জমা হইয়া, ঘটানিরমে—উপযুক্ত ভাবে ব্যয়িত হইত ; বাহারা এযাবৎ পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল না ; তাহারা “জজিয়া ” নামক একটি সামান্য কর (ট্যাক্স) মাত্র দিয়া অব্যাহতি লাভ করিত ।

আরবের অন্তর্বিগ্রহ দূর হইলেও, বহিরাক্রমণের আশঙ্কা দূর হইয়াছিল না । মদীনার মোনাফেকগণ এবং আরবের খৃষ্টীয়ানগণ, প্রবল বহিঃ-শত্রুর দ্বারা মদীনা আক্রমণ করাইবার যোগাড়-যন্ত্র করিতেছিল । ঐ (ছালঃ) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, সিরিয়া-সীমান্তে গমন পূর্বক শত্রু সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ।

তিনি কোথায় যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সেই সংবাদ সম্পূর্ণ রূপে গোপন রাখিলেন। যুদ্ধের বায়-নির্বাহার্থ মোহলমানদিগের মধ্য হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল। সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক হইলে আঁ হজরত (ছালঃ) ৩০০০ তিন হাজার যোদ্ধাপুরুষ সঙ্গে লইয়া সিরিয়ার সীমান্তবর্তী “তবুক” অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অভিযানে তিনি কেবলমাত্র হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে সঙ্গে লইয়া ছিলেন না; স্বীয় পরিবার বর্গের ‘হেফাযত্’ (তত্ত্বাবধান)-জন্য তাঁহাকে মদীনায়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মদীনার ঘোনাফেকগণ তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রতিকূল সমালোচনা করাতে, তিনি মদীনা হইতে ১ ক্রোশ দূরবর্তী “আল্-জরফ্” নামক স্থানে গিয়া, হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন; এবং অভিযানে সজ্জী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ) ঘোনাফেকদিগের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিয়া, তাঁহাকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া মদীনায়া রাখিয়া গেলেন।

তবুক মদীনা-তৈয়বা হইতে ১৪।১৫ মঞ্চেলের পথ। এক্ষণে মদীনা মনুওরা হইতে তবুক পর্য্যন্ত রেল লাইন আছে। আঁ হজরত (ছালঃ) তবুকে গিয়া ২০ দিন অবস্থান করিলেন। সেখানে গিয়া শত্রুপক্ষের কোনও সাড়া পাইলেন না; তাঁহার দ্রুত আগমনে রোমক ■ সিরীয়গণ ভীত হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। বরং আয়লার শাসন-কর্তা এবং অন্যান্য শাসনকর্তা ও দলপতিগণ আসিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার পূর্বক, জজিয়া প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, এবং অনেকেই জজিয়া নগদ আদায় করিয়া দিলেন। কেবল দোমতহল-জন্দলের শাসনকর্তা খুদীয়া ধর্মাবলম্বী আকিদর-বিন্-আবদুল মলক, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত

হইলেন না। মহাবীর হজরত খালেদ-বিন-অলিদ (রাজিঃ), কতিপয় বীরপুরুষের সঙ্গে প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। আকিদর ও জজিয়া প্রদানে স্বীকৃত হইলেন; এবং নঘরানা স্বরূপ বহু অস্ত্র-শস্ত্র, উষ্ট্র, অশ্ব হজুরের খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর আ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে সসৈন্তে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৯ম হিজরীর পবিত্র রমজান মাসে তিনি সদল-বলে—মহাসমারোহে মদীনা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আ হজরত (ছালঃ) তবুক হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলে পর, আরবের বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন জনপদ এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ‘ওফুদ’ (প্রতিনিধি দল—ডেপুটেশন) সকল অনবরত আসিতে লাগিল। এক এক প্রদেশের—জনপদের—জাতির—সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আসিতেন; ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করিতেন, এবং দেশবাসী সকলের পক্ষ হইতে আ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তে ‘বয়্য়েত’ হইতেন। আর পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিধি পদ্ধতি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদাতা সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

অতঃপর আ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে একদল যোদ্ধাপুরুষ সহকারে ‘বেলাদ তয়’ (তয় প্রদেশ) অভিযুখে প্রেরণ করিলেন। তিনি তয় প্রদেশে পঁছিয়া ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। প্রসিদ্ধ দাতাও পরোপকারী হাতেম তায়ীর পুত্র, তয় জাতির সর্বপ্রধান ছরদার, আদি ‘ফরার’ (পলায়নপর) হইয়া শাম প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যুদ্ধে জয়ী হইয়া যুদ্ধ-জয়-লব্ধ সাহায্যী-সস্তার ও বহু সংখ্যক বন্দী লইয়া মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন। বন্দী দলের মধ্যে প্রসিদ্ধ দাতা ■

পরোপকারী হাতেমের কন্যা (আদি-বিন্-হাতেম তারীর ভগিনী) ছিলেন । আ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া উপযুক্ত অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রদান পূর্বক স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন । ভগিনীর মুখে আ হজরত (ছালঃ)-এর প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন শুনিয়া আদি-বিন্-হাতেম তারী ও মদীনার আসিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলেন ; এবং স্বদেশে গিয়া স্বীয় অধীনস্থ সমস্ত জাতিকে ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন করিলেন । এই সময় এত অধিক সংখ্যক ‘ওফুদ’ (ডেপুটেশন) হজুর (ছালঃ)-এর ‘খেদমতে’ আসিতে এবং পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন যে, আ হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষ এই সময় অল্পকালের জন্যও মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্তত যাইবার উপায় ছিল না । হজ্জের সময় আসিলে, হজরত আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি ও হজ্জের আমীর নিযুক্ত করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা করিলেন ; এবং নিজের পক্ষ হইতে কোরবানী দিবার জন্য ২০ টি উট ঐ সঙ্গে দিলেন । ৩০০ হজ্জ্বাঙ্গী মহোৎসাহে হজ্জ-যাত্রা করিলেন । হজরত আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ)-এর যাত্রার পর ছুরা বরআতের ৪০ টি আয়াত এককালীন ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হয় । উহাতে হজ্জ সঙ্কীর্ত্ত অनेক প্রয়োজনীয় আদেশ ছিল ; উহা হজ্জের সময় নানা দেশীয় মোছলমান-দিগের মধ্যে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক ছিল বলিয়া, ঐ সকল নবাবতীর্ণ আয়াত সমূহ সহ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় দ্রুতগামিনী উক্টের পৃষ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, হজ্জ্ পরিসমাপ্তির পর দওয়ান হইয়া আল্লাহ তায়ালার এই আদেশ সকলকে শুনাইয়া দিবে । ‘ঘোল-হলিফা’ নামক স্থানে গিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত হিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন । অতঃপর তাঁহারা

মক্কা-মোয়াব্বায় উপস্থিত হইয়া যথা ■■■ হজ্জ্ কার্য সম্পন্ন ও হজ্জরত আলী (কঃ—ওঃ) ছুরা বরআত সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া দিলেন ; পরে সকলে মদীনার প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই বৎসরেই আবু হজ্জরত (ছালঃ)-এর ছাহেবদাদী হজ্জরত জুয়ে কুলছম (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করেন । মক্কার যে সকল লোক (যদিও সংখ্যায় অতি অল্প) এ সময় পর্য্যন্ত ■ পৌত্তলিক ছিল, এইবার তাহারা সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । এই বৎসরেই 'মোনাকেক' (কপটাচারী) দলের নেতা আবদুল্লা-বিন্-আবি যুত্বা-গ্রাসে পতিত হন ; এই লোকটা আজীবন আবু হজ্জরত (ছালঃ) ও মোছলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল । তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোনাকেক দলের অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হন ।

দশম হিজরীর ঘটনাবলী ।

দশম হিজরীর মহররম মাস হইতে এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণের মদীনার আগমন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের " ছেল-ছেলাঃ " (স্রোত) পূর্ণভাবে চলিয়া ছিল । আবু হজ্জরত (ছালঃ) এই বৎসর কয়েক স্থানে অভিযান প্রেরণ করেন । সেই সকল অভিযানও সাফল্য মণ্ডিত হইয়া মদীনার প্রত্যাবর্তন করে । আরবের সকল প্রদেশ, সকল জনপদ এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই দলে দলে আসিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । বিপুল জনস্রোত অনবরত মদীনার দিকে আসিতে লাগিল । আরবের প্রসিদ্ধ জন-নেতা ওয়ায়েল-বিন্-হজ্জর মদীনার আসিয়া আবু হজ্জরত (ছালঃ)-এর হস্তে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । এই শক্তিশালী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করাতে, আবু হজ্জরত (ছালঃ) খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই বৎসরেই " নজরান "

এদেশ হইতে খৃষ্টীয়ানদিগের এক “ওফুদ” (ডেপুটেশন) আসিল। ইহারা মহজেদ নববৌতে প্রবেশ করিয়া, আ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে ‘বহাছ-মবাহেছাঃ’ (তর্ক-বিতর্ক) আরম্ভ করিল। এই মনের নেতা ছিল উপরোক্ত সম্প্রদায়ের দলপতি আবুল মছিহ্। এই সময়েই ছুরে “আলু-এমরান” এর শুকনু আয়াত ■ আয়াত ‘মোহাহেলা’ নাম্বেল হয়। আ ■ (ছালঃ) উহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিলেন, কিন্তু উহারা নিতান্ত ‘বে-আদবীর’ (অশিষ্টতার) সহিত ‘পেশ’ আসিল। আ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, (হজরত) ঈছা (আলাঃ), আব্রাহ তায়ালার নিকট ঐরূপ ছিলেন—বেমন (হজরত) আদম (আলাঃ)। কারণ তাঁহাকেও খোদা তা-লা মৃত্তিকা দ্বারাই বানাইয়া ছিলেন। ঈছারী (খৃষ্টীয়ান) গণ বলিল না, তা নয়, বরং ঈছা (আলাঃ) খোদার ‘বেটা’ (পুত্র) ছিলেন। উত্তরে আ হজরত (ছালঃ) করমাইলেন, যদি তোমরা আপনাদের ‘কওলে ছাচ্চাঃ’ (উক্তিভে সত্যবাদী) হও, তবে আমার ■ ময়দানে চল। আর আমার প্রিয় ‘আকারেব’ (যনিষ্ট আত্মীয়-বন্ধন) আমার সঙ্গে থাকিবে, উভয় পক্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বসিয়া বলিবে, ■ যে বুটা (মিথ্যাবাদী), তাহার উপর খোদা তা-লার ‘আযাব’ (শাস্তি) অবতীর্ণ হউক।” এই কথা শুনিয়া খৃষ্টীয়ানগণ চূপ হইয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আ হজরত (ছালঃ) ■ আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত হাছন (রাজিঃ) ও ■ হোছায়েন (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পূর্বোক্ত ঈছারীদিগকে বলিলেন, আমি ■ এই প্রার্থনা করিব যে, আমাদের (উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি ‘বুটা’ (মিথ্যাবাদী) তাহাদের উপর খোদার ‘আযাব’ (শাস্তি) ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হউক। তখন তোমরাও “আমিন” বলিও। আ হজরত

(ছালঃ)-এর এইরূপ দৃঢ়তা ও গাভীৰ্য্য দৰ্শনে খৃষ্টীয়ানগণ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, আমরা ‘মবাহেলা’ করিতেছি না। তখন ঈ। হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি তোমরা ‘মবাহেলা’ করিতে না চাও, তবে ইসলামধৰ্ম গ্রহণ কর; তাহারা বলিল, আমরা ইসলাম গ্রহণে ও ইচ্ছুক নহি। তচ্ছবণে ঈ। হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তবে তোমরা আমাকে ‘জজিয়া’ দাও—কিংবা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তখন তাহারা বলিল, আমরা ‘জজিয়া’ দিতে সম্মত আছি। হজুর (ছালঃ) তাহাতেই রাজী হইলেন। তৎপর তাহারা আপনাদের জন্ত একজন ‘আমীন’ (বিচারক—মীমাংসাকারী) চাহিল, তদনুসারে ঈ। হজরত (ছালঃ), হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জার’হ (রাজিঃ)-কে তাহাদের আমীন নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিছু দিনের মধ্যে “নজরান” প্রদেশের সমুদয় অধিবাসী ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত হইল; খৃষ্টীয়ানের নাম নেশান ও সেখানে রহিল না।

ইতিপূর্বে বিশাল এমন প্রদেশের শাসনকর্তা, পারস্ত-সম্রাটের সৰ্ব্ব-কমতাপন্ন রাজপ্রতিনিধি বাযান, ও ঐ প্রদেশের প্রায় সমুদয় অধিবাসী পবিত্র ইসলামধৰ্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; এতাবৎ কাল তিনি সেই শাসন-কর্তৃত্ব পদেই নিযুক্ত ছিলেন। এই বৎসর বাযান পরলোক গমন করেন। ঈ। হজরত (ছালঃ) এমন প্রদেশটী কর ভাগে বিভক্ত করিয়া তথায় ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে এমন প্রদেশের ‘যাকাত’ ■ ‘ছাদকা’ আদায় করিবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া যাকাত ও ছাদকা যথানিয়মে আদায় করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঈ। হজরত (ছালঃ) দশম হিজরীর ২৫শে ■■■■■ তারিখে মহাজের, আন্হার এবং মোছলমানদিগের এক বিরাট দল লইয়া পবিত্র

হজ্জ-ক্রিয়া সম্পাদনার্থ মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । কোরবানীর ১০০ টি উষ্ট্র লইলেন । ৪ঠা জেলহজ্জ রবিবার দিন তাঁহারা মহাড়ঘরে মক্কায় প্রবেশ করিলেন । হজ্জরত আলী (কঃ—ওঃ) এমন হইতে আসিয়া অ' হজ্জরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে যোগদান করিলেন ; এবং তাঁহার সঙ্গে পবিত্র হজ্জ কার্য সম্পন্ন করিলেন । অ' হজ্জরত (ছাল) এই বৎসর মোছলমানদিগকে 'মনাছক' হজ্জের 'তালিম' (শিক্ষা) দিয়াছিলেন ; উহার নিয়মাবলী বাতাইয়াছিলেন ; তৎপর আরকাতে ঈডাইয়া ওজ্জ্বিনী ভাষায় একটি হৃদয়াকর্ষণ কারিণী বক্তৃতা প্রদান করিলেন । সেই বক্তৃতায় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অমূল্য উপদেশাবলী নিহিত ছিল । ইহা অ' হজ্জরত (ছালঃ)-এর শেষ হজ্জ বলিয়া " হজ্জতল-বেদা " এবং " হজ্জ আল বালাগ্ " নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কথিত আছে, এই হজ্জ ১ লক্ষ অপেক্ষা ও অধিক সংখ্যক মোছলমান যোগদান করিয়াছিলেন । কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে হাজীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার হইয়াছিল । আরবের সকল প্রদেশ বাসী, সকল সম্প্রদায়ের মোছলমানই অগ্নাধিক পরিমাণে এই হজ্জ যোগদান করিয়াছিলেন ।

'আরকানে হজ্জ' আদায় করিবার পরে অ' হজ্জরত (ছালঃ) ছাহাবার কারাম (বাক্বিঃ) দিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে মদীনা-মক্কাওয়ার প্রত্যাবর্তন করিলেন । হজ্জরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে যে সকল নবদীক্ষিত মোছলমান এমন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হজ্জরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু 'শেকায়েত' (দুর্গাম) করিয়া ছিলেন—যাহা তাঁহারা বাস্তবিক ভুল বুঝিয়া ছিলেন । অ' হজ্জরত (ছালঃ) এই

শেকায়েত প্রবণে " আযিব হোম " নামক স্থানে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি আলী (কঃ—ওঃ) এর অনেক প্রশংসাবাদ করেন ; কতিপয় এমন বাসীর সেই ভ্রমের বিষয় বুঝাইয়া দেন, এবং ইহাও 'এরশাদ ফরমান' যে, যে ব্যক্তি আমার 'দোস্ত' (বন্ধু), সে (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ) এর দোস্ত ; আর যে লোক (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-এর দোশ্মন (শত্রু), সে আমারও দোশ্মন । " হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), অ' হজরত (ছালঃ) এর এই বক্তৃতা পর, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে 'মবারকবাদ (ধন্যবাদ) দিলেন, আর বলিলেন, আচ্ছ হইতে আপনি আমার 'খাছ' (বিশেষ) বন্ধু হইলেন। অ' হজরত (ছালঃ) মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর, তদীয় পুত্র-রত্ন এব্রাহিম পরলোক গমন করেন।

একাদশ হিজরীর ঘটনাবলী।

অ' হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমন।

১১শ হিজরীর মহররম মাস আসিল, সঙ্গে সঙ্গে অ' হজরত (ছালঃ) জরাজীর্ণ হইলেন ; এবং ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এই সংবাদ আরব দেশের চতুর্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। এই সংবাদ প্রবণে কতিপয় 'মোফ্ছেদ' (বিপ্লব-পন্থী বা ধর্মদ্রোহী) মস্তকোত্তোলন করিল। মোহলেমাঃ, খোয়েন্দ, আছুদ, এবং সজাহ-বিস্তে হারেছ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে 'নবুয়তের'

(পরগম্বরী বা প্রেরিতভের) দাওয়া করিল। উহারা মনে করিয়াছিল, বেরূপ আ [] (ছালঃ) পরগম্বরীর নামে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়া-
ছিলেন, আমাদের ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটবে। কিন্তু পরিণামে উহারা সকলেই অবমানিত, লাহিত [] ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ইহাদের []
মোহলেমাঃতুল কায্‌যাব এমামা প্রদেশে, ও আছদ বিন্-কারাব এমনে
সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আছদ কায্‌যাব আ হজরত (ছালঃ)
[] জীবিতাবস্থায়ই ফিরোয্‌ নামক এক বীরপুরুষের হস্তে 'কতল' (নিহত)
হয়। আর মোহলেমাঃতুল কায্‌যাব প্রথম খলিফা হজরত সিদ্দিক
আকবর (রাজিঃ)-এর খেলাফত-কালে, সেনাপতি হজরত খালেদ-বিন্-
অলিদ ছয়ফোরাহ্ (রাজিঃ) কর্তৃক ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত, [] হজরত হামযাঃ
(রাজিঃ)-এর শাহাদৎকারী (হত্যাকারী) ওহসী কর্তৃক নিহত হয়।
ওহসী বলিতেন, আমি কোফ্‌কারের অবস্থায় একজন 'বেহতরিন'
(উত্তম—আদর্শ) পুরুষকে শহীদ এবং মোহলমান অবস্থায় []
'বদতরিন' (দুঃ—দুরাচার) লোককে হত্যা করিয়াছি।

একাদশ হিজরীর ২৩শে ছফর তারিখে আ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়া
একটু হ্রাস বোধ হইল। ইতিপূর্বে শাম ও ফলস্তিনের সীমান্ত প্রদেশ
হইতে বিশেষ অশান্তির সংবাদ আসিয়াছিল। এই অপেক্ষাকৃত স্থল অবস্থার
তিনি মোহলমানদিগকে ক্রমের কারছারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত
হইতে আদেশ করিলেন। হজুর (ছালঃ) দ্বিতীয় দিবসে (২৭শে ছফর),
[] ওহামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান
পূর্বক, সমুদয় জলিলল্ কদর (মহাসম্মানিত) ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)
দিগকে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করাইলেন। [] আবু-
বকর হিদ্দিক-প্রমুখ ভাবীকালের ৪ খলিফা, আশরার (রাজিঃ) মোবাম্বরাগণ
প্রভৃতি কাহাকেও বাদ দিলেন না। ২৮শে ছফর তারিখে তাঁহার পীড়া

আবার বৃদ্ধি পাইল। এই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ)-এর যুদ্ধ-পতাকা 'দোরস্ত' করিয়া দিয়া, গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে সেনাদল রওয়ানা করিলেন; কেবল নিজের অসুস্থতা বৃদ্ধি দর্শনে প্রধান সেনাপতির মত গ্রহণ পূর্বক পিতৃব্য হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) ও প্রিয় জামাতা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে আপনার নিকটে রাখিয়া দিলেন। এই দুইজন ব্যতীত আর সকলেই মদীনা হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, শাম ও কলত্বিন প্রদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনা হইতে এককোশ দূরবর্তী "জরফ্" নামক স্থানে এছলামী সৈন্যদলের শিবির সন্নিবেশিত হইল। ঐ স্থান হইতে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), প্রধান সেনাপতির অমুমতি গ্রহণ পূর্বক প্রত্যহ মদীনা-তৈয়বার হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া পুনরায় সেনানিবাসে প্রত্যাবর্তন করিতেন। হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) খীর বিশাল সেনাদল লইয়া জরফেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আ হজরত (ছালঃ)-এর পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। আ হজরত (ছালঃ) ও এই অবস্থায় তাঁহাকে 'কুচ্' (যাত্রা) করিতে অমুমতি দিতে ছিলেন না। হজুর (ছালঃ) পীড়িত অবস্থায় যে কয়টি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শেষ বক্তৃতাটি এই :—(আমার মৃত্যু হইলে) "আমার 'করীব রেশতা-দার' (ঘনিষ্ট আত্মীয়) গণ যেন আমাকে গোছল দেওয়ায়; আমার 'জানাযাঃ' (কাফনাবৃত শব) আমার কবরের নিকট রাখিয়া, সকলে অতি অল্প সময়ের ■■■ 'আলগ্' (বিস্তৃত) হইয়া বাইবে, কারণ 'মালায়েক' (ফেরেশতা) গণ যেন আমার জানাযার নমায্ পড়িয়া লইবার অবসর পায়। পরে সকলে দলে দলে আমার জানাযার নমায্ পড়িবে। প্রথমে

আমার 'খান্দানের' (বংশের) পুরুষগণ নমায় পড়িবে, তাহাদের পক্ষ
 জীলোকগণ—তদনন্তর আর আর সকলে জানাযার নমায় আদায় করিবে ।”
 পীড়ার শেষ ৩ দিন তিনি 'ছাহেবে ফরাশ' (শয্যাশায়ী) ছিলেন । এই পীড়ার
 অবস্থায় আঁ হজরত (ছাল), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-কে
 মছজেদে তাঁহার নিজের জায়গায় এমামতি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন ।
 তিনি, হজুর (ছালঃ)-এর জীবিত অবস্থায় ১৩ ওয়াক্তের নমায়ে এমামতি
 করিয়াছিলেন । ইতিমধ্যে আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল । আঁ
 হজরত (ছালঃ)-এর ব্যারাম অবস্থায় হজরত আলী
 (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাহ (রাজিঃ), হজরত ফজল-
 বিনু-আব্বাহ (রাজিঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)
 এবং হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সর্বদাই তাঁহার খেদমতে
 উপস্থিত থাকিতেন ।

তিনি এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে
 যে 'ওছিয়ত করিয়াছিলেন, তাহা এই ঃ—“ নমায়
 'মোতায়াঃল্লেকিন' (আত্মীয়-স্বজন বা সম্পর্কিত ব্যক্তি-
 গণ) সম্বন্ধে 'গাফেল' (অমনোযোগী) থাকিও না ।”

১১শ হিজরীর ১২ই রবিওল-আউওল, সোমবার ফজরের নমাজের সময়
 আঁ হজরত (ছালঃ) মাথায় পটি বাধিয়া মছজেদে গমন করিলেন, এবং
 হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর এমামতিতে—জামাতের ডানদিকে
 বসিয়া নমায় পড়িলেন ; এই দিনও তিনি কিঞ্চিৎ ওয়াজ ফরমাইলেন ।
 হজুর (ছালঃ)-এর অবস্থা একটু ভাল দেখিয়া হজরত আবুবকর ছিদ্দিক
 (রাজিঃ), মছজেদ হইতে কিছু দূরবর্তী খীয় গৃহে গমন করিয়াছিলেন । আঁ
 হজরত (ছালঃ) মছজেদ হইতে হজরায় প্রবেশ পূর্বক, ওম্মোল মুমেনিন
 হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্বক শয়ন

করিলেন। ইত্যবসরে হজরত আবহুর রহমান-বিন-আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) একখানি মেছওয়াক (দাঁতন) লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ), ভ্রাতার হস্ত হইতে দাঁতন খানি লইয়া চিবাইয়া খুব নরম করিলেন; এবং হজুর (ছালঃ)-এর দিলেন। তিনি উহা গ্রহণ পূর্বক যথানিয়মে দাঁতন করিলেন। পরে মেছওয়াক খানি রাখিয়া দিয়া স্বীয় ‘ছের-মবারক’ (পবিত্র মণ্ডক), মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ—আঃ) বক্ষঃদেশে স্থাপন পূর্বক, পবিত্র পা দুখানি সম্ভ্রমারিত করিয়া দিলেন। হজুর (ছালঃ)-এর সম্মুখে একটি পানী পূর্ণ পেয়ালা ছিল; তিনি স্বীয় পবিত্র হস্ত ঐ পানীতে ভিজাইয়া স্বীয় ‘চেহরা মবারকে’ (বদন মণ্ডলে) ফিরাইতে লাগিলেন; এবং ফরমাইলেন, “আল্লাহ্মা আনি আলা ছাকরাতিল মওতে” (হে আল্লাহ্, ছাকরাতিল মওত হইতে আমাকে ‘মদদ’ (সাহায্য) কর। ওম্মোল-মুমেনিन হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা—আঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার চেহরা মবারক দেখিতে ছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল-আউল সোমবার বেলা প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় আ হজরত (ছালঃ)-এর অমর পবিত্র আত্মা দেহ-পিঙ্গর পরিত্যাগ পূর্বক ‘জন্নতল ফেরদওছে’ চলিয়া গেলেন (ইয়া লিল্লাহে ওয়া ইয়া এলায়হে রাযেউন)।

ক্ষণকাল মধ্যে এই ভীষণ শোকাবহ সংবাদ মদীনা নগরের সর্বত্র প্রচারিত হইল। শহরের সমস্ত নরনারী বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ও শোকে একান্ত মুগ্ধমান হইয়া পড়িলেন। সে দুর্কহ শোকের পরিমাণ নির্দেশ করা অসম্ভব। আ হজরত (ছালঃ)-এর এন্তেকাল-সময়ে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না—‘ছবখ্’ নামক মহান্নায় স্বীয় গৃহে ছিলেন। কাকক (রাজিঃ) এই

শোচনীয় সংবাদ শ্রবণে শোকে এরূপ বিহ্বল হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন যে, তিনি বলিতে লাগিলেন, আ হজরত (ছালঃ)-এর 'এন্তেকাল' (মৃত্যু) হয় নাই ; তিনি হজরত মুছা (আলাঃ)-এর গ্রাম স্বীয় প্রভুর নিকট গমন করিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন । তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তিনি আরও বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে শমন সদনে পাঠাইব । হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজুর (ছালঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ শুনিবামাত্র গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিলেন । সোজা-হজি হজরার প্রবেশ করিয়া, আ হজরত (ছালঃ)-এর প্রাণ শূন্য দেহের পবিত্র মস্তকটি মোছলেম-মাতা হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ক্রোড় হইতে তুলিয়া খুব 'গওর' করিয়া (অভিনিবেশ সহকারে) দেখিলেন, পরে বলিলেন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর 'কোরবান' হউক ; 'বেশক' (নিঃসন্দেহ) আপনি ঐ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন,—বাহা আল্লাহ তোলা আপনার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এই কথা বলিয়াই " ইম্মা লিল্লাহে ওয়া ইম্মা এলায়হে রাযেউন " পড়িতে পড়িতে হজুরা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন । এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং তাঁহার আহ'লিয়া' রছুল-নন্দিনী, স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমা যোহরা (রাঃ—আঃ) ভীষণ শোকে কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব । এক্ষণে হজুর (ছালঃ)-এর শেবানুষ্ঠান অর্থাৎ গোছল ও কাকন-দফন সম্বন্ধে যোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ হইল ।

মহজ্জেন-নববীতে এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছিল—এই সকল কথা-বার্তা এবং আলোচনা চলিতেছিল, ঐ সময়ই সেখানে সংবাদ পৌঁছিল যে, "ছকিফাঃ-বহু-ছায়েদা" নামক স্থানে আনুছারগণ সমবেত হইয়া হজরত ছায়াদ-বিনু-সেবাদাঃ (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়ু-স্নেহ করিতে চান । আবার কোনও কোনও আনুছার বলিতেছেন, মোহাজেরদিগের মধ্য হইতে

জন, এবং আমাদিগের মধ্য হইতে একজন আমীর মনোনীত করা হউক । এই অপ্রীতিকর সংবাদ শুনিবামাত্র হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জাবরাহ্ (রাজিঃ), মাঝ একদল প্রধান প্রধান মহাজেরিন তথায় ধাবিত হইলেন । আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) এবং হজরত কজল-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে, আ হজরত (ছালঃ)-এর 'ওছিয়ত' (অন্তিম-নির্দেশ) অনুযায়ী তাঁহার 'তজ্-হিয়' ও 'তক্ফিন্' (মৃতদেহের কাফন-দফনের অনুষ্ঠান) জন্ত রাখিয়া গেলেন । অতঃপর হজুর (ছালঃ)-কে 'গোছল' (স্নান) করান আরম্ভ হইল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) গোছল করাইতে, হজরত আব্বাছ রাজিঃ ও তাঁহার দুই পুত্র 'করওট' ফিরাইতে (পার্শ্ব-পরিবর্তন করাইতে), আর হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) পানী ঢালিয়া দিতেছিলেন । গোছল শেষ হইলে তাঁহাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হইবে, তাহা লইয়া উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইল । ইতিমধ্যে হজরত আবু-বকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), ছকিফাঃ-বনি ছায়েদাঃ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি হজুর (ছালঃ)-এর বাচনিক গুনিয়াছি, প্রত্যেক নবী (পয়গম্বর—রছুল)-কে ঐ স্থানে দফন করা হইয়াছে—যে স্থানে তাঁহারা 'এন্তেকাল' (দেহত্যাগ) করিয়াছেন । এই কথা শুনিবামাত্র ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ, আ হজরত (ছালঃ)-এর বিছানা দি তুলিয়া ঐ স্থানেই কবর খনন আরম্ভ করিলেন । ওদিকে কাফন পরান কার্যও সমাধা হইয়াছিল । কবর খনন হইবার পর জানাযার নমায্ পড়া আরম্ভ হইয়া গেল । প্রথমতঃ পুরুষগণ, পরে স্ত্রীলোকগণ, অবশেষে বালকগণ জানাযার নমায্ আদায় করিলেন ; কেহ কাহারও এমামতি করিলেন না । হজরত ওছামাঃ (রাজিঃ) তাঁহার হস্তস্থিত পবিত্র যুদ্ধ-পতাকা, হজরত আব্বাছ

হিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর দ্বারদেশে আনিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন।
সোমবার দিবাগত রাহি হইতে পরদিন মঙ্গলবার ৯।১০টা পর্য্যন্ত দলে দলে
মোছলমানগণ জানাযার নমাজ পড়িয়াছিলেন। অন্যান ২৫।৩০ হাজার
লোক জানাযায় শরীক হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। হজুর (ছালঃ)-
এতেকালের ২৪.২৫ ঘট্টা পরে তাঁহার দফন কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল
বলিয়া, ঐতিহাসিক দিগের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

আ হজরত (ছালঃ)-এর এতেকাল পর্য্যন্ত হজরত আলী (কঃ—ওঃ)
এর জীবনের ২য় 'দওদ' বা দ্বিতীয় পর্ব শেষ হইয়াছিল। এই সময়
হইতে তাঁহার প্রবল উৎসাহাশ্রিত, শৌর্য-বীর্য প্রকাশের স্পৃহা অনেক
পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের তৃতীয় পর্ব।

(১১শ হিজরীর ১০ই রবিওল-আউওল হইতে ৩৫ হিজরীর ২৫শে,
যেলহজ্জ পর্য্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ ২৪ বৎসরের ঘটনা)।

ছকিফাঃ-বনি-ছায়েদার ঘটনা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে
আনুছারগণ সমবেত হইয়া আপনাদের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র খলিফা নির্বাচনের
যে পরামর্শ ও যোগাড়-বস্ত্র করিয়াছিলেন, যদি ঐ সময় হজরত আবুবকর
হিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু
ওয়ায়দাঃ (রাজিঃ)-প্রমুখ মোহাজের-প্রধানগণ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত
না হইতেন, তবে আনুছারগণ খলিফা নির্বাচন করিয়া ফেলিতেন,
এবং তদ্বারা ইসলামের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া বাইত। পরম করুণাময় আল্লাহ

তারালা তাঁহার প্রিয় ‘মব্‌হব’ এছলামকে রক্ষা করিবেন, স্ততরাং শত সহস্র বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া তিনি এছলামকে জয়যুক্ত করিলেন । উপরোক্ত শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ত্রয় সেখানে যাইয়া একাধিক খলিফা নির্বাচনের অবৈধতা অনিষ্টকারিতা এবং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র উক্তি দ্বারা আন্‌ছার হইতে মোহাজেরগণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করাতে, এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভে বক্তৃতা শ্রবণে, আন্‌ছারগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ; সঙ্গে সঙ্গেই হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও হজরত আবু ওবায়দাঃ (রাজিঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত করাতে, সমবেত জনমণ্ডলী ও মহোৎসাহে হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত করিতে লাগিলেন । কেবল বনি-খয়রজ দলের রইছ (দলপতি—যাঁহাকে আন্‌ছারগণ খলিফা নির্বাচন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন) হজরত ছায়াদ-বিন্‌ য়েবালাঃ (রাজিঃ) ঐ সময় বায়্‌য়েত করিলেন না ; কিন্তু সেই দিনের মধ্যেই বায়্‌য়েত করিলেন । মোহাজেরিদিগের মধ্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ধোবায়ের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ৪০ দিন পর্যন্ত কেবলমাত্র এই কারণ দর্শাইয়া বায়্‌য়েত করিলেন না যে, ছকিফাঃ-বন্‌নু-ছায়েদার পরামর্শে ও বায়্‌য়েত গ্রহণকালে আমাদিগকে কেন ‘শরীক’ (সঙ্গী) করা হইল না ? উপরোক্ত চল্লিশ দিন সময়ের মধ্যে একদা হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ), মদীনার হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, তুমি থাকিতে (হজরত) আবুবকর (ছিদ্দিক) কিরূপে খলিফার পদ গ্রহণ করিতে পারেন ? তুমি হাত বাড়াইয়া দাও, আমি এখনই তোমার হস্তে বায়্‌য়েত করিতেছি । যদি তুমি চাও, তবে আমি অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্তে মদীনার ময়দান পূর্ণ করিয়া দিব । আর ইহার দ্বারা (হজরত) আবুবকর ছিদ্দিক

(রাজিঃ)-এর ‘যেন্দেগী তঙ্গ’ (আবুফাল সফীর্ণ) হইয়া যাইবে।
 তচ্ছ্রবণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-কে
 কঠোরভাবে উত্তর দিলেন যে, তুমি ‘ফেৎনাঃ’ ও ‘ফছাদ’ (বিপ্রব ও বিবাদ-
 বিসম্বাদ) উপস্থিত করিতে চাও, তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার ‘নছিহত’
 (উপদেশ) ও ‘হামদদৌ’ (সহানুভূতি)-শ্রুতক কথা শুনিতে চাই না।
 হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ) এই উক্তি শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত ও
 অপ্রতিভ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী
 মর্জুনা (কঃ—ওঃ) ও উঠিয়া সোজাসুজি হজরত আবুবকর ছিদ্দিক
 (রাজিঃ)-এর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন,
 আপনার ‘ফজিলত’ (বোযর্গী—শ্রেষ্ঠত্ব) এবং খেলা-
 ফতের ‘এস্তেহকাক্’ (ন্যায্য দাবীদার) হওয়া সম্বন্ধে
 আমি ‘মোন্কের’ (অস্বীকৃত) নহি। কিন্তু আমার
 ‘শেকায়েত’ (অভিযোগ) এই যে, আমি জনাব হজরত
 রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর সর্বাপেক্ষা ‘করীবি রেশ্তাদার’
 (অতি নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়), আপনি ছকিফাঃ বনি
 ছায়েদায় কেন আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, লোকের
 নিকট হইতে বায়্য়েত গ্রহণ করিলেন ? যদি আপনি
 আমাকে সেখানে ডাকাইয়া লইতেন, তবে আমি
 সকলের অগ্রে আপনার হস্তে বায়্য়েত করিতাম।
 হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্
 (ছালঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে সদ্ভাবহার করা, আমার নিজ
 আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে সদ্ভাবহার করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কার্য্য
 বলিয়া আমি মনে করি। আমি ছকিফায় বায়্য়েত গ্রহণ করিবার জন্য
 গিয়াছিলাম না ; বরং মহাজেরিণ ও আনছারদিগের ‘নযায়া’ (মনোবাদ—

ঝগড়া:) দূর করার উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়াছিলাম। যেকোন অবস্থা দাঁড়াইয়া ছিল, উভয় সম্প্রদায় যেন পরস্পর যুদ্ধ করিতে—মরিতে এবং মারিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমি নিজের জন্তু বায়্য়েত লইবার ‘দরখাস্ত’ (প্রার্থনা—অভিপ্রায় জ্ঞাপন) করি নাই; বরঞ্চ উপস্থিত জনমণ্ডলী স্বতঃপ্রসূত ও একমতাবলম্বী হইয়া আমার হস্তে বায়্য়েত করিয়াছিলেন। যদি আমি সেই সময় বায়্য়েত গ্রহণ কর্য ‘মুলতবি’ (স্বগিত) রাখিতাম, তবে আশঙ্কা ও বিপদ দ্বিতীয় বার অধিকতর প্রবল ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আপনি আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘তজ্জহিয্’ ও ‘তক্ফিন্’ (গোছল ও কাফন কার্য সম্পাদন) কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আমি ঐ ‘মজ্লতে’ (ব্যস্ত-সমস্ততার মধ্যে) আপনাকে কিরূপে সেখানে ডাকাইয়া লইতাম? হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সকল কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ‘শেকায়েত’ (অভিযোগ) প্রত্যাহার করিলেন, এবং তৎপর দিন মহজেদ নববীতে, সর্ব-সাধারণের উপস্থিতিতে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর হস্তে বায়্য়েত করিলেন।

বলিতে গেলে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রকৃত সুখ-শান্তির দিন প্রায় শেষ হইয়াছিল। ইতিপূর্বে পিতা, এবং পরম স্নেহে প্রতিপালন-কারিণী মোছলেম-মাতা হজরত খাদিজাতুল কোব্রা, এবং স্বীয় গর্ভধারিণী স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমনে তিনি আপনাকে বড়ই অসহায় ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মনে করিলেন। যে বিরাট পর্বত তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল, যে বিশাল আকাশবৎ চন্দ্রাতপ তাঁহার মস্তকোপরি বিচয়মান থাকিয়া, সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার ঃ অস্তর্ধানে তিনি চক্ষে

অন্ধকার দেখিলেন । অমন স্নেহ, অমন প্রাণের ভালবাসা, অমন সহানুভূতি আর কাহার নিকট পাইবেন ? তাঁহার দোওয়া এবং তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসায়ই তিনি জগজ্জয়ী বীর ছিলেন ; ভীকতা, সাহসহীনতা কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না । খয়বরের যুদ্ধকালে তাঁহারই দোওয়ায়, তাঁহারই পবিত্র কর-স্পর্শে তিনি ভীষণ ভাবে চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়াও মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরাময় হইয়াছিলেন । কেবল তাহাই নহে—পিতার পরলোক গমনে তাঁহার পতিততা সহধর্ম্মিণী থাতুনে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ভীষণ শোকে এমনই অভিভূতা হইয়া পড়িলেন যে, তিনি দিবানিশি পিতৃশোকে অবিরল ধারায় অশ্রু-বিসর্জন করিতে ছিলেন । পিতার মৃত্যুতে তাঁহার পবিত্র বদনে কখনও হাস্ত প্রকটিত হয় নাই । পিতার উপদেশে—পাপের ভয়ে তিনি শব্দ করিয়া কাদিতেন না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও নয়নাসারে বসন ভিজাইতেন । তাঁহার সুখ-শান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল । তিনি অনেক সময়ই ‘রওজা মবারকে’ (আ হজরতের সমাধিস্থলে) গমন করিয়া বিলাপ করিতেন, অশ্রুসিক্তে কবর সিক্ত করিতেন, আর সদয়ে তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্য আকুল প্রাণে কামনা করিতেন—আল্লাহ্ তা-বার দরগায় প্রার্থনা জানাইতেন । গৃহে থাকাকালে নমাজ ও এবাদৎ-বন্দেগীতে ‘মশ্গুল’ (ব্যাপৃত) থাকিতেন, ক্ষুদ্র সংসারের গৃহ-কার্য সম্পন্ন ও স্বামী সেবা করিতেন, পুত্র ■ কন্যাগণের লালন পালন ও গুরুশ্রম যথানিয়মে সম্পন্ন এবং মাত্র জীবন রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন । হজরত থাতুনে (রাঃ—আঃ)-এর সাস্তনার এই একটি বিষয় ছিল যে, আ হজরত (ছালঃ) রোগ-শয্যায় শয়ন ছহিতা-রত্নকে বলিয়াছিলেন, “ অস্মি মাতা ফাতেমা ! তুমি সর্বদা আমার সহিত সম্মিলিত হইবে ” (মৃত্যুরূপ শরবৎ পান করিবে) ।

আলী (কঃ—ওঃ) খেলাফত-দরবারে মন্ত্রী বা পারিষদ রূপে কার্য্য করিতেন ; মহামান্য খলিফাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানে সাহায্য করিতেন, কঠিন কঠিন মছলার মীমাংসা করিতেন ; আর গৃহে থাকিয়া উপাসনায় ■ এবাদত-বন্দেগীতে সারা দিবা নিশি কাটিয়া দিতেন । ‘বয়তুলমাল’ হইতে বে বৃত্তি পাইতেন, তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন । শারীরিক পরিচর্যা দ্বারাও কিছু কিছু উপার্জন করিতেন । কিন্তু পতিপ্রাণা সতী-সহধর্ম্মিণীর :শোচনীয় অবস্থা দর্শনে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন ; স্বর্গের রাজ্যের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দর্শনে নিতান্তই নিরাশ হইয়া পড়িতেন । তিনি যেন শোকের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে প্রতিভাত হইতেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বীর হৃদয় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । খাতাপন্ন মোছলেম বীরগণ আরবের ভীষণ বিপ্লব প্রশমিত করিতেছিলেন ; বিদ্রোহী ও বিপ্লবপন্থাদিগের বিরুদ্ধে বড় বড় বীরপুরুষগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ন্যায় অধিতীয় বীর সে কার্য্যে যোগদান করেন নাই । খাতুনে জব্বত (রাঃ—আঃ)-এর জীবিত কালে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধাদি কার্য্যে যোগদান করা ■ এবং মদীনা হইতে দূরে থাকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না ।

এদিকে হজরত খাতুনে ■ (রাঃ—আঃ) নিদারুণ পিতৃ-শোকে দিন দিন ক্ষীণ, জীর্ণ-শীর্ণ ও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন । তাঁহার আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ হইল । যে পিতা, দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ, তাঁহাকে তিনি কিরূপে ভুলিবেন ? তাঁহার অভাব জনিত দুর্কিসহ শোক তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন ? পরম শ্রদ্ধেয় ‘ওয়ালেদ-মাজেদ’ এর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র জীবন পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার

জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রাণের শান্তি চিরদিনের
 অস্তিত্ব হইয়াছিল। তিনি সহধর্মিণী ও জননীর কর্তব্য এবং দায়িত্ব খুবই
 জানিতেন এবং বুঝিতেন; সে কর্তব্য সম্পাদনে তিনি আদর্শ স্থানীয়
 ছিলেন। মৃত্যু-কামনা করা পবিত্র এছলাম ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য, সেই
 জন্ম তিনি সেই ধর্ম-বিরুদ্ধ মৃত্যু-কামনা কখনও করিতেন না—সে খেয়াল
 মনে স্থান দিতেন না। সেই পিতৃ-স্নেহশীলা কস্তার, হজরত রেহানত
 মাব (ছালঃ)-এর প্রতি কিরূপ অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল,
 তাহা অন্যের ধারণাতীত। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া পিতা এবং মাতা
 উভয়ের সমগ্র স্নেহ রাশি ও প্রাণের সহায়ভূতি স্বীয় আদর্শ ওয়ালেদ-
 মাজেদের নিকট পাইয়াছিলেন। সর্বকনিষ্ঠা ওনয়া বলিয়া, স্নেহের
 পরিমাণ আরও অগাধ, অপরিমিত ও ধারণাতীত ছিল। ঐ (ছালঃ)
 (ছালঃ) জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রয়কে বথাসময়ে বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহারা
 ইতিপূর্বে পরলোক গমনও করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ (ছালঃ)-এর পুত্র
 সন্তান কেহ জীবিত ছিলেন না, সুতরাং তদীয় হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ-রাশি
 তিনি এই সর্বগুণালঙ্কৃত আদর্শ ও কনিষ্ঠা কন্যা-রত্নের প্রতি ঢালিয়া
 দিয়াছিলেন; সে স্নেহের কোনও সীমা-পরিমীমা ছিল না। উহা যেমন
 অগাধ তেমনই অপরিমিত ছিল। আবার সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র,
 সর্বগুণালঙ্কৃত পিতৃপুত্র, শৈশবকাল হইতে যাহাকে অপত্য-নির্কিণেবে
 লালন পালন করিয়াছিলেন, সেই পরম ধার্মিক, সাধু পুরুষ, অধিতীর
 বীরপুরুষ, মোস্তফা গত প্রাণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তেই
 সেই স্নেহের পুস্তলীকে সম্প্রদান করিয়া, হৃদয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করিয়া-
 ছিলেন। বিবাহের পূর্বে এই স্নেহ-সত্যের সেবা ও পরিচর্য্যার কতই না
 সুখ-শান্তি অনুভব করিতেন। এই কন্যা-রত্নই, পতিগতপ্রাণা আদর্শ পত্নী
 মোছলেম মাতা মহামাননীয়া হজরত খদিজাতুল কোব্রার স্মৃতি তাঁহার

পবিত্র হৃদয়ে জাগরুক রাখিত । সেই মল্লীয়াসী আদর্শ সতীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরুক হইলে, তিনি আকুল প্রাণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন । ইহাতে কন্ডা রক্তের প্রতি স্নেহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত । আজ সেই পিতৃ-ধনে বঞ্চিত হইয়া, স্বর্গের রাজ্যী হজরত খাতুনে (রাঃ—আঃ) এ সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । মানুষের শোক-বহ্নি সাধারণতঃ ক্রমশঃ নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সে ভীষণ শোক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমের ন্যায় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল ; তিনি ক্রমে মৃত্যুর খুব নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন । তাঁহার শরীরে কোনও রোগ-বাধি ছিল না ; একমাত্র পিতৃ-শোকে তাঁহার জীবনী শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল । এরূপ অবস্থায় ও তিনি স্বামী সেবা, পুত্র কন্ডাগণের তালাকি-তদ্বির বা গৃহ-কর্মে কিছুমাত্র অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন নাই । এই অবস্থায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যেমন গত হইতে চলিল, তাঁহার জীবন নাটকের পর্য্যবসান হইবার দিনও তেমনই নিকটবর্তী হইতে লাগিল ।

এই অবস্থায় আর ৫/৬ দিন গত হইয়া গেল ; এ সময় হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আর চলিবার শক্তি ছিল না । পুত্র কন্ডাগণ এ সময় তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিতেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কার্য্য উপলক্ষে অনেক সময়ই বাহরে থাকিতে বাধ্য হইতেন ; কিন্তু তাঁহার প্রাণে শাস্তি ছিল না । সতী-সাক্ষী প্রিয় পত্নীর অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় যেন চুরমার হইয়া যাইতেছিল । ছৈয়দাঃ পুত্র-কন্ডাগণের ভবিষ্যৎ অবস্থা চিন্তা করিয়া একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন । একদিনের ঘটনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে তশরিফ লইয়া গিয়াছিলেন ; গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, একখানি 'বরুতনের (বাসনের) নিকটে খানিক গোলা (মর্দিত বা মথিত) মাটি রহিয়াছে ; সস্তা ধোয়া কাপড়

‘আল্‌গনির’ (দড়ির) উপর রাখা আছে, আর ছেয়দাঃ জাঁতার আঁটা পিষিতেছেন ; এবং অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন । প্রিয়তমার এই অবস্থা দর্শনে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না ; তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল : তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, প্রিয়তমে ফাতেমা ! তোমার জীর্ণ-শীর্ণ ভগ্ন দেহ ■ একাজের উপযুক্ত নহে । পরম ভক্তি-ভাজন ও পরম প্রণয়াম্পদ স্বামীর কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রবল তুফানের সৃষ্টি হইল ; তিনি রোদন সম্বরণ করিবেন দূরে থাকুক, পূর্বাপেক্ষা জোরে কাঁদিতে—অজস্র ধারে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন । তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার পবিত্র মস্তক স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন । সৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তম স্বামি ! আমি গত রাতে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ হজরত রছুলোজ্জাহ্ (ছালঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছি ; আমার বোধ হইতেছিল, তিনি যেন কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । আমি বলিলাম, হে শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ ! হে রছুলোজ্জাহ্ ! আপনার ‘জুদায়ী’ (বিচ্ছেদ) আমার পক্ষে কেয়ামত স্বরূপ বোধ হইতেছে । তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, মাতঃ ফাতেমাঃ ! আমি তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি । তুমি উঠ, চল, পুত্র-কন্যাদিগকে আল্লাহ তায়ালার হস্তে সমর্পণ পূর্বক ‘জম্মতের’ (বেহেশতের) ভ্রমণ-সুখ উপভোগ কর । স্বামিন্ ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছেন যে, আমার আসন্ন কাল উপস্থিত । যুক্তিকা এই জন্য শুলিয়া রাখিয়াছি যে, ছেলে মেয়েদিগকে শেষবার স্বহস্তে ‘গোছল’ (স্নান) করাইব । কাপড় এই ■ ধুইয়া রাখিয়াছি যে, স্বহস্তে ঐ কাপড় উহাদিগকে পরাইব । যও পিষিয়া এজন্য আঁটা প্রস্তুত করিতেছি যে, আমার মৃত্যু হইলে আপনি এবং আমার সন্তানগণ যেন অনাহারে না থাকেন । স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া

আলী (কঃ—ওঃ) শিহরিয়া উঠিলেন—নিভাস্ত ব্যস্ত-সমস্ত ও অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, তুমি এ কি কথা বলিতেছ ? হজরত রছুল্লাহ্ (ছালঃ)-এর ‘ছদযাঃ’ (শোকের আঘাত) তোমার হৃদয়ে এখনও ‘তাযাঃ’ রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি একরূপ কথা বলিতেছ ।

এই সময়ের অন্ত্যস্ত ঘটনা হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর জীবনীতে লিপিবদ্ধ হইবে ; এস্থলে সংক্ষেপে ইহার উপসংহার করিতেছি । অন্ত্যস্ত কথোপকথনের পর হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিলেন, স্বামিন্ ! আমি আপনার খেদমতে ৩টি প্রার্থনা করিতেছি ; আপনি ইহা ‘মঞ্জুর’ করমাইবেন । ১ম, আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ‘মারাক্’ (মার্জনা) করুন । ২য়, আমার জানাযাঃ রাত্ৰিকালে উঠাইবেন, আর রাত্ৰিকালেই দফন করিবেন, ‘গয়ের মহরেম’ ব্যক্তিকে আমার জানাযাঃ স্পর্শ করিতে দিবেন না । ৩য়, এই মাতৃহীন বালক-বালিকাদিগের ‘দেল-দারিতে’ (মন যোগাইতে) ক্রটি করিবেন না । উহাদের মাথার উপর হইতে যারের স্নেহ-পূর্ণ ছায়া চলিয়া বাইতেছে । উহাদের ‘দেল-কমজোর’ (হৃদয় দুর্বল), ইহাদের আশা ও উৎসাহ ‘পলু’ (কমজোর), উহাদের আব্দার আপনি রক্ষা করিবেন । সৈয়দায় এইরূপ নিদাক্ষণ কথা শুনিয়া হজরত আমীর আলার হেচ্ছালাম (হজরত আলী [কঃ—ওঃ]) রোদন করিতে লাগিলেন ; এবং বলিলেন, তুমিও আমার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া দাও । তৎপর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিলেন, আপনি ছেলেদিগকে লইয়া একবার ‘রওজাঃ মবারকে’ গমন করুন । তদনুসারে তিনি এমাম লাত্-যুগলকে সঙ্গে লইয়া আঁা হজরত (ছালঃ)-এর ‘রওজা আকুদছে’ (পবিত্র সমাধি স্থলে) চলিয়া গেলেন । সৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এই অবসরে অজু করিলেন ; পরিধের কাপড় বদলাইলেন ;

পরিচারিকা-আছমাঃ কে বলিলেন, আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিয়া দিও, তিনি যেন এই অবস্থায়ই আমাকে 'গোছল' দেন (মৃত-স্নান করান) ;—আমার দেহ যেন আবরণ শূন্য করা না হয়। এই সময় খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ)-এর অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তদীয় পবিত্র মুখ কেবলোভিমুখে (কাবার দিকে) ছিল ; তিনি ঐ অবস্থায়ই 'মনাজাত' (আল্লাহ্ তায়ালায় দরবারে প্রার্থনা) করিতেছিলেন। পবিত্র 'রমজানুল্ মবারকের ৩রা তারিখে, মঙ্গলবার দিবস মগ্‌রেব্ ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে, স্বর্গের সম্রাজ্ঞী, নারী-কুলের আদর্শ, আদর্শ স্বামী-পরায়ণা, সতীকুল ভূষণ, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সর্বাবিধ গুণ ■ ধর্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর প্রিয়তমা হুহিতা-রত্ন, হজরত কাতেমা যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), পবিত্র দেহ-ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোক আলোকিত করিলেন (ইয়া লিল্লাহে ওয়া ইয়া এলায়হে বাযেউন)। মদীনার আবার শোকের প্রবাহ ছুটিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্নেহাধার পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে হজুর (ছালঃ)-এর রওজা মবারক চাইতে ফিরিয়া আসিয়া বে দৃষ্ট দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বংপিও যেন ছিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর মরহমার শেষ নির্দেশানুসারে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, কাফন পরাইয়া রাত্রিকালে সন্ধ্যাপনে কবরস্থানে লইয়া গেলেন। "জিন্নতল-বকি" নামক স্বনামখ্যাত কবরস্থানে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছিল। আজও মদীনা-তৈয়বায় গিয়া লক্ষ লক্ষ মোছলমান তাঁহার পবিত্র কবর ঘেয়ারত করিয়া থাকেন।

হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর এন্তেকাল (পরলোক গমন)-কাল হইতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফত কাল শুরু (আরম্ভ) হওয়া পর্য্যন্ত চাক্র মাসের হিসাবে ২৩ বৎসর ১০ মাস বা সাড়ে দশ মাস অতীত হইয়া গিয়াছিল ; সৌর মাসের হিসাবে উহা কম-বেশ তেইশ

বংশর। এই স্বদীর্ঘ সময় মধ্যে হজরত হিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ), হজরত ওসমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ)— এই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফার আধিপত্য কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের এই ২৩ বংশরের ঘটনা তেমন বিস্তৃতভাবে জানা যায় না। তবে একথা বেশ জানা যায় যে, তাঁহার যৌবনের শেষ সীমা ■ প্রোড় বয়সের মধ্যে তিনি কোনও বেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে গমন করিয়া, স্বীয় প্রচণ্ড প্রতাপ ও অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি মহামান্য খলিফা দিগের মজল্লা-সভার সদস্য, জটিল মহলার মীমাংসাকারী ও পরামর্শ-দাতারূপে মদীনা তৈয়্যবারই অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র-পৌত্রী প্রভৃতি লইয়া সন্তান সংসার পাতিয়া ছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ কঠোর উপাসনা-আরাধনা এবং মোশাহেদা-মোরাকাবায় সময় অতিবাহিত করিতেন। হজরত হিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) আ হজরত (ছালঃ)-এর শগুন, স্মরণ্য সেই সম্পর্কে তিনি তাঁহার নানা শগুন, হজরত ফারুক আজম একদিকে তাঁহার নানাশগুন, অন্য দিকে তাঁহার জামাতা ছিলেন। আর তৃতীয় খলিফা—হজরত ওসমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ) ছিলেন তাঁহার ভায়রা-ভাই।

আ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পর যখন হজরত আবু-বকর হিদ্দিক (রাজিঃ) খলিফা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ঐ সময় কতিপয় ■ ব্যক্তি পয়গম্বরীর দাওয়া করিয়া বহু লোককে আপনাদের মতানুবর্তী ■ আক্সানুবর্তী করিয়াছিল। বহুলোক ‘মোরতেদ’ (ধর্ম-ভ্রষ্ট) হইয়া পড়িয়াছিল ; একদল লোক ‘যাকাত’ প্রদানের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমগ্র আরবে একটা ভীষণ অশান্তিগ্ৰস্ত উপস্থিত হইয়াছিল ; এমন কি, পবিত্র মদীনা-তৈয়্যবা নগরীর চতুর্দিকে ■ বিপ্রব-বহি জলিয়া

উঠিয়াছিল। কিন্তু জানী শ্রেষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, আ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী মহামান্য খলিফা হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) দৃঢ়-হস্তে শাসন দণ্ড ধারণ করিয়া, ১১শ জন বিখ্যাত সেনাপতিকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল সহকারে বিদ্রোহ-দমনার্থ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি মদীনা শরীফের ‘হেফাযৎ’ (তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ) জন্য একদল যোদ্ধাপুরুষ মহজেদে নববীর সম্মুখে সুসজ্জিত রাখিলেন। আর হজরত আলী (কঃ — ওঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত তালুহা (রাজিঃ)-এবং হজরত আবদুল্লা-বিন্-মসউদ (রাজিঃ)-কে মদীনার চতুর্দিকে পাহারা দিতে নিযুক্ত করিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি কোনও বিদ্রোহী বা বিপ্লববাদী সম্প্রদায় মদীনা-তৈয়বাঃ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে যেন তৎক্ষণাৎ মহামান্য খলিফাকে সেই সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে। মদীনার চতুর্পার্শ্ববর্তী বিপ্লববাদিগণ যখন জানিতে পারিল যে, মদীনা নগরে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র মোহলমান যোদ্ধাপুরুষ বিদ্যমান আছেন, আর যাকাৎ মোক্ করা সম্বন্ধে মহামান্য খলিফা সম্পূর্ণ রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন তাহারা একমতান্বিত হইয়া মদীনা-তৈয়বাঃ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু হজরত আলী (কঃ — ওঃ), হজরত তালুহা (রাজিঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত আবদুল্লা-বিন্-মসউদ (রাজিঃ), মদীনার বাহিরেই তাহাদের গতিরোধ করিলেন ; মহামান্য খলিফা সংবাদ পাইবামাত্র যতদূর পারিলেন, যোদ্ধাপুরুষদিগকে সমবেত করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে সকলে সমবেত ভাবে আক্রমণ পূর্বক তাহাদিগকে ‘যিখশব’ নামক স্থানে পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিলেন। তাহারা অতি শোচনীয় রূপে পরাজিত হইয়া উর্দ্ধ্বাশ্রমে পলায়ন করিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহারা আবার দফ্ ও অন্যান্য বাজা বাজাইয়া নবোৎসাহে অগ্রসর হইল।

ঐ সকল বাত-বাক্যনা শ্রবণে:মোছলমানদিগের উট গুলি ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, এবং মদীনা নগরে প্রবেশ পূর্বক হাঁক্ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই স্থানে আমরা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে যোদ্ধৃবেশে দেখিতে পাই।

ততিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মহামান্য খলিফার শাসন পরিষদের ও ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য এবং অন্যতম মন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন; তদ্ব্যতীত হজরত ওছমান (রাজিঃ) ও তাঁহার উপর চিঠি-পত্র ও সন্ধিপত্র ইত্যাদি লিখিবার ভারও অর্পিত ছিল। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) কিছুদধিক দুই বৎসর কাল খেলাফৎ করার পর, পরলোক গমনের অব্যবহিত পূর্বে, তাঁহার পরবর্তী খলিফা নির্বাচন সম্বন্ধে বড়ই চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কারণ তিনি বেশ জানিতেন, বিশাল মোছলেম স্বগতের খলিফা এমন উপযুক্ত ব্যক্তির হওয়া আবশ্যক, যিনি একদিকে আদর্শ ধার্মিক ও পরহেজ্জগার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ণ রাজনীতিক জ্ঞান-সম্পন্ন, আর দৃঢ়হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করার উপযুক্ত পাত্র হন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী ব্যক্তিই খলিফা হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। তিনি এ বিষয়ে কর্তব্য নির্দ্ধারণ এবং পরামর্শ গ্রহণ জন্য সর্বাগ্রে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-সয়্যোফ্ (রাজিঃ)-কে আহ্বান করিলেন, তিনি উপস্থিত হইলে মৃত্যু-শয্যায় শায়ীত মহামান্য খলিফা ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) বলিলেন, খেলাফত পদে ওমর (রাজিঃ) কে নির্বাচন করা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি বলিলেন, হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর মেজাজে কঠোরতা বেশী দৃষ্ট হয়। মহামান্য খলিফা ফরমাইলেন, ওমর (রাজিঃ)-এর মেজাজে কঠোরতা থাকিবার

কারণ এই যে, আমি অতি নরমদেল ছিলাম। আমি বিশেষ ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আমি যে বিষয়ে খুব কোমল ব্যবহার করিতাম, ওমর (রাজিঃ) তাগাতে কঠোরতা প্রদর্শন করিতেন। আমার খুব বিশ্বাস, খেলানতের ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হইলে তিনি কোমল হৃদয় এবং কঠোরতা পরিহারকারী হইবেন। অতঃপর তিনি হজরত ওহমান (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া খলিফা নির্বাচন সম্বন্ধে হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর নাম উল্লেখ করিলেন ; তিনি বলিলেন, হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর প্রকাশ্য অবস্থা যাহা, তদপেক্ষা তদীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা অধিকতর উন্নত ও উজ্জল। এ বিষয়ে আমরা কেহই ‘মর্তব্য’ তাঁহার সমকক্ষ নহি। অবশেষে হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহকে ডাকিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও ঠিক ঐরূপ অভিমতই প্রকাশ করিলেন।

মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সম্বন্ধে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) লোকদিগকে ফরমাইয়াছিলেন। তোমরা যখন ‘ছালেহীন’ দিগের নাম উল্লেখ করিবে, তখন হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর কথা ভুলিবে না। একদা শেরে খোদা হজরত আলী মরতুজী (কঃ—ওঃ), হজরত ওমর (রাজিঃ)-কে বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এই বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই আমার অধিক প্রিয়পাত্র নহেন।”

এক ব্যক্তি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সম্বন্ধে আপনি কি মত পোষণ করেন ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ; ■ হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর

হৃদয় সকলের দৃঢ়তায়, বুদ্ধিমত্তায়, সাহসে এবং ধীরত্বে পরিপূর্ণ।”

হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফত কালে যখন পারস্যের যুদ্ধে একবার মোছলমানাদিগের আংশিক পরাজয় ঘটিয়াছিল, পঙ্গপাল সদৃশ অগণ্য পারসিক সৈন্যের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মোছলমান বীরগণ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তাহাদের কতিপয় স্বযোগ্য সেনাপতি বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে শায়ীত হইয়াছিলেন, তখন মহামান্য খলিফা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন ; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে মদীনায়া স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং পারস্য দেশাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । তিনি মদীনা-তৈয়বাঃ হইতে কিয়দূরে—চশমাঃ-যরাবে সসৈন্যে গমন করিলে, হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ) তাহাকে গিয়া বশিলেন, যুদ্ধার্থ এরাাকে (পারস্যে) স্বয়ং আপনার গমন করা সঙ্গত বোধ হয় না । এতচ্ছ বণে মহামান্য খলিফা এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন, এবং এতৎ সম্বন্ধে সকলের মতামত জানিতে চাহিলেন । অধিকাংশ ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ), সেনাপতি এবং সমর বিভাগীয় শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ, মহামান্য খলিফার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু হজরত আবদুর রহমান-বিন-রয়োফ্ (রাজিঃ) এই মতের সমর্থন করিলেন না—প্রতিবাদ করিলেন ; তখন আমিরুল মুমেনিন—খলিফাতুল মোছলেমিন ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে মদীনা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন । তিনি আসিয়া ও হজরত আবদুর রহমান-বিন-রয়োফের মত সমর্থন করিলেন ; তদন্বসারে মহামান্য খলিফা সমবেত জন-মণ্ডলীকে উপরোক্ত ■ মহাত্মার অভিমত জ্ঞাপন পূর্বক, নিজের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখিলেন । এক্ষণে কাহাকে প্রধান


সেনাপতির পদে বরণ করা হইবে, এই প্রস্তাব উঠিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে অবরোধ করাতে তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ফলতঃ মদীনায়, মহামান্ন খলিফার দরবারে তাহার উপস্থিত থাকাও একান্ত আবশ্যক ছিল। অবশেষে মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতি পদে বরিত করিয়া ইরাকে—পারস্ত-সীমান্তে পাঠান হইল।




পারস্ত সাম্রাজ্য জয়:করিয়া মোছলেম সৈন্তগণ সে সকল বহুমূল্য জিনিষ-পত্র মদীনায় পাঠাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া মোছল-মানদিগের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। পারস্ত-সম্রাটের এক খানি মণি-মুক্তা খচিত অপূৰ্ব আসন ও সেই সঙ্গে আসিয়াছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর মতামুসারে অন্যান্য সাম্রাজ্য-সম্রাটের সঙ্গে সেই বহুমূল্য আসন খানিও কাটিয়া ভাগ-বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অংশে যে টুকরা টুকু পড়িয়াছিল, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান না হইলেও, ৩০ হাজার দিনার মূল্যে তিনি উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন।

যখন ‘বয়তুল মোকদ্দস’ (যিকসালেম) মোছলেম সেনাপতিগণ অবরোধ করিলেন; নগরের খৃষ্টীয় ধর্মধাক্ক শাসনকর্তা এবং প্রধান প্রধান লোকেরা, স্বয়ং খলিফা সেখানে পহুছিলে নগর তাহার হস্তে অর্পণ করিবেন বলিয়া যে ‘দরখাস্ত পেশ’ করিয়াছিলেন, মহামান্ন খলিফা তৎসম্বন্ধে প্রধান প্রধান ছাহাবা: কারাম এবং মজলিস-সভার সদস্যদিগকে এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে অবরোধ করিলে, হজরত ওসমান (রাজিঃ), তাহার যাওয়া আবশ্যক নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

ফরমাইলেন, “আমার মতে আপনার সেখানে যাওয়া একান্ত আবশ্যিক”; মহামান্ব খলিফা তাঁহার এই অভিমত খুব গুরুত্ব করিলেন, এবং তদনুসারে বয়তুল-মোকদ্দসে গমন পূর্বক স্বয়ং সেই পবিত্র নগরী খুস্টানদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন ।

মহামান্ব খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পর, মৃতন খলিফা নির্বাচনের পূর্বে একটি অপ্রত্যাশিত অশ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল । মহামান্ব খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হজরত ওবায়দুল্লাহ্ (রাজিঃ) পিতৃ হত্যাকারী ক্রীতদাস ফিরোযের সাহায্যকারী বলিয়া পারস্ত দেশবাসী ছরদার হরমযানকে হত্যা করিয়াছিলেন, ঐ অবস্থায় তিনি হজরত ছায়াদ বিনু-আবি ওকাছ (রাজিঃ) কর্তৃক ধৃত এবং বন্দী হন । ঐ সময় হজরত ছহিব (রাজিঃ) অস্থায়ী ভাবে খলিফার কার্য চালাইতেছিলেন । সুতরাং তিনি হজরত ওবায়দুল্লাহ্ (রাজিঃ)-কে তিনি বন্দী করিয়া রাখিলেন; মৃতন খলিফা নির্বাচিত হইলে তাঁহার বিচার কার্য সম্পন্ন হইবে, এরূপ স্থির হইল । অতঃপর হজরত ওছমান (রাজিঃ) খলিফা নির্বাচিত হইলে সর্বপ্রথমে এই মোকদ্দমা পেশ হইল । মহামান্ব খলিফা, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মত জিজ্ঞাসা করিলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, ওবায়দুল্লাহ্ বিনু-ওমর (রাজিঃ) কে হরমযানের হত্যার পরিবর্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত । কিন্তু হজরত ওমর-বিনু-আছ (রাজিঃ)-প্রমুখ :অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিলেন । মহামান্ব খলিফা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, এই ঘটনা খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে, কিংবা আমার খেলাফৎ সময়ে সংঘটিত হয় নাই; সুতরাং আমি এই বিচারের জিদ্দাদার নহি । তিনি হজরত ওবায়দুল্লাহ্ (রাজিঃ)-কে মুক্তি প্রদান পূর্বক হরমযানের হত্যার

‘দয়িত্ব’ বা যত্ন-পণ আপনার নিকট হইতে, তদীয় উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিলেন। এই ব্যবহার উপস্থিত জনমণ্ডলী খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ওবায়-তুলাহ্ (রাজিঃ)-এর অপরাধ সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের  যে অভিযত প্রকাশ করিয়াছিলেন; উত্তরকালে তাহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। মহামাফ্য খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে হজরত আমীর মাযিয়াঃ (রাজিঃ)-এর ভীষণ যুদ্ধকালে, ছফিন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি হজরত মাযিয়াঃ (রাজিঃ)-এর পক্ষাবলম্বন পূর্বক মহাবীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অবশেষে সেই যুদ্ধেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ), মগিরাঃ-বিন্ শাম্মেবার আবুলুলু উপাধীধারী ক্রীতদাস কর্তৃক ২৩ হিজরীর ২৭ শে যেলহজ্জ—মঙ্গলবারে, ফজরের নমাজের সময় ভীষণভাবে আহত হইয়া, ২৪ হিজরীর ১লা মোহররম শনিবার দিন দিন একে কাল করমাইলেন; যত্নের পূর্বে তিনি হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ), হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাহ (রাজিঃ), হজরত যোবের বিনল্ যাওয়াম (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত ওহমান (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; (হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ঐ সময় মদীনা উপস্থিত ছিলেন না); এই কয়েকজনকে আপনাদের মধ্য হইতে খলিফা নির্বাচনের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি উপস্থিত পাঁচ জন প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা হজরত তাল্হা (রাজিঃ)-এর জন্ত  দিন অপেক্ষা করিবেন। যদি  দিনের মধ্যে তিনি আইসেন, তবে খলিফা নির্বাচনে তাঁহাকে  সঙ্গী করিয়া লইবেন। আর ৩ দিনের মধ্যে তিনি না আসিলে আপনারা পাঁচ জনই আপনাদের

মধ্য হইতে একজন খলিফা নির্বাচন করিয়া লইবেন। তৎপর আবু-তালাহ আনহারী (রাজিঃ) ■ মেকদার বিনু-আল আছদ (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, যখন ইহার খলিফা নির্বাচন ■ পরামর্শ করিতে কোনও গৃহে সমবেত হইবেন, তখন তোমরা সেই গৃহের দ্বারদেশে প্রহরী স্বরূপ দণ্ডারমান থাকিবে ; যে পর্যন্ত খলিফা নির্বাচিত না হন, সে পর্যন্ত অপর কাহাকেও ইহাদের নিকটে যাইতে দিবে না। তৎপর উপরোক্ত পাঁচ জন মহাত্মাকে অস্ত্রাস্ত্র উপদেশ প্রদান করিলেন। এই মহা পরাক্রান্ত ■ আদর্শ ধার্মিক খলিফা ১০।০ সাড়ে দশ বৎসর কাল খেলাফৎ করিয়াছিলেন। এই অল্প ■ মধ্যে ছুনিরাতে কোনও ধর্ম-প্রবর্তক স্বীয় ধর্ম প্রচার কার্যে, কোনও দিবিজরী সত্ৰাট্ দিবিজয় কার্যে এক্রপ সাকল্য মণ্ডিত হইতে পারেন নাই। ১ম খলিফা ■ আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর কবরের পার্শ্বে—আ ■ (ছালঃ)-এর সমাধি স্থলে তাঁহার দফন কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। হজরত ছহিব (রাজিঃ) আনাবার নমায্ পড়াইয়াছিলেন। আর হজরত ওছলাম গণি (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিনু-য়সোফ্ (রাজিঃ), এবং মরহুম খলিফার পুত্র হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ) তাঁহার পবিত্র মৃতদেহ কবরে স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরলোকগত মহামান্ন খলিফা, খলিফা-নির্বাচন ক্রম পূর্বোক্ত ছয় মহাত্মা ব্যতীত, স্বীয় স্বনামখ্যাত পুত্র আবদুল্লা (রাজিঃ) কেও খলিফা নির্বাচনে স্বীয় মত প্রকাশের অনুমতি দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, খলিফা নির্বাচনকারীর সংখ্যা "তাক্" অর্থাৎ 'বেজোড়' হয়। স্বীয় পরম ধার্মিক ও মহা বিদ্বান পুত্র সহক্কে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন কিছুতেই খলিফা নির্বাচন করা না হয়।

হজরত মেকদাদ-বিন্ আব্দু (রাজিঃ) ■ হজরত আবু তাল্হা আনছারী (রাজিঃ), ■ ফারুক আজম (রাজিঃ)-এর ‘ওহিরত’ (অন্তিম নির্দেশ) অনুযায়ী তাঁহার ‘তজ্‌হিয্’ ও ‘তকফিন’ (কাফন পরান ■ সমাধি কার্য) সমাধা করিয়া ■ ছহিব (রাজিঃ)-কে ৩ দিনের জন্য অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তৎপর পূর্বোক্ত ছহ মহাত্মাকে হজরত ময়ছব-বিন্-মথ্‌যমাঃ (রাজিঃ)-এর গৃহে, মতান্তরে মোছলেম-মাতা হজরত আরেশা হিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে সমবেত করিলেন ; এবং হেফযতের ■ প্রহরী স্বরূপ তাঁহারা উভয়ে দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। (হজরত তাল্হা (রাজিঃ) এই সময় মধ্যেও মদীনার আসিয়া পছছিয়া ছিলেন না)। অন্য কাহাকেও এই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল না। হজরত ওমর-বিন্ আব্দু (রাজিঃ) ও ■ মগিরাঃ-বিন্ শয়বাঃ (রাজিঃ) উক্ত গৃহের দ্বারদেশে বসিয়া গিয়াছিলেন ; হজরত হারাদ-বিন্-আবিওকাছ (রাজিঃ) ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে দ্বারদেশে ও বসিতে দিলেন না। যখন সকলে আসিয়া গৃহে উপবিষ্ট হইলেন, তখন হজরত আবদুর রহমান-বিন্-রয়োক্ (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, যাহারা খেলাফতের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি কি আছেন, যিনি খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ? ঐ ব্যক্তিকে এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবে যে, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তাঁহাকে খলিফা নির্বাচন করেন। হজরত আবদুর রহমান-বিন্-রয়োক্ (রাজিঃ)-এর এই উক্তির কেহই উত্তর দিলেন না ; সকলেই চুপ করিয়া থাকিলেন। যখন এই প্রস্তাবের কেহ উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন তিনি একটু অপেক্ষা করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিলেন যে, আমি নিজেকে খেলাফত হইতে “দস্ত-বরদার” (দাবী পরিত্যাগকারী) বলিয়া প্রচার করিতেছি ; এবং খলিফা নির্বাচন করিবার

ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহার এই উক্তি শুনিয়া সকলেই তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, এবং বলিলেন, আপনার বাহাকে ইচ্ছা হয়, খলিফা নির্বাচন করুন। কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 'খামুশ্' (নীরব) থাকিলেন। তিনি এ প্রস্তাবে “ হাঁ ” কিংবা “ না ” কিছুই বলিলেন না। তখন হজরত আবদুর রহমান-বিন্-রয়োফ্ (রাজিঃ) হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর দিকে ‘মোখাতেব্’ হইয়া (তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, আপনিও নিজের মতামত প্রকাশ করুন। তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমিও এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে একমতাবলম্বী। কিন্তু ইহাতে শর্ত এই যে, আপনি এই প্রতিশ্রুতি দান করুন, আপনি যে ‘ফয়ছলাঃ’ (মীমাংসা) করিবেন, তাহাতে কোনও রূপ পক্ষপাতীত্ব ও ‘নফ্ছানিয়েত্’ (স্বার্থ পরতা—স্বেচ্ছা-চারিতা)-এর দখল দিবেন না। কেবলমাত্র ‘হক্ পরস্তি’ (ন্যায়নিষ্ঠা) এবং ওম্মতের (অর্থাৎ হজরত [ছালঃ]-এর শিষ্য মণ্ডলীর) মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই কাজ করিবেন। তৎপরে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-রয়োফ্ (রাজিঃ) বলিলেন, আমি ‘বেলা-রেয়ায়েত্’ (অপক্ষপাতীতার সহিত), বিনা ‘নফ্ছানিয়েত্’ (নিঃস্বার্থ ভাবে—বিবেকের সহিত) কেবলমাত্র ওম্মতের ‘বেহ্তরি’ (মঙ্গল) ও কল্যাণের জন্য ‘হক্ পরস্তি’ (ন্যায়পরতা) সহকারে এ বিষয়ের মীমাংসা করিব। কিন্তু আপনারা এরূপ প্রতিশ্রুতি দান করুন, আমি বাহাকে ‘মস্তথব্’ (নির্বাচিত—মনোনীত) করিব, আপনারা সকলেই সেই নির্বাচনে রাজী হইবেন। আর যিনি আমার মীমাংসার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, আপনারা

সকলে মিলিয়া তাঁহার বিবৃতি আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। ইহা শুনিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং আর [] 'একরার' (প্রতিশ্রুতি দান) করিলেন যে, আমরা আপনার প্রস্তাবের 'তায়ীদ' (সাহায্য) ও সমর্থন করিব। এই কথা-বার্তা স্থির হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ; কারণ, খলিফা-নির্বাচন [] এখনও ৩ দিন সময় বাকী ছিল। এই অবসরে হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ), অন্তান্ত 'জলিলুল কদর' (প্রধান প্রধান) ছায়াবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের মতামত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিজেও নিবিষ্ট মনে এই গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কার্যের অন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলাম ; এবং বলিয়াছিলাম, যদি আমি আপনার হস্তে বয়্য়েত্ না করি, তবে আপনি আমাকে কাহার হস্তে বয়্য়েত্ করিতে পরামর্শ দেন ? তিনি বলিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে আপনার বয়্য়েত করা কর্তব্য। আবার হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর নিকট ও ঐভাবে নির্জনে প্রশ্ন করাতে, তিনি হজরত ওছমান (রাজিঃ) এর নাম করিলেন। পরে আমি হজরত যোবের (রাজিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কিংবা হজরত ওছমান (রাজিঃ) এই দুই জনের মধ্যে একজনের হস্তে বয়্য়েত করিতে পরামর্শ দিলেন। ঐরূপ হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-কে নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর নাম করিলেন। মোটের উপর বেশীর ভাগ লোকের মত হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর দিকে ছিল। তৃতীয় দিবসে মছজেদ নববীতে সকলে সমবেত হইলে, হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ স্বীয় নিরপেক্ষতা ও অপক্ষপাতিতা [] স্বীয় বক্তব্য

প্রকাশ করিলেন । বিপুল জন-সভায় মছজেদ পরিপূর্ণ হইয়া গেল ।
 আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্ (রাজিঃ) স্বীয় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ করিয়া,
 ওছমান (রাজিঃ)-কে নিজের কাছে আহ্বান করিলেন, এবং
 বলিলেন, আপনি খোদা ■ রহুলের 'আহ্-কাম' (আদেশ) পালন এবং
 পূর্ববর্তী খলিফা ঘরের ছোয়ত অমুযারী চলিবেন বলিয়া একরার করুন ;
 তিনি সেইরূপ একরার করিলে, হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়য়োফ্
 (রাজিঃ), সর্বপ্রথমে হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হস্তে বসুয়েত করিলেন ।
 সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহার ■ বসুয়েত করিতে লাগিলেন ।

আলী (কঃ—ওঃ) এই দৃশ্য দর্শনে প্রথমে
 একটু মনঃক্ষুব্ধ হইয়া মছজেদ হইতে বাহিরে যাইতে
 লাগিলেন, কিন্তু কণকাল চিন্তা করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে
 জনতা ঠেলিয়া হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর সমীপবর্তী
 হইলেন, এবং মিতান্ত্র আশ্রয়ের সহিত তাঁহার হস্তে
 বসুয়েত করিলেন ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনের

শেষ পর্ব ।

খেলাফৎ ■ শাহাদৎ ।

এইস্থলে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি ।
 মহামান্ব প্রথম খলিফা ও ২য় খলিফার দোষদণ্ড প্রত্যয়ে ■ ব্যক্তিগত প্রভাবে,
 নিঃস্বার্থপরতা এবং ইসলাম ধর্ম রক্ষাকার্যের আন্তরিকতায়, মোছল-
 মানদিগের মধ্যে কোনও রূপ ভেদ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইতে পারে নাই ।

সর্বতোমুখী ক্ষমতাপন্ন রাজনীতি বিশারদ ফারুক (রাজিঃ)-এর ব্যক্তিগত প্রভাব এতই বেশী ছিল যে, মোছলমানদিগের একতাও সম্ভব হইত, অমাহুযিক শোখ বীর্ঘ্যে, বিভিন্ন দেশ বিজয়ে ■ ইসলাম-প্রচারের ■ প্রবল স্রোত বলিয়াছিল, ওয় খলিফার খেলাফতের প্রথমংশ পর্যন্ত সেই স্রোতই প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল । কিন্তু তৃতীয় খলিফা অতি নিরীহ ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন ; পক্ষান্তরে খ্রীষ বংশ অর্থাৎ বনি-ওম্মিয়ার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন থাকায়, তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং অন্যান্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদের উন্নতি ■ সর্বতোমুখী ক্ষমতা খুব বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন । তাঁহারা শাসনকর্তৃত্ব, বিপুল সম্পত্তি ও অর্থ লাভ, সামরিক শক্তি সঞ্চয় প্রভৃতি ব্যাপারে ও খুব সুবিধা করিয়া লইয়া ছিলেন । বিশেষতঃ ■ মাবিয়া (রাজিঃ), দীর্ঘকাল যাবৎ সিরিয়ার (শামের) সর্ব ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্তা থাকাতে, আর প্রতিবেশী রোমক সম্রাটের সহিত অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়, তাঁহার সৈন্যদল খুব সুশিক্ষিত সুনিয়ন্ত্রিত ও পরাক্রমশালী ছিল । ইহাদের মধ্যে ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-এর সংখ্যা খুব কম, পক্ষান্তরে কতক তাঁহাদের সম্ভান-সমৃদ্ধি ও অধিকাংশ আরব ও সিরিয়াবাসী নব-দীক্ষিত মোছলমান ছিলেন । হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), খলিফা মহাম্মদ ওহমান (রাজিঃ)-এর জ্যোতি ভ্রাতা (একই পিতামহে পোত্র), এবং মকার কোরেশদিগের ভূতপূর্ব সর্বপ্রধান নেতা হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর পুত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি খলিফার অসাধারণ স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল । সুতরাং রোমক সম্রাটের নিকট হইতে গৃহীত নব-বিজিত প্রদেশ ও জনপদ গুলি সমস্ত তাঁহারই শাসনাধীন করিয়া দিয়া-ছিলেন । আর দামেস্কের ন্যায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটা মনোরম প্রধান শহরে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, তাঁহার

দিগের প্রতি অতিরিক্ত করণা বিতরণ, তাঁহার নিরীহ স্বভাব, বার্ষিক্য-চিন্তা দৌর্য্য প্রভৃতির স্বযোগে এই কপটাচারী লোকটি আপনার একটি গঠন করিয়া লইল ; বহুসংখ্যক লোককে মহামান্য খলিফার বিক্কাচারী করিয়া তুলিল । প্রকৃত বিশ্বাসী মোছলমানগণ তাহার কপটতা মনের কুটিল ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন না ; তাঁহারা সাধারণ ধারণার বশবর্তী হইয়া মহামান্য খলিফার বিক্কাচারী হইয়াছিলেন । হজরত মোহাম্মদ-বিন-আবু-বকর (রাজিঃ) মেহেরের শাসনকর্তা নিযুক্তির ব্যাপারে মারওয়ান বে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহাতে মেহের, কুফা, বস্রা ও মদীনা বাসী বহু লোক মহামান্য খলিফার বিক্কাচারী হইয়াছিলেন । ঐ সঙ্গে আবুত্বজা এব্নে ছাবার ষড়যন্ত্র মিলিত হইয়া মহামান্য খলিফার হত্যাকাণ্ড ঘটাইল । মহামান্য খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর কার্য-কলাপে ভুল-ত্রুটি থাকিলেও, তাঁহার সংখ্যা অল্প ছিলেন না । তিনি অতি নৃশংস ভাবে শহীদ হওয়াতে, প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার প্রতি অধিকতর সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়াছিলেন ; হত্যাকারী বিপ্লববাদিদিগের প্রতি তাঁহাদের ক্রোধের সীমা পরিসীমা ছিল না । এব্নে ছাবা তাহার দলের লোকেরা সরল-চেতা মোছলমানদিগকে ভ্রান্ত-পথের পথিক করিয়াছিল । কুফা নিবাসী মহাবীর মালেক-বিন্ আস্তর পথান্ত তাহার ধাপ্পায় পড়িয়া গিয়াছিলেন ; তিনি মহামান্য খলিফার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না থাকিলেও, এব্নে-ছাবা তাহার চেলাদিগের ধোকার পড়িয়া হত্যাকারী দলের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি অচলা ছিল । মহামান্য খলিফার হত্যাকাণ্ডের পর মদীনা-তৈয়্যাব বিপ্লববাদী দিগের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় । তাহাদের দল খুব পুরু থাকাতে, মহামান্য ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ স্ব স্ব গৃহে চূপ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন । একটা ভীষণ

বিপ্লবের মহাপ্রাবনে পবিত্র মদীনা নগরী বেন তাসিয়া চলিয়াছিল ।
বিপ্লববাদিদিগের কুর্দন ও আফালন নগরের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইত ।

এই সময় “জলিলুল-কদর ” (শ্রেষ্ঠতম) ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের
মধ্যে প্রধানতঃ এই কয়জন এবং আরও অনেকে জীবিত ছিলেন ।

১। **আলী** (কঃ—ওঃ), ২। **যোবের** (রাজিঃ), ৩।

তাল্হা (রাজিঃ), ৪। **হজরত ছারাদ-বিন্-আবি-ওকাছ** (রাজিঃ),

৫। **হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাহ** (রাজিঃ), ৬। **হজরত আবদুল্লা-**

বিন্-ওমর (রাজিঃ), ৭। **হজরত আবদুল রহমান-বিন্-আবুবকর হিদ্দিক**

(রাজিঃ), ৮। হজরত এমার-বিন্-এরাছর (রাজিঃ), ৯। **হজরত ওমর**

বিনল্ আছ (রাজিঃ), ১০। **হজরত আবু মুছা আশরাফি** (রাজিঃ),

১১। **হজরত কারকার-বিন্-ওমর** (রাজিঃ), ১২। **মোহাম্মদ**

মোছলেগাঃ (রাজিঃ), ১৩। **ওছামাঃ-বিন্-যরেন** (রাজিঃ),

১৪। **হজরত হেছান-বিন্-ছাবের** (রাজিঃ), ১৫। **হজরত কারাব-বিন্-**

মালেক (রাজিঃ), ১৬। **হজরত আবু ছয়ীদ খোদরী** (রাজিঃ),

১৭। **হজরত নওমান-বিন্-বশির** (রাজিঃ), ১৮। **হজরত যরেন-বিন্-**

ছাবেত (রাজিঃ), ১৯। **হজরত মাবিরা-বিন্-শায়াবাঃ** (রাজিঃ), ২০।

হজরত আবদুল্লা-বিন্-ছালাম (রাজিঃ), ২১। **হজরত আবু হোরেয়াঃ**

(রাজিঃ), ২২। হজরত আবু আইউব আনছারী (রাজিঃ), ২৩।

হজরত মাবিরা-বিন্-আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ), প্রভৃতি ।

তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান জিন্নুরারেন (রাজিঃ)-এর শহীদ
হওয়ার ১ সপ্তাহ পরে, ৩৫ হিজরীর ২৫শে জেলহজ্জ্ তারিখে, হজরত
আলী করমুল্লাহ ওরাজহর হস্তে মদীনার কতিপয় প্রধান ছাহাবাঃ
কারাম (রাজিঃ), জন সাধারণ এবং বিপ্লববাদিগণ, সম্মারণ ভাবে
বস্য়েত—অর্থাৎ তাঁহাকে ইসলাম জগতের খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন ।

দুঃখের বিষয়, এই বয়স্কত গ্রহণ-ব্যাপার সর্ববাদী সম্মত হইল না। একটা ভীষণ বিপ্লবের আশঙ্কায় অনেকে সহসা বয়স্কত করিতে বিরত থাকিলেন। ~~কিন্তু~~ বিপ্লববাদিগণের একমুখ মোছলমান ভক্তির সহিত হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বয়স্কত করিলেন; কিন্তু কপটাচারী আবদুল্লাহ্ এব্নে ছাবার দল মোছলমানদিগের ধ্বংস সাধন জন্য প্রকাশ্য ভাবে বয়স্কত করিল; অথচ তাহাদের উদ্দেশ্য অতি স্থগিত ~~ক~~ মারাত্মক ছিল। মদীনার বহু মোছলমান ও বিপ্লববাদিগণ যখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে খেলাফৎ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা ত আমাকে খলিফা মনোনীত করিতেছ, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ‘আহ্লে বদর’ (যাহারা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) আমাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত তোমাদের নির্বাচনে কি ফল হইবে? এই কথা শুনিয়া তাঁহারা ‘আহ্লে বদর’ গণের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেককেই অতুন্নয় বিনয় করিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। সর্বপ্রথমে মহাবীর মালেক বিন্-আশ্-তর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বয়স্কত করিলেন; ইহার পর অন্যান্য লোকেরাও বয়স্কত জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। ঐ সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) করমাইলেন, (হজরত) তাল্হা (রাজিঃ) এবং (হজরত) যোবের (রাজিঃ)-এর ইচ্ছা এবং সঙ্কল্প ও জানা আবশ্যক। তখন মালেক বিন্-আশ্-তর হজরত তাল্হা (রাজিঃ)-এর নিকট, এবং হকিম বিন্-জাবলাহ্ হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিলেন; এবং উভয়কে এক প্রকার বল পূর্বক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে লইয়া আসিলেন। তখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি খেলাফৎ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা

করেন, আমি তাঁহার হস্তে বস্মত করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা উভয়েই খেলাফতের পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের অভিমত শ্রবণে উপস্থিত জনসম্মুখ বলিয়া উঠিলেন, যদি আপনারা উভয়ে খলিফার পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তবে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বস্মত করুন। তচ্ছবণে তাঁহারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুকাল ভাবা-গোনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে নীরব দেখিয়া মালেক আশুতর হজরত তালুহা (রাজিঃ)-কে বলিলেন, বস্মত না করিলে এখনই আপনার দফা-রফা করিয়া দেওয়া যাইবে। বেগতিক দেখিয়া হজরত তালুহা (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিলেন, আমি এই শর্তে আপনার হস্তে বস্মত করিতেছি যে, আপনি আগ্রাহর কেতাব এবং হজরত রহুল্লাহ্ (ছালঃ)-এর ছোয়ত অনুযায়ী আদেশজারী এবং শরি-য়তের হুকুম 'মতাবেক' কার্য্য করিবেন—অর্থাৎ খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারী দিগের প্রতি সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার প্রস্তাবে সন্মতি প্রকাশ করিলে, হজরত তালুহা (রাজিঃ) হাত বাড়াইয়া দিলেন। তথায় উপস্থিত কেহ কেহ ঐ কাটা হস্তখানি বাড়াইয়া বস্মত গ্রহণ-ব্যাপারকে 'মন্হু' (অশুভ জনক) বলিয়া মনে করিলেন। হজরত যোবের (রাজিঃ) ও ঐ শর্তেই বস্মত করিলেন। তৎপর হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজিঃ)-কে বস্মত করিতে বলা হইলে, তিনি স্বীয় গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, যখন সকল লোকের বস্মত শেষ হইয়া যাইবে, তখন আমি বস্মত করিব। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। এই মহাত্মা সম্পর্কে জাঁ হজরত (ছালিঃ)-এর মাতুল ছিলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-এর ন্যায় বস্মত করিতে বিলম্ব করাতে,

মালেক আশুতর তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন, ইহাকে এখনই 'কতল' (হত্যা) করিয়া ফেলিতেছি। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আমি স্বয়ং ইহার 'যামেন' (প্রতিভূ) হইতেছি ; তদনুসারে তিনি স্বহানে গ্রহান পূর্বক অনতিবিলম্বে ওমরা-ব্রত উদ্‌যাপনার্থ মক্কা-মোয়াজ্জমায় চলিয়া গেলেন। লোকে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বলিতে লাগিলেন, হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ) আপনার বিরুদ্ধে কোনও রূপ ছরতিসন্ধিতে মক্কায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য লোক পাঠাইতে উদ্যত হইলে, তাঁহার কন্যা মহামান্য ২য় খলিফার আহ্লিয়া (পত্নী), হজরত আবদুল্লা (রাজিঃ)-এর বিমাতা হজরত ওম্মে কুলছম (রাঃ—আঃ) পিতাকে বলিলেন, আবদুল্লা (রাঃ—আঃ) আপনার কোনও রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। তিনি কেবলমাত্র ওমরা কাব্য সম্পাদন জন্যই মক্কায় গমন করিয়াছেন ; এই কথা শুনিয়া তিনি নিরস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্বোন্নিখিত ১২ নং হইতে ২২ নং পর্য্যন্ত বিখ্যাত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণও বয়্যত করিলেন না। আবার ওম্মিয়া বংশীয় মারওয়ান-প্রমুখ ব্যক্তিগণ বয়্যত করিবেন দূরে থাকুক, তাঁহাদের কেহ কেহ মক্কায়, এবং কেহ কেহ শামে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট চলিয়া গেলেন। যাহারা মদীনা-তৈরবার উপস্থিত থাকিয়া বয়্যত করিয়াছিলেন না, তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-বয়্যত না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, এখনও এখানে মোছলমানদিগের মধ্যে শোণিত পাতের আশঙ্কা আছে, বিপ্লবের এখনও অবসান হয় নাই, এজন্য আমরা বয়্যত করিতেছি না। ইহার পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), মারওয়ান-বিন্-হকমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও খুজিয়া পাওয়া গেল না। হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত লায়লা:

(হজরত ওসমান গণি রাজি আল্লাহ্ আনহুর পত্নী)-এর নিকট হত্যাকারীদিগের নাম জানিতে চাহিলেন ; তিনি তন্মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তির ‘হলিয়া’ (আকার প্রকার) বলিলেন, কিন্তু আর কাহারও নাম বা আকার প্রকার বলিতে পারিলেন না । মোহাম্মদ-বিন-আবিবকর (রাজিঃ) সম্বন্ধে ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি এই হত্যাকারীদিগের মধ্যে ছিলেন কিনা ? তত্বত্তরে তিনি বলিলেন, খলিফাকে শহীন করিবার পূর্বে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন । ওম্মিয়া বংশের কোনও কোনও লোক মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর ‘আহলিয়া’ হজরত লায়লা* (রাঃ—আঃ)-এর কর্তৃক (ছিন্ন) অঙ্গুলী ও রক্ত রঞ্জিত কুরতা লইয়া দামেস্কে হজরত মাযিয়া-বিন্ আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফৎ সম্বন্ধে ইহাও একটা গুরুতর প্রতিকূল ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খেলাফতের দ্বিতীয় দিবস, হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ), খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার হস্তে এই শর্তের উপর বস্য়ত করিয়াছি যে, আপনি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারীদিগের প্রতি উপযুক্ত রূপ দণ্ডবিধান করিবেন । যদি আপনি হত্যাকারীদিগের দণ্ড-বিধানে বিলম্ব করেন, তবে আমাদের বস্য়ত ‘বাতেল’ হইয়া যাইবে । তত্বত্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, আমি হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারীদিগের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিব ; কিন্তু এ সময় পর্য্যন্ত বিপ্লববাদীদিগের নগরে বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে ; আমার খেলাফৎ এযাবৎ মজবুৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; আমি সকল দিক্ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে এ বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইব । এত

শীঘ্র এ সম্বন্ধে কিছুই করা যাইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন ।

এদিকে খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকারী ও বিপ্লব-বাদিদিগের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হইল যে, যদি ‘কেছাছ’ (হত্যার বদলা) লওয়া হয়, তবে আমরা বিষম বিপন্ন হইব । তাহারা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা ও পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল । পক্ষান্তরে নিরপেক্ষ বা মহামান্য শরীদ খলিফার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন মোছলমানগণ এই হত্যাকাণ্ডকে ঘোরতর অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, আর ইহাও মনে ভাবিতেন, এই দুর্দান্ত বিপ্লববাদী ও হত্যাকারী দল যদি তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত রূপ শাস্তি ভোগ না করে, তবে তাহাদের বিকট তাণ্ডব নিতান্তই অসহনীয় হইবে, তাহাদের অত্যাচার চরমে উঠিবে ; লোকের এই ধারণা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফতের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল । আবার এ সময় ইহার প্রতিকার করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না । একদল লোক হুজা করিয়া মহামান্য খলিফাকে হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং প্রকৃত হত্যাকারী স্থির করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না । হজরত নায়লা (রাঃ—আঃ) ব্যতীত অন্য সাক্ষীও কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না । বিপ্লববাদী দল খুব প্রবল ছিল, প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ তাহাদের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে তাহাদের সাহসে কুলাইত না । আবার সকলে এক মতাবলম্বী হইয়া ও হজরত আলী (রাজিঃ) কে খলিফা নির্বাচন করিয়া-ছিলেন না ; বিশেষতঃ বনি-ওমিয়া ও তাঁহাদের পক্ষপাতী লোকেরা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী ছিলেন । ওদিকে আবদুল্লা এব্নে সাবার দল ভিতরে ভিতরে মোছলমানদিগের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছিল । সুতরাং ব্যাপারটা কিরূপ ‘পেচিদা’ (জটিল)

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার বিপ্লবাদীদিগের মধ্যে একদল খাঁটি মোছলমান, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষপাতী এবং পরম ভক্ত ছিলেন। ৩য় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ লাভের কিছুকাল পূর্বেই খেলাফতের শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছিল—অশান্তির আগুণ ভিতরে ভিতরে প্রধুমিত হইতেছিল; রাজধানী মদীনা-তৈয়বায় অশান্তি ও বিপ্লবের বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। আবদুল্লাহ্‌ এবুনে সাবার মোছলেম-বিদ্রোহী দলটি বিপ্লব-বহ্নিতে বাতাস দিতে—ইন্ধন যোগাইতে ছিল। ১ম এবং দ্বিতীয় খলিফার মৃত্যু সর্বতোমুখী ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি এ সময় কেহ ছিলেন না; হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এ সময় খলিফার সর্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র হইলেও, উল্লিখিত নানাকারণে অনেক লোকই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। আবার বনি-হাশেমের মধ্যে উপযুক্ত লোকের একান্তই অভাব ছিল। হজরত আবদুল্লাহ্‌-বিন্-আব্বাস (রাজিঃ) ব্যতীত ঐ বংশে উল্লেখযোগ্য লোক খুব কমই ছিলেন। এমন কি, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হজরত অকিল (রাজিঃ) ■ তেমন প্রভাব সম্পন্ন ক্ষমতামণ্ডলী ব্যক্তি ছিলেন না; উত্তরকালে তিনিও ভ্রাতার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক আমীর হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত যোবের (রাজিঃ) ফুফাতো (পিতৃতো) ভাই হইয়াও মহামান্ন খলিফার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গেলেন। সুতরাং মহামান্ন খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) প্রকৃত সাহায্যকারী ও সুপরামর্শ দাতা—তাঁহার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন লোক খুব কমই পাইয়াছিলেন।

খেলাফতের ৩য় দিনে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কুফা, বস্রা ও মেহের দেশ হইতে আগত লোকদিগকে স্ব ■ দেশে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ অবগে কপটাচারী ও বিপ্লবকারী দলের প্রধান

নেতা আবদুল্লা-বিন্-সাবা ■ উহার দলস্থ লোকেরা মদীনা-তৈয়বাঃ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। অন্যান্য বিপ্লব-বাদীরা ■ তাহাদের পদাঙ্গুসরণ করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর খেলাফতের পক্ষে ইহা একটি অশুভজনক লক্ষণ ছিল যে, যে সকল লোক তাঁহার একান্ত বাধা, ভক্ত ও অমুর্ষভী বলিয়া দাবী করিত, তাহারাই তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। অতঃপর হজরত যোবেয় (রাজিঃ) ও হজরত তালহা (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, আপনি আমাদের কুফা এবং বসায় পাঠাইয়া দিন, আমাদের ঐ দুই স্থানের ভক্ত ও অমুর্ষভ বিত্তিন্ন খেয়ালের লোকদিগকে আমরা এক মতাবলম্বী করিব। তাঁহাদের কথা ও কার্য্য কলাপে সন্দেহ হওয়াতে, মহামান্য খলিফা তাঁহাদিগকে মদীনা ত্যাগ করিয়া অন্ত্র যাইতে নিষেধ করিলেন।

খেলাফতের ৪র্থ দিবসে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), পূর্ববর্তী খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর আমলের সমুদয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে ‘বরখাস্ত’ (পদচ্যুত) করিয়া, ঐ সকল স্থানে নূতন নূতন শাসনকর্তা নিয়োগের পরওয়ানা বাহির করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে নব-নিয়োজিত শাসনকর্তা দিগকে স্ব স্ব শাসনাধীন প্রদেশ সমূহে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। হজরত মগিরা-বিন্ শয়বাঃ (রাজিঃ) হজরত আলী (রাজিঃ)-এর একজন ঘনিষ্ট আত্মীয়, পরম হিতৈষী এবং রাজনীতি জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি এবং পিতৃবা পুত্র হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ), এত শীঘ্র পুরাতন শাসনকর্তাদিগকে পদচ্যুত এবং নূতন শাসনকর্তা নিয়োগ কার্য্যের অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া, মহামান্য খলিফাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ) তাঁহাকে আরও অনেক প্রকার স্তুতি

দান করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না ; বরং তিনি বলিলেন, তুমি আমার মতের সমর্থন কর । তিনি ইহাও বলিলেন, আমি (হজরত) মাবিয়া (রাজিঃ)-এর স্থলে তোমাকে শামের শাসনকর্তা করতে চাই । তিনি বলিলেন, আমি সর্বপ্রকারেই আপনার আদেশ পালনে বাধ্য, কিন্তু শামে (হজরত) মাবিয়া (রাজিঃ)-এর যেরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেখানে আমি গেলে তিনি আমাকে হত্যা কিংবা বন্দী করিবেন । আপনি তাঁহার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়া দেখুন । আর যে কোনও রূপেই হউক, তাঁহার নিকট হইতে বার্ষিক গ্রহণ করুন । হজরত আলী (রাজিঃ) যে সকল নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, তন্মধ্যে এমনের পূর্বতন শাসনকর্তা লায়লি-বিন্-ময়িনা এমন পরিত্যাগ পূর্বক মক্কার চলিয়া আইসাতে, হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) নির্বিবাদে তথাকার শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন । কুফার নব নিয়োজিত শাসনকর্তা এমারাঃ-বিন্-শাহাব (রাজিঃ), পশ্চিমধ্যে তলিহাঃ-বিন্-খোয়েলদ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া মদীনার ফিরিয়া আসিলেন । কয়েছ-বিন্-ছায়াদ মেছের পহুছিলে কতক লোক তাঁহাকে শাসনকর্তা বলিয়া মানিয়া লইল ; কতক লোক নীরব থাকিল ; আর কতক লোক বলিল, আমাদের ভাই-বন্ধুগণ মদীনা হইতে ফিরিয়া আসিলে আমরা কর্তব্য স্থির করিব । শামের নব-নিয়োজিত শাসনকর্তা ছহিল-বিন্-হানিফ্ “ তবুক ” নামক স্থানে একদল শামী অশ্বারোহী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া মদীনার ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন । জরির-বিন্-আবদুল্লা আল্ জব্ লী, হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে ‘হমদান’ (পারস্তের একটা বৃহৎ ছুবা)-এর শাসনকর্তা ছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে লিখিলেন, তুমি স্বীয় শাসনাধীন ছুবার লোকদিগের নিকট হইতে আমার নামে বার্ষিক গ্রহণ পূর্বক সত্বরে মদীনার চলিয়া আইস । তিনি সেই আদেশানুযায়ী বার্ষিক গ্রহণ পূর্বক

মদীনায় চলিয়া আসিলেন । কুফার শাসনকর্তা হজরত আবু-মুছা আশয়ারি (রাজিঃ)-এর নিকট মায়বদ আহলমীর হস্তে মহামান্য খলিফা একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তদন্তরে হজরত আবু-মুছা আশয়ারি (রাজিঃ) লিখিলেন, কুফার অধিবাসিগণ আমার হস্তে আপনার নামে বায়্য়েত করিয়াছে—কিন্তু কতক লোক কিছু অনিচ্ছার সঙ্গে । এই পত্র পাঠিয়া মহামান্য খলিফা কুফা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত হইলেন । একই অন্য একখানি পত্র জরির-বিন্-আবহুজা ও ছবরঃ জহনীর হস্তে দামেস্কে হজরত মাযিয়াঃ (রাজিঃ)-এর নামে পাঠান হইয়াছিল ; ৩ মাসের মধ্যে তিনি সেই পত্রের কোন উত্তরই দিলেন না । অবশেষে খীর কাহেদ (দূত) কবিছা ইছির হস্তে একখানি পত্র দিয়া, জরির-বিন্-আবহুজার সঙ্গে মদীনায় পাঠাইলেন । ঐ পত্রের উপর হজরত আলৌ (কঃ —ওঃ)-এর নাম ও প্রেরক হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর নাম মাত্র ছিল, তিতরে কোন চিঠি-পত্র ছিল না । তদর্শনে মহামান্য খলিফা দূতের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়ায়, দূত বলিলেন, আমি দূত—স্বতরাং অবধ্য । কুলকথা, নামে (সিরিয়ায়) কেহ আপনার বায়্য়েত করিবে না । আমি দেখিয়াছি, ৬০ হাজার শেখ, শহীদ খলিফা হজরত ওচমান (রাজিঃ)-এর রক্ত-রঞ্জিত পিরাহান দেখিয়া উচ্চ ক্রন্দনে চতুর্দিকে নিনাদিত করিতেছে । অতঃপর দূত দামেস্কে হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট ফিরিয়া চলিয়া গেল । বিপ্লববাদী ও এব্নে সাবার দল তাহাকে মারিতে উত্তত হইলে, মদীনায় কতিপয় অধিবাসী তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে দিলেন না । বিপ্লববাদী দলের নেতাগণ মহামান্য খলিফার প্রেরিত দূত জরির-বিন্-আবহুজা সম্বন্ধে বলিতে লাগিল, এই লোকদ্বিও (হজরত) মাযিয়া (রাজিঃ)-এর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, নচেৎ এই সুদীর্ঘকাল তাহার দামেস্কে বসিয়া থাকার কি প্রয়োজন ছিল ? জরির এই অপবাদে মর্ম-

পীড়িত হইয়া মদীনা পরিত্যাগ পূর্বক " করকিছাঃ " নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। কুট রাজনীতিজ্ঞ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে সেখান হইতে সংবাদ দিয়া আপনার নিকট লইয়া গেলেন।

দামেক্কে দূত যাতায়াত প্রভৃতি ঘটনায় মদীনাবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন, শীঘ্রই হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর [] হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধের পূর্বলক্ষণ দেখিয়া হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও [] যোবের (রাজিঃ), মহামান্ত খলিফার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদেরকে রোমরা অস্থগ্নান সম্পন্ন করিবার জন্য মক্কা মোরাক্কমায় যাইতে অনুমতি দিন। তিনি তাঁহাদিগকে আর বাধা দেওয়া উচিত নয় মনে করিয়া তাঁহাদিগকে মক্কা যাইতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মদীনাবাসীদিগের মধ্যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, শাম প্রদেশ আক্রমণ জন্য সৈন্য সংগ্রহ কর। সঙ্গে সঙ্গেই একখানি পত্র ওছমান বিন্-হানিকের নামে বস্তায়, একখানি পত্র হজরত আবু মুছা আশরাফি (রাজিঃ)-এর নামে কুফায়, আর একখানি পত্র কয়েস্-বিন্-ছাদ (রাজিঃ)-এর নামে মেছেরে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, যতদূর সম্ভব, শক্তি সঞ্চয় পূর্বক উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ কর, আমি যখনই আদেশ করিব, ঐ সৈন্যদল আমার নিকট পাঠাইবে। যখন মদীনার অধিকাংশ অধিবাসী মহামান্ত খলিফার আদেশে যুদ্ধের [] প্রস্তুত হইলেন, তখন তিনি হজরত কহম বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে মদীনায় স্থায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন, এবং স্থায় যুবক বীর পুত্র মোহাম্মদ বিন্-হানিকার হস্তে এই বিরাট সেনাদলের রণ-পতাকা প্রদান করিলেন। আর ডানদিকের সেনাপতি পদে হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), বামদিকের সেনাপতি পদে ওমর-বিন্-আবু ছলমাঃ, এবং মকদ্দমাতুল জয়েশের (অগ্রগামী-সেনাদলের) সেনাপতিপদে হজরত আবু লেয়লী-এব্-নে-জাব্বরাহ্

(হজরত আবু-ওবায়দাঃ বিন্-জাররাহ্ [রাজিঃ]-এর ভ্রাতা) নিযুক্ত হইলেন ।

বিপ্লববাদীদিগের একটা প্রকাণ্ড দল তখনও মদীনার উপস্থিত ছিল ; মহামান্য খলিফা তাহাদিগের নেতাদের মধ্য হইতে কাহাকেও সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন না । তিনি সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিবেন, ইতিমধ্যে মক্কা-মোয়াজ্জম হইতে সংবাদ আসিল যে, সেখানে আপনার বিরুদ্ধে রণ-সজ্জা হইতেছে । তচ্ছবণে তিনি সিরিয়ার যুদ্ধযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রাখিলেন ।

যখন বিপ্লববাদীগণ ৩য় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-এর গৃহ অবরোধ করেন, তখন ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), হজ্জ্-করিয়া সম্পাদনার্থ অন্যান্য ওম্মোল-মুমেনিন (মোছলেম মাতা) গণ সহ মক্কা-মোয়াজ্জমায় গমন করিয়াছিলেন ; হজ্জ্-করিয়ায় তিনি মদীনাভিমুখে যাত্রা করিয়া " ছরফ্ " নামক স্থানে মহামান্য খলিফার শহীদ হওয়ার সংবাদ পাইলেন । এই দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি সেখান হইতে মক্কায় ফিরিয়া গেলেন । সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ ও পাইলেন যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খলিফার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন । তিনি মক্কার মোছলমানদিগের প্রেরণ উত্তরে বলিলেন, আমার শপথ, আমি নিরপরাধ (হজরত) ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব ।

মক্কা-মোয়াজ্জমায় হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে আবদুল্লাহ-বিন্-আমের হজরমী শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন ; তিনি ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, খলিফার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ প্রথম ব্যক্তি আমি । বনি-ওম্মিয়ার যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, একাধে আমরা সকলেই আপনার

সঙ্গী। এই দলে সমীদ-বিন্-আল আছি ও অনিদ-বিন্-ওক্বাঃও ছিলেন। বস্রার পদচ্যুত শাসনকর্তা আবদুল্লা-বিন্-আমের, ■ এমনেব পূর্বতন শাসনকর্তা লায়লী বিন্-লিনিছাঃ ৬ শত উষ্ট্র ■ রাজকোষের ■ লক্ষ দিনার লইয়া আসিয়াছিলেন; এক্ষণে পরামর্শ স্থির হইল যে, হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে হইবে। এই সময় হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত বোবের (রাজিঃ) ও মক্কার আসিয়া পহুছিলেন; ওম্মোল মুমেনিনের অমুরোধে তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গী হইতে স্বীকৃত হইলেন। এই দুই মহাত্মা ও এমনেব পদচ্যুত শাসনকর্তা এবং বস্রার পদচ্যুত শাসনকর্তা, এই চারিজন বিশেষ ক্ষমতালব্ধী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং খ্যাতনামা বীরপুরুষ ছিলেন। মক্কার প্রায় সমুদয় অধিবাসীই মোছলেম-মাতার আত্মাচুবর্তী ছিলেন। এক্ষণে এই অভিযান প্রথমে কোথায় যাইবে, তাহা লইয়া বিস্তর বাদামুবাদ হইল, অবশেষে প্রথমে সকলে বস্রায় যাওয়া সম্বন্ধেই একমতাবলম্বী হইলেন।

পরামর্শ স্থির হইলে সকলেই বস্রা গমনের ■ সজ্জিত হইতে লাগিলেন। হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ঐ সময় মক্কার উপস্থিত ছিলেন; সকলে তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়া আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে ওম্মোল-মুমেনিনের নিকটে ডাকিয়া আনাইয়া ঐ প্রস্তাব করা হইল; উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি মদীনাবাসীদিগের সঙ্গে আছি; তাঁহারা যে পন্থাবলম্বন করিবেন, আমি তাঁহাদেরই মতামুসরণ করিব; তাঁহার উক্তি অবশেষে নেতৃগণ আর কোনও উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিনদিগের সকলেই মক্কার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ও হজরত আয়েশা-ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে বস্রায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন হজরত হাফ্.সা (রাঃ—আঃ) ও ঐ সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা ক

ছিলেন ; কিন্তু তিনি ভাতার (এব্নে ওমর [রাজিঃ]-এর) নিষেধে গমনে বিরত থাকিলেন । মগিরা-বিন্-শায়বাঃ মক্কায় আসিয়াছিলেন, তিনিও এই অভিযানকারীদিগের সঙ্গী হইলেন ।

আবদুল্লা-বিন্-আমের ও লায়লী-বিন্-মনছিয়া, এমন ও নৃশা হইতে বহু টাকা আনিয়াছিলেন ; তদ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র এবং অভিযানোপযোগী অন্যান্য সামগ্রী-সম্ভারঃক্রয় করা আরম্ভ হইল । পূর্বোক্ত পদচ্যুত শাসন-কর্তা ■■■ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া, মক্কাবাসীদিগকে খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ অভিযানে যোগদান ■■■ আহ্বান করিলেন । তদনুসারে মক্কার বহুসংখ্যক যোদ্ধা এই দলে আসিয়া যোগ দিলেন । তাঁহাদের সংখ্যা ১৫০০ শত হইল । এই অভিযান যাত্রা করিবার সময়, মূল বিপ্লবের প্রধান নেতৃক, কুটবুদ্দিন সম্পন্ন মারওয়ান বিন্-আল্ হাকম এবং ছরীদ বিন্-আল-আছ ও ■■■ আসিয়া পহুছিলেন, এবং মহা উৎসাহের সহিত এই অভিযানে যোগদান করিলেন । ঘটনাক্রমে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-এর জননী হজরত ওম্মে ফজল-বিন্তে আল হরছ (রাঃ—আঃ) এই সেনাদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন ; তিনি “ জহনিয়া ” সম্প্রদায়ের জফর নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়া, তাড়াতাড়ি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট মদীনায়া পাঠাইয়া দিলেন ; একখানি পত্রে এই অভিযান সংক্রীয় সমস্ত সংবাদ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন । দেখিতে দেখিতে যোদ্ধ-পুরুষের সংখ্যা ৩০০০ হইল ; অভিযানের যাত্রা আরম্ভ হইল । “ যাত আরক্ ” নামক স্থান হইতে অন্যান্য ওম্মোল মুমেনিনগণ বিচ্ছেদের ■■■ দুঃখ প্রকাশ ও ক্রন্দনের সহিত বিদায় হইয়া মদীনাতিমুখে প্রস্থান করিলেন । ধূর্ত মারওয়ান পশ্চিমধ্যেও নেতৃদিগের পরম্পরের ■■■ বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন ; শেষে ওম্মোল মুমেনিন ■■■ আবেশা হিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর

ধমকানীতে নিরস্ত হন । এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলাতে, আ হজরত (ছালঃ)
উহাকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন । মহামান্ন খলিফা
হজরত ওহমান (রাজিঃ) এই ধূর্ত লোকটীকে বিপ্রবাদীদিগের হস্তে অর্পণ
করিলে তাঁহাকে এমন শোচনীয় ভাবে শহীদ হইতে হইত না । পশ্চিমধ্যে
ভাবী খলিফা নির্বাচন সম্বন্ধে কথাবার্তা সরীদ-বিন্-আলু আছের মনঃপুত
না হওয়াতে, তিনি অভিযানকারী দলের সঙ্গে পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান
করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লা-বিন্-খালেদ-বিন্-আছিদ এবং মগিরা-
বিন্ শয়বাঃ, ■ ছকিফ্ সস্ত্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক দল ছাড়িয়া চলিয়া
গেল । ইতিমধ্যে জনরব উঠিল যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এক
প্রবল সেনাদল লইয়া তোমাদের নিকটবর্তী হইতেছেন । এই সংবাদ শ্রবণে
সৈন্যগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া শিবির উত্তোলন পূর্বক বশার দিকে দ্রুত
অগ্রসর হইতে লাগিল ।

এই সেনাদল যখন বশার নিকটবর্তী হইল, তখন ওম্মোল মুমেনিন
(রাঃ—আঃ), আবদুল্লা-বিন্- আমেরকে বশাখাদীদিগের নিকট
পাঠাইলেন । বশার নব-নিয়োজিত শাসনকর্তা ওসমান-বিন্-হানিফ্ ও
নগরবাসী দিগকে আহ্বান করিয়া, মহামান্ন খলিফার পক্ষাবলম্বন পূর্বক
সমাগত বিরুদ্ধবাদীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অরুরোধ করিলেন ; কিন্তু
বশার হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর পক্ষ
সমর্থনকারী লোকের অভাব ছিল না ; সুতরাং তিনি দেখিলেন, গতিক
বড় ভাল নহে ।

ওদিকে মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) সসৈন্তে " মদির " নামক স্থানে পহুছিলেন । শাসনকর্তা ওসমান-বিন্-হানিফ্ সসৈন্তে এই অভিযানকারী বোদ্ধপুরুষদিগের সম্মুখীন হইলেন ; হজরত তালুহা (রাজিঃ) ■ হজরত যোবের (রাজিঃ) সেনাদলের সম্মুখে আসিয়া, খলিফা

হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে জনস্বার্থে
বক্তৃতা প্রদান করাতে, শাসনকর্তার সেনাদলের মধ্যেই দুই দল হইয়া
গেল । একদল তাঁহার পক্ষাবলম্বী, একদল হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও
হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর পক্ষপাতী । ওম্মোল মুমেনিনও এতৎ
সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিলে, বসাবাসিগণের মাতগতি অনেকটা
পরিবর্তিত হইল । এই সময়েই হানিক-বিন্-ওছমানের সেনাপতি হাকীম-
বিন্-জব্বাঃ, ওম্মোল মুমেনিনের সেনাদলকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন ;
যুদ্ধে সেনাপতি নিহত, শাসনকর্তা পরাজিত ও বন্দী হইয়া, মোছলেম-
মাতার সমীপে আনীত হইলে, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন ।
অতঃপর ওছমান-বিন্-হানিক, মহামান্ত খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-
এর নিকট চলিয়া গেলেন । স্মৃতরাঃ বসার ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-
এর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল ।

মহামান্ত খলিফার মদীনা হইতে বস্রাভিমুখে যাত্রা ।

মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ), হজরত তালুহা (রাজিঃ)
■ হজরত যোবের (রাজিঃ), যুদ্ধযাত্রা করিয়া বস্রাভিমুখে গমন করিতেছেন,
এই সংবাদ শ্রবণে হজরত আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন
আলী (কঃ—ওঃ) বড়ই ব্যথিত হইলেন । তিনি সমগ্র মদীনা বাসিদিগের
নিকট সাহায্য চাহিয়া একটি হুদয়োগাদিনী 'খোত্বা' পাঠ করিলেন ।
তিনি যুদ্ধযাত্রার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন । একদিকে মহামান্ত
খলিফার আহ্বান, ■ দিকে মহা মাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন হজরত
আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), পরম ভক্তিভাজন (আশরার মোবাম্বরা)
হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করা, উভয় পক্ষই মোছলমান—ওম্মতে মোহাম্মদী, এই যুদ্ধে মোছলমান
 দিগেরই শোণিতপাত এবং মোছলমানদিগেরই শক্তি ক্ষয় হইবে,
 তাঁহারা এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ; এরূপ অবস্থায় যখন নামোম্মার
 জলিলুল্ কদর ছাহাবাঃ কারাম হজরত আবুল হাশম বদরী (রাজিঃ),
 বেয়াদ-বিন্-খজলাঃ (রাজিঃ), হজরত খযিমাঃ-বিন্-ছাবেত
 (রাজিঃ), হজরত আবু কেতাদাঃ (রাজিঃ) যুদ্ধ-বাত্তার প্রস্তুত হইতে
 লাগিলেন, তখন অগ্ন্যান্ত লোকেরাও যুদ্ধসজ্জা করিয়া মহামান্ত আমিরুল-
 মুমেনিনের পতাকা-মূলে আসিয়া সমবেত হইলেন । তদনুসারে হিজরী,
 রবিওন্-সানী মাসের শেষ ভাগে, মহামান্ত খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)
 মদীনা তৈয়বাঃ হইতে বস্রাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । মদীনায় উপস্থিত
 কুফা ও মেহের বাসী বিপ্লববাদিগণ ও তাঁহার অনুগামী হইল । বিপ্লববাদী
 দিগের অগ্রণী, মোছলমানদিগের গুপ্ত শত্রু আবদুল্লা-বিন্-ছাবা ও সদল
 যোগদান করিয়াছিল । পথিমধ্যে হজরত আবদুল্লা-বিন্-ছালাম
 (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিনি মহামান্ত খলিফার অশ্বের
 লাগাম ধরিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, হে আমিরুল মুমেনিন ! আপনি
 মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইবেন না ; আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি,
 আপনি মদীনা হইতে চলিয়া গেলে মোছলমানদিগের আমীর আর এখানে
 কিরিয়্যা আসিবেন না । উগ্র-প্রকৃতির (বিশেষতঃ ছাবায়ী দলের)
 লোকেরা এই মহাসম্মানিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-কে গালি দিয়া প্রহার
 পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, তোমরা
 ইহাকে ছাড়িয়া দাও ; আ হজরত (ছালঃ)-এর ছাহাবাঃ গণের মধ্যে
 ইনি একজন সাধু লোক । অতঃপর এই বিরাট সেনাদল বস্রাভিমুখে
 অগ্রসর হইতে লাগিল । “ রিযাঃ ” নামক স্থানে পহুছিয়া মহামান্ত
 আমিরুল মুমেনিন সংবাদ পাইলেন যে, হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত

যোবের (রাজিঃ) বিজয়ীবেশে বস্ত্র প্রবেশ করিয়াছেন ; অগত্যা তিনি ঐ স্থানেই শিবির স্থাপন করিলেন । তিনি এখান হইতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া সৈন্ত-সংগ্রহের যোগাড় করিলেন । রমযার চতুর্দিকে ■ সৈন্ত সংগ্রহ করা হইতে লাগিল । ইতিমধ্যে মদীনা হইতে খীর জিনিষপত্র ও পরিবার বর্গ আনাইয়া, মহামান্ন আমিরুল মুমেনিন বস্ত্র দিকে অগ্রসর হইতে উद्यোগ করিলেন । হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া, হজরত আলী (কঃ—ঃ) করমাইলেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাকে আক্রমণ করিতে বাধ্য না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিব না । যতদূর সম্ভব, তাঁহাদিগকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিব । রমযাঃ হইতে যাত্রা করিবার পূর্বেই তয়বংশীয় একদল বোদ্ধপুরুষ আসিয়া তাঁহার সৈন্তদলে যোগদান করিলেন । মহামান্ন খলিফা এই স্থানে ওমর-বিন-আল আররাহ (হজরত আবু ওবেদাঃ-বিন-আররাহ [রাজিঃ]-এর ভ্রাতা) কে অগ্রগামী সৈন্তদলের সেনাপতি পদে বরিত করিলেন । কুফা হইতে আগত একজন লোকের নিকট তথাকার শাসনকর্তা হজরত আবু মুছা আশরাফী (রাজিঃ) এর ভাব গতিক ও মতিগতির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সেই ব্যক্তি বলিল, যদি আপনি ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি বা আপস)-এর উদ্দেশে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি আপনার মতামুবর্তী ; আর যদি হজরত তালুহা ও যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি আপনার সে মতের পোষকতা করিবেন না । মহামান্ন খলিফা করমাইলেন, যে পর্য্যন্ত কেহ আমাকে আক্রমণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই । তিনি রমযাঃ হইতে রওয়ানা হইয়া-” তয়বলিয়ঃ ” নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করার পর জানিতে পারিলেন, বস্ত্র শাসন-

কর্তা যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী, আর তাঁহার সেনাপতি হকিম-বিন্-জলবাঃ নিহত হইয়াছেন । সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন " যেকার " নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ওছমান-বিন্-হানিফ্ তাঁহার খেদমতে আসিয়া হাজের হইলেন । হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ও যোবের (রাজিঃ) তাঁহার হাতে : বায়্‌য়েত করিয়া এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এজ্জল হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাদিগকে " বদ দোওয়া " (অভিসম্পাত) করিতে লাগিলেন ।

এই সময় মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ) ও মোহাম্মদ-বিন্ জাকর (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগকে হজরত আলী (রাজিঃ)-এর পক্ষ সমর্থন পূর্বক যুদ্ধে যোগদান জন্ত প্ররোচিত করিতে গমন করিলেন । কিন্তু তথাকার শাসনকর্তা হজরত আবুমুছা আশয়ারি (রাজিঃ) এর বিরুদ্ধাচরণে ও তাল্‌হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তিনি অনিচ্ছুক বলিয়া তাঁহারা বিফল মনোরথ লইলেন ; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেদমতে ফিরিয়া গেলেন । তখন মহামান্য খলিফা হজরত এব্নে আব্বাহ (রাজিঃ) ও মহাবীর মালেক আশ্‌তর কে কুফায় পাঠাইলেন । তাঁহারা অনেক বুঝাইয়া তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে পারিলেন না ; অবশেষে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হজরত এমাম হাছান (রাজিঃ) ■ জলিলল কদর ছাহাবাঃ এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) কে কুফায় প্রেরণ করিলেন । তাঁহারাও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ) স্বীয় মতে অটল থাকিলেন । এই সময় ওম্মোল মুমেনিন হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর পক্ষ হইতেও কুফার বড় বড় লোকদিগের নামে পত্র আসিল, সেইপত্র মছজেদে পড়িয়া সকলকে শুনান হইল । তখন পক্ষ প্রতিপক্ষ দুই দল মহা কোলাহল আরম্ভ করিলেন । যয়েদ-বিন্-ছওহান এবং কুফার আরও কতিপয় যোগ্য ব্যক্তি মহামান্য

আমিরুল মুমেনিনের সাপক্ষে বক্তৃতা প্রদান করিলেন ; হজরত এমার-বিন্‌ এয়াছর (রাজিঃ) এবং হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এই সময় অনল-বর্ষিণী ভাষায় বক্তৃতা করাতে জনমত মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল । এই সময় আবার মহামান্য খলিফা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাবীর মালেক আশ্‌তর তথায় পহঁছিলেন ; তাঁহার চেষ্টায় জনতা সম্পূর্ণরূপে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অনুকূল হইল ; হজরত আবুমুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-এর বাধার আর কোন ফল ফলিল না । তখন তাঁহাকে বলা হইল, আপনি আগামী কলাই রাজপ্রাসাদ এবং রাজ-ধানী পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া যান । তৎপর ৯০০০ বিক্রান্ত যোদ্ধাপুরুষ সঙ্গে লইয়া ইহার মহামান্য আমিরুল-মুমেনিনের খেদমতে উপস্থিত হইলেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) “ বিকার ” নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া এই নবাগত সৈন্যদলের অভ্যর্থনা করিলেন । তৎপর তিনি কুফাবাসী যোদ্ধাগণকে লক্ষ্য করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন ; সেই বক্তৃতায় তিনি কেবল শান্তির বাণীই শুনাইলেন । কুফার বীর সন্তানগণ তাহাতে খুবই আনন্দিত হইলেন । দ্বিতীয় দিবস মহামান্য খলিফা, হজরত কায়কায়-বিন্‌-ওমর (রাজিঃ)-কে ব্যায় ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) ও হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) এবং হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন । এই “ বিকার ” নামক স্থানেই বিখ্যাত তাবেরী ও তাপস কুল শিরোমণি হজরত আবিস্‌ করণী (রাজিঃ) আসিয়া আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে বায়্‌য়েত করিলেন ।

কায়কায়-বিন্‌-ওমর (রাজিঃ) একজন শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ এবং বিখ্যাত বক্তা ছিলেন । তিনি জলন্ত ভাষায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছা এমন ভাবে জ্ঞাপন করিলেন যে, হজরত ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ), হজরত তাল্‌হা (রাজিঃ) ■ হজরত যোবের

(রাজিঃ) তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করিলেন ; মহামান্য খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর হত্যার বদলা গ্রহণ এবং মোছলমানদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপনই তাঁহাদের দাবী ছিল, সেই দাবী পূরণ হইবে ওনিয়া তাঁহাদের আপত্তির আর কোনও কারণ রহিল না। সুতরাং হজরত কায়কায়-বিন্-ওমর (রাজিঃ) উদ্দেশ্য সাফল্য-সঞ্চিত হইল মনে করিয়া হঠাৎ মহামান্য খলিফা সমীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে বস্রার একদল প্রধান লোকও ডেলিগেট রূপে তথায় গমন করিলেন। বস্রাবাসিগণ জনরবে ওনিরাছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বস্রা জয় করিয়া, তত্রত্য সমুদয় অধিবাসীকে তরবারি-যুগে নিক্ষিপ্ত করিবেন ; এবং স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে দাসদাসী রূপে গ্রহণ করিবেন। কপট-চুড়ামণি এব্নে ছাবার অতুচ্চরগণই এই মিথ্যা জনরব রটাইয়া ছিল। বস্রার প্রতিনিধিগণ মহামান্য খলিফার বাচনিক এবং সেনাপতিদিগের মৌখিক শক্তির বাণী ও জনরবের অমূলকতা শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বস্রার প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং সমগ্র বস্রাবাসীকে সন্ধি ও শান্তির সুসংবাদ ওনাইয়া নিরুদ্ভিগ্ন ও নিশ্চিন্ত করিলেন।

সন্ধির প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন সমগ্র সেনাদলকে একস্থানে সমবেত করিয়া একটা অনলবর্ষিণী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন, এবং অবশেষে বলিলেন, আগামী কল্য আমাদিগকে বস্রাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এই যাত্রা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নহে—বরং সন্ধি স্থাপনের জন্ত। সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে সকল লোক খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর গৃহাবরোধ কার্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা যেন আমার সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মহামান্য খলিফার এই বক্তৃতা শ্রবণে আবদুল্লা-বিন ছাবা ও মেছের দেশীয় বিপ্লববাদীদিগের মনে বিষম ভীতি ও হুঁশিয়ার উদ্রেক হইল। হজরত

আলী (রাজিঃ)-এর সৈন্যদলে, এই বিপ্লববাদী দিগের সংখ্যা দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার পর্য্যন্ত ছিল ।

এই দলের মধ্যেও অনেক ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান ও স্বচতুর লোক ছিল । এই দলের নেতা খুর্চ চুড়ামণি মোছলেম-বিষেবী এব্নে ছাবা, গুপ্ত সভার স্বীয় দলস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিল । এই খাস গুপ্ত সভার স্বয়ং আবদুল্লা-বিন্-ছাবা, এব্নে মলজুম, মালেক আশ্-তর, তদীয় বিশিষ্ট বন্ধুগণ, আলিরা-বিন্-আল হতিম, ছালেম-বিন্-হয়লাবাঃ, সতরিহ্-বিন্-আওনী প্রভৃতি বিপ্লববাদী দিগের প্রধান প্রধান নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন । তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এতদিন ত (হজরত) তাহাঃ (রাজিঃ) ও (হজরত) যোবেদ (রাজিঃ), ওয় খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর কাছাছ (হত্যার প্রতিশোধ)-এর দাবী করিতেন, এক্ষণে ত স্বয়ং আমিরুল মুমেনিনকেও তাঁহাদের 'হাম-খেরাল' (এক মতাবলম্বী) দেখা যাইতেছে । যদি আপসে ইহাদের মধ্যে সন্ধি-বন্ধন হয়, তবে উভয় দল মিলিয়া আমাদের নিকট হইতে 'কেছাছ' (হত্যার প্রতিশোধ) অবশ্য করিবেন । এই সভায় অনেক বাক-বিতণ্ডা হইল ; অনেকেই অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন ; আবদুল্লা-বিন্-ছাবা এই সভার সভাপতি ছিল ; অবশেষে সকলে তাহাকে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে বলিলেন । তখন সেই মোস্লেম-বিষেবী খুর্চ-চুড়ামণি বলিল, আমার মতে আমাদের পক্ষে ইহাই মঙ্গলজনক যে, আমরা সকলেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সেনাদলে মিলিয়া মিশিয়া থাকি ; তাঁহার সেনাদল হইতে কোনও ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নহে । একান্ত পক্ষে তিনি আমাদেরকে স্বীয় সেনা দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও, আমরা তাঁহার সেনাদলের কাছে কাছেই অবস্থান করি, এবং তাঁহাকে একথাও বলিয়া দেওয়া যাইবে,

যদি আপনাদের মধ্যে প্রস্তাবিত সন্ধি-বন্ধন না হয়, এবং পরস্পরের যুদ্ধ বাধিয়া যায়, তখন আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সাহায্য করিব। মূলকথা, এই উত্তর দলে বাহাতে যুদ্ধ বাধে, তৎক্ষণে আমরা আপনাদের প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। আবদুল্লা-বিন্-হাবার এই কথা সকলের মনঃপূত হইয়াছে, উপরোক্ত পরামর্শ-সত্য এই প্রস্তাবই গ্রহীত হইল। মোছলমান সিংহের সর্বনাশের বিবক্ষণ এখানেই রোপিত হইল।

জঙ্কে-জমল অর্থাৎ জমল যুদ্ধ।

পূর্ব : নির্দেশানুসারে আলী (কঃ—ওঃ) খীর সেনাদলকে বস্ত্রাতিমুখে “ কুচ্ ” করিতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণে তদীয় বিশাল বাহিনী অগ্রসর হইয়া বস্ত্রের নিকটস্থ “ আবদুল্লা ” নামক ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিল। বিপ্লববাদিগণ অত্যন্ত ভাবে থাকিয়া সঙ্গে ময়দানেরই প্রান্তে ডেরা-তাখু স্থাপন করিল। ওদিকে ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ), হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও যোবের (রাজিঃ)-এর বিরাট সেনাদলও ময়দানের অপর পার্শ্বে শিবির প্রণী স্থাপন করিল। ৩ দিন পর্যন্ত এই উত্তর সেনাদল পরস্পরের সম্মুখান অবস্থায় নীরবে অবস্থান করিল ; ইতিমধ্যে হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গীয় কোনও কোনও নেতা বলিলেন, আমাদের পক্ষে অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। তদুত্তরে হজরত যোবের (রাজিঃ) বলিলেন, (হজরত) কায় কায় বিন্-ওমর (রাজিঃ) দ্বারা সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ করা কিছুতেই উচিত নহে। পক্ষান্তরে হজরত আলী (রাজিঃ)-কেও তাঁহার দলের কোনও কোনও প্রধান ব্যক্তি সহরে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; আরও অনেকে

অনেক প্রকার প্রস্তাব করিলেন ; তিনি সেই প্রস্তাবের যথা-বিহিত উত্তর প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং প্রথমেই যুদ্ধারম্ভ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।

অতঃপর আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত তালহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর নিকট এই বলিয়া দুইজন দূত প্রেরণ করিলেন যে, যদি আপনারা (হজরত) কায়-কায়-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-এর প্রস্তাবে রাজী থাকেন, তবে শেখ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে বিরত থাকুন । তদন্তরে তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা আমাদের কথায় অটল আছি, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে পারেন । অতঃপর তাঁহারা জন ময়দানে একত্র মিলিত হইয়া বহুভাবে পরস্পর অনেক কথাবার্তা বলিলেন । হজরত যোবের (রাজিঃ), আ হজরত (ছালঃ)-এর একটা ভবিষ্যদ্বাণী (হাদীছ) শুনিয়া, আর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন ; তৎপর তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন । হজরত যোবের (রাজিঃ) স্বীয় সেনাদলে প্রত্যাবর্তন করিয়া, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, আজ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আমাকে আ হজরত (ছালঃ)-এর একটা ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সেই আমি কোনও অবস্থায়ই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না । আমার সঙ্কল্প এই যে, আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব । ইহার পর উভয় পক্ষ হইতে দূত যাতায়াতে সন্ধির শর্ত ঠিক হইয়া গেল ; এবং আগামী কল্য সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইবে বলিয়াও উভয় পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন । আবদুল্লা-বিন্-ছাবার দল ■ বিপ্লববাদিগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, আগামী কল্য সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আপনাদের বিপদ আসন্ন

ভাবিয়া সারারাত্রি যুক্তি-পরামর্শ আটলেন, এবং রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে—অঙ্ককার থাকিতে থাকিতেই উহারা হজরত তালুহা (রাজিঃ)।

■ হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সেনাদল—অর্থাৎ ‘আহলে-জমল’ কে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। বস্ত্রার বিশাল সৈন্য দলের যে অংশ এই বিপ্লববাদী দল আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও তাড়াতাড়ি স্ফীকৃত হইয়া প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে উভয় সৈন্যদলের বিপুল বাহিনীর সর্বত্রই ভীষণ ভাবে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিকে হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-কে তাঁহার সৈন্যগণ বলিল, হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সৈন্যগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে ; তখন তাঁহারা বলিলেন, ■ আলী (কঃ—ওঃ) কিছুতেই মোছলমানদিগের শোণিতপাতে বিরত হইবেন না ? ওদিকে ভীষণ রণ-কোলাহল শুনিয়া ■ আমিরুল মুমেনিনও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্বীয় শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন ; খুঁড় এব্নে ছাবা পূর্ব হইতেই স্বীয় কতিপয় চর সেখানে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, হজরত তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সৈন্যগণ হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আক্ষেপ, ■ তালুহা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ) কিছুতেই শোণিতপাত হইতে বিরত হইলেন না ? এই বলিয়াই সমগ্র সেনাদলকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। প্রকৃত ব্যাপার তখন কিছুতেই প্রকাশ পাইল না। উভয় কর্তৃপক্ষ দলই প্রতিপক্ষের প্রতি ঘোষারোপ করিয়া সমর সাগরে ঝম্প দিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষীয় সমগ্র সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর, একদিকে মহামান্ন আমিরুল মুমেনিন (কঃ—ওঃ) ■ অন্য দিকে হজরত তালুহা (রাজিঃ) ■ হজরত যোবের

(রাজিঃ) ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, কেহ পলায়নমান ~~ব্যক্তি~~ পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিবে না ; কেহ প্রতিপক্ষের 'মাল-আসমাব' গ্রহণ করিতে পারিবে না ; ইহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উভয় দলের দলপতিদিগের মধ্যে কিছুমাত্র মনোবান বিস্তমান ছিল না ; তাঁহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না । উভয় দলের কর্তৃপক্ষই সরলভাবে সন্ধি-বন্ধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন । কপট ও ধূর্ত কুল-চুড়ামণি আবদুল্লা-বিন্-ছাবা ও তাহার দলের লোকেরাই এই সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল । অনেক সরল বিশ্বাসী খাঁটি মোছলমান ও তাহাদের ধোকার পড়িয়া বিপথে পরিচালিত হইয়াছিলেন । ছাবারী দল মোছলমানদিগের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাঁহাদের সর্বনাশ করিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল । তাহার মহামাত্র খলিফাকে সন্তুষ্ট করিবার ~~জন্য~~ তাঁহার আশে-পাশে থাকিয়া খুব বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল । এই সময় কুটিল চুড়ামণি মারওয়ান বিন্-হকম, হজরত তাল্লা (রাজিঃ)-এর যুদ্ধে অনিচ্ছা দর্শনে, কাপড়ে স্বীয় সর্বদা ঢাকিয়া তাঁহার প্রতি একটা বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিলেন ; সেই তীর তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হওয়াতে অজস্র ধারে শোণিতপাত হইতে লাগিল । হজরত কায় কায় বিন্-ওমর (রাজিঃ)-এর অকুরোধে তিনি তাড়াতাড়ি বস্ত্র গমন পূর্বক অত্যন্ত কাল পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন (ইরালিগাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাযেউন) । হজরত তাল্লা (রাজিঃ) আহত অবস্থায় হজরত কায় কায়-বিন্-ওমর (রাজিঃ)—মতান্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এক গোলামের (ক্রীতদাসের) বস্ত্রে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে বস্ত্রোত্তর করিয়াছিলেন । তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ~~বিস্মিত~~ ব্যথিত ~~হইলেন~~ শোকার্ত হইলেন । কারণ তিনি একজন কমতালী প্রধানতম ছাবাবাঃ ~~জন্য~~ তাঁহার একজন সহযোগী এবং বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন । তিনি

তাহার আশ্রয় মকল কামনার খোদা তায়ালায় দরগাহ প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধারম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে কায়াব-বিন্-ছুর, মহামাননীয়া হজরত আরোহণ ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, আপনি একটি উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করুন, আপনাকে দেখিয়া হর উত্তর দলের যোদ্ধাপুরুষগণই যুদ্ধে বিরত হইবে। মোহলেম-মাতা এই প্রস্তাব মনোনীত করিয়া তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে উষ্ট্র পৃষ্ঠে দেখিয়া কোথায় লোকেরা যুদ্ধে বিরত হইবে, তাহা নী হইয়া তাহার অপক্ষীয় যোদ্ধাদল মহাপরাক্রমের সহিত তাহার উষ্ট্রের চতুর্দিক বেঁটন পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রতিপক্ষ দল মনে করিলেন, মোহলেম-মাতা স্বয়ং সেনা পরিচালনা করিতেছেন, সুতরাং তাহার ও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। মোহলেম-মাতার উষ্ট্রের চতুর্দিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভ্রমের উপর ভ্রম হইয়া মোহলমানগণের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল। হজরত যোবের (রাজিঃ) যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া ইতিপূর্বেই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন পূর্বক যুদ্ধে বিরত থাকিলেন। এই অবস্থায় হজরত এমার-বিন্-এরাহর (রাজিঃ) তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও, তিনি কেবলমাত্র আত্ম-রক্ষাই করিতে লাগিলেন। পরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পশ্চিমধ্যে ওমর-বিন্-আল-জরমুয নামক এক ছুরাত্মা তাহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিতে লাগিল। তিনি এক স্থানে নমাজে প্রবৃত্ত হইয়া ছেজদা দিলে, সেই পাশও তাঁহাকে তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। তৎপর সে দৌড়িয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিল; তখন হজরত যোবের (রাজিঃ) এর সেই সর্বজন পরিচিত তরবারি থানি উহার ছিল; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

উহাকে জাহান্নামের স্বসংবাদ (৭) দিয়া, লাভার শোকে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তিনি সেই হত্যাকারী পাষণ্ডকে বলিলেন, রে জালেম, ইহা সেই পবিত্র তরবারি, বাহা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রত্নলোম্বাহ (ছালঃ)- 'হেফযত' করিয়াছিল। হত্যাকারী ওমরু-বিন্-আল জারমুন্ তাঁহার কথা শুনিয়া একপ মনঃক্লান্ত ভীষণভাবে উত্তেজিত হইল যে, সে আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি কতকগুলি অসংযত বাক্য প্রয়োগ করিয়া, সেই তরবারি খানি স্বীয় উদরে প্রবিষ্ট করিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া জাহান্নাম-বাসী হইল।

হজরত তালুহা (রাজিঃ) হজরত যোবের (রাজিঃ) প্রথম হইতেই যুদ্ধে যোগ না দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ; ওম্মোল-মুমেনিনের পক্ষে প্রধান সেনাপতি কেহ ছিলেন না ; ছোট ছোট বলপতি-গণ স্ব স্ব অধীনস্থ সেনাদল লইয়া মহা-মাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-এর পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতে ছিলেন ; তাঁহারা ইহা জানিতেন না যে, এই যুদ্ধে মোহলেম-মাতার সম্মতি আছে কিংবা নাই। বাহা হউক, এই কপটতা মূলক ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ১০ হাজার মোহলমান বীর-পুরুষ শহীদ হইলেন। মোহলমান এই সর্ব প্রথমে মোহলমানের শোণিত-পাত করিয়া, মোহলেম শক্তিকে দুর্বল করিল। একদিকে কেন্দ্রব, চাল-বাজী, দাগাবাজী, মোহলেম-বিদ্বেষ—অন্য দিকে সরল বিশ্বাস, অম-ধারণা, অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন একত্রিত হইয়া এই মহা অনর্থের শূত্রপাত করিল। একদিকে আবদুল্লা-বিন্-ছাবা, অন্য দিকে মারওয়ান-বিন্-হকম—এই অনর্থ-পাতের সর্ব প্রধান পাণ্ডা ছিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সেনাপতির পদ গ্রহণ পূর্বক স্বীয় বিজ্ঞান সেনাদল পরিচালিত করিতে ছিলেন। তদীর ভীষণ আক্রমণে "আহ লে-জমল" পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। ওম্মোল মুমেনিনের উদ্ভের 'মহার' (লাগাম স্বরূপ দড়ি) হজরত কাহাব

(রাজি:)-এর [] ছিল ; তিনি সঙ্ক্ষেপ-প্রণোদিত হইয়া মোছলেম-
[] উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ছিলেন,
কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইল । অবস্থা সাম্বাতিক দেখিয়া ওম্মোল
মুয়েনিন, (রা:—আ:), [] কারাব (রাজি:)-কে বলিলেন,
তুমি উষ্ট্রের রজ্জু ছাড়িয়া দিয়া, লোকদিগকে কোরআন মজীদে
আদেশ পালন এবং এই অম্ভায় শোণিতপাত বন্ধ করিবার জন্য আহ্বান
কর । হজরত কারাব (রাজি:) ঐ আদেশানুযায়ী কার্য করিলে,
এবনে ছাবার দল তাঁহার প্রতি এমন অজস্র ধারায় তীর বর্ষণ করিতে
লাগিল যে, তিনি সেই স্থানেই শহীদ হইলেন । অতঃপর যুদ্ধ ভীষণ
হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল । বশার বীরগণ ওম্মোল মুয়েনিনের উষ্ট্র
রক্ষার্থ মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; ঐ উষ্ট্রই যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । চতুর্দিক হইতে ঐ উষ্ট্রের উপর অজস্র ধারায় তীর
বর্ষণ হইতেছিল ; মোছলেম-মাতা (রা:—আ:), হজরত ওছমান (রাজি:)-
এর হত্যাকারীদিগকে ‘বদ মোওরা’ (অভিসম্পাত করিতে ছিলেন । উষ্ট্রের
চতুর্দিকে যুদ্ধদেহের ঢেড়ি লাগিয়া গিয়াছিল । হজরত আবদুল্লা-বিন্-
যোবের (রাজি:) ■ খুঁত চুড়ামণি মারওয়ান বিন্-হকম সাম্বাতিক রূপে
আহত হইলেন । আবদুর রহমান-বিন্-য়েতাব, যযব-বিন্-যহর,
আবদুল্লা-বিন্-হকীম (রাজি:) প্রভৃতি খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ []
রক্ষা করিতে গিয়া শহীদ হইলেন । উভয় প্রতিপক্ষ দল এমন তীব্র
ভেজে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছিলেন যে, সে বীরদের তুলনা [] না ।
উভয় পক্ষের এই ৫০ হাজার মহাপরাক্রান্ত বোদ্ধপুরুষ সমগ্র পৃথিবী জয়
করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল । অবশেষে ওম্মোল মুয়েনিন (রা:—আ:)
[] এই উষ্ট্রটিকেই সকল অনর্থের মূল জানিয়া, হজরত আলী (ক:—ও:)
[] পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি উহার পায়ে ভীষণ তরবারির আঘাত করাতে,

উট্টী বৃক্কের উপর ভর করিয়া আর্জনাঙ্গের সহিত ভূতলে পতিত হইল । আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর আদেশে মোহাম্মদ বিন্-আবিবকর (রাজিঃ) তাঁহার ভগিনীকে পরদা করিয়া হেফাযতের জন্য অগ্রসর হইলেন ; হজরত এমার-বিন্-এরাছর (রাজিঃ), হজরত কায় কায় বিন্-ওমর (রাজিঃ), ‘কাজোরা’ (উষ্ট্রের হাওদাঃ) উঠাইয়া, শব-স্তূপের নিকট হইতে সরাইয়া দূরে লইয়া গেলেন । ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আসিয়া ওম্মোল-মুমেনিন (রাঃ—আঃ)-কে ছালাম জানাইলেন । উভয়ে উভয়কে “খোদা আপনার তুল-জাতি মার্জনা করুন ” বলিয়া দোওয়া করিলেন । অতঃপর বিভিন্ন সেনাপতি ও দলপতিগণ আসিয়া ওম্মোল-মুমেনিন কে ছালাম করিলেন ; তিনি বলিলেন, এই ঘটনার ২০ বৎসর পূর্বে আমার মৃত্যু ঘটিলেই ভাল হইত । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এই কথার পুনরুক্তি বা প্রতিধ্বনি করিলেন ।

এই যুদ্ধ “জদে-জমল ” বা “উষ্ট্রের যুদ্ধ ” বলিয়া অভিহিত হইবার কারণ এই যে, মোছলেম-মাতা হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) যে উট্টীর উপর ‘ছওয়ার’ (আরুঢ়) ছিলেন, ঐ উষ্ট্রই যুদ্ধের কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল । এই যুদ্ধে হজরত মোছলেম-মাতার পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ; তাঁহাদের অধিকাংশ বঙ্গাবাসী ; ইহাদের মধ্যে ৯ হাজার সৈন্য এই তীর্থণ আহবে শহীদ হন । আর খলিফা মহামান্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার, তন্মধ্যে ১ হাজার ১০ শহীদ হইয়াছিলেন । যুদ্ধান্তে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ), উভয় পক্ষের শহীদ বীরপুরুষ দিগের জানাধার নমাজ পড়িয়া, যথা-নিয়মে তাঁহাদিগের দফন কার্য সম্পন্ন করিলেন । শিবির সমূহে ও যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল ‘মাল-আছবাব’ পড়িয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি স্ব স্ব মাল-আছবাব চিনিতে পারে,

তাহারা তাহা লইয়া বাউক । মহামাননীরা ওম্মোল মুমেনিনকে প্রথমে
 বসায়, পরে মোহাম্মদ-বিন-আদুবকর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে, ৪০ জন বসী
 বাসিনী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সজিনী করিয়া মকা-মোয়াজ্জমার পাঠাইয়া দিলেন ।
 তিনি স্বীয় ভগিনী-পুত্র, গুরুতর রূপে আহত আবদুল্লা-বিন-যোবের
 (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন । মহামান্ন খলিফা তাঁহার
 প্রতি বখোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক, তাঁহার সর্বপ্রকার স্বথ-স্বচ্ছন্দে
 সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তদীয় গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দিলেন । হজরত আলী
 (কঃ—ওঃ) বসী নগরে প্রবেশ করিলে বসীবাসিগণ পরম ভক্তি সহকারে
 তাঁহার হস্তে বারুয়েত করিলেন । বসীর “ বয়তুল মাল ” ভাণ্ডারে
 যে অর্থ পাইলেন, তাহা খদলহ যোদ্ধাপুরুষদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া
 দিলেন ; প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ ৫০০ পাচ শত দরম করিয়া পাইয়াছিল ।
 এই সময় তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, যদি তোমরা শাম [সিরিয়া)
 করিতে পার, তবে নির্দিষ্ট বেতন ব্যতীত আরও ঐ পরিমাণ অর্থ
 তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে । আবদুল্লা-বিন-ছাবার দল এত দিন হজরত
 আলী (কঃ—ওঃ)-এর “ জান-নেছার ” (উৎসর্গীত প্রাণ) বলিয়া
 আপনাদিগকে পরিচিত করিত ; কিন্তু এক্ষণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-
 এর প্রতি প্রকাশ্যভাবে নানাপ্রকার দোষারোপ করিতে লাগিল । ইহাদের
 প্রকট মূর্তি এই সময় প্রকাশ হইয়া পড়িল । বসীবাসীদিগের মাল-
 আসবাব লুণ্ঠন করিতে নিষেধ করাতে, মহামান্ন খলিফার প্রতি তাহাদের
 আরও রাগের কারণ হইল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইহাদিগকে
 নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়াও সুপথে আনয়ন করিতে পারিলেন না,
 ইহাদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠিল । উহারা মহামান্ন খলিফার বিশাল
 সেনাদলকে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা দ্বারা প্ররোচিত করিয়া বিগ্‌ড়াইতে
 লাগিল । অবশেষে একদা নিশীথ কালে এই দুর্বৃত্ত দল গোপনে বসী

হইতে চলিয়া গেল। আলী (কঃ—ওঃ) ইহাদের সংবাদ জানিতে পারিয়া, উহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য একদল বৌদ্ধপুরুষ পাঠাইলেন ; কিন্তু তাহারা ধরা পড়িল না। এই দলের ভগ্নাবশেষ হইতে উত্তরকালে “ খারেজী ”, “ কেদাওী ”, “ এছমাইলী ” প্রভৃতি বিপ্লববাদী দলের সৃষ্টি হয়। বাহা ইউক, ছাবারী দল পারস্যের সুবা ছবস্তানে গিয়া আড্ডা জমাইল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইহাদের দমন প্রথমতঃ আবদুর রহমান-বিন্-যয়েন তারীর অধীনে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য পাঠাইলেন ; ছাবারিগণের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও শহীদ হইলেন ; ব্যাপার দেখিয়া মহামাত্র খলিফা রবিয়-বিন্-কাস নামক সেনাপতির অধীনে হাজার বিক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন ; ইহারা এই দুর্বৃত্ত ভবঘুরে দলকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। এদিকে মহামাত্র খলিফা শামের শাসনকর্তা হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার মহাভয়ে সমর-সজ্জা করিতে লাগিলেন ; এই যিহাদী সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন ভণ্ডদল, মোছলমানদিগের সর্বনাশ সাধন গুণ্ডাভাবে—ছদ্মবেশে মহামাত্র খলিফার সেনাদলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কুফার

রাজধানী স্থাপন।

জমল যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, মহামাত্র আমিরুল মুমেনিন, মাবিয়া (রাজিঃ)-কে দমন পূর্বক শামে (সিরিয়ার) স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন জন্য চেষ্টার প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় মোছলেম-খেলাফতধীন ৪ স্থানে;

মোহলমান সামরিক পুরুষদিগের প্রধান আড্ডা ছিল; ১ম শায; ২। কুফা, ৩। বঙ্গা, ৪ মেহের। শেখোক্তা স্থানের উপর মহামান্ত আমিরুল মুমেনিনের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। মোর্টের উপর সমগ্র আরব, এরাক, পারস্ত ও মেহের হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফতের অধীন হইরাছিল; ওদিকে এসিরা মাইনরের সীমা পর্যন্ত বিশাল শাম দেশ আমীর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর প্রাধান্ত স্বীকার করিত।

মাবিয়া (রাজিঃ), সুদক্ষ রাজনীতিক ও কুট বুজি সম্পন্ন সূচত্বর ও সুদক্ষ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সামরিক শক্তি প্রবল হইলেও, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম ছিলেন না। কুফা নগরী বিশাল খেলাফত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উহার উত্তরে সমগ্র আরব দেশ, পূর্বদিকে পারস্ত দেশ, উত্তর দিকে শাম (সিরিয়া) ■ পশ্চিমে মেহের ও আফ্রিকার অন্যান্য নব-বিজিত প্রদেশ; আর কুফা পরাজিত যোদ্ধাপুরুষদিগের লীলা-নিকেতন, সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই মহানগরীতেই স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই রাজধানী নির্বাচনে তিনি যে বিশেষ মূরদর্শিতা ■ বুद्धিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি স্বীয় পিতৃব্য-পুত্র ■ পরম হিতৈষী, মহা বিদ্বান্ হাদীছ-বিদ হজরত আবদুল্লা-বিন্ আব্বাহ (রাজিঃ)-কে বঙ্গার শাসনকর্তা—রাজপ্রতিনিধি বা গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিলেন।

মোনাফেক বা কপটাচারী ছাবায়ী দল ■ ছিলই, তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক সাদা-সিদে খাঁটি মোহলমান ও তাহাদের ধোকসে পড়িয়া ছিলেন; সুতরাং তাহাদের বেশ দলপুষ্টি হইরাছিল। সরল বিশ্বাসী মোহলমানগণ ছাবায়ী দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতেন না; তাহারা তাহা তাঁহাদিগকে জানিতেও দিত না। কিন্তু তাহারা ইসলামের ভিত্তি বুড়িয়া

কেল্লিবার আগ্রাণ চেষ্টা করিত। দুঃখের বিষয়, মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের পরম ও অমূল্য মহাবীর মালেক আশুতর ও তাহাদের ধোকার পড়িয়া গিয়াছিলেন।

হজরত মোহাম্মাদ-বিনু-আবিবকর (রাজিঃ)-এর মেহেরের শাসনকর্তৃত্ব লাভ ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খলিফা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অতি হুচতুর এবং ধুরন্ধর বীরপুরুষ করেছ-বিনু-ছারাদ (রাজিঃ)-কে মেহেরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি ৭ মাস বীরপুরুষ সঙ্গে লইয়া মেহেরের গমন পূর্বক, মোহাম্মাদ-বিনু-আবি হোবারফাঃ কে পদচ্যুত করিয়া, তৎকাল শাসনকর্ত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেহেরে এবিদ-বিনু-আল ইয়ছ, মোহলেনা-বিনু-খলদ-প্রমুখ কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, হজরত ওছমান (রাজিঃ) হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী করিতেন। তাঁহারা করেছ-বিনু-ছাদ (রাজিঃ)-এর হস্তে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে বার্ষিক করিতে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, আপনি অপেক্ষা করুন, আমরা দেখি, ৩য় খলিফার অন্যান্য হত্যাকাণ্ড কি মীমাংসা হয়। যখন এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে, তখন আমরা বার্ষিক করিব। অথচ যে পর্য্যন্ত বার্ষিক না করি, চুপ করিয়া থাকিব, আপনার কোনও রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিব না। করেস্-বিনু ছারাদ (রাজিঃ) এ তাঁহাদের নিকট হইতে বার্ষিক গ্রহণার্থ কোনও রূপ বাড়াবাড়ি করিলেন না; কিন্তু স্বীয় ‘আখলাক’ (সৌজন্য) ও যোগ্যতা প্রভাবে মেহেরে বিশেষ রূপ শক্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার প্রভাব শাসন-কর্ত্ত্ব সেখানে বেশ বহুমূল হইল।

জয়ল যুদ্ধ শেষ হইলে হুসরুজা মাঝিয়া (রাজিঃ) বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ; তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, হুসরুজা আলী (কঃ—ওঃ) এইবার আমাকে আক্রমণ করিবেন । তাঁহার অসাধারণ শৌর্য-বীৰ্য ও অমাহুষিক বীরত্বের বিষয় তাঁহার অবিদিত ছিল না । আবার কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ)-এর দ্বারা একজন উপযুক্ত ও শক্তিশালী শাসনকর্তা এবং অসাধারণ বীরপুরুষ মেছেরে বিদ্যমান থাকিতে, ভয়ের কারণ আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল । কিন্তু কতকগুলি ঘটনা এমন ঘটিল, যাহাতে লোকের মঙ্গল ও সন্দেহ-বশে হুসরুজা আলী (কঃ—ওঃ), কয়েছ-বিন্-ছায়াদে প্রতি সন্দেহান হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত, ■ সেই স্থলে মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ)-কে মেছেরের মহাদায়িত্বপূর্ণ শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন । এই কার্যের এমন শোচনীয় ফল হইল যে, মহামানব আমিরুল মুমেনিন ■ আলী (কঃ—ওঃ)-এর মহা শ্রবোগ নষ্ট হইল—যদ্বারা হুসরুজা মাঝিয়া (রাজিঃ) বিশেষ রূপে আপনার সুবিধা করিয়া লইলেন । মেছেরের দিক হইতে আক্রমণের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইল । হুসরুজা কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ)-কে হস্তগত করিবার ■ হুসরুজা মাঝিয়া (রাজিঃ) বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না ; তিনি যদীনায় উপস্থিত হইলে শঠ-চুড়ামণি মারওয়ান-বিন্-হকম নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে ■ মাঝিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষাবলম্বী করিতে চেষ্টা পাইলেন ; তিনি অবশেষে বিরক্ত হইয়া কুফার হুসরুজা আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে চলিয়া গেলেন ; এবং ■ সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচরীভূত করিলে তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহাকে স্বীয় পারিষদ বা মন্ত্রণা-দাতা রূপে নিজের কাছে রাখিলেন । হুসরুজা মাঝিয়া (রাজিঃ) এই সংবাদ শুনিয়া মারওয়ান-বিন্-হকমকে লিখিলেন “ তুমি একলক্ষ সৈন্য দ্বারা (হুসরুজা) আলী (রাজিঃ)-এর

সাহায্য করিলে যে ক্ষতি হইত না, (হজরত) কয়েম্-বিন্-ছারাদ (রাজিঃ) তাঁহার নিকট চলিয়া যাওয়াতে সেই ক্ষতি হইল । ”

হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) মেহেরের শাসন-কর্ত্ত্ব গ্রহণ করিয়াই, যে সকল লোক এতাবৎ কাল হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে বার্ষিক করিয়াছিল না ; তাহাদিগকে বার্ষিক করিবার খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন ; তিনি তরুণ বয়স্ক যুবক ছিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ■ পরিণামদর্শী ছিলেন না । তাঁহার এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে নিরপেক্ষ লোকেরা বিরক্ত হইয়া ■■■■■ হইল । তাহারা শাসনকর্ত্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল । তাহাদের সংখ্যা এবং প্রভাব ■ মেহেরে বড় কম ছিল না । বাহা হউক, হজরত মোহাম্মদ (রাজিঃ), ছিদ্দিক যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উপর খুব নারাজ থাকিলেন ।

হজরত ওমর বিনন্ আহ (রাজিঃ) দামেস্কে ।

হজরত ওমর বিনন্ আহ (রাজিঃ) একজন প্রধান ছাহাবাঃ, মহাবীর পুরুষ এবং মেহের-বিজিতা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ । তিনি যেমন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদর্শী—তেমনই রাজনীতি বিশারদ ছিলেন । যখন বিপ্লব-বাদিগণ খলিফা ■■■■■ ওছমান (রাজিঃ)-এর গ্রহ অবরোধ করে, তখন তিনি মদীনার উপস্থিত ছিলেন ; তিনি মদীনার অবস্থা বিপ্লবজনক ও বিপদজনক দেখিয়া, দুই পুত্র আবতুল্লা ও মোহাম্মদ কে সঙ্গে লইয়া বরতুল-মোকদ্দছে চলিয়া গেলেন । তিনি সেখানে থাকিয়াই খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদত-সংবাদ পাইলেন ; তৎপর ■■■■■ আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফৎ গ্রহণের সংবাদ, কিছুদিন পরে জঙ্গ-জমৎ,

আলী (কঃ—ওঃ) কতৃক বশা অধিকার, তথায় আবদুল্লা-
বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ) কে শাসনকর্তা নিযুক্ত, মাবিয়া (রাজিঃ)
কতৃক হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের
দাবী, হজরত আলী (রাজিঃ)-এর নামে বার্ষিক করিতে অস্বীকৃতি
প্রভৃতি ঘটনার সংবাদ ক্রমান্বয়ে পাইলেন । এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য,
পুত্রদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন ; পুত্র আবদুল্লা বলিলেন,
এই আপনি গোলযোগের সময় নিরপেক্ষ ভাবে এই স্থানেই অবস্থান করুন ।
শেষে সর্ববাদী সম্মত রূপে যখন কেহ খলিফা নিযুক্ত হইবেন, তখন আপনি
কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই ঠিক কার্য হইবে ; অন্য পুত্র মোহাম্মদ বলি-
লেন, আপনি একজন ক্ষমতাশালী, বিচক্ষণ, মহাবীরপুরুষ এবং প্রধানতম
ছাহাবাঃ, আপনি এই বিপ্লবের সময় নীরব থাকিলে চলিবে কেন ? তিনি
উভয় পুত্রের বক্তব্য ও যুক্তিবাদ শুনিয়া বলিলেন, আবদুল্লার পরামর্শ
পরকালের জন্য মঙ্গল জনক, আর মোহাম্মদের পরামর্শ ইহকালের জন্য
হিতকর । ইহার পর তিনি আরও কিছুকাল চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির
করিলেন ; দীনের উপর ছুনিয়ার জয় হইল ; এত বড় একজন ছাহাবাঃ
শৌভ-এবং পার্থিব মায়াজালে আবদ্ধ হইলেন । পার্থিব ‘শান-শওকত’
ছুনিয়ার উন্নতির দিকেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল ; তিনি মাবিয়া
(রাজিঃ)-এর পক্ষাবলম্বন করাই প্রেরণ মনে করিলেন ; তদনুসারে অবিলম্বে
বয়স্কুল মোকদ্দমের নির্জন বাস পরিত্যাগ পূর্বক, পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া
দামেস্কে—হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন ;
তিনি মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন । তাঁহার
ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী, রাজনীতিজ্ঞ মহাবীর পুরুষকে লাভ করিয়া
হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) খুব আনন্দিত হইলেন । সকল বিষয়ে তাঁহার
পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন । অবশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী

প্রদান পূর্বক গৌরবারিত করিলেন । ইতিপূর্বে খলিফা হজরত ওহ্মান (রাজিঃ)-এর শোণিতাক্ত কামিজ ও হজরত লায়লাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কর্তিত অঙ্গুলী প্রত্যহ সাধারণকে দেখান হইতে ; হজরত ওমর-বিন-আছ (রাজিঃ) বলিলেন, ওরূপ করিলে লোকের উদ্বেজনা ক্রমশঃ হ্রাস হইবে, সুতরাং উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ; তাহাই হইল । তিনি হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-কে একথাও বুঝাইয়া দিলেন যে, জঙ্গ-জমলের পরে হজরত আলী (রাজিঃ)-এর সামরিক শক্তি হ্রাস পাইয়াছে ; কারণ, ঐ যুদ্ধে প্রায় ১০ হাজার যোদ্ধা পুরুষ নিহত হইয়াছে ; তন্মধ্যে অনেক বড় বড় দলপতি, নেতা এবং খ্যাতনামা বীর পুরুষও ছিলেন । তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে সকলে একমতাবলম্বী ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নহে ।

ছফিন যুদ্ধ ।

আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কুফায় আগমন পূর্বক, সিরিয়া আক্রমণের জন্য বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । হজরত আবদুল্লা-বিন্ আব্বাছ (রাজিঃ)-কে বশায় শাসনকর্তৃত্ব পদ প্রদান পূর্বক বলিয়া আসিয়াছিলেন, তুমি বশায় একজন যোগ্য প্রতিনিধি নিয়োজিত করিয়া, উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক সত্বরে আমার নিকট উপস্থিত হইবে । তদনুসারে তিনি বশায় উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে কুফাতিমুখে যাত্রা করিলেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

ও পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া আবু মসউদ আনছারী (রাজিঃ)-কে কুফার স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, স্বকীয় বিক্রান্ত সৈন্যদল লইয়া “তখলিয়া” অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উভয় সেনাদল তথায় উপস্থিত হইলে, সৈন্যদ্বিগকে গণনা করা হইল, এবং মহাবীর যেমাদ-বিন-নছর হারসিকে ৮০০০ সৈন্যসহ “মকদমাতুল-জরেশ” (অগ্রগামী সেনাদল) রূপে সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অন্ততম দীৰপুরুষ সরিহ-বিন-হানিফকে ৪০০০ সৈন্যসহ অগ্রগামী হইতে আদেশ করিলেন। আর স্বয়ং পারস্ত সম্রাটের রাজধানী মদায়েনে পঁছছিয়া, মোকল-বিন-কয়েছকে ৩০০০ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। -আমিরুল মুমেনিন রোকার নিকট “ফোরাত” (ইউফ্রেটেস্) নদী পার হইলেন। এই স্থানে পূর্ব প্রেরিত সেনাপতি ত্রয় সসৈন্তে একত্রিত হইয়াছিলেন। ওদিকে হজরত মাযিয়া (রাজিঃ) যখন সংবাদ পাইলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিরাট সেনাদল লইয়া সিরিয়াভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তিনি আবু-আলা য়োর ছলমির নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্য, অগ্রগামী সৈন্যরূপে পাঠাইলেন। অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), মহাবীর মালেক আশ্-তরকে অগ্রগামী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া সিরিয়াভিমুখে পাঠাইলেন। তাঁহারা যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, আবু-আলা য়োর ছলমিও সসৈন্তে তাঁহাদের সম্মুখে ডেরা-তাষু ফেলিলেন।

মহামান্ন আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মালেক আশ্-তর-প্রমুখ সেনাপতিগণকে অগ্রে শত্রু সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই উপদেশানুসারেই শত্রুদলকে প্রথমে আক্রমণ করেন নাই; কিন্তু হজরত মাযিয়ার অগ্রগামী সেনাদলের সেনাপতি আবু আলা য়োর ছলমি ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ই কুফা ও বস্তার সম্মিলিত সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই উভয়

পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল । দ্বিতীয় দিবস সিরীয় সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রতিদ্বন্দী যোদ্ধা আহ্বান করিলেন ; তদনুসারে মহামানু খলিফার সেনাদল হইতে হাশেম-বিন্-যোতবাঃ তাঁহার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । আছরের নমাজের সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বীর-বিক্রমে আক্রমণ করিয়া, কেহ কাহাকে হারাইতে পারিলেন না । অগত্য উভয়ে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই সময় মহাবীর মালেক আশ্-তর, স্বীয় সৈন্য দলকে শত্রু সেনাদল আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন ; তদনুসারে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল । রাত্রি সমাপ্ত হইলে উভয় সৈন্য দল যুদ্ধে বিরত হইল । পরদিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মূল সৈন্যদল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ; ওদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) ৩৪ তাঁহার বিশাল সেনাদল লইয়া অগ্রগমন পূর্বক ফোয়াত নদীর তট অবরোধ করিলেন । সুতরাং মহামানু খলিফার সৈন্যগণের পক্ষে মহাবিপদ উপস্থিত হইল । অনেক কণা কাটাকাটির পর, হজরত ওমর-বিনল্-আছ (রাজিঃ)-এর পরামর্শানুসারে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এর পক্ষ হইতে নদী তটের অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইল । অতঃপর ৩৬ হিজরীর ১লা বেলহজ্জ তারিখে হজরত আলী (কঃ—ওঃ), বশির-বিন্-ওমর (রাজিঃ), রয়ীন মহছেন আনহারী, ছয়ীদ-বিন্-কয়েছ এবং শবত-বিন্-রবয়ী এতিমি দ্বারা গঠিত এক ‘ওফর’ হজরত মাবিয়াঃ (রাজিঃ) সমীপে প্রেরণ করিলেন ; তাঁহারা গিয়া হজরত মাবিয়াঃ (রাজিঃ)-কে অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদ্ভব হইল না । হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে এই দূত দলের খুব কচম্বা হইল ; অগত্যা তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

হুফিন যুদ্ধের প্রথম ভাগ ।

যখন সন্ধি ও মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না, তখন উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল । প্রথম প্রথম যুদ্ধ তেমন প্রবল আকার ধারণ করিল না । ইহা কাকেরের সঙ্গে মোছলমানের যুদ্ধ নয় যে, মোছলমানগণ বীরজয়ের পূর্ণ 'জওহর' দেখাইবেন । উভয় দলেই ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ বিদ্যমান ছিলেন ; কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে তাঁহাদের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল ।

বুধবার দিন প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয় ; এই দিন মহামান্ন আমিরুল মুমেনিনের পক্ষে মহাবীর মালেক আশ্‌তর এক দল পরাক্রান্ত সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে জব্বের-বিন্-মোছলেমাঃ কে রণক্ষেত্রে পাঠান হইল ; সারাদিন উভয় দলে যুদ্ধ হইল ; সন্ধ্যার সময় উভয় প্রতিপক্ষ সেনাদল স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল ।

দ্বিতীয় দিন (বৃহস্পতিবারে) মহামান্ন খলিফা, হজরত হাশেম-বিন্-ওতবাঃ যহরী (রাজিঃ)-কে প্রধান সেনাপতি রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন, ইনি পারশ্ব-বিজ্ঞতা হজরত ছাফাদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ)-এর ভ্রাতা । ইনিও একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন । এরমূলের ভীষণ যুদ্ধে ইহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল । হজরত মাযিয়া (রাজিঃ), তাঁহার বিরুদ্ধে ছোফিয়ান-বিন্-অওফ্‌কে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন । দিবা অবসান কাল পর্য্যন্ত উভয় দলে যুদ্ধ চলিল ।

তৃতীয় দিবস (জুমার দিন) প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ)-কে বদর যুদ্ধে উপস্থিত মহাজেরিন ও আনছারদিগের সেনাপতি পদে বরিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাযিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমর-বিন্-আছ (রাজিঃ)-কে সেনাপতি

করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন । জুমার নামাজের পূর্ব সময় পর্য্যন্ত উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল ; পরে উভয় পক্ষীয় সেনাদল স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল ।

চতুর্থ দিন (শনিবার) মহামান্ন আমিরুল মুমেনিন স্বীয় বীরপুত্র তরুণ যুবক মোহাম্মদ-বিনল-হানিফা কে সেনাপতি করিয়া বিপুল সেনাদলসহ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাযিয়া (রাজিঃ), ওবায়দুল্লাহ-বিন-ওমর (রাজিঃ)-কে সেনাপতি করিয়া বহু সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন, সারাদিন তীষণ যুদ্ধের পর সন্ধ্যার সময় উভয় সেনাদল শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল ।

৫ম দিন (রবিবারে) মহামান্ন খলিফা স্বীয় পিতৃব্যপুত্র হজরত আবদুল্লাহ-বিন-আব্বাহ (রাজিঃ)-কে যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাযিয়া (রাজিঃ), অলিদ-বিন-ওক্বাকে প্রধান সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন ; এই বেআদব লোকটা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বনি-হাশেম ও ছায়দাত (ছৈয়দ) দিগকে গালি দিতে লাগিল ; তখন হজরত এব্নে আব্বাহ (রাজিঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, রে ছক্-ওয়ান ! এস, একবার আমার সম্মুখে আসিয়া বনি-হাশেমের বীরত্ব স্বচক্ষে দেখ । ওত্-বা তয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিল না ; সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তীষণ যুদ্ধ চলিল ।

৬ষ্ঠ দিবস (সোমবারে) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষ হইতে ময়ীদ-বিন-কয়েস্-হামদানী প্রধান সেনাপতি রূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার বিরুদ্ধে হজরত মাযিয়া (রাজিঃ), মহাবীর যোলকালাহ হামিরীকে পাঠাইলেন । সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তীব্রভাবে যুদ্ধ চলিল ; এই দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছিল ; সন্ধ্যা সমাগমে উভয় সেনাদল রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল ।

৭ম দিবস (মঙ্গলবারে) মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, মহাবীর মালেক আশ্‌তরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি রূপে প্রেরণ করিলেন । হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে জনদীব-বিন্-ছলনাঃ ফহরীকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন ; উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ হইয়া সন্ধ্যার সময় এই যুদ্ধের বিরাম হইল ।

৮ম দিবস (বুধবারে) এমামুল মোছলেমিন হজরত আলী করমুল্লাহে ওয়াজ্জহ, স্বয়ং আছহাবে বদর (যে সকল মহামাননীয় ছাহাবাঃ বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন), মহাজের ও আনছার বীরপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীম পরাক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । ওদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) ও স্বীয় পরাক্রান্ত সিরীয় বীরদিগকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন । সন্ধ্যার সময় উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে বিরত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । অশ্রুকার মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু বীরপুরুষ হত এবং আহত হইয়াছিল ।

৯ম দিবসে (বৃহস্পতিবারে) একদিকে মহামান্য আমিরুল মুমেনিন ও অন্যদিকে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) স্ব স্ব পক্ষীয় বীরপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । উভয় পক্ষে বহু মোছলমান হত এবং আহত হইলেন । অশ্রুকার যুদ্ধে মহামান্য খলিফার পক্ষে ঋষিকল্প প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ ও বীর-পুরুষ হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) শহীদ হইলেন (ইমালিল্লাহে ওয়া ইয়া এসায়হে রাযেউন) । তাঁহার বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শোকাক্ত হৃদয়ে তাঁহার জানাযার নমাজ পড়িলেন । হজরত বেলাল (রাজিঃ) তাঁহাকে গোছল দেওয়াইয়াছিলেন । ৩৭ হিজরীতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল ।

হজরত এমার বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) প্রাথমিক ছাহাবাঃ দিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ও “ আহ্‌লে বদরের ” মধ্যে একজন ছিলেন ।

আ হজরত (ছালঃ) একদা তাঁহার সখকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে,
 “ হে ছমিতার পুত্র ! তোমাকে এক বিদ্রোহী সম্প্রদায় ‘কতল’ (হত্যা)
 করিবে । ” এই হাদীস ও ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,
 আনিসুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) হক পথে ছিলেন ; আর
 হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) অন্তায় ভাবে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন ।

এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ
 লিখিবার প্রয়োজন হয় ; এই সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না ।
 ৩৬ হিজরীর জেলহজ্জ মাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বিরাম হইল ।
 ৩৭ হিজরীর মোহররম মাসে যুদ্ধ স্থগিত হইল । এই যুদ্ধ বিরামের অবস্থায়
 উভয় দলের সৈন্য ও সেনাপতি এবং ছরদারগণ যুদ্ধের অপকারিতা বুঝিয়া
 সন্ধির জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন । কিন্তু ধূর্ত-কপট ও মোসলেম-বিষেধী
 ছাবায়ী দল যুদ্ধ জারী রাখিবার জন্ত একান্ত আগ্রহান্বিত ছিল বলিয়া,
 উভয় দলে গুপ্তচর প্রেরণ পূর্বক লোকদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত
 ও উত্তেজিত করিতে লাগিল । যাহা হউক, এই মোহররম মাসেই
 হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একদল উপযুক্ত দূত, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-
 এর নিকট পাঠাইলেন । কিন্তু তিনি যে লম্বা-চওড়া বোল ও দাবী
 উপস্থিত করিলেন, এবং দূত দলের সঙ্গে অসঙ্গত তর্ক-বিতর্ক আবৃত্তি
 করিলেন, তাহাতে তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য
 হইলেন । ইহার পর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) একদল দূত পাঠাইলেন ।
 তাঁহারা আসিয়া যেরূপ দাস্তিকতার সঙ্গে অসঙ্গত দাবী উত্থাপিত করিলেন,
 তাহাতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ওজস্বিনী ভাষায়
 খেলাফতের আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা পূর্বক, একটি বক্তৃতা প্রদান
 করিলেন । দূত দলের প্রধান দাবী ছিল, যাহারা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-
 এর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, তাহাদিগকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিতে

হইবে, আর আপনি খেলাফৎ পরিত্যাগ করিবেন ; মোছলমানগণ আপনাদের পক্ষ হইতে নূতন ভাবে খলিফা নির্বাচন করিয়া লইবে । অবশেষে মহামান্ন আমিরুল মুমেনিন স্বীয় বন্ধু ও পারিষদদিগকে বলিলেন, ইহাদিগকে উপদেশ দান করা ও না করা উভয়ই সমান । ইহাদের উপর তাহাতে কোনও ক্রিয়া হইবে না । সন্ধি সহজে ইহাই শেষ প্রচেষ্টা ছিল ।

ছকিন যুদ্ধের আর এক সপ্তাহ ।

৩৭ হিজরী, মোহাররম মাসের শেষ তারিখে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় সেনাদলের প্রতি এই হুকুম জারী করিলেন যে, আগামী কল্য উত্তর দলে শেষ মীমাংসা-সূচক যুদ্ধারম্ভ হইবে । তদনুসারে ১লা ছফর তারিখ প্রাতঃকাল হইতে উত্তর দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । এই যুদ্ধ ৭ দিন-কাল স্থায়ী ছিল । প্রত্যেক দিন উত্তর পক্ষের বিভিন্ন সেনাপতি সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন । এই যুদ্ধে আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে ২০ হাজার ও হজরত মাবিয়ার পক্ষে ৮০ হাজার সৈন্য ছিল । পূর্ববর্তী যুদ্ধ সমূহে এবং এই এক সপ্তাহের যুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর শামী সৈন্যদলই অধিক পরিমাণে সমরশায়ী হইয়াছিল । যদি এই সময় মেছেরে কয়েছ-বিন্-ছারাদ (রাজিঃ) কিংবা ঐরূপ কোনও উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত থাকিতেন, এবং একদল প্রবল মেছেরী সৈন্যসহ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে পশ্চাদিক্ হইতে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিতেন, কিংবা উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য-সামন্ত শূন্য রাজধানী দামেস্কই আক্রমণ করিয়া বসিতেন, তবে অতি সহজেই এই মহা যুদ্ধের অবসান হইত । কিন্তু মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ)-এর স্ত্রীর তরুণ বয়স্ক অপরিণামদর্শী যুবক শাসনকর্তার নিকট সেরূপ হইবার কোন আশাই ছিল না । তিনি

পূর্বে হইতেই প্রবল এক দল মেহেরবাসীকে বিগ্‌ড়াইয়া লইয়াছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে মেহের হইতে স্বানাস্তরে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল না ।

ছকিন যুদ্ধের শেষ দুই দিন মহাসংহার কার্য ।

পূর্বোক্ত ৭ দিন যুদ্ধ চলিবার পর ৩৭ হিজরীর ৮ই ছফর বৃহস্পতিবার দিবস উভয় প্রতিপক্ষ সেনাদল একটা শেষ গীমাংসা-সূচক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল । তদনুসারে বুধবার দিবাগত বৃহস্পতিবার রাত্ৰিকালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত হইতেছিল । বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে ফজরের নমাজ পড়িয়া আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) অতি ভীষণ ভাবে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর শামী (সিরীয়) সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন । এই যুদ্ধ এমন ভীষণ ভাবে চলিতে লাগিল যে, যাহার কোন তুলনা হয় না । উভয় পক্ষের কৈদায়ী (জীবনোৎসর্গার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) সৈন্য ■ সেনাপতিগণ এমন ভীষণ ভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন যে, প্রাণের মার্যা কেহই করিলেন না । উভয় পক্ষেই ক্রম পরাজয় পর্যায়ক্রমে ঘটিতে লাগিল । মায়লাতুল হরির যুদ্ধের একটা স্বর্ণীয় ঘটনা এই যে, একদা ১০ হাজার বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর শিবির পর্য্যন্ত পহুছিলেন, এবং হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মাবিয়া (রাজিঃ), অনর্থক মোছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া কোন ফল নাই ; তুমি শিবির হইতে বাহির হইয়া আইস, আমরা পরস্পর দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রস্তুত হই, যে

যুদ্ধে জয়ী হইবে, খেলাফৎ তাহারই হইবে। ইহাই মীমাংসার অতি সহজ পন্থা। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এই উক্তি শুনিয়া হজরত ওমর বিনন্ আছ (রাজিঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, এই প্রস্তাবই ত স্মারসঙ্গত ও উত্তম। অসংখ্য মোছলমানের নিপাত সাধন, তাহাদের শোণিতে ধরাতল কর্দমিত করা অপেক্ষা, আপনার পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে বৈরথ যুদ্ধ করিয়া খেলাফৎ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং হজরত আলী (রাজিঃ)-এর কথার কেহই উত্তর দিলেন না; অগত্যা তিনি স্বীয় মূল সেনাদলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জুনার দিন বেলা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত পূর্ণতেজে এই ভয়ঙ্কর ও মহা সংহারক যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধ প্রায় ৩০ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়াছিল; এই ৩০ ঘণ্টার ভীষণ যুদ্ধে অনূন ৭০ হাজার মোছলমানের উত্তপ্ত শোণিতে ছফিনের বিশাল ময়দান কর্দমিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী কোনও যুদ্ধে মোছলমানদিগের ইহার সিকি পরিমাণ সৈন্ত ও ক্ষয় নাই। এই ৭০ হাজার মোছলমান সৈন্ত সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বৃহস্পতিবারের যুদ্ধে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে দুই জন শ্রেষ্ঠতম বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হন; ১। হজরত ওবায়দুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ); ২। যোল কালাহ হামিরী।

যুদ্ধের শেষ ভাগে এই যুদ্ধ পরিসমাপ্তির জন্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সেনাপতি মালেক আশ্-তর, স্বীয় পরিচালনাধীন সৈন্তদিগকে সহকারী সেনাপতি হারান্-বিন্-হোব্দাঃ নানক সেনাপতির অধীনে স্থাপন পূর্বক, স্বয়ং একদল হেজাযী ও এরাকী বিক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্তকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, “ হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিব; নচেৎ

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিব । ” তদনুসারে অসম সাহসী মদীনাবাসী, বঙ্গাবাসী ও কুফাবাসী অশ্বারোহী বীরপুরুষগণ ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন । অবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর “ হামরেকাব ” (সন্ধে) থাকিল । অতঃপর পূর্বোক্ত অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে লইয়া মহাবীর মালেক আশ্-তর কোনও উপযুক্ত স্থান হইতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দ্বারা শামী সৈন্যদলের উপর নিপতিত হইলেন । এই সময় হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এর সৈন্য সংখ্যা ৮০ হাজার হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৩৫ হাজারে পরিণত হয় ; অর্থাৎ তাহার ৩৫ হাজার সৈন্য সমরশায়ী হইয়াছিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে ২৫ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়া তখনও ৬৫ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিদগ্ধমান ছিল । সুতরাং শামীদিগের চূড়ান্ত বলক্ষয় হইয়াছিল । মহাবীর মালেক আশ্-তরের ভীষণ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আগিকুল মুমেনিন এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ এমন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন যে, শামী সৈন্যদল ক্রমে বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে সঙ্কুচিত হইয়া, অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল ; সুতরাং তাহাদের বিধ্বস্ত হইবার আর একঘণ্টা কালও অবশিষ্ট ছিল না । হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য অতল সলিলে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইল । কিন্তু এই ক্ষেত্রে শঠতা, ধোকা ও চালবাজী, প্রকৃত জায়পরতা ও বীরত্বের বিরুদ্ধে কার্যকরী হইল । হজরত ওমরু-বিনলু আছ (রাজিঃ) এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন । কবি এক্ষেত্রে ঠিকই বলিয়াছেন :—

এদিক হইতে ফিরে বাতাসের গতি, ব হিল বিকল্প পথে হায়রে নিয়তি !

হজরত আলী (কঃ—ওঃ), মহাবীর মালেক আশ্-তরের সাফল্য-মণ্ডিত আক্রমণ দর্শনে যেমন হর্ষোৎফুল্ল ও আশান্বিত হইতেছিলেন, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর অন্তঃকরণ সেইরূপ হুশ্চিন্তা ও ঘোর নৈরাশ্যের তমসায় আচ্ছন্ন হইতেছিল । পরাজয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দর্শনে হজরত

ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আর কি দেখিতেছেন, আমাদের পরাজয় ত অনিবার্য। এই সময় কৌশল অবলম্বন না করিলে আর রক্ষা নাই। সৈন্যদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করুন, এই মুহূর্ত্তেই কোরআন শরীফ বড়শাগ্রে বাঁধিয়া উদ্ধৃদিকে উত্তোলন করে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে “হাযা কেতাঘাল্লাহ বায়েনানা ওবায়োনাকুম” (আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে কেতাব “কোরআন মজীদ” রহিয়াছে)। হুশিয়ার জর্জরিত হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ ঐরূপ আদেশ প্রদান করিলেন; আদেশ পাইবামাত্র শামী সেনাদল নেঘার উপরিভাগে কোরআন শরীফ উঁচু করিয়া ধরিল; এবং উচ্চ চীৎকারের সহিত বলিতে লাগিল, “আমরা কোরআন শরীফের ফয়ছলা মান্ত করিতে প্রস্তুত।” সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সঙ্কুল ধর্ম্মবিশ্বাস ও অসাধারণ বীরত্ব এবং শৌর্য্য বীৰ্য্য স্থলে ধোকাবাজী, কৌশল, প্রত্যাৎপন্নমতিত্ব সাফল্য লাভ করিল।

আর কি লিখিব, লেখনী অগ্রসর হইতে চায় না। হঠাৎ যাত্র মত্ত প্রভাবে বেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ধামিয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল পূর্বে যে বিজয়োগুথ হেজাজী ও এরাকী সেনাদল, শত্রুদলকে দলিত ও মথিত করিয়া, তাহাদিগকে একেবারে “নেস্তে-নারুদ” করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ একেবারে শাস্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। আর কেহ অস্ত্র উত্তোলন করিল না। প্রধানতঃ এরাকী ও এব্নে ছাবার দলই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। কোরআন পাক বড়শাগ্রে উত্তোলিত হইবার পূর্বে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রকৃত যুদ্ধ ছিল; এক্ষণে ফেরেব ও দাগাবাজী সেই স্থান অধিকার করিল। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বপক্ষীয় যোদ্ধা-দলকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা এ সময় যুদ্ধে বিরত হইও না। অতি শীঘ্রই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। কিন্তু তাহার উপদেশ কার্য্যকরী

হইল না । আর এই সুদীর্ঘকালের যুদ্ধে বহু সহস্র মোছলমানের দেহপাত হওয়ায়, এই সর্ব সংহারক যুদ্ধের প্রতি অনেকেরই বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল ; সাবায়ী দল এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না ; তাহারা ত চাহিতেছিল মোছলমানদিগের ধ্বংস সাধন ; সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পতন ; সুতরাং তাহারা চতুর্দিক হইতে গোল তুলিল যে, আপনি মালেক আশ্-তর কে এখনই যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য করুন । মহাবীর মালেক আশ্-তর দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, আমাদের বিজয় লাভের আর বিলম্ব নাই ; আমরা কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই শত্রুদলকে একেবারে পিষ্ট করিয়া ফেলিব ; কিন্তু দলপতিগণ ও সেনানায়ক গণ মালেক আশ্-তরকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আসিবার ■■■ সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের প্রতি এতদূর 'গোস্তাখানা' (অশিষ্টতা-সূচক) বাক্য বলিতে লাগিল, যাহা শ্রবণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয় । ঐ সকল কর্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হঠকারী লোকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, আপনি যদি মালেক আশ্-তরকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হুকুম না পাঠান, তবে আমরা (হজরত) ওছমান (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি, আপনার সঙ্গে ও সেইরূপ ব্যবহারই করিব । এই তীষণ মারাত্মক অবস্থা দর্শনে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তৎক্ষণাৎ মহাবীর মালেক আশ্-তরের নিকট এই সংবাদ লইয়া লোক পাঠাইলেন যে, এখানে বিপ্লবের দরওয়াযাঃ খুলিয়া গিয়াছে, আমাদের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা মাটি হইয়াছে, তুমি যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়া সত্বরে আমার নিকট চলিয়া আইস । প্রভু ভক্ত মহাবীর মালেক আশ্-তর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন । মালেক আশ্-তর, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকটে

প্রত্যাবর্তন করিয়া যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা ও সফলতার কথা আনু-
 পূর্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। মালেক আশুতর নিতান্ত
 আক্ষেপ ও মর্শ্ব বেদনার সজ্জিত বলিতে লাগিলেন হে এরাক-
 বাসিগণ ! যে সময়ে তোমরা শামবাসীর উপর সম্পূর্ণ বিজয়ী হইতেছিলে,
 সেই সময় তোমরা কপটতা-জালে জড়িত হইয়া সব মাটি করিলে ?
 বিশৃঙ্খল প্রকৃতির লোকগুলি এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে,
 তাহারা মালেক আশুতরকে আক্রমণ করিতে উদ্বৃত্ত হইল। কিন্তু হজরত
 আলী (কঃ—ওঃ) তাহাদের ঐরূপ অন্তায় কার্যের তীব্র প্রতিবাদ
 করিতে তাহারা নিবৃত্ত হইল। তৎপর আশরুহ-বিন্-কয়ছ নীমানসার
 প্রস্তাব লইয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিলেন,
 হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমরু-বিন্-আছ (রাজিঃ)-প্রমুখ
 মন্ত্রণাকারী দলের পরামর্শানুসারে নিজের সুবিধানুযায়ী যে শর্ত পেশ
 করিলেন, স্বদলস্থ ছাবারী এবং অন্তান্ত স্বেচ্ছাচারী দলপতি ও ছরদারগণ
 সেই প্রস্তাবেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে সম্মতি দান করিতে
 বাধ্য করিলেন। দুই পক্ষ হইতে দুই জন মধ্যস্থ নিযুক্ত করিবার বে
 প্রস্তাব হইল, শামী (সিরীয়)-গণ হজরত মাবিয়াঃ (রাজিঃ)-এর প্রধান মন্ত্রী,
 সর্ব প্রকার মন্ত্রণা দাতা, প্রভু বা বন্ধুর সম্পূর্ণ ‘খাএরখাহ’ (মঙ্গলাকাজী)
 হজরত ওমরু বিন্-আছ (রাজিঃ)-কে মনোনীত করিল ; হজরত আলী
 (কঃ—ওঃ) স্বপক্ষে স্বীয় পিতব্যপুত্র হজরত আবদুল্লা বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-
 কে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিতে চাহিলে, তাঁহার স্বদলস্থ লোকেরাই হজরত
 আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা ভ্রাতা বলিয়া
 তাহাতে আপত্তি করিল ; তৎপর তিনি স্বীয় প্রধান সেনাপতি মালেক আশ-
 তরের নান করিতে, তিনি ছাহাবাঃ কারাম নন বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত
 হইল ; তাহারা হজরত আবু মুছা আশযারী (রাজিঃ)-কে মনোনীত করিল।

কিন্তু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর, তাঁহার প্রতি আস্থা ছিল না ; তিনি একজন বড়দের ছাড়াই হইলেও, একদিকে যেমন সাদা-সিদে ও সরল বিশ্বাসী ছিলেন ; তেমনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে অনুকূল ছিলেন না । কিন্তু তাঁহাকে নিজের দলের লোকের বাড়াবাড়িতেই এই অন্ত্য প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে হইল । অতঃপর হজরত ওমর বিনুল আছ (রাজিঃ) একরার নানা লিখাইবার জন্য হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে সেখানে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদের সুবিধানুযায়ী একরার নাম লেখা পড়া হইল ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এ বিষয়ে স্বাধীন-ভাবে কিছু করিবার বা বলিবার উপায় ছিল না ; এরাকী অর্থাৎ “ কুফি ” এবং “ বস্রাবাসি ” গণ আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী সকল কার্যই করিলেন । আগামী রমজান শরীফ পর্যন্ত ছয়মাস কাল, মধ্যস্থ দ্বয়ের মীমাংসার সময় দেওয়া গেল । তদনন্তর হজরত মাযিয়া (রাজিঃ) হতাবশিষ্ট সেনাদল সহ প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর দলস্থ ছাবায়ী, বিপ্লবপন্থী, তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচারী মোছলেম-শত্রুদল এক বিষম হট্টগোল উপস্থিত করিল ।

এই স্থান হইতে একটা নূতন বিপ্লববাদের দরওয়াজা খুলিয়া গেল । এই সকল বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ, কলঙ্ক কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল । মহামান্ন খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন দূরে থাকুক, অনেকেই তাঁহার প্রতি তুচ্ছ ভাচ্ছিত্য প্রকাশ করিতে লাগিল । যে সেনাদল কুফা হইতে ছফিনে * যাওয়া * কালীন একমতাবলম্বী ছিল, তাহাদের মধ্যে কত উৎসাহ ও উত্তেজনা ছিল ; প্রত্যাবর্তন কালে তাহাদের সে শৃঙ্খলা, সে একতা, সে ভ্রাতৃত্ব, মহামান্ন খলিফার প্রতি সে ভক্তি প্রকাশ কিছুই অবশিষ্ট রহিল না । মহামান্ন আমিরুল মুমেনিন বহু চেষ্টা

করিয়াও তাহাদিগকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি মহাবিপদে পতিত হইলেন।

এই সময় দুইটা নূতন দলের সৃষ্টি হইল। সাবায়ী দল ও তাহাদের মতামুবর্তী অপর কতকগুলি লোক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অনেক কার্যে দোষ প্রদর্শন পূর্বক, তাঁহাকে কাফেরের দরজার পর্য্যন্ত পৌছাইল; ইহারা “খারিজী” নামে অভিহিত হইল। আর একদল তাঁহার অতিরিক্ত প্রশংসা কীর্তনকারী,—তাঁহার অস্বাভাবিক গৌরব বর্দ্ধনকারী রূপে অবিভূত হইল; উহারা তাঁহার তাবেদারী করা, খোদা ও রহুলের তাবেদারী করা অপেক্ষাও গুরুতর কর্তব্য বলিয়া মনে করিত, ইহারা “রাফেজী” বা “লিরা” নামে পরিচিত। ইহারা এই উভয় দলের কোনও দলভুক্ত নহেন, তাঁহারাষ্ট প্রকৃত “ছোন্নত আমাত।” বাহা ইউক, মহামান্ন থলিফা কুফার প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুফাবাসী ও বস্রাবাসী বিপ্লবপন্থিগণ আপনাদের বিপ্লববাদ খুব ছড়াইতে লাগিল। হতাবশিষ্ট ছাহাবাঃ (কারাম)-দিগের অধিকাংশ মদীনায়া চলিয়া গেলেন, কতকংশ মহামান্ন থলিফার সঙ্গে কুফায় রহিলেন।

আব্রাহে মীমাংসাকারী (হালেহ)

যয়ের ঘোষণা

গোলমালে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। এক এক পক্ষ বইতে ৪০০ শত করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন-আব্বাহ (রাজিঃ) উপরোক্ত ৪০০ প্রতিনিধি সহ আব্রাহ অভিযুখে রওয়ানা হইলেন। ওদিকে

হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে ৪০০ প্রতিনিধি সঙ্গে লইয়া
হজরত ওমরু বিনলু আছ (রাজিঃ) ও তদভিমুখে যাত্রা করিলেন ; মক্কা
ও মদীনাবাসী কতিপয় প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ ও এই মীমাংসা-
সভায় যোগদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা ও তদভিমুখে
যাত্রা করিলেন । তাঁহাদের মধ্যে হজরত আবুহুর রহমান-বিন-আবুবকর
ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আবুহুলা-বিন-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবুহুলা-
বিন-যোবায়ের (রাজিঃ), হজরত ছারাদ-বিন-আরি ওকাস (রাজিঃ)-এর
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মীমাংসাকারী কোন্ সিদ্ধান্তে
উপনীত হইয়াছেন, তাহা প্রথমে কেহই প্রকাশ করিলেন না ;
পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করিবে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপর একটি
বিশেষ সভা আহূত হইল, কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজনীতি-বিশারদ হজরত
ওমরু বিনলু-আছ (রাজিঃ) প্রথমেই কতকগুলি জটিল
উত্থাপিত করিয়া, হজরত আবুহুলা আশয়ারী (রাজিঃ)-কে নিজের
অনুকূলে মত প্রকাশ করিতে বাধ্য করিলেন ; খেলাফৎ সম্বন্ধে অনেক
কথা কাটাকাটির পর হজরত আবুহুলা আশয়ারী (রাজিঃ) বলিলেন,
আমার মতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)
এই দুইজনকেই পদচ্যুত করিয়া, হজরত আবুহুলা-বিন-ওমর (রাজিঃ)-
কে খলিফা নির্বাচিত করা উচিত । হজরত আবুহুলা-বিন-ওমর
(রাজিঃ) এই প্রস্তাব শুনিয়া উঠেঃখরে বলিয়া উঠিলেন, আমি এই
প্রস্তাবে রাজি নহি । আবার অনেক তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটির
পর হজরত ওমরু-বিনলু আছ (রাজিঃ) গোপনে হজরত আবুহুলা
আশয়ারী (রাজিঃ)-এর নিকট নিম্ন-লিখিত রূপ মত প্রকাশ করিলেন—
(হজরত) আলী (কঃ—ওঃ) : এবং হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)
এই দুইজনের বিবাদে এবং লড়াইয়ে সমগ্র মোছলমান জাতি বিপর

হইয়া পড়িয়াছে, অসংখ্য মোছলমানের উত্তম শোণিতে ভূপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইতেছে; একপ ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের পক্ষে ইহাই কর্তব্য মনে করিতেছি যে, খেলাফতের 'দাবীদার' উভয়কেই পদচ্যুত করি। তৎপর মোছলমানদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া হউক যে, তাহারা আপনাদের ক্ষমত খলিফা নির্বাচন করিয়া লয়। সরল বিশ্বাসী হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) তাঁহায় এই প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া মানিয়া লইলেন। অতঃপর সাধারণ সভায় এই মত ঘোষণা করা হইবে বলিয়া প্রচার করা হইল। তদনুসারে জন-সাধারণ ও উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ সেখানে উপস্থিত হইলেন; একটা মিম্বর স্থাপন করা হইল। উভয় 'ছালেছ' (মীমাংসাকারী) এবং মক্কা ও মদীনার প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ), নির্বাচিত সদস্য প্রধান প্রধান দলপতি ও নেতাগণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন ওমর-বিনল-আছ (রাজিঃ) হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমাদের উভয়ের যে মত স্থির হইয়াছে, তাহা আপনি উপস্থিত জন-মণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করুন। এক্ষেত্রেও হজরত ওমর-বিনল-আছ (রাজিঃ) চালাকী খেলিলেন; হজরত আবু মুছা আশয়ারীকে প্রবীণ বয়স্ক, বোধগম্য ব্যক্তি বলিয়া তাঁহাকেই প্রথমে মত প্রকাশ করিতে বাধ্য করিলেন। সাদা-সিঁদে ভাল মানুষ হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) সে চালবাজী বুঝিতে না পারিয়া, প্রথমেই মিম্বরে দণ্ডায়মান হইয়া এই ঘোষণা প্রচার করিলেন :—

“ হে উপস্থিত মোছলমানগণ ! আমরা 'ছালেছ' (মীমাংসাকারী) দ্বয় অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিলাম, একটা ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যবস্থায়ই আমরা একমতাবলম্বী হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমরা তোমাদিগকে সেই মতবাদের বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আমরা আশা করি, তোমরা আমাদের এই মীমাংসা গ্রহণ

করিয়া, মোছলমানদিগের মধ্যে একতা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে ।
ঐ মীমাংসা—যাহার উপর আমিও ওমরু-বিনল্-আছ (রাজিঃ), উভয়ে
‘মত্তফক’ (একমতাবলম্বী)—তাহা এই যে, আমরা এ সময় হজরত আলী
(কঃ—ওঃ)-এবং হজরত মাযিয়া (রাজিঃ) এই উভয়কেই পদচ্যুত
করিতেছি ; আর তোমাদিগকে এই ‘এখ্-তেয়ার’ (ক্ষমতা) দিতেছি
যে, তোমরা এক মতাবলম্বী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা, তাঁহাকে আপনাদের
খলিফা নির্বাচন কর ।”

সমবেত মোছলমানগণ হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ)-এর
এই বক্তৃতা শুনিলেন ; তিনি মিস্বর হইতে অবতরণ করিলে হজরত
ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ) মিস্বরে আরোহণ পূর্বক সমবেত মোছলমান
জনসমূহকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন :—

“ আপনারা সাক্ষী থাকুন, (হজরত) আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ),
তাঁহার বন্ধু হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে খেলাফতের পদ হইতে ‘মায়ুল’
(পদচ্যুত) করিলেন ; আমিও তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী ;
এবং তদনুসারে হজরত আলী (রাজিঃ)-কে খেলাফৎ হইতে ‘মায়ুল’
(পদচ্যুত) করিতেছি ; কিন্তু আমি হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-কে
পদচ্যুত করিতেছি না ; তাঁহাকে আমি খলিফা পদে ‘বহাল’ রাখিতেছি ।
কারণ, তিনি ‘মজলুম’ (অত্যাচারগ্রস্ত) খলিফার অলি (উত্তরাধিকারী)
এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার অধিকারী । ”

এই বলিয়া ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) মিস্বর হইতে অবতরণ
করিলেন । সভাক্ষেত্রে হুলস্থূল পড়িয়া গেল । হজরত আবু মুছা
আশয়ারী (রাজিঃ) বেধোকার পড়িয়াছিলেন, ইহা সর্ববাদী সম্মত ।
তাঁহার উক্তি তেমন দুষণীয় ছিল না ; কিন্তু হজরত ওমরু বিনল্-আছ
(রাজিঃ) চতুরতা প্রকাশ পূর্বক এই কাণ্ড করিলেন । ফলতঃ ইহা

দ্বারা কোন মীমাংসা বা শেষ সিদ্ধান্ত হইল না। হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ), হজরত ওমরু বিনন্ আছ (রাজিঃ)-কে বদ-দোওয়া করিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষপাতী অধিকাংশ মেম্বর এই মীমাংসা অগ্রাহ্য করিলেন ; কিন্তু শামী দল ইহা দ্বারা বেশ ফললাভ করিল ; হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে ইহা বেশ অনুকূল হইল ; এতকাল তাঁহার দলের লোকেরাও তাঁহাকে খলিফা বলিয়া সম্বোধন করিতেন না ; এখন হইতে তাঁহারা তাঁহাকে “ আমিরুল মুমেনিন ” বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষীয় ছাবারী ও উচ্ছ ডল প্রকৃতির লোকগুলি এই ব্যাপারে অনর্থক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। অথচ এই গুপ্তশত্রু ও মোনাফেকের দলই ‘যবরদস্তী’ করিয়া “ ছফিন ” এর জয়যুক্ত যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছিল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর প্রতিনিধি দল সানন্দ চিত্তে দামেস্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন ; আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতিনিধিগণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও নানা অসংলগ্ন তর্ক-বিতর্ক করিতে কুফাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) লজ্জিত ও অপ্রেতিত হইয়া অন্ত্র প্রস্থান করিলেন।

বিপ্লব-পন্থী খারেজী দল ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন ৩৭ হিজরীর ১৩ই ছফর তারিখে ছফিন রণক্ষেত্র হইতে কুফাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কতকগুলি ছাবারী-মস্ত্রে দীক্ষিত ক্রুচ্চমতি কপটাচারী বিপ্লব-পন্থী দলপতি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হজরত ! আপনি কুফায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্বক শামীদিগকে পশ্চাদিক হইতে

আক্রমণ করুন । তত্বত্রে মহাত্মা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, আমি একরারনামা লিখিয়া দেওয়ার পর কি এই অসম্ভব কাজ (সন্ধিত) করিতে পারি ? এক্ষণে আমাকে বাধ্য হইয়া আগামী রমজান মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে ; ইতিমধ্যে যুদ্ধের কল্পনাও মনে স্থান দিতে পারি না । এই কথা শুনিয়া লোকগুলি চলিয়া গেল, এবং সেনা দলের মধ্যে বিপ্লব-বীজ ছড়াইতে লাগিল । ক্রমে সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বাদানুবাদ, বচসা ও ঝগড়া-কলহ আরম্ভ হইল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ও এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক-দিগকে সংযত ও নিয়মাধীন করিতে পারিলেন না । সেনাদল কুফার নিকট পঁহুছিলে, তন্মধ্য হইতে ১২ হাজার লোক দল বাধিয়া স্বতন্ত্র হইয়া গেল । তাহারা আবদুল্লা-বিন্-আল কুরাকে আপনাদের এমাম ও ছবত্-বিন্-রবয়ী কে সেনাপতি মনোনীত করিল । এই ব্যক্তি সেই ছবত্-বিন্-রবয়ী—যাঁহাকে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ছফিন যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে দুইবার দূত নিযুক্ত করিয়া হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন । আর দুইবারেই হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ইহার রূঢ়ভাবে কথাবার্তা ও বাক্-বিতণ্ডা হইয়াছিল ; এবং দুইবারেই দূত প্রেরণ কার্য্য বিফল হইয়াছিল । এই দলের নেতৃগণ একমতাবলম্বী হইয়া নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণা প্রচার করিল ।

“ বায়্-য়েত একমাত্র খোদাতৌলার । আল্লাহর কেতাব এবং রহুল (ছালঃ)-এর ছোন্নত অনুযায়ী সংকার্য্যাবলীর ‘ইকুম’ করা ও মন্দ কার্য্যের ‘গানা’ (নিষেধ) করা আমাদের কর্তব্য কার্য্য । আমাদের মধ্যে কোনও খলিফা ও কোন আমীর নাই । যুদ্ধে জয়ী হইবার পর সমুদয় কার্য্য, সমগ্র মোছলমানদিগের মতানুযায়ী এবং অধিকাংশ মোছলমানের ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে । আমীর মাবিয়া (রাজিঃ)

ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)—ইহারা উভয়েই সমান অপরাধে অপরাধী ।”

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) খারেজী দিগের ব্যবহারে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন ; পরে কুফা নগরে প্রবেশ করিয়া, বাহাদের স্বামী-পুত্র, পিতা-ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন ছফিন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহুনা প্রদান করিলেন, এবং ছফিনের যুদ্ধে বাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শহীদ হইয়াছেন, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন । তৎপরে তিনি হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে খারেজীদিগের নিকট পাঠাইলেন, তাহারা তাঁহার সঙ্গে ঘোর তর্ক-বিতর্ক ও বাক্-বিতণ্ডা আরম্ভ করিল । পরে তিনি স্বয়ং সেখানে গমন পূর্বক এই দলের সর্বপ্রধান নেতা এযিদ-বিন্-কয়েছের শিবিরে প্রবেশ পূর্বক, দুই রেকায়াত নফল নমাজ্ আদায় করিলেন । তিনি এযিদ-বিন্-কয়েছকে এফাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন । খারেজী দলের এমান আবদুল্লা বিন্-আলুকুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে, সে মহামান্ন খলিফার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিল । যাহা হউক, বিপ্লবপন্থী খারেজিগণ কোনও ক্রমেই সুপথে আসিল না । তাহারা অবশেষে নহরওয়ানের দিকে চলিয়া গেল । নহরওয়ানে পঁহুঁছিতে পঁহুঁছিতে তাহাদের সংখ্যা ২৫ হাজারে দাঁড়াইল । সেখানে তাহারা আপনাদের সেনা-নিবাস খুব সুরক্ষিত করিয়া লইল ।

এই সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আবার দিরিয়া আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; তদনুসারে স্বীয় পিতৃব্যপুত্র, এবং সর্বপ্রধান প্রতিনিধি বশীর শাসনকর্তা হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-কে বশী হইতে সৈন্ত সংগ্রহ করিতে আদেশ পত্র পাঠাইলেন । তখন বশীর ৬০ হাজার বিক্রান্ত যোদ্ধা পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও, মাত্র ৩ হাজার

১ শত যোদ্ধা যুদ্ধে বাইতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। এই সৈন্য কুফায় পঁহছিলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কুফাবাসীদিগের সম্মুখে এমন একটি অনল-বর্ষিণী হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিলেন যে, কুফার ৪০ সহস্র বীরপুরুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। অতঃপর তিনি খারেজীদিগকে স্বদলভুক্ত করিবার জন্য আর একবার বিশেষ চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু তাহাদের মতিগতি কিছুতেই পরিবর্তিত হইল না। এই সময় এই পাষাণদল আর একটি গর্হিত কার্য্য করিল। হজরত আবদুল্লা-বিন-জনাব (রাজিঃ) নহরওয়ানের নিকট দিয়া সপরিবারে ‘ছফরে’ বাইতে ছিলেন, উহারা তাঁহাকে প্রথম দুই খলিফা এবং হজরত আলী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল ; তিনি তাঁহাদের সকলেরই প্রশংসা-বাদ করাতে উহারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই নিরীহ ছাহাবাঃ (রাজিঃ), তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি এবং সঙ্গীয় লোক জনকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনার সভ্যতা অনুসন্ধানার্থ হরছ-বিন-মররাহকে নহরওয়ানে—খারেজীদিগের আড্ডায় প্রেরণ করিলেন ; দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে ও হত্যা করিল ; সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ ও পঁহছিল যে, যে সকল মোছলমান খারেজীদিগের মতামুবর্তী নয়, তাহারা সেই সকল মোছলমানকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতেছে।

এক্ষণে যে বিক্রান্ত কুফাবাসী ও এরাকী যোদ্ধাপুরুষগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সৈন্যদল ভুক্ত হইরাছিল, তাহাদের মনে এই ভ্রুশ্চিত্তা উপস্থিত হইল যে, আমরা শামদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিলে, এই খারেজিগণ হয় ত সেই সুযোগে কুফা ও বস্রা সংবলিত সমগ্র এরাক প্রদেশ অধিকার করিয়া লইতে পারে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাহারা আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে অতি নির্দয় ভাবে হত্যা করিয়া,

আমাদের যথা-সর্বস্ব নুষ্টিয়া লইবে। তাহাদের এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন ছিল না; পক্ষান্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মনে করিলেন, যদি খারেজিগণ কুফা ও বস্রা অধিকার করিয়া লইতে পারে, তবে আমার পক্ষে সিরিয়া আক্রমণ লাভের পরিবর্তে বিশেষ কতিজনক হইয়া দাঁড়াইবে। তদনুসারে তিনি শামের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখিয়া খারেজিদিগের নিকটবর্তী হইলেন, এবং কতিপয় ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-কে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া, এবং তাহাদের কতিপয় প্রধান প্রধান নেতাকে ডাকাইয়া আনাইয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু “ চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী ” এই অবস্থা দাঁড়াইল; তাহারা তাঁহাকে কাফের বলিয়া প্রকাশ করিতে [বিধা] বোধ করিল না। যখন কোনও চেষ্টাই কার্যকরী হইল না, তখন তিনি স্বীয় সেনাদলকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন বীরপুরুষদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন; আর হজরত আবু আইউব আনছারী (রাজিঃ)-এর হস্তে ‘আমানের ঝাণ্ডা’ (শান্তি-পতাকা) প্রদান পূর্বক বলিলেন, আপনি এই শান্তি-পতাকা এক উচ্চস্থানে স্থাপন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে এই ঘোষণা-প্রচার করুন যে, যে সকল লোক যুদ্ধ না করিয়া আমাদের দিকে চলিয়া আসিবে, তাহাদিগকে ‘আমান’ (শান্তি) দেওয়া হইবে; এবং যে সকল লোক কুফা ও মদায়নের দিকে চলিয়া যাইবে, তাহারাও নিরাপদে থাকিবে। তদনুসারে শান্তি-পতাকা খাড়া হইল, হজরত আবু আইউব আনছারী (রাজিঃ) উচ্চৈঃস্বরে ঐরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন। ঘোষণা শ্রবণ মাত্রে লশ্কার এবনে নওফল আশ্জরী ৫০০ যোদ্ধা পুরুষ সহ স্বতন্ত্র হইয়া চলিয়া গেল। কতক খারেজী যোদ্ধা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সেনাদলে আসিয়া যোগদান করিল। এই প্রকারে দুই তৃতীয়াংশ লোক স্বতন্ত্র হইয়া যাওয়াতে,

এক তৃতীয়াংশ মাত্র লোক মূলদলে রহিয়া গেল । অতঃপর মহামান্য খলিফার সেনাদল খারেজী দিগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল । তাহারা খারেজীদিগকে চতুর্দিক হইতে এমন ভাবে বেষ্টিত করিয়া লইল যে, তাহাদের পলায়ন করিবার পথ রহিল না । তাহাদের প্রধান প্রধান নেতৃদল সহ ৯১০ হাজার খারেজী সমরশায়ী হইল ; মাত্র ২ জন খারেজী জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইরাছিল । রণক্ষেত্রে নিপতিত মৃতদেহ গুলি কবরস্থ করা হইল না ; উহা শৃগাল, কুকুর, গৃধিনী, শকুনী প্রভৃতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইল ; এবং তাহাদের তৃক্ষারোঁচ শোচনীয় পরিণামের নিদর্শন স্বরূপ অস্থিপুঞ্জ সেই ময়দানে পড়িয়া রহিল । খারেজিদলের নিপাত সাধন হইলে মহামান্য আগিবুল মুমেনিন এক দিক্ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । এইবার তিনি শায় আক্রমণের জন্য মহা উৎসাহের সহিত রণ-সজ্জা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কুফাবাসী যোদ্ধাপুরুষগণ যুদ্ধের জন্য কিছুমাত্র উৎসাহ প্রদর্শন করিল না । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কত বুঝাইলেন, কত আশাও উৎসাহের বাণী শুনাইলেন, জলন্ত ভাষায় কত বক্তৃতা প্রদান করিলেন ; কত ওয়াজ করাইলেন ; কিছুতেই কুফাবাসীদিগের উৎসাহান্বিত প্রদীপ্ত হইল না । তিনি কুফাবাসীর এই নিরুৎসাহ ভাব, মোনাবলম্বন ও নীরবতা দর্শনে কিরূপ মন্দ-পীড়িত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না । ইহা দ্বারা এরাকবাসী—বিশেষতঃ কুফার ও বস্রার অধিবাসীদিগের চঞ্চল মতিত্ব, মানসিক দুর্বলতা, ধর্ম-ভাবের শিথিলতা, কাপুরুষতা, মহামান্য খলিফার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি মারাত্মক দোষের পরিমাণ বুঝা যাইতে পারে । এ সময় কেবলমাত্র কুফা ২ বস্রা হইতে একলক্ষ বিক্রান্ত যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিত । আরব ও পারস্যের অন্যান্য অংশ হইতে ও ৪০।৫০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল ।

এই বিপুল সেনাদল লইয়া বীরেন্দ্র কেশরী হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও তদীয় ~~মালেক~~ সেনাপতি মালেক আশ্‌তর যদি খুব সত্বরতায় সহিত শামদেশ আক্রমণ করিতে পারিতেন, তবে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) নিশ্চয় পরাস্ত হইয়া হজরত আলী (কঃ—ভঃ)-এর খেলাফৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন ; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্তরূপ ছিল ।

~~মালেক~~ মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষ

হইতে মেহের অধিকার ।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর (রাজিঃ), ছফিন যুদ্ধের সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কোন সাহায্য, বা হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিয়াছিলেন না ; কারণ তিনি সেখানে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; তাহারা তাঁহার সঙ্গে বা-কায়দা (নিয়মিত রূপে) যুদ্ধ করিতে লাগিল ; ইহা হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে বেশ সুযোগ হইয়া দাঁড়াইল । মেহেরে একজন শক্তিশালী বহুদর্শী শাসনকর্তার আবশ্যক বসিয়া, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় প্রধান সেনাপতি মহাবীর মালেক আশ্‌তর কে মেহেরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন । এ সংবাদে মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) মর্ম্মাহত হইলেন । পক্ষান্তরে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এই সংবাদে নিতান্ত চিন্তাকুল ও ভীত হইয়া পড়িলেন । মালেক আশ্‌তরের বীরত্ব, যোগ্যতা, রাজনীতি-জ্ঞান, জন-প্রিয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ তাঁহার অবিদিত ছিল না । মহাবীর মালেক আশ্‌তর মেহের দেশে পঁছছিবার

পূর্বেই পশ্চিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর ঞ্চরগণ কর্তৃক বিষ-প্রয়োগে ইহার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। ইহার অকাল মৃত্যুতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বাহু ভাঙ্গিয়া গেল। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর কুট রাজনীতি চক্রে তাঁহার সকল বাধা-বিঘ্নই ক্রমশঃ কাটিতে আরম্ভ হইল; পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, মেছেরে মহামান্ন খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বিরুদ্ধবাদী একদল লোক ছিল; মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ)-এর অদূরদর্শিতা ও কঠোর ব্যবহারে তাহারা ক্রমে এমন প্রবল হইয়াছিল যে, শাসনকর্তা তাহাদিগকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিলেন না। হজরত মাবিয়া (রাজিঃ), মেছেরের বিদ্রোহী দলের নেতা মাবিয়া-বিন-খদিজের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করাতে, সে হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। তদনুসারে দামেস্কাধিপতি আমীর মাবিয়া (রাজিঃ), হজরত ওমর-বিন-আছকে ৮০০০ সৈন্যসহ মেছেরে পাঠাইলেন। মোহাম্মদ বিন-আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ), মহামান্ন খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে, তিনি অতি কষ্টে মাত্র ২০০০ সৈন্য কুফা হইতে মালেক-বিন-কায়বের সৈন্তাপত্যে মেছেরে রওয়ানা করিলেন। ওদিকে হজরত ওমর বিন-আছ (রাজিঃ)-এর গতি রোধার্থ মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ), কেনানাঃ-বিন-বশরের নেতৃত্বাধীনে মাত্র ২০০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শামী সেনাদলের সহিত কেনানার যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে কেনানাঃ মহাবীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সৈন্য সংখ্যার অল্পতা বশতঃ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর মোহাম্মদ-বিন-আবুবকর (রাজিঃ) স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্তগণ যুদ্ধ করিবে দূরে থাকুক, চতুর্দিকে পলায়ন করিল; নিরুপায় হইয়া তিনি রাজধানীতে

প্রস্থান করিলেন ; শত্রুদল তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইলেন ; বিদ্রোহী দলপতি মাবিয়া-বিন্-খদিজ তাঁহাকে 'কতল' (শহীদ) করিয়া, একটি মৃত অশ্বের চক্ষের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পুরিয়া আগুণ দিয়া পুড়াইয়া ফেলিল । মোছলমানের পক্ষে ইহা কি নির্দয় পৈশাচিক ব্যবহার ! এই ঘটনার পর বিশাল মেছের দেশ অতি সহজেই হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তগত হইল । হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) মেছের দেশ জয় করিয়া বহুকাল উহা দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন ; সুতরাং অতি সুদূরেই সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন ।

অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কুফাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন, এবং তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিলেন, তোমাদেরই অমনোযোগ, দৌর্বল্য, কাপুরুষতা ও সহানুভূতির অভাবে বিশাল মেছের দেশ আমার হস্তচ্যুত ও শত্রু পক্ষের করতলগত হইল । কিন্তু সেই ক্রূতমতি, চঞ্চল চিত্ত, হৃদয়হীন, কর্তব্য-বিমুখ কুফাবাসিগণ চূপ করিয়া রহিল । মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের অনলবর্ষিণী বক্তৃতায় ও তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ক্ষোভে ও দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন । মোহাম্মদ-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ৩৮ হিজরীতে মেছেরে অতি দুঃশংসভাবে শহীদ হইয়াছিলেন ।

ইহার পর হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর কোশলে, পুরস্কারের লোভে, ক্রমে হেজাজ, এমন ফলস্তিন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশই তাঁহার খেলাফৎ স্বীকার করিল ; এক্ষণে কেবলমাত্র এরাক প্রদেশ (প্রধানতঃ বজ্রা ও কুফা) এবং বিশাল পারস্য দেশ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শাসনাধীন রহিল । এরাকের ও একদল প্রবল আরব তাঁহার বিরুদ্ধাচারী

ছিল। কুফা ও বশার বহু লোকই অস্থির মতি, চঞ্চল চিত্ত এবং দুর্বল হৃদয় থাকাতে, তাহাদের উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা বাইত না। তাহারা লোভী এবং স্বার্থপর ছিল। যুদ্ধে মহাপরাক্রমশালী হইলেও তাহাদের হৃদয় কাপুরুষোচিত ছিল।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জ্ঞান ধর্মপ্রাণ, আদর্শ মোছলমান, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, মহা বিদ্বান, অসাধারণ বক্তা, তাপস কুলের শিরোমণি, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্যে তখন আর একজনও জীবিত ছিলেন না। খলিফার উপযুক্ত পাত্র সে সময় তিনি ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। প্রথম, দ্বিতীয় খলিফার সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় খলিফার (আংশিক) পদানুসরণকারী একমাত্র এই মহাপুরুষই তখন বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বহুসংখ্যক প্রধান ছাহাবাঃ, মোছলমানদিগের, বহু দলপতি, বহু সাধারণ জন-মণ্ডলী তাহার সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহময় পিতৃব্য পুত্র, প্রতিপালিত অন্তরঙ্গ, জামাতা ও প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ-কারীদিগের মধ্যে অন্যতম, মহাত্মা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্ব প্রকারেই খলিফার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হইবার যোগ্যপাত্র ছিলেন; কিন্তু তবু তিনি সর্বজন-প্রিয় হইতে পারেন নাই, ইহা খোদা-তালার মরজী ব্যতীত আর কিছুই নহে। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শোচনীয় ইত্যাকাণ্ড, মোছলেম-মাতা হজরত আরেশা হিন্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে হজরত তালীহাঃ (রাজিঃ) ও হজরত যোবেয় (রাজিঃ) মিলিয়া যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত, জমল যুদ্ধে ১০।১২ হাজার মোছলমানের জীবন নাশ, কপটাচারী আবদুল্লা-বিন-ছাবা ও তাহার মতানুবর্তী দুরাচার লোকদিগের শয়তানী চক্র, হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর পূর্ব হইতে বিশাল শাম-দেশের উপর আধিপত্য, কূট

রাজনীতিক চাল, কুফা ও বশাবাসী একদল মোছলমানের তাঁহার প্রতি
 শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাব, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন, অবশেষে তাঁহাকে
 কাফের পর্য্যন্ত বলিয়া ঘোষণা প্রচার ও প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ অর্থাৎ
 খারেজী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব, উপযুক্ত সাহায্যকারী ও পরামর্শ দাতার
 অভাব, অত্যন্ত সরলতা ও ধর্ম্মভীরুতা জন্য মোছলমান মাত্রেই উপর
 বিশ্বাস স্থাপন, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) কর্তৃক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং
 জন নায়কদিগকে উচ্চ পুরস্কার এবং বৃত্তিদান ইত্যাদি বিষয় গুলি
 মহামানুষ আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফতের
 বিরুদ্ধ ছিল। তদুপরি কুফা ও বশার পরাক্রমশালী অধিবাসীদিগের
 অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল।
 আবার পারশুবাসী অশ্লীলপাসক জাতির বহুসংখ্যক লোক ভয়ে মোছলমান
 হইলেও, তাহাদের মধ্যে সেই পূর্ববর্তী অসার ধর্ম্মের বীজ সম্পূর্ণরূপে
 নষ্ট হইয়াছিল না ; একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা মোছলমান শাসনের
 বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিত ; এতগুলি প্রতিকূল বাধা-বিঘ্ন থাকা
 স্বত্বেও, মহাবীর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে পরিপূর্ণ
 বীর হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইয়াছিল না ; তাঁহার জলন্ত ধর্ম্ম-
 বিশ্বাস, অতুলনীয় সাহস ও অমুপম বীরত্ব, অকপট জন-হিতৈষণা
 তাঁহার পদ-মর্যাদাকে এত উচ্চ স্থান দিয়াছিল যে, হজরত মাবিয়া
 (রাজিঃ) সর্ব প্রকারে সুবিধা লাভ করিয়াও, আপনাকে তাঁহার তুলনায়
 নিতান্ত নগণ্য ও হীনপ্রভঃ দেখিতে পাইতেন। এজন্য এত দেশ,
 প্রদেশ, জনপদ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভর হইতে
 পারিয়াছিলেন না। তিনি তাঁহার ভয়ে সর্বদাই বিভীষিকাগ্রস্ত
 সমস্ত থাকিতেন। তিনি একথা খুব জানিতেন যে, যদি কেবলমাত্র
 এরাক বাসিগণ (নূতন উপনিবেশ কুফা ও বশার অধিবাসিগণ) হজরত

আলী (কঃ—ওঃ)-এর পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতবেও আমার পরাজয় অনিবার্য। আদর্শ ধর্ম প্রাণ, আল্লাহ তাঁলার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরকারী, তাপস কুলের শিরোভূষণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্বপ্রকার সাহায্য-সহায়ত্ব এবং প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবগণকে হারাইয়া ও অটল পর্বতের ন্যায় রাজধানী কুফায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ।

বিপদের উপর বিপদ, তাঁহার একমাত্র পিতৃব্যপুত্র, মহাবীর, মহাধীর, মহা-বিদ্বান্, রাজনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) ও একটা ঘটনার অসম্বল হইয়া বঙ্গার রাজপ্রতিনিধিত্ব বা গবর্নর জেনারেলের পদ পরিত্যাগ পূর্বক মক্কার চলিয়া গেলেন । এই একমাত্র ভ্রাতা, বন্ধু, সাহায্যকারী, ছারার ন্যায় অনুসরণকারী পিতৃব্য-পুত্রের প্রস্থানে তাঁহার শক্তি আরও দুর্বল হইয়া পড়িল । বঙ্গা হইতে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা তাঁহার শাসনাধীন ছিল । হজরত আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর অন্ততম পুত্র মহাবীর যেমাদ পরে বঙ্গার সর্বক্ষমতাপন্ন শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর একান্ত অনুগত ও 'ফরমাবরদার' দিলেন ।

আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহর শাহাদত প্রাপ্তি ।

একদিকে হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) বঙ্গার শাসনকর্ত্বয় পরিত্যাগ পূর্বক মক্কা-মোয়াজ্জমায় প্রস্থান করিলেন, পক্ষান্তরে জ্যেষ্ঠ সহোদর হজরত আকিল-বিন্-আবি তালেব ও মহামান্ন আমিরুল মুমেনিনের প্রতি নারাজ হইয়া :দামেস্কে—হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর নিকটে

চলিয়া গেলেন । হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ পূর্বক, তাঁহার উচ্চ বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন ; তিনি তদীয় সভাসদগণ মধ্যে গণ্য হইলেন । ভ্রাতার এইরূপ ব্যবহারে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বীর এর হৃদয় নিতান্তই বিচলিত হইল ; তিনি পদে পদে অপ্রতিভ হইয়া, হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে একবার শেষ যুদ্ধ করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন । তিনি কুফাবাসীদের নিকট হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন । তাঁহার অনল বর্ষিণী বস্তুতঃ এবার কুফাবাসীর প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল । তদনুসারে ৬০ হাজার কুফাবাসী যোদ্ধাপুরুষ এই বলিয়া তাঁহার হস্তে ‘বায়্-য়েত’ করিল যে, আমরা প্রাণ থাকিতে আপনার আদেশ প্রতিপালনে বিমুখ হইব না ; এবং মরিতে কিংবা শত্রুদলের নিপাত সাধন করিতে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত থাকিব । মহামান্য আমিরুল মুমেনিন এই ৬০ হাজার সৈন্য ব্যতীত এরাক এবং পারস্যের বিভিন্ন সুবার আরও সৈন্য সংগ্রহ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ রসদ-পত্রাদির বিশেষ যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইলেন । চতুর্দিকে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল ।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নহরওয়ানের যুদ্ধে খারেজি দল সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল হইয়া গিয়াছিল । তথাকার বিশাল প্রান্তরে তখনও তাহাদের পূজীকৃত অস্থিরাজি, তাহাদের ধ্বংসের জলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছিল । কিন্তু নহরওয়ানের যুদ্ধ হইতে ৯ জন খারেজী যে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এ সংবাদ ও অবশ্য পাঠকগণের স্মরণ আছে । উত্তরকালে এই ৯ ব্যক্তি খারেজী দলের এমাম বা দলপতির পদলাভ করিতে সমর্থ হয় । ইহারা নহরওয়ানের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন পূর্বক পারস্য দেশের বিভিন্ন অংশে খারেজী মতের বিবাক্ত বীজ ন্যপন ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বিরুদ্ধে বিপ্লববাদ প্রচার

এবং বিজোহ উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়া যখন বিফল মনোরথ হইল, তখন হেজায্ ও এরাক প্রদেশে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিয়া তবঘুরের ভ্রায় ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল ।

অবশেষে ইহাদের মধ্য হইতে আবদুর রহমান-বিন্-বলজম মোরাদী, বরক্-বিন্-আবদুল্লা এতিমি ও ওমরু-বিন্-বকর এতিমি—এই ৩ ব্যক্তি মক্কা-মোয়াজ্জমায় গিয়া একত্রিত হইল । তাহারা সেখানে নহরওয়ানের যুদ্ধে নিহত লোক ও বন্ধু-বান্ধবদিগের অস্ত্র ধুব হুঃখ ও শোক প্রকাশ করিল । অবশেষে তাহারা একামতাবলবী হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিল যে, যে তিনজন লোকের ■■■ এছলাম জগতে মহা অশান্তির উদ্রেক হইয়াছে, ঐ তিন ব্যক্তি—অর্থাৎ হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) এবং হজরত ওমরু বিনল্ আছ (রাজিঃ) এই তিনজনকে মৃত্যু-পথের পথিক করিতে হইবে । তাহারা পরস্পরের মধ্যে একথারও মীমাংসা করিয়া লইল যে, কে কাহাকে হত্যা (শহীদ) করিবে । ছরাত্তা আবদুর রহমান-বিন্-বলজম, মহাপ্রাণ ■■■ আলী (কঃ—ওঃ)-কে, বরক্-বিন্-আবদুল্লা এতিমি হজরত মাবিয়া (রাজিঃ)-কে, ওমরু-বিন্-বকর এতিমি হজরত ওমরু-বিনল্ আছ (রাজিঃ) কে হত্যা করিবার ভার গ্রহণ করিল । ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, এই হত্যা কার্য্য একই দিনে—ঠিক একই সময়ে সম্পন্ন করিতে হইবে । তদনুসারে ১৬ই রমজানুল মবারক—জুমার দিন ফজরের সময় (অতি প্রত্যুষে) এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে বলিয়া উহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিল । অতঃপর এই ৩টা দুর্বৃত্ত মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে কুফা, দামেশ্ক্ ও মেহেরাতিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল ; এবং যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থান ত্রয়ে গিয়া পহুছিল । যখন রমজান শরীফের সেই নির্দিষ্ট তারিখ আসিল, সেই দিন (জুমার দিন ফজরের নমাজের সময়) যখন হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) দামেশ্কের জামে-মছজেদে

নমাজে এমামতি করিতেছিলেন, ঐ সময় বরক্-বিন্ আবদুল্লাহ্ এতিমি তাঁহাকে তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত করিল ; সে মনে করিল, এই ভীষণ আঘাতে হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর নিশ্চয়ই দফা-রফা হইয়াছে। সে তরবারির আঘাত করিয়াই ক্রন্তগতি পলায়ন করিতে ছিল, কিন্তু অনতিবিলম্বে ধরা পড়িল। হজরত মাযিয়া (রাজিঃ)-এর গায়ে সামান্য মাত্র আঘাত লাগিয়াছিল, সুচিকিৎসার ফলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। বরক্ এর দণ্ড-বিধান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে ; কেহ কেহ লিখিয়াছেন, উহাকে তৎক্ষণাৎ 'কতল' (হত্যা) করা হয় ; আর কাহারও কাহারও মতে তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারাবদ্ধ রাখিয়া, পরে তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল। মেহেরে হজরত ওমর-বিনল্-আছ (রাজিঃ) অশ্রুহতা নিবন্ধন ঐ নির্দিষ্ট তারিখে জামে-মহজেদে ফজরের নমাজ পড়িতে গিয়াছিলেন না, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সেনাপতি আবু জয়বাঃ-বিন্-আমের, ফজরের নমাজের এমামতি করিতেছিলেন ; হজরত ওমর বিনল্-আছ (রাজিঃ)-কে মনে করিয়া, ওমর-বিন্-বকর এতিমি, তাঁহাকে তরবারির এক ভীষণ আঘাতে হত্যা করিল। আবার ঐ দিনই ঠিক ঐ সময় কুফার জামে-মহজেদে, আবদুর রহমান বিন্ বলজম, ফজরের নমাজের সময়, মহজেদের দ্বারদেশে, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ভীষণ ভাবে তরবারির আঘাত করিল। সেই দারুণ আঘাত তাঁহার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ছিল ; সেই আঘাতে অল্পশৌণিতপাত হইয়া ২ দিন পরে, ৪০ হিজরীর ১৭ই রমজানুল মবারক—আদর্শ ধার্মিক, আদর্শ তাপস, আদর্শ ধলিফা, আদর্শ ছাহাবাঃ কারাম, অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন (ইম্মা লিল্লাহে ওম্মা ইম্মা এলায়হে রাযেউন)। এই শাহাদৎ-ঘটনার বিবরণ এই যে, পাষণ্ড আবদুর

রহমান-বিন্-বলজম কুকা নগরে পহুঁছিয়া প্রথমে বীর বহু-বান্ধবদিগের
 সঙ্গে দেখা সাফাৎ করিয়াছিল ; কিন্তু কাহারও নিকট বীর ছয়ভিলস্কির
 বিষয় প্রকাশ করিয়াছিল না ; অবশেষে অনেক ভাবা-চিন্তার পর বীর
 অকৃত্রিম 'দোহ' (বহু) শবিত্-বিন্-নজরাহ্ আশ্-জরীর নিকট বীর
 পাপ-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল ; এবং তাহার নিকট সাহায্য চাহিল । শবিত্
 প্রথমে তাহাকে এই তীব্র নজর হইতে প্রতিবিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু
 অবশেষে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর সে তাহার এই তীব্র হৃদয়ের
 সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল । এতিমি সম্মানারের বে ১০ জন লোক
 ধারোজী দলভুক্ত হইয়া নহরওয়ানের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা
 সকলেই সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল । তাহাদের বে সকল আত্মীয়-
 স্বজন কুকা নগরে বাস করিত, তাহারা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর
 প্রতি নিত্য 'নারাজ' (বিরূপ) এবং বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিল ।
 এব্-নে বলজম ঐ সকল লোকের গৃহে সর্বদা বাতায়িত করিয়া তাহাদের
 সঙ্গে মেলা-মেলা করিত । তাহাদেরই এক গৃহে কতাম নারী এক পয়সা
 সুন্দরী রমণীকে সে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল
 হইয়া উঠিল । ঐ নারীর পিতা ও ভ্রাতা নহরওয়ানের যুদ্ধে শমন সন্মানে
 প্রেরিত হইয়াছিল ; এব্-নে বলজম এই সুন্দরীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব
 পাঠাইল । রমণী বলিল, যদি বিবাহের পূর্বে তুমি আমার দেন-মোহর
 আদায় করিয়া দাও, তবে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে বান্ধী আছি ।
 যখন এব্-নে বলজম মোহরের পরিমাণ জানিতে চাহিল, তখন সেই
 প্রতিহিংসা-পরায়ণ নারী কহিল, আমার মোহরের পরিমাণ ৩ হাজার
 দরহম, একটা দাস, একটা দাসী এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর
 ছিন্ন মস্তক । এব্-নে বলজম ত হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হত্য
 সাধন জন্যই আসিয়াছিল ; সুতরাং সে বলিল, আমি কেবলমাত্র শেষোক্ত

শর্ত পালন করিতে পারি, অস্ত্রাশ্র শর্ত পালন—অর্থাৎ নগদ দেন-মোহরাদি আদায় করিতে আপাততঃ অক্ষম । প্রতিহিংসা-বিষে জর্জরিতা কতাম বলিল, তুমি যদি দেন-মোহর সম্বন্ধে শেষ শর্ত-পালন করিতে পার, তবে আমি অস্ত্রাশ্র দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য আছি । কতাম দরদান নামক তাহার এক আত্মীয়কেও এব্‌নে বলজমের সাহায্যকারী রূপে নিযুক্ত করিল । অবশেষে ১৬ই রমজানুল মবারক জুমার দিন অতি প্রত্যুষে (শেষ রাত্রিতে) পূর্বোক্ত শবিত্-বিন্-শজরাহ, এব্‌নে বলজম ও দরদান কুফার জামে-মছজেদের দরজার পাশে লুকাইয়া রহিল । ধর্মপ্রাণ মহামাত্র আমিরুল মুমেনিন যথানিয়মে নমাজীদিগকে মছজেদে আগমন জন্ত আহ্বান করিতে করিতে, মছজেদের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলেন ; সেই সময় দরদান অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিল । কিন্তু এই আঘাত মছজেদের দরওয়াজার চৌকাঠে কিংবা প্রাচীয়ে লাগিয়া ব্যর্থ হইল । হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ যখন দরওয়াজাঃ হইতে দ্রুতগতি মছজেদের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন আবদুর রহমান-বিন্-বলজম তীব্র গতিতে লম্ফ প্রদান পূর্বক তাঁহার ‘গরদানে’ (ঘাড়ে) সবলে তরবারির ভীষণ আঘাত করিল । সে আঘাত বড়ই সাত্বাতিক ছিল । তিনি মছজেদে সমাগত মুহুম্মি-দিগকে আদেশ করিলেন, উহাদিগকে ধরিয়া ফেল ; তৎক্ষণাৎ লোকেরা উহাদিগকে ধরিবার জন্ত পাষাণদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল । দরদান ও শবিত্ দ্রুতবেগে ছুটিয়া পলাইল ; কিন্তু ইব্‌নে বলজম পলায়নের অবসর পাইল না ; লোকেরা মছজেদের পাশেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল । হুয্মী নামক একব্যক্তি ছুরাশ্রা শবিত্‌কে ধরিয়াছিল ; কিন্তু সে তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল । দরদান পলায়ন ‘করিয়া তাহার গৃহের নিকট পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, অনুসরণকারী লোকেরা সেই

হানেই তাহাকে কুকুরের কায় হত্যা করিয়া ফেলিল । পাণীষ্ঠ এব্‌নে বলজম ধৃত হইয়া মহামান্ন আমিরুল মুমেনিনের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি বলিলেন, উহাকে আপাততঃ বন্দী করিয়া রাখ, যদি এ ‘বখমে’ আমার মৃত্যু হয়, তবে উহার গরদান উড়াইয়া দিবে ; আর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে তখন যাহা কর্তব্য বোধ হইবে, উহার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই করিব । অতঃপর তিনি দ্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন ; যদি আমি এই আঘাতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হই, তবে এব্‌নে বলজমকে তরবারির একই আঘাতে “কতল” করিবে । দুর্ভাগ্য এব্‌নে বলজমের তরবারির সেই প্রচণ্ড আঘাত, আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ‘কাণপটি’ (কর্ণ-মূল) পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছিল । আর তরবারির ধার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল । ভীষণ যন্ত্রণা সহ করিতে করিতে ১৭ই রমজান শনিবার দিন তাঁহার পবিত্র অমর আত্মা, দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্বক ‘জন্নতল ফেরদওছ’ এ (স্বর্গরাজ্যে) চলিয়া গেল । মোছলমানদিগের প্রতি যেন ভীষণ অশনি সম্পাত হইল । তৎসময়ের সর্ব প্রধান মোছলমান পুরুষ,—খোদাতালার শাদ্দুল নামে অভিহিত অদ্বিতীয় বীরপুরুষ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিলেন । তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে হবষব বিন্-আবদুল্লা আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমিরুল মুমেনিন ! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তবে কি আমরা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর হস্তে বার্ষ্যেত করিব ? তদুত্তরে হজরত আমিরুল মুমেনিন—খলিফাতুল মুছলেমিন (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, আমি এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না ; তোমরা যাহা কর্তব্য মনে কর, তাহাই করিবে । তৎপর তিনি পুত্রদিগকে বহুমূল্য-বান্ উপদেশ প্রদান করিলেন । পরে একটি সাধারণ অছিয়ত-নামা লিপিবদ্ধ করাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার অবসর পাইলেন না ;

“আয়েনাহা ইল্লাল্লাহে”—এই পবিত্র তওহিদ-বাণী উচ্চারণ করিতে করিতেই তাঁহার পবিত্র জীবনের অবসান হইল। ইস্লামের প্রচণ্ড মার্ত্তও অকালে অন্তমিত হইয়া গেল; তাঁহার পবিত্র গৃহ শোক-পূরীতে পরিণত হইল। কুফা নগরীতে শোকের প্রচণ্ড ঝড় বহিল। হজরত রহুলে আকরম (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, কোর-আনের প্রকৃত আদেশ পালক, ধর্মের সাক্ষাৎ প্রতীমূর্তি, সত্য ও সত্যের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষাকারী, অদ্বিতীয় বীর, মহা বিদ্বান, বিশ্বাসিগণের নেতা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত খেলাফতেরও অবসান হইল।

হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহর শাহাদতের অব্যবহিত পরে পানীঠ আবদুর রহমান এব্নে বলজম, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সমীপে বন্দী অবস্থায় আনীত হইল; তিনি তুরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে তাহার পাপ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। পাপাচারীর সুন্দরী নারী বিবাহের আকাজক্ষা পূর্ণ (?) হইল! অবশ্য পৈশাচিক প্রতিহিংসা-পরায়ণা কতাম নারী শয়তানী নারীর দেন-মোহর আদায় হইল। এই পিশাচ ও পিশাচিনী মোহলমান সমাজের কি সর্বনাশ করিল, তাহা স্বরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মৃত্যুকালে আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মুছলেমিন হজরত আলী মরতুজাঃ (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুর্জয় সাহস ও অমানুষিক বীরত্বের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল না। মাত্র পোণে পাঁচ বৎসর কাল খেলাফত করিবার পর তিনি শহীদ হইলেন। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছাইনে (রাজিঃ) এবং হজরত আবদুল্লা-বিন্-জাফর (রাজিঃ) তাঁহার গোছল দেওয়াইলেন। ৩ খানি বস্ত্র দ্বারা কাফন দেওয়া হইল; কিন্তু তাহাতে কামিজ দেওয়া হইয়াছিল না। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার জানাযার নমাজ পড়াইলেন। তাঁহার পবিত্র কবর কোথায় হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ

আছে । সত্যপথ-ভ্রষ্ট চরিত্রের খারিজগণ তাঁহার প্রতি বেক্রপ বিদ্রোহ-পরায়ণ ছিল, তাহাতে উত্তরকালে তাঁহার কবর খুঁড়িয়া তদীয় পবিত্র দেহের অবমাননা করা তাহাদের পক্ষে কিছুতেই অসম্ভব ছিল না ; এক্ষণে তাঁহার দফন কার্য রাত্রিকালে গোপনে, কুফা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী একস্থানে সম্পন্ন হইয়াছিল । তাঁহার পুত্রগণ ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং পরম ভক্তগণ ব্যতীত সে স্থানের সন্ধান আর কেহই জানিতেন না । এক্ষণে তাঁহার পবিত্র “ কবর শরীফ ” সাধারণের অজানিত ছিল । পরে আব্বাহ-বংশীয় মহাপরাক্রান্ত, ভুবন বিদিত ■ বনামখ্যাত খলিফা হাক্কর রশিদ, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পবিত্র কবরের সন্ধান পান ; এবং সেই পবিত্র কবর শরীফের উপর এক সুদৃশ্য সমাধি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন । ক্রমে উহা মহাতীর্থে পরিণত হইয়া একটি সুন্দর নগর রূপে গড়িয়া উঠে । বর্তমানে উহা “ নজফ-আশ্রফ ” নামক একটি সুদৃশ্য এবং সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগরে পরিণত হইয়াছে । কারবালার স্থায় এই নগর ও শিয়াদিগের একটি প্রধানতম তীর্থ স্থান । ছুন্নি সম্প্রদায়ের মোছলমানগণ ও মহাতত্ত্ব সহকারে ঐ কবর শরীফ জেয়ারত করিয়া থাকেন ।

আমিরুল মুমেনিন-খলিফাতুল মুছলেমিন হজরত আলী করিমুল্লাহ ওয়াজ্জহ ‘বাহেরী’ ■ ‘বাতেনী’ (প্রকাশ ও আধ্যাত্মিক) বিস্তার যে ক্রিপ পারদর্শী ছিলেন, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা হুঃসাধ্য । তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা অসাধারণ ছিল । অতি জটিল ও কঠিন মহলার তিনি অতি সহজে মীমাংসা করিতেন । এক্ষণে পূর্ববর্তী মহামান্ব খলিফাগণ জটিল মহলা-মহায়েল মীমাংসার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতেন । তিনি এমন সুন্দর রূপে—যুক্তি-সম্মত ভাবে তাহার মীমাংসা করিতেন যে, সকলে তাহাতে বিশ্বাসবিষ্ট হইতেন । তাঁহার বক্তৃতা শক্তি অসাধারণ ছিল । এ শক্তি তিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট হইতেই লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় লোক মোহিত হইত ;
 কুফার কঠোরপ্রাণ অধিবাসীদিগের হৃদয় ও তাঁহার বক্তৃতায় এক এক
 সময় এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিত যে, তাহারা তাঁহার জন্ত জীবনোৎসর্গ
 করিতে প্রস্তুত হইত। তিনি সরল চিত্ত, খাঁটি মোছলমানদিগের ভক্তি-
 শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা সংসারের
 মায়ায় মুগ্ধ, ছনিয়াবী স্বার্থ লাভ বাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাঁহারা তাঁহার
 বিপক্ষতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অবশ্য অধিকাংশ খ্যাতিনামা
 ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ও ‘আহ্লে বদর’ (যাহারা সনামখ্যাত বদর যুদ্ধে
 হজরত [ছালঃ]-এর সঙ্গী ও সহযোগী ছিলেন) তাঁহার পক্ষপাতী,
 সাহায্যকারী এবং তাঁহার জন্ত জীবনোৎসর্গকারী ছিলেন। জমল যুদ্ধে
 ছকিন যুদ্ধে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শহীদও হইয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা
 হজরত ওছমান জিন্নুরারেন (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পর, খলিফা হইবার
 দাবী তাঁহারই অগ্রগণ্য ছিল। তিনি আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পিতৃব্য-
 পুত্র, জামাতা ও বনি-হাশেমের প্রচণ্ড ভাস্কর স্বরূপ ছিলেন। তিনি
 অতি শৈশবকাল হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) কর্তৃক প্রতিপালিত
 হইয়াছিলেন ; তিনি বালকদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে পবিত্র এছলাম ধর্ম গ্রহণ
 করিয়াছিলেন। আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সহবাসে থাকিয়া, তাঁহার
 আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্বক, তিনি একজন আদর্শ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন।
 আঁ হজরত (ছালঃ) যেমন পয়গম্বরী লাভের পূর্বে “ ছুর ” গিরি-গহবরে
 অবস্থান পূর্বক পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া
 অদ্বিতীয় আধ্যাত্ম-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)
 তখন বালক হইলেও, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে
 তদ্রূপ ধ্যান-ধারণায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। শরিয়তের সকল
 বিধানই তিনি দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেন। নমাজ্ কখন “ কাজা ”

করিতেন না । ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে নমাজ্ আদায় করিতেন । রোজা কখনও ত্যাগ করেন নাই, জীবনে বহু হজ্জ্ করিয়াছিলেন ; যখন অর্থ-সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তখন নিয়মিত রূপে জাকাৎ আদায় করিতেন । তদ্ব্যতীত “ ছাদকা ”, দান, খায়রাত এত অধিক পরিমাণে আদায় করিতেন যে, কোনও প্রার্থীই তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া বাইত না ।

একদিনের ঘটনা এই যে, তিনি যখন খলিফা, কুফার যখন তাঁহার রাজধানী, সমগ্র আরব, পারস্ত, এরাকও মেহের যখন তাঁহার শাসনাধীন, বস্তুতঃ মাল তহবিল অর্থে-পরিপূর্ণ, তখন একজন বিদেশী ‘মোছাফের’ (প্রবাসী) কুফায় আগমন করিলেন । ঐ সময় এমাম ব্রাহ্ম-যুগলের ‘দস্তরখান’ এমন ‘কোশাদা’ ছিল যে, স্থানীয় এবং বিদেশীয় অসংখ্য ‘মেহমান’ (অতিথি) তাঁহাদের সঙ্গে দুই বেলা খানায় ‘শরীক’ (সন্ধ্যা) হইতেন । নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা অতিথি সৎকার করা হইত । মোছাফের মগরেবের নমাযের সময় কুফার জামে-মছজেদে গমন করিলেন । দেখিলেন, মছজেদের একটি খামের নিকট একজন লোক বসিয়া একটি ক্ষুদ্র পুটুলী হইতে কি জিনিষ বাহির করিতেছেন । উহা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে (শাকড়ায়) বাঁধা ছিল । এফতারের সময় হইলে তিনি ঐ পুটুলীস্থ খানিক চূর্ণ মুখে দিলেন । মোছাফেরকে নিকটে দেখিয়া বলিলেন, “মিঞা ! একটু থাইবে, এই লও ” বলিয়া খানিকটা চূর্ণ বা শুঁড়া তাঁহার হাতে দিলেন । মোছাফের তাহা গলাধঃ করিয়া জানিলেন উহা শুষ্ক খোরমা-চূর্ণ ; কিন্তু অনেক দিনের পুরাতন বলিয়া তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট । তিনি অতি কষ্টে উহা উদরস্থ করিয়া ভাবিলেন, আহা ! এই লোকটি কি গরীব ! দরিদ্রতা বশতঃ এই পুরাতন খোরমা-চূর্ণ দ্বারা এফতার করিলেন । আমরা এমাম ছাহেবদিগের দস্তরখানে কত উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করিতেছি, যদি এই গরীব ব্যক্তিকে সেই দস্তরখানে লইয়া

গিয়া কিছু খাওয়ান যাইত, তবে বড় ভাল কাজ হইত । আমি মহামান্ন
এমাম ছাহেবদিগকে এই কথা বলিব । তদনুসারে নমাজ শেষ করিয়া তিনি
মোছাফের খানায় গমন করিলেন ; এবং নৈশ-আহারকালীন এমাম ভাত-
বুগলকে বলিলেন, হজুর ! আর এই স্থানীয় জুমা-মছজেদে মগ-রেবের
নমাজের সময় দেখিলাম, একজন অতি দীন-দরিদ্র মোছলমান পুরাতন ও
তিক্ত খোরমা-চূর্ণ দ্বারা এক্তার করিতেছেন, তিনি আমাকে ঐ চূর্ণ
খানিকটা খাইতে দিয়াছিলেন ; তিক্ত ও বিখাদ বলিয়া আমি অতি কষ্টে
তাহা গলাধঃ করিয়াছিলাম । আমরা এত উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য রসনা
পরিভূক্ত ও উদর পূর্ণ করিতেছি ; ঐ গরীব লোকটিকে ডাকিয়া আমাদের
সঙ্গে আহার করাইলে হয় না ? তখন এমাম ছাহেবদ্বয় ক্রন্দন করিয়া
বলিলেন, হে ভদ্র আগন্তুক ! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন
নাই ? তিনিই যে আমাদের পরম প্রজাম্পদ পিতা আমিরুল মুমেনিন
খলিফাতুল মোছলেমিন শেরে খোদা হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) ।
তিনি সর্বদা রোজা পালন করেন, ঐরূপ সামান্য খোরমার ছাতু বা অন্য
সামান্য জিনিষ দ্বারা এক্তার করেন, এবং অতি মামুলী খাদ্য দ্রব্য আহার
করিয়া থাকেন । এই সকল রসনা-তৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য, বিশেষ কোনও
খটনা বশতঃ তিনি কচিৎ খাইয়া থাকেন । দূরদেশী প্রবাসী এই কথা
শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; আর মহামান্ন খলিফার প্রতি তাঁহার
বিমল ভক্তি-স্রোত প্রবল ভাবে উছলিয়া উঠিল ।

মহামান্ন হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ), হেজরতের পূর্ব পর্য্যন্ত
মক্কা-মোরাব্বমায় আব্বা হজরত (ছালঃ)-এর পরিবার ভূক্ত ছিলেন ; তাঁহার
অন্ন-বস্ত্র আব্বা হজরত (ছালঃ)ই যোগাইতেন । তিনি নিজেও কিছু উপার্জন
করিয়া, নিজের অস্বাস্থ্য প্রয়োজনীয় খরচ-পত্র চালাইতেন । যতদিন তাঁহার
পিতা জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি স্বীয় মেহময় সর্ব কনিষ্ঠ পুত্রকে কিছু

কিছু আর্থিক সাহায্যও করিতেন । ওশোল মুমেনিন হজরত খদিকা (রাঃ—আঃ) বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইলেও, তৎ ~~বাক্য~~ ~~আ~~ ~~ককর~~ (ছালঃ)-এর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন । সুতরাং মাতৃস্বরূপিণী ওশোল-মুমেনিন ও তাঁহাকে অবশ্য পকেট খরচ বাবদ কিছু টাকাকড়ি দিতেন । হুলকথা, তাঁহার সে সময় কোনও রূপ অর্থকষ্ট হয় নাই । মহা-মাননীরা মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ) এর শেষ জীবনে কিছু অর্থ-সকট উপস্থিত হইয়া ছিল বলিয়া মনে হয় । কারণ, আ হজরত (ছালঃ)-মোছলেম-মাতার বিপুল ঐশ্বর্য রাশি এছলাম ধর্ম-প্রচারে ও দীন-দরিজের অভাব মোচনে প্রায় নিঃশেষিত করিয়া ছিলেন । মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যুর পর আ হজরত (ছালঃ)-এর অবস্থা যে সচ্ছল ছিল না, তাহা তদীয় জীবন চরিত পাঠে জানা যায় । তবে সাংসারিক খরচ-পত্র নির্বাহের জন্য অর্থের অভাব ও হয় নাই । হেজরতের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন মদীনার গমন করিলেন, তখন তাঁহার অর্থাতাব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় । সময় সময় বয়তুল মাল হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাই-তেন । তখনও বয়তুলমালে বেশী অর্থ সঞ্চিত হইত না । বিবাহের পূর্ব-পর্যন্ত তাঁহার এই অবস্থা ছিল । বিবাহের পরেও সচ্ছল অবস্থা ছিল না । সময় সময় কার্মিক পরিশ্রম করিয়াও অর্থোপার্জন এবং তদ্বারা কষ্টে-স্ট্রেঃ জীমনযাত্রা নির্বাহ করিতেন । আ হজরত (ছালঃ) এবং স্বর্গ-রাজী হজরত ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ)-এর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা ~~■~~ বেশী ছিল না । স্বামী-স্ত্রী, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা । সময় সময় একটি পরিচারিকা থাকিত । আ হজরত (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পর, যখন খেলাফতের ‘যমানাঃ’ (সময়) আসিল ; মোছলমান বীর-বৃন্দের দ্বারা নূতন নূতন দেশ জয় এবং বয়তুল মালে বিপুল অর্থরাশি আসিতে লাগিল, তখন মহামান্ব খলিফার মন্ত্রণা-সভার সভ্যগণ এবং মদীনাতে অসংখ্য

ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) গণ বয়তুলমাল হইতে যে পরিমাণ অর্থ পাইতে লাগিলেন, তদ্বারা তাঁহাদের আর অর্থভাব রহিল না । অধিকাংশ ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ই যুদ্ধোপলক্ষে শাম, এরাক, পারস্ত ও মেছেরে চলিয়া গিয়া-ছিলেন ; তাঁহারাও যুদ্ধ-জয়-লব্ধ অর্থ ও সামগ্রী-সম্ভার হইতে যে পরিমাণ অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও প্রচুর ছিল । স্বর্গের মহারাজী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-এর পরলোক গমনের পর এমাম ভাতৃস্বয়ের বিবাহ হইল, মহামান্য আমিরুল মুমেনিন অন্ত্যান্ত বিবাহ করিলেন ; পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী প্রভৃতিতে তাঁহার সংসার ভরপুর হইল, লোক-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল, দাস-দাসীর ও অভাব রহিল না ; সুতরাং সেই পরিমাণে খরচ-পত্র ও অনেক বাড়িয়া ছিল ; কিন্তু তাই বলিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ), অতিরিক্ত খরচ-পত্র করিতেন না । ‘মামুলী’ ভাবেই জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন । বিলাসিতার কোন চিহ্ন তাঁহার গৃহে দৃষ্ট হইত না । দান-দাতব্যে তাঁহার বহু অর্থ ব্যয়িত হইত । দরিদ্রের হুঃখ মোচনে তাঁহার হস্ত সর্বদা মুক্ত ছিল । সে বিষয়ে তিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণ করিতেন । পরের হুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত । তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের মধ্যেও সেই গুণ পূর্ণভাবে বিরাজ করিত ।

তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পর তিনিই খলিফা পদের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম পুরুষ ছিলেন । কি প্রাথমিক এছলাম গ্রহণে, কি হজরতের পিতৃব্যপুত্র ও তাঁহার প্রিয়তম জামাতা বলিয়া, কি ঈশ্বারানুরাগে, কি আ হজরত (ছালঃ)-এর আদর্শ চরিত্রে, কি অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা ও এবাদৎ-বন্দেগীতে, কি অসাধারণ বীরত্ব ও শৌর্য্য বীৰ্য্যে—সকল দিক দিয়াই তিনি ঈর্ষ খলিফার স্থান অধিকার করিবার যোগ্যপাত্র ছিলেন । আ হজরত (ছালঃ)-এর সর্ব প্রধান ছাহাবাঃ (ইয়ার) চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি অন্যতম । সুতরাং খেলাফতের দাবী তাঁহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য

ছিল। ‘আশরায় মোবাহরা’ দিগের মধ্যে হজরত আবু ওবেদা-বিন্-জারাহ (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়রোফ্ (রাজিঃ), হজরত ছয়ীদ (রাজিঃ) এবং ১ম, ২য় ও ৩য় খলিফা ইতিপূর্বেই পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন ; ১০ জনের মধ্যে ৬ জন জীবনের পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন ; বাকী ছিলেন (১) হজরত আলী (কঃ—ওঃ), (২) হজরত তাল্হা (রাজিঃ), (৩) হজরত যোবের (রাজিঃ) ■ (৪) হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ) । কিন্তু সকল দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনিই সেই সময় খলিফা-পদের সর্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র ছিলেন । হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-কে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন খলিফার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে আপনাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন । সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যে খলিফার প্রকৃত হক্কার ছিলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । আর তাঁহার খেলাফৎ কালও প্রকৃত খেলাফৎ এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । তৎপরেই ব্যক্তিগত খেলাফৎ বা রাজতন্ত্রের আবির্ভাব । এছলামী গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব কাল ছিল ৩০ বৎসর । তন্মধ্যে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ ৬ মাস ধরা হয় ।

হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর আহলিয়া

(স্ত্রী) ■ সন্তান-সন্ততিগণ ।

ঐতিহাসিকদিগের মতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সর্বশুদ্ধ ৯টি বিবাহ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের গর্ভে ১৪টি পুত্র সন্তান ও ১৭টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ।

১। তাঁহার প্রথম পত্নী হজরত রহুল করিম (ছালঃ)-এর সর্ব কনিষ্ঠা দুহিতা-রত্ন, স্বর্গের মহারাজী ■■■ কাতেমাঃ জোহরাঃ রাজিঃ আল্লাহ আনহার গর্ভে ২টি আদর্শ বর্ষপ্রাপ "এমাম" উপাধিধারী পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ■ হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)। আর কন্যা দ্বয়ের নাম হজরত জয়নব (রাঃ—আঃ) ■ হজরত কুলছুম (রাঃ—আঃ)। হজরত খাতুনে ■■■ কাতেমাঃ জোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবিত কালে তিনি অল্প বিবাহ করেন নাই।

২। ওম্মোল বনিন বিস্তে হরাম কলাবিয়া। ইনি নর-পিশাচ শেমর যিল যোশনের ভগিনী ছিলেন। ইহার গর্ভে হজরত আব্বাছ, হজরত আকবর, হজরত আবদুল্লা ও হজরত ওছমান এই চারিটি ধুরন্ধর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ■

৩। লায়লী-বিস্তে-মছউদ-বিন্-খালেদ (রাঃ—আঃ); ইহার গর্ভে হজরত ওবারহুলাহ্ ■ হজরত আবুবকর নামক দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৪। আছমাঃ-বিস্তে-য়ামিছ (রাঃ—আঃ); ইহার গর্ভে হজরত মোহাম্মদন আল্ আছগর ও হজরত ইয়াহ্ ইয়ার জন্ম হয়। উপরোক্ত ৮ ভ্রাতা কারবালার মহাযুদ্ধে, আপনাদের পরম শত্রুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত এমাম হোছায়েন রাজি আল্লাহ আনহর সঙ্গে শহীদ হইয়াছিলেন।

■। এমামাঃ-বিস্তে-আবিল : আছ-বিন্-আর-রবিয় (রাঃ—আঃ)। ইহার মাতা হজরত জয়নব (রাঃ—আঃ) বিস্তে-হজরত রহুলোল্লাহ্ (ছালঃ) অর্থাৎ—ইনি হজরত নবী-করিম (ছালঃ)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। ইহার গর্ভে মোহাম্মদনল্ আওছত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬। খুলা-বিস্তে-জাফর (রাঃ—আঃ); ইহার সঙ্গে 'হান্ফিয়া' বংশের সন্ধক ছিল। ইহার গর্ভে একটি মাত্র মহাপরাক্রান্ত বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম মোহাম্মদনল্ আকবর—সাধারণতঃ

ইনি মোহাম্মদ বিনন্ হানাফিয়া (হানিকা:) নামে অভিহিত হইতেন ।
কারবালার যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন না ।

৭ । ছহবা: বিস্তে রবিয়া তগ্‌লবিয়া: (রা:—আ:) । ইহার
গর্ভে ওম্মোল হাছন কোব্রা নামক পুত্র ও ওম্মে কোলছুম ছোগ্রা
নাম্নী কন্যার জন্ম হয় ।

৮ । বিস্তে ওমরা-আন্ করেছ-বিন্-আদি কল্‌বি (রা:—আ:) ।
ইহার গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব কালেই মৃত্যু-মুখে
পতিত হন ।

৯ । একটি পত্নী ক্রীতদাসী বলিয়া কথিত । কোনও কোনও
ঐতিহাসিকের মতে ইহার একমাত্র পুত্র মোহাম্মদ আইগীর কারবালার
যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন ।

হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজ্জহর আরও কয়েকটি কন্যা সন্তান
ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম জানা
যায় না । অওন-বিন্-আলী নামক তাঁহার একটি পুত্রের নাম জানা যায় ;
তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আছমা:-বিস্তে ম্যামিছ
(রা:—আ:)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

৪র্থ খলিফা হজরত আলী (ক:—ও:)-এর বংশ-তরু কেবলমাত্র
নিম্ন-লিখিত ৫টি পুত্র হইতে এবাবৎ ছনিয়াতে বিদ্যমান আছে ।
(১) হজরত এমাম হাছন (রাজি:), (২) হজরত এমাম হৌছেন
(রাজি:), (৩) হজরত মোহাম্মদ-বিন্-হানিফা:, (৪) হজরত আব্বাছ
(৫) হজরত ওমর । পূর্বোক্ত ৫টি পুত্রের সন্তান-সন্ততি হইতে পৃথিবীতে
মহা সম্মানিত ছৈয়দগণ বিদ্যমান আছেন । তন্মধ্যে এমাম ভাতৃ-যুগলের
বংশধরগণই খাঁটি ছৈয়দ, ইহার হাছনী ও হোছায়নী নামে অভিহিত
হইয়া থাকেন । কিন্তু বর্তমান সময়ে অকৃত্রিম ‘কুছীনায়া’ (বংশ-তালিকা)

ব্যতীত ছৈয়দ বংশ স্থির করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে । ইহাদের বংশ বৃদ্ধি ও অসাধারণ রূপে হইয়াছিল । কারবালার যুদ্ধে এবং তৎপর অন্ত্যান্ত ঘটনার অধিকাংশ ছৈয়দ শহীদ না হইলে, আজ ইহাদের বংশ আরও অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিত । পৃথিবীর সকল অংশেই এই বংশের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় । অথচ হজরত মাবিয়া (রাজিঃ) ও বনি-ওম্মিয়ার অন্ত্যান্ত খলিফার বংশধরগণের অস্তিত্ব প্রায়ই দেখা যায় না । খাঁটি ও আদর্শ ছৈয়দ বংশের উপর আল্লাহ তা-লার অপার করুণা সর্বদাই বর্ষিত হইয়া থাকে ; কারণ তাঁহারাই মহামান্ব মহানবীর প্রকৃত বংশধর ।

••

প্রার্থনা

হে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোলা ! তুমি নবী-বংশের—হজরত খাতুনে ফাতেমাঃ-যোহরা (রাঃ—আঃ) ও হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজ্জ্বর শুভ দোওয়া, সকল মোছলমানের উপর বর্ষণ কর । শাহাদৎ-প্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের পবিত্র শোণিতের পরিবর্তে, হুনিয়ার সকল মোছলমানকে মুক্তি-পথের পান্ন কর ।

তৃতীয় ভাগ।

খাতুনে জন্নত

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ

(রাঃ—আঃ)-এর জীবনী।

এই স্থানে ঠাহার জীবনী লিখিত হইতেছে, তিনি ছনিয়ার সমুদয় নারীর শিরোভূষণ, বেহেশতের রাজ্ঞী, হজরত রছুলোলাহ্ (ছালঃ)-এর পরম স্নেহের আধার কনিষ্ঠা নন্দিনী, আদর্শ ধর্ম-পরায়ণা, আদর্শ কণ্ঠা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)। ঠাহার সঙ্গে ছনিয়ার কোনও নারীর তুলনা হয় না। ঠাহার চরিত্রের পবিত্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, পিতৃ-ভক্তি ও স্বামী সেবা-অতুলনীয় ছিল। তিনি যেমন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের ঔরসে ও সর্বগুণালঙ্কৃত জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সর্ববিধ সদগুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ-(রাঃ—আঃ) বিস্তে থোয়েল্দ বিন্-আসদ, বিন্-আবদুল গরে, বিন্-কচ্ছি, খাতুনে জন্নতের মহা-মাননীয়া গর্ভ-ধারিণী। এই কচ্ছি আঁ হজরতের (ছালঃ)-এর 'মওরছে

পাক পাঞ্জতন (৫৪৬) কাতেমাঃ ঘোহরাঃ ।

আলা' (উর্দুতন পূর্ব পুরুষ) । সূতরাং আ হজরত (ছালঃ) ও তাঁহার সর্ব
 গুণালঙ্কৃত আদর্শ পত্নী একই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ওম্মোল
 মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর উর্দুতন চতুর্থ পুরুষ,
 আ হজরত (ছালঃ)-এর পূর্ব পুরুষের সঙ্গে একত্র মিলিয়া গিয়াছে । আবার
 ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'শেজরাঃ-
 নছব' (বংশ-তালিকা) মারের দিক্ দিয়া এইরূপ—হজরত খদিজাঃ, (রাঃ—
 আঃ) বিস্তে কাতেমাঃ, বিস্তে-যায়েদাঃ-বিন্ আলা ছলয়ম বিন্ হরম বিন্-
 রওয়াজাঃ-বিন্-মজর-বিন্ আবদ-বিন্-ময়যিছ-বিন্-আমের তোলি । সূতরাং
 তাঁহার মাতৃপক্ষ ও অতি শরীফ্ ছিলেন । মারের দিক্ দিয়া দশম পুরুষ,
 আ হজরত (ছালঃ)-এর পূর্ব পুরুষের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইয়াছে ।
 সূতরাং মহামানীয়া ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—
 আঃ)-এর পিতৃ-মাতৃ উভয় দিকই আ হজরত (ছালঃ)-এর একই বংশ ;
 অর্থাৎ ইহারা সকলেই স্বনামখ্যাত পরগম্বর হজরত এছমাইল (আলাঃ)-
 এর বংশ হইতে উৎপন্ন । এই বংশ-তালিকা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,
 হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ) 'নজিবত্ তোরফায়েন'
 ছিলেন । অর্থাৎ তাঁহার পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলই মহা সম্মানিত সম্ভ্রান্ত
 বংশ হইতে উদ্ভূত ।

হজরত খদিজাঃতুল কোব্‌রার জন্ম ৫৫৫ খৃঃ অব্দ এবং ৫৭ বছরবী
 সনে হইয়াছিল । তিনি প্রথম হইতেই সচ্চরিত্রা ও সর্বগুণের আধার
 ছিলেন । ঐ অন্ধকার যুগেও তিনি “ তাহেরাঃ ” (পাক—পবিত্রা)
 নামে অভিহিতা হইতেন । 'ছেয়াদত' (বোধগী—সম্মান) ■ 'শরাফত'
 (সৌজন্য—ভদ্র ব্যবহার)-এর ■ তাঁহাকে কোরেশদিগের “ ছৈয়দতম্নেছা ”—
 এই গৌরব জনক উপাধী প্রদান করা হইয়াছিল । তাঁহার পিতা
 খোয়েল্দ ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জন করিয়াছিলেন ; এজন্য

মক্কা নগরীতে তিনি “ আমিরুল-ওমরা ” বলিয়া অভিহিত হইতেন ।
 এছলানের আবির্ভাবের পূর্বে—অন্ধকার-যুগে এই আদর্শ মহিলার বিবাহ
 বরাদ্দাঃ এতিমির পুত্র নেয়াশের সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল ; এই ব্যক্তি
 আবু হালাঃ নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিলেন । ইহার ঔরসে বিবী খদিজার
 দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ; তন্মধ্যে একটীর নাম হালাঃ ; এই বালক
 ‘যামানাঃ-জাঃ হলিয়াতে’ (অন্ধকার যুগে)ই যুতুমুখে পতিত হয় ;
 দ্বিতীয় পুত্র হেন্দ হজরত রহুল করিম (ছালঃ)-এর নবুয়ত কাল পর্য্যন্ত
 জীবিত থাকিয়া, ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের পর্যায়ভুক্ত হন । প্রথম
 স্বামীর মৃত্যুর পর, আতিক্-বিন্-আয়েদ মখ্‌রুমির সঙ্গে হজরত বিবী
 খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় । এই পক্ষে একটি কন্যা
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । আতিকের মৃত্যুর পর এই পরিভ্রমিতা মহিলা
 কয়েককাল বৈধব্য দশায় ছিলেন । এই সময় তাঁহার পিতা খোয়েন্দ
 অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; একমুখ ব্যবসা-বাণিজ্য কার্য নিজে সম্পাদন
 করিতে পারিতেন না ; সুতরাং তাঁহার সর্বগুণালঙ্কতা ও বিশেষ বুদ্ধি-
 সম্পন্ন কন্যা-রত্নই সেই বিরাট বাণিজ্য কার্যের সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান
 ও সমাধান করিতেন । তাঁহার বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই হইয়া উষ্ট্র সকল
 নানা দূরদেশে গমন করিত । আনার সেই সকল স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য
 মক্কায় আনিয়া বিক্রয় করা হইত । সুতরাং তাঁহার এই বাণিজ্য কার্য
 পরিচালন জন্য উপযুক্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল । এই বুদ্ধিমতী
 মহিলা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর বিশ্বস্ততা ও গুণ-গরিমার
 বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন ; সুতরাং তিনি তাঁহাকেই স্বীয় প্রধান
 কর্মকর্তা নিযুক্ত করিলেন । একাধিক বার বাণিজ্য যাত্রায় পাঠাইয়া, হজরত
 খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) দেখিতে পাইলেন যে, এই চরিত্রবান্, সুযোগ্য বিশ্বস্ত
 কর্মচারীর দ্বারা ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে—যেদূর উন্নতি

অন্যান্য কর্মচারীর পরিচালনাধীনে ইতিপূর্বে হয় নাই। তিনি স্ত্রীলোক, এবং বিধবা ; সুতরাং পুনঃ স্বামী গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য ; তবেই তাঁহার নিজের যেমন একটা আশ্রয় হইবে, তেমনই এই বিরাট কারবারেরও ক্রমোন্নতি সাধন হইতে থাকিবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এই সর্বগুণালঙ্কৃত, সচ্চরিত্র ও বিশ্বস্ত তরুণ যুবক কর্মচারীকেই স্বামীত্ব বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তদনুসারে তিনি নিজের পক্ষ হইতে আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট বিবাহের ‘পরগাম’ (প্রস্তাব) পাঠাইলেন। সেই প্রস্তাবে ইহাও বলা হইল যে, আপনার ধর্ম্মভীরুতা, বিশ্বস্ততা, কর্তব্য-পরায়ণতা ও যোগ্যতা, আমার মন আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে ; বিশেষতঃ আমাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব হইতে আত্মীয়তার সম্বন্ধ ও রহিয়াছে। অর্থাৎ আমি আপনার স্বন্ধে-আলা (উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষ) কাছির (কোসাই এর) পৌত্র আছদের পৌত্রী ও খোরেনদের পুত্রী। পরগম্বর খোদা (ছালঃ) এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া স্বীয় প্রতিপালক ও পিতৃস্থানীয় পিতৃব্য-আবুতালেবের নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) অতি সঙ্গতিপন্ন, অতি উচ্চ কোরেশ :বংশীয়া বুদ্ধিমতী সদগুণ সম্পন্ন এবং আদর্শ সুন্দরী নারী ছিলেন। আবুতালেব মনে মনে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন, স্নেহাম্পদ :ভ্রাতৃপুত্রের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই বিবাহ সকল দিক দিয়াই সুবিধাজনক ; এবং সর্ববিধ স্বার্থ ■ সুযোগের অনুকূল। তদনুসারে তিনি ভ্রাতৃপুত্রকে বলিলেন, এ বিবাহ করা তোমার পক্ষে একান্ত কর্তব্য। এই বিবাহে তোমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়িবে, অর্থাভাব দূর হইবে, সর্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। এই বিবাহ দ্বারা তোমার সর্ব প্রকার পার্থিব মঙ্গল সাধিত হইবে। (হজরত) খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)

নিজেও একজন অতি বুদ্ধিমতী ও সর্ব গুণালঙ্কৃত মহিলা । মক্কার সর্বত্র তাঁহার প্রশংসাবাদ শ্রুত হওয়া যায় । পিতৃব্যের যুক্তিপূর্ণ পরামর্শানুসারে আ হজরত (ছালঃ) এই বিবাহে সম্মতি দান করিলেন । অবিলম্বে বিবাহের কথাবার্তা ২ দিন তারিখ স্থির হইয়া গেল । তদনুসারে আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় পিতৃব্য আবুতালেব, হজরত হামযাঃ এবং অস্ফাক্ত কতিপয় সম্ভ্রান্ত কোরেশ বরষাত্রী সহ বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইলেন । বিবী ছাহেবার অতি বৃদ্ধ পিতা খোয়েল্দ কন্যা সম্প্রদান করিলেন । এই স্থানে ঐতিহাসিক দিগের মধ্যে মতভেদ আছে । অনেকেই বলেন, এই বিবাহের সময় খোয়েল্দ জীবিত ছিলেন না ; তৎপূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে আছির (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পিতৃব্য ওমরু বিন্-আছদ ওলী হইয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন । কারণ তাঁহার পিতা খোয়েল্দের ইতিপূর্বেই পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল । “ ছিরাতুন্নবুইয়া ” গ্রন্থে এই বিবাহের বিবরণ এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, যখন হজরত রছুল করিম (ছালঃ) শামের বাণিজ্য যাত্রা হইতে মক্কার প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় একজন ‘লওণ্ডি’ (ক্রীতদাসী) তাঁহার নিকট এই উদ্দেশ্য পাঠাইলেন যে, সে যেন হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-কে বিবাহ সম্বন্ধে ‘তরগিব্’ দেয় (উৎসাহিত করে) । তদনুসারে পরিচারিকা আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি কি আমাদের কর্তাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার নিকট এই বিবাহের উপযুক্ত অর্থ কোথায় ? দ্বিতীয়তঃ বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) একজন প্রভূত অর্থশালিনী মহিলা, হয় ত আমার দরিদ্রতা নিবন্ধন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে । দাসী বলিল,

আপনি এ সকল বিষয়ের জন্ত চিন্তা করিবেন না । বিবী ছাহেবার পক্ষ হইতে বিবাহের সম্মতি গ্রহণ করা আমার 'যেশ্মায়' রহিল, আমি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । অতঃপর দাসী হজরত খদিজা (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া সকল কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল । তচ্ছ বণে তিনি বলিলেন, তুমি তাঁহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন । দাসী তদনুসারে ঐ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে গিয়া, তাঁহাকে বিবী ছাহেবার নিকট ডাকিয়া আনিল । তিনি হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে, বিবী ছাহেবা বলিলেন, আপনার সহিত আমার বিবাহের এই জন্ত 'রগ'বত্' (ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা) হইয়াছে যে, আপনার অতুলনীয় 'আখ'লাকে' (সৌজন্তে—শিষ্টতার—ভদ্রতার) আমি মুগ্ধ হইয়াছি । আপনার আদর্শ কার্য্য-কলাপ ও সততার আমাকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে ; মোরামেলাত (বৈষয়িক কার্য্যে—বাণিজ্য-ব্যবসা সম্বন্ধীয় বিশ্বস্ততা গুণ)-এর 'ছাফাই' (হিসাব-পত্রের বিশুদ্ধতা) আমার অত্যন্ত সন্তুষ্টি বিধান করিয়াছে । হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এই সকল কথা, ঐ হজরত (ছালঃ) আসিয়া স্বীয় পিতৃব্য আবুতালেবকে বলিলেন । তিনি এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । ওদিকে হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় চাচ্চা ওমরু-বিন্-আছদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । সঙ্গে সঙ্গে স্ববংশ ও শ্বগোত্রের প্রধান প্রধান লোকদিগকেও আহ্বান করিলেন । আবুতালের ওমরু-বিন্-আছদের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিলেন ; ওমরু তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন । ২০টি উষ্ট্র মোহর নির্দিষ্ট হইল । আবুতালেব বিবাহের খোতবাঃ পড়িলেন । খোতবার পরে বিবী-খদিজা (রাঃ—আঃ)-এর 'চাচ্চাযাদ ভাই' (পিতৃব্যপুত্র) ওরকা-বিন্-নওফল একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন । ইজাব ও কবুলের

পরে এই পবিত্র বিবাহের সর্বত্র পূর্ণ হইল । ঐ সময় ওম্মোল মুমেনিন (বিশ্বাসীদিগের মাতা বা মোছলমানদিগের মাতা)-এর বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর, এবং আমাদের হজরত রহুল মকবুল (ছালঃ)-এর বয়স কম ও বেশ ২৫ বৎসর ছিল । ঐ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে প্রথম বিবাহের গৌরব এই মহামহিমাম্বিতা মহিলাই লাভ করিলেন । ইহার পূর্বে হজরত রহুল আকরম (ছালঃ) অপর কোনও মহিলার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন না । নিঃসন্দেহ এই বিশেষ সম্মান ও গৌরব তাঁহার জন্য থাছ (বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট) ছিল । এই বিশেষ সম্মান ও গৌরব ‘আব্ ওরাজ মতহরাত’ (ঐ হজরতের সহধর্মিণী অর্থাৎ মোছলেম-মাতা) দিগের মধ্যে কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই । ওম্মোল মুমেনিন হজরত খাদিজাতুল কোব্রার গর্ভে ঐ হজরত (ছালঃ)-এর ৭টি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ৩টি ছাহেবা যাদাঃ (পুত্র) ও ৪টি ছাহেব যাদী (কন্যা) । তাঁহাদের নাম এই :—

১। যয়নব, ২। রকিয়া, ৩। ওম্মে-কলছুম, ৪। কতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এই ৪টি কন্যা ; আর ১। কাছেম, ২। তাহেরও, ৩। আবদুল্লা—এই ৩টি পুত্র । হজরত রহুল মকবুল (ছালঃ), ছাহেব যাদাঃ কাছেমের নামে স্বীয় ‘কুনীরাত’ আবুল কাছেম (কাছেমের পিতা) রাখিয়াছিলেন । ছাহেবযাদাঃ দিগের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ কাছেম, এবং ছাহেবযাদী দিগের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠা যয়নব ছিলেন । ৩ ছাহেবযাদাঃ ও ৩ ছাহেবযাদী, ঐ হজরত (ছালঃ)-এর ‘যমানাঃ বয়ছত (পরগম্বরী লাভ)-এর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর তিন ছাহেবযাদাই হজুর আনওয়ার (ছালঃ)-এর পরগম্বরী লাভের পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন । অবশ্য ছাহেবযাদিগণ নবুয়তের পবিত্র ‘যমানাঃ’ (কাল) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ; এবং সকলের ভাগ্যেই পবিত্র ইছলাম ধর্ম গ্রহণ

যদিগাছিল । সর্বজ্যেষ্ঠ। বিবী য়নব, আ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র
বিবাহের ৫ বৎসর পরে, অর্থাৎ হজুর (ছালঃ)-এর ৩০ বৎসর বয়সের
সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আবুল আছ-বিন্-আর রবির এর সঙ্গে ইহার
বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল । এই যুবক হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ)-
এর ‘হকিকী’ (সাক্ষাৎ) “ ভাজে ” (ভগিনী-পুত্র) ছিলেন । বিবী
য়নবের গর্ভে আবুল আছের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে ।
পুত্রের নাম আলী ও কন্যার নাম এমামাঃ ছিল । আলী বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার
পূর্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয় ; আর মহামাননীয়া কাতেমাঃ যোহরাঃ
(রাঃ—আঃ)-এর এন্তেকালের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), বিবী
এমামাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বিবাহ করেন । কিন্তু যখন হজরত আলী
(কঃ—ওঃ) শহীদ হইলেন, তখন মগিরাঃ-বিন্-নওফল-বিন্ হারেছের
সঙ্গে ইহার ‘নেকাহ্ ছানী’ (দ্বিতীয় বিবাহ) হইয়াছিল । আর তাঁহার
ঔরসে ইয়াহ্-ইয়া নামক এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বিবী
রকিয়া (রাঃ—আঃ) ও বিবী ওশ্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর প্রথমবার
বিবাহ হজরত পয়গম্বর (ছালঃ)-এর চাচা আবুলহবের দুই পুত্রের সঙ্গে
সম্পাদিত হইয়াছিল ; পরে উভয় ছাহেব্বাদির বিবাহ ‘একে বাদ দিগর’
(একজনের মৃত্যুতে অপরের) হজরত ওছমান-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ)-
এর সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল । অর্থাৎ প্রথমে হজরত রকিয়া (রাঃ—আঃ)-
কে হজরত ওছমান জির্-রায়েন (রাজিঃ) বিবাহ করেন ; তাঁহার মৃত্যু
হইলে—হজরত ওশ্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-মুত্রে আবদ্ধ
করেন । হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর ঔরসে হজরত রকিয়া (রাঃ—
আঃ)-এর আবদুল্লা নামক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,
এই বালক ■ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । এই পুত্রের জন্মই
হজরত ওছমান গণী- (রাজিঃ)-এর ‘কুনিয়েত’ ছিল আবি-আবদুল্লাহ্ ।

হজরত ওয়ে কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর গর্ভে কোন সন্তান জন্মিয়াছিল না ।
 আঁ হজরতের ৪র্থ অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠা ছাহেবযাদীঃ ফাতেমাতন্ যোহরাঃ
 (রাঃ—আঃ) ছিলেন ; তাঁহারই জীবনী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল । ইনি
 ব্যতীত আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কোনও ছাহেবযাদীর ‘নছল’ (বংশ-তরু)
 দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকে নাই । আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নবুয়তের ১০ম
 বৎসর—অর্থাৎ হেজরতের ৩ বৎসর পূর্বে, পবিত্র রমজান মাসে, হজরত
 খদিজাঃ রাজ্জিঃ আল্লাহ আনহার পবিত্র জীবন-প্রদীপ নির্বাণ হইয়াছিল (ইম্মা
 লিল্লাহে ওয়াইম্মা এলায়হে রাখেউন) ।

অপেক্ষিত সম্রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ।

অতঃপর যাহার পবিত্র জীবনী লেখা হইতেছে, তিনি দুনিয়াতে মহিলা
 কুলের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠা, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য নারী কুলের আদর্শ ।
 তাঁহার পবিত্র জীবন অতি পবিত্র ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল । তাঁহার মহা-
 মাননীয় ওয়ালেদ মাজেদ যেমন মহুযাদিগের মধ্যে—এমন কি, ফেরেশতা,
 জেন প্রভৃতি সর্বপ্রকার দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ;
 মহামাণ্ড পয়গম্বর (আলাঃ) গণের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ; তাপস কুলের
 শিরোভূষণ ছিলেন ; পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁহার একমুখবাদ প্রচারে,
 তাঁহার মহান্ গুণকীর্ত্তনে সর্বশ্রেণী ছিলেন ; যাহার সঙ্গে তুলনা করিবার
 কেহই—কিছুই জগতে নাই ; তাঁহার প্রিয়তমা চতুর্থা কস্তা, তাঁহারই সম্পূর্ণ
 পদাঙ্কানুসরণকারিণী, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, সর্বগুণের আধার হজরত
 খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও নারীকুলে সর্ব শ্রেষ্ঠা

ছিলেন । তিনি উপাসনা আরাধনায় শ্রেষ্ঠতম্য তাপসী, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে তুলনা রহিত, পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ মাজেদ এবং গুরুজনের আদেশ পালনে তৎপর, স্বামী সেবায় আদর্শ পতিব্রতা, সাংসারিক কার্যে আদর্শ গৃহিণী, সম্মান পালনে আদর্শ জননী, সকলের প্রতি স্নেহ-করুণ ব্যবহারে অতুলনীয়, দীন-দুঃখীর প্রতি করুণা বর্ষণে অদ্বিতীয়া, নিজে না থাইয়া ক্ষুধাতুরা গরীব-গোর্বাকে অন্নদানে তৎপরা, লজ্জা ও শরমের সাক্ষাৎ প্রতি-মূর্তি, আল্লাহ তা-বার ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিতা, তাঁহার প্রণয় লাভে সদা সগুৎসুক, মধুর ভাষিণী, ক্রোধাদি স্বীপু বর্জিতা, সর্ব বিষয়ে অনুপমা স্বর্গ-রাজ্ঞী ছিলেন । এক্ষণে তিনি “ খাতুনে জব্বত ” নামে অভিহিত হইয়াছেন । তাঁহার পবিত্র জীবনী লিখিবার শক্তি এ অধর্মের কোথায় ? বড় বড় ঐতিহাসিক, বড় বড় আলোচক, বড় বড় গ্রন্থকার আরবী-পারসী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন । এই সন্নিধানে তাঁহার পবিত্র জীবনী বিশদ ভাবে লিখিবার স্থানাভাব । পুত্রহীন মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর সমুদয় সদগুণাবলী তাঁহার এই অতি প্রিয়—অতি স্নেহাম্পদ তনয়া-রত্নের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল । যদি নারী জাতিকে পরগন্বরী প্রদান করা বিধাতার বিধান হইত এবং আ হজরত (ছালঃ)-এর উপর নব্বুত ‘খতম’ (শেষ) না হইত, তবে স্বর্গের মহারাজ্ঞী সেইস্থান অবশ্যই অধিকার করিতেন ।

এই সর্ব গুণালঙ্কৃত আদর্শ মহিলার জন্ম দিন হুনিয়াতে বিশেষ ভাবে গৌরবান্বিত । সেদিন মাহুয, পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, ফুল-ফল ইত্যাদি সমস্তই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল । এই স্বর্গীয়া বালিকার নাম রাখা হইয়াছিল ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) । ইহার ‘নজিবত্তোরফায়েন’ হওয়া কিছুমাত্র সন্দেহের “ গোজ্জায়েশ ” নাই । মাতার পরিচয় ত ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ; পিতার পরিচয়

আর কি দেওয়া হইবে ? খোদাতালার সৃষ্ট সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব, কথরে আশিয়া, সর্ব শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মজতবাঃ (ছালঃ) ইহার পিতা ।

যখন ঐ হজরত (ছালঃ) মক্কাবাসীদিগের মধ্যে তওহিদের পবিত্র বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন, কোরেশগণ তাঁহার প্রাণের বৈরী হইয়াছিল, কোরেশগণ তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল, তাঁহার সৃষ্টিমের ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ শত্রুদল কর্তৃক নানাক্রমে নির্যাতিত হইতে ছিলেন, এছলাম-সূর্য্য ছুনিয়াতে তরুণ অরুণবৎ উদিত হইয়াছিল, সেই স্মরণীয় সময়ে এই স্বর্গের রাজ্যী জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে শান্তিধারা প্রবাহিত করেন । তাঁহার জননীর তিনিই শেষ সন্তান । ঐ হজরতের নবুয়ত ঘোষণায়, কঠোর হৃদয় কোরেশগণের হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল ; পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সত্যের বাণী ঘোষণা করাতে পৌত্তলিকদিগের হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল ; তাহারা আজ হজরতের অস্তিত্ব ছুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়াছিল ; এই সময় তাঁহার প্রতি কোরেশদিগের সহানুভূতির লেশমাত্রও ছিল না ; সুতরাং তাঁহার গৃহে পাড়া প্রতিবেশী এবং কোরেশ নারীদিগের বাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল । কেহ তাঁহার ঘরের খোজও লইত না । এই অবস্থায় স্বর্গের মহারাজ্যী জন্মগ্রহণ করিলেন । জননীর বিপুল ঐশ্বর্য্য রাশি তদীয় পরম-শ্রদ্ধেয় জনক এছলাম প্রচারে, দীন-দরিদ্রের অভাব মোচনে ব্যয় করিয়া ফেলিয়া ছিলেন ; সুতরাং এ সময় দাস-দাসীর সংখ্যা ও একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) স্বীয় জননীর জন্মগ্রহণ কালের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত কাতেমা যোহরাঃ (রাজিঃ)-এর প্রসব কালে হজরত ওম্মোলঃমুমোনিन খদিজাতুল কোব্রার কোনওরূপ কষ্ট হয় নাই—যেমন অশ্রান্ত বালক বালিকার জন্মকালে

গতধারিণী দিগের হইয়া থাকে । জন্মগ্রহণ করিবামাত্র হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় পেশানীতে (কপালে) চুম্বন করিলেন ; এবং ইহার সর্বপ্রকার মঙ্গল ■■■ দোওয়া ফরমাইলেন । ঐ :দোওয়ার এই ফল হইল যে, দুনিয়ার কোনও স্ত্রীলোক গৌরবে ■ সম্মানে তাঁহার সমতুল্য হন নাই ।

৬১১ খৃঃ অব্দের ২০শে জমাদিওল-আখের (জমাদিয়হ্-ছানী) পবিত্র জুমার দিন প্রত্যুষে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করেন । তখন হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৪১ এ পড়িয়াছিল । এই সময় পবিত্র কাবা-গৃহ নূতন ভাবে নিৰ্ম্মিত হইতেছিল ; পবিত্র ঘটনার সাক্ষ্যস্য এই যে, এক দিকে খোদা তা-লার উপাসনার্থ নিৰ্ম্মিত প্রথম ঘর পবিত্র কাবা গৃহ নূতন ভাবে নিৰ্ম্মিত হইতেছিল ; আর এক দিকে দুনিয়ার নারী কুলের শ্রেষ্ঠা ও আদর্শ নারী, রছুল নন্দিনী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তখন জন্মগ্রহণ করিলেন । ■

■ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জন্মস্থান “ ছয়গব বনি-হাশেম ”এ অবস্থিত । আজকাল ঐ স্থানে “ শাশিদা ” ও ছাবকলায়েল ” মহালা বিরাজিত । হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহ এক ‘তজ্’ (সন্ধীর্ণ) গলির পাশে দৃষ্ট হয় । হজরত রছুল করিম (ছালঃ) বিবাহের পর হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ)-এর এই নিজ সম্পত্তি, উপরোক্ত গৃহে বাস করিতেন । হেজরতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই গৃহেই বাস করিয়াছিলেন । গৃহে দালান ও দরদালান আছে । হজরত ফাতেমাঃ-যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জন্মস্থান ভূপৃষ্ঠ হইতে কিছু নিম্নে অবস্থিত । ঐ স্থান যেয়ারত করিবার জন্ত ৬ খানি সিড়ি অতিক্রম করিয়া নীচে অবতরণ করিতে হয় । নীচে অবতরণ করিলে দক্ষিণ দিকে একটি কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত ‘কোব্বা’ দেখিতে পাওয়া যায় ।

একদিকে বেমন স্থপতি (ইমারতের মিস্ত্রি) গণ কাবাগৃহ নির্মাণ করিতেছিল ; অন্যদিকে বিশ্ব-শিল্পী, হজরত কাতেমাঃ যোহরার সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করিতেছিলেন । ঘটনার অপূর্ব বৈচিত্র্য !!

হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ) ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) করমাইতেন, জিবরাইল আগাম হেচ্ছালাম জরতের (বেহেশত্ বা মোছলেম-স্বর্গের) একটি ছেব (আপেল ফল) আমার নিকট আনয়ন করিলেন ;—বাহা আমি মেররাজের রাজিতে (বেহেশত্ ভ্রমণকালে) দেখিয়াছিলাম । ঐ রাজিতেই (হজরত) খদিজাতুল কোবরাঃ (রাঃ—আঃ) আমার দ্বারা ‘হামেলাঃ’ (গর্ভবতী) হইলেন । সেই গর্ভেই কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করিল । অতঃপর যখনই আমাকে জরতের ‘খোশবু’ (সুগন্ধ) অনুভব করিবার

উহার উপর আজ কাল একটি অতি সুন্দর বুরুজ বিরাজ করিতেছে । তদুপরি সবুজ বনাতির অতি সুদৃশ্য ‘গেলাফ্’ (আন্তরণ) চড়ান আছে । উহার শিরোদেশে দেয়ালের সঙ্গে একটি আটা পিষিবার চাকি রাখা হইয়াছে ; কথিত আছে, শৈশবকালে তিনি এই চাকিতে আটা পিষিতেন । উহারই ‘দোছরা তরফ্’ (অপরাংশে) আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘খলুত থানাঃ’ (নির্জনে থাকিবার স্থান) ও এবাদতের পবিত্র হজরা (যাহাকে “ কবতহল ওহী ” বলা হয়) বিরাজিত । উহার অতি নিকটেই আ হজরত (ছালঃ) এবং হজরত খদিজাতুল কোবরা (রাঃ—আঃ)-এর ওজু করিবার স্থান রহিয়াছে । এই সকল পবিত্র স্থানের পাকা-পোখতা নিদর্শনাবলী ওহাবী ছোলতান এবনে ছউদের আদেশে, ওহাবী বর্করগণ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছে, পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন সমূহ প্রস্তর ও ইষ্টকের ঢেড়িতে পরিণত হইয়াছে ।

ইচ্ছা হয়, তৎকণাৎ ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ‘দহন’ (মুখ—বদন শর্শী) স্নানিয়া (ঘাণ লইয়া) থাকি ।

“ মদারেজ ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ‘ছনে বেলাদত’ (জন্মের সন), আ হজরত (ছালঃ)-এর এক চল্লিশ বৎসর বয়সে—পয়গম্বরী লাভের পরবর্ত্তী সময় বলিয়া লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাস-বেত্তা এই মত সমর্থন করে না । ‘কামালে হছন’ অর্থাৎ অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য আ হজরত (ছালঃ), তাঁহাকে অনেক সময়ই, “যোহরাঃ” নামে অভিহিত করিতেন । হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এই করটি ‘লকব’ (নাম বা উপাধী) বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ—(১) আল-বতুল ; (২) ছৈয়দতুল্লোছা ; (৩) আফজলুল্লোছা ; (৪) খয়েরুল্লোছা ; (৫) আছ-ছিদ্দিকা ; (৬) আব্-যোহরাঃ ; (৭) আত-তাহেরাঃ ; (৮) আল-শরকিয়া ; (৯) আল-রাজিয়া ; (১০) আল-মরজিয়া ; (১১) আল-মহদেছাঃ ।

আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-কে বলিতেন ; আমার দেলে (অন্তঃকরণে) খোদা তায়ালার পরে সর্ব্বাপেক্ষা ‘মহবুব’ (প্রিয়) আপনার ওয়ালেদ মাজেদ (হজরত রছুল করিম [ছালঃ]) ছিলেন । তৎপরেই আপনাকে ‘মহবুবত’ করিয়া থাকি ।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ—আঃ)-এর বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর ছিল । ইনি তাঁহার আওলাদের (সন্তানগণের) মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিলেন ; এই স্বর্গের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ । বিবাহের ২০ বিংশতি বৎসর পরে ছনিয়ার সর্ব্ব প্রধানা নারী জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র ছনিয়া আলোকিত করেন । যখন খাতুনে জন্নতের বয়ঃক্রম পাঁচ

বৎসর হইল ; সেই সময় হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) মানবলীলা সম্বরণ করিলেন । এই অতি তরুণ বয়সে মাতৃ-বিয়োগে মাতৃগত প্রাণ কুসুম-কলিকাটির হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত লাগিল—প্রাণে কি বিষাক্ত শোক-শেল বিদ্ধ হইল ; লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম । এত অল্প বয়সে যে তাঁহাকে মাতৃহীনা হইতে হইবে, একথা তাঁহার কুসুম কোরক সদৃশ কচি হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই ; তিনি মনের আনন্দে খেলিয়া ■ মায়ের অনুসরণ করিয়া ফুল মনে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ছিলেন ; হঠাৎ যে বিষম ঝঙ্কাবাতে তাঁহার প্রাণের সুখ-শান্তি উড়িয়া যাইবে, তাহা কে জানিত ? মাত্র ■ বৎসর বয়সে হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মাতৃহীনা হওয়া অতি হৃদয় বিদারক শোচনীয় ব্যাপার । কিন্তু হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এই তরুণ বয়সে মাতৃহীনা হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা-লার এক বিশেষ ‘মছ্লেহত’ (উদ্দেশ্য) ছিল । দয়াময় আল্লাহ্ তা-লা যখন কাহারও প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহাকে নানা বিপদে ফেলিয়া অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া থাকেন । খাঁটি স্বর্ণ যেমন আগুনে ফেলিয়া পরীক্ষা করা হয়, সর্বশক্তিমান্ খোদা তা-লাও স্বীয় অকৃত্রিম প্রেমিক ও প্রেমিকাদিগকে সেইরূপ কঠোর পরীক্ষাধীন করিয়া থাকেন । ছনিয়ার সমস্ত পয়গম্বর, গওছ, কোতব, অলি, দরবেশ, তাপস কোনও না কোন কঠিন পরীক্ষাধীন হইয়াছেন, এবং এখনও হইতেছেন । ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ খোদা-প্রেমিকের সম্পূর্ণ পদানুসরণকারিণী হুহিতা-রত্ন—যিনি স্বয়ংও খোদা তা-লার আদর্শ প্রেমাকাজিকী, তাঁহার সম্পূর্ণ আদেশ পালন কারিণী—তাহার প্রতি কঠিন পরীক্ষা হইবে না কেন ? ভীষণ শোক-দুঃখে ফেলিয়া তাঁহাকে “ জাচাই ” করা হইবে না কেন ? যাহার পিতা সর্ববিধ ভীষণ বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিয়া পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইতেছিলেন, আজ তাঁহার মেহময়ী কস্তা-রত্ন ও

সেইরূপ পরীক্ষাধীনা হইলেন । সুতরাং স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞীর পক্ষে শৈশবে মাতৃ-
বিরোগ অনঙ্গল-জনক না হইয়া ছনিয়ার পক্ষে কল্যানকরই হইয়াছিল । ইহা
তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের—ও পর জীবনের উজ্জল পরিণাম বলিয়াই পরে
প্রতিভাত হইয়াছিল । যদি তিনি শৈশবে মাতৃহীনা না হইতেন, তবে
হয় ত অন্নের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ, আর্ন্ত-দুঃখীর প্রতি করুণা
বিতরণ, অনাথ-ও অনাথার প্রতি স্নেহ ও করুণার ছায়া বিস্তার—এ সকল
মহা গুণ তত বিকাশ পাইত না । ইচ্ছাময়ের মহান্ ইচ্ছায়ই এইরূপ
হইয়াছিল । তারপর অভাব ও দরিদ্রতা ভোগ করিয়া দীন দরিদ্রের
অভাব ও কষ্টের পরিমাণ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । তিনি জীবনে
দাস-দাসীর সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন নাই । সংসারের সমস্ত কার্য—
স্বামী-সেবা, সন্তান পালন, চাকিতে (জাঁতার) আটা পেষা, বস্ত্র ধোত,
গৃহাদি বেটান, রন্ধন কার্য, পুত্র কন্যাদিগের মল-মূত্র পরিকার প্রভৃতি সমস্ত
কার্যই আজীবন স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন । সংসারের এত কার্য
সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া একদা মহামানসীয়া ওয়ালেদ-বাজেদের খেদমতে
একটি দাসীর প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি নানা প্রকারে
প্রবোধ দিয়া যে মহা উক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই সুবিদিত ।
অর্থাৎ “ ছোবহানাল্লাহ্ ”, “ আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্ ”, “ লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ্ ”
ও “ আল্লাহ্ আকবর ” এই কালেমা চতুষ্টয় প্রত্যহ ৩৩ বার করিয়া পড়িলে
ইহ-পরকালের সকল দুঃখ-কষ্ট ও অভাবাদি বিমোচন হইবে ; দাসীর
যে অভাব অনুভব করিতেছ, তাহা দূর হইবে । পিতার পবিত্র মুখ-নিঃসৃত
এই পূতবাণী শুনিয়া কন্টার অভাব-অভিযোগ দূর হইল—তিনি দিব্য
জ্ঞান লাভ করিলেন । সেই দিন হইতে তিনি আর দাস-দাসীর—
পরিচারক-পরিচারিকার অভাব অনুভব করেন নাই । যে ব্যক্তি সারা-
জীবনে কখনও ক্ষুধা-পিপাসার দারুণ কষ্ট অনুভব করে নাই, দরিদ্রতার

তাড়নায় অস্থির হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখে নাই, সে ব্যক্তি কিসে বুঝিবে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও ভীষণ দরিদ্রতা কি জিনিষ ? যে 'এতিম' ও 'এছির' (পিতৃ ও মাতৃহীন)—অনাথ ও অনাথা না হইয়াছে, সে তাহাদের দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ কি বুঝিবে ? নিজের বাহা ভোগ করা যায়, তাহার স্বরূপ যেমন মানুষ বুঝিতে পারে, অন্তের মুখে শুনিয়া বা দেখিয়া তাহা বুঝা সম্ভবপর নয় । সুতরাং স্বর্গ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী স্বীয় জীবনে এ সকল বিষয় ভুগিয়া এবং সহিয়া, এ সকলের পরিমাণ ও গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; এবং তৎপ্রতিকারে পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন ।

হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর কলিজার টুকরা ছিলেন । ওম্মতের সমুদয় 'হামদকী' (সহানুভূতি) ও 'গম-গছারি' (দুঃখ দূরকারী) তাঁহার সঙ্গে ছিল । স্বয়ং হজরত রেছালত-নাব (ছালঃ)-এর পবিত্র ছায়া তাঁহার মস্তকের উপর বিরাজ করিত । আর সকলই ছিল ; কোনও কিছুই অভাব ছিল না ; কিন্তু ঐ 'কোদরতি' (স্বাভাবিক) শোক-প্রভাব তাঁহার উপর আপনার ক্রিয়া বিস্তার করিয়াছিল—যাহা মাতৃহীন বালক বালিকার স্বভাবতঃ হইয়া থাকে । তখন চেহুরদার বয়স এমন ছিল না যে, সকল বিষয় বেশ বুঝিতে পারেন । ঈ। মায়ের রেহ-তালবাসার স্বাভাবিক প্রভাব হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না, মায়ের দারুণ অভাব তাঁহার হৃদয়ে কঠোর ভাবে স্বীয় ক্রিয়া বিস্তার করিত । এই জন্যই তাঁহার চেহুরা মবারকে উদাস ভাব দৃষ্ট হইত । আর এই জন্যই বেশী কথাবার্তা না বলিয়া অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকিতেন । তাঁহার অসুসন্ধানকারী ও 'মায়ুছ' (নিরাশ) চক্ষুদ্বয় যেন কাহারও তালাস করিতে থাকিত । যে মাতা এমন স্থানে গিয়াছেন, যেখান হইতে কোনও উপায়েই তাঁহাকে আনয়ন করা যাইতে পারে না । যখন মায়ের অভাব ও তদীয় দর্শন লাভের নৈশাশ, সীমা

অতিক্রম করিয়া বাইত, তখন তদীয় ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে মহা অশান্তির প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতে থাকিত, তখন ‘বে-কারার’ (অধৈর্য্য) হইয়া হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন, “ আক্বাজান ! আম্মা কোথায় গিয়াছেন ? আর তিনি কবে আসিবেন ? ” আহা ! এই মায়ছুম বাচ্চার মায়ের কথা কেমন স্মরণ ছিল । তিনি চাহিতেন, মাতাকে যে কোনও উপায়ে একবার দেখিতে পান । কিন্তু ইহা জানিতেন না যে, মাতা চির-দিনের জন্য বিদায় হইয়া গিয়াছেন ; আর এমন জায়গায় চলিয়া গিয়াছেন, যেস্থান হইতে কেহই ফিরিয়া আসিতে পারেন না । হজরত রছুল করিম (ছালঃ) তাঁহাকে ‘পেম্মার’ করিতেন, পরম স্নেহের সঙ্গে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু একথা কখনও বলিতেন না যে, তিনি কোথায়—কোন্ দিকে গিয়াছেন । সর্বদা এই কথাই বলিতেন, তোমার মা ঐস্থানে গিয়াছেন, যেস্থান হইতে কেহই ফিরিয়া আসিতে পারে না । ছোবহানাল্লাহ্ ! সত্যবাদিতা সম্বন্ধে তাঁহার এতদূর ‘লেহাজ্জ’ ও ‘খেয়াল’ ছিল যে, স্বীয় স্ত্রীপুত্র স্বরূপিনী স্নেহময়ী শোকাভিভূতা কন্যারূপের ‘ভহ্কিন’ (সান্ত্বনা—প্রবোধ) ও কখন মিথ্যা কথা বলেন নাই । খাতুনে সন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কি পরম সৌভাগ্য যে, তিনি এমন সত্যবাদী এবং এমন “ আমীন ” (আমানতদার—খোদার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল) পিতা মাতা করিয়াছিলেন । সন্তানের একরূপ ‘শানদার’ (গৌরব মণ্ডিত) শিক্ষাদানের আদর্শ আর কি হইতে পারে ? একালের পিতা মাতাগণ সন্তানের বাক্য-শ্রবণ হইলেই নানা মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদিগের মন ভুলাইতে চেষ্টা করে । ইহার পরিণাম ফল এই হইয়া থাকে যে, সন্তানগণের যখন বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তখন সেই মিথ্যা ও ভিত্তিশূন্য কথা শুনি তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে ; আবার তাহারাও ভিত্তিশূন্য মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত হয় । সংক্রামক রোগের দ্বারা উহা বংশ-পরম্পরা গত হইয়া পড়ে ।

পাক পাঞ্জভন (৫৬৩) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

কিছু দিন পরে আঁ হজরত (ছালঃ) এই মাতৃহীনা বালিকার লালন পালন এবং গৃহ কার্যাদির সুশৃঙ্খলা সাধন ওম্মোল মুমেনিন হজরত ছাওদাঃ (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-স্থত্রে আবদ্ধ করিলেন । এই বিবাহের সূত্র হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাঁহার ভগিনীদিগের কষ্টের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল । হজরত ছাওদাঃ (রাঃ—আঃ) শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন ; তিনি মাতৃহীনা বালিকাদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন । খাতুনে জন্নত মহাল্লার মেয়েদিগের সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না । সর্বদা গৃহে থাকিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনীদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন । ইহার ভগিনিগণ, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদিগের গৃহে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালিকা কখনও ঘরের চতুঃসীমার বাহিরে পা রাখিতেন না । তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই একাকী নির্জনে বাস করিতেন ; মায়ের সে স্নেহপূর্ণ পবিত্র মুখচ্ছবি ভুলিতে পারিতেন না । এই নির্জন বাসে তাহার হৃদয়ে ততো জন্মিয়াছিল । প্রতিবেশীদিগের কোনও বালিকা আসিলে তাহার সঙ্গে কথাবার্তায় মনে একটু শান্তি লাভ করিতেন । ঐ সময় মক্কার সমুদয় অধিবাসীই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি নিতান্ত বিবেক-পরায়ণ ছিল ; সকলেই তাঁহার সঙ্গে শ্রদ্ধাচরণ করিত । সুতরাং কোরেশ বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলাগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক তাঁহার গৃহে আসিতেন । আঁ হজরত (ছালঃ) এই সময় ‘তব্‌লিগল্‌ এছলাম’ অর্থাৎ ‘এছলাম প্রচার কার্য’ হইতে খুব কমই ‘ফোরছত’ (অবসর) পাইতেন, সুতরাং ঘর-সংসারের দিকে মনোযোগ প্রদান করিতে পারিতেন না । কোরেশ-প্রমুখ মক্কাবাসীদিগের অত্যাচারে ও তাঁহাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত । সুতরাং মোছলেম-মাতা হজরত ইম্মাদাঃ (রাঃ—আঃ)-এর উপর কন্যাদিগের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার দিয়া তিনি

অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন। আর পিতৃব্যপুত্র তরুণ বয়স্ক হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সাংসারিক বিষয়ের অনেকটা দেখা শুনা করিতেন। আ হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষে একটি মাত্র জিনিষ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ‘মহবুব’ (প্রিয়) ছিল—উহা “এছলাম”। এছলামের ভালবাসায় তিনি এমনই নিমগ্ন ও আত্ম-বিস্মৃত ছিলেন যে, অন্য সকল বিষয়ই তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সংসারের মারা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়া ছিল না। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে কার্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, অন্য লোক তাহা ধারণাই করিতে পারিত না। পৃথিবীর মহাশক্তিশালী ধর্মশাস্ত্রবিদ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি যে কোনও শ্রেণীর সর্ব-প্রধান পুরুষদিগকেও সকল দিকে একরূপ মাথা ঘামাইতে এবং শত্রুদিগের ভীষণ শত্রুতাচরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা চরিত্র করিতে হয় নাই। সমগ্র দেশবাসী—এমন কি, আত্মীয়-স্বজনগণ ও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তাঁহার জীবন হননে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ; একরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার পবিত্র মস্তিষ্ক কতদিকে, কি ভাবে চালনা করিতে হইতেছিল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয় ; একদল ভক্ত শিষ্য অত্যাচার-প্রলোভিত হইয়া পবিত্র জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক, আবিশিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট যাহারা মক্কায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা ও পদে পদে ভীষণভাবে উৎপীড়িত ও বিপন্ন। আ হজরত (ছালঃ) সে চিন্তায় সর্বদা বিব্রত থাকিতেন। এত বিপদ-বিপ্লবের পাহাড় ছুনিয়াতে কবে কাহার হৃদয়, একরূপ ভাবে অবসন্ন করিয়াছিল ? আ হজরত (ছালঃ)-এর সাধনা ছিল “এছলাম” বা একেশ্বরবাদ ধর্মের বিজয়-ভূমুভি ছুনিয়াতে নিনাদিত করা ; শের্-রূপ মহাপাপের মূলোৎপাটন করা ; মনুষ্য মাত্রকেই সত্য ধর্মের দিকে আকর্ষণ করা। এত বিপদ আপদ ও ভাবনা চিন্তার মধ্যে তাঁহার পক্ষে কষ্টাগণের নিকট ২।১ ঘণ্টা বসিয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি-ধারা প্রবাহিত

করিবার সময় ও সুযোগ ছিল কোথায় ? ধর্ম-প্রচার জন্য তিনি ইতস্ততঃ গমন করিতেন ; সময় মত আহার এবং বিশ্রাম পর্য্যন্ত যতিনা । ইহার উপর প্রবল শত্রু পক্ষের শক্রতাচরণ ও শুভকার্যে বাধা প্রদান পদে পদে । এতদ্ব্যতীত ও স্বর্ণের রাজ্যী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার 'জের' (হুৎপিও)-এর টুকরা, দেলের 'ছরওর' (ছরদার—অধিকারী) ও চক্ষের 'নূর' (জ্যোতিঃ) ছিলেন । একক হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে অফুরন্ত 'মহব্বত' (মেহ—ভালবাসা) ছিল । যখন একটু 'কোরছত' (অবসর) পাইতেন, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দিকে মনোযোগ প্রদান করিতেন, তাঁহাকে সাধনা দিতেন, তাঁহার মনোকষ্ট দূর করিতে চেষ্টা পাইতেন । যখন 'তব্বীগের' (এছলাম প্রচারের) জন্য বাহিরে যাইতেন, তখন সেই সুবর্ণ-প্রতিমা বেদ ধরিতেন, এবং বলিতেন, আব্বাজান, আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন । আহা ! ইহা কি হৃদয় বিদারক ব্যাপার ছিল । হজরত রুহুল্লাহ্ (ছালঃ)-এর হুৎপিও, হজরত খদিজাতুল কোব্রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আখির পুতুলী, আর তাঁহার এই 'গোব্বত-এতিমি' (অনাধিনী) অবস্থা ! ! না ঘরে, কাহারও সাহায্য, না বাহিরে কাহারও সহানুভূতি ; 'তজ্জদত্তির' (দরিদ্রতার) এই অবস্থা ছিল যে, ঘরে যদিও 'চেরাগ' (প্রদীপ) ছিল, অমেক সময় জ্বলাইবার জন্য তেল থাকিত না । পানীর 'মটকা' (জালা) ছিল, কিন্তু সকল সময় তাহাতে পানী থাকিত না ; আহারের জন্য একবেলা খাদ্য (ক্রটি) থাকিলে হয় ত একবেলা উপবাসে কাটাইতে হইত ; এই অভাব ছিল, দরিদ্রতা ছিল, এই 'এতিমি' (মাহতীনতা) ছিল, এই নিঃস্বলতা ছিল, পক্ষান্তরে তৎসঙ্গে ছিল ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, খোদার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর ; পিতা 'ছাবের' (ধৈর্য্য গুণ বিশিষ্ট) ছিলেন, কন্যা সহ গুণ বিশিষ্টা । অর্থ-সম্পদ-হীন ছিলেন, কিন্তু ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা ও খোদা তা-বার

পতি নির্ভরতার চক্ষু তাঁহাদের হস্তগত ছিল । হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—
 আঃ) যদিও এখন পর্য্যন্ত ‘মালুম’ (অতি অল্পবয়স্ক! নিষ্পাপ) ছিলেন ;
 কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্রতা তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিত । অক্কেয় পিতা হজরত
 রহুল করিম (ছালঃ)-এর পবিত্র বচনাবলী ও উপদেশ মালা খুব মনোযোগ
 সহকারে শ্রবণ এবং পালন করিতেন ; কোনও বিষয় লইয়া ‘ঘেদ’ বা ‘ইঠ
 কারিতা’ ফরমাইতেন না । হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট
 তাঁহার ‘হামনাম’ (একই নাম বিশিষ্ট) বিবী ফাতেমাঃ-বিস্তে আছদ,
 ফাতেমাঃ বিস্তে যবির, আছমাঃ ও আরেশা-বিস্তে হজরত আবুবকর হিদ্দিক
 (রাজিঃ), হাফ্জা-বিস্তে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)—যাঁহাদের গৃহ
 খুব নিকটে ছিল—আসিয়া বসিতেন ; এবং কথাবার্তা বলিতেন । এই
 কতিপয় পবিত্র চরিত্রা বালিকা ব্যতীত হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর
 সঙ্গে আর কোনও বালিকা বা মহিলার দেখা সাক্ষাৎ হইত না । ইঁহারা
 তাঁহার সাথী বা প্রিয় বয়স্কা ছিলেন ; ইঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপেই তিনি
 অনেকটা শান্তি অনুভব করিতেন । অপর কোনও সমবয়স্কা বালিকার সঙ্গে
 উঠা-বসা করিয়া তাঁহাকে কোনও রূপ লজ্জানুভব করিতে হয় নাই । কারণ,
 অর্থশালী কোরেশদিগের গর্বিতা বালিকাগণ তাঁহার দারিদ্র্য অবস্থা দর্শনে
 তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে পারিত । বিপদ ও দরিদ্রতার ঘাত-প্রতিঘাতে
 হজরত ফাতেমাঃ-যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে হুনিয়ার লোভ-লালসা ও
 স্বার্থপরতা ইত্যাদি দোষ হইতে আল্লাহ তালার পবিত্র রাখিয়াছিলেন ।
 তিনি কোনও জিনিষেরই অভাব অনুভব করেন নাই । সাধারণ মোটা
 ও তালিযুক্ত কাপড় পরিধান এবং ষও (ষব)-এর মোটা আটার রুটি
 আহার করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন । সে খাদ্যও সকল দিন সকল বেলা
 মিলিত না । তিনি সকল বিষয়েই স্বীয় মহান পিতার পদানুসরণ করিতেন ।
 আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খোদা তা-লার উপাসনা ও আরাধনার আত্ম-

নিয়োগ করিয়াছিলেন । তাঁহাকে নমাযে কখনও ‘গাফেল’ দেখা যায় নাই । যথা-নিয়মে কোরআন ‘তেলাওত’ করিতেন । হৃদয়ের বৃন্ত স্বরূপিনী কস্তারত্বের কার্য-কলাপ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার দর্শনে হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ) নিতান্তই আনন্দ অনুভব করিতেন । তিনি পুত্রের অভাব এই আদর্শ চরিত্রা কস্তা-রত্নের দ্বারা পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননীর কথা স্মরণ পূর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন ; কখনও বা সেই স্মরণ উপলক্ষে পবিত্র নয়ন যুগলে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিত । হজুর (ছালঃ) স্বীয় স্বপ্নপিতৃের টুকরাটিকে ‘বতুল’ (তারেকদুনিয়া—সংসারের প্রতি অনাশঙ্ক) নামে অভিহিত করিতেন । ফলতঃ স্বর্গের রাজ্ঞী এই নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রীই ছিলেন ।

উর্দু কবি প্রাণম্পর্শী ভাষায় কি সুন্দরই না বলিয়াছেন :—

নঃ যর কি তমন্না নঃ দওলত কি পরওয়া ;
নঃ আরামকি ধুন নঃ এশরত্ কি পরওয়া,
হওছ মান কি থি নঃ হশ্মত কি পরওয়া,
আগার থি তো যোহরা কো আছমত কি পরওয়া,
ওঃ লায়ীথি ফেত্বরত্ছে তওকির এয়ছি,
মিলি কেছকো-দুনিয়ামে তক্দির এয়ছি ।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যখন অবুখ্ হইতে একটু একটু করিয়া বুদ্ধি-শুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, তখন দুনিয়ার কোফরকে স্বীয় ‘নামওর’ (স্বনাম প্রসিদ্ধ) পিতার বিরুদ্ধাচারী দেখিতে পাইলেন । মকার কাফেরগণ পদে পদে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত । তাঁহাকে অবমানিত, লাঞ্চিত ও বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার অসহপায় অবলম্বন করিত । একদা তাঁা হজরত (ছালঃ) পবিত্র কাবাগৃহে নমায্ পড়িতেছিলেন,

রত্নাঃ ■ শয়বাঃ নামক কাকের দলের পাণ্ডুর—যাহারা হজুর (ছালঃ) কে ‘তকলিফ্’ (কষ্ট) দেওয়ার চেষ্টায়ই সর্বদা থাকিত—সত্বে যবেহ করা উটের ‘পোটা’ (আতুড়ি), ছেজদার অবস্থায় হজুর (ছালঃ)-এর ‘গয়দানে’ (গ্রীবাদেশে) লেপ্টাইয়া দিল। উহার ভারে তিনি মাথা ভুলিতে পারিতেছিলেন না। সংবাদ পাইবাগাত্র হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) দৌড়িয়া কাবাগৃহে আসিলেন, তৎক্ষণাৎ পিতার গয়দান হইতে উটের আতুড়ি তুলিয়া ফেলিলেন ; এবং যে সকল কাকের ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ‘বদ-দোওয়া’ (অভিসম্পাত) করিলেন। কিয়ৎকাল পরে উহারা ওহাদের যুদ্ধে নিহত হইয়া জাহান্নাম বাসী হইয়াছিল। উহারা ছনিয়াতেই পাপের ফল অনেকটা ভোগ করিয়াছিল—পরকালের কথা ভাবিবার বিষয়। হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ এই তরুণ বয়সেই কোফর ও এছলামের সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আরও দেখিতে পাইলেন, ছনিয়া সত্যের বিরুদ্ধে কিরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে, আর ইমানদারীর পূতবাণী ঘোষণা করা কিরূপ কঠিন কাজ। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় পরম ভক্তি-ভাজন পিতার বিপদের পরিমাণ ও অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর তিনি কি কঠিন ‘মোশ্কেলে’ (কষ্টে) জীবনাতিপাত করিতেছেন, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষাও পাইলেন যে, ‘ছারেজাহানের’ যিনি মালেক, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিপতি, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যাহার বিনাদেশে একটি ধূলি-কণা—একটা পরমাণু ও স্থানচ্যুত হয়না, এক-
■ তিনিই মানুষের পূজনীয়—একমাত্র উপাস্ত। তাঁহার মহাসম্মানিত ‘ওয়ালেদ মাজেদ’ (পিতা), লোকদিগকে সেই সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ তাহালার দিকেই আহ্বান করিতেছেন ; তাঁহারই আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিতেছেন। মানুষকে হথার্থ প্রভুভক্ত হইবার জন্ত—অনন্ত পরকালে মুক্তি লাভের

জন্ত উপদেশ দান করিতেছেন ; খোদা-দ্রোহিতা, খোদাকে ছাড়িয়া অল্প দেবতা, মানুষ, জীব-জন্তু, নদ-নদী, গাছ-গাছড়া, প্রভৃতি ইত্যাদির পূজা করা যে যোর খোদা-দ্রোহিতা, পিতা মহানবী হজরত রুহুল্লাহ (ছালঃ)-এর উপদেশ-বাণীতে এবং কার্য-কলাপে, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বৃদ্ধিতে পারিতে ছিলেন । ওয়ালেদ মাজেদ কি জন্ত দেশবাসীর শত্রু হইয়াছেন, তাহাদের বিষ 'নযরে' পড়িয়াছেন, তাহাদের অসহ অত্যাচার-উৎপীড়ন সহিয়া বাইতেছেন, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছিলেন । মহামানবীয় পিতার সেই বিশ্বাস, সেই ধারণা ধীরে ধীরে তাঁহার কোমল হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল । মহামানবীয় জনকের দয়া, সৌজন্য, লোকের প্রতি সদ্যবহার, দরিদ্রের প্রতি করুণা বিতরণ, নিজে না খাইয়া ক্ষুধার্ত্তকে আহার প্রদান, ছাহাবাঃ ((রাজিঃ)) দিগের প্রতি অনন্ত মেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপাসনা-আরাধনার নিয়মিত রূপে আত্ম-নিয়োগ, যথানিয়মে রোজা পালন, নিয়মিত রূপে আকাত প্রদান ও কোরবানী করণ—ইত্যাদি প্রত্যেক কার্যের প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করিতেন, এবং নিজেও সেই সকল সদগুণ লাভ এবং ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন । দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে সেই ক্ষুদ্র হৃদয় থানি পরিপূর্ণ ছিল । এ সময়ও যখন স্বীয় সর্বগুণালঙ্কৃত আদর্শ জনবীর কথা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইত, নীরবে অশ্রুপাত বা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন । ঐ হজরত (ছালঃ) গৃহে আসিলেই সর্বপ্রথমে এই সুবর্ণ-প্রতিমার সন্ধান লইতেন, নিকটে আহ্বান করিয়া মেহালিঙ্গন করিতেন ; তখন ভক্তি ■ করুণ-রসে হজরত যোহরার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিত না ; ওয়ালেদ মাজেদের পবিত্র বদন মণ্ডলের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন । মহাপুরুষ মহানবী (ছালঃ)ও হৃদয়ের সমস্ত মেহ রাশি যেন তাঁহার প্রতি ঢালিয়া দিতেন । শত যজ্ঞা, শত উৎপীড়ন-

অত্যাচার, মহাদারিদ্র্য প্রভৃতির বিষয় ভুলিয়া যাইতেন, দেখিতেন, তাঁহারই আদর্শে একটি ক্ষুদ্র বালিকার জীবন কেমন সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে ; তখন তাঁহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিত না । বালিকার সর্ব-গুণালঙ্কৃত জন্মনী যেমন সর্বপ্রথমে পবিত্র এছলাম ধর্ম-বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, স্বীয় পবিত্র আত্মা চরিতার্থ করিয়া ছিলেন ; তাঁহারই স্নেহের পুতুল হজরত ফাতেমাঃ বতুল, তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ পূর্বক এছলামে পূর্ণ বিশ্বাসিনী হইয়া তরুণ স্বর্ণ-লতিকার স্তায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা কতই না আনন্দ-প্রদ ব্যাপার । বালিকা ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) শব্দের ওয়ালেদ মাজেদের প্রত্যেক কার্য ও প্রত্যেক বাক্যের প্রতি অতি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতেছেন, তিনি যে, ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, খোদা তায়ালার ‘খাছ বান্দা’, এই তরুণবয়স্কা বালিকা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বৃদ্ধিতে পারিলেন । যে কয়টি মোছলেম-মহিলা বা বালিকা তাঁহার নিকট বাতায়াত করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বাক্যলাপ করিতেন, তাঁহার কার্য-কলাপ দেখিতেন, তাঁহার চাল-চলন এবং ভাব-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন ; এই সুবর্ণ-প্রতিমার শিষ্টতা, নম্রতা, ধীরতা ও গাঙ্গীর্থ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্তুতিত হইতেন । তাঁহার লজ্জাশীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন । অনেক সময় তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন । দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত ও দ্রবীভূত হইত । কোনও ‘ছারেল’ (ভিক্ষা-প্রার্থী) দ্বারে আওয়ায দিলে যদি ঘরে কিছু দেওয়ার মতন থাকিত, তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতেন । নিজের মুখের গ্রাস রুটি খানিও পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন না ।

পাঠক, একথা বেশ অবগত আছেন, আ হজরত (ছালঃ)-এর কিরূপ সঙ্কটকালে হজরত খাতুনে জব্বত (রাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি যখন আল্লাহ জল্লশানহুর তওহিদ অর্থাৎ খোদা তা-লার একত্ববাদ এবং

স্বীয় নবুয়তের ঘোষণা করিয়াছিলেন ; পৌত্তালিকতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা প্রদান করিয়া মক্কার ঘোর পৌত্তালিকদিগের নিতান্তই বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন ; তথাকার বালক, যুবক, প্রৌড়, বৃদ্ধ, নর এবং নারী তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ-পরারণ হইয়া উঠিয়াছিল ; আবুলাহাব-প্রমুখ স্বগোত্রের অর্থাৎ বনি-হাশেমের বহুলোক তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল ; তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ও মক্কার অধিবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ ঘৃণা প্রকাশ করিত ; বহুকষ্ট ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাত্র ৪০ জন নর-নারীকে বিশ্বাসের পথে—মুক্তির দিকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; দুই একজন মাত্র করিয়া লোক নানা কষ্ট অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র আস্থানে সাড়া দিতেছিলেন, সেই কঠিন সময়—মহা বিপদের কালে স্বর্গের রাজ্ঞী, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠা নারী জন্মগ্রহণ করিয়া, হজরত রহুল (ছালঃ)-এর গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন । দরিদ্রতা ও অভাব যেন তাঁহার চির সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিল, এবং বিপদের পাহাড় তাঁহার ওয়ালেদ মাজেদের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল । কিন্তু সেই বিপদ আপদে তিনি একটু মাত্র বিচলিত না হইয়া, অবিচলিত হৃদয়ে জলদ-গস্তীর স্বরে তওহিদের পবিত্র বাণী ঘোষণা করিতে ছিলেন । তিনি কোনও বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেছিলেন না ; মৃত্যুকেও ভয় করিতেন না । তাঁহার সর্বশক্তিমান্ প্রভুর আদেশ তিনি অবিচলিত চিত্তে—অম্লান বদনে পালন করিতেছিলেন । দুর্দান্ত কাফের দিগের অত্যাচার ■ উৎপীড়ন যত বাড়িতে ছিল, তাঁহার একাগ্রতা, দৃঢ়তা, কঠোর সঙ্কল্প ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অজেয় হইয়া উঠিতেছিল । প্রবল বজ্রের সম্মুখে মাটি বা বালির সামান্য বাঁধ যেন তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ দুর্দৃষ্ণ কাফেরদিগের শত বাধা প্রতিবন্ধতা ও তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অবিচলিত ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল । প্রভুর কঠোর মহাপরীক্ষা পর্য্যায়ক্রমে

তঁাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেও, তিনি অবিচলিত হৃদয়ে তাহার সম্মুখীন হইয়া, সেই সকল কঠোর পরীক্ষায় অতি প্রশংসনীয় ভাবে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন । বাল্য ও যৌবনকালের প্রতিপালক, সর্ব অবস্থায় সাহায্যকারী পিতৃব্য আবুতালেবের মৃত্যু তঁাহার পক্ষে সামান্য বিপদ এবং শোক-দুঃখের কারণ ছিল না । তিনি পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও, সর্ব প্রকারেই পুত্রবৎ মেহ-ভাজন ভ্রাতৃপুত্রের সর্বপ্রকার বিপদ আপদে সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন । সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে তঁাহারই হস্তে সঁপিয়া দিয়া, তঁাহার সর্বপ্রকার আদেশ পালনের জন্য সুদৃঢ় ভাবে অনুমতি দিয়া রাখিয়া ছিলেন । পিতৃ স্থানীয় সেই পিতৃব্যের মৃত্যু তঁাহার পক্ষে কিরূপ শোকাবহ ব্যাপার ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় । ইহার কিছুদিন পরেই হজুর (ছালঃ)-এর সংসার-সাগরের একমাত্র অবলম্বন, সুখ-দুঃখের সাথী, সর্ব প্রথমে তঁাহার নবুয়ত স্বীকার এবং স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য রাশি তঁাহার পদে উৎসর্গ করিণী, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ সাধবী সতী হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন ; সুতরাং আ হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষে সংসারের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল । তঁাহার পারিবারিক শান্তির অবসান হইল । ৩টি কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তঁাহারা কখনও স্বামীগৃহে, আর কখনও বা পিতৃ-গৃহে থাকিতেন । আ হজরত (ছালঃ) তওহিদের বাণী ঘোষণা করাতে তঁাহার দুই কন্যার স্বস্তর ও স্বীয় পিতৃব্য আবুলাহাব এবং জামাতা দ্বয় তঁাহার বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল । সুতরাং কন্যাদ্বয়ের পক্ষে স্বামী-গৃহ কিরূপ শাস্তি জনক হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন । পিতার পবিত্র কার্য্য-কলাপে কাটা কাকের স্বামী, স্বস্তর, স্বাস্ত্রী এবং তৎপরিবারস্থ আর আর সকলের দ্বারা তঁাহাদিগকে নিতান্ত গণনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত । স্বস্তরালয়

তাহাদের — নরক সদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্মৃতরাং মাতৃশূন্য পিতৃ-গৃহে আসিয়া মাঝে মাঝে দৃঢ় হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিতেন। এই অবস্থায় হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ক্রমে গুরুপক্ষের শশি-কলার ন্যায় বাড়িতে ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় পিতার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ঠিক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিতে ছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদু-মাজেদকে তিনি গৃহে খুব কনই দেখিতে পাইতেন। সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি নগরের বিভিন্ন স্থানে এবং পবিত্র কাবা-গৃহে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। গৃহে পুরুষের মধ্যে তরুণবয়স্ক হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত ক্রীতদাস হজরত যয়েদ বিন্-হারেছ (রাজিঃ) ছিলেন। আ হজরত (ছালঃ) ধর্ম্ম-প্রচারার্থ হজরত যয়েদ (রাজিঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তায়েফে গিয়া, তায়েকবাসীদিগের দ্বারা বিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, আ হজরত (ছালঃ)-এর জীবনীতে—এই পাক-পাঞ্জতনের প্রথম ভাগে পাঠকগণ তাহা অবগত হইয়াছেন। এতকাল নক্কার কাফেরগণ আ হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি কঠোর অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল ; এইবার তাহারা তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন — এক-নতাবলম্বী হইল। ‘বোত-পরস্ত’ (পৌত্তলিক) নরনারী আপনাদের উপাস্ত দেব-দেবী গুলিকে অতিশয় ভক্তি করিত, সে গুলিকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিত, আপনাদের ভাল মন্দ—শুভা-শুভ সমস্তই তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত, আর বিশ্বাস করিত—ঐ সকল প্রতিমা গুলিই তাহাদিগকে পরকালে উদ্ধার করিবে ; উহারাই সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়ের মূল ; স্মৃতরাং তাহারা ব্যতীত ইহ ও পরকালে আর কোন গতি নাই ; এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র, মুক্তির একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ দেব-দেবী গুলির যিনি বিরুদ্ধাচারী, তাঁহার উপর ক্রোধের উদ্রেক হওয়া

স্বাভাবিক । তাঁহার প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করা একটা নূতন ব্যাপার নহে । পূর্ববর্তী “ তওহিদ ”-ঘোষণাকারী পয়গম্বর (আলাঃ) গণ ও পৌত্তলিকদিগের দ্বারা নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন । কিন্তু আমাদের পয়গম্বর আখেরজ্জযমান (ছালঃ) যেমন সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নটাও সেইরূপ কঠোর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল । “ তওহিদ ”-প্রচারে—খোদাতা-লার একত্ব ঘোষণায় তাঁহাকে অতি কঠিন বাধা-প্রতিবন্ধকতা সহ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু সর্বশক্তিমান্ দয়াময় আল্লাহ তা-লার অনন্ত কৌশল ও অনন্ত মহিমায় তিনি সকল বিপদ-আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন । মহামাননীয় হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাহা ধীরভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন ; এবং আদর্শ পিতার সর্ববিধ আদর্শ কার্য-কলাপের নিজেও অনুসরণ করিতেছিলেন ।

হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রদেয়া জননীর জীবিত কালের একটি ঘটনা এস্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে । একদা তাঁহার কোনও আত্মীয়ের বাড়ীর বিবাহোপলক্ষে তিনি স্বীয় কন্যাগণকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত করিয়া পাঠাইলেন । তখনও তাঁহার অর্থ-সম্পদের অপ্রতুল ছিল না । সুতরাং বালিকাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট ও নূতন বস্ত্রালঙ্কারাদি তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন । ঐ সময় স্বর্গ-রাজ্ঞী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বয়ঃক্রম মাত্র ৫ বৎসর ছিল । কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার উৎকৃষ্ট বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি বিলাসিতার সামগ্রীর প্রতি এমন বীতানুরাগ ছিল যে, তিনি কিছুতেই সেই সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পরিতে চাহিলেন না—অথচ তাঁহার অন্তঃকরণ ভগিনিগণ তাহা আগ্রহ সহকারে পরিয়াছিলেন । কি আশ্চর্য্য ! ঐরূপ শৈশবকালেই তিনি বস্ত্রালঙ্কারের পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । সংসার-বৈরাগ্য তাঁহার মধ্যে

প্রচুর ভাবে ক্রিয়া করিতেছিল । বিশ্ব-বরণ্য তাপসীদিগের শিরোভূষণ রূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছিলেন ।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, সাধারণ শিক্ষা তাঁহার সর্বগুণালঙ্কৃত জননীর নিকটই আরম্ভ হইয়াছিল । তাঁহার ‘ওফাতের’ (পরলোক গমনের) পরও সেই শিক্ষার ‘ছেলছেলা’ (শৃঙ্খল) ছিন্ন হইয়াছিল না । ৪৥০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি একদা স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আন্মাজান ! খোদার ‘কোদরত’ (মহিমা) ত সকল সময়ই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় ; কিন্তু খোদার ‘দীদার’ (দর্শন) লাভ কি মানুষের অদৃষ্টে ঘটতে পারে ? বালিকার মুখে এই কথা শুনিয়া মায়ের হৃদয়ে কতই না আনন্দের সঞ্চার হইল ; ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) উত্তরে ‘এরশাদ ফরমাইলেন’ (বলিলেন), মা, যখন আমরা দুনিয়াতে ‘নেককাম’ (সৎকার্য) করিব, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিব, খোদা তা-লার আদেশ পালনে তৎপর থাকিব, রহুলের প্রতি ঈমান আনিব, তদ্বারা ‘রোঘ্ কেয়ামতে’ (হাশরের ময়দানে) আল্লাহ্-র সন্তোষ বিধানে সক্ষম হইব, এবং এই উপায়েই তাঁহার ‘দীদার’ (দর্শন) লাভ ঘটবে । জননীর এই উক্তি বালিকার কোমল হৃদয়-ফলকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল ।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত ছওদাঃ (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবার পর, বালিকাদিগের শিক্ষার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ পূর্বক এক প্রকার নিশ্চিত হইয়াছিলেন । ওম্মোল মুমেনিন ■ এই কার্য এমন সুন্দর রূপে সম্পাদন করিতেছিলেন যে, স্বয়ং বালিকাদিগের জননী ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) জীবিত থাকিলেও সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু হইতে পারিত না ।

হেজরতের কিছুকাল পূর্বে হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), তাঁহার প্রধান শিষ্য বা সহচর হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর অতি

অল্পবয়স্কা কন্যা (যাঁহার বয়স তখন ১১০ বৎসরের মধ্যে ছিল) ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে এবং দ্বিতীয় প্রিয়তম শিষ্য হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর কন্যা ওম্মোল মুমেনিন হজরত হাফসা (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন । প্রথমোক্ত বিমাতা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়া বিমাতা তাঁহার সমবয়স্কা এবং প্রিয়-বয়স্কা ছিলেন । অনেক সময়ই উভয়ে একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলিতেন, এবং নির্দোষ খেলাও শৈশবে উভয়ে খেলিতেন । কিন্তু যখন তাঁহাকে তদীয় বোবর্গ ওয়ালেদ্ মাজেদ বিবাহ করিলেন, তখন তাঁহারে প্রতি মাতার স্নায় পূর্ণ ভক্তি-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) সর্বতোভাবে পিতৃগত প্রাণ ছিলেন । তিনি মহাসন্মানিত পিতাকেই যথা-সর্বত্র জানিতেন । তাঁহার ছোট বড় সকল কার্যের দিকেই অতিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য রাখিতেন, আর তাঁহার সেই সকল কার্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন । কেবল পিতা বলিয়াই যে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং ভাল-বাসার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা নহে ; তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বেশ জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমার ওয়ালেদ্ মাজেদ একজন ‘মামুলী’ (সাধারণ) মনুষ্য নহেন । ইনি খোদা তা-বার মনোনীত নবী অর্থাৎ পয়গম্বর বা রছূল । স্বীয় আদর্শ জননী তাঁহাকে নবী বলিয়া সর্বপ্রথমে স্বীকার করিয়াছিলেন । আরও বহু জানী ও শক্তিশালী লোক তাঁহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । পিতৃব্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার পরম ভক্ত শিষ্য, সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, ধর্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি স্বরূপ । ক্রীতদাস (হজরত) যয়েদ বিন্-হাবেছ (রাজিঃ) পিতার সংস্পর্শে আসিয়া একজন আদর্শ পুরুষ হইয়া গিয়াছেন । স্পর্শমণির সংস্পর্শে

যেমন নিকটে লোহাদিও সুবর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ যে কোনও ব্যক্তি তদীয় আদর্শ চরিত্র পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই নবজীবন লাভ করিয়া আদর্শ মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন । এই সকল ব্যাপার দর্শনে স্বীয় মহান পিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে লাগিল । পিতা যে একজন খোদা তা-লার ‘খাছবান্নাঃ’ (বিশেষ ও মনোনীত মনুষ্য) তাহা তিনি পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলেন । সঙ্গে সঙ্গে মহান পিতার সর্বপ্রকার কার্যের যথা-সম্ভব অনুকরণ ও অনুসরণে আত্ম-নিয়োগ করিলেন । এক অভাবনীয় পবিত্র স্বর্গীয় শিক্ষার তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । পবিত্র কোরআনের প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক আয়াত তাঁহার হৃদয় ফলকে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল । পক্ষান্তরে আ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহ-বারিধি ক্রমশঃ উছলিয়া উঠিয়া এই কল্যাণ-রত্নকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল । তিনি তাঁহার মধ্যে যেন স্বীয় প্রতিচ্ছবি দেখিতে লাগিলেন । তাঁহার প্রত্যেক কার্য তাঁহার মধ্যে যেন প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হইতেছিল । শত বিপদ-আপদ, উৎপীড়ন-অত্যাচারের মধ্যেও এই ছহিতা-রত্নের বদন কমল দর্শন করিয়া ক্ষণেকের জন্য সকল ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেন ; আর এরূপ অসামান্য কল্যাণ-রত্ন লাভ করিয়াছেন বলিয়া ভক্তি গদ্ গদ্ চিত্তে পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার মহা দরবারে “শোকর-গোজার ” হইতেন ।

তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে প্রণালীর— যে ভাবের শিক্ষা তৎকালে মক্কা নগরে মোছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিতছিল ; সেই প্রণালীতে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), স্বীয় শিক্ষিতা জননী হজরত খদিজাতুল কোব্‌রা (রাঃ)-এর নিকট মাত্র আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু সে শিক্ষা : অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল । কারণ, শিক্ষারন্তরে অল্প দিন পরেই সেই ধর্মপ্রাণা সত্যী-সাধবী আদর্শ মহিলা ইহলোক ত্যাগ

পাক পাণ্ডতন (৫৭৮) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

করেন । পরে আঁ হজরত (ছালঃ), মোছলেম-মাতা হজরত ছওদাঃ (রাঃ—আঃ)-কে পরিণয়-স্থত্রে আবদ্ধ করিলে, তিনি ইঁহার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন । তিনি সপত্নী-পুত্রীকে যথোচিত স্নেহ করিতেন, ভাল বাসিতেন, সমস্তে শিক্ষাদান করিতেন ; কোরআন শরীফের আয়াত সকল যেমন যেমন ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হইত, অধিকাংশ মোছলেম-নরনারী তাহা মুখস্থ করিয়া লইতেন ; হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) সম্বন্ধেও তাহার অন্তথা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । তাঁহার প্রধান শিক্ষার অবলম্বন ছিল স্বীয় জলিলল্ কদর পিতার বিশ্বয়কর কার্য্য-কলাপ, এছলামের প্রতি আশ্রয় ভালবাসা, সর্বশক্তিমান্ পরাংপর প্রভু আল্লাহ্ তা-লার আদেশ পালন, গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) লোকদিগকে পথ-প্রদর্শন, দরিদ্রের প্রতি দয়া, অসাধারণ অমানুষিক ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি যাবতীয় সংকার্য্য ও সদগুণাবলী । তাঁহার স্নেহ-পালিতা কন্যারও ও সেই সকল মহান্ গুণ শিক্ষা ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন । পরিবারের মধ্যে মাতা-ভগিনিগণ (যাহারা-স্বামী-গৃহ হইতে কখন কখন পিত্রালয়ে আসিতেন), একটি মাত্র পিতৃব্য নব্যযুবক হজরত আলী (কঃ—ওঃ), ইঁহার সকলেই আদর্শ চরিত্র এবং খাঁটি মোছলমানের নমুনা ছিলেন ; প্রতিবেশী যে কয়জন মহিলা ও বালিকা সেই পবিত্র গৃহে আসিতেন, তাঁহারা মোছলমানদিগেরই স্ত্রী-কন্যা এবং আদর্শ মহিলা ; অন্য শ্রেণীর প্রতিবেশীর যাতায়াত ছিল না ; স্তূতরাং মক্কার বদ চাল-চলন বিশিষ্টা কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁহার মেলা-মেশাও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই । এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার চরিত্রে বা চাল-চলনে বিন্দুমাত্রও অনৈসলামীক দোষ স্থান পায় নাই । মোছলমানদিগের ধর্ম্মভাব, কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন কিরূপ হওয়া চাই, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) কেবল তাহাই শিক্ষা করিয়া-ছিলেন । নারীর প্রধান গুণ লজ্জাশীলতা, নম্রতা, বিনীত ভাব,—এ সকল

তাঁহার ভিতর পূর্ণরূপে বিরাজ করিত । তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতেন না, উচ্চহাস্য করিতেন না, তাঁহার আওয়ায্ অস্ত্রের কর্ণগোচর হইত না, যখন চলিতেন, মাটিও ঘেন টের পাইত না ।

এই সকলের মধ্যে আবার সাংসারিক কার্যোও তাঁহার অলসতা ছিল না ; বিমাতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের সকল কাজ ও অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেন । প্রয়োজন মতে আটা পিষিতেন, খাফ্ত যও (যব) গুলি বাছিতেন, রুটী ও বাজ্ঞন প্রয়োজন মতন পাক করিতেন, কাপড় সেলাই করিতেন, হাঁড়ি বাসন (যদিও তাহা অতি যৎসামান্য ছিল) ধৌত করিতেন । তদ্ব্যতীত পিতার সেবাও করিতেন ; বিমাতাগণ যাহা বলিতেন, তাহাও করিতেন ; সুতরাং সাংসারিক কোনও কার্যোও তাঁহার আলস্য ছিল না । তিনি বিনা কাজে—অলস ভাবে একটু সময়ও নষ্ট করিতেন না । গল্প-গুজবে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না—ছনিরার ও আখেরাতের সকল সংকার্যোই স্বর্ণ-রাজীর পূর্ণ আগ্রহ দৃষ্ট হইত । “বিলাসিতা” নামে কোনও জিনিষেরই অস্তিত্ব তাঁহার মধ্যে ছিল না । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার সদগুণাবলীও তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল । তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় থানি ধর্ম্যভাবে ভর-পূর ছিল । ওম্মোল-মুমেনি হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, “আমি সর্ব-প্রকার কার্য-কলাপ, আচার-ব্যবহারে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কে, হজরত রছুল (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ ‘তক্লিদ’ (অনুকরণ—অনুসরণ) করিতে দেখিয়াছি । ‘বেলা শোবাহ্’ (নিঃসন্দেহে) আমি হজরত রছুল (ছালঃ)-এর সঙ্গে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর অধিকতর ‘মোশাবাহ্’ (সাদৃশ্য) দেখিয়াছি ।” ওম্মোল মুমেনি হজরত ওম্মে ছালমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন, ‘রফ্তার’ (চাল-চলন)এ, ও ‘গোফ্তারে’ (কথাবার্তায়), আ হজরত (ছালঃ)-এর উৎকৃষ্ট নমুনা (আদর্শ) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ।

আ হজরত (ছালঃ) যখন কোনও বুদ্ধ বা প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, প্রথমে মছজেদে 'দোগানাঃ' (নফল ছই রাকাত নমায্) আদায় করিয়া হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কে দেখিতে বাইতেন । তৎপর 'আয্ ওয়াজ্ মত্ হরাত্' (আহ্ লিয়া বা সহধর্মিণী) দিগের নিকট গমন করিতেন । আর যখন কোনও 'ছফরে' (প্রবাসে) গমন করিতেন, তখন সকলের শেষে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতেন । উদ্দেশ্য, 'ফেরাক জুদারী' (বিচ্ছিন্নতা—বিচ্ছেদ)-এর সময় পিতা-পুত্রীর মধ্যে, অন্ত্য 'আহ্ লে বয়েত' (পরিবার পরিজন বর্গ) অপেক্ষা বাহাতে কম থাকে । হজরত রছুল আকরম (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর খুব 'য়েয্ বত্' করমাইতেন (সম্মান প্রদর্শন করিতেন) । হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কখনও তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন, পরম সমাদরে নিজের কাছে বসাইতেন এবং তাঁহার মস্তকে ও চক্ষে বোছাঃ দিতেন (চুষন করিতেন) । * আবার যখন আ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং তাঁহার গৃহে বাইতেন, তখনও ঐরূপ করিতেন । হজুর (ছালঃ), এই হুংপিওর টুকরা স্বরূপিনী কন্তা-রত্নকে অসাধারণ স্নেহ করিতেন সত্য, কিন্তু আল্লাহ তা-লার আদেশ সম্বন্ধে কঠোরতাই অবলম্বন করিতেন; সে ক্ষেত্রে কন্তা-রত্নের মুখ চাহিয়া কথা বলিতেন না । খোদা তা-লার বাহা আদেশ, দৃঢ়তার সঙ্গে তাহা গুণাইয়া দিতেন । হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহিত জীবনের একবারের ঘটনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার একটু মনোবাদ হইয়াছিল ; এই সংবাদ শ্রবণে আ হজরত (ছালঃ) কন্তা-রত্নের প্রতি বিরক্তি ■ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

স্বর্গ-সম্রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনী পাঠে আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, আদর্শ পিতা ও আদর্শ কন্যার মধ্যে কি পবিত্র সম্বন্ধ ও পবিত্র ভক্তি-স্নেহের বন্ধন বিরাজ করে। পিতা ও সন্তানের পবিত্র ‘মহব্বৎ’ (ভালবাসা) এক স্বর্গীয় সামগ্রী। ইহা এক ‘বরকত’—এক ‘ছায়াদাত’ (পুণ্যবান্ হওয়া)—এক ‘শরফ্’ (সভ্যতা—ভদ্রতা)। সে পিতাকে সোভাগ্যবান্ বলা যায় না—যে পিতা সন্তানের ভক্তি ও ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট না হন, তাহাদিগকে প্রিয় বা স্নেহাস্পদ মনে না করেন, তাহাদের প্রতি স্নেহানুরাগ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন। পক্ষান্তরে তোমরা ঐ সন্তানকে ‘বদ-বখ্ ত্’ (হতভাগা), দুর্ভাগ্যপ্রস্ত মনে কর—যাহাদের অন্তঃকরণে পিতামাতার প্রতি যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালবাসা নাই—যাহারা পিতা মাতার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, হজরত খাতুনে জরত ফাতেমাঃ যোহরার গম্বুর ব্যবহার ও ভক্তি-শ্রদ্ধায় তদীয় বিমাতাগণ তাঁহাকে স্ব স্ব গর্ভজাত সন্তানের স্থায় স্নেহ করিতেন। কেহ বুঝিতে পারিতেন না যে, ইহারা তাঁহার বিমাতা, আর তিনি ইহাদের সপত্নী-কন্যা। খরবরের যুদ্ধে ওম্মোল মুমেনিন হজরত ছফিয়াঃ (রাঃ—আঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন; তিনি মদীনায়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক স্বীয় কাণের একজোড়া অতি মূল্যবান্ রুম্কা (কর্ণভরণ)—যাহা বহুমূল্য মণি-মুক্তায় জড়িত ছিল—হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে উপহার প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার ‘ছেহেলী’ (বয়স্তা) দিগের প্রত্যেককে এক একটি অলঙ্কার দিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে, স্বর্গ-রাজ্ঞীর কিছু মনোবাদ ছিল; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। মহামাননীয়া মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ)

(রাজিঃ)-এর একদস্তা (একদল) শামী (সিরীস) সৈন্য, তরবারি বলে তাঁহার নিকট হইতে ‘বায়্-য়েত’ গ্রহণ করিতে উত্তত হয় ; এই সংবাদ মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) যখন শুনিতে পাইলেন, তখন ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ মছজেদ নবাবীতে গমন পূর্বক হজরত আমীর মাযিয়া (রাজিঃ)-কে তথায় ডাকিয়া পাঠাইলেন ; তিনি মছজেদে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “হে মাযিয়া ! আমি শুনিলাম, তুমি হজরত ‘ছারওয়ারে কায়েনাত’ (ছাঃ)-এর ‘নওয়াছাঃ’ (দোহিত্র—নাতি) এমাম হোছেনের সঙ্গে ‘গোস্তাখীর’ (অনিষ্টতার) সহিত ‘পেশ’ আসিয়াছ ; দেখ, যদি তুমি ঈদূশ অন্তায় কার্য্য হইতে ‘তওবা’ না কর, তবে আমি তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দিব । তোমার সমস্ত শক্তি ও সমস্ত আমীরি ‘ফাখা’ (নিশ্চিহ্ন) করিব । যদিও উহার নানা এবং মাতা জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্থলে আমি জীবিত আছি ।” যদি মহামাননীয়া ওন্মোল মুমেনিনের, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে মনোবাদ থাকিত, তবে তাঁহার পুত্রের প্রতি কেন ঈদূশ সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন ?

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) বৃত্ত্যর ২।৩ দিন পূর্বে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে ‘হাজের’ (উপস্থিত) হইয়া ফরমাইলেন, আম্মাজান ! যদি আমার কোনও কার্য্য বা বাক্য আপনার ‘মরজীর’ (মতের) বিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আমাকে ‘লিল্লাহ্,’ ‘মাক্’ (মার্জনা) করিয়া দিবেন ।’ ওন্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) এই কথা শুনিবামাত্র আকুল প্রাণে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । একদল মোছলমানের পক্ষে পূর্বোন্নিখিত মনোবাদের অমূলক ধারণা মনে স্থান দেওয়া বড়ই অন্তায় কার্য্য । এই ধারণাটা শিয়া মতাবলম্বীদিগের মধ্য হইতে সংক্রামিত হইয়া,

ছদ্মদলের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । এমন পুতচরিত্রা আদর্শ মহিলাদিগের উপর একটু মাত্র বিরুদ্ধ ভাবপোষণ করা, ধর্ম ও নৈতিক হিসাবে অতীব গর্হিত কার্য ।

উদ্ভূত কবিতা ।

জনাব ফাতেমাঃ কি নরতাবাঃ কা কেয়া কাহ্না ;

হামেশা চাহিয়ে ওন্পর দরুদ খাঁ রাহ্না ।

জনাব হামদর কার্কার কি উওহ্ হায় বিবী ;

হাছন হোছেনকি মা হায় রহুলকী বেটি ॥

এই কথা লইয়া অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে যে, ‘মর্তদার’ (সম্মানে—পদ-মর্যাদায়) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হইতে বড়, কিংবা মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? “ তহততল মহাকেল ” গ্রন্থ লেখক, এই বিষয়ের ‘তহকিক (অনুসন্ধান) করিয়া এই-রূপ ‘রায়’ (মতামত) প্রকাশ করিয়াছেন যে, হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ) ‘আফ্ জল’ (শ্রেষ্ঠ) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হইতে ; আর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) নারীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ছৈয়দ আবদুল জলিল বেলগ্রামী এ সম্বন্ধে একটি পারসী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার মূল মর্ম্ম এই :—

কোনও ব্যক্তি আমাকে বলিল যে, হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ‘কজিলত’ (শ্রেষ্ঠত্ব—সম্মান)-এর হিসাবে, হজরত ফাতেমাঃ

(রাঃ—আঃ) হইতে ‘বেহতর’ । তদন্তরে আমি একটি কবিতা পাঠ করিয়াছি । উহার মর্ম্ম এই যে, ‘রেশতাঃ’ (বৈবাহিক সম্বন্ধ) এক জিনিষ ; আর কলেজার টুকরা — জিনিষ । জনাব হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ - আঃ) অবশ্য হজরত রছুল (ছালঃ)-এর বিবাহিতা পত্নী বলিয়া গৌরবান্বিতা ; কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ আ হজরতের ‘জগর গোশা’ (স্তম্ভপিত্ত) বা প্রিয় সন্তান । সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যাপারই স্বতন্ত্র । “ ছন্দছ ছায়াদাত ” গ্রন্থের গ্রন্থকার এই বিষয় লইয়া ‘বহাছ’ (তর্ক—আলোচনা) করিয়াছেন । তাঁহার মতে খাতুনে জরত হজরত ছৈয়দাঃ ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), ‘ছনিয়ার’ (পৃথিবীর) সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা ‘আফ্ জলতর’ (শ্রেষ্ঠা) । তাঁহার পক্ষে ইহাই কোন্ কম গৌরবের কথা ও সম্মানজনক বিষয় যে, তিনি আমাদের হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর স্নেহময়ী কন্যা-রত্ন বা কলেজার টুকরা ; তিনি তাঁহার মনের—জীবনের শান্তি প্রদায়িনী ও আধির তারা । তিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়াছেন, তাঁহার ‘খুন’ (শোণিত) ইহার খুনের সঙ্গে মিশ্রিত আছে । জনাব হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) করমাইতেন, ‘খাতুনে জরত’ (হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রাঃ—আঃ] বেহেশতি খাতুন (স্বর্গস্থ নারি) গণের ‘ছরদার’ (প্রধানা—নেত্রী) । ইহার পবিত্র গর্ভে দুইজন ‘মকদছ’ (পবিত্র—পাক) এমাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাদের ‘শাহাদত’ (শহীদ হওয়া) ও এমামত, ছনিয়ার মোছলনানগণ হইতে ‘খেরাজে এতেকাদ’ (ভক্তি ও বিশ্বাসের খাজানা) আদায় করিয়াছে । আর যাহাদের ‘এস্তেকলাল’ (দৃঢ়তা—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা) সমস্ত ‘ছনিয়া জাহান’ কে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে । ইহারা ঐ মহামাননীরা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ‘আওলাদ’ (সন্তান) ছিলেন—যাহাদের কার্য্য-কলাপে, অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসে,

খোদা তা-লার প্রতি অসীম ভক্তি শ্রদ্ধার এছলাম সম্বীভিত ও গৌরবান্বিত হইয়া আছে, এবং কেশামত পর্য্যন্ত থাকিবে ।

উদ্দ কবিতা ।

ওম্মত তেরি মোজরেম ভি দোষথ্ ছে বরি নেকলি ;

ছুরত মে তু এন্ছান থি ছিরতনে পরী নেকলি ।

খাতুন জন্নতের ইহাই কি কম 'কজিলত' ! (গৌরব—শ্রেষ্ঠত্ব) যে, ছৈয়দ গণের বংশ তরু তাঁহারই দ্বারায় এতাবৎ কাল ছনিয়াতে কায়েম (স্থাপিত—দৃঢ়ীকৃত) রহিয়াছে ।

সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ 'ছহি মোছলেমে' বর্ণিত আছে, হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওক্কাছ (রাজিঃ) * ফরনাইয়াছেন, যখন আহ্-লে-বায়েত্ সম্বন্ধে কোরআন পাকের আয়াত নাজেল হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ),

* হজরত ছায়াদ বিন্-আবিওক্কাছ (রাজিঃ), আশরায় মোবাশ্বরার মধ্যে একজন । ইনি প্রাথমিক মোছলমানদিগের মধ্যে অন্যতম ; ১৭ বৎসর বয়সে পবিত্র এছলাম ধর্মে-দীক্ষিত হন । খোদার পথে ইনিই সর্ব প্রথমে, খোদা-দোহী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে তীর চালাইয়া ছিলেন । আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে সকল জেহাদেই ইনি যোগ দিয়াছিলেন । ইনি 'মস্তজবদাওয়াত' ও ছিলেন, অর্থাৎ ইহার দোওয়া আল্লাহ তা-লার দরবারে গৃহীত হইত ; এজন্য অনেকে তাঁহাকে ভয় করিতেন, কি জানি ইনি যদি 'বদ-দোওয়া' (অভিসম্পাত) করিয়া বসেন । হজরত রহুলে করিম (ছালঃ) ইহার এই বলিয়া আল্লাহ তা-লার দরগায়

পাক পাণ্ডিত্য (৫৮৭) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

(হজরত এমাম) হাছন এবং (হজরত এমাম) হোছেন রাজি
আল্লাহ তা-লা আনহুম কে আহ্বান করিয়া ফরমাইলেন, হে আল্লাহ,
তা-লা ! ইহারাই আমার ‘আহ্লে-বয়েত’ । তফছিরে কাশ্শাফে
লিখিত আছে, যে এই আয়াত নজরানবাসী খৃষ্টীয়ানদিগের সঙ্গে মবাহেলাঃ
(পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত) করিবার জন্য নাযেল হইয়াছিল ।
কিন্তু ইছায়া (খৃষ্টীয়ান) গণ ‘মবাহেলাঃ’ করিতে ভয় পাইয়াছিল ; এজন্য

‘খাছ’ দোওয়া করিয়া ছিলেন যে, হে এলাহি ! ইহার তীরের লক্ষ্য যেন
কখনও ‘খাতা’ না করে (ব্যর্থ না হয়) ; আর ইহার দোওয়াও তুমি
কবুল করিও । ইনি স্থলকার এবং ধর্মাকার ছিলেন । শরীর বহু রোগ
বিশিষ্ট ছিল । মহানান্ত্র দ্বিতীয় খলিফার খেলাফৎ-কালে ইনিই পারস্ত
সাম্রাজ্য জয় করেন । মদীনার নিকটস্থ স্বীয় গৃহে, ৪৫ হিজরীতে, হজরত
গাবিয়া (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে এশুকাল করেন ; তখন
মারওয়ান-বিন-হকম মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন । ঐ মারওয়ানই তাঁহার
জানায়ার নমাজ পড়াইয়াছিলেন । আশরার মোবাহরাদিগের মধ্যে ইনিই
সর্বশেষে পরলোক গমন করেন । যাহারা নিশ্চয়ই বেহেশতি বলিয়া
সুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহারাই আশরায় মোবাহরাঃ । ■ ইহাতে
৪ নং খোন্সফায় য়াশেদীন চতুষ্টয়, ৫ । হজরত তাল্হা (রাজিঃ),
৬ । হজরত যোবের (রাজিঃ), ৭ । হজরত আবদুর রহমান-বিন্ যম্মোফ,
(রাজিঃ), ৮ । হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ), ৯ । হজরত
আবু ওবায়দাঃ-বিন্-জাররাহ (রাজিঃ), ১০ । হজরত ছয়ীদ-বিন্-যয়েদ
(রাজিঃ) ; তদ্ব্যতীত হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ),
হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), এমাম হোছেন (রাজিঃ) কেও জন্মতি
(বেহেশতি) বলিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) সুসংবাদ দিয়াছেন ।

তাহারা 'মবাহেলাঃ' করিতে রাজী হইয়াছিল না । হজরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযিয্ মোহাম্মেছ দেহলবী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক মজবুৎ দলীল হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাঁহার 'আওলাদ' (বংশধর)-দিগের 'ফজিলত' (সম্মান—শ্রেষ্ঠত্ব) সম্বন্ধে কিছুই হইতে পারে না যে, 'বনি-ফাতেমাঃ' ই হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'আওলাদ' (বংশধর) ।

আয়াঃ-তংহির—নোহলেম-মাতা হজরত আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদিন প্রাতঃকালে জনাব হজরত রহুল খোদা (ছালঃ), একখানি 'মনক্বাশ' (সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট—সুচিত্রিত) চাদর গায় দিয়া বসিয়াছিলেন, ঐ সময় এমাম হাছন (রাজিঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে চাদরের মধ্যে টানিয়া লইলেন ; পরে দ্বিতীয় ছাহেবযাদাঃ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আসিলেন, হজুর (ছালঃ) তাঁহাকেও চাদরের ভিতরে গ্রহণ করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ও সেখানে 'তশ-রিফ্' আনিলেন, হজুর তাঁহাকে ও চাদরের মধ্যে টানিয়া লইলেন ; অবশেষে হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহও সেখানে আগমন করিলেন, হজুর (ছালঃ) তাঁহাকে ও চাদরের মধ্যে গ্রহণ করিলেন ; এবং নিম্ন-লিখিত আয়াত পাঠ করিলেন :—
ইমামা ইউরিদোম্মাহো লেয়ুয্ হেবা আন্ কুমোর্ রেজ্ছা আহ লাল বায়তে অয়ুতাহ্ হেরাকুম্ তাত্ হিরা । ছুরা আহ যাব—৪র্থ রকু

আবু ছয়ীদ খুদরী (রাজিঃ) * বলেন, এই আয়াত পাক পাঞ্জতন

* হজরত আবু ছয়ীদ খুদরী (রাজিঃ)—ইহার পূর্ণনাম ছায়াদ-বিন-মালেক খুদরী আনছারী (রাজিঃ) ছিল । ইনি স্বীয় কুনিয়তে আবু ছয়ীদ খুদরী নামেই প্রসিদ্ধ । এই মহাত্মা অতি উচ্চদের আলেম ও ফাজেল ছিলেন ।

সম্বন্ধে নাযেল হইয়াছিল । আর এক ‘ছহি রওয়ায়েতে’ (নিভুল বর্ণনায়) বর্ণিত আছে, হজরত ছরওয়ায়ে কামেনাত্ (ছালঃ) উপরোক্ত চারিজনকে চাদরে আচ্ছাদিত করিয়া ফরমাইয়াছিলেন, হে খোদাওন্দ তা-লা ! ইহারাই আমার “ আহ্-লে-বয়েত ” ; তুমি ইহাদিগকে পাক (পবিত্র) কর ; আর প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য (গোপনীয়) ‘নজাছত’ (অপবিত্রতা) ইহাদিগের মধ্য হইতে দূর কর ।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঐ হজরত (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল ‘নছব’ (বংশ-বর্ষাদা—খান্দানের গৌরব) ই বেকার হইয়া যাইবে ; কেবল আমার নছব অক্ষয় থাকিবে । আর সকল নবীর মেয়ের বংশধরগণ তাঁহাদের পিতার নামে পরিচিত হইবেন ; কিন্তু কাতেমার ‘আওলাদ’ আমার বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবে ।

ছহি-বোখারী গ্রন্থে হজরত মছুর-বিন্-মথরমাঃ (রাজিঃ) * হইতে ইনি বহু হাদীছের বর্ণনাকারী । ঐ হজরত (ছালঃ)-এর হেজরতের ১০ বৎসর পূর্বে মদীনায়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ৭৪ হিজরীতে, ৮৪ বৎসর বয়সে মদীনা তৈয়বায়ই পরলোক গমন করেন । ‘জিন্নতল বকি’ নামক স্বনাম প্রসিদ্ধ কবরস্থানে ইনি সমাহিত হইয়াছেন ।

■ মছুর-বিন্-মথরমাঃ (রাজিঃ)-এর কুনিয়েত আবু আবদুর রহমান বহরী কোরেশী ছিল । ইনি হজরত আবদুর রহমান-বিন্-মুয়োফ্ (রাজিঃ)-এর ভাগিনেয় ছিলেন । হেজরতের দুই বৎসর পরে মক্কায়া জন্মগ্রহণ করেন । ৮ম হিজরীর যেনহজ্জ মাসে মদীনায়া আনীত হন । যখন ঐ হজরত (ছালঃ) পরলোক গমন করেন, তখন ইহার বয়সক্রম ৮ বৎসর । মছুর (ছালঃ)-এর নিকট ইনি হাদীছ শুনিতাছিলেন, এবং মনোযোগ

বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, কাতেমাঃ আমার ‘পারাঃ গোশত’ (মাংসের টুকরা) ; যে উহাকে ক্রোধাবিষ্ট ও ‘নারাজ’ (অসন্তুষ্ট) করিবে, সে যেন আমাকে নারাজ করিল এবং ক্রোধাবিষ্ট করিল ।

যয়েদ-বিন্ আরকম (রাজিঃ) * হইতে রওয়ায়েত আছে যে, তাঁ হজরত (ছালঃ)-এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ), আলী (কঃ—ওঃ) ও হোছনায়েন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে বে লড়াই (যুদ্ধ) করিল, সে যেন আমার সঙ্গে লড়াই করিল ; আর যাহারা উহাদের সঙ্গে ‘ছোলেই’ (সন্ধি) করিল, উহারা যেন আমার সঙ্গেই সন্ধি করিল । “ফৎহোল বারি” গ্রন্থে হজরত যয়েদ বিন্-আরকম (রাজিঃ)-এর বর্ণনা হইতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, মছজেদ নববীর সংলগ্ন বহু সংখ্যক ছাহাবী (রাজিঃ)-এর বাস গৃহ ছিল—যে সকল গৃহের দরওয়াযাঃ ছিল মছজেদের ভিতর দিয়া । তাঁ

সহকারে তাহা স্মরণ করিয়াছিলেন । তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর শাহাদত কাল পর্য্যন্ত ইনি মদীনা শরীফে ছিলেন, পরে মক্কায় চলিয়া আইসেন । ইনি এষিদের নামে বারয়েত করিতে ‘এন্কার’ (অস্বীকৃতি জ্ঞাপন) করিয়াছিলেন । মক্কায় থাকিতে একটা প্রস্তরে আঘাত পাইয়া, ৭৪ হিজরীর রবিয়ল-আউওল মাংসের প্রায়শ্বে ইনি এন্তেকাল করেন ।

* হজরত যয়েদ-বিন্-আরকম (রাজিঃ)-এর কুনিযেত আবু ওমর আনছারী যবরজি । ইনি মদীনা মনুওরার বসবাস ত্যাগ পূর্বক কুফা নগরীতে গিয়া বাস করিতেছিলেন । ইহার নিকট অনেকে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন । ৬৬ হিজরীতে কুফা নগরীতেই ইনি দেহত্যাগ করেন । ইনিও বহু সংখ্যক হাদীছের বর্ণনাকারী ।

হজরত (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহ ব্যতীত আর সকলের গৃহের দরওয়াযাঃ মছজেদের দিক দিরা বন্ধ করিয়া দিয়া-ছিলেন। ইহাতে ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ ‘য়েতরাজ’ (প্রতিবাদ) করাতে তিনি ফরমাইলেন যে, আমি আপনা হইতে এই কার্য্য করি নাই, বরং আমাকে আল্লাহ তা-লা এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন—আমি ঐ আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র।

হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল (ভাবার্থঃ)—“ আমি তোমার নিকট কোনও ‘উজরত’ (পারিশ্রমিক) চাই না, কিন্তু সমস্ত আকরবার ‘মহব্বৎ’ (আত্মীয়গণের প্রতি ভালবাসা) চাই। ” আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, এস্থলে কোন্ কোন্ লোকদিগের প্রতি ‘এশারাঃ’ (ইঙ্গিত) করা হইয়াছে—যাহাদের প্রতি ‘মহব্বৎ’ (ভালবাসা) ‘ওয়াজেব’ (অবশ্য কর্তব্য) বলা হইয়াছে? আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ), আলী (কঃ—ওঃ), আর তাঁহাদের উভয় ‘করযন্দ’ (পুত্র—এমাম ছাহেবদ্বয়)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে (মছনদ এমাম আহম্মদ এব্নে খলিল [রহঃ]-এর পক্ষ হইতে)।

হজরত আবু ছয়ীদ খুদরি (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, একদা হজরত ছরওয়ায়ে কায়েনাত (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন এবং ফরমাইলেন, আমি ফাতেমাঃ! আমি, তুমি, আলী ও হোছনায়েন (এমাম লাভদ্বয়) কেয়ামতের দিন এক-স্থানে থাকিবঃ (বা একত্রে সম্মিলিত হইব)।

হজরত এমাম মালেক (রহঃ) ফরমাইয়াছেন :—কেহই হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর ‘জগরগোশাঃ’ (জুৎপিণ্ডের টুকরা বা কলেজার অংশ) হইতে ‘ফজিলত’ রাখে না (সম্মান বিশিষ্ট নয়)—যখন স্বয়ং আল্লাহ

তা-না কোরআন পাকে ফরমাইয়াছেন (ভাবার্থ)—নেকাহ কর স্ত্রীলোক-দিগকে—যাহারা তোমাদের পছন্দ (মনোনীত) হয়, দুই তিন কিংবা চারিজন । এই আয়াত অনুযায়ী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষে অধিকার ছিল যে, তিনি আরও (একাধিক) বিবাহ করেন । কিন্তু হজরত ছারওয়ায়ে-কায়েনাতে রছুল করিম (ছালঃ) তাঁহাকে অন্য বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন । এমাম মালেক (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, যেকোন চারিজন অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিবাহ করিবার ‘এজ্জায়ত’ (আদেশ—হুকুম) কেবলমাত্র ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল ; সেইরূপ হজরত কাতেমাঃ যোহরার (রাঃ—আঃ) বর্তমানে (জীবিতকালে) হজরত শেরে খোদা আলী (কঃ—ওঃ)-কে অন্য বিবাহ করিতে বাধা দেওয়া, ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর পক্ষে ‘দোরস্ত’ (সিদ্ধ) ছিল—যিনি চাহেবে শরিয়ত (শরিয়তের উদ্ভাবন কর্তা বা শরিয়ত-প্রবর্তক) ছিলেন ; অন্য স্ত্রীলোকের জন্য এই ‘হক্ হাছেল’ ছিল না ; অর্থাৎ অপর স্ত্রীলোকের জন্য এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয় নাই ; না আর কোনও ব্যক্তি শরিয়ত অনুযায়ী স্বীয় ‘দামাদ’ (জামাতা) কে অন্য বিবাহ করিতে নিষেধ করিবার অধিকারী । এই ‘রেয়ায়েত’ (অধিকার) ঈ। হজরত (ছালঃ)-কেবলমাত্র স্বীয় ‘মোকদ্দছ’ ও ‘তাহেরা’ (পবিত্র) কন্যার জন্য ‘জায়েয্’ (সিদ্ধ) রাখিয়া ছিলেন । না প্রত্যেক পিতার ‘দরজাঃ’ (সম্মান) হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর সমান হইতে পারে, না সকল ‘বেটী’ (কন্যা) হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ফযায়েলের (সম্মানের—প্রাপ্যের) নিকট পৌঁছিতে পারে । অর্থাৎ ইহাদের পিতা-পুত্রীর মধ্যে যে বিশেষরূপ বিশেষত্ব ছিল, ইহা সকলেই অবোধে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ।

হাকেম (রাজিঃ), হজরত আবু ছয়ীদ খুদরি (রাজিঃ) হইতে

রওয়ায়েত করিয়াছেন, এবং ইহাকে ছহীহ্ হাদীছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; ঐ হাদীছ এই যে, হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, “(হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জন্নতের (স্বর্গবাসিনী) :বিবী-গণের ছরদার (অধিনেত্রী) ; কিন্তু মরিয়ম-বিস্তে-এমরান (আলাঃ) এই সীমার বহির্ভূত । ” ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, বিবী মরিয়ম (হজরত ঈছা আলায়হেছালামের জননী) ও স্বর্গীর নারিগণের একজন অধিনেত্রী ; এবং তাঁহার সম্মান ও অতি উচ্চ ।

হাকেম (রাজিঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত আরেশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ইহাতে রওয়ায়েত করিয়াছেন, এবং এই হাদীছকে সহীহ্ (বিশ্বক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন যে, হজরত রছুল করিম (ছালঃ) পীড়িত অবস্থায় (যে পীড়ায় তিনি একে কাল করিয়াছিলেন) হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইয়া ছিলেন, “ তুমি কি এই বিদগ্ধ রাজী (সন্তুষ্ট) হইবে না যে, এই ওম্মতের (আমার ওম্মত অর্থাৎ মতানুবর্তিগণের) সমুদয় স্ত্রীলোক ও সমুদয় মুমেনা স্ত্রীলোক এবং ‘ছারাজাহানের’ (সমগ্র দুনিয়ার) স্ত্রীলোকদিগের ছরদার তোমাকে বানান হয় ? ”

হাকেম (রাজিঃ), হযিকাঃ (রাজিঃ) ইহাতে, আর তিনি হজরত রছুলোলামাহ (ছালঃ) ইহাতে রওয়ায়েত করিয়াছেন (অবগণ করিয়াছেন) যে, তিনি (হজরত [ছালঃ]) ফরমাইয়াছেন যে, “হজরত জিব্রিল আমার নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন, (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ) ও (হজরত এমাম) হোছায়েন (রাজিঃ), আহ্লে জন্নতের (বেহেশত্ বা মোছলেম-স্বর্গস্থিত) পুরুষগণের ছরদার । ”

হারেছ-বিন্-আবি আছামাঃ, মোহাম্মদ-বিন্ আলী ইহাতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছায়েন

(রাজিঃ), মাতামহ হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-এর সম্মুখে একদা কুশ্ভি লড়িতে ছিলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হে হাছন, জল্দী কর (শীঘ্র কুশ্ভি শেষ কর) ; হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ), আপনি হাছনের সাহায্য করিতেছেন ? ইহাতে বোধ হইতেছে, আপনার নিকট হোছারেন অপেক্ষা হাছন অধিক প্রিয় ও মেহ-ভাজন । হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন ; “ জিবরিল আলায়হেছ্ ছালাম হোছারনের সাহায্য করিতেছেন ; এজন্য আমি ইচ্ছা করি যে, হাছনের সাহায্য করি । ” এই হাদীছ ‘মোরছল’ ।

হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) হইতে বহু রওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে এস্থলে কয়েকটি রওয়ায়েত বর্ণনা করা বাইতেছে । জনাব ~~কাতেমাঃ~~ ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, একদা হজরত নবী করিম (ছালঃ) আমার নিকট বসিয়াছিলেন, ও সময় এক ‘খাদেমাঃ’ (পরিচারিকা—দাসী) তথায় উপস্থিত হইল ; সে আঁ হজরত (ছালঃ)-কে বলিতে লাগিল, ইয়া রছুলোল্লাহ্ ! আমার ‘আকা’ (প্রভু—মনিব) তেজারতের জন্ত (বাণিজ্যার্থ) ‘বাহের’ (ভিন্ন দেশে) গমন করিয়াছেন ; আর আমার প্রভুপত্নী গৃহে একাকিনী আছেন । তিনি গৃহের ‘বালায়ী হেছার’ (উপর তলায়) বাস করেন, আর ঐ গৃহের নীচের তলায় তাঁহার বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পিতা মাতা অবস্থান করিয়া থাকেন । আমার প্রভু বাণিজ্য-যাত্রাকালে প্রভু-পত্নীকে বলিয়া গিয়াছেন, আমি যে পর্য্যন্ত প্রবাস হইতে ফিরিয়া না আসি, তৎকাল পর্য্যন্ত তুমি এই গৃহের উপর তলা হইতে নিম্নে অবতরণ করিও না । এক্ষণে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমার প্রভু-পত্নীর পিতা কঠিন রোগাক্রান্ত ; আর তাঁহার মাতাও পীড়িতা । এমন কোনও লোক নাই যে, তাঁহাদের ‘খবরগিরী’ (পরিচর্যা) করে । এজন্য আমার প্রভু-পত্নী হজুরের খেদমতে আরজ করিয়াছেন যে,

পাক পাঞ্জতন (৫১৫) কাভেমাঃ যোহরাঃ ।

যদি হজুর 'এজাযত' (আদেশ) দেন, তবে বিবী ছাহেবা উপর শুজ হইতে নিম্নতলে আগমন পূর্বক পিতা নাতার 'খেদমত' (পরিচর্যা— সেবা-শুশ্রূষা) করিতে পারেন ।

হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইতেছেন, আ হজরত (ছালঃ) ঐ দাসীকে নিজের নিকট বসাইলেন, এবং ফরমাইলেন, তোমার বিবীকে গিয়া বলিয়া দাও যে, যে পর্য্যন্ত তাহার স্বামী গৃহে প্রত্যাবৃত্ত না হয়, ধবরদার ! সে পর্য্যন্ত সে বেন গৃহের নিম্নতলে পদার্পণ না করে । একথা শুনিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল । দুই ঘণ্টা (৫ দণ্ড) পরে ঐ দাসী আবার আসিল, এবং হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে আব্রজ করিল, এয়া রছুলোজ্জাহ্, এক্ষণে আমার বিবীর পিতা জানকন্নির হালাতে (মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের) অবস্থার উপস্থিত হইয়াছেন, হজুর অনুমতি দিলে বিবী নীচে (পিতার নিকটে) নামিয়া আসিতে পারেন । হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, তুমি গিয়া তোমার বিবী (প্রভুপত্নী)-কে বল, যদি সে খোদা ও তাঁহার রছুলের সমষ্টি লাভ করিতে চায়, তবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলেও বেন নীচে অবতরণ না করে । স্বামীর বিনানুমতিতে তাহার পক্ষে নীচে অবতরণ করা কোনও ক্রমেই কর্তব্য নহে । দাসী চলিয়া গেল, এবং তখনই কিরিয়া আসিয়া বলিল, বিবীর পিতা 'এন্তেকাল' করিয়াছেন (মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন), বিবী গৃহের উপর তলে বসিয়া রোদন করিতেছেন, পিতার 'আখেরী দীদার' (শেষ সাক্ষাৎ) লাভেও 'মহ রুম' (বঞ্চিত) হইতেছেন । হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি 'লাড্‌কি' (মেয়ে) ! বেশ করিয়া শুনিয়া লও, এবং শ্রবণ রাখ, যে পর্য্যন্ত ঐ বিবীর স্বামী আসিয়া নীচে অবতরণ করিবার আদেশ না দেয়, সে পর্য্যন্ত যাহাই কিছু হউক না কেন ? তাহার নীচে অবতরণ করা জায়েয (সিদ্ধ—কর্তব্য) নহে । তুমি

যাও, তোমার বিবীকে গিয়া বলিয়া দাও—খোদা, তাঁহার রছুল এবং স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করুক, পরলোকে ইহার ‘আজর’ (প্রতিদান—সুফল) লাভ করিবে । পরিচারিকাটি ফিরিয়া গেল । এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঐ পরিচারিকাটি যখন হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বিবীর এখন কি অবস্থা ? সে বলিল, ‘কোরবান’ হই এয়া বিস্তে রছুলোলাহ্ (ছালঃ) ; আমার বিবীর পিতা ও মাতা ঐ দিনই পরলোক গমন করিয়াছিলেন ; হজুর (ছালঃ)-এর আদেশক্রমে বিবী নিজে অবতরণ করিয়া মৃত পিতা মাতাকে দর্শনও করেন নাই । ইহার কয়েক দিন পর আমার প্রভু বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং সমুদয় ঘটনা আনুপূর্বিক শুনিয়া প্রথমে বড়ই ‘পেরেশান’ (দুঃখিত) হইলেন এবং স্বীয় ‘নেকবখ তু’ (ধর্ম্মানুরাগিনী) বিবীর একরূপ ‘করমাবরদারীর’ (আদেশ প্রতিপালনের) ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন । ঐ রাতেই বিবী স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পিতা মাতা ‘জন্নতে’ (বেহেশতে—মোস্লেম-স্বর্গে), অপূর্ব অটালিকার নগ্নি-মুক্তা-বিখচিত অপূর্ব সিংহাসনে বসিয়া আছেন । হরগণ তাঁহাদের মস্তকোপরি চামর বাজন করিতেছে । বিবী স্বীয় পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুনিয়াতে ত আপনাদের ‘আমাল’ (কার্য-কলাপ) একরূপ ছিল না যে, আপনারা স্বর্গলাভের অধিকারী হইতে পারেন ; কিন্তু আপনাদের এ কি অবস্থা দেখিতেছি ? তাঁহার পিতামাতা উত্তর করিলেন, ‘বেটি’ ! (কস্তে !) তুমি যে স্বীয় স্বামী এবং খোদা ও রছুল (ছালঃ)-এর আদেশ সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছিলে, তাহারই ফলে আমরা ‘জন্নতে’ (বেহেশতে) স্থান লাভ করিয়া, এই অনুপম সুখ-দম্পদের অধিকারী হইয়াছি । ছোবহানাল্লাহ্ । খোদা তা-লা ও তাঁহার রছুলের আদেশ, তদানীন্তন কালের মহিলাগণ কিরূপ

একাগ্রচিত্তে—তত্ত্ব-প্রবণ হৃদয়ে পালন করিতেন, এই ঘটনা দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হয়। পাঠক ! ব্যাপার খানা একবার বুঝুন ; একই গৃহের ‘বালায়ী-হেছায়’ (উপর তলায়) বিবী বাস করিতেন, আর নিম্ন-তলে তাঁহার পিতা মাতা থাকিতেন ; পিতামাতা পীড়িত হইলেন, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার অক্ল লোক ছিল না ; হয় ত দাস দাসিগণ কতকটা দেখা শুনা করিত কিংবা আহাৰাদি করাইত । বিবীর স্বামী প্রবাস গমনকালে তাঁহার স্ত্রীকে বিতল হইতে নিষে পদক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; তাঁহার পিতা মাতা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইলেও, হজরত রছুলে করিম (ছালঃ)-এর নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন ; তিনি স্বামীর আদেশের বিপরীতাচরণ করিতে দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করিলেন ; এমন কি, পিতামাতা মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেও, বিবী নীচে অবতরণ পূর্বক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না ; খোদা ও তাহার রছুলের আদেশ বিবী সম্পূর্ণ রূপে পালন করিলেন ; স্বামীর আদেশের অকৃত্যচরণ করিলেন না । পিতামাতা কবরস্থ হইলেন, তবু সেই ধন্যভয়ে ভীতা আদর্শ মহিলা গৃহের নিম্ন-তলে অবতরণ পূর্বক পিতা মাতাকে মৃত অবস্থায় দেখিতেও বিরত থাকিলেন ; ইহার সুফল দক্ষে সন্ধেই ফলিল ; বিবী তাহা স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইলেন । স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বিবীর কার্য্যে মোহিত হইলেন, এমন ধন্যপরায়ণা পত্নী লাভ করিয়াছেন বলিয়া খোদার দরবারে “ শোকর-গোজার ” হইলেন । আর আ হজরত (ছালঃ)-এর দৃঢ়তা ও আল্লাহ তা-বার আদেশ পালনে একাগ্রতা দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন । পক্ষান্তরে আজকালের স্ত্রীলোকদিগকে দেখুন, ইহাদের মধ্যে পনের আনাই স্বৈচ্ছাচরিত্রী, স্বামীর ক্রায়সঙ্গত আদেশ ও উপদেশের কোন পরওয়া করেন না ; খোদা ও রছুলের আদেশের প্রতি ক্রক্ষেপ করিতে নারাজ,

পাক পাণ্ডুলিপি (৫৯৮) কাতেয়াঃ ঘোহরাঃ ।

তাহারা বিলাসিতায় নিমগ্ন ; শোকর ও ছবর নাই । পাশ্চাত্য বিধাতৃ হাওয়া সজোরে প্রবাহিত হইয়া নারী জাতিকে নিলজ্জ, বেহায়া, স্বেচ্ছাচারিণী ও বিলাসিনী করিয়া তুলিয়াছে । জাতীয় ও 'মহাবি' শিক্ষার অভাবে বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন । স্বামী গরীব হইলে স্ত্রী তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন ; ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল বস্ত্রালঙ্কার লাভের জন্য বিষম আবদার করিতেছেন ; অভিনানে কাল ভুজুনির জ্বর গর্জন করিতেছেন । অবস্থাপন্ন হইলে গৃহস্থালীর দিকে তেমন লক্ষ্য করিতেছেন না ; চাকর-চাকরানীর হস্তে সকল কার্যভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং নাটক-নভেল পড়িয়া, বিছনায়, সোফা বা ইজি চেয়ারে সটান হইয়া হাই তুলিতেছেন ; সম্মান প্রতিপালনের ভার দাই, খেলারী বা পাশ্চাত্য অনুকরণে আয়ার হস্তে অর্পণ পূর্বক শাস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছেন । উত্তান ভ্রমণ, থিয়েটার-বায়স্কোপ দর্শন, উন্মুক্ত মটর বা গাড়ীতে বায়ু সেবন—ইত্যাদি বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিতেছেন । আবার আব-হাওয়া বদলাইবার জন্য দার্জিলিং, শিলং, পুরী, ওয়াল্টেয়ার, রাঁচি, শিমুলতলা, গিরিডি বা মধুপুরে গমন পূর্বক বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে 'বে-পরদেগী' ও বিলাসিতার মাদ্রা খুবই বাড়াইতেছেন । আমরা এক ভদ্র লোকের বিষয় জানি, স্বীয় ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে ভীষণ গ্রীষ্মকালেও কলিকাতার বাস করিতে হয় । কিন্তু বিবী ছাহেবা শাসিক ৩০০ ব্যয় করিয়া দার্জিলিং গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন । তথাকথিত উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত লোকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, খুব জোর পিতামাতাকে লইয়া সংসার চালান । অন্য আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী, পাড়া-প্রতিবেশী, স্ববর্ণ্যাবলম্বী, দরিদ্র শিক্ষার্থী প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায় কোনই সাহায্য পাননা । কন্যাদিগকে বিলাসিতা পূর্ণ শিক্ষাদান পূর্বক তাহাদের আদর্শকে নিতান্ত খাটো করা হয় ।

জনাব ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) আর একটি রওয়ায়েত করিয়াছেন, তাহা এই যে, একদা আবু হজরত (ছালঃ) 'ব্রমণার্থ কোনও উজানে উপনীত হন । ঐ স্থানে কতিপয় 'বকরী' (ছাগ) চরিতে ছিল, উহারা তাঁহাকে দেখিয়া 'তায়জিম' (সম্মান প্রদর্শন) জ্ঞত ছৈয়দাঃ (ভুলুঠিত হইয়া প্রণিপাত) করে । সঙ্গীত একজন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) আরজ করিলেন, এয়া য়ুসুফ্‌আহ (ছালঃ) । যখন বাকশক্তি হীন পশু আপনাকে ছৈয়দাঃ করিতেছে, তখন আমরা আপনাকে ছৈয়দাঃ করি । তজ্জ-বণে হজুর (ছালঃ) করমাইলেন, হে লোক সকল । (প্রিয় শিষ্য বণ্ডলি !) যদি আল্লাহ্ ব্যতীত তোলা কাহাকেও ছৈয়দাঃ (ভুলুঠিত হইয়া প্রণিপাত) করা সিদ্ধ হইত, তবে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাওয়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি, সমুদয় ছনিয়ার নারী জাতিকে দৃঢ়তার সহিত আদেশ প্রদান করিতাম যে, তাহারা স্ব স্ব স্বামীকে ছৈয়দাঃ করে । এই রওয়ায়েত দ্বারা একথা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, জনাব হজরত পরগম্বর খোদা (ছালঃ), স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ ভক্তি প্রদর্শন ও তাহাদের আদেশ প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন । স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর এতদপেক্ষা অধিক 'তায়জিম' এর (সম্মান প্রদর্শনের) কথা আর কি হইতে পারে ? এতদ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাওয়াল ও তাঁহার রহুলের পরেই নারীর পক্ষে তাহাদের স্বামী :সর্বাপেক্ষা সম্মানার্থ । সেই স্বামীদিগকে কেবলমাত্র একজন সহযোগী, সহকর্মী বা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেই চলিবে না ; তাহাদিগকে পরম ভক্তি-ভাজন দেবতা স্বরূপ মনে করিতে হইবে ; এবং তদনুরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাহাদের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করিতে হইবে । বর্তমানকালে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আদেশ প্রতিপালনের মাত্রা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে ।

হজরত আলী-বিন-আবিতালের (কঃ—ওঃ), আ. হজরত (ছালঃ)-এর 'চাচ্চাযাদ ভাই' (পিতৃব্য-পুত্র—চাচাতো ভাই) । ইহাদের উভয়ের পিতা হজরত আবুত্বা ও আবুত্বালের পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন । সালকদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব প্রথমে পবিত্র এছলাম ধর্মগ্রহণ এবং আ. হজরত (ছালঃ)-এর নবুয়ত স্বীকার করেন । যখন এই শেরে খোদা (আল্লাহ, তোমার শার্কুল) পবিত্র এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, তখন ইহার বয়সক্রম মাত্র ১০ বৎসর মাত্র ছিল । ইহা দ্বারা একথা প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার 'ফেৎরত' (জন্মকাল)ই বেন এছলাম ছিল ; অর্থাৎ জন্মকাল হইতেই তিনি মোছলমান ছিলেন । কারণ বালকগণ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা এছলাম ধর্মাবলম্বী থাকে ; 'নাবালেগ্' (অপ্রাপ্ত বয়স) পর্যন্ত তাহারা এছলাম ধর্মের গভীর মধ্যেই অবস্থান করে , সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই শৈশবকাল অতিক্রম করিবার পূর্বেই পবিত্র এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন ; একপ ক্ষেত্রে কোফরীর অবস্থা তাঁহার জীবনে কখনও ঘটে নাই । পাঠক ! সেই সময়ের কথা চিন্তা করুন ; আ. হজরত (ছালঃ) যখন স্বীয় নবুয়তের বিষয় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে ঘোষণা করেন, সেই সময় মক্কার কোরেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক লোকেরা তাঁহার প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল । নগরের সমস্ত নরনারী, বালক-যুবক-প্রৌড়-বৃদ্ধ তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । তাঁহার এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এছলাম ধর্মগ্রহণকারী মুষ্টিমেয় নরনারী মক্কাবাসী-দিগের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র—ঘোর শত্রু রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন । সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় এছলাম ধর্মাবলম্বীর অস্তিত্বই ত খুজিয়া পাওয়া যাইত না । কোরেশ ও মক্কাবাসী পৌত্তলিক সম্প্রদায় আ. হজরত (ছালঃ)-এর প্রতি বেরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতেছিল,

পাক পাঞ্জবন (৬০১) কাতেমাঃ যোহরাঃ ।

তাহাকে পদে পদে অপদস্থ করিতেছিল, জগতে তাহার তুলনা নাই । একদা কোরেশদিগের জনতা মধ্যে দাঁড়াইয়া হজরত পয়গম্বর (ছালঃ) ফরমাইলেন, যদি তোমাদের মধ্যে হইতে কতিপয় লোকও আমার সঙ্গী হইয়া যাও, তবে আমি দেখাইয়া দিতে পারি, খোদা তালার আদেশ কি প্রকারে ‘এশয়াত’ (প্রচার) হইতে পারে । তৎক্ষণাৎ ১০ বৎসর বয়স্ক বাগক হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সোৎসাহে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহর সত্য ও মনোনীত রছুল ! আমি ‘দেলে’ ও ‘জানে’ (মন-প্রাণে) আপনার সঙ্গী থাকিব—আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব । হোব্‌হানামাহ্ ! একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালক—ছনিয়ার ভাল মন্দ কোন দর বাধিতেন না ; এতদ্ স্বত্বেও সত্যতা ও ধর্ম-বিশ্বাসে ঈদৃশ অটলভাব ! প্রকান্তে ত এই বাক্য হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল ; কিন্তু ‘জান্নেওরান্না’ জানেন বে, উহা খোদা-প্রদত্ত ‘খাছ’ একটি শক্তি ছিল—যাহা ঐ বালকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল ; কোরেশ জন-সভ্য ত আ হজরত (ছালঃ)-এর এই পবিত্র উক্তি শ্রবণে ব্যস্ত বিক্রম করিতেছিল ; কিন্তু আ হজরত (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কে গলায় জড়াইয়া ধরিলেন, এছলান্নের গৌরব বর্ণনা করিলেন, আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ‘হেন্মাত’ (সাহস) ও মানসিক বলের প্রশংসা করিলেন । কিন্তু ঐ সময় কে জানিত, এই বালক—যাহাকে আজ কোরেশগণ হেকারত (ঘণা)-এর দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তিনি একদা ছনিয়াতে ‘শোজারত’ (বীরত্ব) ও ‘মাররেফতের’ (তত্ত্ব-জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) বাদশাহ হইবেন । ‘কেরামত’ (পৃথিবীর ধ্বংসকাল) পর্যন্ত ইহার বীরত্ব ও ইমানদারী (ধার্মিকতা) কোটি কোটি মনুষ্যের মুখে প্রতিধ্বনিত হইবে ; ইনি আদর্শ বীর ■ আদর্শ ধার্মিক পুরুষ বলিয়া সম্মান লাভ করিবেন । আর হজরত

রজুল করিম (ছালঃ)-এর হৃদয়ের টুকরা হজরত বতুল (রাঃ—আঃ), ইহার সহিত পরিণীতা হইয়া, ইহার গৌরব সম্মান আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবেন । কেবল তাহাই নহে, কিয়ৎকাল পরে ‘তখুত্তে খেলাফৎ’ (খলিফীয় সিংহাসন) ইহার পরিভ্র পদ চূষন করিবে । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এছলাম গ্রহণ করিবামাত্র কোরেশগণ তাঁহার প্রাণের বৈরী হইল । আঁ হজরত (ছালঃ) ও কোরেশ কর্তৃক হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি বিষেষভাব বা শত্রুতাচরণের বিষয় অবগত ছিলেন । তিনি দিবা চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, আরবের পৌত্তলিক অধিবাসিগণ এই ‘মায়ছুম’ (নিষ্পাপ) বালকের প্রাণের শত্রু হইয়াছে ; সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ‘হেফাযতের (রক্ষণাবেক্ষণের) খেয়াল তাঁহার মনে সর্বদাই জাগরুক থাকিত । হজুর (ছালঃ) সাধ্যানুসারে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে চোখে চোখে রাখিতেন—প্রায়ই চক্ষের অন্তরাল হইতে দিতেন না । কোনও দীনের অর্থাৎ ধর্মের শত্রু তাঁহাকে বিপদ গ্রস্ত কিংবা অবমানিত করে, এই আশঙ্কা তাঁহার অন্তরে সর্বদা বিরাজ করিত । হজুর (ছালঃ) কেবল মাত্র যে হজরত ছৈয়দতোব, যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ভাবনাই ভাবিতেন, তাহা নহে ; শেরে-খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি ‘নেগাহ দাশুত্’ (লক্ষ্য রাখা) ও তাঁহার অবশ্য কর্তব্য কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ‘শফিক’ (স্নেহ-পরায়ণতার—মেহেরবানীর) হস্ত ঐক্লপ হজরত আলী (রাজিঃ)-এর মস্তকের উপর ছিল—যেদ্রুপ আবুতালেব পিতৃ-মাতৃহীন বালক আঁ হজরত (ছালঃ)-কে অতি স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন । আঁ হজরত (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ; সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পুত্রের স্তায় ভাল বাসিতেন ; শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) ও ছায়ার স্তায় তাঁহার অনুসরণ

করিতেন ; তদীয় আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, কার্য-কলাপ, জলন্ত ধর্মভাব, খোদাহুরক্তি প্রভৃতির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেন। আ হজরত (ছালঃ) এই প্রতিপালিত, আশ্রিত, সম্পূর্ণ অনুগত ও আদর্শ চরিত্রবান্ জাতাকে এত ভাল বাসিতেন ও স্নেহ করিতেন যে, তাহার তুলনা হয় না। হজরত আলী (কঃ—জঃ)-এর প্রতি তাঁহার ‘কোদরতি’ (স্বভাব জাত) ভাল বাসা ছিল ; যখন হজুর (ছালঃ) বাহিরে যাইতেন, অনেক সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন। ‘কোফ্ফার’ (মক্কার কোরেশ ও পৌত্তলিক আরবগণ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইত ; তাহারা জানিত, এই যুবক আ হজরত (ছালঃ)-এর দক্ষিণ বাহু স্বরূপ তাঁহার প্রত্যেক কার্যের সাহায্যকারী, প্রত্যেক বিষয়ের পক্ষসমর্থন কারী, তাঁহার অন্ত জীবনোৎসর্গ কারী ; পক্ষান্তরে এই তরুণ বয়সেই মহাবীর পুরুষ, দুর্জয় সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও মহা অধ্যবসায়শীল। ইহার সহায়তা লাভে হজুর (ছালঃ) অধিকতর বলীয়ান্। তাহারা উভয়কে একই প্রকার কোপ বা বিব-দৃষ্টিতে দেখিত। অন্তান্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ সকল সময় সঙ্গে থাকিতেন না, স্ব স্ব বিষয় কার্যে লিপ্ত থাকিতেন, বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সুবোগক্রমে মাত্র সম্মিলিত হইতেন, কিন্তু এই তেজস্বী ও বল-দর্পিত যুবক ছায়ার স্তায় পরম প্রকাস্পাদ প্রভার—শিক্ষাদাতা ধর্ম-গুরুর অনুসরণ করিতেন ; শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন ; তিনি অস্ত্রহীন অবস্থায় চলিতেন না। বীরত্বে স্বীয় অন্ততন পিতৃব্য মহাবীর হজরত আমীর হামযাঃ (রাজিঃ)-এর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন ; মক্কা নগরীতে এ উভয়ের বীরত্বেই কাকের দল অনেকটা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। মক্কাবাসী কোরেশ এবং অন্তান্ত পৌত্তলিকগণ জানিত, আ হজরত (ছালঃ) একজন দয়ালু, হৃদয়বান্,

পরহিতৈষী, সত্যবাদী, অিতেন্দ্রিয়, বিশ্বস্ত পুরুষ ; কোনও প্রকার দোষ তাঁহার চরিত্রে নাই ; তবুও তাহারা তাহাদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া তাঁহার প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াছিল—আর তাহাদের সেই বিদ্বেষানল ক্রমেই অধিকতর প্রবল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল । তাহারা ছনিয়াতে তাঁহার স্থায় ঘোর শত্রু আর কাহাকেও মনে করিত না । পৌত্তলিকতা এমন বদ জিনিষ যে, যে ব্যক্তি পৌত্তলিক ও খোদাদ্রোহী হয়, তাহার হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া যায় ; অধর্ম্যাচারের বিষাক্ত বায়ুতে তাহার হৃদয় বিকৃত ও কলুষিত হইয়া পড়ে । সে সেই স্ব হস্তে নির্মিত মৃত্তিকা বা প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠ নির্মিত পুত্তলিকা গুলিকেই মূর্তির একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করে । সেই অচল ও অক্ষম পদার্থ গুলির সম্মুখে নাথা রগুড়াইতে থাকে । ভক্তি গদগদ চিত্তে তাহাদের উপাসনা করে । তাহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালন কর্তা ■ বিনাশ কর্তা বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে । সুতরাং ঐ গুলির বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনিলেই তাহাদের ক্রোধ ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে । পুরুষ অপেক্ষা নারীর ভক্তির প্রবাহটা আরও বেগবতী, সুতরাং তাহাদের ক্রোধাগ্নি আরও প্রকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে । ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও পিতামাতা বা অক্লান্ত গুরুজনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তরুণ বয়স হইতেই পৌত্তলিক-মন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় । তাহাদের হৃদয় অন্ধ বিশ্বাসের গভীর তিসিরে আচ্ছন্ন হইয়া যায় । এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল । পার্কেওয়ান্ড কোরেশগণ ইচ্ছা করিত, যেকোনো ইউক, আবদুল্লাহ পুত্রকে (নউয্ বেল্লাহ্) ‘হালাক’ (নিহত) বলিয়া দেওয়া চাই । উদ্দেশ্য, ছনিয়াতে এই লোকটির অস্তিত্ব না থাকে ; আর আমাদিগকে ও আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধাচরণ—তাহাদের অবমাননা কর উক্তি শ্রবণ-ইত্যাদি নিদারুণ ননোকষ্ট ভোগ করিতে না হয় । আল্লাহ্,

তী-লার ইচ্ছা ছিল, এই বিদ্রোহী দলকে অপ্রস্তুত করা ; এমনকি তাহাদের সর্বপ্রকার প্রাণপণ চেষ্টা, সর্বপ্রকার কঠোর-‘তদ্বির’ (যোগাড়-যন্ত্র) পরিণামে কিছুমাত্র সাফল্য মণ্ডিত হইল না—তাহারা পদে পদে বিফল যনোরথ হইল । একটি নগরের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত সমগ্র অধিবাসী মিলিয়া একটি ক্ষুদ্রতম শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারিল না ; তাহারা যতই সেই স্বর্গীয় শক্তিকে দাবাইতে চেষ্টা করিল, সে পবিত্র শক্তি ততই বল সঞ্চয় করিয়া দ্রুতবেগে উন্নতি-পথে ধাবিত হইতে লাগিল । পৌত্তলিকদিগের সর্বপ্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া পড়িল । মকার অত বড় প্রবল শক্তি সম্পন্ন জাতি গুলির প্রাণপণ চেষ্টার বিপরীত বলই ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল । নক্কাবাসী—বিশেষতঃ কোরেশগণ আপনাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে, আ হজরত (ছালঃ)-এর একটি রোমও বক্র করিতে পারিতেছিল না । হজুর (ছালঃ) এর দৃঢ়সঙ্কল্প, অমানুষিক ‘এস্তেক্‌লাল’ (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা) ‘গম্বের’ ছিল ; যতই তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা হইত, ততই তাঁহার আরও কার্য মহাশক্তিশালী হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিত ; সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধাচারী ও বিরুদ্ধবাদী দিগের সকল চেষ্টা, সকল উদ্ভম, সকল যোগাড়-যন্ত্র, সকল মন্ত্রণা ব্যর্থ হইয়া যাইত—পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ তা-লার ইচ্ছা পূর্ণ হইত ।

উর্দু কবি বলিয়াছেন,—

” এছলামকি কেৱরতমে কোদরত্‌নে লচক দি ছায় ;

এত্‌না হি ইয়েহ্ ওভ্‌রেগা জেত্‌না কে দবা দেঙ্গে ।”

কোরেশদিগের নথো-‘তিনি’ ‘যবরদস্ত্’ (অসাধারণ) ‘ওয়াজ’ করমাইলেন । চতুর্থী—সর্বপ্রকার কোশেষ্, যন্ত্র ও চেষ্টা করিলেন,

বাহাতে কোরেশ ও মক্কার 'বোত-পরস্তের' (পৌত্তলিক বা অংশীবাদীর) দল 'রাহে-রাস্তে' (সুপথে) আগমন করে—মনুষ্যের প্রকৃত কর্তব্য সাধন করিয়া আদর্শ মনুষ্যে পরিণত হয় ; প্রভুর সর্বপ্রকার আদেশ পালন পূর্বক আত্মা-চরিতার্থ করে । তিনি অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন যে, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্বক সকলে 'তওহিদ-পন্থী' হও ; আল্লাহ তা-লার আদেশ পালন পূর্বক বেহেশতে গমনের পথ সুপ্রশস্ত, এবং ভীষণ আযাবের স্থান 'দোযখের' (নরকের) পথ বন্ধ কর । কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালনরূপ মহা সৌভাগ্য লাভ ইহাদের অদৃষ্টে ছিল না । * উহাদের 'কলুবে' (দেল বা হৃদয়ে) 'হওয়াছে খাম্‌ছাঃ' (প্রকাশ্য পঞ্চেন্দ্রিয় বা গোপনীয় পঞ্চ শক্তি)-তে 'বেদিনীর' (খোদা-দ্রোহিতার) মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । বিবেকের মহান শক্তি মানবের করতলগত হইলেও, খোদা দ্রোহিগণ উহার বিপরীত আচরণ করে ; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল । এই 'বদ-কেছ-মন্ত' (হতভাগ্য) লোকেরা কিরূপে আল্লাহ তালালার পবিত্র উপদেশ গ্রহণ ও আদেশ পালন করিবে—যখন উহাদের জন্য 'আযাবে আলিম (ভীষণ শাস্তি) নিদিষ্ট হইয়াছে । বহু বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে, বহু 'লড়াই-জঙ্গ' হইয়াছে, বহু শোণিতপাত হইয়াছে, পদে পদে অপ্রস্তুত ও লাঞ্চিত হইয়াছে, তবু তাহারা যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গেল । আপনাদের অসভ্যতা, বর্বরতা ও ধর্মদ্রোহিতা হইতে ক্ষান্ত হইল না । যখন কাফের-দিগের কঠোর ব্যবহার, 'বে-আদবী', ঘৃণিত সঙ্কল্প সীমা অতিক্রম করিল ; আর হজরত নবী করিম (ছালঃ) তাহাদিগকে সুপথে আনয়নে 'মায়ূছ'

* খাতামাল্লাহো আলা কুলুবেহেম ওয়ালা ছামরেহেম ওয়ালা আব্‌ছারেহেম গেশা ওয়াতুন ওলাহম আযাবোন আলিম ।

(নিরাশ) হইলেন, তখন অগত্যা জন্মভূমি মকা-মোয়াজ্জমা হইতে হেজরত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মকা-মোয়াজ্জমা পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া হজরতের পক্ষে একটা সাধারণ কাজ ছিল না ; পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব পুরুষদিগের পবিত্র লীলাভূমি, স্বীয় পবিত্র জন্ম-স্থান, জীবনের সুদীর্ঘ বায়ান্ন বৎসর কাল (শৈশব, বাল্য, যৌবন ও প্রৌড়কাল) যে স্থানে তিনি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সর্বশক্তিমান অধিতীয় খোদাতালার উপাসনার একমাত্র আদিগৃহ (পবিত্র কোবাগৃহ) যে পবিত্র মক্কা শহরে অবস্থিত, সেই পবিত্র নগরী পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্নদেশে গিয়া বস-বাস করা কি সহজ ব্যাপার ছিল ! ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা অনুমান করা আমাদের জ্ঞান ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেক পরগম্বর (আলাঃ) কেই খোদা-দ্রোহিদিগের দ্বারা জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের হজরত রহুল আকরম (ছালঃ)-এর জ্ঞান কাহারও প্রতি এক কঠোর অত্যাচার-উৎপীড়ন হয় নাই ; এমন ভীষণ বিপদের সঙ্গে কাহাকেও সুদীর্ঘ কাল যুক্তিতে হইয়াছিল না। হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহ, হজরত ইউছফ (আলাঃ), হজরত আইয়ুব (আলাঃ), হজরত ইউসুফ (আলাঃ), হজরত মুহা (আলাঃ)—অনেক বিপদ আপদের সহিত যুক্তিয়া পবিত্র এছলাম ধর্মের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর জ্ঞান ভীষণ বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া কাহাকেও ঈদৃশ সাফল্য-মণ্ডিত হইতে হয় নাই। বর্তমান সময়ে আর কোনও নবীর ওস্তানের মধ্যেই প্রকৃত ‘তওহিদ-পন্থী’ (একেশ্বরবাদী) লোকের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে না ; আজ পৃথিবীর ৪০ কোটি লোক একেশ্বরবাদী।

স্বীয় প্রিয় জন্মভূমি, পিতৃ-পিতামহাদির বাসস্থান, খোদাতালার প্রথম

উপাসনা-গৃহ, স্বীয় পূর্ব পুরুষ হজরত এছমাইল (আলাঃ)-এর আবাস-স্থান পবিত্র মক্কা নগরী পরিত্যাগ করিতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রাণে যে মর্শ্বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । যখন তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ রূপে বিপর্য্য হইবার উপক্রম হইল, তখনই তিনি মক্কা হইতে মদীনায়া হেজরত করিলেন ; তাঁহার পবিত্র জীবনীতে ইতিপূর্বে সে বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তিনি যথাসময়ে হেজরত করিয়া, প্রিয় শিষ্য হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মদীনায়া প্রস্থান করিলেন ; ইতিপূর্বে মদীনার বহুসংখ্যক সন্তান অধিবাসী পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; এবং হজুর (ছালঃ)-এর প্রিয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের প্রায় সকলেই মদীনায়া চলিয়া গিয়াছিলেন । আঁ হজরত (ছালঃ) মদীনায়া পুরন সমাদরে গৃহীত হইলেন । তিনি ও তাঁহার ভক্ত বহু আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), স্ব স্ব পরিবারবর্গ মক্কায়া রাখিয়াই মদীনায়া চলিয়া গিয়াছিলেন । এই সময়ের একটি ব্যাপারের সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায় না । হজরত মদীনায়া প্রস্থান করার ৩৪ দিন পরেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও মদীনায়া প্রস্থান করেন, ঐ সময়ে ওম্মোল মুমেনিনগণ, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাঁহার ভগিনী হজরত ওম্মে কুলছুম (রাঃ—আঃ) প্রভৃতি কোথায় ছিলেন ; পুরুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনও অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক ত তখন মক্কায়া উপস্থিত ছিলেন না । অবশ্য হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর পরিবারে তাঁহার পিতা ও পুত্রগণ বর্তমান ছিলেন । যাহা হউক, মদীনায়া কিছু দিন বাস করিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) উপাসনার জন্য মছজেদ নির্মাণ করিলেন । নিজের বসবাস জন্য নূতন গৃহ নির্মাণ করাইলেন । অতঃপর স্বীয় পুরন ভক্ত শিষ্য ও ক্রীত দাস হজরত যয়েদ বিন্-

পাক পাঞ্জতন (৬০৯) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

হারছাঃ (রাজিঃ) (১) ও হজরত রাফেয় (রাজিঃ) (২) কে মকায় পাঠাইয়া, ওম্মোল মুম্বিনিন হজরত ছওদাঃ-বিন্ যোময়া (রাঃ—আঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত ওম্মে কোলছুম (রাঃ—আঃ), আছামাঃ বিন্-যয়েদ (রাঃ), (৩) তাঁহার মাতা ওম্মে-এমিন (রাঃ—আঃ)-(৪)কে মদীনায় আনাইলেন । আর হজরত আবুহুলা-বিন্-আবিবকর

(১) ইহার বিষয় আ হজরত (ছালঃ)-এর জীবন-চরিতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।

(২) হজরত রাফেয় (রাজিঃ) মেছেরের কব্‌তি (কপ্ট) জাতীর লোক এবং আ হজরত (ছালঃ)-এর গোলাম (ক্রীতদাস) ছিলেন । আ হজরত (ছালঃ)-এর চাচ্চা (পিতৃব্য) হজরত আব্বাহ (রাজিঃ), ইহাকে নখর স্বরূপ হজুর (ছালঃ)-কে দিয়াছিলেন । হজরত আব্বাহ (রাজিঃ) যখন পবিত্র এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, তখন আ (ছালঃ) ইহাকে 'আযাদ' (স্বাধীন) করিয়া দেন ।

(৩) আছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), ওম্মে এমিন (রাঃ—আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আ হজরত (ছালঃ) যখন একে কাল ফরমাইয়াছিলেন, তখন আছামাঃ (রাজিঃ)-এর বয়স ২০ বৎসর ছিল ; অনেকের মতে ১৭১৮ বৎসর মাত্র । তৃতীয় খলিফা হজরত ওহমান (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ-প্রাপ্তির পরে ইনি “ ওয়াদি-আল্-কোরা ” নামক স্থানে একে কাল করেন ;

(৪) ওম্মে-এমিনের (রাঃ—আঃ) নাম বরকাঃ । আবুহুলাঃ ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ—আ হজরত (ছালঃ)-এর 'আযাদ' করা (মুক্তি প্রাপ্ত) দাসী ছিলেন । যখন আ হজরত (ছালঃ) হজরত খদিজাতুল কোব্রা (রাঃ—আঃ)-কে বিবাহ করিলেন ; তখন তদীয় ক্রীতদাস হজরত যয়েদ-বিন্-হারছাঃ (রাজিঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন ।

(রাজিঃ) স্বীয় মাতা ওয়ে রোমান (রাঃ—আঃ), (*) স্বীয় ভগিনী ওয়েল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ) ■ অস্বাস্থ্য আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া মদীনায়া 'তশরিফ্' আনিলেন। যখন পরিবারবর্গ মক্কা হইতে মদীনায়া আগমন করিলেন, সেই সময় আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় নব-নির্মিত গৃহে গমন করিলেন। ঐ গৃহ মহজেদ-সুন্দর ছিল।

আ হজরত (ছালঃ) হেজরত করিয়া মদীনায়া আসিয়াছেন : তাঁহার পরিবার বর্গের ■ মদীনায়া আগমন হইয়াছে। মহামানবীয় হজরত ফাতেমাঃ সাহরাঃ (রাঃ—আঃ) ও মদীনায়া “ তশরিফ্ ” আনিয়াছেন। এ সময় তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত—যুবতী ; চতুর্দিক হইতে আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল ; অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি বিবাহের 'পরগাম' (প্রস্তাব) পাঠাইলেন। আরবের খ্যাতিনামা বড় বড় ছরদারের পক্ষ হইতেও বিবাহের আগ্রহ পূর্ণ প্রস্তাব আসিল। কিন্তু তিনি সকলকেই অসম্মতি-সূচক 'ছাফ্ জওয়াব' (স্পষ্ট, উত্তর) দিলেন। তিনি অর্থ-সম্পদের ধার ধারিতেন না, বিপুল ঐশ্বর্য—কোঠা-ইমারত প্রভৃতির গৌরব অনুভব করিতেন না, দৈহিক সৌন্দর্য ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য-সম্পদ দর্শনেও প্রীতিলাভ

(*) ওয়ে রোমান অর্থাৎ দহদ-বিস্তে আমের-বিন্ ওমর কেনানী এছলাম গ্রহণের পর ইনি দুই নেকাহ করেন ; তৃতীয় নেকাহ হজরত আবুবকর ছিদিক (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হইয়াছিল। এই পক্ষে ওয়েল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ) ও হজরত আবদুর রহমান (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যু হইলে স্বয়ং আ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে কবরে স্থাপন করিয়াছিলেন।

পাক পাঞ্জতন (৬১১) কাতেমাঃ যোহরাঃ ।

করিতেন না ; মহা বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতিও আস্থা স্থাপন করিতেন না ; তিনি চাহিতেন খোদা-ভক্ত পরম ধার্মিক আদর্শ মানুষ । তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরবই বুঝিতেন । সচ্চরিত্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, যাঁটি মোছলেমোচিত গুণ-গ্রাম, সত্যবাদিতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, জন-হিতৈষণা, দারিদ্রে সন্তুষ্ট বা আল্লাহর দরগাহ শোকর ও হুবরকারী ব্যক্তিই তাঁহার নিকট গৌরবের—সহানুভূতির পাত্র ছিলেন । তিনি বলিতেন, অর্থ-সম্পদের কি মূল্য আছে ? অল্প সময় মধ্যে উহার ক্ষতিও মুছিয়া বাইতে পারে ; অত্যাচ্চ সৌখ্যমালা বা হাফিয়াজি সামান্য ভূমিকম্পেই চূরমার হইয়া ভূমিসাৎ হইতে পারে, সুন্দর স্তম্ভ দেহ শীঘ্রই বিকৃত আকার ধারণ করিতে পারে ; কিন্তু ধর্মপ্রাণ, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, আদর্শ ধার্মিক ব্যক্তির নিকট ঐ সকল বিষয় তুচ্ছ ; সে দরিদ্র হইলেও মহা গৌরবের পাত্র — আদর্শ পুরুষ । তাঁহার রূহানী (আধ্যাত্মিক) এমারিত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বা ভূমিকম্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার নহে । ঐ শ্রেণীর বড়লোকও আমীর-ওমরা ব্যতীত, আ হজরত (ছালঃ)-এর স্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ও প্রচার-বন্ধু হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ও হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)ও, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ), এর জন্ত বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । অবশ্য ইহাদের ‘ফজিলত’ ও ‘মর্তুবা’ সম্বন্ধে কোন কথা ছিল না ; তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তরে আ হজরত (ছালঃ) এইমাত্র ফরমাইয়া ছিলেন, কাতেমাঃ অতি তরুণ বয়স্কা বাণিকা, সুতরাং এই সম্বন্ধ তাহার জন্ত, আমার মতে ঠিক হইবে না ; আবার ইহাও ফরমাইয়াছিলেন যে, কাতেমার বিবাহ সম্বন্ধে আমি আল্লাহ তালার ওহীর (আদেশের) প্রতীক্ষা করিতেছি ।

একদা মছজেদ নববীতে জনাব হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ) ও হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওকাছ (রাজিঃ)

মহম্মদ নববীতে বসিয়া, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ সম্বন্ধে এই বলিয়া আলোচনা করিতে ছিলেন যে, কোরেশ দলপতি এবং আরবের খ্যাতনামা ছরদারগণ ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়া ছিলেন; কিন্তু আ হজরত (ছালঃ) এ যাবৎ কাহারও প্রস্তাব মঞ্জুর করেন নাই; এক্ষণে একমাত্র (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ) বাকী রহিয়াছেন; এবাবৎ তাঁহার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব হয় নাই; সম্ভবতঃ তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর হইতে পারে। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) দরিদ্রতা রিক্ত হস্ত হওয়ার জন্য বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিতেছেন না। আর ইহা আমার কেবলমাত্র 'খেয়াল নহে, বরং 'একিন ওয়াছক' (দৃঢ় বিশ্বাস) যে, (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ তাঁহার সঙ্গেই হইবে। যদি আপনারা আমার সঙ্গে গমন করেন, তবে আমি (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-কে, (হজরত) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করি। যদি অর্থাতাব ও দরিদ্রতাই এই বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়, তবে আমরা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিব। তাঁহার প্রস্তাব অপর দুই মহাত্মার মনঃপুত হওয়াতে, তাঁহারা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সন্ধানে বাহির হইলেন; তিনি ঐ সময় মদীনার নিকটবর্তী জঙ্গলে স্বীয় উষ্ট্রটি চরাইতে ছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়াতে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হে আলী (কঃ—ওঃ) ! আ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে আপনার 'খাছ করাবত' (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা) আছে; এ সৌভাগ্য আর কাহারও নাই। আর যে সকল সদৃশ্যাবলী আল্লাহ তা-লা আপনাকে দিয়াছেন, আপনার চরিত্র যেরূপ গৌরব মণ্ডিত করিয়াছেন, এরূপ আর কাহাকেও করেন নাই। কোরেশদিগের প্রধান প্রধান 'ছরদার' (দলপতি)-গণ, আরবের

পাক পাণ্ডিত্য (৬১৩) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ, ধনপতিগণ, (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কাহারও আরজীই হজুর (ছালঃ) কবুল করেন নাই ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, (হজরত) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আপনার জন্যই আছেন, যদি আপনি দরখাস্ত করেন, তবে নিশ্চয়ই আ হজরত (ছালঃ) আপনার প্রস্তাব মঞ্জুর করিবেন ।

জনাব আবু তৌরাব হজরত আলী * (কঃ—ওঃ) করমাইলেন, যখন হজুর (ছালঃ) আপনাকে ও হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর প্রস্তাবে 'ছাফ্ জওয়াব' দিয়াছেন (স্পষ্ট উত্তর—অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন), এরূপ ক্ষেত্রে আমি কোন্ ভরসায় বিবাহের 'পরগাম' (প্রস্তাব) করিব ? আমি ত সম্পূর্ণ অর্থহীন দীন-দরিদ্র ব্যক্তি । অশ্রু রওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ)-এর এই উক্তি শুনিয়া তাঁহার নেত্রের অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং করমাইলেন, আমি 'আতশে-শওক' (বাসনায়) এতদিন গোপন রাখিয়া ছিলাম, আপনি সেই বাসনানল আজ উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেন । আমি যে বাসনা অতি কষ্টে মনের মধ্যে 'দাবাইয়া' (গোপন করিয়া—চাপিয়া) রাখিয়া ছিলাম, আপনি উৎসাহ দিয়া আমার সেই বাসনা নূতন ভাবে জাগরিত করিয়া দিলেন । আ হজরত (ছালঃ)-এর জামাতী হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে যেদ্রুপ প্রবল ভাবে আসন পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা আমিই বুঝিতে পারি । কিন্তু আক্ষেপ ! দরিদ্রতা, নিঃস্বলতা ও অর্থ রুদ্ধতার জন্য আমি 'মোযুর' (নিরুপায়) ; দরিদ্রতা আমার বাকরোধ করিয়াছে ; এজন্য আমার 'আরযু' (কামনা—বাসনা) মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছে ; অনেক বার ইচ্ছা হইয়াছে, বিবাহের জন্য প্রস্তাব করি, কিন্তু দরিদ্রতা ও অর্থহীনতা সে বিষয়ে প্রবল বাধা জন্মাইয়াছে । হজরত আলী

(কঃ—ওঃ)-এর উক্তি শুনিয়া হজরত আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ)
 করমাইলেন, হজরত 'ছরওয়ায়ে কায়েনাত' (ছালঃ)-এর দৃষ্টিতে অর্থ-
 সম্পদের কোনও মূল্য বা গৌরব নাই। আপনি অর্থহীনতার 'ওজর'
 করিবেন না। আপনি অবিলম্বে আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে
 উপস্থিত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব 'পেশ' করুন। আমার 'দেল' (মন)
 সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, আপনার প্রস্তাব 'রদ' (অগ্রাহ্য) হইবে না।
 হজরত (ছালঃ) প্রসন্ন চিত্তে আপনার প্রস্তাব 'মঞ্জুর' করিবেন।
 এইরূপ কথোপকথন ও 'আহ-বাব' (বন্ধ)-দিগের অনুরোধে হজরত
 আলী (কঃ—ওঃ) বিবাহের প্রস্তাব করিবার প্রস্তুত হইলেন।
 তিনি উষ্ট্রের 'মোহার' (নাসিকা-রজ্জু) হস্তে গ্রহণ পূর্বক গৃহে আগমন
 করিলেন; উষ্ট্রী গৃহে বাধিয়া হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে
 'হাজের' (উপস্থিত) হইলেন। ঐ সময় হজরত (ছালঃ) ওম্মোল-মুয়েনিন
 হজরত ওম্মে ছলমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন।
 গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহার রূপিণী কল্পিত হইতে লাগিল।
 কোনওরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন।
 গৃহের দ্বার উদ্বাটিত হইল; আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)
 গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। লজ্জা ও 'শরম' তাঁহার উপর দীর্ঘ
 প্রস্তাব বিস্তার করিল; তিনি গৃহের এক প্রান্তে নীরবে উপবেশন
 করিলেন। তিনি নির্বাক ছিলেন, লজ্জায় মস্তকোত্তোলন করিতে
 পারিতেছিলেন না। আ হজরত (ছালঃ)-এর দূরদর্শিনী জ্ঞান, কাহারও
 মনোগত ভাব জানিতে অক্ষম ছিল না; তিনি লোকের মুখের ভাব
 দেখিয়া মনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে তিনি হজরত আলী
 (কঃ—ওঃ)-এর আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় অবিদিত ছিলেন না।
 তিনি অতি স্নেহ-সূচক বিনয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলি!

আজ ইহা কি ব্যাপার ! লজ্জা ও 'হেজাবের' এত আধিক্য দেখিতেছি কেন ? আমি দেখিতেছি, তোমার চেহরায় উদাস ভাব প্রকটিত ; তুমি যেন কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ! আমার বোধ হইতেছে, আজ তুমি কোনও 'খাছ-মৎলব' (বিশেষ উদ্দেশ্য) লাতার্থ আমার নিকট আসিয়াছ ; কিন্তু লজ্জা ■ শরমে সেই কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছ না । তুমি ঠিক করিয়া বল, তুমি কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ বিষয়ের প্রার্থনা করিতে আমার নিকট আসিয়াছ । ঐ হজরতের এই স্নেহ-ব্যঞ্জক উক্তির পরেও যদি তিনি মীরব ■ নির্বাক থাকিতেন, তবে তাহা 'বে-আদবী' (অশিষ্টতা) বলিয়া পরিগণিত হইত । সুতরাং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আদবের সঙ্গে, সলজ্জ অবস্থায় মস্তক অবনত করিয়া করজোরে আরজ করিলেন, এয়া রহুলোল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা আপনার নামে 'কোরবান' (উৎসর্গীকৃত) হউন, আমি বাল্যকাল হইতে আপনার দ্বারা প্রতিপালিত, আপনার অগ্রে পরিবর্দ্ধিত, আপনার অমুপম স্নেহে সংরক্ষিত ; আপনি প্রথম হইতেই আমাকে অমুপম স্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন ; অধীন আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ দাস । আমি সর্বদা আপনাকে স্বীয় পিতা আবুতালেব এবং মাতা ফাতেমাঃ-বিন্তে আছদ হইতে আমার প্রতি অধিক স্নেহশীল পাইয়াছি ; আমার 'দীন' ও 'ইমানের' অবলম্বনও আপনি । আপনিই আমার 'ওয়ালী' (প্রভু), 'মোখতার' (কর্তা) এবং সর্ব কমতাপন্ন 'আমীন' (অধিকারী) ; আপনি বাল্যকাল হইতেই আমার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের দায়িত্ব লইয়াছেন ; আমার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সকল বিষয়ের ভারই আপনার উপর ন্যস্ত ; আপনিই আমার একমাত্র অভিভাবক । আজ পর্য্যন্ত আপনিই আমার একমাত্র মুরব্বি ■ আশ্রয় দাতা । বহুদিন হইতে

পাক পাণ্ডতন : (৬১৬) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

আমার কামনা ছিল যে, হজুরের খেদমতে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জন্ত দরখাস্ত করি ; কিন্তু লজ্জায় আমি এবাবৎ সে প্রস্তাব করিতে পারি নাই ; যখনই প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইত, লজ্জা ও শরম আসিয়া তাহাতে বাধা-প্রদান করিত । এক্ষণে আলী খেদমতে নিতান্ত আদবের সহিত আরজ করিতেছি যে, এ অধম দাসকে স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ পূর্বক অধীনের চির মনঃঅভিলাষ পূর্ণ করুন । এতচ্ছণে [redacted] রহুল করিম (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে নিকটে বসাইয়া স্নেহ-ভরে ফরমাইলেন ;—তোমার ‘মতলব’ (উদ্দেশ্য) আমি বুঝিলাম, এক্ষণে তুমি বল, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) কে বিবাহ করিবার জন্ত তোমার নিকট কি পরিমাণ ‘হরমায়্যাঃ’ (পূজি) আছে ? হজরত রেছালতমার (ছালঃ)-এর এই প্রশ্নে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমার নিকট হজুর (ছালঃ)-এর ‘শফকৎ’ (স্নেহ ও ভালবাসা) ই কি কম ‘দওলৎ’ (অর্থ-সম্পদ) ? যখন হজুরের অনুপম স্নেহ ও ভালবাসার হস্ত আমার মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে, এ অবস্থায় আমার পার্থিব অর্থ-সম্পদেরই বা কি ভাবনা ? বিশেষতঃ আমার নিকট কি আছে না আছে, তাহা হজুরের অবিদিত নাই । একটি উষ্ট্র, একখানি তরবারি ও একটি ‘ঘরাঃ’ (বন্দ) ব্যতীত আমার আর কোনই সম্বল নাই । অবশ্য আমি আপনার ‘গোলামী’ (দাস), এই গোলামীর গৌরবকে আমি এক অকুরন্ত ধন-ভাণ্ডার বলিয়া মনে করি ।

পিত্তি বাহাউদ্দীন—পঞ্জাব নিবাসী সুকবি মোহাম্মদ আছিনাম খান ছাহেব এ সম্বন্ধে যে উর্দু কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই হৃদয়স্পর্শী ; নিম্নে সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করা হইল :—

পরওয়ায়ে যব-নেহী, না হায় দওলত্ছে কোই কাম ;

কুচ, মেরে পাছ হায় তো, ফকৎ হায় খোদাকা নাম ।

পাক পাণ্ডতন (৬১৭) কাতেমাঃ যোহরাঃ ।

মোফ্লেছ্ হৌ তজ্জদন্ত্ হৌ, পর দেল্কা হৌ গনী ;

এক ঘরা হায় জো অকমে আতি হায় মেরি কাম ।

লে দেকে মেরে ঘরমে হায় এয়া ছৈয়দল বশর ;

এক তেগ মোশ্গাক্ তো শতর এক খোশ্ খরাম ।

জো কুচ্কে হৌ হজুর পঃ হায় ছব ওহ্ আশ্কার ;

কেয়া কম হায় ইয়ে শরফ্, কে মোহাম্মদ (ছালঃ) কা হৌ গোলাম ।

হুনিয়াকে জাহ্ ও মাল্ছে কেয়া ওয়াস্তাঃ কে হায় ;

ওরদে যবান খোদা, আওর রছুল খোদা কা নাম ।

এই কবিতাটির তাবার্থ উপরেই লিখা হইয়াছে । পাঠক ।

একশ্রেণী হজরত ((ছালঃ))-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জন, দৃঢ় সঙ্কল্প, দরিদ্রতাকে সাদরে

গ্রহণ, ধর্ম-প্রাণতা ও সচ্চরিত্রতাকে মনোনিয়ন—কত উচ্চ আদর্শের

পরিচায়ক, তাহা চিন্তা করুন । আরবের বড় বড় আমীর-ওমরা,

মহার খ্যাতিনামা রইছ প্রভৃতি কাহারও প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন না ;

আর নিজের আশ্রিত, প্রতিপালিত, একেবারে দীন-দরিদ্র হজরত আলী

(কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় স্ত্রীপুত্র কন্যা-রত্ন দান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।

এই বাঙ্গাল দেশেই কোনও ধর্ম-সমাজের একজন সর্বজনমান্ত গুরু বা নেতা

স্বীয় কন্যার বিবাহ, স্বীয় ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী একজন বড় রাজার সঙ্গে

সম্পাদন করিলেন । সেই রাজার ধর্ম-মতানুসারে বিবাহ দিয়া স্বীয়

সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকদিগের এমনই বিরাগ ভাজন হইলেন যে,

তাহার সেই সুগঠিত ধর্ম-সত্ত্বটি তাহারা চুরমার হইয়া গেল । প্রধান

প্রধান লোকেরা তাহার দল ছাড়িয়া একটি নূতন ধর্ম-সংঘের প্রতিষ্ঠা

করিলেন । তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই বিবাহ সম্বন্ধে সর্ব-

নিয়ন্তা পরাৎপর প্রভু কর্তৃক আমি আদিষ্ট হইয়াছি । পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সম্পদের

নিকট তিনি স্বীয় ধর্মমতকে রূপি দিলেন । তাহার ধর্মমতের দুর্বলতা

প্রকাশ পাইল । কিন্তু আমাদের হজরত রছুল করিম (ছালঃ) বিরাট পর্বতের স্তায় অচল থাকিয়া, স্বীয় সুদৃঢ় ধর্মমতের ■ হৃদয়ের মহান শক্তির কি অপূর্ব—অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিলেন ।

হজরত রছুল করিম (ছালঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ফরমাইলেন, তলোয়ার ত অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ; কারণ আজকাল প্রায় সকল সময়েই ‘জেহাদ’ (ধর্মযুদ্ধ)-এর প্রয়োজন হইয়া থাকে ; আর যাতায়াত এবং সাংসারিক কার্যের জন্য উষ্ট্রের ■ একান্ত প্রয়োজন ; আরোহণ করিবার ■ উষ্ট্রের আবশ্যক হইয়া থাকে । অবশ্য ‘ঘরাঃ’ (বর্ম)ও প্রয়োজনীয় জিনিষ, কিন্তু উহা না হইলেও কোন রূপে চলিতে পারে । তুমি বিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থ স্বীয় বর্মটিই বিক্রয় কর । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, উহা ত খুব কম দামী জিনিষ ; উহার মূল্য ৪০০ দরহমও হইবে না । হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি উহাই ‘কবুল’ করিব ; তুমি যাও, ঘরাঃটি বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য আমার নিকট লইয়া আইস । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তৎক্ষণাৎ বর্মটি বিক্রয় করণার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ৪০০ দরহম, কাহারও কাহারও মতে ৪৮০ দরহম মূল্যে হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ) ঐ বর্মটি ক্রয় করিয়া, সেই মূল্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন ; এবং ফরমাইলেন, এক্ষণে আমি ত এই বর্মের অধিকারী হইলাম ; অতঃপর আমার ‘এখ্-তিয়ার’ (অধিকার) আছে, ঘরাঃটি বাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারি । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন,—নিশ্চয়ই আপনি বর্মটি সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন ; সে সম্বন্ধে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । তচ্ছ বণে হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি আমা অপেক্ষা এই বর্মের অধিক হকদার, আপনিই ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র ; এক্ষণে আমি শরানুযায়ী

হেবাঃ করিয়া এই বরাঃ আপনাকে প্রদান করিতেছি । এই বর্ষ আপনার জন্যই 'মবারক' হউক । এই বলিয়া বর্ষটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন । হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ)-এর এই দাতব্য শক্তি ও উদারতায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) অত্যন্ত বাধিত হইলেন ; এবং দরহমও বরাঃ লইয়া হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি জরী সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আত্মপুর্নিক হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন । তিনি এই সংবাদ শ্রবণে হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর মদলার্থ দোওয়া করমাইলেন । অতঃপর হজুর (ছালঃ) হজরত আনছ (রাজিঃ) * কে করমাইলেন, তুমি মহজেদে গমন পূর্বক সমুদয় ছাহাবাঃ—মোহাজেরিন্ ■ আনছারকে ডাকিয়া আন । তদনুসারে তিনি চলিয়া গেলেন । একটু পরে হজুর (ছালঃ) ■ মহজেদে আগমন করিলেন ; আ হজরত (ছালঃ)-কে তখন বড়ই প্রফুল্লিত দেখা গিয়াছিল । হজরত আনছ (রাজিঃ) বলেন, আমি ঐ সময় আ হজরত (ছালঃ)-এর 'খেদমতে' উপস্থিত ছিলাম । তাঁহার 'চেহরাঃ মবারক' দর্শনে বোধ হইতেছিল, তাঁহার প্রতি 'ওহী' (প্রত্যাদেশ) নাযেল হইতেছে । যখন ওহী

* আনছ-বিন্-মালেক-বিন্-নজর (রাজিঃ) । ইহার কুনিয়ত (উপাধী বিশেষ) আবু হামযাঃ জররজি । ইনি আ হজরত (ছালঃ)-এর 'খাছ' (বিশেষ) 'খাদেম'—(সেবক) ছিলেন । ইহার মাতার নাম-ওম্মে ছলিম-বিন্তে-ছলমান ছিল । যখন হজুর (ছালঃ) হেজরত করিয়া মদীনা প্রস্থান করেন, তখন ইহার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র ছিল । হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে ইনি মদীনা পরিত্যাগ পূর্বক নূতন উপনিবেশিক নগরী বসায় চলিয়া যান । আর ঐ বসায় নগরেই ২১ হিজরীতে, ১০৩ বৎসর বয়সে এতৎকাল করেন । তাঁহার কতিপয় পুত্র ও কন্যা ছিল ।

পাক পাঞ্জতন (৬২০) কাতেমাঃ যোহরাঃ ।

অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি ফরমাইলেন, হে আনছ! আমাকে আল্লাহ তা-লা আদেশ দিয়াছেন যে, কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নেকাহ্ (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন করি। অতঃপর তিনি মহজেদ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হুহিতা-রত্ন হজরত কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আলী তোমার বিবাহ-প্রার্থী। ছৈয়দত-য়েছা (রাঃ—আঃ) পিতার উক্তি শ্রবণে অতি লজ্জিত ভাবাপন্ন ও 'খামুশ' (নীরব) হইয়া রহিলেন। তদনন্তর আঃ হজরত (ছালঃ) মহজেদে গমন করিলেন। আলেমদিগের নিকট বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকার বিবাহ প্রস্তাবে বা বিবাহ কালে নীরব থাকাই সন্মতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

যখন ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ মহজেদ নববীতে—আঃ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন হজুর সিংহরে গিয়া উপবেশন করিলেন; এবং ফরমাইলেন, হে মহাজেরিন ও আন্ছারগণ! এখনই হজরত জিব্-রাইল, আল্লাহ্, জল্লশানহুর আদেশ-বাণী লইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন; আল্লাহ তা-লা 'মালায়েক' (ফেরেশতাঃ) দিগকে 'বয়তুল মায়ূরে' সমবেত করিয়া স্বীয় 'কনিব্' (দাসী) কাতেমাঃ-বিন্তে মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর বিবাহ স্বীয় 'গোলামে খাছ' (বিশেষ দাস) আলী (কঃ—ওঃ) বিন্-আবি তালেবের সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছেন। আর আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, 'আক্কে নেকাহ তজ্জদিদ' করিয়া, বিশ্বস্ত সাক্ষীদিগের 'ক্বব্ব' (সম্মুখে) ইজাব ও কবুল করাইয়া দি। অতঃপর তিনি বিবাহের খোত্বাঃ পাঠ এবং শুভ-বিবাহ কার্য্য-সম্পন্ন করিলেন। ২য় হিজরীর মোহররম মাসে—২১শে তারিখে এই পবিত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

যে সময় আঃ হজরত (ছালঃ) বিবাহের খোত্বা পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, ঐ সময় হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন

না ; কোনও প্রয়োজন বশতঃ বাজারে গিয়াছিলেন । খোত্বা পড়ার অবস্থায়ই তিনি সেখানে আসিয়া পহুছিলেন । তখন আ হজরত (ছালঃ) তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ফরমাইলেন, আমি ৪০০ চারিশত মেছকাল * মোহরের 'রেওজে' (পরিবর্তে) কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে তোমার নেকাহতে দিলাম ; তুমি ইহাতে সন্তুষ্ট আছ ? শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, 'বহরও চশ'—অর্থাৎ তিনি আনন্দের সহিত সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিলেন । তখন হজুর (ছালঃ) এই বলিয়া 'দোওয়া' (প্রার্থনা) ফরমাইলেন :—খোদা তোমাদের উভয়ের 'পেরেশানী' দূর করুন ; আশা ও আকাঙ্ক্ষা সাফল্য মণ্ডিত করুন, তোমাদের প্রতি 'বরকত' (সচ্ছলতা) অবতীর্ণ হউক, আর তোমাদের পক্ষ হইতে 'পাক আওলাদ' (পবিত্র সন্তান) জন্মগ্রহণ করুক ।

উপরের বর্ণনানুসারে দেখা যায়, এই নেকাহ (বিবাহ) আল্লাহ

* তদানীন্তন চারিশত মেছকাল এদেশে প্রচলিত বর্তমান মুদ্রার ১৬০০ হর ; শিয়াদিগের মতে ৫০০ পাঁচ শত দরহম (দেরম) মোহর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল । দরহমের ওজন ৩০ মাশা । ১২ মাশায় এক তোলা হইয়া থাকে । এই হিসাবে ১৭৪০ মাশা বা ১৪৫ তোলার কিছু উপর হয় ; আর মেছকালের ওজন ৪০০ মাশা । এই হিসাবে উহা ১৫০ তোলা হইয়া থাকে । সুতরাং উভয় সংখ্যার মধ্যে বেশী তারিতম্য নাই । রোপ্য মুদ্রার হিসাব খরিলে বর্তমান প্রচলিত মুদ্রার ১৬০০ বা ১৫০০ টাকা মোহর ধার্য্য হইয়াছিল । আর আজকাল এদেশে দু পাঁচ দশ হাজার বা বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ হাজার—অথবা লক্ষ বা লক্ষাধিক টাকার দেন মোহর ধার্য্য হইয়া থাকে । এবিষয়ে মোছলমানদিগের বাড়াবাড়ি চরমে উঠিয়াছে ।

তা-লার আদেশে 'আছমানে' (আকাশে—স্বর্গে) সম্পন্ন হইয়াছিল । তৎপর হজরত রুহোল-আমিন (জেব্রাইল ফেরেশতা), আ হজরত (ছালঃ)-কে আল্লাহর অভিমত ও আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । সেই আদেশানুযায়ী তিনি ছনিয়াতে, যথা-নিয়মে, এই শুভ-বিবাহ কাব্য সম্পন্ন করেন । তৎপর হজরত রুহুলে খোদা (ছালঃ) একমুষ্টি দরহম লইয়া হজরত আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ)-কে প্রদান পূর্বক এরশাদ ফরমাইলেন যে, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'জেহেব্' (কন্যা বিদায়ের দ্রব্য-সামগ্রী) ক্রয় করিয়া আন । তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, উহাতে ৩৬০টি দরহম ছিল । হজুর (ছালঃ), ছলমান ফারছী (রাজিঃ) ও

■ ছলমান ফারছী (রাজিঃ)-এর কুনিয়েত্ আবু-আবদুল্লাহ্ । ইনি আ হজরত (ছালঃ)-এর 'আযাদ করদাঃ' (মুক্তি দেওয়া—মুক্ত) 'গোলাম' (ক্রীত দাস) ছিলেন । ক্রীত দাস থাকা সম্বন্ধে মতভেদ আছে । ইনি পারস্য দেশের অধিবাসী এবং বামহরময্ সম্প্রদায় ভুক্ত অধ্যাপক ছিলেন । ইনি সত্যধর্মের অন্বেষণে গৃহ হইতে বাহির হন ; এবং প্রথমে খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ইচ্ছায়ী ধর্ম অবলম্বন করেন । পরে একজন 'য়েরাবী' (বদ্ধু) ইহাকে ধরিয়া এক যিহুদীর নিকট বিক্রয় করে । তিনি তাহাকে 'মকাতেবাঃ' করিলেন ; অর্থাৎ যিহুদীর ক্রীত মূল্য তাহাকে আদায় করিয়া দিলেন ; এই 'অর্থসংগ্রহ' কার্যে আ হজরত (ছালঃ) তাহাকে বিশেষ সাহায্য করেন । যখন হজুর (ছালঃ) হেজরত করিয়া মদীনায়া আসিলেন, তাহার কিয়ৎকাল পরে ছলমান ফারছী (রাজিঃ) পবিত্র এছলাম ধর্মে-দীক্ষিত হইলেন । আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ছলমান ফারছী (রাজিঃ) 'আহ্লে বয়েত' অর্থাৎ হজুর [ছালঃ]-এর পরিবার বর্গের অন্তর্ভুক্ত । তিনি নিজের উপার্জিত অর্থ বাতীত অন্ত

বেলাল ■ (রাজিঃ)কেও তাঁহার সঙ্গে দিলেন । পরে এক পাত্র খোরমা আনাইয়া উপস্থিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগকে বলিলেন, তোমরা ইহা লুটিয়া লও । তদনুসারে তাঁহারা হাতে হাতে তাহা লুটিয়া লইলেন । নিম্ন-লিখিত জেহেয্ হজরত খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল । (১) মিসর দেশীয় বস্ত্র-নির্মিত একখানি বিছানার কাপড়

কোনও রূপ অর্থ দ্বারা আহার করিতেন না । ইনি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন । কাহারও কাহারও মতে ইহার বয়ঃক্রম ৩৫০ বৎসর হইয়াছিল । ৩৫ হিজরীতে মদায়েনে (পারস্ত সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানীতে) ইহার মৃত্যু হইয়াছিল । এক রওয়ায়েত মতে হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর খেলাফত কালে বয়তুল মকদ্দছে শহীদ হইয়াছিলেন । কিন্তু প্রথমোক্ত বিবরণই বিশেষ ভাবে প্রামাণ্য ।

■ + বেলাল-বিন্-য়েয়াহ্ হাবশী, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর আযাদ করা (মুক্ত) ক্রীতদাস ছিলেন । ইনি প্রাথমিক গোছলমান-দিগের মধ্যে একজন । বদর এবং তৎপরবর্তী সমুদয় জেহাদেই তিনি ‘শরীক’ ছিলেন । শেষ সময়ে ‘শামে চলিয়া যান ; এবং ২০ হিজরীতে দেমেশ্কে এন্তেকাল করেন । উক্ত নগরের বাবুল আরবায়ীনে তাঁহার কবর আছে । ইহার কোনও সম্মান-সম্মতি ছিল না । যখন ইনি পবিত্র ‘এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন ওম্মিয়া-বিন্ খলফ্ ইহার প্রতি ভীষণ উৎপীড়ন করিয়াছিল । অবশেষে সে বদরের যুদ্ধে হজরত বেলাল (রাজিঃ)-এর হস্তেই নিহত হয় । অন্য রওয়ায়েতে দৃষ্ট হয়, ছফিন যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন ; এবং প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) ঐ যুদ্ধে শহীদ হইলে, হজরত বেলাল (রাজিঃ) তাঁহাকে গোছল দেওয়াইয়া ছিলেন ।

পাক পাঞ্জতন (৬২৪) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

(তোষক)—যাহার ভিতর 'উন' (পশুতোষ বা পশম) ছিল ;
 (২) একখানি চামড়ার বিছানা ; (৩) ২টি 'তকিয়া' (বালিস—
 উপাধান)—উহার একটির ভিতর পশম ও একটির ভিতর ধোরমার ছাল
 ছিল ; (৪) একখানি রেশমী চাদর ; (৫) পানী পান করিবার জন্য
 ২টি মৃত্তিকা নিৰ্ম্মিত গ্লাস ; (৬) দুইখানি চাদর ; (৭) চান্দির ২ গাছি বাজু-
 বন্দ ; (৮) একখানি বৃহৎ কৃত্তিকাঃ নামক চাদর ; (৯) একটি চাক্কি (আটা
 পিষিবার জাত) ; (১০) একটি মশক (পানী আনয়নের চর্যাধার) ;
 (১১) একটি পেয়াল্লা ; (১২) একখানি পালং (চারপায়ী বা খাটিয়া) ;
 (১৩) একখানি 'জা-নমায্' (নমাজ পড়িবার বিছানা বা আসন) ।

যখন এই সকল জেহেবের 'ছামান' (সামগ্রী-সম্ভার) আ হজরত
 (ছালঃ)-এর হজুরে আনীত হইল ; তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক
 অশ্রুপূর্ণ লোচনে ফরমাইলেন, হে আল্লাহ ! এই সকল জিনিষে তুমি
 'খয়রকত' দান কর । এই সকল জিনিষ ক্রয় করিয়া যে মুদ্রা অবশিষ্ট
 থাকিল, উহা রছুলে খোদা (ছালঃ), ওম্মোল মুমেনিন হজরত ওম্মে
 ছালমাঃ (রাঃ—আঃ) এর হস্তে, অন্য রওয়াতোহুসারে আনিছ (রাভিঃ)-
 এর ওয়ালেদার হস্তে (তফরিহল আয্ কিয়া ৩৬৮ পৃঃ) অর্পণ করিলেন ;
 এবং ফরমাইলেন, ইহা ধারা 'বানানাঃ' (স্বীলোক)-দিগের প্রয়োজনীয়
 জিনিষ (যথাঃ—আতর, সুগন্ধি তেল, আয়না, চিক্নী, ছোরমা প্রভৃতি)
 আনাইয়া লও । এই শুভ-বিবাহ কার্য যখন সম্পন্ন হইয়া ছিল, তখন
 হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর ৩৩ স্বর্গ-রাজ্যী
 হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বয়স ১৫ বৎসর ৫ মাস
 ছিল (আল্লামা এবনে হজর আক্বোলানী) ।

বিবাহ উপলক্ষে শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) না অখারোহণ
 করিয়াছিলেন ; না হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পালকিতে

চড়িয়াছিলেন, না গান বাজা ■ কোন আড়ম্বর হইয়াছিল, না রং ছোড়া-
ছোড়ি বা পিচ্কারীর সদ্যবহার হইয়াছিল ; না লোকের মধ্যে মল্ল-
বন্দ, নর্তন-কুর্দন হইয়াছিল ; বরং অতি সহজ ভাবে শুভ-কার্য সম্পন্ন
হইয়াছিল । “ রওজাতল-আছফিয়া ” গ্রন্থে ‘দাওতে ওলিমাঃ’ (বরপক্ষ
হইতে বিবাহের পর যে খানা দেওয়া হয়)-এর জন্য আ হজরত (ছালঃ),
হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে খোরমা ও ‘মওয়েব্’ (একপ্রকার
বৃহজ্জাতীর সাধারণ শ্রেণীর আঙ্গুর) প্রদান করিলেন । হজরত আলী
(কঃ—ওঃ) উহার উপর জও এর দলিয়া ‘এজাফা’ (বৃদ্ধি) করিয়া
দিলেন । ঐ জও এর দলিয়া ও দৈ—সমবেত মেহমানদিগের সম্মুখে রাখিয়া
দেওয়া হইল ; উহাই সকলে আনন্দের সহিত—ভৃগু সহকারে ভক্ষণ
করিলেন । এই বিবাহের দ্বারা হজর (ছালঃ) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অতি
অল্প খরচে—মামুলী রকমে এই পবিত্র বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা চাই ; কিন্তু
আজকাল এই বিবাহ-অনুষ্ঠান মোছলমানদিগের একটা মহা সর্বনাশের
কারণ হইয়াছে । অপব্যয়ের পরিমাণ সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া
গিয়াছে ; গীত-বাজ, মহা আড়ম্বরের খানা, বিরাট মিছিল, বাইজী ও
থেম্টাওয়ালীর নাচ ও গান, পার্টি, মেরাছিনের অল্লীল সঙ্গীত ■ কুৎসিৎ
অঙ্গ-ভঙ্গি, ইত্যাদি—পবিত্র বিবাহ উৎসবে কত কি হইয়া থাকে । এই
বিবাহের আড়ম্বর ■ মোছলমানগণ ■ বাড়ী বন্ধক দিয়া টাকা কল্lect
করে, এবং সেই দেনার বিষয়-সম্পত্তি, ঘর বাড়ী, হালের গরু, ভূমির
গাই প্রভৃতি সুদখোর মহাজনের হস্তগত হয় ; কিংবা আদালত কর্তৃক
প্রকাশভাবে নীলামে বিক্রয় হইয়া যায় ।

এই বিবাহের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে ;
কাহারও মতে ২য় হিজরীর মোহররম মাস, কাহারও মতে ২য় হিজরীর
ছফর মাস । এক রওয়ানেত অনুসারে জঙ্ক-ওহদের (আহদ যুদ্ধের) পরে,

হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ)-এর 'রোখ্ ছতির' (পিতৃ-গৃহ হইতে) হজরত [ছালঃ]-এর গৃহে আগমন করিবার) সাড়ে চারি মাস পরে এই পবিত্র বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল । (তবকাত্বে এবনে ছায়াদ, বাবুয়েছা) । শুভ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় কস্তা-রত্ন হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট আগমন করিলেন ; দেখিলেন, তিনি নামুলী (সাধারণ) কাপড় পরিধান করিয়া আছেন ; উদাস ভাবে, হায়া ও শরনে মস্তকাবনত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন । তাঁহাকে চূপ-চাপ ও 'পেরেশান' অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হজুর (ছালঃ) খেয়াল করমাইলেন, সম্ভবতঃ আলী (কঃ—ওঃ)-এর এফ লাছের (দৈন্ত—দরিদ্রতার) খেয়ালেই উহার এই অবস্থা । তখন আঁ হজরত (ছালঃ) কস্তা-রত্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ অরিয়া পেয়ারী বতুল (রাঃ—আঃ) ! তুমি 'মলুল' (দুঃখিত) হইও না ; আহ্লে বয়েতের মধ্যে আলী (কঃ—ওঃ) অপেক্ষা 'বেহ্তর' (উত্তম—শ্রেষ্ঠ) কেহ ছিল না—বাহাকে তোমার স্বামীত্বে বরণ করিতে পারিতাম । যদিও আলী (কঃ—ওঃ) 'তঙ্গ্দন্ত' (গরীব—দরিদ্র), তাহাতে কোনও 'পরওয়া' নাই ; এই পার্থিব দরিদ্রতা কয়েক দিনের জন্য মাত্র ; পরকালের সচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখ । পরকালের 'খাজানাঃ' (ঐশ্বর্য রাশি) তোমার স্থায়ী সম্পদ । পেরেশান হইবার কোনই কারণ নাই । এই অস্থায়ী পৃথিবীতে 'ফকর' (আদেশ—নৈরাশ্র) ও দরিদ্রতার দুর্ভাবনা করাই 'ফজুল' (বৃথা) । ” আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই পবিত্র উপদেশ—পবিত্র বাণী, বিশেষ রূপ ফলপ্রদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । জনাব ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-কে “ রব্বল য়েষ্ষত ” (আল্লাহ জল্ল-শানহ) ছবর ও শোকর এর 'তওফিক' প্রদান করিলেন ; তিনি ধৈর্য-সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন । নিশ্চয়ই ঐ সকল 'পাকরুহ্'

(পবিত্র আত্মা)-এর জন্ম পরকালের সম্পদ রাশি নির্ভারিত আছে—
তাহারাই উহার অধিকারী—যাহারা এই অস্থায়ী দুনিয়ায় ‘ছবর’ এবং
ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকেন ; নিঃস্বলতা ■ দরিদ্রতা
সম্বন্ধে কোনও ‘শেকায়েত’ করেন না ; অক্ষুণ্ণ চিত্তে, অম্লান বদনে
উহার (দরিদ্রতার) ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন ।

এই শুভ-বিবাহের পর ৬৭ মাস গত হইয়া গিয়াছে ; এই সময় মধ্যে
আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘এরশাদ’ (আদেশ) অনুযায়ী হজরত আলী
(কঃ—ওঃ), হারছাঃ-বিন্-নওয়ানের একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়ার গ্রহণ
করিয়াছিলেন । কিন্তু শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) লজ্জা বশতঃ স্বীয়
আহলিয়ার (স্ত্রীর) বিদায় সম্বন্ধে একটি কথাও এযাবৎ আ হজরত
(ছালঃ)-কে বলিয়াছিলেন না । বরঞ্চ যখন আ হজরত (ছালঃ)-
এর সঙ্গে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কখনও নির্জনে সাক্ষাৎ হইত,
তখন হজুর (ছালঃ) ফরমাইতেন, “ হে আলি ! তোমার পক্ষে তোমার
বিবী মবারক হউক, সে বড় ভাল মেয়ে । ” অতঃপর একদিন হজরত
আলী (কঃ—ওঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত আকিল (রাজিঃ), আ হজরত
(ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ‘আরজু’ করিলেন, আমি ইচ্ছা
করি, বো এর ‘রোখ্-ছত’ (বিদায়) কার্য ও সম্পন্ন হইয়া যায় । কোনও
কোনও ঐতিহাসিক এতদ্ সম্বন্ধে অন্তরূপ লিখিয়াছেন, সেই বর্ণনা
এই :—একদিন হজরত আকিল (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-
এর নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন, আমাদের এই ‘আরজু’
(প্রাণের আগ্রহ) বে, আ হজরত (ছালঃ) এই সময় স্বীয় ‘লখ্-ত্-
জগর’ (কলেজার টুকরা)-কে ‘রোখ্-ছত’ (বিদায়) দেন ; প্রত্যুত্তরে
হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমিও ইহাই চাই ; কিন্তু হজুর
আকরম (ছালঃ)-এর নিকট আরজু করিতে আমার সাহস হয় না । হজরত

আকিল (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্ত ধারণ পূর্বক
 আঃ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন ; তৎপূর্বে হজুর
 ছালঃ)-এর পরিচারিকা ওম্ম-এমিন (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে তাঁহাদের
 সাক্ষাৎ হইল ; হজরত আকিল (রাজিঃ) তাঁহার নিকট স্বীয় মনোভাব
 জ্ঞাপন করাতে তিনি বলিলেন, প্রথমে ‘আবু ওরাজে মত হরাত’ (আঃ
 হজরতের সহধর্মিণী অর্থাৎ মোছলেম-মাতা) গণের সঙ্গে পরামর্শ করা
 উচিত ; এসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ; কারণ
 এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকদিগের ‘খেয়াল’ পুরুষদিগের অপেক্ষা
 ‘পছন্দীদাঃ’ (মনঃপুত) হইরা থাকে । তৎপর আঃ হজরত (ছালঃ)-এর
 খেদমতে যথানিয়মে ‘আরজ’ (প্রার্থনা) করিবেন । এই পরামর্শ স্থির
 হওয়াতে তাঁহারা মোছলেম-মাতা হজরত ওম্মে-ছলমাঃ (রাজিঃ)-এর
 গৃহে আসিয়া প্রথমে তাঁহার নিকট কথা উত্থাপন করিলেন, পরে
 আর আর মোছলেম-মাতার মত গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া
 হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইলেন ;
 ঐ সময় সেই গৃহেই আঃ হজরত (ছালঃ) অবস্থান করিতেছিলেন । হজরত
 আকিল (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বাহিরে থাকিলেন ।
 আঃ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে মোছলেম-মাতাদিগের অন্যান্য কথার
 আলোচনা হইতে লাগিল । কথা-প্রসঙ্গে হজরত ওম্মে-ছলমাঃ (রাঃ—
 আঃ), হজরত খদিজাতুল কোব্রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন
 করিলেন ; সাংসারিক কাজ কর্মে তাঁহার দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে
 অত্যুৎকৃষ্ট আলোচনা করিলেন ; আর বলিলেন, তাঁহার সম্মুখে যদি
 কাতেমার ‘শাদী’ (বিবাহ) হইত, তবে তিনি আজ কতই না আনন্দ প্রকাশ
 করিতেন ; আমাদিগকে কোনও বিষয়ের জন্য কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না ।
 আমরা হাসি-খুশির সঙ্গে মহা উৎসাহ ও উল্লাস সহকারে এই শুভকার্যে

যোগদান করিতাম । এক্ষণে আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার বিবীর রোখ্‌ছতের জন্ত প্রার্থী ; আর আমরা সকলেই ‘রোখ্‌ছত’ (বিদায়) করিতে প্রস্তুত ; এবং সেকার্য্যে সহানুভূতি সম্পন্ন ; এক্ষণে এ বিষয়ে আর কিসের জন্ত বিলম্ব হইতে পারে ? হজরত খদিজাতুল কোব্‌রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নাম শ্রবণে হজুর (ছালঃ)-এর নেত্রযুগলে অশ্রু বিন্দু দেখা দিল ; তিনি শোক-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ফরমাইলেন “ খদিজা (রাঃ—আঃ)-এর উপমা কোথায় ? তিনি আমার ‘তছদিক্’ (সত্যতার সাক্ষ্য) ঐ সময় দিয়াছিলেন—যখন মক্কার সকল লোক আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিতেছিল । তিনি স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি আমার জন্ত খোদার পথে—আল্লাহর নামে উৎসর্গ এবং তদ্বারা এছলামের পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন । ” ওম্মে ছলমাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, “ এয়া হবিবে খোদা (হে আল্লাহ তা-লার বন্ধু) ? আপনি বাহা ফরমাইলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ; খোদা তোলা তাঁহার সঙ্গে আমাদেরকে ‘জন্নতে’ (মোছলেম-ধর্মে) সম্মিলিত করাইবেন, ইহাই আমাদের সম্পূর্ণ আশা ও ঐকান্তিক কামনা । এক্ষণে আপনার ভাতা—পিতৃব্যপুত্র এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে, আপনি তাঁহার স্ত্রীকে ‘রোখ্‌ছত’ (বিদায়) করিয়া দেন । ” আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, “ অয়ি ওম্মে ছলমাঃ ! আলী ও এবাবৎ আমাকে একথা বলে নাই । ” হজরত ওম্মে ছলমাঃ (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, “ এয়া রছুলোল্লাহ্ ! আলী নিতান্ত লজ্জাশীল এবং ‘মওদ্ব’ (আদবদার) যুবক, এজন্ত হজুরের সম্মুখে স্বীয় বাসনা প্রকাশ করিতে পারেন নাই । ” তখন হজুর ফরমাইলেন, আচ্ছা যাও, আলীকে ডাকিয়া আন । তদনুসারে তিনি আহূত হইরা গৃহে প্রবেশ করিলেন । ঐ সময় ওম্মোল মুমেনিনগণ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন । হজুর (ছালঃ) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলি ! তুমি কি চাও ? তুমি কি

ইহাই চাও যে, আমি তোমার বিবীকে বিদায় করিয়া দি ? হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মস্তক অবনত করিয়া অতি আদবের সহিত বলিলেন, এয়া বহুলোল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা হজুরের নামে কোরবান্ হউন, আমার ত ইহাই আরম্ভ । তচ্ছ-বশে আ হজরত (ছালঃ) কয়েকটি 'দহরম' (মূদ্রা) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে প্রদান করিলেন ; এবং ফরমাইলেন, কতক 'ছোহারে' (খোরমা) ও কতক পনির প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আন । তদনুসারে তিনি বাজারাতিমুখে প্রস্থান করিলেন । এদিকে আ হজরত (ছালঃ), ছৈয়দাঃ ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বিদায়ের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন,—আমি ৫ দরহমের স্বত, ■ দরহমের খোরমা ও এক দরহমের পনির আনিয়া হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম । হজুর (ছালঃ) দস্তরখান চাহিলেন, ওমৎকর্তৃক আনীত ঐ সকল জিনিষ কুটির সঙ্গে দলিয়া মখিয়া স্বহস্তে মলিদা তৈয়ার করিলেন, এবং দস্তরখান স্থাপন করিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি বাহিরে যাও, আর যে যে মোছলমানকে দেখিতে পাও, ডাকিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আইস । আমি মহাজের ও আন্ছারদিগের মধ্যে ঝাঁহাকে ঝাঁহাকে পাইলাম, ডাকিয়া লইয়া আসিলাম । তাঁহারা সেই পবিত্র গৃহে প্রবেশ পূর্বক মলিদা ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেলেন । অতঃপর আ হজরত (ছালঃ) একটি মাটির পেয়ালা চাহিলেন ; উহা আনীত হইলে, তিনি ঐ পেয়ালাটি মলিদা দ্বারা পূর্ণ করিলেন, এবং ফরমাইলেন, ইহা ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ও তাহার স্বামীর ■ রাখা হইল । তৎপর উহা আবু ওয়াজ মোত্ হারাত (মোছলেম-মাতা) দিগের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিলেন । অতঃপর মোছলেম-মাতা হজরত ওশ্বে-ছলমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, যাও, ফাতেমাঃ কে এখানে আনয়ন কর । তিনি উঠিয়া গিয়া ছৈয়দতন্নেছা

(রাঃ—আঃ)-কে সেখানে আনয়ন করিলেন । সে সময় ছৈয়দার চেহারা মবারক (বদন মণ্ডল) হইতে ‘পছিনা’ (স্বর্ণ) প্রবাহিত হইতে ছিল ; এবং তিনি অতি কষ্টে সম্মুখের দিকে পা-বাড়াইতে ছিলেন । যখন তিনি পিতৃ-সম্মিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন আ হজরত (ছালঃ) তাঁহার মুখস্থিত ‘রওয়া’—যাহা বোরকার স্থান অধিকার করিয়া ছিল—উত্তোলন করিলেন ; এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলের বামদিকে থাতুনে জয়ন্তের পবিত্র মস্তক রাখিয়া ‘পেশানীর দরমিয়ানে’ (কপালের মধ্যস্থলে) মেহ-ভরে ‘বোছা’ দিলেন (চুম্বন করিলেন) । আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তে তাঁহার হস্ত প্রদান পূর্বক ফরমাইলেন, হে আলি ! পরগম্বর-দুহিতা তোমার জন্য ‘মবারক’ (মঙ্গলজনক) হউক । দুহিতা-রত্নকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অয়ি কাতেমাঃ ! তোমার ‘খাওন্’ (স্বামী) খুব ভাল লোক । এক্ষণে তোমরা ‘মিঞা-বিবী’ (স্বামী-স্ত্রী) স্বগৃহে গমন কর । দেওয়া-খোওয়ার জন্য খোদার পরগম্বরের নিকট কি আছে না আছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই । হাঁ ! অবশ্য ওয়াজ-নছিহতের (উপদেশ দানের) অতুলনীয় উত্তরাধিকারিণী আমার ‘জগর গোশাঃ’ (কলেজার টুকরা)-কে করিয়াছি । আর ইহা এমনই ‘নেয়ামত’ (অতুলনীয় সম্পদ) ছিল যে, দুনিয়ার সমুদয় মূল্যবান্ ধন-রত্নও উহার তুলনার অতি তুচ্ছ । হজুর (ছালঃ), হজরত কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে, তাঁহার প্রতি স্বামীর কি কি হক্ (অধিকার) আছে, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন ; আর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কি হক্ আছে, তাহা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কেও বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন । হজুর (ছালঃ) দীন ও ঈমানের অতুলনীয় সম্পদ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীকে ‘মালামাল’ (সম্পদ-সম্পন্ন) করিলেন, তৎপর গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উভয়কে বিদায় করিতে আগমন করিলেন । অবশ্য ইতিমধ্যে স্বর্গ-রাজ্ঞী বিমাতা দিগকে ছালাম করিয়া বিদায় গ্রহণ

করিয়াছিলেন । হজুর (ছালঃ) গৃহের দ্বারদেশে পঁহছিয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর, দুই বায়ু (বাহ) ধারণ পূর্বক বরকতের দোওয়া করাইলেন । ওদিকে উষ্ট্র সজ্জিত ছিল, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং ছৈয়দাঃ তত্পরি আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । এই উষ্ট্রের লাগাম (নাসিকা-রজ্জু) হজরত ছলমান ফারছী (রাজিঃ) ধরিয়া চলিলেন । আছমাঃ-বিস্তে ওমিছ ■ (রাঃ—আঃ) (এবং অধিকাংশ রাবির মতে ছলমি [রাঃ—আঃ] +) ঐ সময় হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে

* আছমাঃ-বিস্তে ওমিছ (রাঃ—আঃ), ইনি হজরত জাফর-বিন্-আবি তালেব (রাজিঃ)-এর বিবী ছিলেন ; ইনি স্বামীর সঙ্গে হাবশা- (আবিশিনিয়া) রাজ্যে হেজরত করিয়া গমন করিয়াছিলেন ; সেই স্থানেই ইহার গর্ভে আবতলা (রাজিঃ) ও আওন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন । মৃত্যুকে হজরত জাফর (রাজিঃ) শহীদ হইলে, ১ম খলিফা আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ইহাকে বিবাহ করেন । তাঁহার পরলোক গমনের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ইহাকে নেকাহ করেন । তাঁহার গর্ভে শেরে খোদার ওরসে ইয়াহু ইয়া নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । খাতুনে জন্মের বিবাহ ও বিদায় কালে আছমাঃ-বিস্তে ওমিছ [রাঃ—আঃ] মদীনায়া উপস্থিত ছিলেন না ; আবিশিনিয়ায় ছিলেন ; সুতরাং ছলমি (রাঃ—আঃ)ই হজরত খাতুনে জন্মত (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে গিয়াছিলেন ।

+ ছলমি ওয়ে রাফেয় (রাঃ—আঃ), আবি রাফেয় (রাজিঃ)-এর সহধর্মিণী ও ছাহাবিয়া ছিলেন । ইহার নিকট হইতে ইহার প্রভু আবতলা বিন্-আলী রওয়ান্নেত করিয়াছিলেন যে, আ হজরত (ছালঃ)-এর পুত্র এবাহিমের জন্মগ্রহণ কালে ইনি তাঁহার খাতীর কার্য করিয়াছিলেন । স্বর্গ-রাজী হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যুর পর আছমা-বিস্তে ওমিছ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে একত্র হইয়া ইনি তাঁহার মৃত্যু-স্নান দেওয়াইয়াছিলেন ।

আরজ করিলেন, এয়া রহুলোমাহ্ ! ‘লাড্‌কি’ (কন্না—মেরে)-দিগকে প্রথমে স্বামী-গৃহে গিয়া সময় অসময়ের জন্য কোনও স্ত্রীলোকের আবশ্যক হয়, একজন্ম আমি ছাহেব যাদীর সঙ্গে যাইতেছি । হজরত ছারওয়ারে কায়েনাৎ (ছালঃ) এই কথা শ্রবণে খুব আনন্দ লাভ করিলেন ; এবং উহার জন্য “ দোওয়া-খারের ” করিলেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়ের দ্বিতীয় দিন ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) আমার গৃহে আগমন করিলেন । আমিও ফাতেমাঃ তকিয়া জাগাইরা (বালিশ হেলান দিয়া) বসিয়াছিলাম, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আওয়ায শুনিয়া ইচ্ছা করিলাম যে, আমি উঠিয়া যাই ; কিন্তু তিনি আদেশ করিলেন, তোমরা যে অবস্থায় আছ, ঐ অবস্থায়ই বসিয়া থাক ; তৎপরে তিনি আসিয়া আমাদের শিয়রের দিকে বসিয়া গেলেন । আর স্বীয় পবিত্র পা দুখানি আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন । আমি তাঁহার দক্ষিণ পদ এবং ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বামপদ স্ব স্ব বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলাম । তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বাক্যলাপ করিতে লাগিলেন । ইহার পর ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, একটু পানী আনয়ন কর । তদনুসারে তিনি একটি মাটির পেয়ালায় করিয়া খানিকটা পানী আনিলেন । হজরত (ছালঃ) সেই পানীর কিয়দংশ ফেলিয়া দিলেন ; অবশিষ্ট পানী সহ পেয়ালার হাতে লইয়া কিছু দোওয়া পড়িলেন ; এবং ফরমাইলেন, হে আলি ! তুমি এই পানী পান কর ; এবং উহার কিয়দংশ রাখিয়া দাও । আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে আমি কিয়দংশ পানী পান করিলাম, অবশিষ্টাংশ রাখিয়া দিলাম । যে টুকু পানী অবশিষ্ট ছিল, তিনি উহা আমার বক্ষঃ-স্থলে ও মুখে ছিটাইয়া দিলেন, আর আমার মঙ্গলের জন্য দোওয়া ফরমাইলেন ।

ইহার পর আবার পানী আনাইলেন, এবং ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে,

পানী দম করিয়া কিয়দংশ ঐরূপে পান করাইলেন ও অবশিষ্ট পানী তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন, এবং অবশেষে দোওয়া করাইলেন । নাছেক-ভাওয়ারিথকার লিখিয়াছেন, ঐ সময় ছলমি অর্থাৎ ওম্মে রাফেয়কে লক্ষ্য করিয়া জনাব হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) করাইলেন, অয়ি ওম্মে রাফেয় ! তুমি এক্ষণে এখানে আর কিজন্ত রহিয়াছ ? উত্তরে তিনি বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) । যে সময় ওম্মোল মুমেনিন হজরত খদিজাতুল কোব রাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের আর কোনও আশা ছিল না, আমি সেই সময় তাঁহার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম । আমি দেখিতে পাইলাম, তিনি রোদন করিতেছেন । আমি ‘তায়াজ্জব’ (আশ্চর্য্যাবৃত) হইলাম, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অয়ি ওম্মোল মুমেনিন ! আপনি এসময় কেন রোদন করিতেছেন ? আপনি পরগম্বর অপেরখমান (ছালঃ)-এর বিবী, আর এমন বিবী—যাঁহার প্রদত্ত উপকার কাশির বিষয় হজরত (ছালঃ) স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ অনস্থায় এই আসন্ন কালে আপনার হৃদয়ে বেদনানুভূত হইবার কারণ কি ? আপনি কেন অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন ? উত্তরে তিনি করাইলেন, অয়ি ওম্মে রাফেয় ! ছল্হীন (নব-বধূ)-দিগকে স্বামী-গৃহে বাসিতে, প্রথমে কোনও হিতৈষিনী বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকা আবশ্যক—যে নারী সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও কার্যে তাহার সহায়তা করিতে পারে । আমার ফাতেমাঃ ‘বাচ্চাঃ’ (অতি অল্প বয়স্কা বালিকা), কি জানি, স্বামী-গৃহে বিদায় কালে যদি তাহার সঙ্গে কোনও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক না পাওয়া যায় ? ঐ কথা মনে করিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি । আমি আরজ করিলাম, অয়ি ওম্মোল মুমেনিন ! যদি আমি ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমি ও খেদমত আদায় করিবার জন্য প্রতি-শ্রুতিদান করিতেছি । খোদার দরগাহ হাজার শোকর, ফাতেমার

পাক পাঞ্জতন (৬৩৫) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

জননীৰ নিকট আমি যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম, আজ এই দিনে
আমার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল। এই উক্তি শ্রবণে হজরত বহুল
করিম (ছালঃ) ওশে-বাকের এর জন্ত দোওয়া (খোদার দরগার মঙ্গল
কামনা) করিলেন। ইহার পর আ হজরত (ছালঃ) এরশাদ করমাই-
লেন, গৃহের সমস্ত কার্য, যথা :—কুটি পাক করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া,
চাকিতে আটা পেয়া ইত্যাদি কার্য ত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) সম্পন্ন
করিবে ; আর বাহিরের কাজ যথা :—বাজার (বাঃ দোকান) হইতে
সওদা-পত্র আনয়ন করা, পানী আনয়ন, উট চরান ইত্যাদি কার্য আলী
(কঃ—ওঃ) ‘আঞ্জাম’ দিবে। বিবাহের ৭ মাস পরে হজরত ফাতেমাঃ
যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বামী-গৃহে বিদায় হইয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত আকিল (রাজিঃ) এই সময় স্বীয় জননীৰ
একত্রে-বাস করিতে ছিলেন। স্বর্গ-রাজী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ
(রাঃ—আঃ) সেই গৃহেই আগমন করিয়াছিলেন। এই গৃহ আ
হজরত (ছালঃ)-এর গৃহ ও মছজেদে নববী হইতে কতকটা দূরবর্তী থাকায়,
তাহার যাতায়াতে কষ্ট হইত ; কারণ, মেহমরী কস্তা-বন্ধকে দেখিবার
জন্য তিনি সর্বদাই সেই গৃহে উপস্থিত হইতেন। একদা তিনি ছৈয়দাঃ
বহুল (রাঃ—আঃ)-কে করমাইলেন, ফাতেমাঃ ! আমি তোমাকে স্বীয়
গৃহের নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করি ; তদ শ্রবণে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ
(রাঃ—আঃ) আনন্দ সহকারে করমাইলেন, আপনার গৃহের নিকট হারছাঃ
(রাজিঃ)-এর অনেক গুলি গৃহ আছে ; যদি আপনি তাহাকে বলেন,
তবে তিনি আমার জন্ত কোনও গৃহ খালি করিয়া দিতে পারেন। হজরত
(ছালঃ) করমাইলেন, হারছা (রাজিঃ) ত আমার এত অধিক
সংখ্যক গৃহ খালি করিয়া দিয়াছে যে, এক্ষণে তাহাকে আর কোনও

গৃহের জন্য অনুরোধ করিতে আমার লজ্জা বোধ হয় । এই সংবাদ হজরত হারছাঃ (রাজিঃ)-এর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি আঁ হজরত (ছালঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এয়া রছুলোলাম্ (ছালঃ) ! আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি হজরত কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে নিজের কাছে রাখিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য আমি তাঁহার জন্য আপনার গৃহের অতি নিকটবর্তী গৃহ খালি খালি করিয়া দিতেছি । * এয়া রছুলোলাম্ ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের শপথ, আমার সমুদয় মাল (ঐশ্বর্য্য) আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের উৎসর্গীকৃত । আমার ঐ মাল—যাহা আপনার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমি অতি প্রিয় ও পবিত্র বলিয়া মনে করি । যাহা হউক, তিনি সেই গৃহ খানি অচিরে খালি করিয়া দিলেন ; আর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) ঐগৃহে আগমন করিলেন । এই গৃহ-পরিবর্তন-ব্যাপারে আঁ হজরত (ছালঃ), কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে সর্বদা দেখিবার সুযোগ লাভ করিলেন ; হজরত কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ও সর্বদা পিতৃ-গৃহে গমন এবং বিমাতাদিগের সঙ্গে মিলিবার মিলিবার সুযোগ পাইলেন । সম্ভবতঃ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জননী স্বীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র হজরত আকিল (রাজিঃ)-এর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন । অবশ্য কনিষ্ঠ পুত্রের গৃহে ও যাতায়াত করিতেন । অন্ততঃ (তৃতীয়) পুত্র হজরত জাফর (রাজিঃ) তখনও আবিশিনিয়ায়ই ছিলেন ।

* মহাজেদ নববীতে যে স্থান এক্ষণে “ বস্তানে কাতেমাঃ ” নামে উত্তরের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ গৃহ খানি ঐস্থানে অবস্থিত ছিল । হজরত কাতেমাঃ যোহরার কবর বলিয়া যে স্থান আঁ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র রওযাঃ মবারকের উত্তর দিকে নির্দেশ করা হয়, এই গৃহ-খানি ঐ স্থানে বিরাজ করিত ।

হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) মহামহিম পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, কিছু দিন কিছু দূরে—স্বামী-গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন ; এক্ষণে পিতার গৃহ-পাশে বাসস্থান নির্দেশ হওয়াতে দূরত্বের অসুবিধা দূর হইয়া গেল । এইবার নিশ্চিন্ত মনে, ঐকান্তিক চিত্তে তিনি স্বামী-সেবার আত্ম-নিয়োগ করিলেন । একদিকে নিয়মিত উপাসনা-আরাধনা, অন্য দিকে সাংসারিক কার্যের সুশৃঙ্খলা বিধান ও স্বহস্তে তৎ সমুদয় সম্পাদন—সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-সেবা, পিতৃ-দর্শন, বিমাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে সম্মিলন ইত্যাদি কার্যেই তাঁহার সারা দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত । অবশিষ্ট ৪।৫ ঘণ্টা সময় মাত্র তাঁহার বিশ্রাম ও নিদ্রায় অতিবাহিত হইত । গভীর নিশীথেও “ তাঁহাজ্জদ ” নামায়ে কাটাইতেন । তিনি একটু সময় ও বিনা কাজে বৃথা অপব্যয় করিতেন না । কি সুখ-শান্তিতেই না তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হইতেছিল । তাঁহার গৃহে অর্থের সচ্ছলতা আদৌ ছিল না ।

আলী (কঃ—ওঃ) যৎসামান্য বাহা কিছু উপার্জন করিতেন, তদ্বারা কোনও মতে কষ্টে-স্বষ্টে ‘দিন গোজরান’ হইত । হজরত কাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ) সেই সামান্য খাদ্য জিনিসাদি দ্বারাই স্বামীকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইতেন ; ভিক্ষার্থী রাহী-মোছাকেরের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন ; আর যৎসামান্য বাহা অবশিষ্ট থাকিত, তদ্বারা স্বয়ং আহার কার্য সম্পন্ন করিয়া ; খোদার দরগায় “ শোকর-গোজার ” হইতেন । ধনী ও আমীর ওমরাগণ নানাপ্রকার উপাদেয় চর্ক্য, চোব্য, লেহ, পেয় প্রভৃতি খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া যত না পরিতৃপ্ত হইতেন, হজরত কাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ) সামান্য যও এর কুটি ভক্ষণ করিয়া তদাপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন । ছনিয়ার সমস্ত বিপদ অভাব ও অসচ্ছলতা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার

‘ছবর’ (ধৈর্য) ও ‘তহম্মল’ (সহ্যশক্তি)এ একটুও পার্থক্য দৃষ্ট হয় নাই । গিঞা-বিবীর সম্বন্ধ অতীব মধুর ও প্রীতিকর ছিল । দাম্পত্য-জীবনে সুখ-শান্তির একটু অভাব ও কখন দৃষ্ট হয় নাই । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, যতদিন (হজরত) কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) জীবিত ছিলেন, তাঁহার দ্বারা আমার উপর কোনও রূপ ‘তকলিফ্’ (কষ্ট) হয় নাই । আর প্রকৃত পক্ষে কষ্ট হইবেই বা কিরূপে ? যখন দুই দিক্ দিয়াই আঁ হজরত (ছালঃ)-এদ রঙ ‘গালেব’ ছিল, তাঁহার প্রতিবিম্ব উভয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছিল—তাঁহার খোদামুরজ্জি, কার্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, এছলাম-প্রিয়তা উভয়ের মধ্যেই বিশেষ ভাবে পবিত্র ক্রিয়া প্রকাশ করিত, সেরূপ ক্ষেত্রে এই দুইটি পবিত্র জীবনের ধারা একই দিকে—পবিত্র পথেই প্রবাহিত হইত । সংসারের কোনও রূপ আবিলতার তাঁহাদের দেহ মন কখনও কলুষিত হয় নাই । মহামানবীর মহানবীর আদর্শ শিক্ষায় তাঁহাদের মন প্রাণ সর্বতোভাবে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল । তাঁহার সম্পূর্ণ পদানুসরণ করিয়া উভয়েই চলিতেন । বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত মহাপুরুষের দ্বারা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । দুইটি জীবনের পবিত্র ধারা অবশেষে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটা মহা-তরঙ্গিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল ; তাহাতে অপবিত্রতা, আবিলতা ও কলুষের লেশমাত্র ছিল না । সুতরাং তাঁহাদের সম্মান-সম্মতিগণও আদর্শ নর-নারী রূপে পৃথিবী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । যদি কোনও ‘মায়মুলী’ (সামান্য) বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে কিছু ‘শকররজ্জিঃ’ (মনোবাদ) উপস্থিত হইত : তাহা শুনিতে পাইয়া আঁ হজরত (ছালঃ) এমন অমূল্য ও ঐশী শক্তি সম্পন্ন উপদেশ প্রদান করিতেন যে, সেই সামান্য মনোবাদ অক্ষুরেই বিনষ্ট হইত । পরিশেষে উভয়ে সেই মন কষাকষি ও মনোবাদের জন্ত লজ্জিত হইতেন ।

“আলম আশ্শরাহ্” গ্রন্থে হজরত ফেতান (রাজিঃ) হইতে রওশানেত আছে যে, ঘটনা বশতঃ একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও হজরত ছৈয়দাঃ কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মধ্যে কিছু মন-কষাকষি হইয়াছিল ; যখন এই সংবাদ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কর্ণগোচর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের গৃহে গমন করিলেন ; এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে দক্ষিণ (ডান) দিকে এবং হজরত ছৈয়দতয়েছা, (রাঃ—আঃ) কে বামদিকে বসাইয়া—স্বর্গীয় মহামূল্য উপদেশের ‘দফ্তর’ খুলিয়া দিলেন । তিনি এমন অমূল্য উপদেশ সকল দান করিলেন যে, উভয়ের মনোবাদ সম্পূর্ণরূপে দূর হইল—উভয়ের অন্তঃকরণ পরস্পরের সহক্রে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হইয়া গেল । তাঁহাদের সে মনোবাদ বর্তমান কালের স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসম্বাদের দ্বায় মারাত্মক ছিল না । উহার সঙ্গে বর্তমান সময়ের দাম্পত্য-কলহের কোন তুলনাই হইতে পারে না । তাঁহাদের মধ্যে মনোবাদের সঞ্চার হইলে খোদা তা-লার ভর অচিরে উভয়ের অন্তঃকরণে উপস্থিত হইত, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মিটিয়া যাইত । বর্তমান কালে আল্লাহ্ তা-লার ভর ও আতঙ্ক কাহারও মনে ক্ষণকালের জন্যও উদয় হয় না । উভয়েই আপনাদের দুর্জয় ‘বেদ’ বজায় রাখিবার বন্ধপরি কর হয়, এবং পরিণামে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যায় । এই মনোবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক বিব বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ; এবং একে অপর কে ‘জব্দ’ করিবার নানা ফন্দি-ফেরেব আঁটিতে থাকে । স্বামী-স্ত্রীর মুখোমুখী অনেক সময় হাতাহাতিতে পরিণত হয় । হয় ত স্বামীর লাঠী কিংবা পাছুকা স্ত্রীর পৃষ্ঠে বা মস্তকে পতিত হয় । আবার স্ত্রীর জুতা-খড়ম, বাঁটা ও সময় সময় স্বামীর উপর বর্ষিত হয় । আর গালাগালি এবং বকাবকির ত কোন ‘সীমানা-ছরহদই’ থাকেনা । অকথ্য ও অশ্রাব্য গালি-গালাজের দ্বারা উভয় পক্ষ ইহাতে প্রবাহিত হয় । হয় ত পরিণামে

ইহা দ্বারা অনেক সোণার সংসার ছাই হইয়া যায় । তাহারা খোদা ও রহুলের আদেশ এবং উপদেশ একেবারেই ভুলিয়া যায় । কোরআনের পবিত্র বাণীর প্রতি লক্ষ্যও করে না । তাহারা যদি হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এবং অন্যান্য পবিত্র চরিত্র ও পবিত্র চরিত্রা মোছলেম-নরনারীদিগের আদর্শ জীবন চরিত আগ্রহের সহিত—অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে, তবে তাহাদের মনের পতি অনেকটা পরিবর্তিত হইতে পারে ।

এমামুল-আওলিয়া হজরত হাছন বছরী (কোদঃ) রওশায়েত করিয়াছেন যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) করমাইয়াছেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) খুব অধিক পরিমাণ এবাদত করিলেও, গৃহকার্যে এবং সাংসারিক সর্বপ্রকার অশুদ্ধানে তাঁহার কোনও রূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হয় নাই ।

শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ‘মালী হালাত’ (আর্থিক অবস্থা) বিবাহিত জীবনে আদৌ সচ্ছল ছিল না । শারীরিক পরিশ্রম মজুরী কার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন । কষ্টে সৃষ্টে—অভাব ও দৈন্তের মধ্য দিয়া কোনও রূপে দিন কাটিয়া যাইত । এক দিনের ঘটনা এই :—তিনি কোনও ‘ময দুরী’ (শ্রমিকের কাজ) পাইলেন না । অনাহারে গিঞা-বিবীর (স্বামী-স্ত্রীর) অষ্ট প্রহর (২৪ ঘণ্টা) কাটিয়া গেল । সন্ধ্যার সময় একজন তাষেরের (ছওদাগরের—বণিকের) উষ্ট্র, বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া মদীনায়া আসিল ; ঐ সকল মাল-আছবাব উঠি হইতে নামাইবার জন্য শ্রমিকের আবশ্যক হইল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঐ কার্যের ভার গ্রহণ পূর্বক অনেক রাত্রি পর্যন্ত উষ্ট্র হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য গুলি নামাইয়া যথাস্থানে রাখিলেন । ছওদাগর তাঁহাকে এই কার্যের জন্য ১০ দরহম মাত্র পারিশ্রমিক দিলেন ; তিনিও সন্তুষ্টির সহিত উহা গ্রহণ করিলেন ।

রাত্রি দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া যাওয়াতে নগরের প্রায় সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। একখানি দোকান খোলা পাইয়া সেখান হইতে কিছু ‘জুও’ (যব) ক্রয় করিলেন। তিনি এক দরজমের জুও লইয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ; হজরত বতুল (রাঃ—আঃ) আনন্দ সহকারে—হাসি-খুসির সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার বুলি হইতে ‘জুও’গুলি বাহির করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা চাকিতে (জাঁতায়) পিষিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই টাটকা-আটার কুটি পাকাইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্মুখে দস্তরখানে স্থাপন করিলেন। তিনি তৃপ্তি সহকারে আহার করিবার পর, অবশিষ্ট যাহা রহিল, হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাহা পাইলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, ঐ সময় হজরত ছরওয়ারে কারেনাত (ছালঃ)-এর এই ‘এরশাদ’ (উক্তি) আমার স্মরণ-পথে পতিত হইল যে, তিনি একদা বলিয়াছিলেন, কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) দুনিয়ার ‘বেহতরিশ আওরত’ (সর্বোৎকৃষ্ট—সর্বগুণ সম্পন্ন স্ত্রীলোক) ; স্মরণ মাত্রেই আমি খোদাতায়ালার শোকর আদায় করিলাম (আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম)।

স্মরণ জীবনের শেষ ভাগে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন খলিকার পবিত্র ও সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ তাঁহার চরণ তলে গড়াইতে ছিল ; তদীয় আযাদ করা (মুক্তিপ্রাপ্ত) প্রিয় ক্রীতদাস আবু রাফের (রাজিঃ) বয়তুল মালের অধ্যক্ষ পদে বরিত ; সেই সময় একদা তাঁহার এক ছাহেববাদী (কস্তা-বস্ত্র) এক ছড়া (একগাছি) ছাচ্চা মতির (মুক্তার) হার পরিয়াছিলেন। তিনি বয়তুল মালের মুক্তাহার দেখিয়া চিনিয়া ফেলিলেন, এবং বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মতির হার তুমি কোথায় পাইলে মা ! কস্তা ফরমাইলেন, আবু রাফের (রাজিঃ) আমাকে ইহা দিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া এই বলিয়া ‘তশ্বি’ (শাসন)

করিলেন যে, “ ভবিষ্যতে যদি তুমি বয়তুল মালের কোনও জিনিসে হাত লাগাইবে, তবে তোমার হাত কাটিয়া ফেলা হইবে ।” যত্নে সত্নে ইহাও ফেরমাইলেন যে, “ আমি যখন ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে ‘আকুদু’ (বিবাহ) করিলাম, তখন আমার এই অবস্থায় দিনাত্রিপাত হইতেছিলাম, একখানি মেঘচন্দ্র মাত্র শব্যাক্রমে ব্যবহৃত হইত । দিনের বেলায় উহাতে করিয়া উটটিকে ‘চারা’ (ঘাস) খাওয়াইতাম, আর রাত্ৰিকালে উহাই আমাদের শব্যাক্রম পরিণত হইত । আমাদের দীন বা পরিচারক কেহ ছিল না ; আমরা নিজেই সমুদয় গৃহকার্য সম্পন্ন করিতাম ।”

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এক পরলোক গমনের পর কোনও ব্যক্তি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এক কবরস্থ আপনার সঙ্গে কিরূপ ছিল ; তিনি বিষম বদনে শোকাক্ত হৃদয়ে আব্দ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “ তিনি কবরস্থ (মোহলুম-বর্গের) একটি সুগন্ধি ‘পুষ্প’ ছিলেন ; বাহা বিতক হইয়া যাওয়ার পরেও উহার সুগন্ধে আমার মস্তিষ্ক ‘ময়ন্তর’ (সৌরভিত) ।”

হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এই নিয়ম ছিল যে, প্রথমে তিনি ‘শওহর’ (স্বামী) ও মেহাস্পদ বালক-বালিকাদিগকে আহার করাইতেন ; অবশেষে তিনি স্বয়ং আহার করিতেন । ইহাও একটি প্রশংসনীয় ‘আদব’ ও আদর্শ কর্তব্য কার্য ছিল । ইহার আর একটি কারণ এই ছিল যে, খাদ্য দ্রব্যের অল্পতা প্রযুক্ত প্রথমতঃ স্বামী এবং পুত্র কন্যাদিগকে উদর পূরিয়া আহার করাইতেন, যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকিত, তবে নিজে উপবাস থাকিতেন । আবার কিছু খাদ্য দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিলে, ঐ সময় যদি কোনও সুখার্ত্ত ব্যক্তি দয়াদরাজ্যে ইঁাক মারিত—খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিত, তবে নিজে না থাইয়া প্রার্থীর-প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন । সামান্য কণ্ডের কুটিও

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র পক্ষে সর্বদা টাকা দাবী, অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদের দাবী, বিলাস-ব্যসনের উপকরণের দাবী বড়ই মারাত্মক হইয়া উঠে । স্বল্প আয় বিশিষ্ট পুরুষগণ এরূপ ক্ষেত্রে চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া থাকেন । আমাদের পরিচিত কোনও উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র লোককে দেখিয়াছি, স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদিগের ক্যাসান রক্ষা করিতে, বহুমূল্য বস্ত্র-বিনামা ও বিলাস-সামগ্রী বোগাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেন । শেষ জীবনে ৪।৫ শত টাকা বেতনের চাকরী করিয়াও কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না । অকস্মাৎ সুদূর প্রবাসে—চাকরী স্থলে প্রাণত্যাগ করাতে, স্ত্রী-কন্যা (কন্যা—বাহাদের বিবাহ হইয়াছিল না) জামাতাদিগের গলগ্রহ হইতে বাধ্য হইলেন । অথচ বিলাসিতা ■ অপব্যয় রোগে আক্রান্ত না হইলে এমন কিছু বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন, বন্দার স্ত্রী-কন্যাদির পরম সুখে দিন ‘গোজরান’ হইতে পারিত । একজন নর, অনেকেই এইরূপ শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত । ৬০—৭০—৮০—৯০ বা ১০০ শত টাকা বেতনের লোকদিগের স্ত্রীগণ বিলাসী হইলে, তাহাদের সাংসারিক বিপদ কি ভীষণ আকার ধারণ করে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয় । কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরে এই শ্রেণীর বিপদগ্রস্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে ।

হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মহাগাননীর পিতা ছিলেন ‘ছোল্তামুল ফোকারাঃ’ (ফকীর অর্থাৎ দরিদ্রদিগের সম্রাট), আর ‘শওহর’ (স্বামী) ছিলেন ‘যোব্দাতুল্ মছাকিন’ (মিছকিন অর্থাৎ গরীবদিগের অগ্রণী) । অর্থাৎ তাহার পিতালয় ও স্বস্ত্রালয়, উভয় স্থানই ছিল দরিদ্রতা এবং অর্থহীনতার পূর্ণ আদর্শ স্থল । এই অবস্থায় ছৈয়দার ‘এস্তেক্বাল’ (ধৈর্য্য ■ সহিষ্ণুতা) অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল । পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের প্রতি তিনি কিছুমাত্র ক্রম্প করিতেন না ।

উহাতে যেন তাঁহার জন্মগত অধিকার ছিল। মহামানবীয় ওয়ালিদ-মাজেদের শিকায় তিনি পরম পরাৎপর আল্লাহ্-তার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন ; আর পরজীবনের সুখ-শান্তির দিকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি স্বীয় গৃহের সমস্ত কাজকর্মই স্বহস্তে-সম্পন্ন করিতেন ; এবং তাহাতেই তিনি অল্পপম শান্তি অনুভব করিতেন। পুত্র-কন্যাগণের জন্মগ্রহণের পর তাঁহার সাংসারিক কাজের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গেলেও, তিনি মহা উত্তমের সঙ্গে ছোট বড় সকল কাজই স্বহস্তে এসমু চিন্তে নির্বাহ করিতেন ; সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-সেবা এবং উপাসনা-আরাধনা ও দ্বা-নিয়মে সম্পন্ন করিতেন। রাত্রির অধিকাংশ সময়—কখন কখন সমস্ত রাত্রি উপাসনা কার্যে অতিবাহিত হইত। দিনের বেলায় বিশ্রাম লাভ তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিত না।

পূর্বে আরবদেশের নিয়ম ছিল, যুদ্ধে জয়-লব্ধ দ্রব্য-সামগ্রীর এক চতুর্থাংশ বিজয়ী দলের নেতা বা সেনাপতি লাভ করিতেন ; অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ (চারি ভাগের তিন ভাগ) যোদ্ধৃপুরুষদিগের মধ্যে বন্টন হইত। আ হজরত (ছালঃ) নিয়ম করিলেন, বিজয়ী দলের দলপতি এক পঞ্চমাংশ পাইবেন ; আর পাঁচ ভাগের চারিভাগ যোদ্ধৃপুরুষগণ লাভ করিবেন। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোর-আন শরীফে আল্লাহ্ জল্ল-শানহু ফরমাইয়াছেন, “আর (গোছলমানগণ) জানিয়া রাখ যে, তোমরা যে জিনিস (যুদ্ধে) লুণ্ঠিয়া আনিবে, উহার এক পঞ্চমাংশ খোদা এবং তাঁহার (রছুলের) ‘করাবত দার’ (‘আত্মীয়-স্বজন’)-দিগের, আর ‘মহাতাজ’ (দরিদ্র—পরমমুখাপেক্ষী)-দিগের এবং ‘মোছাফের’ (প্রবাসী)-দিগের।” একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) জানিতে পারিলেন, আ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট যুদ্ধে জয়-লব্ধ কতিপয় ‘লওণ্ডি’ (দাসী) আসিয়াছে ; তিনি আসিয়া হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে এই বলিয়া সংবাদ দিলেন যে, তুমি বলিয়া থাক,

“ চাকিতে (জাঁতার) আটা পিষিতে পিষিতে আমার হস্তে ‘আব্‌লা, (ফোঙ্কা) পড়িয়া গিয়াছে, আর গৃহকার্য সম্পন্ন করিয়া আমার একপ অবসর হয় না যে, সম্মানগণের যথোচিত রূপ ‘হেফাযৎ’ (তত্ত্বাবধান) করি। ” এসময় কতকগুলি দাসী তোমার ওয়ালেদ মাজেদের হাতে আসিয়াছে ; তুমি মাইরা উহাদের মধ্য হইতে একটি চাহিয়া লও । এই কথা শুনিয়া হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি স্বীয় মহামহিম পিতার অবস্থা জানিতেন ; তিনি মোহাজের (দেশত্যাগী) মোছলমানদিগের সুবিধার দিকে সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতেন ; তাঁহাদের অভাব দূর না করিয়া, স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের অভাব মোচনে কদাচ অগ্রসর হইতেন না । তিনি যখন পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) গৃহে উপস্থিত ছিলেন না ; কোন কার্যোপলক্ষে বাহিরে গমন করিয়াছিলেন । তিনি স্বীয় অভিপ্রায় বিমাতা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর নিকট প্রকাশ করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন, আমার আগমন সংবাদ এবং আগমনের উদ্দেশ্য আপনি প্রক্টেয় ওয়ালেদ-মাজেদের খেদমতে জানাইবেন । অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর আগমন সংবাদ এবং তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন ।

পরগম্বর (ছালঃ) ছাহেব এই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন, এসময় তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শয়নের উদ্যোগ করিতে ছিলেন ; তাঁহারা আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আগমনের ‘আহট্’ (আভাষ) পাইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলেন ; কিন্তু তিনি বলিলেন, তোমরা ঐ অবস্থায়ই থাক ; অতঃপর তিনি গিয়া উভয়ের

মাক্কাতে উপবেশন করিলেন, এবং করমাইলেন, অম্মি যা কাভেমাঃ !
তুমি যে জিনিষের প্রার্থনা করিতে আমার নিকট
করিয়াছিলে, উহা অপেক্ষা 'বেহতর' (উত্তম) এক জিনিষের বিষয়
তোমাকে জানাইতেছি,—তোমরা মিক্কা-বিবী (স্বামী-স্ত্রী) যখন
শয়ন করিবার জন্য শয্যার আগমন করিবে, সেই সময় ৩৩ বার হোব্‌হান
আল্লাহ্, ৩৩ বার আল্‌হাম্মদো লিল্লাহ্ ও ৩৩ বার আল্লাহো আকবর
পড়িয়া লইবে। ■ এই 'আমল' (অনুষ্ঠান) তোমাদের 'খাদেম'
(দাস দাসী) অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। কে বলিতে পারে যে,
জনাব হজরত পরগম্বর (ছালঃ) ছাহেবের 'খোশ্‌হালী' (সচ্ছল অবস্থাপন্ন
হইবার) সুযোগ ছিল না ; সুযোগ ত বিলক্ষণ ছিল, অর্থ-সম্পদ ত তাঁহার
চরণ তলে গড়াইত ; কিন্তু তিনি সচ্ছল অবস্থায় জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে
ইচ্ছা করিতেন না, তিনি দরিদ্রতাকেই পছন্দ করিতেন। অর্থ-সম্পদ মানুষের
মধ্যে অহঙ্কার, আত্মস্তুতি, বিলাসিতা, আড়ম্বর-প্রিয়তা ইত্যাদি দোষাবলী
আনয়ন করে ; তিনি স্বীয় 'ওম্মত' (শিষ্য বা অনুগমনকারী)-দিগকে ঐ সকল
মারাত্মক দোষ হইতে বাঁচাইবার জন্য দরিদ্রতাই অবলম্বন করিয়াছিলেন ;
তাঁহার খলিফা চতুষ্ঠয় ■ অধিকাংশ ছাহাবাঃ (সাহাবাঃ) এবং প্রাথমিক বংশধর-
গণও তাঁহার সম্পূর্ণ পদানুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শত সহস্র ছাহাবাঃ

* গতান্তরে ৩৩ বার লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ্ শব্দের উল্লেখ আছে,
যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। চারিটিই অতি পবিত্র বাক্য। প্রত্যেক
মোছলমানের পক্ষে শয়নের পূর্বেই ইহা পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহাতে
সমগ্র রাত্রি সর্ব প্রকার আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। আর
ফজরের নমাজের পরে পাঠ করিলে সারাদিন বিপদ আপদ হইতে রক্ষিত
থাকিবে।

(রাজিঃ) তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগতে এছলাম ধর্মের জলন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন । তদ্ব্যতীত হাজার হাজার এমাম, আলেম-ফাজেল, ছুফি-দরবেশ একরূপ দীনভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন যে, অন্য জাতির মধ্যে তাহার অস্তিত্ব বিরল । আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় ‘খান্দান’ (বংশধর)-দিগের সম্বন্ধে এই ‘দোওয়া’ (প্রার্থনা) করিতেন—“ হে আল্লাহ্ ! তুমি মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর ‘আহ্ল ও আয়াল’ (পরিজন বর্গ ও বংশধর)-দিগকে এই পরিমাণ ‘রুবি’ (অর্থ-সম্পদ) দাও, বাহাতে উহারা ‘ছরকশ্’ (গর্বোন্নত মস্তক—অসাধ্য) ও পাপাচারী না হয় ।”

এই বিষয়টি আল্লামা শিব্লী নোমানী মরহুম মহোদয় উর্দু ভাষায়—হুদয়োনাদিনী কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ।

কথিত আছে, খয়বরের যুদ্ধে বহু দাস দাসী আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হস্তগত হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্য হইতে ফজ্জা নামী একটি দাসী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে তিনি দান করিয়া ‘এরশাদ ফরমাইয়াছিলেন’ “ গৃহকার্যের অর্ধেক এই দাসী করিবে, আর অর্ধেক কাজ তুমি নিজে করিও । তুমি স্বয়ং যে খানা খাইবে ; এই ‘কনিষ্’ (দাসী) কেও ঠিকএরূপ খানা খাওয়াইবে ।”

একবার আঁ হজরত (ছালঃ) ‘ছফর’ (প্রবাস) হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথানিয়মে সর্বপ্রথমে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন । তাঁহার গৃহে একখানি রঙ্গিণ পরদা ঝুলিতে ছিল ; আর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় পবিত্র হস্ত দ্বয়ে ২ গাছি চান্দ্রির কাঞ্চণ (বলয়—বালা) পরিয়াছিলেন ; ইহা দেখিয়াই আঁ হজরত (ছালঃ) গৃহে প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলেন । তাঁহাকে ফিরিয়া বাইতে দেখিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । এই সময় তাঁহাদের অতি প্রিয় ক্রীতদাস হজরত আবু রাফেয় (রাজিঃ)

পাক পাঞ্জতন (৬৪৯) কাতেমাঃ যোহরাঃ †

তথায় উপস্থিত হইলেন ; তিনি হজরত খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ)-কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ; তিনি বলিলেন, ওয়ালেদ-মাজেদ হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) আগার গৃহ-দ্বারে আসিয়া, জানিনা কি কারণে গৃহে প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া চলিয়া গেলেন । আবু রাকের (রাজিঃ) বলিলেন, গৃহ-দ্বারের এই রজ্জি পরদা ও আপনার হাতের কাজ (কঙ্কণ) দেখিয়াই তিনি ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছেন । হজরত কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) তৎক্ষণাৎ ঐ উভয় জিনিষ হজরত বেলাল (রাজিঃ)-এর হস্তে, আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন ; এবং ইহাও বলিয়া দিলেন যে, আমি উহা থয়রাত করিয়া দিয়াছি ; আপনার বাহাকে ইচ্ছা উহা দান করুন । তদনুসারে তিনি উহা বিক্রয় করিয়া আছহাবে ছফাএর এখ-রাজাতে (প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যয় করিলেন । (বোখারী—এব্-নে ওমর [রাজিঃ]-এর রওয়ায়েত) । মাজেজে আবু যর (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার আগাকে হজরত ছরওয়ায়ে কায়েনাত (ছালঃ) আদেশ করিলেন যে, তুমি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ডাকিয়া আন । তদনুসারে আমি তাঁহার গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলাম । তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, হজরত ছৈয়দাতুন্নেছা (রাঃ—আঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইয়া চাকিতে (জাতায়) আটা পিষিতেছেন । এইরূপ একটি ঘটনা ‘নাছেখত্তাওয়ারিখ’-প্রণেতা স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন ; যদ্বারা জানা যায়, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এক এক সময় দুই দুই ‘ওয়াখ্ত’ (বেলা) অনাহারে অতিবাহিত করিতেন । ঐ অবস্থায় ও তিনি ‘বাচ্চাঃ’ (সন্তান) ক্রোড়ে লইয়া চাকিতে আটা পিষিতেন । মোল্লা জামালুদ্দীন মোহাদ্দেছ (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, একদা হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) মছজেদ নববীতে আগমন করিলেন, আর কুটির একখানি ছোট টুকরা আ হজরত

পাক পাঞ্জতন (৬৫০) কাতেমাঃ যোহরাঃ ।

ছবিওরে কায়েনাত্ (ছালঃ)-এর [] দিলেন ; হজরত রহুলে করিম (ছালঃ) ঐ কুটির টুকরা খানি সাদরে গ্রহণ করিলেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহা কোথার পাইলে ? হজরত ছৈয়দাতরেছা (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, এরা রহুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ! অল্প পরিমাণ জও (বব) পিষিয়া কুটি তৈয়ার করিয়াছিলাম, উহার দ্বারা কুটি প্রস্তুত করিয়া যখন ‘বাচ্চাঃ’ (বালক-বালিকা)-দিগকে খাওয়াইলাম, তখন মনে হইল, হজরত রহুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-কেও কিছু খাওয়ান চাই ; হে খোদার ছাচ্চাঃ (সত্য) রহুল ! এই কুটি ওয় দিনে আমাদের অদৃষ্টে জুটিরাছে (পূর্ববর্তী দুই দিন উপবাসে কাটিরাছে) ; আ হজরত (ছালঃ) ঐ কুটির টুকরা ‘তনাওল ফরমাইয়া’ (খাইয়া) বলিলেন, অরি কাতেমাঃ ! চারি ওয়াক্তের পরে তোমার প্রদত্ত এই কুটি খও তোমার পিতার মুখে প্রবিষ্ট হইরাছে ।

মাওলানা ছিমান্ ছিন্দিকী-আল-ওয়ানেরছী
আফবরা বাদীর একটি উদ্দ
কবিতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত
হইল ।

বেটি এয়্ছি ছাবেরাঃ আওর বাপ এয়্ছা ছবর দোস্ত্ ;
আজকাল পয়দা কেহিঁ এয়্ছি মেছালে হায় কাই।
ফকর গর ছোলতান রাওয়া দারদ কামালে খুয়ে উস্ত্ ;
ওহঃ চলন জাতে রহে বিল্কুল্ ওহ্ চাগৈয়্ হায় কাই।

করেন্দখানাঃ হায় ইয়েঃ ছনিয়া মোমেনু'কে ওয়াস্তে ;
 মালে ছনিয়ামে' ভালা য়োকবে কি য়েবায়েশ্ কাই।
 হায় ইয়েহ্ ছব ছওদায়ে ফানা কুচ্ দিনো'কে ওয়াস্তে ;
 ফের আক্কেরা গোরকা হায় ওছমে' আছায়েশ্ কাই।

ছিরতে যোহরাঃ কে জর আতরাক্ দেখে বিবিয়'। ;
 চাহিয়ে ওন্কো করে' যোহরা কি উও'হ তকলিদ ভি।
 ছবর মে আওর ফকরমে' খোশ্ ছুদীয়ে হক্ হায় নেই। ;
 হৌ আমল আছে তো জরত্ কি রাখ'খে ওশ্বেদ ভি ॥

এই সকল ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনযাত্রা কিরূপে নির্বাহ হইত। এইরূপ দরিদ্রতা ও অভাবের মধ্যেও 'ছবর' ও 'কেনায়াত' (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা) সর্বদাই তাঁহার পবিত্র জীবনে বিরাজ করিত। অভাব ও দরিদ্রতাকে তিনি আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। একদা হজরত আমিরুল মুমেনিন আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) কে ফরমাইলেন, আমি কাতেমাঃ ! ঘরে খাদ্য দ্রব্য যদি কিছু থাকে, আমাকে থাইতে দাও। কিন্তু ঘরে কিছুই 'মওজুদ' ছিল না ; আমিরুল মুমেনিন অতি মাত্রায় কুখার্ত হইয়াছিলেন, অগত্যা তিনি কিছু খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহার্থ বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, 'ছাবেরাঃ' (ছবরকারিণী—ধৈর্যশালিনী) ও 'শাকেরা' (শোকর কারিণী—আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারিণী) ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) জোহরের নগায পড়িয়া ছেজদার (মস্তক ভুলুণ্ঠিত করিয়া) পড়িয়া আছেন, আর সর্ব-শক্তিমান্ আল্লাহ্ তায়ালার দরগায় কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন।

একবারের ঘটনা এই যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খাণ্ডদ্রব্য কি ঘরে ‘গওজুদ’ আছে ? উত্তরে হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, আজ ৩ দিন হইতে গৃহে জও এর একটি দানাও ‘গওজুদ’ নাই। তচ্ছব্ধে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, অগ্নি ছৈয়দা (রাঃ—আঃ) ! আমাকে কেন এযাবৎ সে কথা বল নাই ? উত্তরে তিনি বলিলেন, বিদায়ের দিন আমার ওয়ালেদ মাজেদ (শ্রেষ্ঠ পিতা) আমাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, আমি কোনও জিনিষের জন্ত ছওয়াল করিয়া (চাহিয়া) যেন আপনাকে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত না করি।

হজরত এব্নে আব্বাহ (রাজিঃ) রওয়াকেত (বর্ণনা) করিয়াছেন যে, বনি ছলিম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদা হজরত ছরওয়ারে কারেনাত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল ; এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এয়া মোহাম্মদ (ছালঃ) ! এয়া মোহাম্মদ (ছালঃ) ! ! তিনি উত্তর দিলেন, তখন সে বলিল, তুমি কি সেই জাদুগর, যাহার সম্বন্ধে মশ্হুর আছে যে, তাহার শরীরে ছায়া পড়ে না ? আমার ‘বোত্’ (দেব-প্রতিমা) দ্বিগের শপথ, যদি আমার এই খেয়াল না হইত—আমার ‘কওম’ (জাতি—সম্প্রদায়) খুশি হইবে না (নারাজ হইবে), তাহা হইলে এই তরবারির আঘাতে এখনই তোমার গরদান উড়াইয়া দিতাম। হজরত ওমর (রাজিঃ) ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, উহার এই ‘গোস্তাখীর’ (অসভ্যতার—অশিষ্টতার) উত্তর দেন, কিন্তু হজরত রছুলে করিম (ছালঃ), ইঙ্গিতে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন ; এবং ফরমাইলেন, আমি খোদার বান্দাঃ (দাস—সৃষ্ট-মনুষ্য) এবং তাঁহার আদেশ প্রচারকারী। হে ভ্রাতঃ ! পরকালের ‘আযাব’ (শাস্তি)-কে ভয় কর ; আর দোষখের (নরকের) অগ্নির ‘খওফ’ কর ; একমাত্র অধিতীয় খোদা তা-লার পূজা (উপাসনা) করা উচিত—

যোহার কোনও 'শরীক' (অংশী) নাই । এই 'গোফ্তগুর' (কথোপ-
কথনের) এমনই একটি অপ্রত্যাশিত ক্রিয়া প্রকাশ পাইল যে, সেই এরাবী
(মকুবাসী যাবাবর বা বদু) ইমান আনিয়া পবিত্র এছলাম ধর্মের দীক্ষিত
হইলেন । হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) তখন আছহাব (রাজিঃ)-দিগকে
বলিলেন, ইহাকে কিছু কোরআনের আয়াত শিক্ষা দাও ; যখন সে
পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া কোরআন পাকের কতিপয় আয়াত মুখস্থ
করিল, তখন হজুর (ছালঃ) উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার
নিকট কি পরিমাণ মাল (টাকা-কড়ি বা জিনিষ-পত্র) আছে ? সে
বলিল, ঐ পাকযাতের (আল্লাহ্ তা-লার) শপথ—যিনি আপনাকে
পরগম্বর (নবী—তত্ত্ববাহক) করিয়া পাঠাইয়াছেন ; আমাদের বনি
ছলিমের ৪০০০ চারি হাজার অধিবাসীর মধ্যে আমার জায় ফকীর (গরীব—
দরিদ্র) আর কেহই নাই । তখন হজুর (ছালঃ) আছহাব (রাজিঃ)-
গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং ফরমাইলেন, তোমাদের মধ্যে এমন
কোন ব্যক্তি আছে, ইহাকে একটি উষ্ট্র ক্রয় করিয়া দিতে পার ?
আমি 'যামেন' (প্রতিভূ) হইতেছি যে, খোদা ইহার উত্তম 'বদলাঃ'
(প্রতিদান বা প্রতিফল) দিবেন । শ্রবণ মাত্রে হজরত ছারাদ-বিনু-
য়েবাদাঃ (রাজিঃ) সসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্
তা-লার 'ছাচে' (সত্য) রছুল ! আমার নিকট একটি 'উট্‌নী' (উষ্ট্র)
আছে, আমি সেই উষ্ট্রটি উহাকে দিতে প্রস্তুত আছি । ইহার পর হজরত
ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন, এক্ষণে তোমাদের মধ্যে
এমন কে আছে যে, উহার মস্তক ঢাকিয়া দিতে, এবং খোদাকে রাজী
করিতে পার । তৎক্ষণাৎ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) দণ্ডায়মান হইয়া
বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার নামে 'ফেদা' (উৎসর্গীত),
আমি আপনার এই আদেশ পালন করিতেছি । এই কথা বলিয়াই স্বীয়

মস্তকস্থিত ‘আমামা’ (পাগড়ি) সেই এরাবীর মস্তকে স্থাপন করিলেন ।
 অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে
 আছে যে, উহার খোরাক ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পার ? শ্রবণ
 মাত্রেই হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) উঠিলেন, এবং ঐ নব-দীক্ষিত
 মোছলমান ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া করেক গৃহে গমন করিলেন ; ঐ সকল গৃহে
 কোনও খাদ্য দ্রব্য সে সময় ‘মওজুদ’ ছিল না । তখন তাঁহার দৃষ্টি হজরত
 কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর হজরার প্রতি পতিত হইল ; তিনি
 গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন ; হজরত ছৈয়দতয়েছা (রাঃ—আঃ)
 জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? তিনি অ’রজ করিলেন, আমি ছলমান
 ফারছি । জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্ত আসিয়াছ ? তিনি সকল
 ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন । তাহেরাঃ, যাকিয়াঃ, ঝাদিয়াঃ, মরদিয়া,
 ছৈয়দতয়েছা হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এই বৃত্তান্ত শুনিয়া
 ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, এবং ফরমাইলেন, হে ছলমান (রাজিঃ) ! শপথ ঐ
 খোদা তা-লায়,—যিনি আমার পিতাকে পরগম্বর করিয়াছেন ; আজ তৃতীয়
 দিবস, আমরা খাদ্যভাবে উপবাসী আছি । ছই বাচ্চাঃ (পুত্র)
 ছাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌কট্‌ করিতেছে,
 ক্ষুধার কাতর হইয়া একগুণে শুইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু ‘ছায়েল’ (প্রার্থী)
 আরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, উহাকে বিমুখ করিতে পারি না । হে
 ছলমান ! এই একখানি চাদর আমার নিকট মওজুদ আছে, ইহা লইয়া
 শমউন নামক সিন্ধীর নিকট গমন কর, এবং গিয়া বল হজরত
 মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর কন্যা কাতেমার এই চাদর খানি বন্ধক রাখিয়া
 কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রদান কর । তদনুসারে হজরত ছলমান ফারছি
 (রাজিঃ) চাদর খানি লইয়া উপরোক্ত সিন্ধীর গৃহে গমন করিলেন,
 এবং সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া কিছু খাদ্য দ্রব্য চাহিলেন ;

শমউন সিহদী কিছুকাল চাদর খানি উ-টাইয়া-পান্টাইয়া দেখিলেন, তৎপর হঠাৎ তাঁহার অবস্থান্তর উপস্থিত হইল ; শমউন বলিলেন, হে ছলমান ! ইহারা ঐ লোক—যাঁহাদের সংবাদ আমাদের পয়গম্বর হজরত মুহা (আলাঃ) তওরাতে দিয়াছেন । এক্ষণে আমি কাতেমার পিতার উপর ইমান আনিলাম, আর ‘ছাচ্চাঃ দেলে’ (সত্য মনে—অকপট হৃদয়ে) মোছলমান হইলাম । ইহার পর উপযুক্ত পরিমাণ আনাঙ্গ (যবাদি শস্ত) হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ)-কে প্রদান করিলেন এবং চাদর খানিও ফেরত দিলেন । তিনি হজরত কাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন ; তখন হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) তাড়াতাড়ি জও পিষিয়া রুটি তৈয়ার করিলেন, এবং ছলমান ফারছি (রাজিঃ)-এর হস্তে দিলেন । তিনি বলিলেন, ইহা হইতে কিছু রুটি বাচ্চাঃ দিগের জন্ত রাখিয়া দিন । হজরত কাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, হে ছলমান (রাজিঃ) ! যে জিনিষ খোদার রাহে দিয়াছি (দান করিয়াছি), উহার কোন অংশ আর এক্ষণে বাচ্চাঃ দিগের গ্রহণ করা উচিত নহে । হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) ঐ রুটি লইয়া আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন ; এবং সকল ঘটনা তাঁহার হজুরে বর্ণনা করিলেন । আ হজরত (ছালঃ) ঐ রুটি এরাবিকে দিলেন ; আর মছজেদ হইতে হজরত ছৈয়দতয়েছা (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন । তাঁহার চেহরাঃ উদাস দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন, গত ৩ দিন যাবৎ অনাহারে আছেন । (ছালঃ) ! স্বীয় মেহাধার কস্তা-রত্নকে নিজের কাছে বসাইলেন ; এবং আকাশের দিকে তাকাইয়া দোওয়া করিলেন, হে এলাহি ! তোমার দাসী কাতেমার প্রতি রাজী থাকিও ।

আবদুল মজিদ ছিদ্দিকী ছাহেবের
উর্দু কবিতাংশ ।

ইয়েহ্ মোফ্লেছি আওর আপ্কে ইছার কি ইয়েহ্ হাল ;
খোদ ভুকা রহ্না করনা নাঃ ছায়েলকা রদ ছওয়াল ।
যোহরাঃ থি' গরুচে দোখ্তরে ছরওয়ারে দো-জাই ;
খোদ চাকি পিছ্তি থি' পাকাতি থি' রোটিয়' ।
শেরেখোদা কি যওয়াঃ থি' হাশেম কী পোতি থি' ;
কের স্বরকে মরলে কাপ্ড়ে উওহ্ আপ্ ধোতি থি' ।
থে-কুল্ জো আওরতু'কে লিয়ে ইয়েঃ শরীফ্ কাম ;
লাগ্তা হার আজ উন্ছে বছ-বেটি-উকো নাম ॥
ছিদ্দিকী পড়্হ্ দরুদ আদব্ছে রাত দিন ;
ছল্লো আলা মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদীন ॥

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন এক ওয়াক্তের (এক বেলা) পর আমাদের অদৃষ্টে খানাঃ জুটিয়াছিল । জনাব ওয়ালেদ ছাহেব ও আমাদের দুই ভ্রাতার খাওয়া (আহার কার্য) শেষ হইয়াছিল ; কিন্তু ওয়ালেদাঃ ছাহেবাঃ তখন পর্য্যন্ত আহার করিয়া-
ছিলেন না ; অবশেষে আহার করিতে বসিয়া কেবলমাত্র 'নওয়ালঃ' (লোকমাঃ—গ্রাস) মুখে তুলিবেন, এমন সময় দ্বারদেশে একজন 'ছায়েল' (ভিক্ষুক) এই বলিয়া আওরায্ দিল যে, বিন্তে রছুলোল্লাহ্ কে ছালাম (হজরত রছুলোল্লাহর কণ্ঠ্যকে অভিবাদন) ! আমি দুই ওয়াক্তের অনাহারী ; আমার উদর পূর্ণ করিয়া দাও ; এমাম ছাহেব

(রাজিঃ) ফরমাইতেছেন, জনাব ছৈয়দাঃ (আমার জননী) তৎক্ষণাৎ থানাঃ হইতে হাত তুলিয়া লইলেন ; এবং আমাকে বলিলেন, যাও, এই থানাঃ (কুটি) ভিক্ষুককে দিয়া দাও । আমি ত এক বেলাই খাই নাই ; আর ঐ ‘ছায়েল’ (ভিক্ষুক) দুই বেলার অনাহারী ।

‘সিচ্ছার’ (অপরের উদ্দেশ্য বা স্বার্থ, নিজের উদ্দেশ্য বা স্বার্থের উপর বলবৎ করা—বোষণা), সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লা, শৈশব কাল হইতেই তাঁহার মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিলেন ; ফাতেমাঃ শামীয়া *, খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ)-এর ধর্ম নিষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, পর-হিতৈষণা প্রভৃতি খোদা-প্রদত্ত অমূল্য গুণগ্রামের খ্যাতি শুনিয়া হজরত

■ ফাতেমাঃ শামীয়া, শাম অর্থাৎ সিরিয়া নিবাসী একজন আমীর-কবীরের কন্যা ছিলেন ; ইনি অতীব ধর্ম-পরায়ণা, খোদা-পরস্ত এবং সর্বগুণের আধার—পক্ষান্তরে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন । যখন তিনি ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, হজরত খাতেমুলবীরীন (ছালঃ)-এর জন্মকাল নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, তখন তিনি সুদূর সিরিয়া প্রদেশ হইতে মক্কা-মোয়াজ্জমায় আগমন করিলেন ; একদিন আ হজরত (ছালঃ)-এর ওয়ালেদ আবদুল্লাহ সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল ; তাঁহার ‘পেশানীতে’ (কপালে) ‘নূরের’ (স্বর্গীয় জ্যোতির) চিহ্ন দেখিয়া তিনি তাঁহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । তিনি বলিলেন, আমার পিতার বিনা আদেশে এ সম্বন্ধে আমি কোনও মতামত প্রকাশ করিতে পারি না । কিছুদিন পরে যখন বিবী আমেনার সঙ্গে আবদুল্লাহ শুভ-বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, আর সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যখন আবদুল্লাহ ‘পেশানী’ (ললাটদেশ) হইতে বিবী আমেনার গর্ভে স্থান গ্রহণ করিল,

ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মদীনায়া আসিলেন । তিনি তওরিত ও যবুর গ্রন্থের সারতন্ত্র গ্রহণে অভ্যস্ত ও পারদর্শিনী ছিলেন । তিনি শাম হইতে মদীনায়া আগমন কালে নানা-প্রকার উপঢৌকন, অলঙ্কার, ‘জওয়াহেরাত’ (মণিমুক্তা প্রভৃতি), নানাবিধ মেওরা, বহুমূল্য বস্ত্র, নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে আনিলেন । তিনি খাতুনে জম্মত (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে আগমন করিলে, তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন । তৎপর ঐ সকল মূল্যবান সামগ্রী-সম্ভার হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর হুজুরে পেশ হইলে, তিনি ফাতেমাঃ শামিয়ায় অভিমত গ্রহণ পূর্বক, উহা এছলামের ‘খেদমত’ জন্ত দান করিলেন ; নিজের ■■■ কিছুই রাখিলেন না । সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ও বস্ত্রাদি ঐ সকল মোছলমানের মধ্যে বিতরণ করিলেন,—যাঁহারা এছলামের সেবা ও পরিচর্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । ফাতেমাঃ শামীয়াঃ পয়গম্বর যাদির (রছুল নন্দিনীর) ঈদৃশ দাতব্য শক্তি, এছলাম সেবা ও পর-হিতৈষণা প্রভৃতি উন্নত গুণ ও সহৃদয়তা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন ; এবং স্নেহ-ভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । বলা বাহুল্য, এই

ঐ সময় আবদুল্লা বিবাহ সম্বন্ধে পিতার মত গ্রহণ পূর্বক ফাতেমাঃ শামীয়ার গৃহে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; তখন ঐ পুণ্যবতী মহিলা বলিলেন, আমি যে পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতির অনুসন্ধানে স্বীয় ঘর-দ্বার পরিত্যাগ পূর্বক সুদূর মক্কায়া আগমন করিয়াছিলাম, এবং আপনার ‘পেশানী’তে (কপালে) যে জ্যোতির সন্ধান পাইয়াছিলাম, এক্ষণে ঐ জ্যোতিঃ আপনার নিকট নাই ; যাঁহার অদৃষ্টে ছিল, তিনি উহা লাভ করিয়াছেন । পার্থিব কোনও প্রকার সুখ-সন্তোগের জন্ত আমি বিবাহের আকাঙ্ক্ষিনী ছিলাম না ।

পাক পাঞ্জতন (৬৫৯) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

গুণবতী মহিলা (ফাতেমাঃ শামীয়াঃ) পবিত্র এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; এবং যতকাল জীবিত ছিলেন, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রশংসা কীর্তনে বিরত ছিলেন না। তিনি যে সর্বোন্নত আদর্শ মহিলা ; ইহা সেই অতি বৃদ্ধা, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী সিরীয় নারী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন ।

রওয়াজেত (বর্ণিত) আছে যে, একদা জনাব হৈয়দা (রাঃ—আঃ) নমাজ শেষ করিয়া ঐ মহল্লার (জা-নমাযের) উপরই উদাস ভাবে বসিয়া ছিলেন ; ‘এফ্-লাছ’ এর (দরিদ্রতার) খেয়াল করিয়া চিন্তা করিতে-ছিলেন ; কারণ, সন্তানদিগের কুখার বিষয় তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরুক ছিল । মানুষের মনে কত প্রকার ভাব-তরঙ্গই না উপস্থিত হয় ; তিনি একবার ভাবিতেন, খোদা তা-লা আমাকে বৃথা সৃষ্টি করিয়াছেন ; সন্তান-দিগের জন্ম না উদর পূরিয়া খাওয়া, না ভাল বস্ত্রের সংস্থান হয় ; আমার মাথার চাদর খানি শত শত তালিযুক্ত । যদি খোদা আমাকে সৃষ্টি না করিতেন, তবে, তাঁহার খোদাইতে কোন্ অভাব থাকিয়া যাইত ? হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতে ছিলেন ; ঠিক ঐ সময় জনাব হজরত রহুলে খোদা (ছালঃ) তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি স্বীয় কন্তা-রত্নের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি মাতঃ ফাতেমাঃ ? তোমার এ কি অবস্থা ? তুমি উদাস ভাবে বসিয়া কেন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছ ? মহামাননীয় পিতার হঠাৎ আগমনে হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) চম্কাইয়া উঠিলেন ; এবং আত্ম-সংবরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন । তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া আদবের সঙ্গে ছালাম করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে আরজ করিলেন, কিছুই নয়, বাসিয়া বসিয়া স্বীয় অভাব ও দরিদ্রতার বিষয় খেয়াল হইতেছিল । আ হজরত (ছালঃ) তৎক্ষণাৎ কন্তার হস্ত ধারণ পূর্বক ঐ স্থানেই বসিয়া

গেলেন ; এবং ফরমাইলেন, ফাতেমাঃ ! একবার তোমার যায়নমায-
খানা উল্টাইয়া দাও, হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তৎক্ষণাৎ পিতৃ-
আজ্ঞা পালন পূর্বক যায়নমাযের একদিক্ উল্টাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন,
হজুরের আদেশে নমাযের মছল্লার একদিক্ উল্টাইয়া দিয়াছি সঙ্গে
সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন, উহার নীচে দিয়া ‘নহর’ (ক্ষুদ্র পানীর স্রোত)—
একটি সোণার ও একটি চান্দ্র প্রবাহিত হইতেছে । আঁ হজরত (ছালঃ)
‘এরশাদ ফরমাইলেন’—ফাতেমাঃ, যত পার, সোণা এবং চান্দ্র গ্রহণ
কর । এক্ষণে ইহা তোমার অধিকার ভূক্ত : তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য আহার
কর, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান কর, রম্য হস্তা নিৰ্ম্মাণ কর, সুদৃঢ় কেল্লা (দুর্গ)
তৈয়ার কর ; যত ইচ্ছা দাসদাসী নিযুক্ত কর ; সুলকথা, তোমার যাহা ইচ্ছা,
তাহাই করিতে থাক । কিন্তু একথা খুব বুঝিয়া রাখ যে, এই আরাম
ও আয়েশ্ ছনিয়ায় মাত্র কয়েক দিনের জন্ত । পক্ষান্তরে পরকালে
লাভ করিবার কিছুই থাকিবে না । হয় তুমি পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ
কর ; নয় পরকালের জন্ত উহা রাখিয়া দাও । মহান্ পিতার মুখে এই
কথা শুনিয়া হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, আব্বাজান ! আমি
আমার এই খেয়ালাতের জন্ত অনুতাপ প্রকাশ করিতেছি ; ইন্শাআল্লাহ্,
আর কখনও এরূপ অন্তায় খেয়াল ও অসঙ্গত ধারণা আমি মনে
স্থান দিব না । আমার পার্থিব ধন-সম্পদের প্রয়োজন নাই ; ইহা বলিয়া
স্বীয় যায়নমাজ উল্টান দিক্টা সোজা করিয়া দিলেন । হজরতল এছলাম
হজরত এমাম গয্‌যালী (রহঃ) আহ্ ইয়া-উল্-ওলুম—৪র্থ জেল্‌দে
ফরমাইয়াছেন, একবার হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)
পীড়িত হইরাছিলেন ; হজরত রছুল খোদা (ছালঃ), খ্যাতনামা ছাহাবী
হজরত এমরান-বিন্-হাছিন (রাজিঃ)-কে ফরমাইলেন, হে এমরান ! তুমি
আমার নিকট ‘যি মরতবাঃ’ (পদ-গম্যাদা সম্পন্ন) ও ‘যি জাঃ’ (সম্মান

প্রাপ্ত) ব্যক্তি, আমার সঙ্গে চল, রোগ-ক্লিষ্টা ফাতেমার পীড়ার অবস্থা দেখিয়া আসি। তদনুসারে তিনি, হজরত নবী-করিম (ছালঃ)-এর সঙ্গে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ।

আ হজরত (ছালঃ) ছৈয়দাঃ (ছালঃ)-এর গৃহ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন ; এবং ফরমাইলেন, আচ্ছালামো আলায়কুম, যদি 'এজ্জাযত' (অনুমতি) হয়, গৃহে প্রবেশ করি। 'বিস্তে-রছুল' (রছুল-নন্দিনী) আরজ করিলেন, ভিতরে তশরিফ আনয়ন করুন। হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি একা নহি, আমার একজন 'সাথী' (সঙ্গী) ও আছে। তিনি ফরমাইলেন, আপনার সঙ্গে আর কে আছেন ?

আ হজরত (ছালঃ)-এরশাদ ফরমাইলেন, এমরান-বিন্-হাছিন । হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, আমার নিকট এক 'আবা' ব্যতীত অন্য কোন কাপড় নাই। হজুর (ছালঃ) হস্ত দ্বারা 'এশারাঃ' (ইঙ্গিত) করিলেন, ঐ আবা দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত কর। হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আরজ করিলেন, আবা দ্বারা ত আমি শরীর ঢাকিতে পারি, কিন্তু উহা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত হইতে পারে না। হজুর (ছালঃ) স্বীয় পুরাতন চাদর খানি কন্ডার দিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন ; এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন কর। সর্বশরীর এবং মস্তক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। হজুর (ছালঃ) গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, শরীরের তীব্র বেদনায় অস্থির আছি। ইহার উপর অবস্থা এই বে, গৃহে থাওয়ার কোন জিনিষ নাই ; ক্ষুধায় আমি আরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, ঘাব্রাইবার কোন কথা নাই, আমি ৩ দিন

যাবৎ অনাহারে আছি। আর খোদার নিকট তোমা অপেক্ষা আমার 'মর্ত্বা' (পদ-মর্যাদা) অধিক। আমি আল্লাহর নিকট যাহা প্রার্থনা করি ; তিনি তাহা আমাকে অবশ্যই প্রদান করেন ; কিন্তু আমি 'ছনিয়া' অপেক্ষা 'আখেরাত' (পরকাল) অধিক মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি। পরে তিনি স্বীয় পবিত্র হস্তখানি ছহিতা-রত্নের পৃষ্ঠদেশে বুলাইয়া (অর্পণ করিয়া) করমাইলেন, তুমি জন্নতের (বেহেশত্ বা মোহলেম-স্বর্গের) নারীদিগের 'ছরদার' (অধিনেত্রী) ; তোমাকে ছনিয়ার বিপদে ও কষ্টে 'বেদেল' (ভয়-হৃদয়—নারাজ) হওয়া উচিত নয়।

হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দরিদ্রতা, অসচ্ছলতা ও অর্থ-হীনতার এই অবস্থা ছিল যে, অনশনের পর অনশন তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল ; অর্কাহারের ত কথাই নাই ; পূর্ণাহার ভাগ্যে খুব কমই জুটিত ; কিন্তু 'রেবাজত্' (কঠোর পরিশ্রম—ধর্ম্মালুষ্ঠানে প্রাণপণ চেষ্টা) ও 'রেবাদৎ' এ (উপাসনা-আরাধনায়) সম্পূর্ণ নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন। নফল নমাজ আদায়, কোরআন পাক তেলাওত, দোওয়া-দরুদ পাঠ ও ষেকের ফেকেরে তাঁহার দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। হজরত হাছন বছরী (কোদাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর 'রেবাদৎ' (উপাসনা-আরাধনা) এত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল যে, অধিকাংশ সময় সারারাত্রি খোদা-তায়ালার দরবারে দণ্ডায়মান থাকিতেন। হজরত ছলমান ফারছী (রাজিঃ)-এর 'বয়ান' (বর্ণনা) এই যে, একবার আঁ হজরত (ছালঃ)-এর আদেশে, আমি হজরত ছৈয়দাঃ খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম, তদীয় পুত্র-কন্যাগণ মধ্যস্থলে শুইয়া আছেন, আর তাঁহাদের মহা সম্মানিতা মাতা তাঁহাদের গায়ে পাথার বাতাস

দিতেছেন ; কিন্তু মুখে কালাম আল্লাহ্ এর ‘তেলাওত’ (পাঠ) জারী আছে । এই অবস্থা দর্শনে আমার অন্তঃকরণে এক ‘খাছ হালাত’ (বিশেষ অবস্থা) উপস্থিত হইল । আমি ভাবিলাম, সাধারণ স্ত্রীলোকেরা আরেশ-আরামে দিনাতিপাত করে, কিন্তু হজরত রছুল (ছালঃ)-এর কণ্ঠা পার্থিব সুখ-শান্তি পরিত্যাগ পূর্বক, এতদূর উপাসনা-আরাধনায়—তপ-জপে আত্ম-নিয়োগ করিয়া আছেন । “আলান আশ্শরায়” গ্রন্থ লেখকের বর্ণনা হইতে জানা যায়, একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বাহির হইতে গৃহে আগমন করিলেন, দেখিতে পাইলেন, হজরত খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ) রুটি পাক করিতেছেন ; আর পবিত্র বদনে আল্লাহ তাঁহার ‘যেকের’ জারী আছে । উপাসনা-আরাধনায় তিনি এত কঠোর পরিশ্রম করিতেন যে, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম । কারণ, তাঁহার চিরজীবনই উপাসনা এবং আরাধনায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । তিনি সকল সময় এবং সকল অবস্থায়ই বিশ্ব-পতি আল্লাহ তা-বার স্মরণে ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন । আল্লাহর সন্তুষ্টি-বিধানই তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । তৎপর মহামান্ব পিতার আদেশ ও উপদেশ পালন, স্বামী-সেবা, সন্তানগণের লালন পালন, গৃহ কার্য্য-সম্পাদন, দরিদ্রের হুঃখ বিমোচন ইত্যাদি সদগুণান সমূহ তাঁহার জীবনের অন্ততম প্রধান কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত । ইতিহাস-বেত্তাগণ লিখিয়াছেন, যখন কোরআন শরীফে দোষখের (নরকের) ‘আখাব’ (শাস্তি) সম্বন্ধে আয়াত ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হইল ; ঐ সময় হজরত ছরওয়াবে কায়েনাৎ (ছালঃ) ওম্মতগণের ভয়ে রোদন করিতেছিলেন । তিনি এত অধিক পরিমাণে রোদন করিয়াছিলেন যে, ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণও তদর্শনে হজুর (ছালঃ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অতিরিক্ত ভালবাসা বশতঃ আকুল প্রাণে—ব্যাকুল ভাবে,

অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন । কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, আঁ হজরত (ছালঃ) কিজল্য একরূপ ভাবে ক্রন্দন করিতেছেন । একজল্য তাঁহারা উঠেঃস্বরে ক্রন্দন না করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে ছিলেন । আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই ‘সাদত’ (অভ্যাস) ছিল যে, হজরত হৈয়দতয়েছা (রাঃ—আঃ)-কে দেখিয়া তিনি শত শোক-দুঃখ ও বিপদ-আপদের মধ্যেও প্রফুল্ল ভাব প্রদর্শন করিতেন ; তজ্জল্য সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোনও প্রকারে ঐ পবিত্র-চরিত্রা মহিলাকে এখানে আনয়ন করিলে, হজরত (ছালঃ)-এর মনে আনন্দ লাভ হইবে, এবং তিনি ক্রন্দন হইতে বিরত হইবেন ; তাঁহার মানসিক ক্লেশের অবসান হইবে । এই সিদ্ধান্ত করিয়া কয়েক জন ছাহাবাঃ মিলিয়া হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন । হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) ‘আওয়ার্’ দিয়া গৃহ-মধ্যে চলিয়া গেলেন । গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, হজরত খাতুনে জল্লত (রাঃ—আঃ) চাকিতে আটা পিষিতেছেন, আর কোরআন পাকের আয়াত আবৃত্তি করিতেছেন । হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ) সকল ঘটনা আত্মপূর্বক বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে চলুন । হজরত হৈয়দতয়েছা সকল বস্ত্রান্ত শুনিয়া তখনই উঠিলেন, এবং একখানি কস্বল দিয়া সর্বাপেক্ষ আচ্ছাদিত করিয়া চলিলেন, ঐ কস্বল খানিতে ১২টি তালি ছিল । ইহা দেখিয়া হজরত ছলমান ফারছি (রাজিঃ)-এর হৃদয়ে একটি অভিনব ভাবের তরঙ্গ উঠিল ; তিনি বলিতে লাগিলেন, ‘কাযছর’ (রোনক সম্রাট) ও ‘ফেছরা’ (পারস্ত-সম্রাট) রেশম ও ‘হরির’ (এক প্রকার বহুমূল্য রেশম-এর উৎকৃষ্ট কারুকার্য খচিত বস্ত্র) পরিধান করেন, আর পয়গম্বর আখেরব্য়মান (ছালঃ)-এর কস্তা-রত্নের সামান্ত বস্ত্র (কস্বল) খানি এত তালিযুক্ত ? এই

বলিয়া সেই ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ (রাজিঃ) রোদন করিতে লাগিলেন । যখন সকলে মিলিয়া মহজেদ-নববীতে, হজরত রেছালত মাব (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) মহামাননীয় ওয়ালেদ মাজেদের খেদমতে সকল ঘটনা বর্ণনা করিলেন, এবং করমাইলেন, আমি চাকিতে (যাতায়) আটা পিষিতে এবং এই (অমুক) আয়াত পাঠ করিতেছিলাম । খোদা তা-লার ‘কছম’ (শপথ) গত ৫ বৎসর বাবৎ আমার এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর একখানি ‘বকরীর খাল’ (ছাগচর্খ) ব্যতীত বিছাইয়া শুইবার আর কিছুই নাই । ইহা শুনিয়া হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) করমাইলেন, অগ্নি আমার স্নেহময়ী কন্যা ফাতেমাঃ ! আমার বেটির ‘ছবর’ (ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার) ‘বদলাঃ’ (বিনিময়—পুরস্কার) খোদা তা-লার নিকট আমানত (গচ্ছিত) রহিয়াছে । অতঃপর হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় মহামান্য ও পরম শ্রেষ্ঠ ওয়ালেদ মাজেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতাঃ ! কিজন্য আপনি এত রোদন করিতেছিলেন ? তখন হজরত রহুলে আকরম (ছালঃ) নবাবতীর্ণ উক্ত আয়াত পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইলেন । সেই ভীষণ ভীতিপ্রদ দোযখের ‘আযাব্’ (শাস্তি) বর্ণিত আয়াত শ্রবণ মাত্র হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ভয়ে অভিভূত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন ; তিনি সেই আয়াত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে রোদন করিতে ছিলেন । এই ব্যাপার খোদা তা-লার ‘পছন্দ’ (মনঃপুত) হইল ; এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ‘রহমতের’ (দয়া বা করুণায়) আয়াত ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) করিলেন । এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া মাত্র হজরত ছারওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) শোকর গোষারীর সঙ্গে ‘ছেজদাঃ’ (ভুলুগ্ঠিত হইয়া মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন) করিলেন ।

“আলগশ্-শরায়” গ্রন্থে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর নিম্ন-লিখিত রূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমি স্বীয় মহাসম্মানিতা জননী হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে ‘শাম’ (সন্ধ্যা) হইতে ‘ছোবেহ্’ (প্রাতঃকাল) পর্যন্ত খোদা তা-বার মহাদরবারে ‘গিরিয়া-বারি’ (ক্রন্দন ও বিলাপ) করিতে, এবং তাঁহার ‘হজুরে’ (দরগায়—সমীপে) প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছি, ঐ দোওয়ায় (প্রার্থনায়) আমি কখনও দেখি নাই যে, তিনি নিজের জন্য কোনও প্রার্থনা করিয়াছেন (মহামান্য পিতার ওম্মত অর্থাৎ শিষ্যদিগের পারলৌকিক মঙ্গলাথেই দোওয়া করমাইতেন)।

মাষ্টার ছৈয়দ বাছেত আলী বাছেত বছ-
ওয়ানীর একটি উদ্দু কবিতা
এহলে উদ্ধৃত হইল।

বারহা দেখ্‌হা হায় খোদ হজরত হাছন (রাজিঃ) নে ছাল্‌হা ;
ছৈয়দাঃ খাতুনে-জরত এয়ানে ওন্‌কি ওরালেদাঃ ।
পেশ্‌তর্ ওক্‌কে রেবাদৎ রহ্‌তি থিঁ বায়াদ আয্‌ রেশাঃ ;
ছোবেহ্ তক্‌ করতি থিঁ উওহ্ বিম ইউহি য়াদে খোদা ।
কেয়া কহৌ থা ওন্‌কি দেল্‌মে কেছকদর থওফে খোদা ;
হেচ্‌কি বক্‌ জাতিথি রোতে রোতে বরমলা ।
আরজ করতি থিঁ বরায়ে থল্‌কে উওহ্ ছোবেহ্ ও মছা,
ইা কভি মাস্তি নেহিঁ আপ্‌নি লিয়ে কোরী দোওয়া ॥

য়েশ্‌ক্ বারি কাম থা আওর আহ্‌ও যারি কাম থা ,
 হায় এছ্‌ পরদেমে ভি দেখ্‌হো তো ফয়েজে আম থা ॥
 বন্দেগানে হক্‌ কি খাতের ছরফ্‌মাল ও বর্‌নাঃ থা,
 বল্‌কে ওন্‌কি ওয়াস্তে থা আওর ভি এছ্‌কি ছেওরা ॥
 এক বড়া হেচ্ছা দোওয়াকা থা ওন্‌হিকি ওয়াস্তে ;
 আওর কুচ্‌ হজরত আলী (কঃ) আওর আপ্‌নি বাচ্‌কুকে লিয়ে ।
 ইয়ুঁ দোওয়া ফরমায়ী রোকর জেছ্‌ ঘড়ি বিস্তে রছুল ;
 কেউ নাঃ হো উওহ্‌ বারগাহে হক্‌ তায়ালেমে কবুল ।
 দাস্তানে বেন্দাঃ হায় বাছতে ফয়েজে দরইয়া বার কি ;
 এছ্‌ছে বড়্‌কর হোগি কেয়া আব্‌ এন্তেহা ইছার কি ।

হজরত জাবের আনছারী (রাজিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে,
 একবার হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) দেখিতে পাইলেন, হজরত
 ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দেহে উটের চামড়ার ‘লেবাছ’ (পরিচ্ছদ)
 রহিয়াছে । এক হস্তে চাকিতে আটা পিষিতেছেন, আর দ্বিতীয় হাতের
 সাহায্যে হজরত এনাম হাছন (রাজিঃ)-কে দুগ্ধপান করাইতেছেন ।
 এই অবস্থা দর্শনে আঁ হজরতের চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ।
 সঙ্গে সঙ্গে করমাইলেন, “ অরি ফাতেমাঃ ! দুনিয়ার কণ্ঠে ছবর (ধৈর্য—
 সহিষ্ণুতা)-এর সঙ্গে ‘খাতেমাঃ’ (শেষ) কর ; আর আখেরাতের
 (পরকালের) খুশীর (আনন্দের) জন্য অপেক্ষা করিতে থাক ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন :—আমাকে ঘরের কাজ
 কর্ম ও ধান্দা বিষয়ে কোনও সময়েই ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) সম্বন্ধে
 কোন ‘শেকায়েত’ (অভিযোগ) নাই ; হজরত রছুল-করিম (ছালঃ)
 করমাইয়াছেন, “ অরি ‘লখ্‌তে জগর’ (কলেজার টুকরা) ! এ বিষয়ের

কখনও ‘গরুর’ (অহকার) ও ‘তকব্বর’ (গর্ব) করিও না যে, আমি
 পয়গম্বর-হুহিতা, আমার নিকট কেয়ামতের দিন পাপ-পুণ্যের কোনও
 প্রশ্ন হইবে না ; একথা কখনও হইতে পারে না । সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ
 তাঁহার ছেহাব-কেতাব ‘আলমগীর’ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী । তাঁহার নিকট
 ছেহাব-কেতাবের জন্ত সকলেই দারী হইবে ; উহা এমনই এক ‘আদালত’
 (বিচারালয়) যে, ‘আমীর’ (বিপুল ঐশ্বর্যশালী—বড়লোক) ও গরীব
 (দীন-দরিদ্র) এ উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই । তাঁহার মহা-
 দরবারে কাহারও ‘হাছব-নছব’ (বংশ-মর্যাদা) কোনই কাজে আসিবে
 না ।” হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) মহামান্য পিতার উপদেশ-বাণী শ্রবণে
 বহু রোদন করিলেন, এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ‘এবাদৎ-বন্দেগী’তে
 আত্ম-নিরোগ করিলেন । তিনি সর্বদা খোদা ও রছুলের ভয়ে কম্পিত
 থাকিতেন । তাঁহার গৃহে ‘শোকর’ ও ‘ছবর’ এরই একাধিপত্য ছিল ।
 এমনও অবস্থা ঘটিয়াছে যে, একাদিক্রমে কয়েক দিন উনানে আগুণ জলে
 নাই । এই উভয় ‘মিঞা-বিবী’ (স্বামী-স্ত্রী) দুনিয়ার দিকে ফিরিয়াও
 তাকাইতেন না । দরিদ্রতা ও অনাহার-ক্লিষ্টতাকেই ঐশ্বর্য ও সম্পদ
 বলিয়া মনে করিতেন । দিন ও দুনিয়ার ছরদার এর (নেতার) ‘লখ্ৎ
 জগর’ (কলিজার টুকরা), শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর
 প্রিয়তমা সহধর্মিণী হওয়া সত্ত্বেও, সারা জীবন এক খেজুর পাতার সামান্য
 চোটাইতে, কিংবা ছাগ বা উষ্ট্র চর্শে শুইয়া কাটাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া
 অনেকেই ‘তায়াজ্জব’ (বিস্ময়াপন্ন) হইবেন । হজরত রেছালত পানার
 মেহময়ী-হুহিতা-রত্ন স্বহস্তে ‘চাকিতে’ (যাঁতায়) আটা পিষিতেন ; ছোট
 বড় সর্বপ্রকার গৃহকার্য সম্পন্ন করিতেন ; কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার
 কোন কারণ নাই ; খোদা তাঁহার খাছবান্দ (দাস-বা অনুগৃহীত
 ব্যক্তি)-গণ পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার আদেশ পালন ও দুনিয়ার

আরোহ-আরাম-বর্জনে স্বাভাবিক ভাবে বিতুষ্ট হন। পার্থিব দুঃখ ও কষ্টটাকে তাঁহারা অল্প দিন মাত্র স্থায়ী মনে করিয়া, তৎপ্রতি ক্রক্ষেপও করেন না। দুনিয়ার আরোহ-আরাম ও বিলাস-ব্যসনকে তাঁহারা 'ফানী' (অস্থায়ী) মনে করিয়া থাকেন। ইহাদের ইমানের 'কুওত' (শক্তি) অসাধারণ হইয়া থাকে। খোদা তা-লা এই শ্রেণীর লোকের জন্য যে 'ওয়াদাঃ' (প্রতিশ্রুতি দান) করিয়াছেন, তাঁহারা যেন তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর অল্পকাল স্থায়ী ক্লেশ তাঁহারা একপ ভাবে সহ করেন, যেমন রোজাদার ব্যক্তিগণ রাত্রি ও এফতারের অপেক্ষায় দিব্যভাগ অতিবাহিত করেন।

শেছানল হেন্দ, হজরত আযিয্ সখ্-নবীর একটি কবিতা।

গেয়ে দওলত্ ছরায়ে ছৈয়দাঃ পর একদিন ছলমান ;
নজর আয়ি তজল্লি যার উওহ্ কাশা নাঃ যেরফান ।
তজল্লি নূরে হক্ কি চ্ছন রহিথি গোশাঃ গোশাঃ ছে ;
দর ও দিওয়ার পর চ্ছায়ীছয়ী থি হয়বতে এয্-দান ।
আলী মহ্-হফ্ থে বাচ্চে মহ্-হফে নাতেক কে পারে থে ;
যমিন বারে এমানতছে বনি থি হামেলে কোরআন ।
জবিনুননে এহাঁ তক থাক্ কি য়েয্-বত্ বাড়হায়ী থি ;
শবস্তান্কা হরএক যররাহ্ বনাথা কওকবে ইমান ।
উওহ্ ঘর গো পস্তুর থা শহরকে আক্ছের মকানু'ছে ;
মগর থা কম্ছেকম ফের তি ছতুনে গনববদ গরদান ।

উওহ্ ওছ কি চার দিওয়ারি নাঃ থি কুচ্ এয়ছি মন্তহকম ;
 মগর হাঁ আজতক রোকে হায় নজনে আলমে একান ।
 মতায়ৈ দিল্লীয়ে পাক মানেন্দ দেলে আরেফ্ ;
 কেনায়াত আওর তওয়কল্ কা মগর ছামান ছা ছামান ।
 নেগাহে যহদ পরওরছে ইয়েহ্ ছুরত এছ তরেহ্ দেখ্ হি ;
 ওবল আয়া দেল্ ছলমানছে—আওরাকে চশমাঃ জ়মান ॥
 আমিনে ওহিকা শাহ্-যাদাঃ এক জানেব তড়প্তা থা ।
 নবী কি লাড্-লী বেটী মগর থি আছিয়া গরদান ॥
 রেজাজতছে জবিনে ছৈয়দাঃ থি ইওঁ আরকে আফ্-শান ।
 লহো আহ্-মদকা দস্তে কাতেমাঃছে বহ্-তা জাতাথা ;
 মহিতে আছিয়া থা আওর থুনে পঞ্জাঃ মরজান ।
 ইয়েহ্ হামত্-দেখ্-কর ছলমাননে কি ইয়েহ্ আরজ শাহ্-যাদী ;
 মশকত্ এছকদর এছ নাতোয়ানী পর নহিঁ শায়ান ।
 কাহা হায় উওহ্ কনিষে থাছ ফজ্জাঃ নাম হায় জেছ্-কা ;
 ওছেতো বহরে খেদমত্ দেচুকে হেঁয় ছৈয়য়েদে দওরান ।
 ইয়েহ্ ছোনকর ছৈয়য়েদাঃ খাতুন নে এরশাদ ফরমায়া ;
 মেলা হায় বারগাহে আহ্-মদীছে হামকা ইয়েহ্ ফরমান ।
 কারোঁ একরোয় ঘরকা কাম মায়, আওর এক দেন্ ফজ্জাঃ ;
 এহি হায় মরজি মাওলা এহি হায় মরজি য়িদ্দান ।
 মছাদাত এছ্-কো কহ্-তে হেয় ইয়েহ্ হায় আখ লাকে এছলামী ;
 ইয়েহ্ বাতের হায় কেঃ জেন্পর মত হরে এছলাম হায় নাবান ॥

মওলানা ছিমান ছিদ্দিকীর
একটি কবিতা ।

হায়দরে ছফ্দর আলী গরুতজা শেরে খোদা ;
খোদাহি ফরমাতে হেয়ঁ আওছাফে জনাবে ফাতেমাঃ ।
কওল হায় ওন্কী কেঃ জব্ তক যেনেগী বাকী রহি ;
মেরে হক্মে ওছ নে বররাঃ, ভর নাঃ করক আনে দিয়া ।
খতম হো জাতাখা দেল্ বাঁচ্চুঁ:কি খাতেরমে যুঁহি ;
রাতভর রহ্ তিথি মছ্ রফে রেবাদতে খোদা ।
ঘরমে হোতাখা আগার মওজুদ ছামামে তায়াম ;
ওয়াক্ত পর তৈয়ার করতিথি খানা বাযযাঃ ।
এক দফের কা মাজেরা হায় ছৈয়দাঃ (রাঃ আঃ) বিয়ার থি ;
আর তৈয়ন্নম কি ভি আয়েত নাথি গোশ্ আশ্ না ।
ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) উঠ্ঠে ওছি হালাত মে আওর করকে ওজু ;
হোগেয়িঁ এস্তাদ পড়্ হ্ নেকো নমাযে বেয়েরা ।
রাত্ ভর মুঝ্ কো না আয়ি নিন্ ওছ্ দিন করব্ ছে ;
ছোবেহ্ কি ছাত্ আগেয়ি “ আল্লাহ আকবর ” কি ছদা ।
মায়্ ওঠা আওর জানেবে মছ্ জেদ গেয়া বহ্ রে নমায্ ;
ফের ওজু করকে নমাযে বা-জমায়াত্ কী আদা ।
ওয়াপেছ আকর্ দেখ্ তা কেয়া হ্ কেঃ, এত্ মিনান্ছে ;
হোগেয়িঁ মছ্ রফ্ চাকি পিছনেমেঁ ছৈয়দাঃ ।
রহম আয়া মুঝ্ কো আওর বোলা-কে আয় বিস্তে রছুল,
আব্ কর্ আরাম ভি, ইয়েহ্ ওয়াক্ত হায় আরাম কা ।

এছকদর মছকফিয়েত্ আওর এছকদর আশ্গাল্ছে ;
 হো নাঃ তকলিফে মরজ্জ মেঁ মোশ্কেলুঁকা ছামনা ।
 আপ্ বোলোঁ এয়া আলী, ইয়েহ্ তোমুঝে মায়নুম্ হায় ;
 হোঁ বহুত কমবোর বিমারি হায় মেরি জানগয়া ।
 হায় মগর মেরি মরজ্জকা ছব্ছে বেহ্ তর ইয়েহ্ য়েলাজ্জ ;
 আপকি তায়ত হো আওর তারমিলে আহ্ কামে খোদা ।
 হো আগার দোনো মেঁ কোয়ী মেরে মরনেকা ছবব ;
 তো ভালা এছ মওতছে বেহ্ তর হায় কোয়ী মওত কেয়া ।
 বেন্দেগীকা মাহছল ইয়েহ্ হায় কেঃ ছরফে ফরজ্জ হো ;
 তায়তে শওহর করেঁ আওর বন্দেগী কিব্ রিয়া ।
 মওত এয়ছি হালত মেঁ আ জায়ে তো আর খোশু কেছমতি,
 ময়েঁ তো এয়ছি মওত পর্ কর্তি হোঁ ছও জানেঁ ফেদা ।

হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ), জনাব ছৈয়দাঃ খাতুনে জন্নত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে যেক্রপ অতুলনীয় স্নেহ করিতেন—ভালবাসিতেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। সে স্নেহ ও ভালবাসা অপার্থিব—স্বর্গীয় ছিল। পক্ষান্তরে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ও স্বীয় ‘মকদছ’ (পবিত্র—‘পাক’) পিতার জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ‘ওহুদ’ (আহদ)-এর ভীষণ যুদ্ধে যখন হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) অতি গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন ; এমন কি, মদীনার সর্বত্র তাঁহার শাহাদত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল ; তৎক্ষণাৎ ১৪ চৌদ্দ জন স্বনামাখ্যাতা মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে হজরত ছৈয়দাঃ ও একজন ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ঐ হজরত (ছালঃ) আহত অবস্থায়

বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ; এবং ভূতলে শায়ীত আছেন ; তিনি একপ্রকার চেতনা শূন্য অবস্থায় রহিয়াছেন । জনাব হৈয়দাঃ তদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন ; তদীয় নয়ন দ্বয় হইতে অজস্র ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল ; তিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ ওয়ালেদ-মাজেদের পবিত্র মস্তক স্বীয় জানুর উপর স্থাপন করিলেন ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঢালে করিয়া পানী আনয়ন করিতে ছিলেন ; আর হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) শোণিতাক্ত চেহরা মবারক ধুইয়া পরিষ্কার করিতে ছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে বস্তা বা চট পোড়াইয়া উহার ভগ্ন ক্ষতস্থানে লাগাইতে-ছিলেন । কিয়ৎকাল পরে হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) চৈতন্য লাভ করিলেন । তখন তিনি ‘তছ্ কিন আমেব্’ (সাস্তনা-সূচক) বাক্য বলিয়া ঐ সকল মহিলাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, শহীদ ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের ‘গোর-কাফন’ সম্পন্ন করিয়া আঁা হজরত (ছালঃ) সায়াংকালে মদীনার উপস্থিত হইলেন ।

আঁা হজরত প্রত্যুষে যখন ফজরের নমায্ পড়িবার জন্য মহজেদ নববীতে উপস্থিত হইতেন, আর হজরত ফাতেমাঃ ঘোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর চাকির আওরায্ তাঁহার কাণে পহুছিত, তখন তিনি ‘বে-এখ্ তেয়ার’ হইয়া (বিচলিত হৃদয়ে) খোদা তা-লার দরগার এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, “ হে এলাহি ! ফাতেমাঃ কে এই ‘য়েয়াজত্’ (পরিশ্রম—উপাসনাদি কার্য্যে ‘মেহ্নত’) ও ‘কেনায়ত’ (অল্পে সন্তুষ্টি) এর ‘আজর’ (প্রতিদান—পারিশ্রমিক) প্রদান করিও । আর উহাকে এইরূপ দরিদ্রতার অবস্থায় থাকিতে ‘ছাবেত-কদুম্’ (অবিচলিত) রাখিও । ”

একদা হজরত রছুল করিম (ছালঃ) মহজেদে উপবেশন করিয়া-ছিলেন ; উপস্থিত ছাহাবাঃ মণ্ডলী নীরবে উপবিষ্ট ; এই সময় হজরত

পাক পাঞ্জতন (৬৭৪) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

আলী (কঃ—ওঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন । তিনি উপবেশন করিতে উত্তত হইয়াছিলেন ; ঐ সময় আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “হে আলি ! তুমি কি আমাকে কখনও দেখিয়াছ ?” তিনি অতি আদবের সঙ্গে আরজ করিলেন, “এয়া রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ), আমার জ্ঞান ‘ছাদিকাঃ’ আর আমার পিতামাতা আপনার নামে ‘কোরবান’ (উৎসর্গীত) ; আমি আপনাকে দেখিবার মতন দেখিয়াছি । বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিয়াছি ; বদর যুদ্ধে, ওহোদ যুদ্ধে, হোনয়েন যুদ্ধে—অর্থাৎ সমুদয় বড় বড় যুদ্ধে হুজুরের অসাধারণ সাহস, অমানুষিক বীরত্ব এবং অক্লান্ত সর্ব প্রকার নব্রতের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, আমার ‘খোশ্ নছিবি (পরম সৌভাগ্য) বশতঃ সকল সময়েই হুজুরের ‘হামরেকাব’ (সঙ্গী) থাকি ; আর এ সময়ও হুজুরকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতেছি ।” জনাব হজরত রেছালত্ পানাহ্ (ছালঃ) ফরমাইলেন, “না, আলী (কঃ—ওঃ) তুমি আমাকে কখনই দেখ নাই ! দেখ নাই ! ! দেখ নাই ! ! !” হুজুরের উক্তির দৃঢ়তা ও উহার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ‘বেকারার’ (অস্থির) হইলেন ; শরীর কম্পিত হইয়া তখনই তাঁহার দেহ অরাক্রান্ত হইল ; হৃদয়ে ‘দহশ্ ত’ (ভীতি-ব্যঞ্জকতা) প্রকাশ পাইল, তিনি তখনই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক গৃহে প্রস্থান করিলেন । গৃহে উপস্থিত হইয়া জনাব হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর নিকট সকল কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন ; এবং ‘গিরিয়া ও বারি’ (আক্ষেপ ও ক্রন্দন—বিলাপের সঙ্গে রোদন) করিতে লাগিলেন । হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহাকে একুথানি কঞ্চল দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন, এবং তিনি (হজরত শেরে খোদা [কঃ—ওঃ]) শয্যায় শুইয়া গেলেন । অতঃপর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) একজন দাসীকে এই বলিয়া আঁ হজরত

(ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইলেন যে, তুমি গিয়া আব্বাজানকে বল, যদি তাঁহার অবসর থাকে, তবে একবার যেন আমার এখান হইয়া যান । দাসী হুজুরের খেদমতে গমন পূর্বক সংবাদ পঁহুছাইল । তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র পরিচারিকার সঙ্গেই মছজেদ-নববী হইতে স্নেহময়ী কন্ঠার গৃহে আগমন করিলেন ; এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ কাতেমাঃ ! তুমি কিজন্য আগাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছ ? ‘বিস্তে রহুল’ (পরগম্বর-নন্দিনী) নিতান্ত আদর ও নম্রতার সহিত আরজ করিলেন, আব্বাজান ! আজ আপনি শেরে খোদার জংপিণ্ড চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন । তাঁহার প্রবল ‘বেখার’ (জর) আসিয়াছে ; আপনি আমার ‘খাতেরে’ তাঁহাকে স্বীয় ‘জামাল বাকামাল’ (পবিত্র দেহ) দেখাইয়া দিন । হজরত রহুল করিম (ছালঃ) তৎক্ষণাৎ ‘ছহন মবারকে’ দণ্ডায়মান হইয়া এক হস্ত হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর স্বকোপরি স্থাপন পূর্বক ফরমাইলেন, “ হে আলি ! আইস, আমার এই হস্তের নীচে দিয়া বাহির হইয়া আগাকে দর্শন কর । ” আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ঐরূপ করিলেন, অর্থাৎ যখন হুজুর (ছালঃ)-এর সম্মুখবর্তী হইয়া তদীয় বাহু-নিম্নে আগমন করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই অচেতনাবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন । তৎপর যখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল, তখন বলিলেন, “ মাশা আল্লাহ্, আমি ইতিপূর্বে বাস্তবিকই আপনাকে দেখিয়াছিলাম না । ”

এই ঘটনার দ্বারা প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে ; গোপনীয় যবনিকা (গুপ্ত পরদা) উন্মোচিত হইয়া যায় । হজরত রহুল মকবুল (ছালঃ)-কে স্বীয় “ নূরে নযর ” হজরত বতুল (রাঃ—আঃ)-এর প্রতি কিরূপ স্নেহ ও ভালবাসা ছিল ; এই ঘটনার দ্বারা তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় । হৃদয়ের রক্ত-স্বরূপিনী কন্ঠা যে বিষয়ের জন্ত আবদার

করিতেন—অনুরোধ করিতেন, হজুর (ছালঃ) তাহাই পালন করিতেন ; কখনও তাঁহার কোন অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না । বিস্তৃত-বহুল (স্বর্গ রাজ্যী ফাতেমাঃ যোহরাঃ) বাস্তবিকই আঁ হজরত (ছালঃ)-এর চক্ষের তারা ছিলেন । প্রত্যেক মনোকষ্ট ও মনোবেদনা দূরীকরণ পক্ষে তিনিই একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন । ছোলতানে দোজাহান (ছালঃ) ফরমাইতেন, “ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আমার কলেজার টুকরা ।” বধন “ ওয়ান্‌ঘোর আশিরাতোকাল আকরেবিনা ” এই পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় সমুদয় সম্পদায় এবং স্বনংশীয় লোকদিগকে সমবেত করিয়া এক পরগম্বরানা ‘লহ্‌জায়’ (ভাষায়) আল্লাহ্ তা-লার এই কঠোর আদেশ শুনাইলেন । উক্ত আদেশের মর্ম্ম এই :—

“ হে কোরেশ আত্মীয় বর্গ ! হে আব্দে মনাফ্ সম্পদায়স্থ আত্মীয় বর্গ ! হে আবহুল মোত্তালেব বংশীয় স্বজন বর্গ, অসি মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর কন্যা ফাতেমাঃ ! তোমরা সকলে আপনাদিগকে দোযখের ভীষণ অগ্নি হইতে রক্ষা কর । কারণ কেয়ামতের দিন কেহ কাহারও কাজে আসিবে না । ” হজরত ওম্মে-ছাল্‌মাঃ (রাঃ—আঃ) রওযায়েত করিয়াছেন, আঁ হজরত (ছালঃ) একদা রাত্রিকালে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ফরমাইলেন, ‘ছোবহানাল্লাহ্’ আছমান হইতে ‘ফেৎনা’ ও ‘ফাছাদ’ (বিবাদ-বিসম্বাদ বা বিপ্লববাদ) দূর হইয়া গেল ; আর ‘বরকত’ ও ফজলের খাজানাঃ (ঐশ্বর্য্য-সম্পদ) খুলিয়া গেল । হজরায় শয়ন কারিণী (আয্ ওয়াজ-মতহরাত বা মোছলেম-মাতা)-দিগকে জাগাইয়া দাও । কারণ, ছনিয়ার বহু বস্ত্র পরিধান কারিণী স্ত্রীলোকদিগকে ‘আথেরাতে’ (পরকালে) ‘বরহ্‌নাঃ’ (নগ্ন বা উলঙ্গ) অবস্থায় দেখা যাইবে । ” ■

আ হজরত (ছালঃ) একদা রাত্রিকালে হজরত আলী (রাঃ—আঃ)-এবং হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া ফরমাইলেন, তোমরা 'তাহাজ্জদ' নামায কেন নিয়মিত রূপে সর্বদা পড়িতেছ না ? উত্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বলিলেন, আমাদের নিদ্রা এবং জাগরিত থাকা ত খোদা তা-লার 'এখতিয়ারে' (অধিকারে) রহিয়াছে । যদি তিনি জাগাইয়া দেন, তবে জাগিতে পারি ; নচেৎ কিরূপে জাগিব ? ইহা শুনিয়া আ হজরত (ছালঃ) 'খামুশ্' (চুপ) হইয়া গেলেন ; কিন্তু ক্রোধ তরে বীর রাণের (জানুর) উপর 'আফ্‌ছোছের' (আক্ষেপের) সহিত হাত মারিলেন ; এবং কোরআন শরীফের একটি আয়েত পাঠ করিলেন যাহার স্থল মন্তব্য :—“ মানুষ বড়ই ঝগরাটে । ”

ছহিহীনে বর্ণিত হইয়াছে যে, তদানীন্তন মোছলমানগণ 'তহফা-তহায়েফ্' (নজর—উপঢৌকন) 'যেয়াদাঃতর' (অধিকাংশ), ওম্মোল-মুমেনি হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর 'বারির' (পালার) দিন (যে দিন আ হজরত [ছালঃ] তাহার গৃহে বাস করিতেন) হজুর আনওয়ার (ছালঃ)-এর খেদমতে পাঠাইতেন । অন্তান্ত 'আব্‌ওম্মাজে মতহরাত' (হজরতের আহলিয়া—মোছলে-মাতা) গণ, হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, মা, তুমি গিয়া হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে এই আরজ কর বে, তহফা-তহায়েকে (নযর ও উপঢৌকনে) আবু কোহাফার পোল্লীর (হজরত আবুবকর ছিদ্দিক [রাজিঃ]-এর কস্তার) সঙ্গে অন্তান্ত আব্‌ওম্মাজে মতহরাত কেও যেন 'শরীক' (সঙ্গী) করা হয় । তদনুসারে বিমাতাদিগের আদেশ ও অনুরোধানুসারে তিনি পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিমাতাদিগের অভিপ্রায় জানাইলেন । হজুরে আনওয়ার (ছালঃ) ফরমাইলেন, অম্বি

কন্তো ? মোছলমানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আয়েশা (রাঃ—আঃ)-এর পালার দিন, আমার বিনামুমতি বা বিনা ইজিতে তহ্‌ফা তহারেফ্ পাঠাইয়া দেয় । আমি এ বিষয়ে কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই, পক্ষান্তরে নিষেধ ও করিতে পারি না । আমি এরূপ অভিযতও কখন জ্ঞাপন করি নাই যে, তোমরা আয়েশাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পালানুযায়ী নবর বা উপঢৌকন পাঠাইয়া দাও । অতঃপর আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, যা ফাতেমাঃ ! তুমি কি উহাকে মহব্বত কর না—আমি যাহাকে মহব্বত করি (ভালবাসি) ? হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, কেন আমি তাঁহাকে ভালবাসিব না ? হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন—বাছ, তুমি আয়েশা (রাঃ—আঃ)-কে মহব্বত করিবে ।

একদা আঁ হজরত (ছালঃ) জ্ঞানিতে পারিলেন যে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর কিছু ‘আন্-বান্’ (মনোমালিন্য) উপস্থিত হইয়াছে । সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে তিনি গনঃক্লমাবস্থায় তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন । অবশেষে উভয়ের মনোবাদ মিটাইয়া দিলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ; লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হজুরের এরূপ প্রফুল্ল বদন হইবার কারণ কি ? তদুত্তরে আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, “আমি ঐ দুইজন মানুষের মধ্যে ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি—মিটমাট্) করাইয়া দিয়াছি—বাহারা দুনিয়ায় মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ।”

একদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আবুজহলের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন । পাত্রী পক্ষের মনে ‘আন্দেশাঃ’ (সন্দেহ—আশঙ্কা) ছিল যে, ‘শায়েদ’ (সম্ভবতঃ) এই বিবাহ আঁ হজরত (ছালঃ) এর পক্ষে ‘নাগওয়ার’ (অপ্রীতিকর—অনিচ্ছাজনক) হইবে ; এই মনে

করিয়া তাহার আ হজরত (ছালঃ)-এর অনুমতি গ্রহণ আসিল ।
এদিকে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় মহাসম্মানিত ও ভক্তি-
ভাজন পিতার খেদমতে আরজ করিলেন : শ্রদ্ধের পিতঃ ! সকল লোকেই
স্ব স্ব দুহিতার ‘হেমায়েত’ (সাহাবা—পক্ষসমর্থন) করিয়া থাকেন,
কিন্তু আপনি আমার সম্বন্ধে কিছুই খেয়াল ফরমাইতেছেন না ; এক্ষণে
হজরত আলী (কঃ—ওঃ), আবুজহলের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার
উপর সতিনী আনিতেছেন ; এই সংবাদ শুনিয়া, এবং স্বীয় কলিজার
টুকরা হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে ‘গমগীন’ (দুঃখিত—
মনঃক্ষুণ্ণ) দেখিয়া, আ হজরত (ছালঃ)-এর প্রাণে বিষম আঘাত
লাগিল । তিনি তৎক্ষণাৎ মছজেদে গমন পূর্বক মিসরে (বেদীতে)
আরোহণ করিলেন ; এবং সমবেত জন-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন,
“ হেশাম-বিন্-আল্ মগিরার খান্দানের (বংশের) লোকেরা আমার নিকট
‘এজায়ত’ (অনুমতি) লইতে আসিয়াছিল যে, আলী (কঃ—ওঃ)-
এর সঙ্গে আবুজহলের কন্যার বিবাহ দেয় । কিন্তু আমি ‘হরগেয়’
(কিছুতেই) এ বিষয়ের অনুমতি দিব না । একথা কখনও হইতে
পারে না যে, আল্লাহর রছুল, আর আল্লাহর ‘দোঈণ’ (শত্রু) আবু-
জহলের কন্যা এক গৃহে—একত্রে বাস করিবে । সকলে স্মরণ রাখিবে,
ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আমার হৃৎপিণ্ডের টুকরা ; তাঁহার ‘রঞ্জে’
(মানসিক কষ্টে—দুঃখে) আমার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে, তাহার
দুঃখে আমার হৃদয়ে বিষম ক্লেশ অনুভূত হয় । ” হজরত রছুলে খোদা
(ছালঃ)-এর এই “ নারাজীর ” (অসন্তুষ্টির) বিষয় অবগত হইয়া শেরে
খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কাণের উপর হাত রাখিলেন ; এবং
এই বিবাহের সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন । তদনুসারে
হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর জীবিত কাল মধ্যে তিনি

আর কোনও বিবাহ করেন নাই ; বা বিবাহ করিবার ইচ্ছাও জ্ঞাপন করেন নাই ।

ওম্মোল মুমেনিন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়া-ছেন, আঁ হজরত (ছালঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একদা আমরা সকলে গৃহে বসিয়া ছিলাম ; এই সময় (হজরত) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) তথায় আসিলেন ; আঁ হজরত (ছালঃ) যথা-নিয়মে তাঁহাকে পরম সমাদরে নিকটে বসাইলেন ; এবং তাঁহার কাণে আস্তে আস্তে কি কথা বলিলেন ; তাহা শুনিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন ; পরে হজরত (ছালঃ) আবার কি কথা ফরমাইলেন, তাহাতে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) প্রফুল্ল বদনে হাসিতে লাগিলেন । আমি এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম ; এবং আঁ হজরত (ছালঃ) সেখান হইতে উঠিয়া যাওয়ার পর, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ; বল ত মা আজ তোমার ক্রন্দন করিবার ও হাসিবার মধ্যে কি ‘ভেদ’ (রহস্ত) আছে ? তৎপরে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, যে কথা বাবাজান কেবলা গোপন রাখিয়াছেন, সে কথা আমি প্রকাশ করিব না । আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ‘ওফাতের’ (মৃত্যুর) পর ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলাম, অয়ি নাতঃ ফাতেমাঃ ! সেই গোপনীয় কথা বলিবার আর ত কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নাই, এক্ষণে সেই ভেদ প্রকাশ কর, শুনি । তখন ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বলিলেন, হাঁ আম্মাজান, এক্ষণে সে কথা প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই । এই বার সেই গোপনীয় কথা ও আমার ক্রন্দন এবং হাস্যের কারণ শুনুন । বাবাজান কেবলা আমাকে ফরমাইয়াছিলেন, দেখ ফাতেমাঃ, জিবরাইল (আলাঃ) ‘হামেশা’ (সর্বদা—প্রতি বৎসর) আমাকে রমজান শরীফে একবার কোরআন পাকের ‘দওর’ করাইতেন (পড়িয়া শুনাইতেন বা পড়াইয়া শুনিতেন), এ বৎসর তাহা

পাক পাঞ্জতন (৬৮১) কাতেমাঃ যোহরাঃ ।

হুইবার করিয়াছেন । ইহা দ্বারা বোধ হয়, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইয়াছে । এই কথা শুনিয়া আমি মর্শ্ববেদনার কাঁদিয়া উঠিলাম ; তৎপর তিনি ফরমাইলেন ; “ দেখ মা ! আমার সকল ‘রেশ্তাদার’ (আত্মীয়) অপেক্ষা তুমি সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে জন্মতে (বেহেশতে) সম্মিলিত হইবে । আর তুমি জন্মতে সকল স্ত্রীলোকের ‘হরদার’ (আধিনেত্রী) হইবে । এই কথা আমার মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, এবং তজ্জন্তই হাস্য করিয়াছিলাম ।

আ হজরত (ছালঃ) যেমন স্বীয় দুহিতা-রত্নকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, স্নেহ করিতেন, সেইরূপ জানাতা এবং দৌহিত্রদিগের প্রতিও অত্যন্ত স্নেহ এবং ‘পেয়ার’ প্রদর্শন করিতেন । তিনি অনেক সময় ফরমাইতেন, যে ব্যক্তি আমার ‘দোস্ত’ বন্ধু : সে আলী (কঃ—ওঃ)-এর ও বন্ধু । আমার কখনও কখনও ফরমাইতেন, হে আলি ! তুমি ‘ছনিয়াতে’ (ইহকালে) ও ‘আথেরাতে’ (পরকালে) আমার ভ্রাতা । ‘নওয়াছাঃ’ (দৌহিত্র—নাতি)-দিগের প্রতি ‘মহব্বত’ (স্নেহ—ভালবাসা) সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখাই বাহুল্য । সমস্ত ভালবাসা ও স্নেহ রাশি যেন তাঁহাদের উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন । তিনি এমাম ভ্রাতৃ-বৃন্দকে আখির তারী স্বরূপ মনে করিতেন । স্নেহ ও ভালবাসার ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি হইল পাবে যে, হজুর (ছালঃ) উভয় ভ্রাতাকে স্বীয় পবিত্র কক্কোপরি বসাইয়া দিতেন, কখনও বা উভয় ভ্রাতাকে ক্রোড়ে বসাইয়া অনিমিষ লোচনে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং বিমল আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইতেন ।

‘একরোয্’ (একদা) আ হজরত (ছালঃ), হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে ‘তশরিফ্’ আনিলেন । খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) বিশ্রাম করিয়াছিলেন ; ঐ সময় কনিষ্ঠ এমাম

পাক পাঞ্জতন (৬৮২) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

(রাজিঃ) পানী চাহিলেন, আ হজরত (ছালঃ) স্বয়ং তাঁহাকে পানী পান করাইতে লাগিলেন ; ঐ সময় জ্যেষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) পানী পান করিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে হটাইয়া দিয়া কনিষ্ঠ এমামকে পানী পান করাইলেন । তদর্শনে হজরত খাতুনে জব্বত (রাঃ—আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এয়া হজরত ! আপনি কি হোছায়েন (রাজিঃ)-কে অধিক ‘ওলফৎ’ (স্নেহ) করিয়া থাকেন ? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, না, আমি উভয়কে সমভাবে স্নেহ করি ; আর উভয়েই আমার ‘দেলের রাহত্’ (প্রাণের শান্তি) । কিন্তু এক্ষেত্রে হোছায়েন প্রথমে পানী পান করিতে চাহিয়াছিল, এজন্য আমি তাহাকেই প্রথমে পানী পান করাইলাম । অয়ি মা ফাতেমা ! তুমি, তোমার ‘খাওন্’ (স্বামী) এবং তোমার সন্তানগণ আমার সঙ্গে ‘জব্বতে’ (বেহেশতে—মোছলেম-স্বর্গ) একত্রে সম্মিলিত হইবে ।

হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইতেন, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) আমার ‘রাযহানাঃ’ (সুগন্ধি কুল বা সুগন্ধি তৃণ বিশেষ) । ওম্মোল মুমেনিন (মোছলেম-মাতা) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ফরমাইতেন, আমার নেত্রদ্বয় হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর পরে ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) ব্যতীত আর কাহাকেও ‘বেহ্-তর’ (উত্তম—মনোনীত) দেখে নাই । একদা কোনও ব্যক্তি মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হজরত রছুলোলাহ্ (ছালঃ) সর্বাপেক্ষা কাহার প্রতি অধিক ‘মহব্বত’ (স্নেহ—ভালবাসা) প্রদর্শন করিতেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, ফাতেমার প্রতি । ছহিহ্ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) জব্বতি ‘খাওয়াতিনের’ (নারীগণের) ‘মালকাঃ’ (রাজ্ঞী) । ছাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ একদা হজুর (ছালঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এয়া রহুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ! ‘আওরত’ (স্ত্রীলোক)-দিগের মধ্যে কাহার ‘দরজাঃ’ (পদ-মর্যাদা) সর্বাপেক্ষা উন্নত ? তচ্ছ বণে হজরত (ছালঃ) যুস্তিকার একটি ‘খৎ’ (রেখা) আঁকিলেন, এবং বলিলেন, ১। মরিয়ম (রাজিঃ) : ২। খদিজাঃ (রাজিঃ) ; ৩। ফাতেমাঃ (রাজিঃ) ও ৪। আছিয়া (রাজিঃ)—(আছিয়া—খোদাদোহী মেছের-রাজ ফেরাউনের স্ত্রী) । এতৎ সম্বন্ধে ‘মোহাদ্দেছীন’ (হাদীছ-বেত্তা) দিগের মধ্যে মতভেদ আছে যে, ওম্মতের (আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ওম্মত অর্থাৎ মতানুবর্তী দিগের) মধ্যে কোন্ মহিলার ‘ফজিলত’ (সম্মান—পদ-মর্যাদা) অধিক ? এ বিষয়ে কতক মোহাদ্দেছীন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ফজিলত অধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; আর একদল হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ)-এর পদ-মর্যাদা অধিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু অধিকাংশের মতে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পদ-মর্যাদা অধিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । “ খাতুনে জন্নত ” বলিয়া যে তিনি অভিহিত হইয়াছেন, ইহাই সে বিষয়ের এক শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ ; এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে । ওম্মোল-মুনেনি হজরত খদিজাতুলকোবরাঃ ও হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর ফজিলত্ (পদ-মর্যাদা) অতুলনীয় । ইহারা সকলেই নারীকুলের ভূষণ—সর্বোচ্চ শ্রেণীর আদর্শ মহিলা ।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র, ধার্মিকতা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, প্রত্যেক বিষয়ে মহামান্য পিতার পদানুসরণ; দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, দরিদ্রতার অবিচলিত ভাব, ইত্যাদি গুণে আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাকে হৃৎপিণ্ডের টুকরা স্বরূপ মনে করিতেন এবং তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রদর্শন করিতেন । হজরত খাতুনে জন্নতের

পাক পাণ্ডিত্য (৬৮৪) কাতেমাঃ যোহরাঃ ।

পদ-মর্যাদা ও গৌরবের আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল । (১) তিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর সর্বাপেক্ষা মেহের পাত্রী কণ্ঠা-রত্ন ছিলেন ; (২) তিনি আ হজরত (ছালঃ)-এর পরম মেহাস্পদ পিতৃবাপুত্র শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর আহলিয়া (সহধর্মিণী—পত্নী) ছিলেন ; (৩) তাঁহার গর্ভে যে দুইটি পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা ও ধার্মিকতা, শোখা-বীখ্য ও পরাক্রম এবং চরিত্র গুণে অতুলনীয় ছিলেন : আর তাঁহাদের শাহাদতের শোচনীয় ঘটনা কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে । এ গৌরব, এ সম্মান, এ পদ-মর্যাদা আর কোনও মহিলার অদৃষ্টে ঘটে নাই । তাঁহাদের বংশে বহু আদর্শ এমাম, জগদ্বিখ্যাত তাপস ও আলেম-ফাজেল জন্মগ্রহণ করিয়া মোছলেম জগতের অসাধারণ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন । এক হজরত বড় পীর ছাত্তেব মহামান্ন ছৈয়দ মতিউদ্দীন আবদুল কাদ্দর দ্বিলানী কোদাছের্ রহুল আযিযের তুলনাও জগতে নাই । তিনি মরফত ও তরিকতের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত করিয়া গিয়াছেন ।

খাতুনে জরত হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় অসাধারণ 'এবাদত-বন্দেগী, (উপাসনা—আরাধনা) প্রভাবে 'মস্তাব-দাওয়াত' হইয়াছিলেন ; অর্থাৎ তিনি একাগ্র মনে আল্লাহ্ জল্লশানহুর দরগায় যে প্রার্থনা করিতেন, তাহাই সেই মহা দরবারে গৃহীত হইত । এই পৃথিবীতেই যখন কোনও দাস দাসী স্বীয় প্রভুর সর্বপ্রকার আদেশ-অনুজ্ঞা পালন করে, প্রভু অর্থাৎ মনিবের যে কোনও হুকুম অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে, কোনও সময়েই প্রভুর আদেশের কিছুমাত্র অন্তর্থাচরণ করে না, তখন সেই প্রভু বা মনিব আপনার আদেশ পালক ও অনুজ্ঞা পালিকা দাস দাসীর উপর কিরূপ সন্তুষ্ট হন ; তাহাদের প্রার্থনা ও

আব্দার রক্ষা করেন, তাহা সচরাচর দৃষ্টিশথ পতিত হয় । আর বিশ্ব-পালক মহাবিচারক আল্লাহ তা-লার আদেশ-নিষেধ-যে নর-নারী প্রাণপণে পালন করেন, তাঁহার আদেশ পালন করাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কার্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের প্রতি মহা দয়াময় আল্লাহ জল্লশানহর দয়ার অনন্ত স্রোত কেন প্রবাহিত হইবে না ? কেন তিনি তাঁহাদের যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না ? হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) আল্লাহ তা-লার সমুদয় আদেশ-নিষেধ প্রাণপণে পালন করিতেন ; মহাপ্রভু যে অবস্থায় রাখিতেন—দরিদ্রতা ও অভাবের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতেও তিনি ‘ছবর’ ও ‘শোকর’ মাত্র অবলম্বন করিতেন ; পার্থিব কোনও ক্লেশকেই তিনি ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না । প্রসন্ন চিত্তে সকল অভাবের তাড়নাই সহ করিতেন ; সাংসারিক কাজ কর্ম শেষ করিয়া সন্তান পালন ও স্বামীর আদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবা ■ পরিচর্যা করণ ; অশ্লিষ্ট সময়টা উপাসনা-আরাধনায় শেষ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন । সুতরাং তাঁহার প্রার্থনা দয়াময়ের মহা দরবারে অবাধে গৃহীত হইত । এক দিনের ঘটনা এই যে, ঈদ-মবারকের দিন ছিল । স্বর্গ-রাজ্যী ফজরের নমায়-পড়িয়া অবসর হইয়াছিলেন ; অতঃপর চাকিতে আটা পিষিতে লাগিয়া গেলেন । হালাল কুজি ও দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার তাঁহাকে যেন পাথার বাতাস দিতেছিল । উপাসনার কষ্ট ও শারীরিক পরিশ্রম যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছিল ; ‘নফ্-ছ্ কুশী’ (খাহেশের আকর্ষণী—আকাঙ্ক্ষার টান) তাঁহার ‘কদম’ (পদ—পা) চুম্বন করিতেছিল । তাঁহার দুই প্রিয় ‘লায়ল’ (মণি—রত্ন)—আর নানার (মাতামহের) ‘হুলায়া’ (পরম স্নেহাস্পদ) হজরত এমাম হাছান (রাজিঃ) ও এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) ঘরের বাহিরে খেলা করিতেছিলেন ; তাঁহার

বখন বুঝিতে পারিলেন, আজ ঈদের দিন, তখন উৎসাহে দৌড়িয়া আসিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, আম্মাজান ! আপনি কি অবগত নহেন যে আজ ঈদের দিন ! আজ ‘আমীর-ফকীর’ (ধনী-দরিদ্র) নির্বিশেষে সকলে আনন্দ শ্রোতে ভাসিবে ; আজ আমার নানার ‘ওম্মত’ (শিষ্য—মতামুবর্তী) দিগের পক্ষে অতি খুশির দিন, আজ ‘ঈদগাহে’ আমার ‘নানার’ (মাতামহের) নামের-খোতবাঃ পড়া হইবে ; আর মোহাজেরিন ও আনুছারদিগের ‘বাচ্চাঃ’ (বালক)-গণ ভাল ভাল কাপড় পরিবে ; বস্ত্রে স্তম্ভকি লাগাইবে ; উষ্ট্রে আরোহণ করিবে ; উষ্ট্রগুলি সজ্জিত করিবে : উষ্ট্র গুলিকে অলঙ্কার পরাইবে ; উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য আহার করিবে ; আর আমরা কি এই অবস্থায়ই থাকিব ? আনুন, আমরাও উৎকৃষ্ট কাপড় পরাইয়া দিন, আমরাও অন্যান্য বালকদিগের স্যায় সাজিয়া-পারিয়া ঈদগাহে গমন করি । হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) পুত্রদ্বয়ের এই সকল কথা শুনিতে ছিলেন, আর ‘বেকারার’ (অধৈর্য্য) হইতে ছিলেন । ভাবিতেছিলেন, পুত্রদ্বয়কে কোথা হইতে বস্ত্রাদি দিবেন ; কিরূপে ইহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন । যদিও মনে মনে ‘পেরেশান’ (চিন্তাকুলিতা) ছিলেন, চিন্তা-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু মোখিক বালক দ্বয়কে—নয়ন-মণি দুইটিকে ‘তছল্লি’ [প্রবোধ) দিতে ক্রটি প্রদর্শন করিতেছিলেন না । তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেছিলেন, বাছাধনেরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আটা পিষিয়া লই ; তৎপর তোমাদিকে নূতন পোষাক পরাইব । কিন্তু কোমলমতি বালকদ্বয়ের এ বিলম্ব টুকুও সহ্য হইতে ছিল না । তাঁহারা বরাবর ‘ষেদ’ করিতেছিলেন । খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ‘মজ্বুর’ (নিরুপায়) হইয়া ‘চাকি’ (জাঁতা) বন্ধ করিয়া দিলেন । বালকদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, বাছাধনেরা বাও, খুব ভাল রূপে ‘গোছল’ (স্নান) করিয়া

আইস । দেখ, এখনই ‘দরজী’ (থলিকা—ওস্তাগর) আসিবে ; এবং তোমাদের জন্য কাপড় লইয়া উপস্থিত হইবে । বালক এমামদ্বয় জননীৰ কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং তাড়াতাড়ি ‘গোছল’ (স্নান) করিতে চলিয়া গেলেন । এদিকে হজরত খাতুনে জন্নত খায়রুন্নেছা (রাঃ—আঃ) ‘জা-নমায্’ বিছাইয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা-লার দরগায় ‘গিরিয়া’ ও ‘বারি’ (ক্রন্দন ও বিলাপ) আরম্ভ করিয়া দিলেন ; তিনি রোদন করিতে করিতে আল্লাহ্ তা-লার মহাদরবারে কাতর প্রাণে এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, হে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তোলা ! আমার ‘য়েয্-যত’ (গান) ও ‘শরম’ (লজ্জা) তোমার হাতে ; তোমা ব্যতীত কে আছে যে, নবী (ছালঃ)-এর ‘নওয়াছাঃ’ (দোহিত্র—নাতি) দিগাক ‘তছকিন’ (প্রবোধ) দেন ; আর আমার ‘কওল’ ও ‘এক্-রার’ (প্রাতিশ্রুতি) পূর্ণ করেন । তুমি সমগ্র দুনিয়া-জাহানের প্রকৃত ‘শাহানশাহ্’ (সম্রাট) ; তোমার ফয়েজ ও করমের (দানের) সমুদ্র, অসংখ্য তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণা-নিবারণ করে । আজ হোছনায়েন (এমাম ব্রাহ্ম-যুগল) আমার নিকট নূতন কাপড় চাহিতেছে, আর আমার এই অবস্থা যে, তালিযুক্ সাধারণ কাপড় ও আমার জুটিতেছে না । এই ‘মাছুম’ (নিষ্পাপ) বালকদিগের প্রতি ফজলের দৃষ্টি-নিপাতিত কর ; ‘গায়েবেব’ (অদৃশ্য) ‘খাজানাঃ’ (ভাণ্ডার) হইতে উহাদের জন্য ‘লেবাছ’ (বস্ত্র—পরিচ্ছদ) পাঠাইয়া দাও । এই বালকদ্বয় তোমার মহবুবের (বন্ধুর) ‘নওয়াছাঃ’ (দোহিত্র—নাতি) ; তুমি স্বীয় করমের দৃষ্টির ছদকায় ইহাদের দেল (মন) খুশি কর । তুমি গণী, তুমি দাতা, তুমি ‘মোছাব্বল আছবাব’—তুমি যদি দিতে চাও, তবে তোমার নিকট কিসের অভাব ? এই মাছুম বালকদ্বয় তোমার নবীর নাতি, (হজরত) আলী (কঃ—ওঃ)-এর চক্ষের তারা, আমার দেলের (প্রাণের) শান্তি ।

এমন যেন না হয় যে, ইহাদের হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায় । যদি উহারা একপা দীনবেশে—হিন্ন পরিচ্ছদে ঈদগাহে গমন করে, তবে এই ব্যাপার তাহাদের মনোভঙ্গের কারণ হইবে । আর আর বালকেরা ইহাদের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিবে—ইহাদিগকে উপেক্ষা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে । আমি নিজের ব্যক্তিগত ‘আয়েশ’ (বিলাসিতা—আরাম) ও ‘রাহত’ (সুখ-শান্তি)-এর জন্য তোমার দরবারে কখনও কোন প্রার্থনা করি নাই ; বা এখনও করিতেছি না । হাঁ, হোছনায়েনের জন্য তোমার দ্বারে খট-খটাইতেছি—(দ্বারে করাঘাত করিতেছি) । দরাময় ! আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর । তাহার ‘দোওয়া’ (প্রার্থনা) শেষ হইতে না হইতেই কে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল ; এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এই কাপড় লইয়া যাও । বালকদ্বয় ইতিপূর্বেই শ্রান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ; আওয়ায্ শুনিয়া দ্বারদেশে গিয়া দেখিলেন, দ্বারে একজন ‘য়েরাবী’ (যাযাবর বা বন্ধু)-এর আকার বিশিষ্ট লোক দণ্ডায়মান আছে ; তাহাকে দরবী বলিয়া বোধ হইল ; তাহার হাতে একখানা খান (পাত্র বা থাঞ্চা), উহা বস্ত্র দ্বারা ঢাকা । এমাম ভ্রাতৃ-যুগল সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত খান লইয়া মাতার নিকট চলিয়া গেলেন ; কাপড় তুলিয়া রাখিয়া থাঞ্চা খানা সেই দরবীবেশধারী লোকের হস্তে প্রদান করিলেন ; সে থাঞ্চাখানি গ্রহণ পূর্বক এমাম বালকদ্বয়কে ছালাম করিয়া চলিয়া গেল । হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এষাবৎ ছৈয়দায় পড়িয়াছিলেন ; হজরত হোছায়েন (রাজিঃ) বলিয়া উঠিলেন, আশ্বাজান উঠুন ; দরবী আমাদের কাপড় লইয়া আসিয়াছে ; সম্বরে আমাদিগকে এই নববস্ত্র পরাইয়া দিন । হজরত খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ) শোকর প্রকাশ পূর্বক ছৈয়দাঃ হইতে মন্তকোত্তোলন করিলেন, এবং এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে এই নূতন কাপড় পরাইয়া ঈদগাহে রওয়ানা করিলেন । ছোবহানাল্লাহ্ !

প্রসিদ্ধ হাদীছ-বেত্তা মহাপণ্ডিত-ছাহাবা হজরত আবু হোরেয়া (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত পরগম্বর (ছালঃ) করমাইরা-ছেন, " হারা (লজ্জা—শরম) ঈমানের এক শাখা ; আর আহ্লে ঈমান (ঈমানওয়াল্লা—ঈমানদার লোক) বেহেশতে বাস করিবে । * * * (তিরমযি) ।

মেশ্কাতের এক ছহী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে হারা ও ঈমান 'লাবেম'ও 'মযনুম'। যখন কোনও ব্যক্তির এই দুই জিনিষের এক জিনিষ উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন অপর (দ্বিতীয়) আপনা হইতে উঠিয়া যায় ; কিংবা 'খোদ-বখোদ' (আপনা হইতে) উহার পেছনে (পশ্চাতে) চলিয়া যায় ।

কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য মোহলোম-রাজ্যের (যথা :—তুরক, মেহের, এরাক, শাম) নারীগণের মধ্যে অনেককই উপরোক্ত 'চন্দ্ ছেফত্' (কতিপয় গুণ) পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন । পাশ্চাত্য বিদ্যাক্ত শিক্ষা ও সংসর্গ প্রভাবে তাঁহারা নিলজ্জতা ও 'বেহায়্যাপনীর' শেষ ধীর পূহিয়াছেন । নিলজ্জতা ও স্বেচ্ছাচারিতা আজ পাশ্চাত্য সমাজে অসহ হইয়া উঠিয়াছে, সেই 'বে-শরমী' ও 'বেহায়্যাপনী' আমাদের নব্য-শিক্ষিতা নারী সমাজের আজ অনুকরণীয় । তাঁহারা পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য 'বে-চরেন' (অধৈর্য্য) হইয়া উঠিয়াছেন । তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লা পুরুষ এবং নারীকে প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছেন । সেই অনুসারে তাঁহাদের কার্য-কলাপ ও দায়িত্ব বিভিন্ন প্রকারের হওয়া আবশ্যিক । পুরুষের প্রাকৃতিক কঠোরতার সহিত নারীর স্বভাবগত কোমলতা ও কমলতার কোনও রূপ সৌসাদৃশ্য নাই । নর এবং নারীর শারীরিক

গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষ সন্তানের জন্মদাতা, আর নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করেন। আমাদের কতকগুলি বিকৃতমনাঃ নরনারী, স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ আযাদী (স্বাধীনতা বা স্বৈচ্ছাচারিতা)-এর উপর জাতীয় উন্নতির নির্ভর বা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বৈচ্ছাচারিতা ও স্বাধীন বিহারের ফলে বঙ্গীয় মোছলেম-সমাজে কতগুলি শোচনীয় দুর্ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে ; তবুও এই পাশ্চাত্য খেয়াল সম্পন্ন গুণধরদিগের চৈতন্য সম্পাদিত হইতেছে না। ইহারা চার নরনারী স্বাধীনভাবে একত্র মিলিয়া-মিশিয়া পথে-ঘাটে, বাগানে-কুঞ্জবনে, নিভৃত প্রকোষ্ঠে বিচরণ এবং উপবেশন করিয়া হস্ত পরিহাস, গল্প-গুজব করেন। পুরুষ ভৃত্য বা বয়, নারীদিগের সেবা পরিচর্যা করে। পুরুষের দোকানে প্রবেশ করিয়া ‘ছ’ওদা’ (জিনিব-পত্র) খরিদ করেন ; পুরুষ বন্ধুদিগের সঙ্গে মিশিয়া নারিগণ উন্মুক্ত মাঠে বা নদী ও সমুদ্র তটে, পাহাড় পর্বতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন। তাঁরা আবার “ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় ” হইতে চান। পূর্বতন আদর্শ ইসলামী রাজ্য টার্কিতে (তুরস্কে) নারিগণ ‘বেহাঙ্গাপনী’ (অর্ধ নগ্ন) ইউরোপীয় পোষাক-ভূষিতা হইয়া দীর্ঘ চুল ছাটাইয়া, পুরুষের সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ-বিহার করিতেছেন ; পুরুষের সঙ্গে ঐরূপ নগ্ন পরিচ্ছদে নৃত্য করিয়া ক্ষুণ্ণি লাভ করিতেছেন। ইহাই কি এছলামী সভ্যতার আদর্শ ! জগ্ননীতে যেমন উলঙ্গ নরনারীর একটি আড্ডা সৃষ্টি হইয়াছে ; কালে হয় মোছলমান নামধারী বর্তমান তুর্কী জাতির মধ্যে সেইরূপ জাংটা পল্লী বা প্রমোদ-কাননের সৃষ্টি হইবে। কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মোছলেম মহিলা মোছলমান সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ জন্য স্বীয় পরিচালিত-স্কুলে বেশ পরদার শক্ত বাধুনী রাখিয়াছেন ; কিন্তু নিজে পরদার বিকছে জেহাদ ঘোষণা করিতেছেন। তিনি নিজেও এযাবৎ প্রকাশ্য ভাবে পরদার বন্ধন ছিন্ন করেন নাই ; কিন্তু লেখনীর সাহায্যে ও বক্তৃতার

যুগে যুগে পরদা-বিরোধিতা খুব জোর-শোরে প্রকাশ করিয়া, পাশ্চাত্য খেয়াল বিশিষ্ট নর-নারীর নিকট বেশ 'বাহ্ বা' লইতেছেন। প্রকৃতন খেয়াল বিশিষ্ট নর-নারীর উপর এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী ও স্বেচ্ছাচারিণী নর-নারীগণ অনবরত গরলোদগার করিতেছেন। “লজ্জা ■ শরম” বলিয়া কোনও জিনিষের অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করেন না। নারীর লজ্জা ও শরমই যে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার, একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। ইহারা বিবী, বেগম, খাতুন প্রভৃতি উপাধী ছাড়িয়া আজকাল মিস, মিসেস ও লেডি উপাধী অতি গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। মোছলমানী পোষাক-পরিচ্ছদ ও আবেষ্ট আবেষ্ট পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহারা ময়ূরের পালক পরিহিত কাকের আকার ধারণ করিতে একটুগাত্রও কুষ্ঠা বোধ করিতেছেন না। উদ্ভূতে একটা কথা আছে, যথা :—“জেহনে কী শরম, ওহ্কে ফুটে কলম ; জেহনে কী বেহারী, ওহ্ নে ধারী দুখ-মালারী ।”

উপরোক্ত দুইটি ছহী হাদীছ দ্বারা লজ্জা ও শরমের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে ; লজ্জাহীনা বেহারী নারী মোছলেম-সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ ।

কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র আচার-ব্যবহার, কার্য্য-কলাপ, চাল-চলন আমাদের কল্যাণ, তগিনিগণ এবং বিবিগণের সম্পূর্ণ অনুকরণীয়। আমরা একথা স্বীকার করি যে, এদেশের মোছলেম-অবরোধ-প্রথাটি কিছু কঠোর। সম্পূর্ণ বিশ্বাসী মনুষ্য-প্রাণিত দেশে পূর্বকালের নবাগত ও ভারত-বিজয়ী মোছলমানগণ অবরোধ ■ পরদার কঠোরতা যাহা করিয়াছিলেন ; তাহা দেশ, কাল এবং পাত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। এখনও তাহার প্রয়োজন আছে। নারীর পরদা ফাঁক করিলেই মোছলমানগণ উন্নতির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিবেন, এ বিশ্বাস কোনও চিন্তাশীল খাঁটি এবং আদর্শ মোছলমানের

নাই। জাতীয় আদর্শ ছাড়িয়া, ধর্মের অনুশাসন না মানিয়া যাহারা
তির জাতির—অমোছলমানের আদর্শ গ্রহণ করে, তাহারা পদে পদে
বিড়ম্বিত হয়।

আ হজরত (ছালঃ) একদা যখন স্বীয় প্রাণাধিকা কন্যা-রত্ন হজরত
ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ত্রী জাতির
সর্বাপেক্ষা উচ্চ ‘ছেফত’ (গুণ) কি ? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,
“না তাহারা পর পুরুষকে দেখে, না কোনও পর পুরুষ উহাদিগকে
দেখিতে পারে।”

তাহার এই শরম ও হায়া খোদা তালার ও ‘পছন্দ’ (মনঃপুত)
ছিল। মহাত্মা আবু নযীন নিম্ন-লিখিত রওয়ায়েত হজরত আবু হোরেরাঃ
(রাজিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রহুলে-করিম
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন :—কেয়ামতের দিন
যখন বিস্ফে-রহুল (হজরত খাতুনে জব্বত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রা—আঃ)
‘পুল ছরাত’ অতিক্রম করিবেন, তখন ফেরেশ্তাগণ ‘মনাদি’ (ঘোষণা)
করিবে যে, “হে মনুষ্যাগণ ! তোমরা মস্তক অবনত কর, চক্ষু বদ্ধ
কর, ফাতেমাঃ বিস্ফে-হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) পুল-ছরাত পার হইয়া
জব্বতে (বেহেশতে) তশরিক লইয়া যাইতেছেন।”

তিনি ফরমাইতেন, কোনও ‘আওরত’ (স্ত্রীলোক), বিনা ‘আশদ
জব্বরত’ (অত্যন্ত প্রয়োজন), অপর স্ত্রীলোককেও যেন ‘লাঙ্গে বদন’
(নগ্ন দেহ) না দেখে। আর না দুইজন নগ্নদেহ স্ত্রীলোক একই
চাদরে দেহ ‘লেপ্টায়’ (আবৃত করে)। যদিও বা ঘটনা বশতঃ
কোনও স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের নগ্নদেহ দেখিতে পারে, তবে তাহার
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন, শরীরের সাজ-সজ্জা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে স্বীয় স্বামীর
নিকটও হবেন প্রশংসাবাদ না করে। এই হায়া ও শরমের প্রভাবে হজরত

থাতুনে (রা:—আ:) ‘মরজল-মওতে’ (মরণ-ব্যাবিতে—যে রোগে তিনি এন্তেকাল ফরমাইয়াছিলেন, ঐ রোগের অবস্থায়) ‘অছিরত’ ফরমাইয়াছিলেন (অন্তিম-নির্দেশ করিয়াছিলেন) যে, আমার জানাযা: যেন রাত্রিকালে উঠান হয়, আর রাত্রিকালেও যেন আমার জানাযার উপর পরদা ঢাকা দেওয়া যায় । আর বিবী আছমা: (হজরত আবুবকর হিদ্দিক [রাজি:]-এর ‘যওজা:’ [স্ত্রী] যিনি হজরত ফাতেমা: যোহরা: [রা:—আ:]-এর গোপনীয় বিষয় জ্ঞাত এবং পরম পুণ্যবতী ধার্মিক মহিলা ছিলেন) ব্যতীত, অপর কোনও স্ত্রীলোক যেন আমার মৃতদেহের গোছল না দেয় (মৃত্যু-স্নান না করায়) । তিনি শুনিয়াছিলেন যে, যেমরান-বিন্-হাছিন (রাজি:)-কে * একবার হজরত ছরওসারে কারেনাত (ছাল:) হজরত বিবী ফাতেমা: (রা:—আ:)-এর গৃহে ‘য়েয়াদত’ (পীড়ার অবস্থার খবরগিরি)-এর জন্ত নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু হজরত ছৈয়দা: (রা:—আ:) যে পর্যন্ত স্বীয় ওয়ালেদে মাজেদের চাদরখানি লইয়া সমগ্র দেহ আচ্ছাদন না করিয়া-ছিলেন—পদ-যুগল হইতে মস্তক পর্যন্ত না ঢাকিয়া ছিলেন, হজরত যেমরান (রাজি:)-কে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন না ; এই ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।

■ হজরত এমরান-বিন্-হাছিন (রাজি:)—ইহার কুনিয়েত আবু ছনজিদ খযায়ী কায়বি ছিল ; ইনি খরবর বিজয়ের বৎসর পবিত্র এছলাম ধর্ম্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । পরে ইনি বছরা নগরে স্বীয় বাসস্থান নির্দেশ করেন । ৫২ হিজরীতে ইনি বছরা নগরেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । বছরা নগরেই ইহার সমাধি আছে । ইনি একজন মহা বিদ্বান্ ছাহাবা: এবং ‘কোকাহ (কেফা-শাস্ত্রবিদ) মধ্যে পরিগণিত ছিলেন ।

একবার আবদুল্লাহ্-বিন্-উম্ম-মকতুম (রাজিঃ) * নামক অন্ধ ছাহাবী কোনও প্রয়োজনে ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর খোঁজ করিতেছিলেন । হজুর (ছালঃ) ঐ সময় হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে তশ্রিফ রাখিয়া ছিলেন । উপরোক্ত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ঐ গৃহে উপস্থিত হইলে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাড়াতাড়ি অন্ধ প্রকোষ্ঠে (কক্ষে—কামরায়) গমন করিলেন । যখন হজরত

■ আবদুল্লাহ্-বিন্-উম্ম-মকতুম (রাজিঃ) অন্ধ ছিলেন । একদা মক্কা-মোয়াজ্জমায় জনাব হজরত রহুল করিম (ছালঃ), মক্কার রইছ দিগকে—যাহাদের মধ্যে আবুজহল-বিন্-হেশাম, আতিবাঃ-বিন্-রাবিন্না, আবু ওম্মিয়া বিন্-খলফ্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কোরেশগণ উপস্থিত ছিল—পবিত্র এছলামের দিকে ‘দাওত’ দিতে (আহ্বান করিতে) এবং তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন ; ঐসময় আবদুল্লাহ্-বিন্-উম্ম-মকতুম (রাজিঃ) ঐস্থানে আগমন করিলেন, এবং হজুর (ছালঃ)-কে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । এই ‘কেতারে কালাম’ (বাক্য-শ্রোতে বাধা প্রদান), ঈ। হজরত (ছালঃ)-এর ‘না-গওয়ার’ (বিরক্তিকর) বোধ হওয়াতে, তিনি তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং তাঁহার প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না । ইহাতে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন্-উম্ম-মকতুম (রাজিঃ) বড় দুঃখিত হইলেন ; ঈ। হজরত (ছালঃ) সভা হইতে উঠিয়া আসিলেন, ঐ সময় ছুরা আবছ (৩০ পারা) নাযেল (অবতীর্ণ) হইল । হজুর (ছালঃ) আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার ‘দেলজুয়ী’ (মনঃসন্তোষ) করিলেন । ইহার পর এই অন্ধ ছাহাবাঃ যখন হজুর (ছালঃ)-এর খেদমতে আসিতেন, তিনি তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিতেন ।

আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ) স্বীয় প্রয়োজন সাধন পূর্বক চলিয়া গেলেন ; তখন হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) সেই ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন । জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ‘এরশাদ ফরমাইলেন’ (বলিলেন), অগ্নি কন্তে ! আবদুল্লা-বিন্-উম-মকতুম ত ‘নাবিনাঃ’ (অন্ধ), তুমি কেন পরদার জন্য ‘তকলিফ্ (কষ্ট) স্বীকার করিলে ? পিতৃবাক্য শ্রবণে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, আব্বাজান ! উনি ত অন্ধ ছিলেন, কিন্তু আমি ত অন্ধ ছিলাম না যে, ‘গায়ের মহরেম’ (বাহাদুরের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ)-কে দেখিতে থাকিব । এই ঘটনা সম্বন্ধে উর্দু কবি ছৈয়দ মোহাম্মদ নোহ (মছলীশহরী) একটি হুদরোয়াদিনী কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; উহার শেষাংশ এই :—

আরজ কী ছিদ্দিকাঃ কোব্ রেনে তব্ ইয়েহ্ বা-আদব,
 মুঝ্ কো এছ এরশাদে আলী পর নাঃ কেওঁ আরে আজব ।
 বু আলবছির আন্ধে ছহি, মার তো নাবিনাঃ নেহী ;
 বায়টি রহ্ তি কেছতরেহ্ আর রহমতুল্লিল আলামীন ।
 পড়হ্ তি নামহরেম পর আখের কুচ্ না কুচ্ মেরি নঘর ;
 কেউ নাঃ কর্ তি শরম কেবলা আপকি লখ্ তে জগর ।
 খোশ্ হয়ে ছোন্ধর পরগন্ধর ইয়েহ্ জওয়াব বা-ছওয়াব ;
 দিয়ি দোওয়া—তুঝ্ পর হো নাযেল রহমতে হক বেহেছাব ।
 পেশ্ গাহ্ হক্ছে মমদাঃ লায়ে তব্ কহোল আমীন ;
 ফাতেমাঃ যোহরাঃ হায় ছরদারে নেছা আল্ আলামিন ।

হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর শরম ও হাজার আর একটি ঘটনা নেশ্ কাত শরীফ হইতে নকল করা যাইতেছে :—একদা হজরত নবী করিম (ছালঃ) একটি ‘নাবালেগ্’ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ক্রীতদাসকে

সঙ্গে লইয়া—বাহাকে স্বীয় নূর 'চশম' (চক্ষের জ্যোতিঃ) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে 'হেবা' (দান) করিয়া দিয়াছিলেন,—হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে আগমন করিলেন। খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) তখন একরূপ একখানি ছোট কাপড় পরিধান করিয়া ছিলেন যে, উহা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিলে বস্ত্রখানি পা পর্য্যন্ত পঁহুঁহিত না ; আবার পা ঢাকিলে মস্তক অনাবৃত হইয়া যাইত। তিনি অতি ব্যস্ততার সহিত ঐ ছোট কাপড় খানির দ্বারা সর্বাত্ম আচ্ছাদিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, তদর্শনে হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) ফরমাইলেন, অয়ি ফাতেমাঃ ! কোনও ভয় নাই,—যে জন্তু তুমি লজ্জিত হইতেছ। কেবলমাত্র তোমার পিতা ও তোমার 'নাবালগ', 'গোলাম' আসিয়াছে। এই হাদীছ আবু-দাউদ এহে বর্ণিত হইয়াছে।

মওলানা ছিমান ছিন্দিকী আকবরানন্দ
একটি প্রাণতোষিণী কবিতা
নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

শমউন সিন্দী এক হাম্ছায়া যোহরাঃ থা ;
আইয়্যামে জেহালত্বে দোশ্মন্ জো আলীকা থা ।
তকলিফ্ নাঃ থি কোয়ী জো ওহ্ছে নাঃ পঁহুঁছি হো ;
জো ওহ্ছে না পঁহুঁছা হো উওহ্ কোয়ী-নাঃ ছদ্মা থা ।
তওফিকে এলাহীনে আখের ওছে লল্কারা ;
আগায্ছে-আঞ্জামে তক্দীর কুচ্ আচ্ছাঃ থা ।

এছলাম কি আছনে তছখির্ কিয়া ওছকো ;
 মোমেন উওহ্ হুয়া আখের জো কোফ্ র পর শিদা থা ।
 জেত্ নে থে আযিব্ ওছকে, ছব্ ওছছে হুয়ে বরহম্ ;
 আওর দোশ্মনে জান ওছকা হুর্ আপনা এগানাঃ থা ।
 আছবাবে তেজারত্ কী মহুদুদ হুয়ে রছতে,
 ওছমেতি পড়া টুটা জো কাম উওহ্ কর্তা থা ।
 এফ্ লাছনে আ ঘেরা নোকবত্ নে কিয়া ফেহ্ রা ;
 আদ্বাহ্ তেরি কোদরত্ কেয়া হো গেয়া আওর কেয়া থা ।
 থি ওছ কি জো এক বিবী, ওছকো তি কজা আয়ি ;
 আফত্ পঃ ইয়েহ্ আফত্ থি ছদ্মে পঃ ইয়েহ্ ছদ্মাঃ থাঃ ।
 এত্ না তি না থা কোয়ী আকরব্ ওছে নাহ্ লাতা ;
 বেকছ কি নেগাহ্ মে তারিক যমানাঃ থা ।
 এছ্ ওয়াকেরে কি আখের বোহরাঃ নে খবর পারী ;
 লওণ্ডিনে কাহা আ-কার্ জো ওয়াকেরাঃ গোয্ রা থা ।
 উওহ্ রাত্ কা ছান্নাটা অলম পঃ হুয়া তারি ;
 উওহ্ আলমে তারিকি হুর্ ছমত্ আন্ধেরা থা ।
 যোহরা ওঠ্ ঠে আওর ছর্ গর্ রওয়া ডালি ;
 ওছ্ যর্কা লিয়া রাস্তাঃ জেছ্ ঘর্মে উওহ্ রাহ্ তা থা ।
 পহছি তো ওহী জাকর খোদহি ওছে নাহ্ লারা ;
 কাফ্ নারী গেয়ী-মইয়েত্ জেরছা কেঃ তরিকাঃ থা ।
 কী ফাতেমাঃ নে আপ্ নি হাতুঁছে হরএক খেদমত্ ;
 শময়্ নছে গোয়া কেঃ ওন্কা কোয়ী রেশ্ তাঃ থা ।
 ছব্ ভুল গেয়িঁ কেছে গোয্ রেথে জো কুচ্ পহ্ লে ;
 ছিনেমে নাঃ থা কিনাঃ দেল থা তো মহ্ ফ্ কা থা ।

দোশ্‌মন্‌ছে তি হোখা থা এছ্‌ দরজাঃ ছলুক ওন্‌কা ;
 গমখারী ও হামদরদী ছাদাত্‌কা শিওয়াঃ থা ;
 গোরবত্‌ মে মছিবত্‌ মে হামছায়া কে কাম আনা ;
 ইয়েহ্‌ মোছলকে যোহরাঃ থা ইয়েহ্‌ মশ্‌রব্‌ যোহরা থা ।



ঐ কবির লিখিত আর একটি কবিতা ।

এক যিহদী কা মকান থা আপ্‌কে হামছায়া মে' ;
 ওছ্‌ কি লাড়্‌কী হজরতে যোহরাঃ পা থি দেল্‌ছে নেছার ।
 গম্বের ময়্‌হব থি তো উওহ্‌ লেরকীন ইকিকত্‌ মে' ওছে ;
 মেলতে বয়্‌জাছে থা এক ওন্‌ছ্‌, 'ওন্‌ছ্‌ ওস্তোয়ার ।
 খোল্‌কে যোহরানে মছখ্‌খর কর্‌ লিয়া থা যিযু' ওছে ;
 জেছতরেহ্‌ শাহীন কে কাবু মে' আ-জারে শেকার ।
 আ-কে পহর দেন্‌ বয়েঠ্‌তি থি আওর ছোন্‌তিথি কালাম ;
 থি উওহ্‌ গোয়া বর-খরিদি আপ্‌কি খেদমত্‌ গোযার ।
 এক দেন্‌ খোড়াছা লায়ী হালুয়া যোহরাঃ কে লিয়ে ;
 আর কাহা ফরমাইয়ে এছ্‌ কো কবুল্‌ আয় থি ওকার ।
 হজরতে যোহরানে ছোচা, হায় যিহদীকা ইয়েহ্‌ মাল ;
 এছ্‌ কা থানা না রওয়া হায় এছ্‌ কো লেনা না গওয়ার ।
 আওর আগার্‌ এন্‌কার করতি হোঁ তো দেল জায়েগা টুট ;
 জানে কেয়া দেল্‌মে কাহে আপ্‌নে ইয়েহ্‌ লাড়্‌কী শরম্‌ছার ।
 আল্‌-গরজ্‌ ইয়েহ্‌ ছোচ্‌ কর্‌ হালুয়া খুশিছে লে লিয়া ;
 আওর-উওহ্‌ লাড়্‌কী রওয়ানা হো গয়ি মেলত গোযার ।

জব্ হুয়া মালুম ফেদাহ্ কো ইয়েহ্ ছারা ওয়াকেরা ;
 কওন ফেদা ? আপ্ কি পেরারী কনিয্ নামদার ।
 আরজ্ কী, আছহাবে ছফ্ ফাঃ কো ইয়েহ্ ভেজওয়া দিজিয়ে ;
 তাকেঃ ইয়েহ্ খায়রাত হো খোশ্-রুদীয়ে পরওয়ার দেগার ।
 আপ্ নে এরশাদ করমায়া কেঃ ফেদা গওর কর্ ;
 কেয়া খোদাকো দৌ উওহ্ শর জো খোদ হায় মুব্ কো নাগওয়ার ।
 জা কোরী রাহেব রিহদী চুনড্ হালুয়া ওছ্ কো দে ;
 মন্তহক্ ওছ্ কা ওহি হায়, হাম্ নেহি হৈয় খিন্ হার ।
 লারী ফের্ এক দেন্ ইয়েহ্ লাড়্ কী চান্দ্ দীনার ও দরহম ;
 আওর কাহা লেলিজিয়ে বিস্তে-রচুল করদেগার ।
 আপ্ নে ইয়েহ্ কাহ্ কে উওহ্ দীনার ওয়াপছ্ কার্ দিয়ে ;
 ইয়েহ্ পরায়ে হৈয়, নেহি এন্পর তোম্ হারা এখ্ তিয়ার ।
 তোম্ এজাযত্ বাপ্ ছে লেকর নেহী লাই ইয়েহ্ মাল ;
 দোশ্ মনে এছলাম হেয় উওহ্ ইয়েহ্ নেহী ওছ্ কা শায়া ।
 পাছ্ ইয়েহ্ জাহের হেরকেঃ চোরী কার্কে দরহম লারী হো ;
 মালে চোরীকা মোছলমানু'কো কব্ হায় ছাব্ গার ?
 জাও লেজাও নাঃ কর্না ফের্ তোম্ এরছা ভুল কর্ ;
 উল্ফতে এছলামকা এছপর নেহী হায় এন্হেছার ।
 তোম্ আগার মোহতাজ্ হো তো কোরী রজ্ গম নহি' ;
 ছাফ্ নিয়েত দেখ্ নে ওয়ালা হায় উওহ্ পরওয়ার দেগার ।
 এহ্ তিয়াতে এছলাম মে হেয় এক ওছুল বেহ্ তরিন ;
 থা জো আহ্ লে বয়েত্ কা দওরে নবুয়ত মে শয়ার ।
 আওর এস্তেগ্ নাঃ কা ইয়েহ্ আলম তওকলকী ইয়েহ্ শান ;
 হায় জাহাঁমে ফাতেমাঃ যোহ্ রাকি বেন্দাঃ এয়াদগার ।

ইহাতে খোদা তা-বার কোনও ‘বড়ি হেকমৎ’ (মহান্ কৌশল বা উদ্দেশ্য) ছিল যে, জনাব হজরত রছুলোলাহ্ ছাল্লাল্লাহাহ্ আলায়হে ওয়াছাল্লামের কোনও পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না, কেবলমাত্র ‘দোখ্তরি আওলাদ’ (কন্তার সন্তান-সন্ততি) দ্বারা তাঁহার ‘নছল’ (‘আওলাদ’—বংশাবলী) পৃথিবীতে এযাবৎ বিদ্যমান আছে। আবার প্রথমোক্ত ও কন্তার বংশ-তরু অবশিষ্ট নাই; কেবলমাত্র সর্বকনিষ্ঠা ও সর্বাপেক্ষা স্নেহেরপাত্রী হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর বংশ-তরুই সমগ্র পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। আ হজরত (ছালঃ)-এর কন্তা হজরত ওম্মে-কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর কোন ‘আওলাদ’ (সন্তান) ইহাইয়াছিল না। সর্বজ্যেষ্ঠা কন্তা হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ)-এর একটি পুত্র সন্তান জন্মিলেও, অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এমামাঃ নাম্নী একটি মাত্র কন্তা জীবিত ছিলেন; হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক প্রাপ্তির পর, শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার আওলাদও দুই ‘পোশত্’ (পুরুষ)-এর মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। তৃতীয় কন্তা হজরত রোকয়া (রাঃ—আঃ)-এর ও কোন সন্তান-সন্ততি ছিলেন না। জনাব হজরত ছৈয়দার গর্ভে ৩টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; (১) হাছন (রাজিঃ), (২) হোছায়েন (রাজিঃ) ও (৩) মহছেন (রাজিঃ); আর ৩টি কন্তা-রত্ন যথা :—হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ), হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ) এবং হজরত রকিয়া (রাঃ—আঃ)।

“ফজলল-খেতাব” গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ)-এর নাম হজরত রকিয়া (রাঃ—আঃ) ও কুনিয়েত ওম্মে কলছুম ছিল। এই হিসাবে হজরত খাতুনে (রাঃ—আঃ)-এর দুইটি মাত্র কন্তা ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্য রওয়ায়েতে দৃষ্ট হয়, হজরত

রকিয়া (রাঃ—আঃ) শৈশবেই এন্তেকাল করিয়াছিলেন । ওম্মে কলছুমের বিবাহ শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ), স্বভঃ-প্রবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় খলিফা হজরত ফারুকে আজম ওমর বিন্ খেতাব (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । মহামান্ন খলিফার ঔরসে যয়েদ নামক এক পুত্র ও রকিয়াঃ নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু ইঁহার উভয়ে অতি শৈশবেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন । মহামান্ন ২য় খলিফা হজরত ওমর (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ প্রাপ্তির পর, যয়োন এবনে জাকর (হজরত আলী [কঃ—ওঃ]-এর ভ্রাতৃপুত্র)-এর সঙ্গে তাঁহার 'নেকাহ ছানী' (দ্বিতীয় বার বিবাহ) হয় । ইঁহার পক্ষ হইতে কোনও আওলাদ হইয়াছিল না । ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা হজরত মোহাম্মদ বিন্-জাকর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ইঁহার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় ; ইঁহার পক্ষে একটি পুত্র সন্তান জন্মিলেও, শৈশবেই সেই পুত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন । মোহাম্মদ-বিন্ জাকর (রাজিঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহাদের অন্ততম ভ্রাতা আবদুল্লা-বিন্-জাকর (রাজিঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন ; ইহা হজরত বতুল-নন্দিণীর ৪র্থ বিবাহ । ইঁহার পক্ষেও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই ; আর ইঁহার সঙ্গে বিবাহিত অবস্থায়ই হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ) 'ওফাত' পাইয়াছিলেন ।

হজরত যয়নব (রাঃ—আঃ)-এর বিবাহ আবদুল্লা-বিন্-জাকর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল, ইঁহার গর্ভে আলী (রাজিঃ) নামক এক পুত্র ও ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ) নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । এই কন্যার সহিত কাছেম-বিন্-মোহাম্মদ-বিন্-জাকর (রাজিঃ)-এর বিবাহ হয় । ইঁহাদের বহু 'আওলাদ' (সন্তান-সন্ততি) হইয়াছিল । আর আলী-বিন্-আবদুল্লা (রাজিঃ) হইতেও বহু সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন । ইঁহাদের বংশধরগণ জাকরী ও ফাতেমী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

এই রমজানুল মবারক—মতান্তরে ১৫ই শা'বানুল মোরাজ্জম (তৃতীয় হিজরী), হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) শুভক্ৰমে জন্মগ্রহণ করেন । এ সম্বন্ধে অগ্ন্যন্ত রওয়াকেত থাকিলেও, উপরোক্ত বর্ণনাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য । হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন আমার পিতৃব্য বড় এমাম ছাহেবের 'বেলাদত' (ভূমিষ্ঠ) হওয়ার সময় আসন্ন হইল, তখন হজুর ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) হজরত আছমাঃ-বিন্তে-আমিছ (রাঃ—আঃ) ও ওম্মে এমিন (রাঃ—আঃ)-কে মদীয় পিতামহী জনাব ছৈয়দাঃ ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন ; এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা আরেতল কুরছি ও নয়যু পড়িয়া পড়িয়া ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রতি দয় করিবে । তাঁহার বেলাদত (জন্ম) আছরের নমাজের সময় হইয়াছিল । আছমাঃ-বিন্তে-আমিছ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন, যে সময় (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ) ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নেফাছের শোণিত দেখিতে পাইলাম না । এতদর্শনে আমি বিশ্বয়াবিষ্ট হইলাম এবং ঈ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে এবিষয় আরজ করিলাম । তচ্ছ বণে তিনি ফরমাইলেন, আমার কন্যা-বড় ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) 'পাক' (পবিত্র) । প্রসবাস্তে 'গোছল' (স্নান) করিয়া তিনি সেই দিনই মগ'রেভের নমাব্ যথানিয়মে আদায় করিয়া-ছিলেন । এষাবৎ আর কোনও মহিলা সম্বন্ধে একরূপ ঘটনা ঘটে নাই । শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ)-এর 'আকিকা' (সন্তান জন্মবার পর বিশেষ অনুষ্ঠান) জনাব ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রতি আদেশ

করিলেন, শিশুর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া উহার চুলের সম পরিমাণ চান্দ্রি (রৌপ্য) খায়রাত করিয়া দাও। তদনুসারে হজরত হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করা হইল; শিশুর চুলের ওজন এক দরহম বা তদপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আকিকার বকরীর একখানি রাণ ও এক দরহম দাইকে দেওয়া হইয়াছিল। হজরত আছমা-বিস্তে আমিছ (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জন্ম-গ্রহণের ৭ম দিবসে এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর আকিকা কার্য সম্পন্ন হয়; দুইটি মেষ (দোন্না) বা ছাগল যবেহ হইয়াছিল। (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাঁহার চুলের পরিমাণ 'চান্দ্রি' (রৌপ্য) খায়রাত করা হয়। অতঃপর হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) দ্বীয় পবিত্র হস্তে শিশুর মস্তকে সুগন্ধ লাগাইলেন, এবং ফরমাইলেন, অম্মি আছমাঃ! শিশুর মস্তকে 'ধুন' (রক্ত—শোণিত) লাগান, 'রহম জাহেলিয়ত' (অসভ্যতা-মূলক নিয়ম)। (ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, অন্ধকার যুগে আরব (কোরেশ)-দিগের মধ্যে শিশুর মস্তকে শোণিত লেপন করার নিয়ম প্রচলিত ছিল।) জাক্রাণ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য শিশুর মস্তকে লাগান চাই।

অতঃপর এই ঘটনার ২য় বর্ষে (৪র্থ হিজরীতে) ৪ঠা কিংবা ৬ই শা'বান রোয্ ছেঃশোয়া (সোমবার)—আর এক রওয়ায়েত অনুযায়ী রবিয়ছছানী মাসে (হজরত এমাম) হোছায়েন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আকিকা ও ঠিক ঐ নিয়মেই সম্পন্ন হইয়াছিল। আছমাঃ (রাঃ—আঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি (হজরত এমাম) হোছায়েন (রাজিঃ)-কে 'হজুর আকদছ' (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে 'লেটাইয়া' (শোয়াইয়া) দিলাম। হজরত (ছালঃ) তখন রোদন

করিতে ছিলেন। আমি আরজ করিলাম, এয়া রহুলোল্লাহ্ (ছালঃ) আপনি কেন রোদন করিতেছেন? আঁ! হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, অগ্নি আছমা! আমার এই পুত্র (দৌহিত্র) অত্যাচারীর তরবারি-মুখে শহীদ হইবে। আমার ওস্তানের ‘বাগী’ (বিদ্রোহী) সম্প্রদায় ইহাকে হত্যা (শহীদ) করিবে। আল্লাহ্ তা-লার নিকট আমার ‘শাফায়াত’ (‘ছোফারেশ’—মুক্তি প্রদান ■■■ অমরোদ) ঐ ‘বদনছিব’ (হতভাগ্য) লোকদিগের অদৃষ্টে ঘটিবে না। অগ্নি আছমাঃ ‘খবরদার’ (সাবধান)! ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে একথা কিছুতেই বলিবে না। সে নব-প্রসূতি, এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিলে সে শোকে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইবে।

হজরত জাবের (রাজিঃ) হইতে রেঙয়ায়েত আছে (বর্ণিত হইয়াছে), হজরত হোছায়েন (রাজিঃ)-এর ‘আকিকা ৭ম দিনে সম্পন্ন হইয়াছিল, আর ঐ দিন তাঁহার খতনাঃ (বুক্‌ছেদ) ও হয়।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, “ যখন হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল, তখন আমি তাহার নাম ‘হরব’ (লড়াই-জঙ্গ—যুদ্ধ) রাখিলাম। পরক্ষণেই হজরত হজুর ছরওয়ায়ে কায়েনাৎ (ছালঃ) আমার গৃহে ‘তশরীফ’ আনিলেন (আগমন করিলেন), এবং ফরমাইলেন, আমার বেটাকে আমার নিকট আনয়ন কর। উহার কি নাম রাখা হইয়াছে? লোকেরা বলিল, হরব নাম রাখা গিয়াছে। হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, না, বরং হাছন নাম রাখা হউক। তৎপর যখন হোছায়েন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল; তাঁহার নামও প্রথমে হরব রাখা হইয়াছিল। কিন্তু হজুর (ছালঃ) তাঁহার নাম হোছায়েন (রাজিঃ) রাখিলেন। ইহার পর যখন মহছেন জন্মগ্রহণ করিল, আমি তাহার নামও হরব রাখিলাম, কিন্তু হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, না, ইহার নাম মহছেন,

রাখা হইল। পরে হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমি এই সকল বাচ্চার (শিশুর) নাম, হজরত হারুন আলায়হেছালামের পুত্রদিগের নামানুসারে রাখিলাম ; তাঁহাদের মান শবর (রাজিঃ), শবির (রাজিঃ) ও মশর (রাজিঃ) ছিল ; এরাণা (হিক্র) ভাষায় ঐ তিন নামের আরবী অর্থ হাছন (রাজিঃ), হোছায়েন (রাজিঃ) ও মহছেন (রাজিঃ) ।

রেওয়ায়েত আছে, হাছন (রাজিঃ) ও হোছায়েন (রাজিঃ) ‘আহ্লে জন্নতের’ (বেহেশত্ বা মোছলেম-খর্গ বাসীর) নাম। আরবের ‘যামানাঃ জাহেলিয়তে’ (অসভ্যতা ও বর্বরতার অন্ধকার যুগে) কাহারও এই নাম রাখা হইয়াছিল না। আর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ), জ্যেষ্ঠ এমামের নাম হাছন ও কুনিয়েত আবু মোহাম্মদ রাখিয়াছিলেন ; আরবের অন্ধকার যুগে কাহারও এই নাম ছিল না। আর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ‘খোদাওয়ান্ আলম’ (সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ জল্লশানহ) হাছন ও হোছায়েন এই উভয় নাম ‘মখলুক্’ (সৃষ্ট জীব বা মানুষ) হইতে ‘পুশিদাঃ’ (গোপন) রাখিয়াছিলেন ; যখন এই দুই ‘ছাহেব্বাদাঃ’ জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ সময় হজরত ছরওয়ায়ে কাসেনাত (ছালঃ) ঐ নামদ্বয় ঘোষণা করিলেন। হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রাজিঃ), হইতে বর্ণিত আছে যে, এই উভয় নাম এমাম ভ্রাতৃযুগলের আকিকার দিন—অর্থাৎ জন্মগ্রহণের ৭ম দিবসে রাখা হইয়াছিল। হজরত আবু রাফিয় (রাজিঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, যখন হজরত হোছনায়েন (এমাম ভ্রাতৃ-যুগল [রাজিঃ]) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হজরত ছরওয়ায়ে কাসেনাত (ছালঃ), তাঁহাদের উভয় কাণে আযান দিয়াছিলেন।

হজরত ওম্মোলফজল (হজরত আব্বাছ রাজিঃ আল্লাহ আনহুর সহ-
ধর্ম্মিণী) ফরমাইয়াছেন, আমি হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে
আরজ করিলাম, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, হজুরের পবিত্র দেহের কোন
অংশ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) আমার গৃহে আছে । আ হজরত (ছালঃ)
ফরমাইলেন, আপনার স্বপ্ন খুব ভাল ; ফাতেমাঃ (রাজিঃ)-এর গৃহে
সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে ; আর আপনি তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবেন ।
বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ
করিলে, তিনি হজরত কুলছুম (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে, ওম্মোল ফজল
(রাঃ—আঃ)-এর ও দুগ্ধ পান করিয়া ছিলেন ; আর স্বপ্নের ‘তায়বির’
(ফল) সফল হইয়াছিল ।

হাকেম (রাজিঃ), হজরত জাবের (রাজিঃ) হইতে বেওয়ারেত
করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন,
প্রত্যেক মাতার পুত্রদিগের আছবাঃ (পিতার পক্ষ হইতে রেশ্তাদার)
হইয়া থাকে ; কিন্তু হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর
পুত্রদিগের কেহ আছবাঃ নাই । আমি ঐ উভয়ের অলি এবং আছবাঃ
(খছায়েছ কোব্-রে-প্রণেতা এমাম জালালুদ্দীন ছেয়ুতি [রহঃ]) ।

হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,
‘এক মরতবাঃ’ (একবার) জমাব হজরত রছুল খোদা (ছালঃ) স্বীয়
‘দওলতখানাঃ’ (বাসগৃহ) হইতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে
‘দোশ মবারকে’ (স্কন্ধে) লইয়া তশ্রিফ্ আনিতেছিলেন ; পথিমধ্যে
এক ব্যক্তি দেখিয়া ছাহেবযাদাঃকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওয়াহ্ মিঞা
ছাহেবযাদা ! তোমার ‘ছওয়ারি’ ত খুব ! তচ্ছ-বণে হজরত ছরওয়ারে
কায়েনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন, এ ‘ছওয়ারি’ (আরোহী) ও
ত ‘আচ্ছা’ (উত্তম) ।

এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) শৈশবকালে একবার ছদকার একটি খেজুর লইয়া মুখে নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন, আ হজরত (ছালঃ)-এর ঐ দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে ‘টুকিলেন’ (সাবধান করিলেন) এবং “ কখ্ কখ্ ” করিলেন,—ফরমাইলেন, তুমি কি জাননা, আমার খান্দানের কেহ ছদকা খায়না । এজন্যই ছৈয়দ বংশধরদিগের পক্ষে ছদকা ও খায়রাত গ্রহণ করা উচিত নয়, ‘নযর’ বা উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারেন ।

আবদুল্লাহ্-বিন্-আবদুর রহমান-বিন্ যবির (রাজিঃ) বলেন যে, আহ্লে বয়ত নবুবীর মধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ), আ হজরত (ছালঃ) এর সহিত শারীরিক গঠনে, ‘ছুরত শকলে’ (অঙ্গ-সৌষ্ঠবে) বহুলাংশে ‘মোশাবাহ্’ (তুলনীয়) ছিলেন । হজুর (ছালঃ) তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ‘পেয়ার’ করিতেন (ভাল বাসিতেন—স্নেহ প্রদর্শন করিতেন) । আমি অনেক বার দেখিয়াছি, জনাব রুহুলোল্লাহ্ (ছালঃ) নমাযে ছেজদায় থাকিতেন, ঐ সময় এমাম হাছান (রাজিঃ) আসিলে তাঁহার উপর ছওয়ার হইয়া যাইতেন । অনেক সময় এমনও হইত যে, হজুর (ছালঃ) যদি কুকুতে হইতেন, ত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার পবিত্র পদদ্বয় লেপ্টাইয়া ধরিতেন । হজুর (ছালঃ) পা ‘ফয়লাইয়া’ (বিস্তৃত করিয়া—প্রসারিত করিয়া) দিতেন, উদ্দেশ্য বাহাতে তিনি অল্প দিক দিয়া বাহির হইয়া যান ।

ছহি বোখারী গ্রন্থে য়োক্‌বাঃ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ‘গর্ত্বাঃ’ (একবার) জনাব হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) আছরের নমায্ আদায় করিয়া, হজরত আলী মরতুজাঃ (কঃ—ওঃ)-এর ‘হামরাহ্’ (সঙ্গে) মছজেদ হইতে বাহির হইলেন ; পশ্চিমধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন ; তিনি

পাক পাঞ্জতন (৭০৮) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

(হজরত ছিদ্দিক আকবর [রাজিঃ]), তাঁহাকে তুলিয়া স্কন্ধে লইলেন ; এবং বলিতে লাগিলেন, এই বালক ত ‘ছুরতে’ ও ‘শকলে’ (আকার প্রকারে ও শারীরিক গঠনে) হজরত রছুলে আকরম (ছালঃ)-এর অনুরূপ ; হে আলি ! আপনার ছুরত-শকলের সঙ্গে ইহার ছুরত-শকল (আকার প্রকার) মিলিতেছে না । হজরত আলী (রাজিঃ) একথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন ।

জামেয় তিরমযিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যন্তক হইতে ‘ছিনায়’ (বক্ষঃদেশ) পর্য্যন্ত, আর এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) বক্ষঃস্থল হইতে পবিত্র পা-মবারক পর্য্যন্ত, আ হজরত (ছালঃ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন ।

হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন আমি এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে দেখিয়া থাকি, তখন ‘ফরতে মোহব্বতে’ (স্নেহ-ভালবাসায়) আমার অশ্রুপাত হইতে থাকে । ইহার কারণ এই যে, এক দিবস জনাব হজরত ছরওরে আলম (ছালঃ) স্বীয় ‘দওলত খানাঃ’ (বাসগৃহ) হইতে বাহির হইলেন, আর মছ্জেদে আগমন করিলেন ; এবং আমার হস্ত ধারণ পূর্বক একদিকে গমন করিতে লাগিলেন ; ‘এহাঁতক’ (এই পর্য্যন্ত) যে, আমরা বনি কেন্কার বাজারের রাস্তায় মছ্জেদ নববীতে পহুছিলাম ; পশ্চিমধ্যে একস্থানে উপবেশন পূর্বক তিনি ফরমাইলেন, আমার বেটাকে ডাকিয়া আন । ইতিমধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) সেখানে দৌড়িয়া আসিলেন ; এবং আসিয়াই হজুরের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন । হজুর (ছালঃ) পুনঃ পুনঃ স্বীয় পবিত্র মুখ তাঁহার মুখে স্থাপন পূর্বক বলিতেছিলেন, খোদাওয়ান্দ ! আমি ইহাকে ‘পেয়ার’ করি (স্নেহকরি—ভালবাসি) ; আর যে কোনও ব্যক্তি ইহাকে পেয়ার করে, তাহাকেও আমি প্রিয় জ্ঞান করি ।

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, আমি হজরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামকে ইহা ফরমাইতে শুনিয়াছি যে, (ঐ সময় (এমাম) হাছন (রাজিঃ) তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন, তখন) তিনি এক একবার লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন, আর এক একবার তাঁহার (এমাম হাছন [রাজিঃ]-এর) প্রতি দেখিতেছিলেন, আর ফরমাইতেছিলেন, এটি আমার বেটা ও ছরদার; আশা করি আল্লাহ তা-লা ইহার দ্বারা মোছলমানদিগের দুই দলের মধ্যে ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি) করাইয়া দিবেন।

আছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ) হজরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে (আছামাঃ [রাজিঃ]-কে) ও এমাম হাছান (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইতেন, এবং ফরমাইতেন, হে “আল্লাহ্ ! আমি এই উত্তম বালককে দোস্ত (প্রিয়) রাখি; তুমিও ইহাদিগকে দোস্ত (প্রিয়) রাখিও।”

হজরত আনছ-বিন্-মালেক (রাজিঃ) বলিয়াছেন, ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেয়েদের সম্মুখে এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ‘ছের’ (মস্তক) মবারক আনিয়া এক ‘তশ্তে’ (খালা বা বাসনে) রাখা গেল। এব্নে যেয়েদ তাঁহার পবিত্র চক্ষে ও নাকে বেত্র দ্বারা আঘাত করিতেছিল; আর তাহার ‘খুব ছুরতি (সৌন্দর্য) সম্বন্ধে কিছু বলিতে (বিক্রম সমালোচনা করিতে) ছিল। হজরত আনছ (রাজিঃ) বলিলেন, ইনি সর্বাপেক্ষা রছুল খোদা (ছালঃ)-এর ‘মোশাবাহ্ঃ’ (আকার বিশিষ্ট বা নমুনা স্বরূপ) ছিলেন। হজরত এমাম হোছায়ন (রাজিঃ)-এর চুলে এবং দাড়িতে খেজাব লাগানো ছিল (সম্ভবতঃ মেহেন্দীর খেজাব হইবে)।

হজরত বরাঃ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত নবী করিম (ছালঃ)-কে দেখিয়াছি, একদা হজরত এমাম হাছন এব্নে আলী

(রাজিঃ) তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে ছিলেন ; তিনি সেই অবস্থায় ফরমাইতে ছিলেন,ঃ “ আয় আল্লাহ্ ! আমি ইহাকে দোস্ত রাখি ; আর তুমিও ইহাকে দোস্ত রাখ । ”

হজরত এব্নে ওমর (আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর—[রাজিঃ]) বলেন যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) বলিতেন, হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর ‘রেশামনি’ (রাজী থাকা—সম্বলিত থাকা) তাঁহার আহ্লে বয়েতের (পরিবারস্থ নরনারীর) ‘খেদমত’ ও ‘মহব্বত্’ (পরিচর্যা ও ভালবাসা)—ইহা বুঝিয়া লও ।

হজরত আনছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) অপেক্ষা, হজরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওছাল্লামের ‘মশাবাহ’ (আকৃতির আদর্শ—শারীরিক গঠনের নমুনা) আর কেহই ছিলেন না ।

এব্নে আবি নযীম (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার নিকট কোনও ব্যক্তি মোজরেমের (অপরাধীর) বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঐ মক্ষিকে যদি কতল (হত্যা) করা যার, তবে তাহা কেমন হয় ? হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ‘আহ্লে এরাক’ (এরাকবাসী) মক্ষি এর ‘কতল’ (হত্যা) এর মছলা জিজ্ঞাসা করিতে-ছিল, কিন্তু তাহারাই হজরত রছূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের ছাহেবযাদীর পুত্রকে ‘কতল’ (হত্যা) করিয়াছিল । আর হজরত নবী (ছালঃ) ফরমাইয়াছিলেন, ইহারা উভয়ে (এমাম ভ্রাতৃ-যুগল) আমার দিনের ‘আরায়েশ্’ (সৌন্দর্য)—(ছহীহ্ বোখারী) ।

শুকবি মাওলানা ছিমান ছিদ্দিকীর
একটি উর্দু কবিতা ।

তরবিয়ত্ আওলাদ কি হোতি হায় মঁ-কি গোদ মে,
মকতব আউওল হায় মঁ কি গোদ ওছমে শক নেহি ।
হৈয়দাঃ দেতিখি জেয়ছি তরবিয়ত্ আওলাদ কো ;
আজ হুন্ইয়া মে নেহি পয়দা নজীর ওছকি কহি ।
জব ছোলাতি থি কতি উওহ্ শবর (১) ও শবীর কো ;
আয়েতেয় পড়হ্ তে কালামে পাককী বাছদ একীন ।
ঝুটে ছাচ্ছে ওন্কো আফ্ ছানে নাঃ বিলকুল স্যাদ থে ;
লোরিয়ঁ ওন্কে কালামে পাক কী আয়াত থি ।
উওহ্ ডরাতি থি তো পড়হ্ তি থি উওহ্ আয়াতে পাক ;
আওর ছম্বাঠে তো কর্তি ওর্দে আয়াতে মবিন ।

এক দেন্ শবির ও শবর মে লাড়ারী হোগরী ;
আয়ে দোনো চিথ্ তে রোতে মচলতে বেকারার ।
ফের শেকায়েত্ দোছরী ভাইকী কী এক ভাই নে ;
দেখ্ হো আন্সাজান নারা হায় হামে বে-এখ্ তেয়ার ।
আপনে দোহুঁকো পহ্লে ছরছরি তছকিন দি ;
ফের কাহা “ বাচ্চু নহি থওফে খোদা কেয়া বিনুহার ? ”
উওহ্ তো কহ্ তা হায় কে আপছমে লড়ো ঝগড়ো নাঃ তোম,
আওর করো বরগা নাঃ ফেত্ নে লড়-ঝগড় কর বার বার ।

(১) হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ; (২) হজরত এমাম
হোছায়ন (রাজিঃ) ।

এহ্ছে কুচ্ মত্ লব নেহী তোম্ মেছে হায় কেছকী খাতাঃ ;
 ইঁ মগর আল্লাহ্ কে তোম্ হো গয়ো তক্ছির ওয়ায় ।
 আব্ বাতাও, দোগে কেয়া আল্লাহ কো এছ্ কা জওয়াব ;
 তোম্ছে জব্ পুছ্ছেগা উওহ্ এছ্ কা ছব্ব রোষে শোমার ।

মাঁকে কহ্ নেকা আছর বচ্চুঁকি দেল্ পর হো গেয়া ;
 ভুল্ বয়ঠে আপ্ নে তুফ্, খওফে খোদাছে রো দিয়ে ।
 কাপ ওঠ্ঠা জেছম্, লরবাঃ ছারে আযামে পড়া ;
 রো চুকে—তো ফাতেমাঃ যোহরা ছে ইউঁ কহ্ নে লাগে ।
 ইয়েহ্ খাতা বেশক্ হযী হাম্ নার্ তরফ ইঁয় আওর খজল ;
 আব্ তো ইয়েহ্ তক্ছির হক্ছে আফু করওয়া নিজিয়ে ।
 হোগী আয়েন্দাঃ নাঃ হাম্ছে আব্ কভি এরছি খাতা ;
 বায্ আয়ে ডয়গরে হাম্ গওফ্ আল্লাহ্ কে ।

আপ্ নে করনায়া—আচ্ছা জল্দতর কর লো ওজু ;
 আব্ তোম্ছে খোশ্ নোদয়ী মওলা আগার দরকার হায় ।
 ফের করো ছেজদাঃ দোওয়া মাক্কো কেঃ এয়া রবে গফুর ;
 আফুকর্ দে ইয়েহ্ খাতাঃ তু, তু বড়া ছত্তার হায় ।
 উওহ্ বড়া হায় রহম ওয়ালা উওহ্ বড়া হায় মেহেরবান ;
 আফু কার্ দেগা খাতা, ওছ্ কি বড়া ছরকার হায় ।
 আলগয়্ষ ছেজদাঃ মেঁ দোনো শাহ্ যাদে গের পড়ে ;
 আওর কাহা “এয়ারাবে আগ্ ফেরলি কেঃ তু গফ্ ফার হায় ।
 ছেজদাঃ ভি ছাত বাচ্চুঁকে থিঁ মছ্ রফে দোওয়া ;
 হায় মোয়ছর ইয়েহ্ রহে তাদিব কো দেশ্ ওয়ার হায় ।

বাচ্ছে ওয়ালা বিধিবয়ো ! তক্লিদ কর্নি চাহিয়ে ;
ইয়েহ্ : তরিকে আহ্লে বায়্ তে আহ্ মদে মোখ্ তার হায় ।

উপারোক্ত প্রসিদ্ধ কবির লিখিত
আর এক টি কবিতা (কনিষ্
যোহরা (রাঃ—আঃ))

মোরতজে কো হজরত বুবকর নে দি এক কনিষ্ ;
খুব ছুরত খুব ছিরত খোশ্ তবিরত খোশ্ জামাল ।
ফাতেমা কো জব হয় মালুম ছারা ওয়াকেন্না ;
আপ্কে দেল্ কো ছয়া করতে মহব্বতছে মলাল ।
ওম্মে এগিন আয়ি বয়তি, আওর পুছহা—হৈয়দাঃ ;
কেউ তবিরত ছোছ্ ত হায় চেহরা কেউ গম্ছে নড্ হাল ।
টাল্ কর্ খাতুনে জরত ছেপায়া রাযে দেল ;
ওম্মে এগিন কো ছয়া এহ্ ওয়াজে হছে ছদমাঃ কামাল ।
আওর কাহা কোরবান জারে মেরে ম' বাপ আপ্পর ;
বেছবব কেউ আপ্নে মুঝে ছেপায়া দেল্কা হাল ।
খোদ রছুলোম্মাহ্ কাহ্ দেতেথে মুঝে হালে দেল্ ;
রায়্দারি ছরওরে কওনায়েন হৌ আর খোশ্খ্ থুছাল ।
কহিয়ে কহিয়ে হালে দেলু আওর মন্ ও আন কহ্ হ ডালিয়ে ;
কেয়া আজব দেল্ছে তোমহারে ধো ছকৌ গরদে মলাল ।

কর্দিয়া ছব্ হৈয়দাঃ নে ওম্মে এমিন পর আয়ান ;
 আপ্নি শওহর আওর কনিযে নও রছিদাঃ কা খেয়াল ।
 ওম্মে এমিন লে গেঁরে তশরিফ্ নয্ দে মোরতযেঃ ;
 আওর দর পর হোকে এসেদাঃ কুচ্ এরছি কী মকাল ।
 এয়া আগি, রাখ্তে থে আহ্লে বয়েতকো হজরত আযিয্ ।
 আপ্নে কেওঁ ফাতেমাঃকে ছর পঃ ডালা হায় ওবাল ।
 আপ্কো লাযেম থি দেলজোয়ী বতুলে যার কি ;
 একহিতো উওহ্ রছুলোল্লাহ্ কী হায় নওনেহাল ।
 আল্গরজ শেরে খোদানে পুছ্ হি ওজেহ্ রজ্ ;
 ওঠ্কে হো বরঠে, ছোনা জব ওম্মে-এমিন কা ছওয়াল ।
 ওম্মেএমিন নে কেনায়ামে কাহে ছব্ ওয়াকিয়াত ;
 এয়ানে যোহরাঃ কো কনিয্ নওকা হায় বেহদ খেয়াল ।
 বোলে হায়দর, ওম্মে এমিন ! উওহ্ নেহী নেরি কনিয্ ;
 খাদেমাঃ যোহরাঃ কি হায় বে পশ ও পছ বে কিল ও কাল ।
 খাদেমাঃ জব্ ওন্কি হায় উওর উওহ্ নেহী নেরি কনিয্ ;
 তোম্ ওন্হিছে পুছ্ না, কেউকর হয়ী মুঝ্ পর মলান্ ।
 মায়' দেল যোহরা কো ছদমাঃ দৌ ইয়েহ্ হো ছেক্তা নেহি' ;
 ওম্মে এমিন ! হায় মুঝে উন্ছে ছওয়া ওন্কা খেয়াল ।

১০ দশম হিজরীতে হজুর ছরওয়ারে কারেনাত্ (ছালঃ) মদীনার
 পার্শ্ববর্তী সমুদয় জাতি ও সম্প্রদায়কে এতলাঃ (সংবাদ) দিলেন যে,
 আগি হজ্জ-যাত্রার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি ; যাহার যাহার এই পবিত্র
 ফরজ কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা হয় ; তাহারা আমার সঙ্গে গমন কর ।
 ঘোষণা প্রাপ্তে অসংখ্য জনসঙ্ঘ মদীনা-মনুওয়ার আসিয়া সমবেত

হইলেন । ২৫শে যিকাদাঃ (বেকদ) সোমবার দিন হজুর (ছালঃ) 'গোছল' (মাদ) করিয়া :শরীরে সূগন্ধি (আতরাতি) লাগাইলেন । ধোতবস্ত্র পরিধান করিলেন । তৎপরে বাদ জোহরের নমায, 'তরিক্-ওস্ত' অর্থাৎ শজরার রাস্তায় " যোল-হলিকাঃ " নামক স্থানে পহুছিলেন । এই হজ্জ্ যাত্রায় সমুদয় 'আয-ওয়াজ্ মতহরাত' (আ হজরতের আহ-লিয়া অর্থাৎ মোছলেম-মাতা)-গণ উষ্ট্রের হোদজে (হাওদায়) আরোহণ পূর্বক তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন । বিপ্লববাদী দিগের দমন জন্য হজরত আলী শেরে খোদা (ক—ওঃ) ইতিপূর্বেই এমনে গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহাকে সেইস্থানে সংবাদ পাঠান হইল যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), শেরে খোদা (কঃ—ওঃ)-এর অরুপস্থিতিতেই স্বীয় ওয়ালেদ বোয়রগোয়ার (মহাসম্মানিত পিতার) সমতিব্যাহারে হজ্জের নিয়ত করিয়া উষ্ট্রের হোদজে আরোহণ পূর্বক মক্কা-মোবাজ্জমার আগমন করিতেছেন । তাঁহারা পথিমধ্যে (মক্কা-মোবাজ্জমার অতি নিকটে)—যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ; হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এমন হইতে রওয়ানা হইয়া ঐস্থানে আসিয়া আ হজরত (ছালঃ)-এর কাকেলার সন্মিলিত হইলেন ; তিনি এমন হইতে কতিপয় উষ্ট্র আ হজরত (ছালঃ)-এর জন্য 'হাদিয়াঃ' (নজর) স্বরূপ আনিয়াছিলেন ।

হজরত হুরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ), হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), হজরত আলী শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) স্ব স্ব হাদিয়াঃ (কোরবানীর পশু) সঙ্গে আনিয়াছিলেন । কিন্তু ওম্মেহাতল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) ও হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে কোরবানীর কোনও পশু ছিল না । এজন্য জনাব বতুল (রাঃ—আঃ) এহ-রামের বাহির হইয়া 'মোহেল' হইয়া গেলেন ।

হজরত শেরেখোদা (কঃ—ওঃ) বখন তাঁহাকে রঙ্গিণ কাপড় পরিহিত এবং চক্ষে ‘ছোরমাঃ’ (স্মৃতি) লাগান অবস্থায় দেখিলেন, তখন নিতান্ত নারাজী (অসন্তুষ্টি) প্রকাশ করিলেন । জিজ্ঞাসার উত্তরে হজরত রতুল (রাঃ—আঃ) বলিলেন, আমাকে আমার ওয়ালেদ বোখরগোয়ার (ছালঃ) এহ্রাম ভাঙ্গিবার অনুমতি দিয়াছেন । আর আপনার আগমন সংবাদ পাইয়া আমি ‘বিনতের’ (সাজ-সজ্জা ও শৃঙ্গারের) বন্দোবস্ত করিয়াছি ; শরীরে সুগন্ধি লাগাইয়াছি, এবং নূতন ও রঙ্গিণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছি । তচ্ছ-বশে হজরত শেরেখোদা (কঃ—ওঃ), হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ)-এর খেদমতে এবিষয়ের ‘শেকায়েত’ (অভিযোগ) করিলেন ; এবং বলিলেন, তিনি (হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ) আপনার আদেশানুসারে ইহা করিয়াছেন, বলিয়া বলিতেছেন । হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, সে সত্য কথাই বলিয়াছে ।

হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) এপর্যন্ত এহ্রামের অবস্থায়ই ছিলেন ; তিনি এমন হইতে কোরবাণীর জন্য যে উট আনিয়াছিলেন, জনাব রেছালতমাব (ছালঃ)-এর সঙ্গে মিলিয়া ‘বচ্ছা’ (বড়শা বা বল্লম) ধারণ করিলেন, এবং উষ্ট্র ‘মহর’ (কোরবাণী) করিলেন । কোরবাণী কার্য সম্পন্ন করিয়া পয়গম্বর খোদা (ছালঃ), ‘খচ্চর’ (অশ্বতর) এ আরোহণ করিলেন, এবং শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে স্বীয় পশ্চাভাগে বসাইয়া লইলেন ।

হজ্জ “আল্বেদা” হইতে অবসর হইয়া জনাব রতুল খোদা (ছালঃ) ‘খন-গদর’ নামক স্থানে ‘মজ্জেল’ (গমন) করিলেন ; আর জোহরের নমাযের পর “ময়শ্শরল মোছলেমিন” (হজ্জ-প্রার্থী)-দিগের সম্মুখে (যাহাদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ছিল), একটি হৃদয়োন্মাদিনী ওজস্বিনী ‘খোত্বা পাঠ’ (বক্তৃতা প্রদান) করিলেন । সেই খোত্বায় ইহাও

ফরমাইলেন যে, আমি সত্বরেই ছুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিব ; তোমাদের মধ্যে ‘দো-চিষ্’ (দুইটি জিনিষ) রাখিয়া যাইতেছি—যাহার ‘য়েষ্যত’ (সম্মান) একজনকে অপর জনা হইতে অধিক পরিমাণে করা ‘লাবেম’ (কর্তব্য) । (১) কোরআন মজীদ ; আর (২) আমার নিজের ‘আওলাদ’ (বংশধর)—অর্থাৎ (হজরত) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ । ইহাদের প্রতি সীমাতীত ‘এহ্তেরাম’ (সম্মান) প্রদর্শন করিবে । এন্শাল্লাহ ইহারা পরস্পর ‘জুদা’ (স্বতন্ত্র) হইবে না । এ উভয়ের মধ্যে ‘এন্তেহাদ’ (একতা—সম্মিলন) থাকিবে । কেয়ামতের দিন ইহারা উভয়ে ‘হাওজ-কওছরে’ আমার সঙ্গে সম্মিলিত হইবে । খোদাওয়ান্দু তোলা আনার ‘মাওলা’ (প্রভু), আর আমি প্রত্যেক দিনদার ব্যক্তির ওলী । তৎপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর হস্তধারণ পূর্বক এরশাদ ফরমাইলেন, আমি যাহার ওলী, আলী ও তাহার ওলী । হে পরম করুণাময় খোদাওয়ান্দাঃ ! আলী (কঃ—ওঃ) যাহার ওলী হইবে, তুমি তাহার ‘মহাকৈজ’ (তত্ত্বাবধায়ক) ■ ‘নেগাহ্ বান’ (রক্ষক—প্রহরী) থাকিও । আর যে ইহার সঙ্গে ‘আদাওত’ (শত্রুতা) রাখিবে, উহার প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত ‘গযব’ (ক্রোধাগ্নি) বর্ষণ ‘নাঘেল’ (অবতীর্ণ) রাখিবে ।

ফদকের মোস্তামেলা ।

হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ ‘খাতুনে মহশর’, হজরত রেছালমাব ছালঃ)-এর ছাহেববাদী (ছহিতা-রত্ন) ছিলেন । ‘শাফেয়ে রোফ

‘মহশর’ (হাশরের দিনের ছোফারেশ্কারী—পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ তা-লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাকারী)—অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ্জতবা (ছালঃ)-এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না; একমুহু হজুর (ছালঃ) এই কন্যা-রত্নের প্রতি পুত্র সন্তানের স্থায় স্নেহ প্রদর্শন করিতেন । তজ্জম্ব সকল মোহলমানই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখাইতেন । ইহা অবশ্য ঐ হজরত (ছালঃ)-এর আছরের ‘ছবব’ (কারণ) ছিল । কোরেশগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সঙ্গে স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র বিবাহ কার্য সম্পন্ন হওয়া, তাঁহার (শেরেখোদা হজরত আলীর) ‘কখরের’ (গোরবের) অন্ততম কারণ ছিল । একথা ‘মশ ভর’ (প্রসিদ্ধ) আছে যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর প্রভাবেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ছয় মাস পর্য্যন্ত ১ম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর হস্তে বার্ময়েত করিয়াছিলেন না; আর যখন বিস্তে রছুল (পরগম্বর-নন্দিনী)-এর পরলোক প্রাপ্তির পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ‘তাকত’ (শক্তি), ‘কুওত’ (বল) এবং আছর (প্রভাব) কম হইয়া গেল, তখন তিনি মহামান্ন প্রথম খলিফার হস্তে বার্ময়েত করিলেন । বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক-সিদ্ধান্ত অনুসারে এই কথাটি ‘গলৎ’ (ভুল—ভ্রমপূর্ণ) ; কারণ হাদীসবেত্তা ও ইতিহাসবেত্তাদিগের সত্যানুসন্ধানে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ হজরত (ছালঃ) এর পরলোক গমন এবং হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ গ্রহণের অতি অল্পকাল পরেই হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মহামান্ন খলিফার হস্তে বার্ময়েত করিয়াছিলেন । তবুও উপরোক্ত রওয়ায়েত অনুসারে এবিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তদানীন্তন ছাহাবাঃ কারাম

(রাজিঃ)-গণও মোছলমান জন-সাধারণ, স্বর্গ-রাজ্যী হজরত বতুল
 (রাঃ—আঃ)-এর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রতি কিরূপ অসাধারণ
 ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; এই ১৩ শত বৎসর মধ্যে
 মোছলমানদিগের মধ্যে শত শত বিভিন্ন মতবাদের ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি
 হইলেও, আজ পর্যন্ত কোনও সম্প্রদায়ই—তা তাহারা বে মজহাবামলম্বীই
 হউক না কেন, হজরত খাতুনে জন্নত ও খাতুনে মহশর (রাঃ—আঃ)-এর
 প্রতি কোনও রূপ বেআদবী এবং অভক্তি প্রদর্শন করে নাই । ইহাও
 খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর এক আশ্চর্য্য মওজেবাঃ ও অপূর্ব্ব
 কারামত যে, এই সুদীর্ঘ তেরশত বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে তিনি
 প্রত্যেক মনুষ্যের ‘গোস্তাখানা কালাম’ (বে-আদবী-সূচক বাক্য)
 হইতে ‘মোবররা’ (বিমুক্ত) রহিয়াছেন । আর এনশান্নাহ্ কেয়ামত
 পর্যন্ত এইরূপ নিন্দাবাদের অতীত অর্থাৎ বিমুক্ত থাকিবেন । যদি হজরত
 কাছেম (রাজিঃ) কিংবা হজরত এবরাহিম (রাজিঃ) জীবিত থাকিতেন,
 তবে হয় ত তাঁহার (হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রাঃ—আঃ]-এর) প্রতি
 হজুর (ছালঃ)-এর স্নেহ ও ভালবাসার আত্ম হাস পাইত । কিন্তু
 ‘আল্লাহ্ তালার ইহা ইচ্ছা ছিল না ; তিনি ‘রোযে আযল’ (অদৃষ্ট-
 লিপি নির্ধারণের দিন), ‘ফথ্-রে দোজাহান’ (হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা
 আহমদ মোজতবা [ছালঃ]) স্বীয় পূর্ণ ‘মোহাব্বত’ (স্নেহ-ভালবাসা)-
 এর সম্পূর্ণ অংশ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে দিয়া-
 ছিলেন । এই অতুলনীয় ও অখণ্ড স্নেহ-ভালবাসার কোনওরূপ
 ‘তক্ছিম’-(ভাগ-বাটোয়ারা) হইবার উপায় ছিল না ।

ফদকের হেবাঃ (দান) ও ‘মিরাহ্’ (মৃত ব্যক্তির মাল—যাহা
 উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হন)-এর ‘মছলাঃ’ বা আলোচ্য বিষয় এমন গুরুতর
 ব্যাপার ছিল না, যে রূপ : গুরুত্ব ইহাকে দেওয়া হইয়াছে । আ হজরত

(ছালঃ)-এর জীবনের এই একটি ব্যাপার—যাহাতে মোছলমানদিগের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইয়া মহানতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে ; এবং এক সম্প্রদায় ইহার গুরুত্ব বাড়াইতে বাড়াইতে সীমা অতিক্রম পূর্বক বিষয়টিকে একটি মহাজটিল সমস্যায় পরিণত করিয়াছে । এই সামান্য ব্যাপারটিকে একটা ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া প্রধানতঃ শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বহু কেতাব লিখিয়াছেন, এবং অবশ্য কাগজ ও কালী খরচ করিয়াছেন । ফদক একটি ক্ষুদ্র পল্লী ; যাহা খয়বর বুক হইতে আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রত্যাবর্তন কালে তাঁহার হস্তগত হইয়া, তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল ; মহামান্য পিতার ত্যজ্য সম্পত্তি বলিয়া হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) প্রথমে তাহা দাবী করিয়া থাকিবেন । কিন্তু ১ম খলিফা হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) এই বলিয়া তাঁহার দাবী অগ্রাহ করেন যে, আশিয়া আলায়-হেচ্ছালাম দিগের মিরাজ তাঁহাদের উত্তরাধিকারী দিগের মধ্যে ভাগ-বণ্টন হয় না ; উহা সাধারণের সম্পত্তিতে পরিগণিত হয় । প্রকৃত ব্যাপার এইটুকুই হইবে ; কিন্তু ইহা লইয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং মহামান্য খলিফা বা তাঁহার মত সমর্থনকারী প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) যথা :— হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) প্রভৃতির মধ্যে কোনও রূপ মনোবাদ হইয়াছিল না । যদি তাহাই হইত, তবে প্রামাণ্য ইতিহাসে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত । হাদীছ বর্ণনাকারী বিজ্ঞ ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ তাহা রওয়ায়েত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না । খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পার্শ্বিক অর্থ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের আকাজিকনী ছিলেন না । তবে পিতার ত্যজ্য সম্পত্তিতে তাঁহার হক আছে বলিয়া তিনি ফদকের দাবী করিয়াছিলেন ; ১ম খলিফা মহাপ্রাজ্ঞ হজরত আবুবকর সিদ্দিক

(রাজিঃ)-এর যুক্তি-সঙ্গত উক্তি, আ হজরতের বর্ণিত হাদীছ শুনিয়া তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না । শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও এ বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি করেন নাই । মহামান্ন খলিফার সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র মন কষাকষি হইয়াছিল না । তিনি মহামান্ন খলিফার মজল্লা-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন । প্রত্যেক গুরুতর রাজনীতিক বিষয়ে, শরিয়তের বিধি-ব্যবস্থার তিনি তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন । তিনি অনেক সময়ই মহামান্ন খলিফার মহা দরবারে উপস্থিত থাকিতেন । এ ব্যাপারে হজরত ফারুক আজম (রাজিঃ)-এর প্রতি হজরত শেরেখোদা (কঃ—ওঃ)-এর, অধিকতর মনোবাদ হওয়া সম্ভবপর ছিল ; কারণ তিনিই মহামান্ন আমিরুল মুমেনিন-খলিফাতুল মোছলেমিনের প্রধান মন্ত্রী স্বরূপ কাজ করিতেন ; এবং তাঁহার প্রধান পরামর্শ-দাতা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রতি হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর এতটা বাধ্য-বাকতা সহানুভূতি ছিল যে, তিনি তাঁহাকে স্বীয় কল্যা-রত্ন দান করিয়া, তাঁহাকে জামাতা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । সুতরাং শিয়াদিগের এই বাড়া-বাড়িটা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । স্বর্গ-রাজ্যী হজরত বিবী ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যদি অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সম্পদের আকাঙ্ক্ষিনী হইতেন, তবে পৃথিবীর বিপুল ঐশ্বর্য্য তাণ্ডারের দ্বার তাঁহার জন্ত খোলা ছিল ; কিন্তু তিনি উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সর্বদা উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেন । স্বীয় জীবনে কখনও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই । মহামান্ন ওয়ালেদ মাজেদের পবিত্র উপদেশাবলী তাঁহার পাক হৃদয়-ফলকে গভীরভাবে অঙ্কিত ছিল । সে অনুপম স্বর্গীয় উপদেশাবলী তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই ।

খাতুনে জব্বত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ‘ছবর’, ‘শোকর’—ঐশ্বর্য্য-সহিষ্ণুতার কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না । তারপর

খোদাপরস্তির ত কোন তুলনাই নাই । ছনিয়াবী লোভ-লালসা তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র দেখা যাইত না । তিনি ত দরিদ্রতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন । মহামানবীয় পিতার অমূল্য উপদেশাবলী তাঁহার হৃদয়-ফলকে সুবর্ণাকরে অঙ্কিত ছিল । তাঁহার দানের হস্ত এত প্রসারিত ছিল যে, কোন ‘ছায়েল’ (ভিক্ষুক) তাঁহার দরওয়াজা হইতে কখনও রীক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই ; তিনি নিজে অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধাত্তের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছেন । এরূপ ক্ষেত্রে তিনি এক টুকরা সামান্য যমিনের ■■■ যে মহামানব থলিফার আদালতে দৃঢ়তার সহিত অভিযোগ উপস্থিত করিবেন, সামান্য জ্ঞানেও ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না । পরম ভক্তি-ভাজন ওয়ালেদ মাজেদের এন্তেকালে (পরলোক গমনে) তিনি এমনই শোকাকুলিত হইয়াছিলেন যে—অন্য ভাবনা, অন্য চিন্তা, অন্য খেয়াল তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না । তিনি শোকাক্ত হৃদয়ে অনবরত নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেন । ‘ছনিয়াবী’ (পার্থিব) চিন্তা বা খেয়াল সেই সময় মধ্যে তাঁহার ভিতর আত্ম-প্রকাশ করিবার কোন সুযোগই লাভ করে নাই । তিনি যে একবার ফদকের ■■■ দাবী করিয়া ছিলেন ; তাহা এছলামী শরিয়তের—উত্তরাধিকারী-বিধানের সাধারণ নিয়মানুসারেই করিয়া থাকিবেন ; কিন্তু মহামানব থলিফা ও অজ্ঞান প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের উক্তি অনুসারে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, পয়গম্বর দিগের সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, উহা সাধারণের সম্পত্তি ; তখন আর বিরুদ্ধি বা উচ্চবাচ্য করেন নাই । ঐতিহাসিক হিসাবে এই টুকুই সত্য বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু শিয়া ছাহেবান ইহাতে রং চড়াইয়া ব্যাপারকে অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন ; কাজেই ছুরত জামাতের আলেমদিগকেও উহার উত্তর দিতে গিয়া অনেক কথা বলিতে হইয়াছে—

অনেক দলিল ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে । শিয়াঃ ছাহেবদিগের উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, মহামাননীয়া খাতুনে জম্মত (রাঃ—আঃ)-কে অতি লোভী, অতি স্বার্থপর, অতি ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ বিশিষ্টা, পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি একান্ত লালসা-সম্পন্ন প্রভৃতি সাধারণ ~~লোক~~ যুক্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু তিনি এই সকল দোষ হইতে সম্পূর্ণ পাক (পবিত্র) ছিলেন । তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সকল বিষয়ের খেয়াল মনে স্থান দেওয়া ও জীবন্ত পাপ । ইহা দ্বারা তাঁহার পবিত্র চরিত্রে দোষারোপ করা হয় । খোদা মোছলমান মাত্রকেই ঐ সকল অমথা ধারণা হইতে দূরে রাখুন ।

—

ফদক কোথায় অবস্থিত ?

“ কামুছ ” নামক বিখ্যাত আরবী অভিধানে লিখিত হইয়াছে, “ ফদক খয়বরের একটি পল্লীগ্রাম । ” “ মেহবাহল লোগাত ” নামক অভিধানে বর্ণিত হইয়াছে, “ উহা একটি ‘বলদাঃ’ (বস্ত্র) — মদীনা তৈরবাঃ হইতে ২ দিনের পথ দূরে অবস্থিত, আর খয়বর হইতে ১ ‘মঞ্জেল’ দূরবর্তী । ” আবার “ লেছানল্-আরব ” গ্রন্থে লিখিত আছে, “ ফদক ” “ হেজাযে অবস্থিত একটি গ্রাম । ” আবার বহরী বলেন, “ ফদক একটি গ্রাম খয়বরে অবস্থিত । কেহ কেহ বলেন, উহা হেজায প্রদেশের প্রান্তবর্তী একটি গ্রাম ; উহাতে পানীর চশমাঃ ও খেজুরের বাগান ছিল ; খোদা তোলা উহা স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি উহা “ফয়” ■ করিয়াছিলেন । ” আর “ মেরাছাদাল

■ ‘ফয়’ ঐ ‘গনিমত’ (লুটের মাল বা লুটের দ্রব্য) ও ‘খেরাজ্জ’

আতুলার আলী আছমা আলী কাস্তাঃ ওয়াল্-বকায় ” নামক গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় (যাহা জর্মনিতে মুদ্রিত হইয়াছে) লিখিত আছে, “ ফদক হেজাজের একটি গ্রাম মদীনার পথে অবস্থিত এবং মদীনা হইতে উহা ২।৩ দিনের পথ দূরবর্তী । আর উহা খোদা তা-লা স্বীয় রছুল (ছালঃ)-কে ‘ফয়া’ করিয়াছিলেন । একজ্ঞ ইহা ‘ছোলেহান্’ (বিনা যুদ্ধ বা বিনা জেহাদে) হস্তগত হইয়াছিল । ইহাতে ‘চশমাঃ’ (ঝরণা বা নিঝরিণী) এবং খেজুরের বাগান ছিল । ” আবার “ ময়জমল বোলদান এয়াকুত হমুয়ী ” গ্রন্থে লিখিত আছে, “ ফদক নামক গ্রামটি হেজাজ প্রদেশে অবস্থিত, উহা মদীনা হইতে ১ দিনের পথ দূরবর্তী । ” কোনও কোনও রওয়ায়েত অনুযায়ী ৩ দিনের পথ দূরবর্তী । এই গ্রাম হেজরতের ৭ম বর্ষে আব্দুল হজরত (ছালঃ)-এর হস্তগত হইয়াছিল । আর ইহাতে পানীর ‘চশমাঃ’ (নহর—ঝরণা) এবং খেজুরের বাগান ছিল । ছহিহ্ বোখারীর শরাহ্ ফত্ হল বারির ৬ষ্ঠ ‘জেল্দে’ (খণ্ড) লিখিত আছে যে, “ ফদক একটি কছবাঃ (ক্ষুদ্র শহর)-এর নাম । ইহা মদীনা হইতে ৩ দিলেন পথ দূরবর্তী । ” উপরের বিভিন্ন বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ফদক একটি সাধারণ মওজাঃ বা গ্রাম মাত্র ; উহা কোনও ‘কছবাঃ’ নহে । আর এই গ্রামের চতুঃসীমাও অন্যান্য গ্রামেরই মতন । আব্দুল হজরত (ছালঃ) এই গ্রাম স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ইহার ‘এন্তেজাম’ (বন্দোবস্ত)-এর ভার ঐ সকল লোকের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন—যাহাদের নিকট

(যমিনের খায়ানাঃ)-কে বলে, যাহা মোছলমানগণ বিধর্মী লোকদিগের নিকট হইতে জেহাদ ও যুদ্ধ ব্যতীত প্রাপ্ত হন । খয়বরের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে আব্দুল হজরত (ছালঃ) বিনা যুদ্ধে এই ভূখণ্ড লাভ করিয়াছিলেন ; এবং উহা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার অংশে পড়িয়াছিল ।

হইতে ‘ছোলেহান’ (আপস-নিষ্পত্তির সহিত) উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, ঐ গ্রামের ষমিনে যে ‘ফছল’ (শস্য) উৎপন্ন হইবে, উহার ‘নেছ্ ফ্’ (অর্দ্ধাংশ) উহারা গ্রহণ করিবে, আর অর্দ্ধাংশ আঁ হজরত (ছালঃ)-কে প্রদান করিবে । ঠিক আমাদের দেশের আধিভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ বর্গাভাগের বন্দোবস্তে দেওয়া হইয়াছিল । এই ‘ফয়ছলাঃ’ (মীমাংসা) অনুযায়ী প্রতি বৎসর কতিপয় লোক আঁ হজরত (ছালঃ) তথায় প্রেরণ করিতেন, এবং তাঁহারা ভাগ করিয়া হজরত পয়গম্বর (ছালঃ)-এর অর্দ্ধাংশ হিসাব মতন লইয়া আসিতেন । যে শস্য ফদক হইতে পাওয়া যাইত, আঁ হজরত (ছালঃ) উহার কিয়দংশ স্বীয় পরিবার বর্গের ভরণ পোষণের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ মোছলমান-দিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন ।

**ফদক কিরুতশে আঁ হজরত (ছালঃ)-
এর অধিকারে আসিয়াছিল ।**

“ ফৎহোল বারি ” গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে, ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, বহু আছহাব, (রাজিঃ) ফদক ‘কব্ জায়’ (অধিকারে) আসিবার বিবরণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফদকের অধিবাসিগণ যিহুদী ছিল । যখন খম্ববর মোছলমানদিগের দ্বারা বিজিত হইল, আঁ হজরত (ছালঃ) সদলবলে মদীনাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন, পশ্চিমধ্যে আরও কতিপয় জনপদের যিহুদী অধিবাসিগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল ; ঐ সময় ফদকের কতিপয় প্রতিনিধি আসিয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর

পাক পাঞ্জতন (৭২৬) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

খেদমতে প্রার্থনা জানাইল যে, আপনি আমাদিগকে ‘আমন’ (শান্তি) প্রদান করুন, আমরা আমাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অত্র চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি । আবু দাউদ (রহঃ), যহরী (রহঃ)-এর রওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন যে, খয়বরের কতিপয় অধিবাসী ‘কেলাঃবন্দ’ হইয়া (দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর হজুরে প্রার্থনা জানাইল যে, আমাদের ‘খুন’ (মৃত্যু দণ্ডের ব্যবস্থা) ‘মাক্কাফ্’ (ক্ষমা) করিয়া, আমাদিগকে আমাদের বাসভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিন ; তদনুসারে আঁ হজরত (ছালঃ) তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন ; ফদক বাসিগণ ও আপনাদের গৃহদ্বার পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র প্রস্থান করিল । আবু দাউদ (রাঃ), এবনে শহাব (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ) যখন অবশিষ্ট খয়বরবাসীদিগের বাসস্থান অবরোধ করিয়াছিলেন, ঐ সময় তম্বিকটবর্তী ফদক এবং আর কয়েকটি গ্রাম বা জনপদের অধিবাসিদিগের সঙ্গে ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি) হইয়া গিয়াছিল । নেছরে মুদ্রিত তফ্ছির কবীরের ২৭১ পৃষ্ঠায় “ ওমা ফাল্লাহ-আলা রছুলেহী মিন্‌হম ” এই পবিত্র আয়াতের ‘শানে নযুলে’ লিখিত আছে যে, এই আয়াত ফদক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল । এই জন্য এই আয়েত নাযেল হর যে, ফদকের অধিবাসিগণকে ‘জালাওতন’ (নির্বাসিত) করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । আর উহাদের সমস্ত গাঁও (গ্রাম—পল্লী) এবং সামগ্রী-সত্তার বিনা যুদ্ধে হওরত রছুলোলাহ্, ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওছাল্লান্নের হস্তগত হইয়াছিল । ফদকের প্রাপ্ত ‘গল্লা’ (শস্ত) হইতে আঁ হজরত (ছালঃ) নিজের এবং পরিবার বর্গের খরচোপযোগী অংশ গ্রহণ পূর্বক, অবশিষ্টাংশ দ্বারা যেহাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন ।

এমান আবুল আব্বাছ আহমদ বিন্-ইয়াহিয়া বালামোরী (রহঃ)

“ ফতুহুল-বলদান ” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আছামাঃ বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), এব্নে শহাব (রাজিঃ) হইতে, আর তিনি মালেক-বিন্-আওছ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, ২য় খোলাফায়ে রাশেদীন হজরত ওমর বিন্-আল্ খাত্তাব (রাজিঃ) বলিয়াছেন যে, হজরত রহুল (ছালঃ)-এর তিন ছফায়া (ছফায়া উহাকে বলে, যাহা এগাম অর্থাৎ নেতা ‘মালে-গনিমত’ (যুদ্ধ বা সন্ধি-লব্ধ সম্পত্তি বা সামগ্রী-সম্ভার হইতে নিজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া লেন) ছিল । প্রথম, বনি-নজীরের মাল ; দ্বিতীয়, খয়বরের মাল ; তৃতীয়, ফদকের মাল । বনি-নজীরের ‘মাল’ (সম্পত্তি) আ হজরত (ছালঃ) স্বীয় প্রয়োজন সাধন জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন ; ফদকের উপস্থিত মোহাকের (প্রবাসী)-দিগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ; আর খয়বরের উপস্থিত ৩ ভাগ করিয়া দুই অংশ নোছলমানদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন ; আর এক অংশ স্বীয় ব্যক্তিগত খরচ-পত্র নির্বাহ এবং পরিবার বর্গের ব্যয়-ভরণ জন্য ‘মহ্-ফুজ্জ’ (স্বতন্ত্র—সংরক্ষিত) করিয়া লইয়া ছিলেন । আ হজরত (ছালঃ)-এর পরিবার বর্গের খরচ-পত্র নির্বাহ হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, উহা ফকীর (ভিক্ষা-জীবী) এবং ‘মোহাজেরীন’ (দেশত্যাগী—হেজরতকারী) নোছলমানদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন (দেখুন জম্মানিতে মুদ্রিত “ ফতুহুল বোলদান ” গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠা) ।

ঐ গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, লোকেরা বলিয়াছেন, আ হজরত (ছালঃ) পরবর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, মহহিছাঃ-বিন্-মহুউদ-আনহারী (রাজিঃ)-কে ফদক বাসীদিগের নিকট এছলাম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন । ফদকের ‘রযীছ’ অর্থাৎ দলপতির নাম ছিল, যিহুদী ধর্মাবলম্বী ইউশয়-বিন্-রুন । যিহুদিগণ ‘নেছফ্ হেচ্ছাঃ’ (অর্দ্ধাংশ) ষমিনের (ভূ-সম্পত্তির) উপর হজরত রহুলোলাহ্ (ছালঃ)-এর স্বত্ব স্বীকার

পূর্বক সন্ধি-বন্ধন করিয়া ছিল। মোছলমান যোদ্ধৃপুরুষ দিগকে এক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে বা অস্ত্র চালনা করিতে হইয়াছিল না বলিয়া, ইহা খাছ রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর অংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যে সকল ‘মোছাফের’ (বিদেশী—প্রবাসী) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের আহাঙ্গাদি খরচ-পত্র নির্বাহের জন্য ফদকের উপস্থত্ব ব্যয়িত হইত। উহার মিহদী অধিবাসিগণ হজরত ওমর ফারুক (রাজি)-এর খেলাফত-কাল পর্যন্ত ঐস্থানে বাস করিতে ছিল। কিন্তু তিনি অবশেষে পবিত্র হেজাজ-ভূমি-হইতে মিহদিদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। মহামান্য খলিফা (রাজিঃ), আবু আল্ শামি মালেক-বিন্-তয়হান, সহল-বিন্-আবি খছিমাঃ এবং যয়েদ-বিন্-ছাবেত্ আনছারী (রাজিঃ)-কে ফদকে পাঠাইলেন ; তাঁহারা উহার ‘নেছফ্’ (অর্ধেক) যমিনের (ভূমির) স্থায় সঙ্গত মূল্য নির্ধারণ পূর্বক মিহদিদিগকে প্রদান করিলেন ; আর শাম (সিরিয়া) প্রদেশে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন (দেখুন, জর্মনিতে মুদ্রিত “ ফত্-হল বোলদান ” গ্রন্থ ২৮ পৃষ্ঠা)। প্রায় এইরূপ বিবরণই প্রসিদ্ধ ইতিহাস “ তব্-রি ” এবং “ তারিখ কামেল আছির ” এ ও লিপিবদ্ধ আছে।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রতিপন্ন ও প্রমাণিত হইতেছে যে, ‘ফয়্’ এর মাল ও গণিমতের মালে (যুদ্ধ-বিজয় জনিত অর্থ বা সম্পত্তিতে) কেবলমাত্র এই পার্থক্য রহিয়াছে যে, যুদ্ধ জয়-লব্ধ সাধারণ মালে যেমন যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের অধিকার ছিল, ফয়্ এর মালে তাঁহাদের সে অধিকার ছিল না ; ইহা আ হজরত (ছালঃ)-এর ‘খাছ’ অধিকার ভুক্ত ছিল। তিনি মতওল্লি রূপে এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিতেন। আর খোদা তা-লার আদেশ এবং ‘মরজী’ (অতিপ্রায়) অনুযায়ী ইহা ব্যয় করিতেন। আ হজরতে (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পরে ইহা

মহামান্ন খোল্ফায় রাশেদিনগণ এবং অন্তান্ত খলিফাগণের অধিকার ভুক্ত হয় । উদ্দেশ্য, তাঁহারাও ঐ সকল (দান-খায়রাত, অতিথি-সেবা প্রভৃতি) কার্যে উহা ব্যয় করেন—যেদূর আঁ হজরত (ছালঃ) নিজে করিতেন । ইহা দ্বারা এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে ‘ফয়্’ এর মাল তাঁহার এরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না যে, তাহা উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ভাগ-বন্টন হইবে ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ফদকের উপস্থিতি হইতে কিয়দংশ আঁ হজরত (ছালঃ) স্বীয় ব্যক্তিগত খরচ-পত্রে ব্যয় করিতেন, কিয়দংশ পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণে পর্য্যবসিত হইত, অবশিষ্টাংশ ‘রাহী মোছাফের’ (অতিথি অভ্যাগত—বিদেশ হইতে আগত প্রবাসী)-দিগের আহাৰাদি এবং দান কার্যে ব্যয় করা হইত ; এক্ষণে তাঁহার পরলোক গমনের পর কোনও কোনও ‘মোফ্ছেদ’ (হয় ত মোনাফেকদিগের গুপ্ত দল), এছলামের অসাধারণ উন্নতি দর্শনে উহার ক্ষতি সাধন মানসে হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে বুঝাইয়া ছিল যে, ফদক আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি । আর আপনি তাঁহার একমাত্র কন্যা-রত্ন ও উত্তরাধিকারিণী ; সুতরাং উহার ‘ওয়ারেছ’ আপনি ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না । বিরুদ্ধবাদী দলের বক্তব্য এই যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেলাফতের প্রারম্ভে, হজরত খাতুনে — ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, আর স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদের উত্তরাধিকারী হুত্রে ফদকের দাবী কোরআন মজীদে এই আয়েত দ্বারা করিলেন ; যাহার অর্থ এই যে, “ তোমার আওলাদের ‘হেচ্ছায়’ (অংশে) পিতার ত্যজ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে এই আদেশ দিতেছেন যে, এক পুত্রকে দুই কন্যার সমান অংশ প্রদান কর । ” মহামান্ন খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-কে তাঁহার দাবীর উত্তরে বলিলেন, পরগণ্বরদিগের

পাক পাঞ্জতন (৭৩০) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

‘মালে’ (অর্থ-সম্পত্তিতে) ‘ওয়ারেছে’ (উত্তরাধিকারিত্বের) দাবী জারী হইতে পারে না (অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা) । এই কথা শুনিয়া হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর প্রতি নিতান্ত নারাজ হইয়া চলিয়া গেলেন ; আর মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই ।

‘মহক্কিন’ (অমুসন্ধানকারী—ঐতিহাসিক তত্ত্বামুসন্ধিৎসু)-দিগের ‘রান্ন’ (মত) এবং আমাদিগের জ্ঞান বিশ্বাস মতে নিম্ন-লিখিত হাদীছের মর্মানুযায়ী (হাদীছঃ)—“আমাদের—পয়গম্বরদিগের মালে ‘ওয়ারেছ’ (উত্তরাধিকারী) নাই ; আমরা বাহা কিছু (ধন-সম্পত্তি) ছাড়িয়া যাই, উহা খোদার পথে ছদকাঃ [দাতব্য] ” ইহা নিতান্ত ‘ছহী’ (সন্দেহ বর্জিত) ; পয়গম্বর (ছালঃ ও আলাঃ)-দিগের অনেক বিষয়ই সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র ; যথা :—বহু বিবাহ ইত্যাদি) । এই হাদীছের বিষয় হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) না ও জানিতে পারেন, সুতরাং তিনি শরীয়তের সাধারণ ব্যবস্থানুসারে ফদকের দাবী করিতে পারেন, কিন্তু হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), আ হজরত (ছালঃ)-এর উক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন না, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মানুবর্তী ও পদানুসরণকারী ছিলেন ।

খয়বর যুদ্ধ সম্বন্ধে হাদীছের মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকাঃ (রাঃ—আঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, “বিস্তে-রহুল ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) কোনও ব্যক্তিকে (খলিফা) হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেদমতে পাঠাইলেন, এবং মদীনাঃ, ফদক ও খয়বরের ‘খম্ছ’ (এক পঞ্চমাংশ)—বাহা হজরত রহুল্লাহ (ছালঃ)-এর পরলোক গমনের পর অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল, আপনার প্রাপ্য অংশ বলিয়া পাইবার দাবী করিলেন ;

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজি:) উত্তরে বলিলেন, হজরত রহুলোলাহ্ (ছাল:) ফরমাইয়া গিয়াছেন, আমাদের পয়গম্বরদিগের 'মালে' (তাজ্য-সম্পত্তিতে) ওয়ারেছ (উত্তরাধিকারী) নাই । আমরা বাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তাহা খোদার 'রাহে' (পথে) ছদ্কা: (দাতব্য) । অবশ্য ঐ হজরতের বংশধরগণ এই মাল হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় খরচ পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন । আল্লাহ্ তাঁ-লার শপথ, আমি এ বিষয়ে (ঐরূপ খরচ-পত্র প্রদানে) একটুও বিলম্ব করিব না । আর যে রূপ 'তছররোফ্' (আধিপত্য) ইহাতে হজরত রহুলোলাহ্ (ছাল:) করিতেন, আমিও ঐরূপই করিব ; যখন হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজি:) অংশ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ; তখন হজরত ফাতেমা: যোহরা: (রা:—আ:) নারাজ হইলেন ; এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করিলেন না । ”

এই ঘটনা দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, হজরত ছিদ্দিক আবুবকর (রাজি:) যে রূপ আদেশ হজরত রহুল করিম (ছাল:) হইতে পাইয়া-ছিলেন, তদনুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে বাহা করিতে দেখিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন । হজরত ফাতেমা: যোহরা: (রা:—আ:)-এর সঙ্গে তাঁহার কোনও 'বোগ্জ' (হিংসা-দেষ) বা 'আদাওত' (শত্রুতা) ছিল না ; বরং হজরত রহুলোলাহ্ (ছাল:)-এর অতি মেহেরপাতী কন্যা-রত্ন বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ মেহ ও সহানুভূতিই প্রদর্শন করিতেন । স্বীয় দীক্ষা-গুরু এবং খোদার রহুলের প্রতি তাঁহার কিরূপ অপরিমিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । ঐ হজরত (ছাল:)-এর তাক্ক সম্পত্তির 'তরকাহ্' (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল বা সম্পত্তি) সম্বন্ধে পরিষ্কার দলিল এই যে, যদি উহা উত্তরাধিকারী সূত্রে-ভাগ-বন্টন হইত, তবে হজরত খাতুনে

পাক পাঞ্জতন (৭৩২) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

জন্মত (রাঃ—আঃ) একাকী তাহা পাইবার হুকুমার ছিলেন না ;
 আঁ হজরতের আহ্লিয়া (মোছলেম-মাতা)-গণ ও ফরায়েজ অনুযায়ী
 অংশ পাইতেন, আর আঁ হজরত (ছালঃ)-এর চাচ্চাঃ (পিতৃব্য) হজরত
 আব্বাহ (রাজিঃ) ■ একটা মোটা রকমের অংশ প্রাপ্ত হইতেন । আবার
 মোছলেম-মাতা (রাঃ—আঃ)-দিগের মধ্যে হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা
 (রাঃ—আঃ) ত হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর দুহিতা-রত্নই
 ছিলেন । পিতা হইয়া কি তিনি স্বীয় কন্টার স্বত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন ?
 যদি স্বীকার করা যায় যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর
 সঙ্গেই মহামান্য খলিফা হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর মনোবাদ
 ছিল ; তবে তিনি স্বীয় দুহিতা-রত্ন সহ মোছলেম-মাতাগণ এবং হজরত
 আব্বাহ-বিন্-আব্বুল মোত্তালেব (রাজিঃ)-এর ওয়ারেছী স্বত্ব কেন
 লোপ করিলেন ? হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর প্রত্যেক
 কার্য্য-কলাপ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনি আঁ হজরত
 (ছালঃ)-এর আদেশ এবং উপদেশের একটু মাত্র ব্যতিক্রম করেন
 নাই ; যথা :—ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ)-এর নেতৃত্বাধীনে সিরিয়ায়
 অভিযান প্রেরণ করা, যাহারা জাকাৎ প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া-
 ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে যেহাদ ঘোষণা করা ইত্যাদি ।

পবিত্র হাদীছ গ্রন্থ ছহি বোখারী ও মওতা গ্রন্থে এই হাদীছটিও
 বর্ণিত আছে যে, আয়্ ওয়াজ নবী (আঁ হজরত [ছালঃ]-এর আহ্লিয়া
 অর্থাৎ মোছলেম-মাতা গণ), হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ)-কে, হজরত
 আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইতে উদ্বৃত্ত
 হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হইতে নিকট আমাদিগের প্রাপ্য এক অষ্টমাংশ
 (৮ ভাগের এক ভাগ) ‘তলব’ (প্রার্থনা—দাবী) করেন, যাহা আল্লাহ
 তালা স্বীয় রচুলকে ‘গনিমত’ (সন্ধি-হত্রে প্রাপ্ত) বলিয়া দিয়াছিলেন ।

কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) হজরত ওছমান (রাজিঃ)-কে এই বলিয়া ‘ওয়াপছ’ (ফেরত) পাঠান (বাইতে নিষেধ করেন) যে, আপনি গিয়া আমার সপত্নী দিগকে বলুন, আপনারা কি খোদা তা-লাকে ভয় করেন না ? তাঁহারা কি জানেননা যে, হজরত রছুল খোদা (ছালঃ) ফরমাইতেন “আমি যাহা পরিত্যাগ করিয়া বাইব, উহার (আমার ত্যজ্য সম্পত্তির) কেহ ‘ওয়ারেছ’ (উত্তরাধিকারী) হইবে না । যাহা আমি ছাড়িয়া বাইব, উহা ‘ছদক্কাঃ’ (খোদার পথে ককীর-মিছকিন কে দেওয়ার মাল বা অর্থ) । কেবলমাত্র ‘আলে’ মোহাম্মদ (ছালঃ) অর্থাৎ আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বংশধর—বিশেষতঃ কস্তার বংশীয়গণ) আপনাদের প্রয়োজনানুরূপ উহা হইতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন ।” যখন আঁ হজরত (ছালঃ)-এর বিবিগণ (ওম্মোল-মুমেনিনগণ) এই হাদীছের বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা চুপ হইয়া গেলেন । এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণ্ডক্ত হাদীছের বিষয় না মহামাননীয়া ওম্মোল মুমেনিন (হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা [রাঃ—আঃ] বাতীত)-গণ জানিতেন, না হজরত খাতুনে জরত (রাজিঃ) জানিতেন ; কেবলমাত্র হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ■ হজরত আয়েশাঃ ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এবং আরও কোন কোন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এই হাদীছের বিষয় অবগত ছিলেন । হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর এই উক্তি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, একান্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে ফরজ (একান্ত কর্তব্য) ছিল । যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ের আলোচনা এই স্থানেই শেষ করিলাম । যাহারা এই ব্যাপারটিকে তুমুল কাণ্ডে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহারা যেদ ও হঠকারিতা কর্তৃকই পরিচালিত হইয়াছেন ; উপরোক্ত প্রমাণ সমুহই ইহার জন্ত যথেষ্ট । মহামান্ন খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)

পাক পাঞ্জতন (৭৩৪) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

বাহা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই ন্যায়সঙ্গত ছিল। যদি তাঁহার কার্য্য অসঙ্গত হইত, তবে হজরত শেরে খোদা আলী মর্ভুজা (কঃ—ওঃ) সহজে নিজেদের স্বত্ব পরিত্যাগ করিতেন না ; ওম্মোল মুমেনিন (রাঃ—আঃ) গণ এবং হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) ও স্ব স্ব দাবীকৃত অংশ নিশ্চয় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু হাদীছের অসম্ভব বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই নির্বাক হইয়া গেলেন।

মহাপণ্ডিত এমাম আলালুদ্দীন সেউতী (রহঃ) “ খছায়েছ কোব্বের ” নামক গ্রন্থের ২য় ভাগে (খণ্ডে) লিখিয়াছেন যে, এখানে ছায়াদ ওয়াকেন্দী হইতে, তিনি শবল-বিন্‌ল্ আলা হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত নবী (ছালঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইয়াছিলেন যে, যে সময় আমি ‘ওফাত’ পাইব (পরলোক গমন করিব), তুমি “ ইম্মা লিল্লাহে ওয়া ইম্মা এলায়হে রাজেউন ” বলিবে ; কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের এই কলমাঃ প্রত্যেক ‘মছিবত্’ (বিপদ আপদ)-এর ‘বদলা ।’ অর্থাৎ ইহা পাঠে নানা বিপদ-আপদ কাটিয়া যায়। হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এয়া রহুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ! আপনার ‘তরফ্’ (পক্ষ) হইতে যে ‘মছিবত্’ হইবে, তাহারও কি ইহাই বদলা ? হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, আমার মছিবত্ (বিপদ)-এর ও ইহাই বিনিময়। হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর ‘ওছাল’ (পরলোক গমন)-এর সময়, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ ব্যতীত তাঁহার সমুদয় ‘আওলাদ’ (সন্তান)ই পরলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন। হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর বয়ঃক্রম বখন মাত্র ২৮ কি ২৯ বৎসর, সেই সময় ঈসা হজরত সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পবিত্র স্বর্গধামে মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন। এমন কোন্ ‘কমবখ্ত্’ (হতভাগ্য) ছিল,

এই প্রচণ্ড শোকাঘাতে 'বেতাব' (একান্ত অধৈর্য্য) হইয়া ছিল না । কিন্তু এমন মহান পিতার—আদর্শ ওয়ালেদ বোমর্গের ছায়া মস্তকের উপর হইতে উঠিয়া যাওয়াতে—যিনি রহুলে খোদা (আল্লাহ্ তা-লার সংবাদ বাহক বা তত্ত্ববাহক) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আপনার আওলাদের সঙ্গে অপরিণীম মেহ প্রদর্শনকারীও ছিলেন ; তাঁহার অভাবে পিতৃগতপ্রাণ মেহের প্রতিমা হজরত খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ)-এর অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল ; ছনিয়া হইতে তাঁহার মন একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল ; সংসার-বন্ধন তিনি একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া ছিলেন । তখন জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনাময় বলিয়া বোধ হইতে ছিল । তিনি হজরত আনছ (রাজিঃ) কে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করিতেন হে, আনছ ! তোমার মন কিরূপে 'গওয়ারা' (কর্তব্য বোধ) করিল যে, তুমি হজরত রহুলোলাহ্ (ছালঃ)-এর উপর যুক্তিকা নিক্ষেপ করিলে (তাঁহাকে কবরস্থ করিলে) ? হজরত আনছ (রাজিঃ) “আবদীদাঃ” হইয়া (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) কহিতেন, “আল্লাহ তা-লার কার্যে কাহারও কিছু বলিবার শক্তি নাই ।” পৃথিবীতে এতিমির 'দাগ' (চিহ্ন) বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে । বিশেষতঃ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাজিঃ)-এর জন্ত হজরত রহুলে করিম (ছালঃ)-এর 'ফরাক্' (জুদায়ী—বিচ্ছেদ) বড় ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল । কারণ, ঐ হজরত (ছালঃ), স্বীয় প্রাণ-প্রতিম কন্যারদিকে 'বেহদ' (সীমাতীত রূপ) ভালবাসিতেন ও মেহ করিতেন । আর তাঁহাকে স্বীয় কলেজার টুকরা বলিয়া সর্বদা উল্লেখ করিতেন । পিতৃ-বিয়োগে হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর শোকাবেগ এমন প্রবল আকার ধারণ করিল যে, হজুর (ছালঃ)-এর 'রেহ্ লতের' (পরলোক গমনের) কিছু দিন পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন । ইহা তাঁহার শারীরিক রোগ নয়, কঠিন মানসিক রোগ ছিল । পিতৃ-বিয়োগের পর

তিনি ছয়মাস কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে কেহ তাঁহাকে হস্ত করিতে বা প্রফুল্ল মুখে কথা বলিতে দেখেন নাই । একথা সত্য যে, হৃদয়ের দাগ বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে ; অবশেষে উহাতে মানুষকে 'খুলাইয়া' (গলাইয়া—অতি দুর্বল করিয়া) দেয় ; তাহার জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে । বালক বালিকাগণ (এমাম দ্বয় ও তাঁহাদের ভগিনী দ্বয়) নানার (মাতামহের) শোকে পূর্ব হইতেই অর্ধ মৃতাবস্থাপন্ন হইয়া ছিলেন, এক্ষণে মেহমরী জননী এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে একেবারেই মৃতকর হইয়া পড়িলেন । তাঁহাদের মধ্যে সর্বদাই উদাস ভাব দৃষ্ট হইত । হজরত হামদারে কাররার (কঃ—ওঃ)-এর মানসিক অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল । তাঁহার বীর হৃদয় দমিয়া গিয়াছিল । গৃহে আসিয়া হজরত খাতুনে (রাঃ—আঃ) ও পুত্র কন্তা-গণের শোক ক্লিষ্ট বদন মণ্ডল যখন নিরীক্ষণ করিতেন, তখন তাঁহার অতীত সুখের দিন ও দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া, তাঁহাকে অতি মাত্রায় আকুল করিয়া তুলিত ; আ হজরত (ছালঃ)-এর তিরোধানে তিনি চক্ষে অশ্রুকার দেখিতে ছিলেন ; তাঁহার সেই অজ্ঞেয় শৌর্য-বীৰ্য্য ও পরাক্রম যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল । তিনি মনে মনে ভাবিতেন, আগার দিন ও ছনিয়ার (পরকাল ও ইহকালের) সাহায্যকারী ত পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন ; আ হজরত (ছালঃ)-এর 'জুদায়ীর' (বিচ্ছেদের) পাহাড় আমার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; এক্ষণে এই 'হামদর্দ' (সহানুভূতি সম্পন্ন) হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ [রাঃ—আঃ] ও না আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান । হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ), হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-কে কেবল স্বীয় পরম হিতৈষিনী, আরাম-দায়িনী, শোক-হঃখে শান্তি প্রদায়িনী বিবী বলিয়াই ধনে করিতেন না, বরং আ হজরত (ছালঃ)-এর একমাত্র 'নেশানী'

(চিহ্ন) বলিয়াও মনে করিতেন । একান্ত তাঁহার প্রতি অফুরন্ত প্রেম ও ভালবাসা ছিল । এই স্বর্গ-রাজ্যের পরলোক গমনে বীরেন্দ্র কেশরী হজরত হায়দারে কারার আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহর হৃদয় দুর্বীর শোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । তিনি সর্বদা তাঁহার কবর স্মরণ করিতে বসিতেন, এবং নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতেন ; আর শোকাক্ত হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেন । একদা তিনি কবরের পাশে বসিয়া রোক্তমান অবস্থায় যে প্রাপ্পন্নী কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

(১) “ আমি নিজের উপর ছনিয়ার বহু পীড়া দেখিতেছি, আর এই পীড়িত ব্যক্তি (আমি স্বয়ং) মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত পীড়িত থাকিব ।

(২) যে স্থলে দুইজন বন্ধু আছেন, ‘আখের’ (অবশেষে) ইহাদের মধ্যে ‘জুদায়ী’ (বিচ্ছেদ) হইবে । আর সমুদয় ‘মছিবত’ (আপদ—বিপদ) এই বিচ্ছেদের ‘হৃদমাঃ’ (তীব্র আঘাত) হইতে কম ।

(২) হজরত রহুলোল্লাহ্ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের ‘বোদ’ (পরে) ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে হারাইয়া ফেলা এই বিষয়ের ‘দলীল’ (প্রমাণ) যে, কোনও ‘পেয়ারাঃ’ (প্রিয়ব্যক্তি) ও ‘দোস্ত’ (বন্ধু) চিরকাল এক সঙ্গে থাকিতে পারে না । ”

মূল আরবী কবিতাটির ভাব ও সৌন্দর্য্য অল্প ভাষায় প্রকাশ করা এবং মূর্খ-সাধারণকে উপলব্ধি করান সম্ভবপর নহে ।

“ তফ্রিহল আয়্কিয়া ” গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) কোনও রূপ রোগগ্রস্তা ছিলেন না ; বরং এন্তেকালের (পরলোক গমনের) দিন অতি প্রত্যুষে ‘খেলাফ্ মায়মুল’ (নিয়মিত নিয়মের বিপরীত ভাবে), বেশ ‘খোশ’ ও ‘খোররম’ (আনন্দ ও ক্ষুণ্ণির সঙ্গে) শয্যাভ্যাগ করিলেন ; এবং ‘কনিয্’ (দাসী)-

কে এরশাদ করমাইলেন, আমার স্বানার্থ পানী আনয়ন কর । দাসী আদেশ প্রতিপালন পূর্বক গোছলের পানী আনিয়া দিল ; হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) অতি কষ্টে গোছল করিলেন ; আর ধৌত করা পাক (পবিত্র) বস্ত্র পরিধান পূর্বক করতলে কপোল বিস্তৃত করিয়া, কেব্‌মাভিমুখী হইয়া শরন করিলেন ; এবং এরশাদ করমাইলেন ; আগি স্বীয় জীবন খোদা-ওমান্দ করিমের নামে সমর্পণ করিতেছি । অতঃপর কেহ যেন আমাকে আহ্বান না করে ; আর আমাকে যেন এই অবস্থায়—এই স্থানেই “দফন” (কবরস্থ) করা হয় । যখন হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) বাহির হইতে গৃহে আগমন করিলেন ; তখন হজরত ছৈয়দার ‘ওছিয়ত’ (অন্তিম নির্দেশ) অনুযায়ী কার্য করিলেন । কিন্তু এব্‌নে জরযী (রহঃ) এবং অজ্ঞাত প্রসিদ্ধ হাদীস-বেস্তাগণ এই হাদীসটিকে ‘মওয়ুয়াত’ (অপ্রামাণ্য—জরীফ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তাঁহারা লিখিয়াছেন, হজরত ছৈয়দা ‘নযুম’ (অন্তিম) সময়ে—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, হজরত আছমাঃ-বিস্তে আমিছ (রাঃ—আঃ—হজরত আবুবকর ছিদ্দিক [রাজিঃ]-এর আহ্‌লিয়া অর্থাৎ পত্নী)-কে করমাইলেন, আমার ‘তদফিনে’ (কাফন-দফন কার্যে) পরদার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত রাখিবেন ; আর আপনি স্বয়ং এবং আমার স্বামী ব্যতীত আমার মৃত্যু-স্থানে যেন আর কেহ শরীক না হন (যোগ না দেন) । জানাযার সময় ও দফন (কবরস্থ) করার সময় যেন অধিক লোকের সমাগম এবং ভিড়্‌ ভাড়্‌ না হয় । “তবকাত এব্‌নে সোদা ছাযী” এবং “আছদল গালেবাঃ” (১৭।১৮ পৃঃ) তেও ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) এর এক্ষেপাল সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে ।

ঐ ‘যামানায়’ (সময়ে) স্বীলোকদিগের জানাযাঃ এইরূপে কবরস্থানে লইয়া যাওয়া হইত—যেদূর আজকাল পুরুষদিগের জানাযাঃ লইয়া

যাওয়া হয় ; স্বীলোকের জন্ত বিশেষ ভাবে পরদার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবিতাবস্থায়ই এবিষয়ের 'ফেকের' (চিন্তা) ছিল ; তিনি ভাবিতেন, আমার জানাযাঃ বাহিরে যাইবে, এবং পর পুরুষেরা দেখিতে পাইবে। এইরূপ 'বে-পরদেগী' সম্বন্ধে তিনি বড়ই লজ্জা এবং সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি আছমাঃ (রাঃ—আঃ) এর নিকট এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন ; তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি হাবশাতে (আবিশিনিয়ায়) দেখিয়াছি, স্বীলোকদিগের জানাযার উপর বুকের নরম 'শাখা' বাক্সের ডুলির আকারে পরিণত করিয়া পরদার ব্যবস্থা করে—যাহাতে মৃতদেহ কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না—(যাহাকে 'ঘওয়ারাঃ' বলে)। অতঃপর বিবী আছমাঃ (রাঃ—আঃ) ঘওয়ারার নমুনা তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। উহা দেখিয়া হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন। তৎপরে আছমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে বলিলেন, মৃত্যুর পর আপনিই আমার 'গোছল' দেওয়াইবেন ; এবং কাফন পরাইবেন ; আর যেরূপ ঘওয়ারার নমুনা আমাকে দেখাইলেন, আমার জানাযার উপর এইরূপ ডুলির আকার বিশিষ্ট পরদার ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ পরদার ব্যবস্থা সর্ব প্রথমে হজরত খাতুনে জন্নতের জানাযায়ই হইয়াছিল ; তৎপর হজরত জন্নত বিন্তে-হজশ্ (ছাহাবিয়া রাঃ—আঃ)-এর জানাযায় ব্যবহৃত হয়। 'ছরকারে আলিয়া' (হজরত খাতুনে জন্নত [রাঃ—আঃ]) যখন বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, আমাকে অতি শীঘ্রই 'শফিক্' (মেহেরবান—মেহ প্রদর্শনকারী) পিতার নিকট যাইতে হইবে। এ সময় আ হজরত (ছালঃ)-এর এন্তেকালের ছয়মাসও পূর্ণ হইয়াছিল না—হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পবিত্র জীবন-বিসর্জন করিলেন (ইম্মা লিল্লাহে

ওয়া ইম্মা এলায়হে রাযেউন) । ছাদশ হিজরীর ওরা রমজানল-মবারক মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রিকালে, হজরত রহুলেখোদা (ছালঃ)-এর ‘জগর শোশাঃ’ (ছুৎপিণ্ডের টুকরা) তাঁহার সঙ্গে গিয়া সম্মিলিত হইলেন ।

জনাব হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শেরে খোদা ছিলেন ; ‘ছফদারে জার’র’ ছিলেন ; ‘হারদারে কার’র’ ছিলেন ; ছনিয়ার কোনও শক্তি—শত্রুপক্ষের কোনও ‘তকলিফ্’ (ক্লেশ) তাঁহাকে ভীত, সম্ভ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর করিতে পারিত না । ‘মায়ুছি’ (নৈরাশ্র) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বাইত । কিন্তু হজরত খাতুনে জব্বত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনে তাঁহার কলিজাঃ টুকরা টুকরা এবং লোহার ছায়া খুদুৎ বন্ধঃস্থল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । মোছুম এমাম আতু-মুগলের ‘মছিবত্’ (বিপদ)-এর পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ।

স্বর্গ-রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ‘ওহিয়ত’ (অন্তিম নির্দেশ) অনুযায়ী, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহার গোছল এবং কাফনের ‘এন্তেজাম’ (বন্দোবস্ত) করিলেন । আর হজরত আহমাঃ (রাঃ—আঃ) গোছল করাইয়া, কাফন পরাইয়া পরদার ছামান করিয়া দিলেন—যেৰূপ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । এই সময় (গোছল কাফন পরাইবার সময়) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) তথায় আগমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু হজরত আহমাঃ (রাঃ—আঃ) এই বলিয়া তাঁহাকে সেই কার্যে যোগ দিতে নিষেধ করিলেন যে, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) একাধো আর কাহাকেও যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছেন । হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) ইহাতে দুঃখিত হইয়া স্বীয় পিতা মহামাতা খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ—আঃ)-এর খেদমতে এই বলিয়া ‘শেকায়েত’ (অভিযোগ) করিলেন যে, আপনার বিবী (স্বীয় সৎ মাতা) আমাকে ফাতেমার মৃতদেহের নিকট বাইতে দেন নাই ।

হজরত আয়েশাঃ ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ) পিতাকে ইহাও বলিলেন, আছমাঃ (রাঃ—আঃ), ফাতেমার জানাযার উপর ডোলের স্থায় কোনও জিনিষ বাধিতেছেন। ইহা শ্রবণ মাঝে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) খাতুনের জন্মত (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন পূর্বক, দরওয়ানায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় আহলিয়াকে বলিলেন, তুমি ইহা কি ‘গম্ব’ করিতেছ ? হজরত রহুলোল্লাহ বিবীদিগকে ও তাঁহার কন্যার মৃতদেহের নিকট আসিতে দিতেছ না ; আর জানাযার উপরে দিবার জন্ত কি নূতন জিনিষ তৈয়ার করিতেছ ? আছমাঃ (রাঃ—আঃ) তাঁহার নিকটও ঐ ওজর পেশ করিলেন যে, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আমাকে এই ওহিয়ত করিয়া গিয়াছেন, আপনিই আমাকে গোছল দেওয়াইবেন, আর কাহাকেও সেখানে প্রবেশ করিতে দিবেন না । আমি কোনও নূতন জিনিষ জানাযার উপর স্থাপন জন্য তৈয়ার করিতেছি না ; বরং মরহুমার অভিপ্রায়ানুযায়ী জানাযার উপর পরদার ব্যবস্থা করিতেছি মাত্র । জনাব হজরত ছিদ্দিক আকবর ■ এই কথা শুনিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং বিবী আছমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে অহুমতি দিলেন ; ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) যেরূপ ওহিয়ত করিয়া গিয়াছেন, তুমি

* এই রওয়ান্নেত দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মৃত্যু-সংবাদ ষথাসময়েই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আর ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কবর তাঁহার হজরায় হইয়াছিল না ; কারণ হজুরায় কবর হইলে তাঁহার জানাযার পরদা করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না । “ খদবল কলুব আয় দেয়ারল মহবুব ”-প্রণেতা মাওলানা শেখ শাহ আবদুল হক্ ছাহেব মহদুছ দেহলবী) ।

সেইরূপ কার্যই কর । জনাব হজরত খাতুনে জন্নত হৈদাঃ (রাঃ—আঃ) লজ্জা ও শরমের জন্ত পরদার বিশেষরূপ খেয়াল করিতেন । এজন্য তিনি ইহাও ‘আরযু’ (অভিপ্রায়—ইচ্ছা) ফরমাইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে স্বীয় পরম ভক্তি-ভাজন মহা সম্মানিত স্বামী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আমাকে যেন রাত্রিকালে ‘দফন’ (কবরস্থ) করা হয় ; তদনুসারে রাত্রিকালেই তাঁহার জানাযাঃ কবর স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । মদীনাবাসীদিগের বিখ্যাত কবরস্থান “ জন্নতল বন্ধিয় ” তেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয় । জানাযার নমায্ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-ই পড়াইয়াছিলেন । রাত্রিকালে জানাযার নমায্ পড়া ও দফন কার্য সম্পন্ন করাতে জানাযার লোকসংখ্যা খুব কমই হইয়াছিল । আর আবু হজরত (ছালঃ)-এর নামে জীবনোৎসর্গকারী ভক্ত বৃন্দের পক্ষে এজন্য বড়ই ‘আফ্‌ছোছ’ (আক্ষেপ) রহিয়া গিয়াছিল । মহামাননীরা খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ ও যথানিয়মে—যথাসময়ে ঘোষণা করা হইয়াছিল না ; তাহা করিলে সহস্র সহস্র ছাহাবাঃ (রাঃ—আঃ) ও জন-সাধারণ তাঁহার জানাযার নমাযে সাগ্রহে যোগদান করিতেন ।

“ তবক্কাত্‌ এব্নে ছায়াদ ” (কেতাবয়েছা) গ্রন্থে মোহাম্মদ-বিন্-মুছা (রহঃ) হইতে রওযায়েত আছে যে, হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ) কে স্বয়ং হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ‘গোছল’ (মৃত্যু-স্নান) দেওরাইয়া ছিলেন । আর হজরত আবদুল্লা-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জানাযার নমাজ হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-ই পড়াইয়া-ছিলেন ; এবং হজরত ফজল-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ)-এর সহায়তায় তাঁহার পবিত্র মৃতদেহ, শেষে খোদা হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-ই কবরে স্থাপন করিয়াছিলেন । এমাম শাহাবুদ্দীন আক্বোলানী (রহঃ) বর্ণনা

করিয়াছেন যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর ‘আহ্লিয়া’ (পত্নী) আছমাঃ-বিস্তে যমিছ (রাঃ—আঃ)-এর সাহায্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-ই মহামাননীয়া ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গোছল কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এস্থলে আমরা একটি বিষয় বুঝিতে পারিতেছি না । ইতিপূর্বে পরদা সম্বন্ধীয় কোরআন পাকের আয়েত ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হইয়াছিল । একপক্ষে আছমাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সম্মুখে বাইতে পারিতেন না । সুতরাং তাঁহারা উভয়ে গিলিয়া কিরূপে গোছল দেওয়াইলেন ? “ আছাবাঃ ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ওছিরত ছিল, আছমাঃ-বিস্তে যমিছ (রাঃ—আঃ)-এর সাহায্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বয়ং তাঁহাকে মৃত্যু-স্নান দেওয়াইবেন । এক রওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-কে আর গোছল দেওয়ান হয় নাই ; এন্তেকালের অব্যবহিত পূর্বে তিনি ‘এত্মিনানের’ (স্থির বিশ্বাসের—নিশ্চিততার) সহিত স্নান কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; ঐ গোছলই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট মনে করা হইয়াছিল । এমাম ছাহেব এক জরীফ্ (দুর্বল) রওয়ায়েত অনুসারে ফরমাইয়াছেন যে, জানাবার নমাজ মহামান্ন খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) পড়াইয়াছিলেন । কিন্তু “ তব্কাত এব্নে ছায়াদ ” এ লিখিত আছে, জানাবার নমাজ্ হজরত আব্বাছ (রাজিঃ) পড়াইয়াছিলেন । তৎকাল প্রচলিত নিয়মানুসারে মহামান্ন আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এরই জানাবার নমাজ্ পড়ান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর অন্তিম নির্দেশানুযায়ী হজরত আলী (কঃ—ওঃ)ই জানাবার নমাজ্ পড়াইয়া ছিলেন বলিয়া মনে হয় । প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌ই পরিজ্ঞাত ।

এক রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর এন্তেকাল মগরেভের নমাযের অব্যবহিত পরেই হইয়াছিল । তাঁহার জানাযায় হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন-রয়োক্ (রাজিঃ) উপস্থিত ছিলেন ; হজরত আলী (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ‘আফ্ জল’ (উত্তম—সম্মানিত), সুতরাং তিনিই জানাযার নমায পড়াইবেন ।

রওয়ায়েত আছে যে, হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনে আকাশ কাঁদিতে ছিল ; পৃথিবী শোক প্রকাশের সঙ্গে ক্রন্দন করিতে ছিল ; ফেরেশতাগণ ‘নালা’ (ক্রন্দনের সহিত শোক প্রকাশ) করিতেছিল ; বন-জঙ্গলে, মনুষ্যের বসতি স্থানে—যে দিকে দেখ, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ‘ওফাতের’ (মৃত্যুর) ‘মাতম’ (শোক-প্রকাশ) জারী ছিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর গৃহের ‘শাময়া’ (চেরাগ—প্রদীপ) ‘গুল’ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছিল । শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার বীর হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল । পৃথিবীর সকল জিনিষই শোকাক্ত বোধ হইতেছিল । এক ‘যমানায়’—হজরত রেছালত মাব্ ছাল্লালাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের পরলোক গমনে, মদীনা তৈয়বায় শোকের প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হইয়াছিল ; সকলেই মহাপুরুষের অন্তর্ধানে ভীষণ শোকানলে দগ্ধীভূত হইতেছিলেন । প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার কথা ছাহাবাঃ কারান (রাজিঃ)-দিগের স্মৃতিপথে পতিত হইতেছিল । নরনারী সকলেই দুর্ব্বল শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন । সকলের মস্তকেই যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল । আজ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমন

পাক পাঞ্জতন (৭৪৫) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

সংবাদে তাঁহাদের শোকাবেগ নূতন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল । প্রত্যেকে সেই স্বর্গ-রাজ্যের 'আখলাক্' (সৌজন্য), দীন-দরিদ্রের প্রতি করুণা বিতরণ, এতিম-এছিরের প্রতি স্নেহ-প্রদর্শন, উপাসনা আরাধনায় পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ, খোদা তা-লার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, আদর্শ চরিত্রতা, নম্রতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যাবতীয় সদগুণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন । ছনিয়া হইতে ধর্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি যেন হঠাৎ বিলীন হইল ; ধর্মের পবিত্র জ্যোতিঃ যেন অকস্মাৎ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল । তাঁহার মৃত্যুতে অনেক নর-নারীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যেন চুরমার হইল । এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের চেহারা 'মরদী' (হরিদ্রা বা পাণ্ডুবর্ণ) ধারণ করিয়াছিল । ইহাদের 'জগরে' (হৃৎপিণ্ডে) এই দ্বিতীয় প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়া ছিল । কখনও স্বীয় পরম ভক্তি-ভাজন মানব কুলশ্রেষ্ঠ নানার (মাতামহের) 'শকল' (প্রতিকৃতি বা ছবি) তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদয় হইত, আর কখনও 'শফিক্' (স্নেহ-কারিণী) মাতার চেহারা স্মরণ পথে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিত । ইহারা স্বীয় শোকাক্ত পিতার বিষন্ন বদন দেখিয়া আরও 'পেরেশান' হইতেন । ছনিয়ার সকল দিকেই তাঁহারা 'গম' (শোক) ও ব্যাকুলতাই দেখিতে পাইতেন । শাহ-যাদী স্বয়ের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল । মাতৃহীনা ক্ষুদ্র বালিকাছয় স্নেহময়ী জননীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন । গৃহ তাঁহাদের পক্ষে ভীষণ শোকপূরী বলিয়া বোধ হইত । কে তাঁহাদিগকে সাহুনা দিবে ? জননীর স্নেহ-ছায়া তাঁহাদের মস্তকোপরি হইতে উঠিয়া গিয়াছিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর বীষ হৃদয় মৃৎপাত্রের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; তিনি স্নেহের কুসুম পুত্র কন্যাদিগকে বক্ষে লাগাইয়া সাহুনার বাণী শুনাইতেন, কত প্রকারে প্রবোধ দিতেন । কিন্তু সে ভাস্মাপ্রাণে কিছুতেই শান্তি বোধ হইত না ।

নানা ও মায়ের অভাব কিছুতেই পূরণ হইতেছিল না । ভীষণ শোকের আঘাত বড়ই মারাত্মক হইয়া থাকে ; সে শোকাগ্নি কোনও প্রবোধ বা সাধনার পানীতে নির্বাপিত হয় না । মদীনা শরীফের কথা ত বলাই বাহুল্য, অনেক দূরবর্তী স্থানের মরনারিগণ ও তাঁহার পরলোক গমন সংবাদে বিশেষরূপ শোক প্রকাশ করিতে ছিলেন । মক্কা-মোয়াজ্জিদা, তাবেফ, যেদা, এমন, ওমান প্রভৃতি বহু দূরবর্তী স্থানেও এই শোকের প্রচণ্ড আঘাত গিয়া লাগিয়াছিল । কারণ, মরহুমার ধর্মনিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, স্বামী সেবা, আর্জুনের প্রতি করুণা প্রদর্শন, মহা সম্মানীয় ওয়ালেদ মাজেদের সম্পূর্ণ পদাঙ্গুসরণ, দীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ, সর্বপ্রকার সাংসারিক কাজ স্বহস্তে সম্পাদন, নারী জাতিকে নানাপ্রকার উপদেশ দান, নিজের মুখের গ্রাস বুভুক্ষুদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবারণ, মানব যাত্রের প্রতি করুণা প্রদর্শন, তাহাদের মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা-লার মহা দরবারে কাতরভাবে প্রার্থনা—ইত্যাদি সদগুণাবলী তদানীন্তন মোছলদিগের মধ্যে—সমগ্র আরব দেশের সর্বত্র বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল । সুতরাং সেই পরিমাণে শোকের প্রবল স্রোত ও সর্বত্র প্রবাহিত হইয়াছিল । বড় বড় ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) ও ছাহাবিয়া (রাঃ—আঃ)-দিগের ত কথাই নাই ; সর্ব শ্রেণীর মোছলমানদিগের মধ্যেই হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল । আজ সকলে বুঝিতে পারিলেন, হজরত রছুল (ছালঃ)-এহ গৃহের সর্বপ্রধান ‘শামাদান’ (প্রদীপ) টি নির্বাপিত হইল ।

আ হজরত (ছালঃ)-এর পূর্ণদর্শ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল ।

যদিও আজ প্রায় তেরশত বৎসর অতীত হইল, হজরত খাতুনে জন্নত এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন ; কিন্তু তিনি নারীজাতির যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যে স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা

কেয়ামত (মহা প্রলয়কাল) পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে । মোছলেম নরনারী তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিবে । নানা ভাষায় লিখিত তাঁহার পবিত্র জীবনী মানুষের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করিবে । তাঁহার পবিত্র স্মৃতি কিছুতেই মুছিয়া যাইবার নহে ।

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনের পূর্ববর্তী ঘটনা, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জীবনীতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহার আর পুনরুল্লেখ হইল না । তিনি কোনওরূপ পীড়াগ্রস্ত হইয়া একেবারে ফরমান নাই । দারুণ পিতৃ-শোকে বিদগ্ধ হইয়া, জীর্ণ-শীর্ণ দেহে দুর্বল হইতে হইতে মৃত্যু-পথের পথিক হইয়াছিলেন । এই প্রায় ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার চক্ষের পানী শুকাইয়া ছিল না ; নীরবে সর্বদা অশ্রু-বিসর্জন করিতেন । জীবন তাঁহার পক্ষে ভার বোধ হইতেছিল । তিনি পরম ভক্তি-ভাজন ওয়ালোদ-মাজেদের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য একান্তই আকুল হইয়া পড়িয়া-ছিলেন । পরম ভক্তি-ভাজন স্বামী, অতি স্নেহ-ভাজন পুত্রদ্বয়ও পরম স্নেহের পাত্রী কন্যাদ্বয়কে ছাড়িয়া যাইতে অবশ্যই মনে বিষম কষ্ট অনুভব করিতেন । মাতৃহীন বালক-বালিকার যে শোচনীয় দুর্গতি হয়, তাহাও সমর সময় চিন্তা করিতেন ; কিন্তু পিতার সঙ্গে সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হইয়াছিল যে, প্রণয়-ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধনও তিনি অবাধে ছিন্ন করিয়াছিলেন । পৃথিবীর কোনও বন্ধনই তাঁহাকে পিতার সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত রাখিতে পারিতে ছিল না । এই সুদীর্ঘ ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার পবিত্র বদনে কখনও হাস্য প্রকটিত হইয়া ছিল না । আহারের রুচি তিরোহিত হইয়াছিল ; জীবন ধারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য মাত্র গলাধঃ করিতেন । পরম ভক্তি-ভাজন পিতার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য তিনি এমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে,

সে কথা বর্ণনা করা অসাধ্য। এমন পিতৃগত প্রাণ পুত্র কন্যা ছনিয়াতে কাহারও দেখা যায় নাই। ‘কলতঃ’ তিনি সত্য সত্যই ‘ছোলতানে দোজাহান’ (ছালঃ)-এর কলেজার টুকরাই ছিলেন।

আবু নরীম (রাজিঃ), হজরত আলী (কঃ—ওঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, “ যখন কেরামতের দিন সমাগত হইবে, সর্ব প্রথমে আমি “ পুল ছরাত ” এর উপর দিয়া গমন করিব। তৎপর বলা হইবে, হে আহলে হশর (হশরে উপস্থিত লোক সকল)! তোমরা স্ব স্ব চক্ষুদ্বারা বন্ধ কর। কারণ ফাতেমাঃ যোহরাঃ বিস্তে হজরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু ওয়া আলায়হে ওয়া ছাল্লাম) পুল ছরাত পার হইয়া যাইবেন। তিনি এমন ‘শান’ ও ‘শওকতে’ পুলছরাত পার হইবেন যে, দুইখানি চাদর দ্বারা তাঁহার পবিত্র দেহ আচ্ছাদিত থাকিবে।

আবু নরীম (রাজিঃ), হজরত আবু হোরেরা (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আমি হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি, তিনি ফরমাইতেন, যখন কেরামতের দিন সমাগত হইবে, হেজাবী (হাশর প্রান্তরে উপস্থিত ব্যক্তি) গণকে ঘোষণাকারিগণ ঘোষণা করিয়া বলিবে, হে লোক সকল! তোমরা চক্ষু মুদ্রিত কর, এবং স্ব স্ব মস্তক অবনত করিয়া লও, কারণ ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) বিস্তে হজরত রছুল (ছালঃ) পুল ছরাত পার হইয়া ‘জন্নতে’ (‘বেহেশ্-তে’—মোছলেম-স্বর্গে) গমন করিতেছেন।

মোছলেম (রহঃ), হজরত আনছ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জনাব হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, সর্ব প্রথমে আমি জন্নতের (বেহেশ্-তের) দরওয়াযাঃ খট্-খটাইব (দ্বারে করাঘাত করিব), এবং উহার দরওয়াযাঃ খোলাইব; ‘খাতুনে জন্নত’

(বেহেশতের অধ্যক্ষ) জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কে? আমি বলিব: মোহাম্মদ (ছাল:) ; তখন বেহেশতের অধ্যক্ষ বলিবেন, আপনার সম্বন্ধে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, আপনার পূর্বে কাহারও জন্য যেন বেহেশতের দরওয়াজা খোলা না হয়। আপনার পরে (হজরত আবু হোরেরা: [রাজি:]-এর রওয়াজেতানুসারে) হজরত খাতুনে জন্নত (রা:—আ:) 'ফরদ ওছ বরি'তে' দাখেল হইবেন (প্রবেশ করিবেন)। তাঁহার খাতুনে জন্নত নামের সার্থকতা এই উক্তির দ্বারাই স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি হয়।

হজরত ফাতেমা: যোহরা: (রা:—আ:)-এর 'মকামাতে দফন' (কবরের স্থান) বিভিন্ন 'রওয়াজেত' (বর্ণনা) অনুসারে ৪ স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ১। আঁ হজরত (ছাল:)-এর পবিত্র রওয়া: মবারকের 'পোশত' (পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশে)—মহুজ্জেদ নববীর অভ্যন্তরে। এই স্থান 'বেলা এখতেলাফ' (বিনা মতভেদ) ছুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মোছলমানগণ 'যেয়ারত' করিয়া থাকেন। এখানে কবরের জায়গা তৈয়ার করা আছে ; অর্থাৎ স্থানটি কবরের ন্যায় করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে 'কত্বা:' (স্মারক-লিপি—লিখিত প্রস্তর ফলক) ও স্বতন্ত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ২। এক অপরিজ্ঞাত স্থলে—মহুজ্জেদ নববীর মিসর ও আঁ হজরত (ছাল:)-এর রওজা: শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে খাতুনে জন্নতের পবিত্র কবর আছে বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন ; এই স্থানে কেবলমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যেয়ারত করিয়া থাকেন। ৩। এক রওয়াজেত অনুসারে তাঁহার 'মদফন' (কবর) রওজা: 'আহলে বয়েতে' আছে। এই রওজা মবারক 'জন্নতল-বকিয়' নামক স্বনাম প্রসিদ্ধ কবরস্থানে অবস্থিত ; এবং উহার উপরিভাগে একটি সাদা 'গনবদ' (গুম্বজ) বিরাজিত—যাহার ইমারত 'যেয়াদা: শানদার' (বিশেষ আড়ম্বর পূর্ণ) নহে। ছাদের উপর জরিহ-যরবকত্ এই কাপড় আছে। হজরত

পাক পাঞ্জতন (৭৫০) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কবরের সম্মুখবর্তী দেয়ালে অভ্যন্তর মূল্যবান 'তালারী' (সূবর্ণের) কারুকর্ষিত খচিত চাদর দোতলায়মান আছে—যাহা কয়েক সহস্র মুদ্রা বায়ে তৈয়ার হইয়াছে । এবারতের বহির্দ্বারের উপরিভাগে আরবী ভাষায় নিম্ন-লিখিত কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে :—

লি খামছাতো উৎফিবেহা হারাল ওবা আল্ ফাতেমাঃ ;

আল্ মোস্তফা ওয়াল মরতুজা ও আব্‌না হুমা ওয়াল ফাতেমাঃ ।

রওজা শরীফ্ অর্থাৎ সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তরে, খাতুনে জন্নত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র 'মযারে মবারক' (কবর শরীফ) 'জানেবে গরব্' (পশ্চিম দিকে) এক প্রান্তে—উচ্চ স্থানে অবস্থিত ।

এখং রওয়ান্নেত অনুসারে তিনি “ বয়তুল হযন ” নামক স্থানে সমাহিত (কবরস্থ) হইয়াছেন । ঐ স্থান “ জন্নতুল-বক্কিয় ” নামক স্বনামখ্যাত কবরস্থানের পশ্চাদিকে ২০ 'কদম' (২০ পাদ) মাত্র দূরে অবস্থিত । আ হজরত (ছালঃ)-এর 'ওফাতের' (পরলোক গমনের) পরে হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এই স্থানে বসিয়া পিতৃ-শোকে রোদন করিতেন । ঐ সময় এই স্থানটি জঙ্ঘলপূর্ণ ছিল । তিনি নির্জন স্থানে বসিয়া রোদন করা পছন্দ করিতেন । আ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র মদায় শরীফে সর্বদা লোকেরা আসিয়া ঘেয়ারত করিতেন, সুতরাং সেখানে বেশীক্ষণ নির্জন থাকা সম্ভবপর ছিল না ; এই জন্ত এই জঙ্ঘলপূর্ণ নির্জন স্থানে বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অশ্রু-বিসর্জন করিতে পারিতেন, ইহাও তাঁহার এই স্থানে বসিয়া ক্রন্দনের অন্ততম কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয় । উল্লিখিত কারণে ঐ স্থানের নাম “ বয়তুল হযন ” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । হজরত খাতুনে (রাঃ—আঃ)-এর পরলোক গমনের পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই স্থানে

একটি মহ্জেদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন । এই মকামে একটি স্থান দুই গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া এবং সওয়া গজ উচ্চ নির্মাণ করা হইয়াছে ; উহার দরওয়াযাঃ লোহ-নির্মিত । উহার উপরিভাগে ‘ছবয্’ (সবুয্) মখমলের ‘গেলাফ্’ (আচ্ছাদনী) আছে । হজরত হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গুম্বজের চতুর্দিকে বহুসংখ্যক আরবী কবিতা উৎকীর্ণ রহিয়াছে ।

নয্দ্দী ওহাবী বর্করগণ ঐ সকল পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন ভাঙ্গিয়া ‘চুর-মার’ করিয়া ফেলিয়াছে ।

মহামাননীয়া হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র ‘মযার শরীফ্’ (পাক কবর) সম্বন্ধে খাজা হাছন নেযামী হাছেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

এই গোর ‘গোরবত্’ বিস্তে রছুলোল্লার । ইহা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ‘মরকদে খামুশ্’ (নীরবে থাকিবার চির নিদ্রার স্থান)—যিনি হজরত মোহাম্মদ (ছালঃ) হবিবে খোদার ‘নূর চশ্ম’ (নয়নের জ্যোতিঃ) ছিলেন । এখানে শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ‘খাতুন’ (স্ত্রী—পত্নী) শয়ন করিয়া আছেন । এই পবিত্র ভূখণ্ডে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মহা সম্মানিতা জননী ‘কাফন’ পরিয়া আরাম করিতেছেন । এই চুপ্‌চাপ্ (নীরবতা পূর্ণ) কবরের শোকে অশ্রুপাত কর । এই কবরের মধ্যে দুইজন বে-গোনাঃ (নিরপরাধ—নিষ্পাপ) ‘মক্‌তুলের’ (শহীদের—নিহত ব্যক্তির) মাতা এবং এক নিরপরাধ কাতলের (নিহত পুরুষের) ‘যওজাঃ’ (আহ-লিয়া—স্ত্রী)-এর ‘আথেরাতে’ হজরাঃ’ (পরলোকের বাসস্থান বা বিশ্রাম স্থান) বানান হইয়াছে । আর এই মযার মবারকের পাশে দাঁড়াইয়া অভিনিবেশ সহকারে ও ধ্যান-

স্তিমিত নেত্রে হজরত যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর উপদেশ-মূলক জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ কর। যে চিরস্থায়ী ‘আওয়ায্’ (শব্দ) শুনান হইতেছে, আর যে ‘গম’ (শোক) ‘গায়েব’ (অদৃশ্য) এখানে লিখিয়া দিয়াছে, তাহা এই :—

ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-বিস্তে হজরত মোহাম্মদ রছুলোল্লাহ্, ছালামুআলাইহে ওয়া ছালাম এর কবর (এই স্থানে), যিনি ‘জন্নত’ (‘বেহেশত’—মোছলেম-স্বর্গ)-এর প্রীলোকদিগের ‘ছৈয়দাঃ’ (অধিনেত্রী) ; যাহার জননী হজরত বিবী খদিজাঃ (রাঃ—আঃ) প্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব প্রথমে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যাহার জনক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ), খোদা তা-বার সর্বপ্রধান রছুল (পরগম্বর -তত্ত্ববাহক) ছিলেন। আর যাহার ‘খাওন্দ্’ (স্বামী) আলা মরতুজা ‘নওজওয়ান’ (তরুণ যুবক) দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম মোছলমান এবং মহব্বে খোদার (হজরত রছুলোল্লাহর) পূর্ণ ‘মহবুব’ (সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত প্রিয়পাত্র) ছিলেন—যাহার ‘ফরযন্দ’ (সন্তান—পুত্র) হজরত এমাম-হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছায়েন (রাজিঃ) শহীদগণের ‘ছরদার’ (নেতা) এবং যাহারা বেহেশতের তরুণ যুবকদিগের ছৈয়দ (ছরদার)। তিনি (খাতুনে জন্নত) দুনিয়ার ‘আহ্লে দুনিয়ার’ (পার্থিব ভোগাশক্তদিগের) জায়-স্থখ সম্ভোগ করেন নাই। তিনি চাকি দ্বারা আটা পিষিতেন, সমুদয় গৃহকার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। তিনি ক্রমাগত কয়েক ‘ওকুত্’ (বেলা) ‘ফাকৈ’ (উপবাস) থাকিতেন। কিন্তু এত কষ্টে থাকিয়াও খোদাতা-বার ‘শেকায়েত’ (‘গেলা’—নিদ্দাবাদ) কখনও করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা কেহ হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ)-কে ‘মহব্বৎ’ করেন নাই (ভালবাসেন নাই)। ইনি খোদাও তাঁহার রছুলের ‘লাডলী’ (প্রিয়) ‘বেটী’ (কন্যা) ছিলেন। আর হজরত

পাক পাঞ্জতন (৭৫৩) ফাতেমাঃ যোহরাঃ ।

রহুল (ছালঃ)-এর ‘ওফাতে’ (পরলোক গমনের) পর সর্বপ্রথমে ইনি দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে এবং খোদা তা-লার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিলেন । এই কবর—যাহা বনি-ফাতেমার ‘ওশ্মেদ’ (আশা) কেরামত পর্য্যন্ত ‘যেন্দাঃ’ (জীবিত—স্থায়ী) রাখিবে । এই কবর দুনিয়ার ‘গমযদাঃ’ (শোকাক্ত) লোকদিগকে ‘হশর’ (পুনরুত্থান) পর্য্যন্ত ‘তছল্লি’ (প্রবোধ) দিতে থাকিবে । কেননা, কোনও ব্যক্তির এমন ‘শান’ (মর্যাদা—সম্মান) হইতে পারে না—যাহা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর ছিল । না এত ‘মছিবত’ (বিপদ—কষ্ট) কেহ সহ্য করিতে পারিবে, যে পরিমাণ বিপদ ও কষ্ট তিনি ভোগ করিয়া-ছিলেন । হশর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দরুদ ও ছালাম বর্তুক । ”

হজরত খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ)-কে তাঁহার জনৈক ‘ছহলী’ (পরিচারিকা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, যদি কাহারও ৪০টি উট থাকে, উহার ■■■ কি যাকাত দিতে হইবে । হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) উত্তর করিলেন, তোমার জন্ত ৪০টিতে ১টি, আর আমার জন্ত পূরা ৪০টি । এই ‘ময্ হব’ হজরত সিদ্দিক আকবর (রাজিঃ)-এর ছিল । তিনি যখন যথাসর্বস্ব লুটাইয়া (বিলাইয়া—দান করিয়া) আ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা আবকিত লা মেল্ক্ ” (স্বীয় আহ্ল ও আরালের [পরিবারবর্গের] ■■■ কি রাখিয়াছ ?) ; হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ) তখন আরজ করিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রহুলকে । তবু যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহার্থ হজরত ছরওয়ারে কায়েনাৎ (ছালঃ) যে টাকা তুলিয়াছিলেন, তাহাতে হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) নিজের যথা-সর্বস্ব আনিয়া জমা দিয়াছিলেন । হজরত খাতুনে জরত (রাঃ—আঃ)-এর উক্তিরও ঐরূপই উদ্দেশ্য ছিল ।

হজরত রহুল আকরম (ছালঃ)-এর ‘ওফাতে’ (পরলোক গমনে)

হজরত খাতুনে ■■■ (রাঃ—আঃ) একটি হৃদয় বিদারক কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এইরূপ :—

■ —‘আয়’ (হে) ‘ওয়ালেদ’ ‘বোযর্গওয়ার’ (পরম শ্রদ্ধের পিতঃ) ! এক্ষণে ঐ সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত যে, জিবরিল আলায়হেচ্ছালাম আমাকে আপনার পরলোক গমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ।

“ আফ্ ছোছ আক্বাজান (আক্ষেপ পিতৃদেব) ! আপনি এক্ষণে আল্লাহ্ তা-লার হজুরে তশরিফ্ লইয়া বাইবেন, আর ‘জন্নতল কেবদওছ’ (পবিত্র ‘বেহেশত্’—স্বর্গধাম) আপনার বাসস্থান হইবে ।

■ যে ব্যক্তি আহমদ (ছালঃ)-এর কবরের ভ্রাণ লয়, তাহার কর্তব্য কি ? তাহার কর্তব্য এই যে, সমগ্র জীবনে কোনও ‘খোশবু’ (সুগন্ধি দ্রব্য) এর ভ্রাণ গ্রহণ না করে ।

“ আমার প্রতি ঐ ‘মছিবত্’ (বিপদ) উপস্থিত হইয়াছে যে, যদি উহা আলোপূর্ণ দিবসের উপর পতিত হইত, তবে উহা ঘোর অন্ধকার রাঁত্রিতে পরিণত হইত । ”

একবার হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু এই পীড়িত অবস্থায় সারারাত্রি য়েবাদতে (উপাসনাদি কার্যে) অতিবাহিত করেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন ফজরের নমাজ্ পড়িবার জন্ত মছজেদে গমন করিলেন, তখন তিনি ও নমাজের ■■■ দণ্ডায়মান হইলেন ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যখন মছজেদ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) চাক্কিতে আটা পিষিতেছেন । তদর্শনে তিনি ফরমাইলেন, অগ্নি রছুলে খোদার ‘লখ্ ত্ জগর’ (হুৎপিণ্ডের টুকরা) ! এত ‘মেহনত’ (পরিশ্রম) করিও না । কিছুক্ষণ ‘আরাম’ (বিশ্রাম) করিয়া লও । এমন না

হয়, এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে তোমার অসুখ বাড়িয়া যায় । তদন্তরে হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) ফরমাইলেন, এ উভয় কার্য্য এমন নহে যে, ইহাতে ব্যারাম বৃদ্ধি হইতে পারে । খোদা তা-লার 'স্বেবাদত' (উপাসনা ও আরাধনা)-এবং আপনার 'এতায়ত' (আদেশ পালন—তাবেদারী) ব্যাধির উৎকৃষ্টতম চিকিৎসা । যদি এই দুই কার্য্যের কোনও কার্য্য 'মওতের বায়ছ' (মৃত্যুর কারণ) হয়, তবে এই মৃত্যু অপেক্ষা কোন মৃত্যু অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারি—যাহার ■■■ স্হল জীবন উৎসর্গীত করা কর্তব্য ।

মক্কা-বিজয়ের পূর্বে যখন মদীনা মনুওয়ার আবু-ছুফিয়ানকে তাঁহার কন্যা ওম্মোল-মুমেনিन হজরত ওম্মে-হবিবাঃ (রাঃ—আঃ), হজরত রেছালত মাবের 'মছল্লে' (জা-নমায্) হইতে এই বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি কাফের, আর এই মছল্লে (জা-নমায্) জনাব পরগম্বর আথেরয্ যমানের নমায্ পড়িবার স্থান, ইহার উপর তোমার 'নাপাক' (অপবিত্র) শরীর লাগান চাই না । আবু-ছুফিয়ান নিরাশ হইয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে গমন পূর্বক হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক বলিলেন, হে বাচ্চা (শিশু) ! তুমি আমাকে স্বীয় 'পানায়' (আশ্রয়ে) গ্রহণ কর । তাহা শুনিয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, " হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-এর 'মরজীর খেলাফ্' (মত-বিরুদ্ধে) আজ মদীনা-মনুওয়ার কোনও ব্যক্তিই তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে না । তুমি এখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাও (আল্-হেশামী, ৩৫৪ পৃষ্ঠা) । যদি তুমি আপনাকে বাঁচাইতে চাও, তবে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ■■■ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে গিয়া হাজের হও । "

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ! আপনারা খাতুনে জব্বত হজরত ফাতেমাঃ

যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর পবিত্র জীবনী—অর্থাৎ জীবনের ঘটনাবলী অবশ্যই বেশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন। নারী জীবন ইহাপেক্ষা পবিত্রতর হইতে পারে কি ? একটি মহিলার মধ্যে যত প্রকার সদগুণাবলী থাকিতে পারে, মহামাননীয়া ছৈয়দতয়েছা (রাঃ—আঃ)-এর জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা জল্লশানহুর প্রতি তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বপ্রকার আদেশ-নিষেধ তিনি আজীবন দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহামাননীয় পিতা, তদীয় কর্ণ কুহরে যে সকল উপদেশামৃত অহর্নিশ ঢালিয়া দিতেন, তিনি ক্ষণকালের জন্যও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। সেই সকল অমূল্য উপদেশ তিনি অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন ; এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন। পবিত্র কোরআন মজীদের মর্ম্ম তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহার প্রকাশ্য মর্ম্ম ব্যতীত আধ্যাত্মিক মর্ম্মও পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহামাননীয় পিতা তাঁহাকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা শুনাইতেন ; তিনি মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইতেন ; সঙ্গে সঙ্গেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইত ; সেই ভক্তির পবিত্র স্রোতে তাঁহার হৃদয় পবিত্রীকৃত হইত। আর সঙ্গে সঙ্গে এছলামের পবিত্র জ্যোতিঃতে তদীয় ক্ষুদ্র হৃদয় ধানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত ; তখন তিনি তন্ময় চিত্তে ভাব সাগরে ডুবিয়া যাইতেন—আত্ম-বিস্মৃত হইতেন।

হজরত খাতুনে জল্লত (রাঃ—আঃ) শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া মহামাননীয় পিতার স্নেহ-ক্রোড়ে পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন, পৃথিবীতে কোনও

পিতা স্বীয় হুহিতা-রত্নকে সেরূপ স্নেহ করেন নাই—ভালবাসেন নাই—সমগ্র স্নেহ-রাশি কন্যার প্রতি উৎসর্গীত করেন নাই। পক্ষান্তরে কন্যাও পিতাকে সেইরূপ অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন। পিতা যেমন পুত্র ও কন্যার প্রাপ্য সমস্ত স্নেহ স্বীয় প্রাণ-প্রতিম কন্যা-রত্নের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন; পিতা ও মাতার সমুদয় স্নেহ-ভালবাসা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন; কন্যা-রত্ন ও সেইরূপ পিতা এবং মাতার প্রাপ্য সমুদয় ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পিতার প্রতি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরম শ্রদ্ধের পিতা যে খোদা তা-লার প্রেরিত সর্ব প্রধান পয়গম্বর, প্রেরিত মহাপুরুষ, ভাববাদী নবী বা রসুল, তাহা তিনি সর্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় মহান্ পিতার সর্বপ্রকারে পদানুসরণ করিতেন; তাঁহার প্রত্যেক বাণীর মূল্য শত কোটি “কোহেনুর” অপেক্ষাও মূল্য বান্ মনে করিতেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার কোনও আদেশের ক্ষুদ্রতম অংশের ও বাহাতে অন্তথাচরণ না হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। মহামান্ন পিতা যখন তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া নানা উপদেশ-বাণী শুনাইতেন, সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া—অন্ত বিষয় ও চিন্তা ভুলিয়া গিয়া, সেই পবিত্র উপদেশ-সুধা-তিনি পান করিতেন। উহাই তাঁহার ‘রুহের গেজা’ (আত্মার খোরাক বা খাদ্য) ছিল। আবার অনেক সময় স্বীয় খোদা-গতপ্রাণ আদর্শ স্বামী শেরেখোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া ধন্ত হইতেন; সহুপদেশ ব্যতীত অন্য কথা তাঁহার কাণে স্থান পাইত না। যখন পিতৃ-গৃহে গমন করিতেন, তখন পবিত্র চরিত্রা আদর্শ স্থানীয়া বিমাতা দিগের নিকটও নানাপ্রকার উপদেশ-বাণী এবং আব্বা হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র হাদীছ সকল শুনিয়া চরিতার্থ হইতেন। মহামাননীয় ওয়ালেদ মাজেদ গৃহে উপস্থিত থাকিলে,

তিনি পবিত্র কোরআনের বাণী ■ মোখিক উপদেশ বাণী শুনাইতেন ।
 গৃহে যখন তাঁহার সমবয়স্কা বালিকা ও মহিলা—ছাহাবীয়া (রাঃ—
 আঃ) গণ আগমন করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গেও প্রধানতঃ ধর্ম্মালোচনাই
 হইত । তাঁহারা স্ব স্ব পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা বা স্বামীদিগের নিকট পবিত্র
 কোরআনের যে সকল বাণী বা ব্যাখ্যা ও হাদীছ শুনিতেন, তাহাও খাতুনে
 জন্নত (রাঃ—আঃ)কে শুনাইতেন, আবার তাঁহারা ইহার নিকট ধর্ম্মের
 অনেক নূতন বাণী শুনিতা কৃতার্থ হইতেন । কুকথা, পরের নিন্দা-গানি
 প্রভৃতি কখনও তিনি শুনিতেন না বা বলিতেন না । পরনিন্দা কারিণী,
 অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ কারিণী বা ঐ শ্রেণীর কোনও স্ত্রীলোকের তাঁহার গৃহে
 প্রবেশাধিকার ছিল না । ভরে ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোক তাঁহার গৃহে পদার্পণ
 করিত না । আর অল্পদিনের মধ্যেই মদীনা হইতে বিধর্ম্মীর অস্তিত্ব প্রায়
 লোপ পাইয়াছিল । পৌত্তলিক, রিহুদী ও খৃষ্টানের নাম-নেশানও তথায়
 ছিল না । অবশ্য মোনাফেক (কপট মোছলমান)-দিগের একটি দল
 ছিল, কিন্তু তাহাদের স্ত্রীলোকদিগের ও খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর
 গৃহে গতিবিধি ছিল না । স্মৃতরাং তদীয় পবিত্র গৃহ পাপীর পাদম্পর্শে
 কখনও কলুষিত হয় নাই : আর কোনও রূপ পাপ বাক্য তাঁহার কর্ণেও
 কদাপি প্রবেশ করে নাই । পবিত্র মদীনা নগরী ক্রমে একটি স্বর্গীয়
 পুণ্য নগরীতে বা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল ।

স্বামী ভক্তি ও স্বামী সেবা—যখন তাপসকুল-চূড়ামণি শেরে খোদা
 মহাবীর হজরত আলী (কঃ—ওঃ), হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-
 এর সহিত পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন তিনি কিরূপ গরীব-
 ‘নাতোয়ান’ ছিলেন, তাহা তদীয় জীবন-চরিত ও হজরত খাতুনে জন্নত
 ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবন-বৃত্তান্তে ইতিপূর্বে বর্ণিত
 হইয়াছে । ছাহাবাঃ (রাঃ—আঃ)-দিগের মধ্যে মহামান্ন হজরত আলী মর্ত্তুজাঃ

(কঃ—ওঃ)-এর স্ত্রী দরিদ্র ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। অতি কষ্টে তাঁহাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হইত। অধিকাংশ সময় অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইত। আজকাল আমাদের শরীফ, নামধারী ব্যক্তির শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীর নামে নাসিকা কুণ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা “শরীফ” ও “রজিল”—“আশরাফ” ও “আতরাফ” এই দুইটি দলের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদিগের স্ত্রী একটা বিরাট জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই জাতিভেদ দ্বারা তাঁহারা মোছলমানদিগকে নিতান্তই দুর্বল ও একতা বিহীন করিয়া ফেলিয়াছেন। আছল বা নকল ছৈয়দ ও মীর ছাহেবেরা দরিদ্রতা-নিবন্ধন ভিক্ষাজীবী সাজিয়াছেন—যে ভিক্ষা গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারে ‘নাজায়েয্’ (নিষিদ্ধ); লেখাপড়া না শিখিয়া খোন্কার বা ‘ছায়েল’ সাজিয়াছেন, কিন্তু ওদিকে বংশ-মর্যাদার অভিমানে একেবারে অন্ধ। অথচ কিছু অর্থলাভ হইলে সেই “রজিল” বা “আতরাফ” উপাধী বিশিষ্ট কৃষি-জীবী এবং শ্রমজীবীর কন্যা বিবাহ করিতে, বা তাহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে একটু মাত্রও কুণ্ঠিত নহেন। সেই ছৈয়দ, মীর বা আশরাফ্ কুল-তিলকগণ একথা স্মরণ করেন না যে, স্বয়ং হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ও হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ) শ্রমজীবীর কাজ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত শেরে খোদা হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহুর জীবন-চরিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছৈয়দ, মীর ও শরীফ্ ছাহেবেরা চরিত্রহীন, ব্যভিচারী, নেশাখোর, বে-নামাধী, সুদখোর প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইলেও, হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের স্ত্রী তাঁহাদের মধ্যে আত্মাভিমান ও আত্মগর্ব পূর্ণভাবে বিরাজমান। একজন শ্রমজীবী কৃষি-জীবী, বস্ত্রশিল্পী বা মৎস্যজীবী মোছলমান দিনী এলেমে মহাবিদ্বান্, শরাপরস্ত্, দীনদার-পরহেয্গার হইলেও দুষ্টচরিত্র আশরাফ্ তাহা হইতে আপনাকে

উচ্চতম মনে করিয়া থাকেন । ভারতবর্ষে বা হিন্দুস্থানে হিন্দুজাতির সংস্পর্শে ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ঈদুশ নারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন । পরম করুণাময় আল্লাহ তা-লার দরবারে ঈদুশ-শরীফ রযিল এবং আশরাফ-আতরাফের কোনও ভারতম্য নাই ; সেখানে ভারতম্য দিনী-এলেম, দিনদারী-পরহেজগারী, খোদা তা-লার আদেশ-নিষিদ্ধ পালন কার্যের ।

বাহা হউক, হজরত খাতুনে জন্নত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) দরিদ্র স্বামীর গৃহে আসিয়াও মহামান্য পিতার উপদেশ এবং স্বীয় শিক্ষা ও দীক্ষা অনুযায়ী “ শোকর-গোয়ার ” ছিলেন । সেই দরিদ্র অবস্থাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন । দরিদ্র স্বামীর প্রতি ক্ষণকালের জন্যও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই ; দরিদ্রতার জন্য দুঃখানুভব নাই ; আদর্শ সতী-সাক্ষী রূপে প্রাণপণে স্বামী-সেবা করিয়াছেন,—অবনত মস্তকে স্বামীর সকল আদেশ পালন করিয়াছেন । নিজে অনাহারে থাকিয়া তাঁহাকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইয়া, স্বয়ং পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন । স্বামীর আদেশের বিপরীতাচরণ কখনও করেন নাই । নিজের অসুস্থ শরীরেও স্বামীর সর্বপ্রকার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন । তাঁহার বস্ত্র ধোত করিয়া দিয়াছেন ; তাঁহার অঙ্গু ও গোছলের পানী ঝোঁগাইয়াছেন ; জীবনে কখনও তাঁহার আদেশের বিপরীতাচরণ করেন নাই ; কোনও জিনিষের জন্য তাঁহার নিকট আবদার করেন নাই ; কিসে তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন, সর্বদা সেই চিন্তা ও সেই খেয়ালই করিতেন ।

যখন তিনি সন্তানের মা হইলেন, সংসারের কাজ কর্ম ক্রমে বাড়িয়া চলিল, একদিকে চাকিতে আটা পেষা, ঘর ও আঙ্গিনা পরিষ্কার করা, হাঁড়ি বাসন মাজা, স্বামী ■ পুত্র-কন্যার বস্ত্রাদি ধোত করা, ছেলে মেয়েদিগকে ‘গোছল’ (স্নান) করান, ইত্যাদি সর্বপ্রকার

সাংসারিক কার্য তাঁহাকে সহস্বে সম্পন্ন করিতে হইত । এতগুলি কাজের সঙ্গে স্বামী সেবা, স্বামীর পরিচর্যা ইত্যাদি করা, সেলাই ইত্যাদি করা কত দূর কষ্টকর, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় । এই সকল সাংসারিক কাজ করিয়া নিয়মিত রূপে দৈনিক ৫ ‘ওয়াক্ত’ (সময়—বার) নমাজ পড়া, দোওয়া-দরুদ পড়া, কোরআন ‘তেলাওত (পাঠ), রাত্তিকালে, তাহাজ্জদ ও অন্তান্ত নফল নমাজ পড়া, কত-দূর গুরুতর ব্যাপার, তাহা চিন্তা করিবার বিষয় । তিনি বিশ্রাম ও শয়ন করিবার সময় বা অবসর খুব কমই পাইতেন । দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বোধ হয় ৪ ঘণ্টা কালও শয়ন এবং বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে পারিতেন না । চাক্ষুতে আটা পিষিবার সময়ও তিনি কোরআন পাঠ করিতেন । সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েদিগকে উপদেশ প্রদানেও ক্রটি করিতেন না । আবার পাড়া প্রতিবেশিনী, সমবয়স্কা বালিকা এবং যুবতিগণ সাক্ষাৎ করিতে আসলে তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ এবং ধর্ম্যালোচনা করিতেন ; ধর্ম্যকথা শুনিতেন, এবং বলিতেন । মহামাননীয় পিতার নিকট যে সকল উপদেশ ও নীতি কথা শুনিতেন, তাহা সমাগত মহিলাদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন । ধর্ম্যকথা, নীতিকথা, সাংসারিক বিষয়ের কথা ছাড়া অন্য প্রকার গল্প-গুজব করিতেন না বা শুনিতেন না । তাঁহার মুখে সর্বপ্রকার ধর্ম্যকথা ও নীতিকথা শুনিয়া সমাগত মহিলা ও বালিকাগণ মহাতৃপ্তি লাভ করিতেন । তাঁহাদের মনে হইত, যেন কোনও ধর্ম্ম-সভায় বসিয়াছেন । তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, উপাসনা-আরাধনা, স্বামী-সেবা, সম্মানগণের প্রতি স্নেহ-প্রদর্শন, সাংসারিক কার্যাবলীর আলোচনা করিয়া সকলে বিশ্বাসাপন্ন হইতেন ; এবং শত মুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ।

তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ, দরিদ্র ও অনাথ বালক-বালিকার প্রতি

দয়া ■ সহানুভূতি, সকলের প্রতি সদর-নয় ব্যবহার, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ, নিজে অনাহারে থাকিয়া খালি-প্রার্থীর উদর পূরণ করণ, নিজে কপর্দক শূন্য হইয়াও দরিদ্র 'ছায়েলের' (সাহায্য-প্রার্থীর) ছওয়াল পূর্ণকরা—প্রভৃতি তাঁহার দাতব্য-শক্তির অলস প্রমাণ ছিল। যদি ঘরে কিছু না থাকিত, ধার-কর্জ করিয়া দরিদ্রের ছওয়াল পূর্ণ করিতেন। নিজের বস্ত্রাভাব থাকিলেও, যে সামান্য বস্ত্র থাকিত, তাহা হইতে যতদূর সম্ভব (পুরাতন ছেঁড়া হউক না কেন,) বস্ত্র-প্রার্থীকে দান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, এবং তাহাতেই তাঁহার আত্ম-প্রসাদ অনুভূত হইত। দান কার্যে তাঁহার হস্ত নিতান্ত 'দারাব' (দীর্ঘ) ছিল। যদি ঘরে কিছুই না থাকিত, আর ভিক্ষা-প্রার্থীকে তিনি কিছুই দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনি বড়ই মনোকষ্ট অনুভব করিতেন ; তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিত।

সংসা দিগের প্রতি তাঁহার প্রবল ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। সকল বিমাতার প্রতিই তিনি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন। আদবের সঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট বসিয়া কোরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা শুনিতেন। মহামাননীয় পিতার সেই সকল অমূল্য উপদেশ-বাণী হৃদয়-পটে গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। জীবনে কাহারও সহিত তাঁহার মনোবাদ বা মন কষাকষি হয় নাই। তিনি প্রত্যেক নর-নারীর শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং মেহ-ভালবাসা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন ■ কোনও ব্যক্তিই তাঁহার নিন্দা-'শেকায়েত'এর সুযোগ পান নাই। তিনি সকলের ভক্তিমতি জননী স্বরূপিনী ছিলেন। সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসাবাদ শুনা যাইত। মহামাননীয় পিতার সম্পূর্ণ আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

একটা নারীর মধ্যে যত প্রকার সদগুণ ও সদাচার থাকিতে পারে,

একটী মহিলা যতদূর আদর্শ স্থানীয়। হইতে পারেন, হজরত খাতুনে জব্বত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর মধ্যে তৎসমুদয়ই পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল। তিনি অতি লজ্জাশীলা ছিলেন। পরদা সম্বন্ধে তাঁহার ক্রুর দৃঢ়তা ও কঠোরতা ছিল, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ তিনি সর্বপ্রকারেই স্বর্গের মহারাজ্ঞী স্বরূপিনী ছিলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার নিকট তিনি সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে পরাৎপর মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিনী দাসী বলিয়া মনে করিতেন; এবং সেইরূপ ভাবেই জীবনের ২৮ বা ২৯ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যদিও বর্তমান কালের ক্রান্ত শিক্ষা-প্রণালী তখন প্রবর্তিত ছিল না; কিন্তু তৎকালোচিত শিক্ষালোকে তাঁহার পবিত্র হৃদয় আলোকিত ছিল। পবিত্র কোরআন ■ হাদীছে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। কখনও কাহারও নিন্দা-চর্চা করেন নাই; হাস্য-পরিহাস করেন নাই; বৃথা গল্প-গুজবে আত্ম-নিয়োগ করেন নাই; নম্রতা, শিষ্টতা, সৌজন্য, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ প্রভৃতি সদগুণাবলী তাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। তিনি সময়ের সম্পূর্ণ সদ্যবহার করিতেন, একটু সময় ও বৃথা নষ্ট করিতেন না। একের গোপনীয় কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। লোক-সেবার, পরোপকারে তাঁহার মন কত উন্নত ছিল; একাধিক উর্দু কবিতায় তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিত; নেত্র-নীরে তাঁহার বসন ভিজিয়া যাইত। ফলতঃ তিনি সর্ব-প্রকার সদগুণের আধার ছিলেন; একাধারে এতগুণ মানুষে সম্ভবে না। ■

হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর কর্তব্য পরায়ণতা, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্যবহার, বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, পরোপ-

কারিতা প্রভৃতি গুণের বহু কাহিনী বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এই গ্রন্থেও একটি উর্দু কবিতায় একটি ঘটনার উল্লেখ আছে । ঘটনাটি এই :—শমউন নামক মদীনাবাসী একজন যিহুদী বড়ই এছলাম-বিদ্বেষী ছিল ; সে কাফেরী অবস্থায় হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি বড়ই বিদ্বেষ প্রকাশ করিত, তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে সে কিছুমাত্র ক্রটি করে নাই । কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ তা-বার এমনই অপূর্ব মহিমা যে, সেই কাটা কাফের শমউন যিহুদী, পবিত্র এছলাম ধর্মো-দীক্ষিত হইয়া এছলামের জীবনোৎসর্গকারী হইলেন ; তদর্শনে তদীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সম্প্রদায়ের লোক সকল তাঁহার প্রতি বিষম কোপাবিষ্ট হইল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে সকল ছিন্ন করিল । শমউন একজন বাণিজ্য-ব্যবসারী ছিলেন ; এছলাম ধর্ম গ্রহণের পর সেই বাণিজ্য-ব্যবসারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার সংসার চলা ভার হইল । স্বজাতির নিকট তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও তাহাদের দ্বারা পদে পদে নিগৃহিত হইতে লাগিলেন । বিপদের উপর বিপদ ; পরিবারের মধ্যে এক স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না । অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মারা পড়িলেন । তখন তিনি এমন বিপন্ন হইলেন যে, চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । কে তাঁহাকে (শমউনের মৃত্যু স্ত্রীকে) গোছল দেওয়াইবে, এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন । তখনও মদীনার মোছলমান সমাজের সঙ্গে তিনি পরিচিত হইয়া ছিলেন না ; সুতরাং মৃত্যু স্ত্রীকে লইয়া তিনি কিঙ্কর্তব্য বিমূঢ় হইলেন । অচিরে হজরত খাতুনে জন্নতের দাসী গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিল । তিনি সংবাদ শ্রবণে শমউনের বিপদে নিতান্ত সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া ‘রওয়া’ (বোরকা বিশেষ) পরিয়া সেই নব-দীক্ষিত মোছলমানের গৃহে উপস্থিত

হইলেন ; এবং যথানিয়মে স্বহস্তে তাঁহার স্বীয় মৃত-দেহের গোছল দেওয়াইলেন ; তাঁহাকে কাফন পরাইলেন ; অবশ্য এই অবসরে মোছল-মানগণ সংবাদ প্রাপ্তে তথায় উপস্থিত হইয়া, মৃত-দেহের জানাবার নমায আদায় ও জাতীয় কবরস্থানে মৃতাকে নিয়া দফন করিলেন ; হজরত ছৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ) স্বীয় কর্তব্য কার্য সম্পাদন পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাঁহার এই কার্যটি কতটা সঙ্গদয়তার পরিচায়ক ও প্রতিবেশার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের উজ্জল দৃষ্টান্ত, তাহা চিন্তা ও বিবেচনা করিবার বিষয় । আমরা বর্তমান সময়ে ঐরূপ উচ্চ আদর্শ হইতে কতদূরে গিয়া পড়িয়াছি, তাহা মনে হইলে লজ্জার অধোবদন হইতে হয় । মনে হয় আমাদের আদর্শ কত নীচ ও কত খাটো হইয়াছে ।

মহামাননীয়া হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর তরুণ বয়স্ক পুত্র-রত্ন এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যে যদি কখনও বাল-সুলভ ঝগড়া-ঝাটি হইত, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহার জননীর নিকট বিচার-প্রার্থী হইতেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদের জন্ত—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দোষারোপের জন্ত, আল্লাহ্ তা-বার ভয় দেখাইতেন ; ইহা যে পাপ কার্য, তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতেন ; আর আল্লাহর দরবারে পাপ-মোচনের জন্ত কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিতেন । সেই ৫৬ বৎসর বয়স্ক বালকদ্বয় আপনাদের দোষ-ত্রুটি বুঝিয়া লজ্জানুভব করিতেন, ভীত হইতেন ; এবং জননীর উপদেশানুসারে আল্লাহর দরবারে ‘তওবা’ (অনুশোচনা—পাপ মোচনের জন্ত ক্ষমা-প্রার্থনা) করিতেন । মাতাও সেই সঙ্গে দুই হাত তুলিয়া পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে ‘মনাযাতে’ (প্রার্থনায়) শরীক হইতেন । এইরূপে তিনি বালক দ্বয়কে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতেন । সেই তরুণ বয়স হইতেই এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের হৃদয়ে পাপের ভয় বদ্ধমূল হইয়াছিল । যে বিষয়ের দোষ মাতা কিংবা পিতা অথবা মাতামহ জনাব হজরত

রহুলে করিম (ছালঃ) বুঝাইয়া দিতেন, ঐ কার্য হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা মানিয়া লইতেন—গ্রহণ করিতেন, তাদৃশ কার্যে জীবনে আর কখনও করেন নাই । এই উপায়ে তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই পাপে ভীত এবং পাপ কার্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ফল স্বরূপ এই ছাহেবযাদাঃ দুইটি দুনিয়াতে আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন । তাঁহাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণও আদর্শ ধর্মবীর হইয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে শত সহস্র আওলিয়া-তাক্বাল, তাপস, ছুফী ও আদর্শ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মানব সমাজে ধন্য ধন্য হইয়া গিয়াছেন ।

আদর্শ সতী-সাধবী পতিব্রতা নারী ও বেহেশতের রাজ্ঞী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) পৃথিবীতে নারী কুলের শিরোভূষণ ছিলেন । তাঁহার সঙ্গে কোনও নারীর তুলনাই হইতে পারে না । তাঁহার পূর্বে বা পরে এরূপ মহিলা-রত্ন কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না । তিনি নারী জাতির সে সর্বোন্নত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন ; এই প্রায় সাড়ে তের শত বৎসর যাবৎ মোসলমান জগতে তাঁহার জীবনের পুণ্য-কাহিনী সুবর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । যাহারা এছলামের মর্যাদা বুঝেন, এছলামের গৌরব অনুভব করেন, নারী জাতির আদর্শ কত উন্নত হইতে পারে, এ বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করেন ; সত্য ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষায় চেষ্টা পান, তাঁহারা ধীরভাবে মহামাননীয়া হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর জীবনী সমালোচনা করিয়া ধন্য হন । তাঁহারা তাঁহার পবিত্র জীবনী মধ্যে অমূল্য ও সর্বোন্নত আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন । তাঁহার প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক উপদেশ মোছলমানদিগের পরকালের সম্বল ; মোছলমান নারীদিগের পক্ষে উহা

সর্বতোভাবে গ্রহণীয় । তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও কার্যাবলীর অনুকরণ ও অনুসরণ করিলে আজও মোছলমান নারী সমাজ উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । অনেক ভাগ্যবতী মোছলমান মহিলা তদীয় পবিত্র আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্বক ছনিয়াতে ধল ধল হইয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের আখেরাতের পথ ও দীপ্তি-সম্পন্ন ; তাঁহারা মুক্তি পথের পাশ্চ হইয়াছেন । ধরাতল তাঁহাদের পক্ষে স্বর্গ-ধামে পরিণত হইরাছিল ।

অয়ি বঙ্গীয় স্নেহের মোছলেম ভগিনিগণ ! তোমরা স্বর্গ-রাজ্যী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সম্পূর্ণ পদাঙ্কানুসরণ কর । তাঁহার প্রত্যেক কার্য-কলাপ, প্রত্যেক আচার-ব্যবহার, তাঁহার প্রত্যেক সদগুণ তোমরা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পাও । তাঁহার স্নায় সংযম, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, ‘ছবর’, ‘শোকর’ আয়ত্ত কর । বিলাসিতা ও বড় মানুষী চাল সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দাও । দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে হৃদয় পরিপূর্ণ কর । সাংসারিক কাজ যতদূর সম্ভব, স্বহস্তে সম্পাদন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর । আদর্শ শিক্ষা আয়ত্ত কর । এছলামীক শিক্ষা-দীক্ষা আয়ত্ত করিয়া আদর্শ নারী রূপে প্রতিপন্ন হও । পবিত্র এছলাম ধর্মের সর্ববিধ বিধান প্রাণপণে পালন কর । ঐহিক সুখ ও বিলাস-ব্যসনে আত্ম-নিয়োগ করিয়া, পরলোকের পথ কণ্টকিত করিও না । দত্ত, অহঙ্কার, আত্ম-শ্লাঘা পদাঘাতে দূর করিয়া দাও । সাধ্যানুসারে দরিদ্রের সাহায্য কর । বৃথা গল্প-গুজবে আত্ম-নিয়োগ করিও না । অসার নাটক-নভেল, উপন্যাস-নবন্যাস, জঘন্য গল্প পুস্তক পাঠ করিয়া আত্মা কলুষিত করিও না । সময়ের সদ্যবহার কর । সর্ব প্রকারে আদর্শ মোছলমান মহিলা হইতে চেষ্টা পাও ; গরীবকে দেখিয়া নাক সিকুটাইওনা । সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া গৃহকার্য সম্পন্ন কর । চাকরাণী বা মামা-দাই এর হস্তে সকল বিষয় ছাড়িয়া দিয়া নিজে “ ফুল বিবী ” হইও না । সন্তানগণকে

সবতে পালন কর ; এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা তাহাদিগকে দাও । পরকালের বিষয় সর্বদা চিন্তা কর । নমায্-রোযায় “ গাফেল ” থাকিও না । সর্বদা মৃত্যুর চিন্তা করিবে, এবং পরম কারুণিক আল্লাহ্ তা-লার নিকট সর্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করিবে ।

আমরা এই স্থানেই জনাব খাতুনে জব্বত হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ রাজিঃ আল্লাহ্ আনহার পবিত্র জীবনী শেষ করিলাম । হে আল্লাহ্ ! তুমি মহা-মাননীয় হৈয়দাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দোওয়ার বরকতে সমুদয় মোছলমান নরনারীকে পাপ-তাপ হইতে বিমুক্ত কর । সকল মোছলমান নরনারীর তওবাঃ কবুল কর । মোছলমান মাত্রকেই—প্রত্যেক “ তওহীদ-পন্থী ” কেই দোষখের ভীষণ অগ্নি হইতে মুক্তি প্রদান করিও । আযাবে কবর, আযাবে ‘হশর’ হইতে বাঁচাইয়া লইও । তোমার এই অধম দাসাশুদাস লেখককে স্বীয় প্রিয় হবিব (ছালঃ) এবং হজরত খাতুনে জব্বত (রাঃ—আঃ)-এর ‘ছোফারেশে’ মুক্তি প্রদান করিও ।

চতুর্থ ভাগ।

হজরত এমাম হাছন

(রাজিঃ)-এর জীবন চরিত।

হজরত রছুল মকবুল (ছালঃ)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর তনয়-রত্ন, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নয়নমণি শেহ-কুসুম, জ্যেষ্ঠ এমাম হজরত হাছন (রাজিঃ), তৃতীয় হিজরীর ১৫ই রমজানুল্ মবারক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কোনও কোনও রাবির (বর্ণনাকারীর) মতে ১৫ই শা'বান তারিখে এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত তারিখই ঠিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্যের তারিখ সম্বন্ধে অন্যান্য রওয়ায়েত ও আছে; কিন্তু তাহা নিভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন আমার মহামাননীয় জ্যেষ্ঠ চাচা ছাহেব (পিতৃব্য)-এর জন্মগ্রহণ কাল আসন্ন হইল, তখন হজুর ছরওয়ারে আলম (ছালঃ), হজরত আছমাঃ-বিন্তে যমিছ (রাঃ—আঃ) এবং হজরত ওশ্মে-এমিন (রাঃ—আঃ)-কে, জনাব দাদী আম্মা ছৈয়দাঃ হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন; এবং ফরমাইলেন, তোমরা আয়েতল কুরছি ও ময়ূস্ ৩ বার করিয়া পড়িয়া, ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-

এর উপর দম্ (ফুৎকার) দিবে। আছরের নমাযের পরে তাঁহার 'বেলাদত্ (জন্ম) হইয়াছিল। হজরত আছমাঃ বিন্তে-য়মিছ (রাঃ—আঃ) বলিয়াছেন যে, যে সময় হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপরে আমি হজরত ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নেকাছের শোণিত দেখিতে পাইলাম না। আমি ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া হজরত নবী

ছালঃ) ছাছেবের খেদমতে এবিষয় আরজ করিলাম; তাহা শুনিয়া হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আমার বেটি (কন্যা) ফাতেমাঃ যোহরা (রাঃ—আঃ) পাক (পবিত্র)। প্রসবের পরেই তিনি গোছল (স্নান) করিয়া ঐ দিন শামের নমায্ (মগরেবের নমাজ) পড়িয়াছিলেন। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বর্ণনা করিলেন যে, হাছন (রাজিঃ)-এর আকিকাঃ জনাব হজরত ছরওয়ায়ে আলম (ছালঃ) সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে আদেশ করিয়াছিলেন যে, হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া (মাথা কাটাইয়া), সেই চুলের 'হাম-ওজন' (সমান ওজনের) 'চান্দি' (রৌপ্য) খায়রাত করিয়া দিবে। ঐ চুলের ওজন ১ দরম বা তদপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল।

হজরত খাতুনে জরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, বকরীর একখানি রাণ (সম্পূর্ণ পা) ও একটি দরম দাঁড়কে দেওয়া হইয়াছিল। হজরত আছমাঃ-বিন্-য়মিছ (রাঃ—আঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জন্মগ্রহণের ৭ম দিবসে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর আকিকা কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। দুইটি 'মেন্‌চেয়ে' (মেঘ বা দোন্ডা) যবেহ করা হর, আর দাঁড়কে উহার রাণ দেওয়া হইয়াছিল। এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার চুলের পরিমাণ চান্দি খায়রাত করিয়া দেওয়া হয়। তৎপর হজরত নবী (ছালঃ), হাছন (রাজিঃ)-এর মস্তকে 'খোশবু' (সুগন্ধি দ্রব্য) লাগাইলেন; আর হজরত আছমাঃ

(রাঃ—আঃ)-এর প্রতি ফরমাইলেন, “ অগ্নি আছমা ! বাগকের মস্তকে ‘খুন’ (রক্ত) লাগান ‘জাহেলিয়তের’ (অসভ্যতার) ‘রছম’ (নিষম) ।” জাফরাণ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য মস্তকে লাগান উচিত ।

হজরত জাবের (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘হুনায়েনের’ (এমাম ভাতৃ-যুগলের) আকিকা তাঁহাদের জন্মের ৭ম দিনে সম্পন্ন হয় ; আর ঐ দিন ‘খৎনাঃ’ (ত্বক্চ্ছেদ) কার্য্য ও সম্পন্ন হইয়াছিল ।

হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল, আমি তাহার নাম ‘হরব’ (যুদ্ধ—লড়াই-জঙ্গ) রাখিয়াছিলাম । অতঃপর হজরত ছারওয়ারে কায়েনাতঃ (ছালঃ) আমার গৃহে আগমন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বেটা (পুত্র—দৌহিত্র)-কে আমার নিকটে লইয়া আইস । উহার কি নাম রাখিয়াছ ? উপস্থিত লোকেরা বলিলেন, শিশুর নাম ‘হরব’ রাখা হইয়াছে । তিনি ফরমাইলেন, না, তা নয় ; বরং উহার নাম হাছন রাখা হউক । এইরূপে হোছেন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিলে, আমি তাহার নামও প্রথম ‘হরব’ রাখিয়াছিলাম ; কিন্তু হজরত (ছালঃ) তাঁহার নাম হোছেন (রাজিঃ) রাখিলেন । যখন মহছেন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিল, তাহার নামও আমি পূর্ব্ববৎ হরব রাখিয়া ছিলাম ; কিন্তু হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, উহার নাম মহছেন রাখা হইবে । তৎপরে আবু হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন ; আমি ইহাদিগের নাম হজরত হারুণ (আলাঃ)-এর পুত্রদিগের নামানুসারে রাখিলাম । শবর (রাজিঃ), শবির (রাজিঃ) ও মশর (রাজিঃ), হজরত হারুণ আলায়হেচ্ছালামের পুত্রত্রয়ের নাম ছিল ; আর হাছন (রাজিঃ), হোছায়েন (রাজিঃ) ও মহছেন (রাজিঃ) ঐ তিন নামের আরবী ‘তরজমাঃ’ (অনুবাদ) ।

বওয়ায়েত আছে যে, এমাম হাছন (রাজিঃ) ও এমাম হোছেন (রাজিঃ)

‘আহ্লে জন্নত’ (বেহেশত্ বাসী)-এর নাম । ‘যমানাঃ জাহেলিয়তে’ (অসত্যতা বা অন্ধকার যুগে) আরবে বা কোরেশদিগের মধ্যে এই সকল নাম কাহারও রাখা হইয়াছিল না । আর এক রওয়াকেতে বর্ণিত আছে যে, হজুর নবী (ছালঃ) বড় এমাম ছাহেবের নাম হাছন ও কুনিয়েত আবু মোহাম্মদ (রাজিঃ) রাখিয়াছিলেন । অন্ধকার যুগে আরবে এই নাম কাহারও রাখা হয় নাই । আর এক রওয়াকেতানুযায়ী খোদাওন্দ আলম (আল্লাহ জল্লশানহ) হাছন ও হোছেন (রাজিঃ)—এই দুইটি নাম স্বীয় ‘মখ্লুক’ (সৃষ্ট জীব বা মনুষ্য) হইতে ‘পুশিদাঃ’ (গোপন) রাখিয়া ছিলেন । যখন এই দুই ছাহেবদাদাঃ (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিলেন,, তখন হজুর ছরওয়ারে কামেনাত (ছালঃ) ইহা ‘য়েলান’ (ঘোষণা) করিলেন ।

হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই নাম জন্মগ্রহণের সপ্তম তারিখে—আকিকার দিনে রাখা হইয়াছিল । হজরত আবু রাফেয় (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন এমাম ভ্রাতৃ-যুগল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) উহাদের কাণে আযান দিয়াছিলেন ।

হজরত আব্বাছ (রাজিঃ)-এর ‘আহ্লিয়া’ (স্ত্রী) ওন্মোল ফজল (রাঃ—আঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি ঐ হজরত (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলাম, আমি ‘খাবে’ (স্বপ্নে) দেখিলাম, হজুরের পবিত্র ‘আয়া’ (অঙ্গ) হইতে কোনও অঙ্গ আমার গৃহে আছে । হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আপনার স্বপ্ন খুব ভাল । ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; আর আপনি তাহাকে দুগ্ধ পান করাইবেন । বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল । অর্থাৎ যখন এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি হজরত কুলছমের

সঙ্গে, হজরত ওম্মোল ফজল (রাঃ—আঃ)-এর ও দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন ; স্ততরাং স্বপ্নের 'তায়বির' (ফল অর্থ) পূরা হইয়াছিল।

হাকেম, হজরত জাবের (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত রহুলোল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলাহ্ ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন, “ প্রত্যেক মাতা বেটাঙ্গির 'আছবাহ্' (পিতার পক্ষ হইতে রেশ্তাদার) হয় ; কিন্তু কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-এর দুই পুত্রের কোন আছবাহ্ নাই ; আমিই ঐ উভয় ভ্রাতার আছবাহ্ । ”

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া, শুরুপক্ষের শশি কলার ত্রায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। মাতামহ হজরত ছরওয়ায়ে আলম (ছাগঃ) তাঁহার প্রতি কতই না স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতেন। পিতা মাতার ও আদরের সীমা-পরিসীমা ছিল না। মাতা-মহিগণও তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। যখন তাঁহার কথা ফুটিত, এবং আধ আধ স্বরে কথা বলিতে লাগিলেন ; তখন 'নানার' (মাতামহের) আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রায়ই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর গৃহে গমন পূর্বক স্নেহান্বিত 'নওয়াছাঃ' (নাতি—দৌহিত্র)-কে দেখিতেন ; তাঁহার প্রতি আদর ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন ; তাঁহার আধ আধ স্বরের অন্তিময় বালাবলী শুনিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেন। কখনও ক্রোড়ে লইয়া, কখনও বা স্বন্ধে চড়াইয়া স্বীয় গৃহে বা মহজেদে লইয়া বাহিতেন। খেলার জিনিষ ■ খাণ্ড-সামগ্রী দিয়া বালকের সন্তোষ বিধান করিতেন। ঐ হজরতের পরম স্নেহের পাত্র নাতি বলিয়া ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণও তাঁহার প্রতি নিতান্ত স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার অর্ধফুট বাক্য শুনিয়া উৎফুল্লিত হইতেন। হজরতের পবিত্র গৃহে ওম্মোল-সুমেদিনগণ তাঁহাকে লইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন ; কত প্রকারে স্নেহ ও 'পেয়ার' করিয়া

আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন । তিনি মাতামহ ও পিতার গৃহের ‘চেরাগ’ (প্রদীপ) স্বরূপ ছিলেন ।

হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা আব্বাছ হজরত (ছালঃ) স্বীয় পবিত্র ‘দওলত খানাঃ’ (গৃহ) হইতে এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে স্বীয় পাক ‘দোশ্’ (স্কন্ধ) মবারকে ছওয়ার করাইয়া (চড়াইয়া) মস্জিদে তশরিফ্ আনিতেছিলেন ; এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বলিল, ওয়াহ্ মির’! ছাহেব্বাদে, তোমার ‘ছওয়ারি’ ত খুব বেশ ! তাহা শুনিয়া হজরত ছরওয়ারে কায়েনাত (ছালঃ) ফরমাইলেন, ছওয়ারও ত আছে। (বেশ—ভাল) আছে ।

দ্বিতীয় বৎসর অর্থাৎ ৪র্থ হিজরীর ৪ঠা কিংবা ৬ই শা’বান তারিখে, সোমবার দিন হজরত এমান হোছেন (রাজিঃ) ভূমিষ্ঠ হইলেন । সূতরাং জ্যেষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) ছাহেব্ব অপেক্ষাও কনিষ্ঠ এমাম (রাজিঃ) ছাহেব্বের বয়ঃক্রম এক বৎসরের কম ।

ছহীহ্ বোখারী গ্রন্থে হজরত ওক্বাঃ-বিন্-হারেছ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে, একদা হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাজিঃ), আছরের নমায়্ আদায় করিয়া, হজরত আলী মরতুজাঃ (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে মস্জিদ হইতে বাহির হইলেন ; পথিনধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) বালক-দিগের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইলেন ; এবং ফরমাইলেন, এই বালক ত ছুরত-শকলে (আকৃতি ও চেহেরায়) জনাব রছুলে খোদা (ছালঃ)-এর ‘মোশাবাহ্’ (আকার বিশিষ্ট) ; হে আলি (রাজিঃ) ! আপনার ছুরতের সঙ্গে ত ইহার আকার মিলিতেছে না । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একথা শুনিয়া হাস্য করিলেন ।

জামেয় তেরমজিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) মস্তক হইতে ‘ছিনাঃ’ (বক্ষঃস্থল) পর্য্যন্ত, আর হজরত এমাম হোছেন

(রাজিঃ) ছিনাঃ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ‘মোশাবাহ’ (আকার বিশিষ্ট) ছিলেন ।

মহা বিদ্বান্ ও অদ্বিতীয় হাদীছ-বেত্তা হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি যখন এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে দর্শন করি, ‘ফরীত মহব্বতে’ (ঐকান্তিক ভালবাসায়) আমার ‘আছু’ (অশ্রু) বাহির হইয়া পড়ে । একদা জনাব হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ) স্বীয় দওলত থানা হইতে বাহির হইলেন ; এবং প্রথমে মছজেদে তশরিফ্ আনিলেন ; পরে আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একদিকে গমন করিতে লাগিলেন ; এমন কি, আমরা বাজার-বনি-কনিকার এর পথে মছজেদ নববীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম । পথিমধ্যে তিনি একস্থানে উপবেশন করিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, আমার বেটাকে ডাকিয়া আন । ইতিমধ্যে এমাম হাছন (রাজিঃ) দৌড়িয়া আসিলেন এবং হজুর (ছালঃ)-এর ‘আগুশ্ মবারকে’ (পবিত্র ক্রোড়ে) বসিয়া গেলেন । হজরত (ছালঃ) পুনঃ পুনঃ স্বীয় পবিত্র মুখ তাঁহার মুখে লাগাইতে এবং বলিতেছিলেন, “খোদা ওয়ান্দাঃ ! আমি ইহাকে ‘পেয়ার’ (স্নেহ) করি, আর যে ব্যক্তি ইহাকে পেয়ার করে, সেও আমার প্রিয় ব্যক্তি ।”

হজরত আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন, একদা (হজরত এমাম) হাছন (রাজিঃ), হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন ; আঁ হজরত (ছালঃ) একবার বালক হাছন (রাজিঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, আর একবার উপস্থিত জনগণের দিকে তাকাইয়া দেখিতে ছিলেন । হজুর (ছালঃ) তখন মিস্বরের (বেদীর) উপর উপবেশন করিয়াছিলেন । ঐ সময় তিনি স্বীয় প্রিয় দৌহিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া ফরমাইতেছিলেন, “আমার এই বেটা ‘ছরদার’ (নেতা) ; আর ‘ওশ্বেদ’ (আশা) আছে, ইহার দ্বারা মোছলমান

দিগের ‘দো-গেরদের’ (দুই সম্প্রদায়ের) মধ্যে ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি) স্থাপিত হইবে । ”

আছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), হজরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লাম হইতে রেওয়াজেত করিয়াছেন যে, হজুর (ছালঃ) আমাকে ও হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইতেন, এবং ফরমাইতেন, “ হে আল্লাহ্ ! আমি এই উভয় বালককে ‘দোস্তু’ (বন্ধু—প্রিয়) রাখি ; তুমিও ইহাদিগকে দোস্তু রাখ (বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর) । ”

হজরত বরাঃ (রাজিঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি ; একদা (এমাম) হাছন (রাজিঃ), হজরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন ; সেই অবস্থায় আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, “ হে আল্লাহ্ ! আমি ইহাকে দোস্তু রাখি, তুমিও ইহাকে দোস্তু রাখিও (বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিও) । ”

হজরত আনছ (রাজিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হইতে হজরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লামের ‘গশাবাহ্’ (আকৃতির আদর্শ) আর কেহ ছিলেন না । অর্থাৎ হজুর (ছালঃ)-এর শারীরিক গঠনের সঙ্গে তাঁহার এই প্রিয় দোহিত্রের শারীরিক গঠন অনেক পরিমাণে মিলিত ।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ছরওয়ারে আলম (ছালঃ), স্বীয় এই দোহিত্র-রত্নকে কিরূপ স্নেহ করিতেন । তিনি ইহাকে এবং ইহার কনিষ্ঠ সহোদর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে চক্ষুর পুত্তলীর স্থায় বা হৃৎপিণ্ডের টুকরার স্থায় জ্ঞান করিতেন । স্নেহময়ী ছহিতা ও প্রিয়তম জামাতা-রত্নের সমস্ত স্নেহ রাশি এই দুই ভ্রাতার প্রতি ■■■ করিয়াছিলেন । ক্ষণকাল ইহাদিগকে না দেখিলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেন । তখন তাঁহার পক্ষে কি সঙ্কট জনক

সময়। বদর ও ওহদের ভীষণ যুদ্ধ এবং আরও কতিপয় ছোট বড় যুদ্ধ হইয়া গেলেও, একদিকে মক্কার কোরেশগণ, অন্যদিকে মদীনার মোনাফেকগণ এবং খয়বর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত যিহুদিগণ তাঁহার ভয়ানক রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে ছিল; আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই নবোদ্ভূত এছলাম-শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইত। ঐ হজরত (ছালঃ) একদিকে এই সকল প্রবল শত্রুর কবল হইতে এছলামকে রক্ষা করিবার জন্য দিবানিশি চিন্তা ও 'খেয়াল' করিতে এবং প্রয়োজনানুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছিলেন। অন্য দিকে এছলাম প্রচার কার্যে, হেজরতকারী (স্বদেশত্যাগী) মোছলমানদিগের জীবিকা-নির্বাহ-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। হেজরতকারীদিগের বাসস্থান নির্দেশ, তাঁহাদের অন্ন-বস্ত্র ও উপার্জনের পস্থা নির্দেশ, আবিশিনিয়ায় হেজরতকারী মোছলমানদিগের ভাবনা-চিন্তা, ইত্যাদি কত বিষয়েই না তাঁহাকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইয়াছিল; স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা বিভিন্ন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিবার উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন; এতদ্ব্যতীত স্নেহ-কুসুম নাতিদ্বয়ের প্রতি স্নেহ ও করুণা বর্ষণে কিছুমাত্র বিরত ছিলেন না। তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে তিনি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন।

খয়বর 'ফতেহ্' (জয়) এবং ফদক অধিকারে আইসাম ঐ হজরত (ছালঃ)-এর আর্থিক অবস্থা একদিকে যেমন সচ্ছল হইয়াছিল, তেমনই ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। হেজরতকারী অর্থাৎ দেশত্যাগী মোছলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহের পরিমাণও অপরিমাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার আরবের বিভিন্ন প্রদেশবাসী নব-দীক্ষিত মোছলমান বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ দলে দলে মদীনা আসিতেছিলেন; ঐ সকল লোকের খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা একটা মহা বিরাট ব্যাপার ছিল; ইহা ছাড়া বহু দূরবর্তী নানা

স্থানের দরিদ্র লোক অন্ন-বস্ত্রের প্রার্থী হইতেন, তাঁহাদের ও প্রার্থনা পূর্ণ করা হইত । তখনও রত্নতুল্যমাল তহবিলে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইতে ছিল না ; সুতরাং আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ব্যক্তিগত আয় হইতে ঐ সকল ব্যয় সঙ্কলান করা হইত । একান্ত সর্বদাই তাঁহার অর্থাতাব থাকিত ; তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না ; সুতরাং অনেক সময় তাঁহাদিগকে উপবাস থাকিতে হইত । পক্ষান্তরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ও এমন কোনও কাজ কর্ম কিংবা আয়ের পথ ছিল না ; বন্ধারা তিনি সচ্ছল ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন । সুতরাং নিতান্ত অভাবের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবন কাটিয়া বাইতেছিল । এই অবস্থায় দ্রাঘ-যুগলের বাল্য-জীবন খুব অসচ্ছল অবস্থায়ই অতিবাহিত হইয়াছিল । কিন্তু তাঁহার আদর্শ পিতা মাতা এবং আদর্শ মাতামহের নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনে ■ আল্লাহ তা-লার দরবারে “ শোকর-গোবার ” হওয়া ব্যাপারে তাঁহারা বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত ছিলেন । বিলাসের কোনও উপকরণেরই তাঁহাদের প্রয়োজন ছিল না ; যও এর সাধারণ রুটি ও দাল-তরকারি বা শাক-ছজ্জীই তাঁহাদের জন্ত বথেষ্ট ছিল । তাঁহারা কদাচিত মাংসের মুখ দেখিতেন । মোটা কাপড়ের তহবন, পিরাহন বা চাদর, খুব বেশী হইলে সাধারণ পা-জামা ও পাগড়ি বা টুপি তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের অভাব পূরণ করিত । ‘নালায়েন’ (খড়ম) বা সাধারণ ‘বিনামা’ (জুতা) তাঁহারা পায় দিতেন । এই ত ছিল তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটা । অবশ্য ঐ সামান্ত পোষাক পরিচ্ছদ ও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইত । খাণ্ড, পরিচ্ছদ ও চাল-চলন সম্বন্ধে যে উন্নত আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজ করিত, তদ্বারাই তাঁহারা সাধারণ আহার ও পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকিতেন । যখন অতি তরুণবয়স্ক বালক ছিলেন, ভাল-মন্দ কিছু বুঝিতে

পারিতেন না, তখনই ভাল বস্ত্রাদির জন্য মহামাননীয়া মাতার নিকট কখনও কখনও আবদার করিয়াছিলেন ; একটু বৃষ্টিবার শক্তি হইবাগাত্ত তাঁহারা বৃষ্টিতে পারিলেন, তাঁহাদের মহা সম্মানিত মাতামহ আল্লাহ্ তা-লার প্রেরিত মহানবী, শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর ও মানবের মুক্তি পথ-প্রদর্শনকারী । পিতা অদ্বিতীয় বীর পুরুষ, পক্ষান্তরে অদ্বিতীয় তাপস ; মহামাননীয়া জননী রছুল-নন্দিনী খাতুনে জন্নত ; তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই পার্থিব বিষয়-সম্পদের লিপ্সা নাই ; ভাল খাদ্য ও উত্তম পরিধেয় বস্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই । মানবের কল্যান সাধনই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । এজন্য দরিদ্রতাকেই তাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন । একমাত্র পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লার আদেশ পালন এবং তাঁহার সন্তুষ্টি-বিধানই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । মহামান্ন হাযাযাঃ (রাজিঃ)-দিগের মধ্যেও তাঁহারা ঐ সকল গুণেরই উন্মেষ দেখিতে পাইতেন । তাঁহারা যদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেই দিকেই মানবের সর্বোত্তম আদর্শ তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত । সুতরাং বাল্যকাল হইতেই পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি তাঁহাদের বিরাগ জন্মিয়াছিল । কোনও রূপ হীন আদর্শ তাঁহাদের নয়নতলে কখনও পতিত হয় নাই । তাঁহারা “ ধরাতলে স্বর্গধামই ” দেখিতে পাইতেন । তাঁহাদের জ্ঞান এমন সৌভাগ্য কাহারও অদৃষ্টে কখন কালেও ঘটে নাই । পৃথিবীতে লক্ষাধিক পয়গম্বর (আলাঃ) ও অন্যান্য ধর্ম-প্রবর্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও পুত্র-পৌত্র যা দোহিত্রের এমন সৌভাগ্য ঘটে নাই যে, মাতামহ, পিতা, মাতা, মাতামহিগণ, মাতামহের শিষ্য মণ্ডলীর নিকট ধর্ম-নীতি ও সংসার-নীতি সর্বদা সুন্দর রূপে শিক্ষা লাভ করিয়া সর্বপ্রকার আদর্শ চরিত্র মানুষ হইয়াছিলেন ; আর সর্বশক্তিমান্ বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্ তা-লার স্বর্ষ প্রকার আদেশ পালনে, তাঁহার প্রতি আত্ম-সমর্পণ করণে

সমর্থতা লাভ করিয়াছিলেন ; সম্পূর্ণ আদর্শ চরিত্র পরম ধার্মিক পুরুষ রূপে পৃথিবী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ; অবশেষে জীবন দান করিয়া আত্মোৎসর্গের জলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন এবং “শহীদ” গণের শিরোভূষণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কোটি কোটি মানুষ তাঁহাদের শোক-প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদের শাহাদতের স্মৃতি চিরকালের জন্য জাগরুক রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আজও হইয়াছেন । তাঁহাদের শাহাদতের স্মৃতি স্বরূপ লোকে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানও সদানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন । উপাসনা-আরাধনা, (নফল নমাজ পড়া—এবাদৎ-বন্দেগী করা), রোযাপালন করা, পবিত্র কোরআন পাক তেলাওয়াত করা, দান-খায়রাত করা, তাঁহাদের পবিত্র আত্মার মজল কামনা করা ইত্যাদি পুতকার্য্য দ্বারা আত্মা-চরিতার্থ করা হইয়া থাকে ; এরূপ কোন্ পয়গম্বর, পয়গম্বর-পুত্র বা তাঁহাদের পৌত্র ও দোহিত্রের জন্য হইয়াছিল বা হইয়া থাকে ? সুতরাং মহামাননীয় এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বয় কত বড় সৌভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন, ইহা চিন্তাও খেয়াল করিবার বিষয় । অবশ্য এই উপলক্ষে কতকগুলি লোক কতক ‘বেদম্মাত’ কার্য্য ও নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা নিতান্তই দুঃখ-জনক । সে গুলি বাদ দিলে আর যে সকল সদানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহা অভুলনীয় ; কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার শতাংশের একাংশ পরিমাণ সদানুষ্ঠানেরও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না । পাওয়া যায় কতকগুলি অসার আমোদ-প্রমোদ, অস্বাভাবিক পাঠানুষ্ঠান-পাপাচার ও অসং কার্য্যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় । উহারই অনুকরণে একদল মোছলমানও কতকটা অনাচার করিয়া থাকে ।

তখন আরবে—বিশেষতঃ মক্কা-মদীনায়া কোনও রূপ নিয়মিত মাদ্রাছা-মক্তব প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না । ব্যক্তি বিশেষের নিকট শিক্ষা লাভের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । অন্ধকার যুগের পর পবিত্র এছলামী

যুগের আবির্ভাব হইলেও, প্রথম প্রথম অবস্থায় ঐ প্রমাণাতেই শিক্ষালাভ হইত। পবিত্র কোরআন ও হাদীছের শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা ছিল। কোরআন ত আল্লাহ্ তা-লার মহাবাণী, সে শিক্ষা আঁ হজরতের নিকট, কোরআনের আয়াত সমূহ 'নাযেল' (অবতীর্ণ) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র-চরিত্র ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণ শিক্ষা লাভ করিতেন; আর হজরতের মৌখিক উপদেশ ও তাঁহার আদর্শ কার্য-কলাপ পবিত্র হাদীস রূপে মোছলমানদিগের শিক্ষার অবলম্বন বা বাহন ছিল। নরনারী সকলেই সে শিক্ষা লাভ করিতেন। আরবী তাঁহাদের মাতৃ-ভাষা ছিল বলিয়া, মোটামুটি রূপে কোরআনের অর্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন। জটিল অংশ আঁ হজরত (ছালঃ) কিংবা তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ছাহাবাঃ ও মহা বিদ্বান্ ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। মহামাননীয়া ওম্মোল-মুমেনিনগণ, হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) এবং অন্তান্ত ছাহাবীয়া (রাঃ—আঃ)-গণ, নারী-দিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিতেন। ধর্ম্মাঙ্গুসন্ধিৎসু নারীগণ ঐ সকল পবিত্র চরিত্র ধর্ম্মপ্রাণা ও ধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞা মহিলাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার মহলা-মছারেল এবং ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতেন। স্থলকথা, তখন মৌখিক শিক্ষাই শিক্ষা লাভের সোপান স্বরূপ ছিল। নানা বুদ্ধিবিগ্রহ, অভিযান প্রভৃতি গুরুতর কার্যে লিপ্ত থাকিয়া আঁ হজরত (ছালঃ) পবিত্র বচন-সুধা পান করাইয়া ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের ধর্ম্ম-পিপাসা নিবারণ করিতেন; কোরআন পাকের সহজ-সরল ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন। সেইরূপে আবার মহামাননীয়া ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-গণও জন-সাধারণের মধ্যে ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিতেন—জন-সাধারণকে উপদেশ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। বহু উপযুক্ত ও শিক্ষিত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) বিভিন্ন প্রদেশে,

বিভিন্ন জনপদে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরিত হইয়া, কোরআনের পবিত্র শিক্ষা দান করিতেন—হাদীছ বয়ান করিতেন । এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই বিশাল আরব দেশের মধ্যে এছলামের পবিত্র জ্যোতিঃ দ্রুতভাবে বিকীর্ণ হইয়াছিল । উত্তরে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও এরাক হইতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্য্যন্ত, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সূয়েজ যোজক হইতে পূর্বে পারস্তোপসাগর ও ওমান উপসাগর পর্য্যন্ত বিশাল জনপদের মধ্যে এছলামের পবিত্র শিক্ষা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল ।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) প্রথমে স্বীয় আদর্শ ধর্ম-পরায়ণা জননী খাতুনে জরত হজরত কাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর নিকট—এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতামহ হজরত ছরওয়ারে কায়েনাৎ (ছালঃ)-এর নিকট এছলামের পবিত্র শিক্ষা লাভ করিতে ছিলেন । পিতা হারদরে কারার হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মোখিক শিক্ষাদান করিতেন । দুই ভাই মাত্র কয়েক মাসের বড়-ছোট ছিলেন ; স্মৃতরাং উভয় ভা'য়ের শিক্ষাই একত্রে চলিয়া ছিল । মহামানবীয় মাতামহ, মহামতি ওয়ালেদ মাজেদ, মহামানবীয়া ওয়ালেদা মাজেদা, প্রত্যেক বিষয়ে মোখিক শিক্ষা দিতেন ; ধর্ম-নীতি ও সংসার-নীতি সম্বন্ধে অতি মূল্যবান উপদেশ প্রদান পূর্বক তাঁহাদের তরুণ হৃদয়ে ধর্ম-বীজ বপন করিতেন । তদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের মুখেও উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতেন । সর্ব প্রকারের আদর্শ শিক্ষায়ই তাঁহাদের হৃদয় নির্মল ও জ্যোতিষ্মাণ হইতে ছিল । কোনও রূপ কুশিক্ষা বা কু আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে কখনও স্থাপিত হয় নাই । তাঁহাদের সমবয়স্ক বালকগণ ও আদর্শ চরিত্র লইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে ছিল । খেলার সাথিগণের মধ্যেও কেহ বিপথগামী ছিলেন নী । সকলেই বাল্যকাল হইতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিতেছিলেন । এই শিক্ষা

প্রধানতঃ মোখিক ছিল। হজরত আবদুল্লা-বিন-যোবের (রাজিঃ), হজরত আসামা-বিন-যয়েদ (রাজিঃ) প্রভৃতি তরুণ মোছলেম-যুবকগণ এমাম ভ্রাতৃ-যুগল হইতে কিছু অধিক বয়স্ক ছিলেন। মহামাননীয় নানা, মহামান্ন পিতা ও মহামাননীর ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ হইতে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-গণ যে মোখিক শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন; সে শিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতেছিল। তাহা প্রস্তরে বা লৌহ কলকে খোদিত স্মারক-লিপির ন্যায় তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, সারা জীবনে তাহার কিঞ্চিদ্ভ্রান্তও ব্যত্যয় ঘটে নাই। সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ তা-লার প্রতি তাঁহাদের অলঙ্ঘন বিশ্বাস ছিল; তাঁহার আদেশ-নিষেধ অতি সতর্কতা সহকারে পালন করিতেন। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে অতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। মহামাননীয় নানার ত কথাই নাই; তাঁহার ওয়ালেদ মাজেদ ও কোরআনের প্রকাশ্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ ছিলেন। সুতরাং সে শিক্ষায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিয়া, আধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী হইতেছিলেন। তাঁহাদের শিষ্টতা-নম্রতা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ দর্শনে সকলেই শত মুখে তাঁহাদের প্রশংসা কীর্তন করিতেন। ক্রোধ ও লোভাদি জঘন্য রীপু হইতে তাঁহারা সর্বতোভাবে ‘পাক’ (পবিত্র) ছিলেন। গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সমবয়স্ক ও বয়োনিষ্ঠ দিগের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা, দীন-দরিদ্রের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি, তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করিতে বিশেষ তৎপরতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, হিংসা-দ্বेष ও পরিত্রী কাতরতা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্পূক্ত; কাহারও দুর্গাম প্রচার বা গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে ‘পাক’ (পবিত্র) ছিলেন। মানুষের মধ্যে যত প্রকার সদগুণ ও সংপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে; এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের

মধ্যে তাহার কিছুই অভাব ছিল না। তাঁহারা সর্বতোভাবে ধর্ম-প্রাণ
 খাটি মনুষ্য ■ আদর্শ মোছলমান ছিলেন। অক্লান্ত ও অনাচারের বিরুদ্ধে
 তাঁহারা প্রাণপণে বুদ্ধিতেন। তাঁহারা মহামানবীয় নানা ও মহামান্য
 পিতার দরিদ্রতার গৌরব অনুভব করিতেন। কৃপণতা কাহাকে বলে,
 তাহা জানিতেন না। কৃপণতা ও অর্থ-গুরুতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা
 করিতেন। নমাজ-রোযা পালন, কোরআন তেলাওত, তছবিহ্ জপ ইত্যাদি
 ধর্ম্মানুষ্ঠানে, পবিত্র হজ্জ্ কার্য সম্পাদনে জীবনে কখনও শোখিলা প্রদর্শন
 করিয়াছিলেন না। ফলতঃ তাঁহারা যেন ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতীমূর্তি
 ছিলেন। তৃতীয় হিজরীর ১৫ই রমজান, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)
 জন্মগ্রহণ করেন, স্মৃতিরাং ঐ বৎসরের সারে তিন মাস, আর একাদশ
 হিজরীর ২ মাস ১২ দিন এই প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস এবং ৪র্থ হিজরী
 হইতে দশম হিজরী পর্য্যন্ত ৭ বৎসর এই কিঞ্চিদূর্ণ ৭৥০ বৎসর বয়সে
 হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), তাঁহার পরম ভক্তি-ভাজন নানা, পৃথিবীর
 সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার প্রতি একান্ত স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শনকারী
 জনাব হজরত রুহুলে আকরম (ছালঃ)-কে হারাইয়া ছিলেন। আবার ইহার
 প্রায় ৬ মাস পরে কিঞ্চিদূর্ণ ৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্নেহ-স্বরূপিনী জননী
 হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে হারাইয়া, প্রায় সর্ব প্রকার
 স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। একমাত্র পিতা ব্যতীত প্রকৃত স্নেহ-
 প্রদর্শনকারী আর কেহ রহিলেন না। কনিষ্ঠ এমাম ছাহেব (রাজিঃ) এই
 হিসাবে প্রায় ৬৥০ ও ৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরম শ্রদ্ধেয় মাতামহ ও
 পরম শ্রদ্ধেয়া গর্ভধারণীকে হারাইয়া ছিলেন। এই তরুণ বয়স্ক বালক-
 , ঘরের মস্তকের উপর হইতে স্নেহের পবিত্র ছায়া যেন চলিয়া গিয়াছিল,
 শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল।
 তাঁহাদের তাৎকালীন শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলেও হৃদয়

অবসন্ন হইয়া পড়ে । তখন একমাত্র মহামান্ন পিতার অসাধারণ স্নেহই তাঁহাদের সাহায্যের একমাত্র অবলম্বন ছিল । পিতা হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ) ■ তাঁহাদের শোকোপনোদনের ■ প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছিলেন ।

সর্বপ্রকার গুণগ্রাম ব্যতীত এমাম ভ্রাতৃ-যুগল মহামান্ন পিতার মহাবীরত্বের ও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন । তাঁহারা কেবলমাত্র নবীর পুতুল ছিলেন না । যৌবন সমাগমে আরব বালকদিগের স্থায় যুদ্ধ-বিজ্ঞা ও যথানিয়মে শিক্ষা করিয়াছিলেন । সমবয়স্ক ও বাল্যসঙ্গী যুবকদিগের সঙ্গে মিলিয়া অশ্বারোহণ, তরবারি ও বর্শা সঞ্চালন, তীর নিক্ষেপ পূর্বক লক্ষ্য ভেদ, কুশল্টি-কছরত প্রভৃতি বীর জনোচিত সর্বপ্রকার সমর বিজ্ঞাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন । আরব ও হাশেমী বীরত্ব তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল । তাঁহাদের ধমনীতে পিতৃ-পুরুষদিগের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইত ; সুতরাং আরবের কোনও বংশের লোক অপেক্ষা তাঁহাদের শৌৰ্য্য-বীৰ্য্য কিছুমাত্র কম ছিল না ; বরং সর্বাপেক্ষা অধিকই ছিল । জমল যুদ্ধে, ছফিন যুদ্ধে, উত্তর আফ্রিকা ■ কনষ্টান্টিনোপলের ও শেষ কারবালার যুদ্ধে তাঁহাদের সেই বীরত্বের " জওহর " প্রকাশ পাইয়াছিল ।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), কনিষ্ঠ ভ্রাতা ■ ভগিনিদ্বয়কে বড়ই স্নেহ করিতেন । তাঁহাদের সুখ-শান্তির দিকে সর্বদাই বিশেষ খেয়াল রাখিতেন । তিনি পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ■ কনিষ্ঠা ভগিনীদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ-সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণেই প্রদর্শন করিতেন । মহামান্ন পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি চিরদিনই অটুট ছিল । জনবীর মৃত্যুর পর জনক ক্রমান্বয়ে কয়েকটি বিবাহ করিলেও, মহামান্ন শেরে খোদা (কঃ—ওঃ)

এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের প্রতি একই রূপ স্নেহ-পরায়ণ ছিলেন । বরং মাতামহ ও মাতৃহীন বলিয়া স্নেহ ও ভালবাসা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । পুত্রদ্বয় ও পিতার প্রতি তদমুখ্যায়ী ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একটু মাত্রও কার্পণ্য প্রদর্শন করিতেন না । ফলতঃ তাঁহারা আদর্শ নানার আদর্শ নাতি এবং আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্র ছিলেন । এমন পুত্র-রত্ন পৃথিবীতে অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল ।

জননীর পরলোক গমনে এই তরুণ বয়স্ক এমাম ছাহেব (রাজিঃ) শোকে এমন অভিভূত হইলেন যে, তাঁহাদের সেই শোকের পরিমাণ নির্ণয় করা অসাধ্য । তাঁহাদের সেই কোমল হৃদয় পরম শ্রদ্ধাঙ্গাদ 'নানা' (মাতামহ) এবং অতি শ্রদ্ধেয়া ওয়ালেদাঃ মাজেদার অন্তর্ধানে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল । তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেই দিকেই শোকের জীবন্ত চিত্র তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত । মহাজেদ নববীতে গেলে মাতামহের স্থান শূন্য দেখিতেন ; মহাজেদের যেস্থলে দাঁড়াইয়া হজরত ছরওয়ারে কায়েনাৎ (ছালঃ) এগামতি করিতেন, সেই স্থানে এক্ষণে হজরত আবুবকর হিদ্দিক (রাজিঃ) কে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইতেন । জুমার দিন যে মিম্বরে দাঁড়াইয়া মহামান্ন মাতামহ খোৎবা পাঠ করিতেন, সেখানে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না ; নানার গৃহে গমন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিত না । মহামাননীরা নানীগণের সকল গৃহেই আ হজরত (ছালঃ)-এর শয্যা শূন্য দেখিতেন ; সকলই আছে, সকলেই আছেন ; কেবল নানার স্থানই শূন্য দেখিয়া তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইত, অশ্রুধারায় বন্ধঃপ্রাবিত হইত ; নানীগণ নানাপ্রকার সাহুনা দিতেন, ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুখন করিতেন, অশ্রু মুছাইয়া দিতেন, সঙ্গে

সঙ্গে নিজেরাও নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতেন। ছনিয়ার যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পরম মেহাধার দৌহিত্র দ্বয়কে ক্ষণকাল না দেখিলে অধীর হইতেন, দৌড়িয়া মেহম্মদী কন্টার গৃহে উপস্থিত হইতেন, রাস্তায় দেখিতে পাইলে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন, কখনও বা স্কন্ধে ধারণ করিতেন, আজ সেই পরম ভক্তি-ভাজন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ সম্পন্ন মাতামহ কোথায় ? নানাজানকে ত আর দেখিতে পাইতেছেন না। গৃহে পরম শ্রদ্ধার ওয়ালেদ মাজেদের মুখপানে তাকাইলে দেখিতে পাইতেন, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার পবিত্র বদন মণ্ডল বিষাদ পূর্ণ; তাহাতে প্রকৃত্তার লেশমাত্রও নাই। মাতার অভাবে গৃহ অন্ধকার। মাতার শয্যা, মাতার নমাজের স্থান, তাঁহার আটা পিষিবার জাঁতা, পাক করিবার উনান, গৃহস্থালীর সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী রহিয়াছে; কিন্তু জননীকে কোথাও দেখা যাইতেছে না। মাতৃহীনা ক্ষুদ্র ভগিনী দ্বয়ের মুখ-চন্দ্রিমা গভীর শোক-মেঘে আচ্ছন্ন। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, শোকের জীবন্ত মূর্তি তাঁহাদের নেত্রপথে পতিত হয়। নানাজানের কবর শরীফে গিয়া অশ্রু-বিসর্জন করেন; আশ্রা জানের সমাধি স্থলে উপস্থিত হইয়া শোকাশ্রুতে বক্ষঃ প্রাবিত করেন; হাহাবাঃ (রাজিঃ) গণ দেখিতে পাইলে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া, ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া গৃহে পঁছছাইয়া দেন। পিতা যখন গৃহে থাকেন, ক্রোড়ে লইয়া মধুর বচনে সাশ্বনা দেন, আর খোদার দরগায় “ছবর” এবং “শোকর” করিতে বলেন; এবং নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। দুই ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া মদীনার নরনারিগণ মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করেন। বালকদ্বয় যেন কি হারাইয়াছেন, কাহার সন্ধানে ফিরিতেছেন, সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে আর খেলা করেন না। কোনও স্থানে গিয়াই তাঁহারা শান্তি পান না। উপর্যুপরি দুইটি ভীষণ শোকের আঘাতে তাঁহাদের সদা

প্রফুল্ল আনন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন ; এক্ষণে আর উদর পূরিয়া
আহার করেন না ; আহার করিতে বসিলে পরম স্নেহশীলা জননীর
কথা মনে পড়ে ; মহামানবীর নানার কথা স্মৃতিপথে পতিত হয় ; আর
আহার করিবার প্রবৃত্তি থাকে না । মহামানব ওয়ালেদ মাজেদ নানা-
প্রকার সাধনা দিয়া কিছু আহার করান । পুত্রদ্বয়ের অবস্থা দর্শনে
তঁাহার কলেক্সা ফাটিয়া যায় ।

যে আদর্শ বীরপুরুষ, পৃথিবীর অদ্বিতীয় বোদ্ধা শেরে খোদা হজরত
আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রচণ্ড প্রতাপে—সিংহ-বিক্রমে বড় বড় নাম
বাদাঃ বীরপুরুষ ভয়ে একান্ত অভিভূত ও কেশরীর সম্মুখস্থ শৃগাল শিশুর
ভায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িত ; যে তঁাহার সম্মুখীন হইত, তঁাহার
আর নিস্তার ছিল না ; যে কোনও প্রচণ্ড শত্রুকে তিনি হয় শমন সদনে
পাঠাইতেন, কিংবা ভূপাতিত করিয়া বন্দী করিয়া লইতেন ; আ হজরতের
তিরোভাবে তঁাহার সে শৌর্য্য-বীৰ্য্য যেন অন্তর্হিত হইয়া ছিল ; তিনি
শোকে একান্ত মুহমান হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এক্ষণে একমাত্র সাধনার
পাত্রী আদর্শ পত্নী খাতুনে জন্নতের পরলোক গমনে একেবারে মুষরিয়া
পড়িলেন । তঁাহার সদা প্রফুল্ল বদনে আর হাস্য প্রকটিত হয় না ।
মহামানব পিতার এই শোক-ক্লিষ্ট বদন দেখিয়া পুত্রদ্বয়ের শোক-সিদ্ধ আরও
যেন উছলিয়া উঠে । তঁাহারা কোনও স্থানেই শান্তি পান না । মহাজেদ
নববীতে, নানাজানের গৃহে, তঁাহার রওযাঃ মবারকে, জননীর কবর পার্শ্বে,
স্বীয় গৃহে, খেলার স্থানে—সর্বত্রই অশান্তি—দারুণ অশান্তি ! তবু
মহামানব পিতা, মহামানবীয়া মাতামহিগণ ও ছাহাবার কারাম (রাজিঃ)-
দিগের প্রবোধ বাক্যে, উপদেশে, ‘তছলিতে’ (সাধনা বাক্যে) অনেকটা
শোক সংবরণ করিয়া থাকেন । দাদা হজরত আব্বাছ (রাজিঃ), চাচ্চা
হজরত আকিল (রাজিঃ), পিতৃব্য হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ

(রাজিঃ), যতদূর সম্ভব, সাহসনা প্রদান করেন ও প্রবোধ দেন । শোকের মাত্রা একটু একটু করিয়া হ্রাস পাইতে লাগিল । মহামান্ব খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ চলিতে লাগিল । নানাদিকের বিদ্রোহ দমনে তিনি নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন । এক সময় এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিদ্রোহিগণ মদীনা তৈয়বাঃ আক্রমণার্থ দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইল । শেরে খোদা হজরত আলী মর্তুজা (রাজিঃ)-প্রমুখ বীরপুরুষগণ তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্ত নগরের বাহিরে প্রহরীর কার্য করিতে লাগিলেন । প্রকাশ্যে এ বিদ্রোহ দমন করিবার শক্তি খলিফার ছিল না ; কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা এছলামকে জয়যুক্ত করিবেন ; সুতরাং অসম্ভব ও সম্ভবে পরিণত হইল । হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খলিফা মহামান্ব হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) ১২ জন বিখ্যাত সেনাপতির অধীনে ১২ দল সৈন্ত বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন ; তাহারা অল্প দিনের মধ্যে সেই ভীষণ বিদ্রোহানল নির্বাপিত করিয়া এছলামের গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । সম্পূর্ণ বিপথগামিগণ মৃত্যু-পথের পথিক এবং আর সকলে তওবাঃ করিয়া পুনরায় এছলামে দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেন । ইতিপূর্বে হজরত ওছামাঃ-বিন্-যয়েদ (রাজিঃ), আ হজরতের আরক কার্য শেষ করিবার জন্ত সিরিয়ার অভিযান করিয়া-ছিলেন ; তিনিও সাফল্য মণ্ডিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । এইবার শাম ও এরাক স্থায়ী ভাবে আক্রমণ জন্ত মোছলেম সেনাদল বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে প্রেরিত হইলেন । আল্লাহ তা-লার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইল । মোছলেম-সেনাপতিগণ প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইয়া অসংখ্য বন্দী ও অপরিমিত ধনৈশ্বর্য ও মাল-আসবাব মদীনায় পাঠাইতে লাগিলেন । এমাম ভাতৃ-যুগল

শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন । মহামান্ন মাতামহ ও মহামাননীয়া জননীর নিকট মৌখিক যে সকল শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহাদের অন্তর্ধানের সে শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল । এক্ষণে একমাত্র ওয়ালেদ মাজেদ হজরত হাযদরে কার্‌রার আলী শেরে খোদা (কঃ—ওঃ)-এর নিকট শিক্ষা-লাভ করিয়া পবিত্র এছলামী-শিক্ষায় পরিপক্বতা লাভ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে ইরান (পারস্য) ও শামের (সিরিয়ার) দিকে এছলামী বিজয়ের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সকল জেহাদে যোগদান করিলেন না । তিনিও হজরত ওছমান জন্নূরায়েন (রাজিঃ), মহামান্ন খলিফার মন্ত্রণা-দাতা ও তাঁহার পক্ষ হইতে চিঠি-পত্র লিখার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন ।

১৩শ হিজরীর ২২শে রবিয়্যুছ-ছানী, রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রে, মগরেবের মমাবের পরক্ষণে, ৬৩ বৎসর বয়সে মহামান্ন খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) পরলোক গমন করিলেন (ইম্মা গিল্লাহে ওয়া ইম্মা এলায়হে রাযেউন) । সুতরাং তিনি কিঞ্চিদূর ২৥০ আড়াই বৎসর কাল মাত্র খলিফার পবিত্র পদে অভিষিক্ত ছিলেন । সেই সময় মধ্যে বয়তুল মাল হইতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বারা হজরত শেরে খোদা আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজ্জহর সংসার-যাত্রা বেশ সচ্ছলভাবে নির্বাহ হইত । এই সময় মধ্যে তিনি অল্প বিবাহ করিয়া-ছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না । তবে একথা স্থনিশ্চিত যে, এ সময় তাঁহার দাস দাসীর অভাব ছিল না । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মহামান্ন পিতার অপরিসীম স্নেহে, মহামাননীয়া মাতামহ ও মহামাননীয়া মাতার শোক কিঞ্চিৎ বিষ্মত হইয়াছিলেন । ছনিয়ার সাধারণ নিয়মানুসারে মানুষের শোকের বেগ ষতটুকু হ্রাস প্রাপ্ত হয় । ইহাদের শোক সে পরিমাণে হ্রাস

হইয়াছিল না। কারণ ইঁহারা নানাজানের “জান্নাত” স্বরূপ এবং জননীর “চক্ষের ভারী” স্বরূপ ছিলেন। মহামান্ন নানা মহামাননীয়া আশ্রা জান তাঁহাদের সমগ্র স্নেহ-রাশি এই দুই ভ্রাতার প্রতি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সে পবিত্র স্বর্গীয় স্নেহের তুলনা হয় না। মহামান্ন মরহুম খলিফাও দুই ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-প্রদর্শন করিতেন। মাতামহিগণ ও স্নেহ-প্রদর্শনে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেন না। দুই ভ্রাতা আবার সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে নির্দোষ খেলা এবং শারীরিক ব্যায়াম ও কুশ্টি-কছরতে প্রবৃত্ত হইলেন।

২৩ হিজরীর ২৭শে যেলহজ্জ তারিখে মহামান্ন খলিফা ওমর ফারুক (রাজিঃ), মগিরাঃ-বিন্-শয়বার এক ‘নছরানী গোলাম’ (খৃষ্টীয়ান ক্রীত দাস) কর্তৃক ভীষণ ভাবে আহত হইয়া ২৪ হিজরীর ১লা মোহররম তারিখে ‘এন্তেকাল ফরমাইলেন’ (ইয়া লিল্লাহে ওয়াইয়া এলায়হে রাযেউন)। এই মহামান্ন খলিফার সাড়ে দশ বৎসর কাল স্থায়ী খেলাফতে এছলামের যে উন্নতি হইয়াছিল, যতদেশ জয় হইয়াছিল, এরূপ ব্যাপার পূর্বে বা পরে আর কখনও ঘটে নাই। ১৪শ হিজরীতে তিনি শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর কন্যারত্ন হজরত ওয়ে কলছুম (রাঃ—আঃ)-কে ৪০ হাজার দরহম দেন মোহরে বিবাহ করেন। এতদ্বারা আহলে বয়তের সঙ্গে মহামান্ন খলিফার বৈবাহিক সম্বন্ধও মহামান্ন এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের সঙ্গে তাঁহার পবিত্র সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মহামান্ন খলিফা (রাজিঃ) বিবাহের পূর্বে ও পরে এই ছাহেবযাদাঃ দ্বয়কে বিশেষ রূপ স্নেহ করিতেন, এবং ভালবাসিতেন।

মহামান্ন দ্বিতীয় খলিফার খেলাফৎ কালেই এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের শুভ-বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। এই সময় তাঁহারা পুরা সংসারী

হইয়াছিলেন । মহামান্ন খলিফা হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ)-এর পরলোক গমন কালে এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর ও এমাম হোছায়েন (রাজিঃ)-এর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসরের কিছু উর্দ্ধ মাত্র ছিল । মহামান্ন দ্বিতীয় খলিফার খেলাফৎ কালে এরাক (মেসোপটেমিয়া), পারস্ত (ইরান), শাম (সিরিয়া), ফলস্তিন (পালেষ্টাইন), মেছের (মিসর বা ইজিপ্ট) দেশ, সাম্রাজ্য, রাজ্য এবং প্রদেশ সমূহ মোছলমান বীর বৃন্দের দ্বারা বিজিত হইলে, ঐ সকল দেশের যুদ্ধ-লব্ধ বহু মূল্যবান সামগ্রী ও বন্দী এবং বন্দি-মদীনা শরীফে অনবরত আসিতে থাকে । ইহার যে অংশ শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পাইতেন, তদ্বারা তাঁহার বিশাল পরিবারের খরচ-পত্র খুব সচ্ছল ভাবেই চলিত । এই সময় মধ্যে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন তাঁহার সংসারটি নিতান্ত ছোট খাট ছিল না । পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া যে অর্থ বাঁচিত, তাহা প্রায় সমস্তই দীন-দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন—অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণ করিতেন । পারস্তের যুদ্ধে যখন মোছলমান-গণ কিছু বিরত হইয়া পড়েন ; তখন স্বয়ং হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ) যুদ্ধে গমন করিতে উত্তত হন ; এমন কি, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে মদীনার স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, মদীনা তৈয়বা হইতে সৈন্যে রওয়ানা হন । কিন্তু কতিপয় প্রধান প্রধান ছাহাবাঃ (রাজিঃ) তাঁহার যুদ্ধ-যাত্রার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে, তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে ডাকাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন ; তিনিও প্রতিকূল মত প্রকাশ করাতে মহামান্ন খলিফা স্বয়ং যুদ্ধে গমনে বিরত হন । অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পারস্ত-বিজয় কার্যে অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন ; অবশেষে হজরত ছায়াদ-বিন্-

আবি ওকাছ (রাজিঃ) মোছলেম-সৈন্তের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

আমিরুল মুমেনিন হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) শহীদ হইলে, সর্ব সম্মতিক্রমে হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন-বিন্-আফ্ফান (রাজিঃ) খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার খেলাফতের শেষ ভাগে এছলাম-জগতে বিদ্রোহ ও বিপ্লব উপস্থিত হয়। মহামান্ব খলিফার নরম মেজাবী, স্বজন-প্রিয়তা, কুট বুদ্ধি সম্পন্ন কুচক্রী মারওয়ান-বিন্-হকমকে মীর মুনশী পদে নিযুক্ত করিয়া, বহু রাজকার্যের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ—ইত্যাদি ব্যাপারে মেছের ও কুফার বহুসংখ্যক লোক খলিফার বিরুদ্ধাচারী হয়, এবং তাহারা মদীনার সমবেত হইয়া মারওয়ান-বিন্-আল্ হকম কে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য দাবী করে। তাহাকে বিপ্লব-পন্থী দিগের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা এই কুচক্রী ব্যক্তিকে নিশ্চয় ‘কতল্’ (হত্যা) করিত ; আর বিপ্লব সম্ভবতঃ এখানেই থামিয়া যাইত ; কিন্তু তিনি তাহা না করাতে বিদ্রোহী ও বিপ্লবকারিগণ তাঁহার গৃহ বেষ্টিত করিয়া ফেলে। হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে হজরত এমাম হাছান (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে তাঁহার গৃহ-রক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন ; হজরত যোবের (রাজিঃ) স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ)-কে, হজরত তাল্হা (রাজিঃ) স্বীয় পুত্র ছয়ীদ (রাজিঃ)-কে ও মহামান্ব খলিফার গৃহ-রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) ও মহামান্ব খলিফার গৃহ-দ্বার রক্ষা এবং বিপ্লববাদী দিগকে আক্রমণ পূর্বক দূরে তাড়াইয়া দিতেছিলেন। মহামান্ব খলিফা সকলকে বিদ্রোহী দিগের গতিরোধ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন ; এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের পিতার নিকট চলিয়া চাও ; কিন্তু তাঁহারা

তাহার দ্বার পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেলেন না। হজরত মগিরা:-
বিন্-আল্ আখনছ (রাজিঃ) কতিপয় যোদ্ধ পুরুষের সঙ্গে বিদ্রোহীদিগের
সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলবলে শহীদ হইলেন। হজরত আবু হোরেরাঃ
(রাজিঃ) ও বিদ্রোহী এবং বিপ্লব-পন্থীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান
(রাজিঃ) তাহাকে নিষেধ করিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ছালাম
(রাজিঃ) বিপ্লববাদীদিগকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তাহারা তাহার
সহিতও যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; অগত্যা তিনি প্রস্থান করিলেন।
অবশেষে খলিফা হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ) বিপ্লববাদীদিগের
হস্তে, ৮২ বৎসর বয়সে, অতি নৃশংসভাবে শহীদ হইলেন। তিনি ১২
বৎসর কাল খেলাফৎ করিয়াছিলেন। এমাম হাছন (রাজিঃ) মহামান্য
খলিফার জানাযায় শরীকে ছিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিতে পাই যে, মেছেরের শাসনকর্তা হজরত
আবদুল্লাহ্-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) উত্তর আফ্রিকার “ আফ্রিকা ” নামক
রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য মহামান্য খলিফার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন; সেই যেহাদে যোগ দেওয়ার জন্য হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর
(রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-
বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত ওমর-বিনল্ আছ (রাজিঃ), হজরত
এমাম হাছন-বিন্-আলী মরতুজা (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন-বিন্-
আলী মরতুজা (রাজিঃ), হজরত এব্নে জাফর (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ
ছাহাবাঃ ও জগদ্বিখ্যাত বীরপুরুষগণ যোগদান করিয়া ছিলেন। ভীষণ যুদ্ধে
জয়ী হইয়া আফ্রিকা রাজ্য (ইহা তারাব্রিছ) [ত্রিপলী] হইতে “ তাজাঃ ”
[ট্যাঞ্জিয়ার] পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) মোছলমানগণ অধিকার করেন। বর্তমান
টি পলী, টুনিস্, আলজিরিয়া ও মরক্কোর বিপুলাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় খলিফার সুদীর্ঘ ছাদশ বৎসর ব্যাপী খেলাফৎ কালে মহামান্ন
এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে কেবলমাত্র এই এক যুদ্ধে যোগদান করিতে দেখা
যায়। এই সময় মধ্যে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদি ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
তাঁহাদের এই সময়ের দৈনন্দিন কার্যাবলীর কোনও তালিকা দেখিতে
পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা স্বীয় গৃহে খোদা তা-লার এবাদৎ-
বন্দেগীতে “মশ্গুলা” থাকিতেন; খলিফার রাজ-সভায় ও তাঁহাদের
গতিবিধি ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা অবসর কালে বুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া
তাহাতে পরিপক্বতা লাভ করিতেছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান
গণি (রাজিঃ)-এর খেলাফতের শেষভাগে বিশাল এছলামী খেলাফতে নানা
গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মহামান্ন খলিফা (রাজিঃ) সমুদয়
শাসনকর্তার পদে স্বীয় আত্মীর-স্বজন ও অমুগত বন্ধু-বান্ধবকে নিযুক্ত
করাতে, তাঁহার কার্যে অনেকেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
মারওয়ান-বিন্-ইকম—যাহাকে আবু হজরত (ছালঃ) মিথ্যা কথা বলার
জন্য মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; মহামান্ন দ্বিতীয় খলিফা
হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) ও তাহাদের পিতা পুত্রকে বিতাড়িত
করিয়াছিলেন, মহামান্ন ওয় খলিফা তাঁহাকে মীর মুন্শীর পদে নিযুক্ত
করাতে, তাহার কুচক্র ও দুর্ব্যবহারে জন-সাধারণ নিতান্তই বিরক্ত
ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মারওয়ান রাজ্যশাসন কার্যে
অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করাতে নানাপ্রকার অনর্থের সূত্রপাত হইতে
ছিল। এই কুচক্রী লোকটি বনি-হাশেমের সহিত বিষম বিদ্বেষ ভাব
মনে মনে পোষণ করিত। ইহার অন্যায়-অসঙ্গত কার্য-কলাপেই
মহামান্ন খলিফাকে অতি নির্দয় ভাবে শহীদ হইতে হইয়াছিল।

হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার পর হজরত
আলী (কঃ—ওঃ) খলিফা নির্বাচিত হইলেন। যখন হজরত যোবেয়

(রাজিঃ) ও হজরত তাল্হা (রাজিঃ)-এর সহানুভূতিতে ওম্মোল-মুমেনি হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), মহামান্য খলিফা হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ)-এর অন্যায় রূপে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে একদল যোদ্ধৃপুরুষ লইয়া বস্ত্রা অভিযুখে অভিযান করিলেন ; সেই সংবাদ পাইয়া হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ও সৈন্যে ঐ দিকে গমন করিলেন ; সেই সময় কুফার যোদ্ধৃপুরুষগণকে স্বদলভুক্ত করণার্থ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও হজরত এমার-বিন্-এব্বাহর (রাজিঃ)-কে কুফায় পাঠাইলেন ; কুফার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রাজিঃ) কুফাবাসী যোদ্ধৃপুরুষগণকে নিরপেক্ষ থাকিবার ■■■ বিশেষ রূপে চেষ্টা পাইতে ছিলেন, কুফার বহুসংখ্যক লোক তাঁহার মতানুবর্তী ছিল ; ঐ সময় হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগকে স্বীয় ওয়ালেদ নাজেদ আমিরুল-মুমেনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর পক্ষ সমর্থনার্থ যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানবত্তা, বক্তৃতা-শক্তি এবং চিন্তা ধারার সুন্দর পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল । তাঁহার সেই অনল বর্ষিণী ও সুধা নিস্তন্ধিনী বক্তৃতায় জনগত আমিরুল-মুমেনি খলিফাতুল মুছলেমিন হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজ্জহর সম্পূর্ণ অনুকূল হইল । ইতিপূর্বে হজরত মোহাম্মদ বিন্-আবিবকর (রাজিঃ) ■ হজরত আশরে বিন-আব্বাহ (রাজিঃ), মহামান্য খলিফার পক্ষ হইতে কুফায় গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন । একদিকে শাসনকর্ত্তার বাধা প্রদান, অন্য দিকে 'ওম্মোল-মুমেনি' (মোছলেম-মাতা) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ), হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্হা (রাজিঃ)-এর প্রতি কুফার বহুসংখ্যক লোকের প্রাণের সহিত সহানুভূতি থাকাতে,

ব্যাপার বড়ই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । আবার এই সময় মহামাননীয়া মোছলেম-মাতার পক্ষ হইতে কুফার প্রধান প্রধান লোকদিগের নামে এই মর্শের পত্র আসিয়াছিল যে, তোমরা এ সময় আমাকে সাহায্য কর ; একান্ত পক্ষে তাহা না করিলে নিরপেক্ষ ভাবে স্ব স্ব গৃহে চূপ করিয়া বসিয়া থাক । তাঁহার এই পত্রের প্রভাবে জনমত তাঁহার একান্ত অনুকূল হইয়াছিল ; কিন্তু মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাবাগ্মী হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সেই অনল-বর্ষিণী বক্তৃতায় অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল । কুফার পরাক্রান্ত বীরবন্দ মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন-খলিফাতুল মুছলেমিনের সাহায্য করিবার জন্য একমতাবলম্বী হইল । জনগণ শাসনকর্তার অনুরোধ এবং মোছলেম-মাতার অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক, হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজ্জহুর পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল । এই সময় বীরেন্দ্র কেশরী মালেক আশ্‌তর তথায় উপস্থিত হইয়া কুফার বীরবন্দকে উৎসাহিত করিতে, মহামান্য খলিফার পক্ষে সোণায় সোহাগা হইল । যাহা হউক, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমার-বিন্-এয়াছর (রাজিঃ) ও মহাবীর মালেক আশ্‌তর ২০০০ বিক্রান্ত যোদ্ধা পুরুষ কুফা হইতে সংগ্রহ পূর্বক, মহামান্য খলিফা-সমীপে উপস্থিত হইলেন । এতদ্বারা তাঁহার সামরিক শক্তি খুবই প্রবল হইল ।

আবদুল্লা-বিন্-ছাবা ও বিপ্লবপন্থী কপট লোকদিগের ষড়যন্ত্রে, উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপনের সম্পূর্ণ আয়োজন হইয়াও অন্যান্য তুমুল যুদ্ধের অবতারণা হইল । এখানে ছাবার দল রাত্রিকালে হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল ; উভয় পক্ষই দারুণ লম্বে রহিয়া গেলেন । মহামাননীয়া ওন্মোল মুমেনিন ও তাঁহার পক্ষাবলম্বিগণ মনে করিলেন, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) সন্ধির কথাবার্তা চালাইয়া অন্যান্য ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । হজরত আলী

(কঃ—ওঃ) তাঁহার পক্ষের নেতৃগণ মনে করিলেন, হজরত যোবের (রাজিঃ) ■ হজরত তাল্হা (রাজিঃ) সন্ধির কথাবার্তা চালাইয়া কপটতা পূর্বক নৈশযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইল না । অনর্থক উভয় পক্ষের বহু সহস্র মোছলমান জমল যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন । ঐ পরিমাণ উৎকৃষ্ট যোদ্ধা যদি কোনও বিধর্মীর রাজ্য আক্রমণ করিত ; তবে সে রাজ্য মহামান্ন খলিফার অধিকারভুক্ত ও মোছলেম সাম্রাজ্যের অংশ রূপে পরিণত হইত । এই যুদ্ধে ও এমাম ভ্রাতৃ-যুগল বীরত্বের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু মোছলমানের শোণিতপাতে তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়া ছিল । এব্নে ছাবা-প্রমুখ কপটদিগের বিষম ধোকা বাজীতে এই শোচনীয় দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছিল ।

এই ঘটনার পর সিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশ ও রাজ্যের শাসনকর্তা দামেশ্-কাধিপতি হজরত মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মহামান্ন আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল মোছলেমিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর যে ভীষণ যুদ্ধ বিশাল ছফিন প্রান্তরে সংঘটিত হইল, তাহাতেও এমাম ভ্রাতৃদ্বয় (রাজিঃ) আপনাদের বীরত্বের পূর্ণ ‘জওহর’ দেখাইয়াছিলেন ।

ইহার পর বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল, উহা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর এতদ্ সঙ্গীয় জীবনীতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাঁহার সৈন্যদলে এব্নে ছাবার কপট দল ও কুফার যে সকল চঞ্চলমতি যোদ্ধৃপুরুষ ছিল, তাহাদের দোষে মহামান্ন আমিরুল-মুমেনিন পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে লাগিলেন । তাঁহার খেলাফতের শেষ সময়ে মেহের, মুকা, মদীনা, এমন প্রভৃতি প্রদেশ, জনপদ ও পবিত্র নগরাবলী হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তগত হইল । তিনি আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । এই সময়ে “ খারেজী ”

সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে তাঁহার বিরাট আয়োজনে প্রবল বাধা জন্মিল । যদিও নহরওয়ান এর যুদ্ধে হুদাঙ্গ খারেজী দল একেবারে নিশ্চূর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু যে ■ জন লোক সেই মহাসংহারক যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতেই পাপীষ্ঠ আবদুর রহমান-বিন্-মলজুম, মহামাণ্ড আমিরুল-মুমেদিন খলিফাতুল মোছলেমিন শেরে-খোদা হজরত আলী কময়ুল্লাহ ওমাজহকে শহীদ করিয়া মোছলমান জগতের সর্বনাশ সাধন করিল । আদর্শ ধার্মিক, আদর্শ তাপস, হজরত রেছালতমাবের সম্পূর্ণ পদানুসরণকারী, আদর্শ চরিত্র, জগতের অদ্বিতীয় আদর্শ বীরপুরুষ অকালে পৃথিবী হইতে মহা প্রস্থান করিলেন । প্রকৃত খেলাফতের এখানেই প্রায় শেষ হইল । মহামাণ্ড খলিফার ‘অছিরত’ (অন্তিম নির্দেশ) অনুসারে এমাম ভাতৃ-যুগল মোহাম্মদ-হানিফ-প্রমুখ ও তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ অতি সজোপনে পিতার দফন কার্য-কুফা হইতে অনেকটা দূরবর্তী “ নজফ ” নামক স্থানে সম্পাদন করিলেন । আর মহামাণ্ড পিতার নির্দেশানুসারে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হুয়াত্বা আবদুর রহমান বিন্-মলজুমকে তরবারির একই আঘাতে শমন সন্দনে প্রেরণ করিলেন । তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল । পাপীষ্ঠ ছনিয়াতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিল ; পরকালের ভীষণ নরক-যন্ত্রণা তাহার অদৃষ্টে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে ।

আমিরুল-মুমেদিন হজরত আলী কময়ুল্লাহ্ ওমাজহর ওফাতের (পরলোক প্রাপ্তির) অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার পরে কি আমরা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর হস্তে-বয়্যেত করিব ? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, আমি নিজের অবস্থায় ‘মশ্‌গুল’ (বিব্রত), তোমরা যাহাকে ‘পছন্দ’ (মনোনীত) কর, তাহার হস্তেই বয়্যেত করিবে । লোকেরা ইহাকে হজরত এমাম হাছন

(রাজিঃ)-এর বস্য়ত করার ‘এজাবত’ (ইজিত—আদেশ) মনে করিয়া, তাঁহার পরলোক গমনের পর বড় এমাম ছাহেবের হস্তে বস্য়ত করিলেন । সৰ্ব্ব প্রথমে হজরত কয়েছ্-এব্-নে-ছায়াদ এব্-নে য়েবাদ (রাজিঃ) বস্য়ত করিবার হাত বাড়াইয়া দিলেন ; ইহার পরে কুফাবাসী লোকেরা দলে দলে বস্য়ত করিতে লাগিল ; অর্থাৎ তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল । বস্য়ত গ্রহণের সময় হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সমবেত জন-মণ্ডলী হইতে এই ‘এক্-রার’ (স্বীকৃতি) লইতেছিলেন :—

“ আমার কথায় আমল (আমার আদেশ পালন) করিবে, আমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব, তোমরা ও তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে ; আমি তাহার সঙ্গে ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি) করিব, তোমরা ও তাঁহার সঙ্গে ‘ছোলেহ্’ করিবে ।

এই বস্য়ত গ্রহণের পরেই কুফাবাসিগণ পরস্পর এই বলিয়া ‘ছরগোশিয়া’ (কাণাঘুসা) করিতে লাগিল যে, ইহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া বোধ হইতেছে । হজরত আমীর মোয়াবিয়া (রাজিঃ), যখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শাহাদতের (শহীদ হওয়ার) সংবাদ পাইলেন ; তখন তিনি “ আমিরুল-মুমেনিন ” উপাধী ধারণ করিলেন—যদিও ইতিপূর্বে হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রাজিঃ) ও হজরত ওমর-বিন-আছ (রাজিঃ)-এর মীমাংসার পরই তিনি শামবাসীদিগের নিকট হইতে খেলাফতের বস্য়ত গ্রহণ করিয়া-ছিলেন ; এক্ষণে দ্বিতীয় বার বস্য়ত গ্রহণ পূর্বক খলিফার পদ দৃঢ়ীভূত করিলেন । কয়েছ্-বিন-ছায়াদ (রাজিঃ) যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর হস্তে বস্য়ত করিয়াছিলেন, ঐ সময় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি কেতাব আল্লাহ্ ও ছোন্নত রছুলোন্নার অতিমতানুসারে

‘মলহদীন’ (বিধর্ষা—ধর্মদোহী) দিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য বয়স্বেত করিতেছি।’ হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার উক্তি শ্রবণে করমাইলেন, ‘কেতাব’ (যুদ্ধ) ও ‘যেহাদ’ (ধর্ম-যুদ্ধ) প্রভৃতি সকলই ‘কেতাব আল্লাহ্’ (কোরআন পাক) হোয়ত-রহুলোম্মার ‘শামেল’ (অন্তর্ভুক্ত) ; ইহার জন্য স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন না। এই উক্তির দ্বারা ‘আহ্লে কুফার’ (কুফা নগরবাসীদিগের) পূর্বোক্ত কাণাকাণি করিবার অধিকতর ‘মওকা’ (সুযোগ) ঘটয়াছিল। তদনুসারে তাহাদের মনে এই সন্দেহ হইয়াছিল যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক নহেন। হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) দ্বিতীয় বার লোকের নিকট হইতে বয়স্বেত গ্রহণ কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া, ৬০ হাজার পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া দামেশ্কে হইতে কুফাতিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইলেন যে, ‘হোলেহ্’ (সন্ধি) ‘জদ্’ (যুদ্ধ) হইতে উত্তম। আর ‘মোনাছেব’ (সঙ্গত কার্য্য) এই যে, আপনি আমাকে ‘খলিফা ওয়াক্ত’ (এই সময়ের খলিফা—অর্থাৎ মোছলেম-জগতের নেতা) স্বীকার করিয়া, আমার হাতে বয়স্বেত করেন। এদিকে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যখন সংবাদ পাইলেন যে, আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) সসৈন্তে কুফাতিমুখে আসিতেছেন, তখন তিনিও চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া দামেশ্কাতিমুখে যাত্রা করিলেন। ‘মজেল তন্ন’ (পথ অতিক্রম) করিয়া যখন তিনি “বির আবদুর রহমান” নামক স্থানে পৌঁছাইলেন, তখন হজরত করেছ-বিন্-ছারাদ (রাজিঃ)-কে ১২ হাজার সৈন্যসহ ‘মকদমাতুল জয়েশ্’ (অগ্রগামী সেনাদল)-এর সেনাপতি রূপে সম্মুখের দিকে প্রেরণ করিলেন। মদায়েনের (পূর্বতন পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী) সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া এমাম হাছেব (রাজিঃ) তথায় শিবির সন্নিবেশ

করিলেন ; ঐ সময় কোনও লোক এই ‘গলৎ খবর’ (মিথ্যা-সংবাদ) প্রদান করিল যে, হজরত কয়েছ-বিন-ছায়াদ (রাজিঃ) যুদ্ধে মারা গিয়াছেন । মহামায়া খলিফা ■ স্থানে একদিন এই উদ্দেশ্যে ‘কারাম’ (অবস্থান) করিলেন যে, ছওয়্যারির পশুগুলি একটু বিশ্রাম লাভ করিতে পারে । এই স্থানে সমবেত জন-মণ্ডলীর সম্মুখে তিনি এক ‘খোত্বা এরশাদ করমাইলেন’ (বক্তৃতা প্রদান করিলেন) ; ‘হাম্দ’ (খোদা তা-লার প্রশংসা) ও ■ রহুলোল্লার ‘হানা’ (তারিফ—গুণাবাদ) বর্ণনা করিবার পর বলিলেন,—

“ হে জন-মণ্ডলি ! তোমরা আমার হস্তে এই শর্তে বস্তুত করিয়াছ যে, সন্ধি কিংবা যুদ্ধে আমার ‘তাবেদারী’ (আদেশ পালন) করিবে ; আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা-লার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার ■ কাহারও বিধে তাব বা শত্রুতা নাই । ‘মশরেক’ (পূর্ব) হইতে ‘মগ্নরেব’ (পশ্চিম) পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকেও আমি দেখিতে পাই না যে, আমার প্রতি সে লোক ‘রজ্জ’ ■ ‘মলাল’ (মনঃক্লেশ), ‘নক্সত’ ও ‘করাহিয়াত’ (ঘৃণা—অবজ্ঞা) প্রদর্শন করে । ‘মহকাত’ (ভালবাসা) ‘হালামতি’ (নিরাপদতা), হোলেহ্’ (সন্ধি) কে আমি ‘না-এন্তেকাকি’ (অনৈক্য) ■ ‘দোশ্মনি’ (শত্রুতা) হইতে ‘বেহ্তর’ (উত্তম) বলিয়া মনে করি । ”

এমাম হাছেবের এই বক্তৃতা শুনিয়া ‘মোনাফেক’ (কপট) ■ খারেজী সম্প্রদায়, সমগ্র সেনাদলে এই কথা ঘোষণা করিয়া দিল যে, এমাম হাছন (রাজিঃ), মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক । সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল পাপাচারীর দল হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর প্রতি ‘কোফরের কতওরা’ প্রচার করিল । এই কোফরী কতওয়ার হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সেনাদলের মধ্যে এই

‘আছর’ (ক্রিয়া—প্রভাব) বিকৃত হইল যে, সাধারণ সেনাদলের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল । কেহ কেহ বলিতে লাগিল, এমাম হাছন (রাজিঃ) কাকের হইয়া গিয়াছেন ; আর একদল লোক বলিতে লাগিল, না এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কাকের হন নাই, তিনি খাঁচা — আদর্শ মোহন-মান । অবশেষে কাকেরের কত-ওরা দাতার দল সংখ্যায় বেশী হইয়া পড়িল ; উহারা তাহাদের মত-বিরোধী দলের প্রতি খড়গহস্ত হইয়া, উহাদিগকে মার-ধর আরম্ভ করিয়া দিল । আবার বহুসংখ্যক লোক “ কাকের ” — “ কাকের ” শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ‘খিমায়’ (শিবির বা তাবুতে) প্রবেশ করিল ; আর চতুর্দিক হইতে তাঁহার পরিহিত বস্ত্র সজোরে টানিতে এবং উহা ছিন্ন করিতে লাগিল । এই ঘটনার তাঁহার গায়ের সমস্ত কাপড় ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল । তাঁহার স্বকোপরি যে চাদর খানি ছিল, এই বেহুদা বে-আদবের দল তাহাও কাড়িয়া লইল । সঙ্গে সঙ্গে খিমার আসবাব-পত্র ও সূঁঠন করিতে লাগিল । এই অবস্থা দর্শনে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণ পূর্বক রবিয়ঃ ও হামদান ‘কওম’ (সম্প্রদায় বা জাতি)-কে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন । এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা (যাহারা তাঁহার সেনাদলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থান করিতেছিল) তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল । তাহারা আক্রমণকারী বদমাশ্দিগকে দূরে তাড়াইয়া দিল । অল্প সময়ের মধ্যেই গোলমাল, শোর-চীৎকার ও বিশৃঙ্খলা দূর হইল । অতঃপর মহামান্ব এমাম ছাহেব (রাজিঃ) সেখান হইতে “ মদায়েন ” শহরের দিকে অগ্রসর হইলেন । পশ্চিমধ্যে জরাহ্-বিন্-কবিছনাঃ নামক এক পাথর খারেকী স্রোযোগ বুকিয়া তাঁহার প্রতি একটা নেযাঃ (বল্লম বা বড়শা বিশেষ) নিক্ষেপ করিল । ঐ নেযাঃ তাঁহার ‘রাণে’ (পাদ-মূলে) বিদ্ধ হওয়াতে তিনি ‘যখ্মী’ (আহত) হইলেন । তাঁহাকে সেই অবস্থায় চারপাশী

অর্থাৎ খাটুলীতে করিয়া মদায়েন রাজধানীস্থ “ কছরে আবেজ ” নামক রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করা হইল ; এবং ঐ স্থানেই তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । আবদুল্লাহ্-বিন্ হজল ও আবদুল্লাহ্-বিন্ যবিয়ান ঐ পাখণ্ড জরাহ-বিন্-কবিছনাঃ খারেকীকে ‘কতল’ (হত্যা) করিল । কছরে আবেজে অস্ত্র-চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করাতে, অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন । কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) যে ১২ হাজার সৈন্ত লইয়া অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তিনি “ আন্বার ” নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । আমীর হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) স্বীয় বিপুল সৈন্তদল সহ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ‘মহাছেরাঃ’ (বেষ্টন) করিয়া লইলেন ; আর আবদুল্লাহ্-বিন্-আমের (রাজিঃ)-কে অগ্রগামী সেনাদলের নেতৃ রূপে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া মদায়েনে পাঠাইলেন । এদিকে মদায়েনে পহুঁছিয়া এবং স্বীয় সৈন্তদলের “ বদ-তমিযি ” (অশিষ্টতা—অসম্মতব্যবহার) দর্শন করিয়া হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), সন্ধি স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর ভাগিনেয় আবদুল্লাহ্-বিন্ হারেছ-বিন্-নওফলকে দূত স্বরূপ আমীরের নিকট ইতিপূর্বেই প্রেরণ করিয়াছিলেন । আবদুল্লাহ্-বিন্-আমের মদায়েনের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাঁহার সঙ্গে ‘মোকাবেলা’ (যুদ্ধ) করিবার জন্য মদায়েন হইতে বাহির হইলেন । আবদুল্লাহ্-বিন্-আমের, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সৈন্য দলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহাদের সন্নিকটবর্তী হইলেন ; এবং এরাকী যোদ্ধ-পুরুষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই ; আমি আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর ‘মকদমাতুল জয়েশ্’ (অগ্রগামী সেনাদল)-এর সেনাপতি ; আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) মূল সেনাদল লইয়া আন্বারে অবস্থান করিতেছেন ; তোমরা হজরত

এমাম হাছন (রাজিঃ) সমীপে আমার ছাগাম পঁছাইয়া দাও ; আর আমার পক্ষ হইতে বল যে, আবদুল্লাহ্ আপনাকে খোদার ‘ওয়াস্তাঃ’ দিয়া বলিতেছে যে, আপনি যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ‘হালাকৎ’ (ধ্বংস) হইতে অব্যাহতি লাভ করুন । যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এই কথা শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ মদায়নে ফিরিয়া আসিলেন, এবং আবদুল্লাহর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি আমীর মোম্বিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি) করিতে, এবং খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য আছি—যদি আমীর মোম্বিয়া (রাজিঃ) আমার কতিপয় শর্তঃ মঞ্জুর করেন । তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও প্রধানতম শর্ত এই যে, আমীর মোম্বিয়া (রাজিঃ) কেতাব (কোরআন পাক) ও ছোন্নত নববীর প্রতি সম্পূর্ণ আমল রাখিবেন ; আর পূর্বতন ‘গোখালেফত্’ (শত্রুতা) ভুলিয়া যাইবেন, এবং কাহারও ‘জান’ (জীবন) ও মাল (সম্পত্তি)-এর প্রতি হস্তার্পণ করিবেন না, আর আমার পক্ষাবলম্বিগণের জীবন রক্ষার্থে প্রতিশ্রুতি দান করিবেন ।

“আল্ ছোলেহ্ খায়ের”—সন্ধি মঙ্গল জনক । আবদুল্লাহ্-বিন্-আমের এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই উত্তর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হজরত আমীর মোম্বিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট আন্বারে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং বলিলেন, কতিপয় শর্তে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) খেলাফৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য আছেন । হজরত আমীর মোম্বিয়া (রাজিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সকল শর্ত কি কি ? আবদুল্লাহ্ বলিলেন, প্রথম শর্ত এই যে, আপনার মৃত্যুর পর খেলাফত হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) প্রাপ্ত হইবেন ; দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যতদিন আপনি জীবিত ও খেলাফত্-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, বয়তুল মাল হইতে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ দরহম

নিয়মিত রূপে পাঠাইয়া দিবেন। তৃতীয় শর্ত এই যে, আহুওয়াম্ ও ফারছের (পারস্ত দেশের) খাজানা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে প্রদান করিতে হইবে। এই ৩টি শর্তই আবদুল্লাহ-বিন-আমের স্বয়ং এমাম হাছেব (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে ‘পেশ’ করিয়া ছিলেন। তৎপর ঐ সকল শর্তের ও উল্লেখ করিলেন, বাহা এমাম হাছেব (রাজিঃ) স্বয়ং তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমীর হজরত মোরবিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, এই সকল শর্ত সমুদয়ই আমি মঞ্জুর করিতেছি। এমাম হাছন (রাজিঃ) যদি ইহা ব্যতীত আর ও কোন শর্ত পেশ করেন, তাহাও আমি মঞ্জুর করিব; কারণ তাঁহার ‘নিয়ত’ (সকল) নেক বলিয়া বোধ হইতেছে। আর মোছলমানদিগের মধ্যে ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি) ও শান্তি স্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া আমি মনে করিতেছি। এই কথা বলিয়া হজরত আমীর মোরবিয়া (রাজিঃ) এক খণ্ড সাদা কাগজে স্বীয় নোহর অঙ্কিত ও নাম স্বাক্ষর করিয়া, আবদুল্লাহ-বিন-আমেরকে প্রদান পূর্বক বলিলেন, তুমি এই কাগজ হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর নিকট লইয়া যাও, আর তাঁহাকে গিয়া বল, তিনি যে যে শর্ত চান, এই কাগজে তাহা লিখিয়া দেন, আমি সেই সকল শর্তই পালন করিতে প্রস্তুত আছি। হজরত এমাম হাছেব (রাজিঃ) আবদুল্লাহ-বিন-জাফর (রাজিঃ) যখন জানিতে পারিলেন, এমাম হাছন (রাজিঃ) সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তখন তাঁহার বড় এমাম (রাজিঃ) হাছেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই সকল হইতে বিরত থাকিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের এই ‘রায়’ (মত) ‘পছন্দ’ করিলেন না। তিনি হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর সময় হইতে কুফা ও এরাক বাসীদের কার্য-কলাপ এবং তার-ভদী দেখিয়া আসিতেছিলেন; পক্ষান্তরে হজরত

মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর 'মোল্‌কী-এস্তেজাম' (রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত), রাজনীতিক জ্ঞান ও তদ্বিশয়ের দৃঢ়তা এবং শাসন-শৃঙ্খলা ও তাঁহার 'পেশ-নবর' (দৃষ্টির অন্তর্ভূত) ছিল, সুতরাং তিনি সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দৃঢ়সঙ্কল্প রহিলেন । যখন আবছরাহ্-বিন্-আমেয়, হজরত আমীর মোয়বিয়ার 'দস্তখতি' (স্বাক্ষরীত) কাগজ লইয়া আসিলেন ; এবং সমুদয় 'পেশ-করদাঃ শরারেত্' (উত্থাপিত শর্ত সমূহ) এর উল্লেখ করিলেন, তখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) বলিলেন, আমি এই শর্ত-পছন্দ করি না যে, হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর পরে আমাকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করা হয় । কারণ যদি আমার খেলাফত লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি এ সময় কেন উহা পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি ? অতঃপর তিনি কাতেবকে ডাকাইয়া সন্ধিপত্র লিখিতে আদেশ করিলেন ; তদনুসারে নিম্ন-লিখিত মর্মে সন্ধি-পত্র লেখা হইল ;—“ এই 'ছোলেহ্-নামাঃ' (সন্ধিপত্র) হাছন (রাজিঃ) বিন্-আলী (রাজিঃ) বিন্-আবিতালেব, এবং মোয়বিয়া (রাজিঃ)-বিন-আবু-ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর মধ্যে লেখা যাইতেছে । উভয়ে নিম্ন-লিখিত শর্ত-সমূহে একমতাবলম্বী এবং 'রেজামন্দ' ('রাজী'—সম্মত) হইয়াছেন । 'আমার খেলাফত' (খলিফার পদ) মোয়বিয়া (রাজিঃ) বিন্-আবি ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর হস্তে অর্পণ করা হইল । মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর পরে মোছলমানগণ তৎসাংগরিক 'মছলেহত' (সিদ্ধান্ত) অনুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা করিবেন, খলিফার পদে অভিষিক্ত করিবেন । মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে এবং বাক্যে সমুদয় 'আহ্‌লে এছলাম' (মোছলমান-গণ) নিরাপদ, নির্ভয় ও শান্তির সহিত বাস করিবে । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এর মতানুবর্তী ও পক্ষাবলম্বিগণের প্রতি মোয়বিয়া (রাজিঃ) কোনও রূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিবেন না (তাঁহাদের প্রতি কোনও

রূপ উৎপাদন করিবেন না) ; হাছন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এবং হোছেন বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর প্রতি এবং তাঁহাদের ‘মোতরল্লেকিন’ (পক্ষাবলম্বী বা সহানুভূতি সম্পন্ন এবং আত্মীয়-স্বজন)-এর প্রতি মোয়বিয়া (রাজিঃ) কোনও রূপ ‘জরর’ পঁছছাইবেন না (ক্রেশ প্রদান করিবেন না), আর এই দুই ভ্রাতা এবং তাঁহাদের সম্পর্কিত ও পক্ষাবলম্বিগণ খেলাফতের অধিকারভুক্ত যে কোনও শহরে বা যে কোনও পল্লী বা গ্রামে ইচ্ছা, বসবাস করিবেন ; আমীর মোয়বিয়া, (রাজিঃ), তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তাগণ বা কর্মচারিগণের এরূপ কোনও অধিকার থাকিবে না যে, তাঁহাদিগকে আপনাদের ‘মহকুম’ (‘ছকুম বরদার’—‘তাবেদার’—অধীন) মনে করিয়া, আপনাদের কোনও ব্যক্তিগত আদেশ পালনের জন্য তাঁহাদিগকে ‘মজবুর’ (বাধ্য) করেন । ‘আহ্ ওয়ায্’ নামক ‘ছুবার’ (প্রদেশের) খাজানা এমাম হাছন (রাজিঃ) নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত হইবেন, আর বার্ষিক ২০ লক্ষ দরম হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-কে, আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) যথানিয়মে পঁছছাইতে থাকিবেন । কুফার ‘বয়তুল-মালে’ (রাজকোষে) বর্তমান সময়ে যে পরিমাণ টাকা (ও সামগ্রী-সম্ভার) ‘মওজুদ’ (জমা) আছে, তৎ সমস্ত হজরত এমাম হাছন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে । তিনি নিজের ক্ষমতাবলে উহা যে রূপ ইচ্ছা থরচ করিবেন । আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ), ‘বনি-হাশেম’ (হাশেম বংশীয়)-দিগকে ‘এনাম’ (পারতোষিক) ও বৃত্তি ইত্যাদি প্রদানে অন্তের অপেক্ষা অগ্রবর্তী মনে করিবেন । ”

এই ‘আহদ নামার’ (সন্ধিপত্রের) উপর আবদুল্লাহ্-বিন্-আল্-হারছ-বিন্-নওফল, ওমর-বিন্ আবি ছলমাঃ-প্রমুখ কতিপয় প্রধান প্রধান লোকের ‘দস্তখত্’ (স্বাক্ষর), সাক্ষী : ও ‘জামেন’ (প্রতিভূ) স্বরূপ হইল । যখন সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া উহা ‘আনবার’ নামক স্থানে হজরত

মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট পঁহুছিল, তখন তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন । ইতিমধ্যে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সদল বলে “ মদায়েন ” হইতে কুফায় পঁহুছিলেন । হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) ও আনবার হইতে ‘মহাছেরা’ (অবরোধ) তুলিয়া লইয়া, কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ)-কে স্বাধীন ভাবে বথেছা গমন জন্ত পরিত্যাগ পূর্বক, সসৈন্তে কুফাতিমুখে রওয়ানা হইলেন । কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) ও ঐদিন সদলবলে ঐস্থান হইতে রওয়ানা হইয়া যথাসময়ে কুফায় গিয়া পঁহুছিলেন । আমীর হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) কুকার জামে-মছজেদে পঁহুছিয়া হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) ও ‘আহ্লে কুফা’ (কুফাবাসিগণ) হইতে যথা-নিয়মে বয়্য়েত গ্রহণ করিলেন । কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) বয়্য়েত করিতে প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন, আর তিনি ঐ সময়ে মছজেদে ও আসিলেন না । আমীর হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) তাঁহার নিকটও একখানি সাদা কাগজে মোহর ও স্বীয় নাম ‘দস্তখত’ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার যাহা শরত্ করিবার ইচ্ছা, এই কাগজে উহা লিখিয়া দাও ; আমি তাহাই মঞ্জুর করিব । তদনুসারে তিনি কেবল নিজের, এবং স্বীয় অধীনস্থ ও মতাবলম্বী লোকদিগের ‘জানের আমান’ (জীবন সম্বন্ধে নিরাপদতা) চাহিলেন ; অর্থ-সম্পদ বা টাকা কড়ি সম্বন্ধে কোনও প্রার্থনা জানাইলেন না । আমীর হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরত্ মঞ্জুর করিয়া লইলেন । ইহার পর কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) ও তাঁহার মতানুবর্তী লোকেরা ও মছজেদে উপস্থিত হইয়া বয়্য়েত করিলেন । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) প্রথমে বয়্য়েত করিতে ‘এন্কার’ (অস্বীকার) করিলেন ; হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) বয়্য়েত গ্রহণ ■■■ ‘এছরার’ (তাকিদ) করিতে লাগিলেন, ; তদর্শনে এমাম হাছন (রাজিঃ) বলিলেন, আপনি (এমাম)

হোছেন (রাজিঃ) হইতে বয়্য়েত গ্রহণ জন্ত পাড়াপীড়ি করিবেন না ; সে আপনার নিকট বয়্য়েত করা অপেক্ষা স্বীয় 'ফখর' (গৌরব) প্রিয় মনে করে । ইহা শুনিয়া হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) 'খামুশ' (চূপ) হইয়া গেলেন । কিন্তু পরক্ষণেই হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আসিয়া হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিলেন । এই ছফরে (প্রবাসে) হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ওমরু-বিনল-আছ (রাজিঃ) ও ছিলেন, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, এক্ষণে আপনি এমাম হাছন (রাজিঃ) ও কুফাবাসিগণের মনস্তাট্টী সাধন জন্ত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বারা একটি বক্তৃতা দেওয়ান । হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) তাঁহার এই মত পছন্দ করিলেন ; তদনুসারে তাঁহার অনুরোধে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন ; সেই বক্তৃতার মর্ম্ম এই :—

“মোছলমানগণ ! আমি 'ফেৎনা' (বিবাদ বিসম্বাদ)-কে বড়ই 'মক্‌রুহ্' (নাপছন্দ—অপ্রিয়) বলিয়া মনে করি । স্বীয় 'জদে-আমজদ' (এস্থলে মাতামহ অর্থাৎ হজরত রেছালতমাব [ছালঃ]-কে লক্ষ্য করা হইয়াছে)-এর ওস্ততের সঙ্গে 'ফছাদ' ও বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিবার জন্ত, তাহাদের 'জান ও মাল' (ধন ও সম্পত্তি) 'মহ্‌ফুয্' (নিরাপদ) রাখিবার অভিপ্রায়ে আমি হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে 'ছোলেহ্' (সন্ধি) করিলাম ; এবং তাঁহাকে আমীর ও খলিফাঃ বলিয়া স্বীকার করিলাম । যদি এমারত ও খোলাফতে ইহার হক্ (স্বত্ব) থাকিয়া থাকে, তবে ত উনি তাহা লাভ করিয়াছেন, আর যদি উহা আমার হক্ হয়, তবে আমি তাহা ইহাকে প্রদান করিলাম । ”

ইহার পর 'ছোলেহ্' (সন্ধি)-এর সমুদয় ব্যাপার ও অনুষ্ঠান হইল, সঙ্গে সঙ্গে আ হজরত (ছালঃ)-এর ঐ 'পেশগোরী'

(ভবিষ্যদ্বাণী) ও—যাহা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) সম্বন্ধে তিনি করমাইতেন, তাহা সফল হইল ; ঐ ভবিষ্যদ্বাণী এই :—

“ আমার এই বেটা (পুত্র—অর্থাৎ দৌহিত্র) ‘ছরদার’ (নেতা) ; খোদা তা-স্বালা ইহার দ্বারা মোছলমানদিগের দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন (মিলন) করাইয়া দিবেন । ”

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়া মিশর হইতে অবতরণ করিলে, হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) উৎসাহের সঙ্গে তাঁহাকে নির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

“ আবু মোহাম্মদ ! আপনি আজ বেক্রপ ‘জওয়ামর্দি’ (বীরত্ব), ও ‘বাহাহুরী’ (সাহসিকতা) প্রদর্শন করিলেন, একরূপ জওয়ামর্দিও বাহাহুরী আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই । ”

এই সন্ধি ৪১ হিজরীতে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর শাহাদৎ-প্রাপ্তির ৬ মাস পরে স্থাপিত হইয়াছিল ; এজন্য এই ৪১ হিজরী “ আম আল-জম্মাত ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।

সন্ধি স্থাপন কার্য সম্পন্ন করিয়া হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) সসৈন্তে ■ সদল বলে দামেস্কে চলিয়া গেলেন । এমাম হাছন (রাজিঃ) যতকাল জীবিত ছিলেন, হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ) সন্ধির সকল শর্তই বধানিয়মে পালন করিয়াছিলেন ; সন্ধি-শর্তের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন না । নিয়মিত রূপে তাঁহার বৃত্তির টাকা প্রেরণ করিয়া-ছিলেন । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে তিনি কিছুমাত্র ক্রটি প্রদর্শন করেন নাই । তিনি কুফা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর চঞ্চলমতি আহলে কুফা (কুফাবাসিগণ) পরস্পর এই চর্চা করিতে লাগিল যে, হুয়া আহ-ওয়ায্ এর ‘খেয়াজ’ (খাজানা) ■ আমাদের ‘মালে-গণিমত’ (জম্বলক-সম্পত্তি), আমরা

উহা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে কিছুতেই লইতে দিব না । এই আলোচনা শ্রবণে জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগকে সমবেত করিয়া উহাদের সম্মুখে নিম্ন-লিখিত রূপ ‘তকরিব্’ (বক্তৃতা) করিলেন ।

“হে এরাক বাসিগণ ! আমি তোমাদিগের কার্যে ‘বারহা’ (বারংবার—পুনঃ পুনঃ) ‘দরগোযর’ (চশমপুলি—দেখিয়া ও না দেখা) করিয়াছি ; তোমরা আমার মহামাণ্ড পিতাকে শহীদ করিয়াছ ; আমার বাড়ী ঘর লুণ্ঠন ও আমাকে নেযাঃ নারিয়া ‘বখ্‌মি’ (আহত) করিয়াছ, তোমরা দুই শ্রেণীর ‘মকতুলিন’ (নিহত) লোকদিগকে স্মরণ করিয়া থাক ; প্রথমতঃ যাহারা ছফিন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ যাহারা নহরওয়ানের যুদ্ধে নিহত হইয়াছে । তোমরা উহাদের ‘ময়া ওযাঃ (বদলা) দাবী করিতেছ ; হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) তোমাদের সঙ্গে যে ‘মোয়ামেলা’ (ব্যবহার) করিয়াছেন, উহাতে তোমাদের কোন সম্মান লাভও হয় নাই ; আর উহা ‘এন্‌ছাফ্ (বিচার) সঙ্গত ও নহে । একপক্ষে তোমরা যদি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, তবে আমি এই সন্ধি ভঙ্গ করি, আর তরবারি ও নেবার দ্বারা ইহার ‘ফয়ছলা’ (মীমাংসা) করিয়া লই । পক্ষান্তরে তোমরা যদি আপনাদের জীবন প্রিয় জ্ঞান কর, তবে আমি এই সন্ধি ‘কায়েম’ (অক্ষুণ্ণ—বলবৎ) রাখি ।”

এই আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণে চতুর্দিক, হইতে শব্দ উত্থিত হইল—
“সন্ধি ‘কায়েম’ (স্থির) রাখুন, সন্ধি কায়েম রাখুন ।” প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগের ‘কম হেন্মতি’ (সাহসহীনতা—কাপুরুষতা) ও ‘বেওকুফির’ (নির্ভুক্তিতার) বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । তিনি ধমক দিয়া উহাদিগকে ‘শায়েক্তা’ (সোজা) করাই কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন । এই ভীতি-প্রদর্শনে তাঁহার

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল । কুফাবাসী যুদ্ধ করিয়া প্রাণদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না ; সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধ চর্চা ও আলোচনা এই স্থানেই শেষ হইল । কুফাবাসিগণ আদর্শ যোদ্ধা পুরুষ হইলেও, নিতান্ত চঞ্চল মতি ছিল ; তদুপরি ছাবাযী দল ও খারেজী দল তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া সর্বদাই বিপথগামী করিত । তাহারা স্থিরচিত্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে, ছফিন যুদ্ধে অনেক পূর্বেই বিশ্ব-জ্ঞাস মহাবীর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) জয়লাভ করিয়া, অথও মোছলেম জগতের একচ্ছত্র খলিফা হইতেন ; হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) শোচনীয় রূপে পরাস্ত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন । ইহাদের মধ্যে মহাবীর মালেক আশ্-তর-প্রমুখ কতিপয় কর্তব্য পরায়ণ এবং হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অকৃত্রিম পরম ভক্ত আদর্শ বীর-পুরুষ ছিলেন । যাহা হউক, হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ) নির্বিরোধে সমগ্র মোছলেম-জগতের খলিফা হইলেন ; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই রহিলেন না । আশ্-রায়ে মোবাব্বার অশ্রুতম পুরুষ, পারস্ত-বিজয়ী ও কুফা নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর হজরত ছাবাদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ) রাজনীতিক ব্যাপারের সংশ্লিষ্ট পরিত্যাগ পূর্বক, উষ্ট্র এবং হাগ-মেঘ চরাইয়া এবং ‘গোশা-নিশিনি’ (নির্জনবাস) অবস্থায় কেবল-মাত্র আল্লাহ্-তালার উপাসনা-আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন ; তিনিও হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়স্বেত করিলেন । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) প্রভৃতি সকলেই ক্রমশঃ হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়স্বেত করিলেন । স্থূলকথা, মহামান্ন ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এবং অন্যান্য ক্ষমতাশালী মোছলমান দিগের মধ্যে কেহই বয়স্বেত করিতে বাকী থাকিলেন না । সুতরাং হজরত মোয়বিয়া (রাজিঃ)

সমগ্র মোছলেম-জগতের একচ্ছত্র খলিফা হইলেন । উত্তরে এসিয়া মাইনর, ককেশ'শ পর্বতমালা ও বাহরে খেজর (কাস্পীয়ান সাগর) হইতে দক্ষিণে আরব সাগর এবং পূর্বে তুর্কিস্তানের সীমা হইতে পশ্চিমে মরক্কোর সীমা পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল । পরে এই সীমা আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

সন্ধি স্থাপনের পর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)—ভ্রাতা, আত্মীয়-ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া কিছু দিন কুফা নগরে বাস করিলেন ; তৎপর কুফানগরী চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ পূর্বক সদল বলে মদীনা শরীফে রওয়ানা হইলেন । কুফার অধিবাসিগণ কিয়দূর পর্যন্ত তাঁহার প্রত্যাগমন করিয়াছিল । এই দিন হইতে কুফার চুর্দ্দিনের স্মৃতিপাত হইল । এমাম ছাহেব (রাজিঃ) মদীনা শরীফে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । মহামানবী নানার (মাতামহের) এবং পরম শ্রেয়সা জননী পবিত্র কবর যেয়ারত করিয়া আনন্দ অমুভব করিতেন ; এবং সর্বদা আল্লাহ তা-লার এবাদৎ-বন্দেগীতে ‘মশ-গুল’ নিয়োজিত থাকিতেন । তাঁহাদের আগমনে মদীনাবাসিগণও অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন । তাঁহাদের তত্ত্ব ও অমুরক্ত দলের আনন্দের সীমা পরিসীমাই ছিল না । হজরত মোম্বিনা (রাজিঃ) একটি অপ্রীতিকর কার্য্য এই করিয়াছিলেন যে, আত্মীয়তার অমুরোধ কুচক্রী ও বনি-হাসেম এবং আহলে বয়েতের পরম শত্রু মারওয়ান-বিন্-হকমকে পবিত্র নগরী মদীনা-তৈয়বার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া, মহামাতা এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দ্বয়ের হৃদয়ে দারুণ বেদনা প্রদান করিয়াছিলেন ।

• ৫০ কিংবা ৫১ হিজরীতে হজরত এমাম হাছন আলায়হেচ্ছালাম ‘ওফাত’ পাইয়াছিলেন । সাধারণতঃ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রী জয়দাঃ-বিস্তে আল-আশরত তাঁহাকে বিষ পান করাইয়া-

ছিলেন । কিন্তু যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) এবং হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)ও নিশ্চিত রূপে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন না যে, কে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল ; এবং কি জন্ত বিষ পান করাইয়া তাঁহার পবিত্র জীবনের অবসান করিয়াছিল, তখন প্রায় চৌদশত বৎসর পরে একজনের প্রতি দোষারোপ কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না । পরবর্তী কালে এই ঘটনা সম্বন্ধে অনেক প্রকার বর্ণনাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং বিবী জরদাঃকেই বিষ প্রয়োগ কারিণী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে ।

‘ওফাতের’ (মৃত্যুর) পূর্বে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে বলিলেন “ আ হজরত (ছালঃ)-এর পর হইতে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পর্য্যন্ত (অর্থাৎ খেলাফতের প্রথম অবস্থা পর্য্যন্ত) খেলাফৎ পহুছিয়াছে (অর্থাৎ এই সময় পর্য্যন্ত খেলাফতের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই) ; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তরবারি কোষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে ; অথচ খেলাফতের কোন মীমাংসা হয় নাই । এক্ষণে আমি খুব ভাল রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, এমামঃ ও খেলাফৎ আমার ‘খান্দানে’ (বংশে) একত্রে থাকিতে পারে না । ইহাও ‘আনেশা’ (আশঙ্কা) হইতেছে যে, :বিপ্লববাদী ও বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসিগণ তোমাকে এখান হইতে তথায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, তুমি কোনও ক্রমেই তাহাদের ‘ফেরেবে’ (চক্রান্তে) পড়িও না । আমি (নানী) হজরতঃ আরেশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-কে বলিয়া ছিলাম, আমার মৃত্যু হইলে আমাকে আ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র কবরের পার্শ্বে দফন করিতে অনুমতি দিবেন ; তখন ত তিনি এ সম্বন্ধে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের খেয়াল এই যে, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে এক্ষণে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন না ;

কিন্তু আমার পরে (আমার মৃত্যু হইলে) তুমি আবার তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তিনি আদেশ না দেন, তবে তুমি কোনও রূপ প্রতিবাদ করিও না । ”

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পরলোক গমন করিলে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ)-এর নিকট ভ্রাতার দফন কার্য্য সম্বন্ধে অনুমতি চাহিলে তিনি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি প্রদান করিলেন । কিন্তু মদীনার শাসনকর্ত্তা শঠ-চুড়ামণি কুটিলমনাঃ মারোয়ান-বিন্-ইকম যখন শুনিতে পাইলেন যে, মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ), আ হজরত (ছালঃ)-এর সমাধি-পার্শ্বে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে দফন (কবরস্থ) করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তখন তিনি ইহাতে বাধা প্রদান করিলেন । এই সংবাদ প্রাপ্তে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও তাঁহার ভ্রাতা এবং অনুচর মণ্ডলী অস্ত্র-শস্ত্রে হুসজ্জিত হইয়া ভ্রাতাকে বলপূর্ব্বক দফন করিতে বাইবার জন্ত উত্তোগ করিতে ছিলেন ; কিন্তু এই সময় পণ্ডিত কুল চুড়ামণি হজরত আবু হোরেরাঃ (রাজিঃ) আসিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে বুঝাইয়া শুঝাইয়া শোণিতপাত হইতে নিবৃত্ত করিলেন । অগত্যা তিনি স্বীয় ভ্রাতা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে তাঁহার ওয়ালেদাঃ মাজেদাঃ হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর সমাধির পার্শ্বে—জন্নতল বকিতে দফন করিলেন ।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ২টি পুত্র ও ৬টি কন্যা—সর্ব্বসমেত এই পনরটি সন্তান ছিলেন । মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স্ক্রম ৪৭ কিংবা ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল । খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ এবং হজরত আমীর মোয়বিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের পর তিনি মাত্র ১০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন । তাঁহার মৃত্যুতে হজরত এমাম হোছেন

(রাজিঃ), তদীয় :অন্যাত্ম আত্মীয়-স্বজন, মহামাননীয়া নানী ছাহেবা (রাঃ—আঃ)-গণ, ছাহাবাঃ কারামগণ এবং মদীনার অধিবাসিগণ বিশেষ শোকাকুলিত হইয়াছিলেন। তিনি তদীয় মহামান্য পিতার জায় ধর্মের সাক্ষাৎপ্রতিমূর্তি স্বরূপ ছিলেন। এমাম ছাহেবের প্রশংসনীয় স্বভাব চরিত্র এবং ধর্ম্যানুষ্ঠানে দৃঢ়তা :——হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) নিতান্ত ‘হলিম’ (ক্রোধ-সংবরণকারী), ‘ছাহেবে-ওকার’ (ভারী-ভরকম্পন—গম্ভীর), ‘ছাহেবে-হশ্মত’ (দব্দবা-ওয়াল) এবং নিতান্ত ‘ছখি’ (দাতা) ছিলেন। ‘ফেৎনা’ (বিবাদ-বিসম্বাদ) ও ‘খুনরেবী’ (রক্তপাত)-এর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। তিনি ‘পেয়াদাঃ-পা’ (পদব্রজে) ১৫টি হজ্জ্ করিয়া ছিলেন—যদিও তাঁহার সঙ্গে আরোহণোপযুক্ত বিস্তর উট থাকিত। পদব্রজে গমন করিয়া অধিক পুণ্য লাভ হয় বলিয়া তিনি এত কষ্ট স্বীকার পূর্বক হাটিয়া গিয়া পবিত্র হজ্জ্ কার্য সম্পন্ন করিতেন। আজকাল নিতান্ত দরিদ্র লোক ব্যতীত কেহই হাটিয়া গিয়া হজ্জ্ করেন না। যমির-বিন্-এছহাক বলেন, কেবলমাত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)ই এমন এক ‘শখ্ছ’ (ব্যক্তি) ছিলেন যে, তিনি যখন কথা বলিতেন, আমি তখন ইচ্ছা করিতাম, তিনি কথা বলিতে থাকুন, কথা বলিতে তিনি যেন কোনও ক্রমই ক্ষান্ত না হন। আমি তাঁহার মুখে কখনও কোন ‘ফহশ্ কল্মাঃ’ (অশ্লীল বা অশ্রাব্য কথা) শুনি নাই। মারওয়ান-বিন্-আল্ হকম যখন মদীনার শাসনকর্তা ছিল, আর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) খেলাফৎ পরিত্যাগ পূর্বক মদীনায়া বাস করিতেছিলেন, ঐ সময় বে-আদব মারওয়ান একটি লোকের দ্বারা হজরত এমাম (রাজিঃ)-কে বলিয়া পাঠাইল যে, “ আপনার ‘মেছাল’ (উপমা) খচরের জায় (নউয্-বেল্লাহ্ মেন্হ) ; কারণ, উহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়

তোর বাপ কে ছিল ? উত্তরে সে বলে আমার মা ঘোড়ী ছিল । ” ইহার উত্তরে হজরত এমাম হাছেব (রাজিঃ) বলিয়া পাঠাইলেন, “ আমি তোমার একথা কখনও ভুলিতে পারিব না যে, তুমি বিনা কারণে আমাকে গালি দিতেছ । ‘আখের’ (অবশেষে) তোমাকে ও আমাকে একদিন খোদা তা-লার সম্মুখে বাইতে হইবে । যদি তুমি তোমার ‘কওলে’ (কথায়) ‘ছাচ্চা’ (সত্যবাদী) হও, তবে খোদা তা-লা তোমাকে সত্য কথা বলিবার সুফল প্রদান করিবেন ; আর যদি তুমি ‘বুটা’ (মিথ্যাবাদী) হও, তবে খুব স্মরণ রাখিও যে, খোদা তা-লা সর্বাপেক্ষা অধিক ‘মস্তকম্’ (বদলা লেনেওয়াল—প্রতিশোধ গ্রহণকারী) । ”

হবিব-বিন্-আছমা বলেন, যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন, তখন মারওয়ান তাঁহার জানাযার কাছে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । তদর্শনে হজরত এমাম হাছেন (রাজিঃ) ফরমাইলেন, এক্ষণে ত তুমি রোদন করিতেছ, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে ‘ছাতাইতে’ (বিরক্ত করিতে—মনোকষ্ট দিতে) ছিলে । উত্তরে মারওয়ান বলিল, আমি জানিতাম যে, ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমি ঐরূপ ব্যবহার করিতাম—যিনি পাহাড় অপেক্ষাও অধিক ‘হালিম’ (বোরদোওয়ার—দৈর্ঘ্যশালী—সহগুণ-বিশিষ্ট) ছিলেন ।

আলী-বিন্-যয়েদ বলেন, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) দুইবার স্বীয় সমস্ত ‘মাল’ (অর্থ-সম্পত্তি) খোদা তা-লার রাহে খায়রাত করিয়া দিয়াছিলেন । আর দুইবার অর্ধেক অর্ধেক মাল দান করিয়াছিলেন ; এই পর্য্যন্ত খায়রাত করিয়াছিলেন যে, একখানি জুতা রাখিয়াছিলেন, একখানি দান করিয়াছিলেন ; ঐরূপে একখানি মোযাঃ রাখিয়া আর একখানি মোযাঃ খায়রাত করিয়া দিয়াছিলেন ।

একবার তাঁহার সম্মুখে হজরত আবুযর (রাজিঃ) বলিয়াছিলেন, “ আমি

‘তওফরি’ (ঐশ্বর্যশালী) হইতে ‘মোক্লেছি’ (দরিদ্রতা) কে, আর ‘তন্দরস্তি’ (স্বাস্থ্য-সম্পদ) হইতে পীড়িত থাকাকে অধিক ‘আযিয’ (প্রিয়) বলিয়া মনে করি ;” তজ্জ্ববে হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বলিলেন, “ খোদা আপনার উপর ‘রহম’ (দয়া প্রদর্শন—করুণা বিতরণ) করুন, আমি কিন্তু আমাকে সর্বতোভাবে খোদা তা-লার হস্তে অর্পণ করিয়াছি ; আর কোনও কথারই ‘তমায়াঃ’ (আরয়ু—থাহেশ—কামনা) করি না ; তাঁহার (আল্লাহ্ তা-লার) বাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন ; আমার তাহাতে ‘দখল’ দেওয়ার কি আছে ? ”

তিনি ৪১ হিজরীতে হজরত আমীর মোবিনা (রাজিঃ)-কে খেলাফত ছাড়িয়া দেন । উহার পরে তাঁহার কোনও ‘দোস্ত্’ (বন্ধু) তাঁহাকে “ আমিরুল-মুমেনিন ” বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি ফরমাইতেন যে, ‘আর’ (‘শরম’—লজ্জা—লাজ), ‘নার’ (দোষথ্—নরক) হইতে ‘বেহ-তর’ (উৎকৃষ্ট) । এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়া ছিল, হে মোছলমান দিগকে ‘যলিল’ (অপদস্থ) করনেওয়াল ! তোমাকে ছালাম । উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি মোছলমানদিগকে অপদস্থ বা অবমাননাকারী নহি ; আমার পক্ষে কি উহা ভাল কাজ ছিল যে, তোমাদিগকে হত্যা করাইয়া দিতাম ?

জবির-বিন্-নফিল বলিয়াছেন যে, আমি হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে বলিলাম, এইরূপ জনরব যে, আপনি নাকি পুনরায় খেলাফতের ‘থাহেশ-মন্দ্’ (আকাজ্জী) ? উত্তরে তিনি ফরমাইলেন, যখন আরববাসীর মস্তক আমার হাতে ছিল, বাহাকে ইচ্ছা যুদ্ধে লাগাইতে পারিতাম, ঐ সময়ও আমি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা-লার প্রীতি সাধন ■■■ খেলাফৎ পরিত্যাগ করিলাম ; সেইরূপ ক্ষেত্রে এক্ষণে ‘আহ-লে হেজায্’ (হেজায্ বাসী)-দিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত কেন

খেলাফৎ কবুল করিব? ৫০ হিজরীর রবিওল-আউওল মাসে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন; বিষ প্রয়োগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) নিতান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন যে, কে আপনাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, বলুন; কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না; বরং ফরমাইলেন, “আমার বাহার প্রতি ‘শোবাহ্’ (সন্দেহ), যদি সেই লোকই আমার ‘কাতেল’ (হত্যাকারী) হয়, তবে খোদা তাঁ-লা কঠোর ‘এস্তেকাম’ (প্রতিশোধ) গ্রহণকারী; অন্যথা আমার জন্ত কেন কোনও ব্যক্তি ‘নাইক্’ (অনর্থক) মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে?”

— —

খেলাফৎ হাছেনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত

আলোচনা।

কোনও কোনও ইতিহাস-বেত্তা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ছয় মাস কাল মাত্র স্থায়ী খেলাফৎ কে “খেলাফৎ রাশেদাঃ”তে ভুক্ত করিতে চাহেন না। কারণ ইহা অতি অল্প সময় মাত্র স্থায়ী এবং ‘নামকম্বল’ (অসম্পূর্ণ) খেলাফৎ ছিল। আমাদের মতে এই অল্পকাল স্থায়ী খেলাফৎকে অসম্পূর্ণ খেলাফৎ বলিতে গেলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর খেলাফৎকেও অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে তাঁহার খেলাফৎকেও খেলাফৎ রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা কোনও ক্রমেই সিদ্ধ নয়। খেলাফৎ অল্পকাল স্থায়ী হইলেই, তাহা খেলাফতের বহির্ভূত বলিয়া ধরা

কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না । বিশেষতঃ আবু হজরত (ছালঃ)-এর বর্ণিত হাদীছানুসারে যখন প্রকৃত খেলাফতের সময় ৩০ বৎসর ধরা হইয়াছে, তখন এই নির্দিষ্ট সময় মধ্যের খেলাফৎ অবশ্যই খেলাফৎ রাশেদার অন্তর্ভুক্ত হইবে । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ছয়মাস কাল স্থায়ী খেলাফৎ ঐ ত্রিশ বৎসরের অন্তর্ভুক্ত । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালের প্রতি যদি স্থির ভাবে—অবিচলিত চিত্তে, নিবিষ্ট মনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে উহাকে নিশ্চয়ই খেলাফৎ রাশেদা বলিয়া ধরা যাইতে পারে । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর অতি অল্প-কাল স্থায়ী খেলাফৎ কাল মধ্যে যদিও ভিন্ন দেশ বিজয় এবং যুদ্ধ-হাদ্যাদা কিছু ঘটে নাই ; কিন্তু তিনি যুদ্ধ-হাদ্যাদায় লিপ্ত ও শোণিতপাত না করাতে, এছলাম ও এছলাম জগতের এত উপকার সাধিত হইয়াছিল যে, সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসরের খেলাফতে ও শত শত যুদ্ধ ও অসংখ্য লোকের শোণিতপাত দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইত না । এছলামের ‘খেদমতে’ (পরিচর্যায়—সেবা কার্যে) হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) নিশ্চয়ই খোলাফায়ে রাশেদিনের পার্শ্বে আসন পাইবার উপযুক্ত । তিনি ৪৫ বৎসরের “ খানাঃজঙ্গী ” (আপসের যুদ্ধ—অন্তর্বিগ্রহ) যাহা দূর হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন । মোছলেম-বিদ্রোহী মোনাফেক ও মোছলমান আকার বিশিষ্ট যিহুদীদিগের যে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সুদীর্ঘ ২১১০ বৎসর হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তাহা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন । সেই বিপ্লবানলে হঠাৎ যেন পানী পড়িয়া উহা নির্বাপিত হইয়া গেল । আবু হজরত (ছালঃ)-এর সময়কার প্রবল মোনাফেক দলের নেতা আবদুল্লা-বিন্-আবির মৃত্যুতে সেই বিপ্লববাদী দলটি যদিও মাথা গুঁজিয়া

ছিল ; এবং ১ম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ)-এর অল্পকাল স্থায়ী গৌরবান্বিত খেলাফৎ কাল, এবং অদ্বুতকর্মা মহা প্রভাবশালী ২য় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে, তাঁহার দোদীর্ঘ প্রতাপে ঐ রক্তবীজের দল একেবারে নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল ; তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান (রাজিঃ)-এর খেলাফতের প্রথমাংশ, ২য় খলিফার সেই গৌরবান্বিত কার্যাবলী প্রভাবে, সেই প্রচণ্ড স্রোতে সম্পূর্ণ শান্তির সহিত অতিবাহিত এবং পূর্ণ তেজে বিদেশ বিজয় ও এছলাম-প্রচার হইয়াছিল ; মহামান্ব তৃতীয় খলিফার খেলাফতের শেষ ভাগে যিহুদী সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত মোনাফেক সম্প্রদায় আবার মস্তোকোত্তোলন করিল ; আবুহুলা-বিন্-ছাবাঃ নামক একজন মহা ক্ষমতাশালী চালবাজ ব্যক্তি ও তাহাদের নেতৃত্বে জুটিল ; অনেক খাটি মোছলমান ও উহার ধোকার পড়িয়া বিপথগামী হইয়াছিলেন ; উহাদের কুহক-জালে জড়িত হইয়া একটা ভীষণ বিপ্লবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন । বে মোনাফেক দল প্রথমে মদীনা ও তৎপাশ্বে বর্ত্তী স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহারা এক্ষণে পূর্ব-দিকে এরাক ও পারস্ত এবং পশ্চিম দিকে মিশর দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল । আবুহুলা-বিন্-ছাবার গুপ্তচর বা এজেন্টগণ মোছলেম-জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল । তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে এবং মারওয়ান বিন্-হকমের দুষ্কৃতি-ফলে, নির্দোষ তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ) অতি নৃশংস ভাবে শহীদ হইয়াছিলেন । ইহাদেরই ষড়যন্ত্রে অতি সর্বনাশ কর “ জমল ” যুদ্ধ সজ্জাটিত হয়, এবং হজরত যোবের (রাজিঃ) ও হজরত তাল্হা (রাজিঃ) অতি শোচনীয় ভাবে শহীদ হন ; এবং উভয় পক্ষে ১০ দশ হাজার অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মোছলমান বীরের উত্তপ্ত শোণিতে সমর-ক্ষেত্র রঞ্জিত ও কর্দমিত হয় । তৎপর ছফিন যুদ্ধেও উভয় পক্ষের ৭০৮০ হাজার সৈন্তের নিপাত

সাধন হয় । এই সময় মোনাফেক ■ এব্‌নে ছাবার দল হইতে “ শিয়া ” এবং “ খারেযী ” সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল । পরবর্ত্তীকালে খারেজিগণের উৎপাত ও বাড়াবাড়ি চরমে উঠিলে, হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কর্তৃক নহরওয়ানের যুদ্ধে উহাদের অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হয় ; কিন্তু ঐ ভীষণ যুদ্ধে যে ৯ জন খারেজী জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল । তাহাদেরই এক পাষণ্ড কর্তৃক মহামান্ন আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শহীদ হন । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎকালে ইহাদের দল আবার বাড়িতে থাকে । হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত না হইলে, এই পাষণ্ড দল আরও যে কি ভীষণ পাপানুষ্ঠান ও মোছলমানদিগের সর্বনাশ সাধন করিত, তাহা বলা যায় না ।

এই সন্ধির দ্বারা যদিও হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) বংশগত ও ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; খেলাফৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্য দিকে মোছলমানদিগের জাতীয়তার হিসাবে ইহা আপাততঃ বড়ই ফলোপধায়িনী হইয়াছিল । মোছলমানদিগের আপসের যুদ্ধ-হাঙ্গামা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; বিপ্লববাদী মোনাফেক ও খারেজী সম্প্রদায়ের উৎপাত নিবারিত হইয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে অমোছলমানের রাজ্য আক্রমণ ও তাহাদের রাজ্য মোছলেম-খেলাফতের অধীন হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল । পূর্বে তুর্কস্তানের দিকে, পশ্চিমে রুমের কারছরের রাজ্য ও আফ্রিকার মোছলেম-বিজয় কার্য অতি গৌরবান্বিত রূপে সম্পন্ন হইতে ছিল । ইতিপূর্বে যে শানিত তরবারি ও তীক্ষ্ণনেখাঃ (বল্লন বা বড়শা) মোছলমানদিগের পরম্পরের মধ্যে স্বীয় ধ্বংসকরী কার্য্য করিতেছিল, উহা এক্ষণে বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইবার সুযোগ ঘটিল । এই ব্যাপারে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যে উন্নত হৃদয় ও সংসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, মোছলমানদিগের

পরস্পরের মধ্যে শোণিতপাতের দ্বারাবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠে চির দিন সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে । যে অস্ত্র এত দিন মোছলমানদিগের পরস্পরের বক্ষঃ বিদ্ধ করিতে ছিল ; সঙ্গে সঙ্গে মোছলেম-শত্রুগণ—বিপথগামী খৃষ্টীয়ান অগ্ন্যুপাসক ও পৌত্তলিকগণ শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে ছিল, মোছলমান জাতিকে ধ্বংস করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাদের সে উদ্দেশ্য বার্থ ও সে সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল । মোছলমানগণের শোণিত অস্ত্র গুলি আবার তাহাদের বক্ষঃভেদ করিবার জন্য উদ্ভূত হইল ; মোছলেম-বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হইল । আবার বিক্রান্ত আরব-বাহিনী পশ্চিমে, পূর্বে ও উত্তরে বিজয়-পতাকা উড়াইয়া, বিধর্মী ও খোদা-দ্রোহী জাতিকে এছলামের দিকে আহ্বান করিবার সুযোগ লাভ করিল । যে বিশাল মোছলেম-সৈন্যদল—বিশ্বজ্ঞান মোছলেম বীর বৃন্দ জমল যুদ্ধে, হুফিন যুদ্ধেও মেছের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষের উপর ছিল ; তাহাদের দ্বারা সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এছলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত । তবুও পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আত্ম-দ্বন্দ্ব, আত্ম-কলহ ও আত্ম-বিচ্ছেদের দ্বার বন্ধ হইল । পরবর্তী কালে আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ), নিতান্ত অসচ্চরিত্র, কদাচারী, ব্যভিচারী, মদ্য-পায়ী মোছলেম-বিদ্বেষী নরাধম পুত্র এষিদকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না করিলে, কয়েক বৎসরের জন্য আবার মোছলেম-বিজয়ের গতিরোধ হইত না । যাহা হউক, এক্ষেত্রে উদার হৃদয় ধর্ম-প্রাণ হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) যে উন্নত হৃদয়ের, নিঃস্বার্থ পরতার ও উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ব-বিশ্রুত অসমসাহসিক মহাবীর পুরুষ হজরত খালেদ-বিন্-অলিদ (রাজিঃ)-এর বীরত্ব অপেক্ষাও গৌরবান্বিত । আজ সমগ্র মোছলেম-জগত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এবং তদীয় কনিষ্ঠ

সহোদর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শত সুখে গুণ কীর্তন এবং তাঁহাদের পবিত্র আত্মার সদগতি-কামনা করিতেছেন ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ! হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর হস্তে যখন 'বয়্য়েত' করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সময়কার শেষ উক্তিটুকু স্মরণ করুন :—“ যদি এমারত (আমীরি) ও খেলাফৎ হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর 'ইক্' ছিল, তবে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইলেন, আর যদি উহা আমার 'ইক্' (ন্যায় প্রাপ্য) ছিল, তবে আমি উহা তাঁহাকে 'বখ্শিয়া' দিলাম (প্রদান করিলাম) । ইহা কি উদারতার পরিচায়ক মূল্যবান্ উক্তি ! জনাব আঁ হজরত (ছালঃ)-এর প্রিয় দোহিত্রের উপযুক্ত উক্তিই বটে । তাঁহার এই উদারতা পূর্ণ উক্তিতে : তাঁহার পিতৃ-শত্রু, বনু-হাশেমের চির বিরুদ্ধাচারী, প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পবিত্র এছলাম ও আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ভীষণ শত্রু, কোরেশ দলের নেতা হজরত আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর পুত্র হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই । আবার এই উদারতায় বিমোহিত হইয়া মেহের-বিজয়ী মহাবীর ও কুটিল রাজনীতিবিদ হজরত ওমরু বিনল্-আছ (রাজিঃ), হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) দ্বারা এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন ; সে সুন্দর বক্তৃতার সার মর্ম্ম ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এমাম ছাহেন (রাজিঃ) ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতীমূর্ত্তি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নবীর উপযুক্ত আদর্শ বংশধর, আদর্শ উত্তরাধিকারী, ও আদর্শ পদানুসরণকারী ছিলেন ।

মহামান্য হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর এই উদারতায়, এছলাম-প্রীতিতে, নিঃস্বার্থপরতায় কেবল যে সেই সময়কার মোছল-মানগণই মহা উপকৃত হইয়াছিলেন ; তাহা নহে । বরং 'কেয়ামত'

(মহাপ্রলয়) কাল পর্য্যন্ত ইহার সুফল মোছলমানগণ ভোগ করিবে । তাহাদের পক্ষেও অর্থাৎ শোণিত পাতের অঙ্ককার সমুদ্রে মহামান্ন এমাম হাছেব (রাজিঃ)-এর কার্য্য “লাইট্ হাউস” এর কার্য্য করিবে । কুফার অধিবাসিগণের মধ্যে অন্ত যত প্রকার দোষই থাকুক না কেন ? তাহাদের চিত্ত-চঞ্চল্য, অস্থিরমতিত্ব, শত্রুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়া, স্বার্থ-পরতা ইত্যাদি দোষ নিতান্ত মারাত্মক হইলেও, তাহারা ভীষণ যোদ্ধা, অসম সাহসিক বীর পুরুষ, সংগ্রামে হৃদয়ের শোণিত দান কার্য্যে অত্যন্ত ছিল । এই শ্রেণীর ৪০ হাজার বিক্রান্ত যোদ্ধাপুরুষ এমাম হাছেব (রাজিঃ)-এর পক্ষে হৃদয়ের শেষ রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল ; উহারা নির্বোধ এবং চঞ্চলমতি হইলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জন করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত ছিল না ; বিগত ছফিন যুদ্ধে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল । শাম—অর্থাৎ সিরীয় বীরপুরুষগণও আদর্শ যোদ্ধা এবং শত্রুর পক্ষে যম স্বরূপ ছিল ; তাহাদের বাহুবলে রোমক সাম্রাজ্য টলটলায়মান হইত ; তাহাদের অসাধারণ ভূজবলে কনষ্টান্টিনোপলস্থ রোমক বা গ্রীক সম্রাটের এসিয়িক অধিকারের অধিকাংশ স্থান মোছলেম-খেলাফতের শাসনাধীন হইয়াছিল ; হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) কর্তৃক পরিচালিত সেই সিরীয় সেনাদল কোনও দিনই রোমক বীরদিগের দ্বারা পরাভূত হয় নাই ; বরং প্রত্যেক যুদ্ধে পরাজিত ; বিধ্বস্ত ও পলায়নপর হইয়া ছিল ; কিন্তু ছফিন যুদ্ধে সেই বিক্রান্ত, শামী অর্থাৎ সিরীয় বীরদল এরাক অর্থাৎ কুফাবাসী বীরগণের হস্তে শোচনীয় রূপে পরাভূত হইয়াছিল ; যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের ৩০ গুণ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল । সেই মহা পরাক্রান্ত যোদ্ধা পুরুষগণ মহাবীর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), হজরত এমাম ছোছেন (রাজিঃ), মহাবীর কয়েছ-বিন্-ছায়াদ (রাজিঃ) ও অন্যান্য হাশেমী

বীরগণের দ্বারা পরিচালিত হইলে আবার হুসাইন যুদ্ধের পুনরাভিনয় হইত । মক্কা ও মদীনায়া বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) এবং আরবের বিভিন্ন প্রদেশস্থ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ■ এমাম ভক্তগণ, আর পারশ্বাদি দেশের মোছলমানগণ ক্রমশঃ তাঁহার পতাকা-মূলে সমবেত হইয়া, তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিত, সুতরাং এই যুদ্ধে আমীর হজরত মোবিনা (রাজিঃ)-এর জয়লাভ করা সুদূর পরাহত ছিল । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), হজরত জাফর তাইয়্যার (রাজিঃ)-এর তনয়গণ, হজরত অকিল (রাজিঃ)-এর পুত্র হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকেই তরুণ যুবক ও আদর্শ বীর-পুরুষ ছিলেন । শত্রুদলের পক্ষে তাঁহারা ভীষণ কালান্তক কাল স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেন । পরবর্তী কারবালার যুদ্ধে মুষ্টিমেয় হাশেমী বীরগণ অনাহারে ও ভীষণ ভাবে পিপাসার্ত থাকিয়াও এযিদী ও এব্নে যেয়াদী সৈন্যগণের সহিত কিরূপ মহাবীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্বারাই-হাশেমী বীরগণের বীৰ্য্য-বতীর পরিচয় পাওয়া যায় । সুতরাং এই যুদ্ধ যে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত, এবং তাহাতে উত্তম পক্ষীয় মোছলেম বীরগণ পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইত, তাহাতে অগুমানও সংশয় নাই । এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দয়, শেরে খোদা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর উপযুক্ত পুত্র এবং তাঁহারই দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত আদর্শ বীর পুরুষ ছিলেন ; সুতরাং সেই তেজস্কর পিতৃ-শোণিত বাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত হইত ; তাঁহারা সমরক্ষেত্রে কি ভীষণ সমর-লীলারই অভিনয় করিতেন, উহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে । তখনও শত শত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) জীবিত ছিলেন ; বাহারা হজরত রছুলোম্মাহ্ (ছালঃ)-এর দৌহিত্র দ্বয়ের প্রতি মাতামহের অতুলনীয় ও অনন্ত মেহ-

ভালবাসার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুরাগ স্বভাবতঃই এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের প্রতি ছিল । আবার তাঁহাদের আদর্শ ধর্ম্মানুরাগ, আদর্শ মোছলেম-প্রীতি, আদর্শ চরিত্র প্রভাবে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন । এমন কি, হজরত ওহমান গনী (রাজিঃ)-এর অন্ত্যায় শাহাদতে (হত্যাকাণ্ডে) ভ্রম-জনিত নানাকারণে যাহারা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রতি মহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না ; হজরত এমাম ভ্রাতৃ-যুগলের প্রতি তাঁহাদের ও পূর্ণ মহানুভূতি ছিল ; ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) ও অন্যান্য ক্মতামশালী তায়্যপরায়েণ মোছলমানজিগের মধ্যে অধিকাংশ জ্ঞানী মহাপুরুষই জানিতেন যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)ই প্রকৃত পক্ষে খলিফা হইবার উপযুক্ত পাত্র । কারণ, মাতামহ এবং পিতা মাতার সর্ব প্রকার সদগুণ ও আদর্শ শক্তি তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল । একদিকে যেমন ধর্ম্ম বিজ্ঞায় ও শত্রু বিজ্ঞায় পরিদর্শী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই রাজনীতি শাস্ত্রে ও সুপণ্ডিত ছিলেন । কোনও প্রকার চালবাজী ও ধোকাবাজী তাঁহার মধ্যে ছিল না । তিনি অতি সরল বিশ্বাসী, সরল চেতা আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন । এই সকল বিষয় তাঁহার একান্ত অনুকূল হইলেও, তিনি মোছলমানদিগের শোণিতপাতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক ছিলেন না । মোছলমানদিগের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব সম্পাদনের জন্যই তিনি একান্ত ব্যাকুল ছিলেন ; তাহার ফলেই অতি সহজে এই পবিত্র সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ।

এই সন্ধি স্থাপনের এই ফল এই হইল যে, মোছলমানগণ আবার একতাবদ্ধ হইয়া মোছলেম-বিদ্রোহী শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । এছলাম প্রচারের ■■■ মোছলেম ধর্ম্ম-প্রচারক ও মোছলেম বীরপুরুষগণ পশ্চিমে, পূর্বেও উত্তর দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন ; বাহ্-রে-রুম' (ভূমধ্য-সাগর)-এর স্বনামধ্যাত দ্বীপ 'কোবরছ্' (সাইপ্রস্)

■ রোডসাদি মোছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইল ; বলিফা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর বিজয়ী সেনাদল বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দ্বারা গঠিত হইয়া, রোমক রাজধানী বিশ্ব-বিস্তৃত মহানগরী কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করিলেন ; এই অভিযানে সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাজিঃ) অঙ্গতম নেতা রূপে গমন করিয়া-ছিলেন । সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাল অবরোধ সময় মধ্যে তিনি সেখানে প্রাণত্যাগ করিলেন ; কনষ্টান্টিনোপলের নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল । আজ উহা কনষ্টান্টিনোপল (কুস্তন্তিনিয়া বা ইস্তাম্বুল)-এর একটি প্রধান “যেয়ারত-গাহ্” এবং সেখানে “জামেয় আবু আইয়ুব” নামে অভিহিত এক প্রকাণ্ড জামেয় মহজেদ তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন রূপে বিরাজ করিতেছে । হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি ওত্বাঃ উত্তর আফ্রিকার আল-জিরিয়া ও মরক্কো (আল-মগরেব) অধিকার করিয়া—আটলান্টিক মহাসাগরের তট পর্য্যন্ত এছলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া ছিলেন । তিনি আটলান্টিক মহাসাগরে স্বীয় অশ্ব নিপাতিত করিয়া বলিয়াছিলেন, “হায় ! আর স্থলভাগ নাই ; এই বিশাল সমুদ্র আমাদের গতিরোধ করিল ।” মোছলেম-গোরবের সেই একদিন, আর আজ একদিন । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ), আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি-বন্ধন না করিলে, এই গোরবান্বিত মোছলেম-বিজয় কার্য সম্পাদিত হইত না । হয় ত মোছলেম-আত্ম-বিচ্ছেদের ফলে বহু নব-বিজিত রাজ্য, দেশ, প্রদেশ, জনপদ ও নগরাবলী মোছলমানদিগের হস্তচ্যুত হইত ; তওহিদের মহাবাহী আর নূতন কোনও দেশে গুনা যাইত না । পৌত্তলিক, অগ্নি-পূজক ও খৃষ্টীয়ানদিগের দ্বারা উন্নতিশীল এছলামের গতিরোধ হইত ; পৃথিবী আবার ঘোর অন্ধকারে

আচ্ছন্ন হইত । পৌত্তলিকতা, জড়বাদ, অগ্নিপূজা ও খৃষ্টীয়ানী ত্রিঈশ্বরবাদ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইত । [REDACTED] এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর উদারতা, স্বার্থত্যাগ, এছলামের প্রতি প্রাণের সহানুভূতি, সমবেদনা ইত্যাদির প্রবল আকর্ষণে মোছলমানদিগের মধ্যে আত্ম-কলহ ও আত্ম-হত্যার অবসান হইল । তদনুসারে হজরত মোবিনা (রাজিঃ)-এর দীর্ঘকাল ব্যাপী-রাজ্য শাসন কালে মোছলেম-জগতে কোনও রূপ অশান্তির উদ্বেক হই নাই ; নব নব দেশ বিজিত এবং ঐ সকল দেশে এছলাম প্রচার হইয়াছিল ।

আদর্শ ধার্মিক, আদর্শ চরিত্র এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর অকাল মৃত্যুতে মোছলমান মাতেই শোকার্কুলিত হইয়াছিলেন । অমন উদার, অমন-দয়ালু, অমন স্বজাতি-বৎসল ও স্বধর্ম্মানুরাগী পুরুষের অন্তর্ধান বড়ই শোকাবহ ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল ।

হে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা ! মহামান্ন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর পবিত্র আত্মার দোওয়ার বরকতে হুনিয়ার মোছলমান নরনারীদিগকে মুক্তি প্রদান করিও ; আর অধম লেখকের প্রতি অনন্ত করুণাকণা বিতরণ পূর্বক, পরকালের সর্ব-প্রকার আযাব হইতে তাঁচাকে রক্ষা করিও ।

পঞ্চম ভাগ।

হজরত এমাম হোছেন

(রাজিঃ)-এর জীবনী।

জন্ম-বৃত্তান্ত।

হজরত মাওলানা ওয়ালী উদ্দীন দামেশ্‌কী মেশ্‌কাত শরীফ্‌ (রহঃ), স্বরচিত কেতাব “আকমাল ফি আছমায়ের রেজাল” নামক গ্রন্থে ‘তহরির ফরমাইয়াছেন’ (লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) যে, বিভিন্ন বিশ্বাস্ত গ্রন্থাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমাম আল্-আমম্ হুরদারে শিধান কারবালা, ছব্‌তর রছুল জনাব হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম ৪র্থ হিজরীর ৪ঠা শা’বান, শনিবার দিন মদীনা-মনুওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ‘কুনিয়ত’ “আবুল্লাহ্”, লকব “যকি”, “শহীদ” “ছিদাঃ” ও “ছব্‌ত্‌”। ‘বাচ্চাঃ’ (সন্তান—শিশু) সাধারণতঃ ■ মাসে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তিনি ছয়মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছয় মাসের কোনও শিশু এই এমাম চাহেব (রাজিঃ) ও হজরত ইয়াহ্‌ ইয়া (আলাঃ) ব্যতীত আজ পর্যন্ত জীবিত থাকেন নাই। ইহাও তাঁহার এক ‘খল্‌ফি কারামত’ (জন্মগ্রহণ জনিত আশ্চর্য ব্যাপার) ছিল—

যাহা হজরত ইয়াহুইয়া (আলাঃ)-এর পরে তাঁহার উপর ঘটয়াছিল । আবার তাঁহার উপরই ইহা ‘খতম (শেষ)ও হইয়াছে ; অর্থাৎ তাঁহার পরেও আর কোন ব্যক্তি ৬ মাস কাল গর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জীবিত থাকেন নাই এবং থাকিবেনও না । ইনি হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হইতে মাত্র ৭ মাস ২০ দিনের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন । যখন ইহার ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ জনাব হজরত রছুল করিম ছালাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া ছালামের নিকট পহঁছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা-লার দরগায় শোকরিয়ার (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের) ছেজদাঃ আদায় করিলেন । তৎপর তিনি তখন তখনই হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর গৃহে আগমন করিলেন । হজরত আছমাঃ-বিস্তে-য়মিছ (রাঃ—আঃ), শিশুকে কাপড়ে জড়াইয়া আঁ হজরত (ছালঃ)-এর কোড়ে স্থাপন করিলেন । হজুর (ছালঃ) শিশুর ডান কাণে আজান ও বাম কাণে আকামত বলিলেন । অতঃপর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলি ! তুমি এই শিশুর কি নাম রাখিয়াছ ? শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) করজোরে ‘আরজ’ করিলেন, “ হজুর বর্তমান থাকিতে আমি কিরূপে এই শিশুর নাম রাখিতে পারি ? আপনি যে নাম উপযুক্ত মনে করেন, সেই নামই রাখুন । আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহার নাম “ হরব ” (যুদ্ধ) রাখা হইবে ; এক্ষণে হজুরের যাহা মরজী । ”

আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হে আলি ! আমি স্বয়ংও এই নাম রাখা ব্যাপারে অগ্রবর্তী হইতে ইচ্ছা করি না ; অর্থাৎ নিজ হইতে শিশুর নাম রাখিতে ইচ্ছুক নহি । আলার ওহীর (প্রত্যাদেশের) অপেক্ষা করিতেছি । এই কথাবার্তা চলিতেছে, ইত্যবসরে হজরত জিব্রিল আলায়হেছালাম ‘নাযেল’ (অবতীর্ণ) হইলেন ; এবং

আরজ করিলেন, এয়া রহুলোল্লাহ্ ! শাহ্‌বাদাঃ এমাম হাছন আলায়-
হেচ্ছালামের নাম, হজরত হাক্বণ আলায়হেচ্ছালামের জ্যেষ্ঠ পুত্রের
নামানুসারে শব্বর অর্থাৎ হাছন রাখা হইয়াছে। একন্ত ছোট শাহ্‌বাদার
নামও হজরত হাক্বণ (আলাঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্রের নামানুসারে শব্বির
অর্থাৎ হোছেন রাখুন ; তদনুসারে ঐ নামই রাখা হইল।

আ হজরত (ছালঃ) এই পবিত্র শুভবাণী শ্রবণে নিতাস্তই আনন্দ
লাভ করিলেন। আল্লাহ্ জল্লশানাহর আদেশানুসারে এই নব-প্রসূত
শাহ্‌বাদার নাম হোছেন রাখিলেন। ৭ম দিনে শিশুর 'আকিকা' কার্য
সম্পন্ন করা হইল। আকিকার ২টি 'বকরী' (ছাগ) যবেক, আর মাথার
চুলের পরিমাণ চান্দ খায়রাত করা হইয়াছিল। আল্‌হাম্দো গিল্লাহ্ !
এই 'রহম' (নিয়ম) মোছলমানদিগের মধ্যে অস্ত্রাপি চলিয়া আসিতেছে,
এবং ইহার মধ্যে কোনও রূপ 'বেদম্মাত' (কুপ্রথা—নিষিদ্ধ নিয়ম)
এষাবৎ প্রবেশ করে নাই।

হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) মস্তক হইতে 'ছিনাঃ' (দক্ষঃস্থল)
পর্যন্ত, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ছিনাঃ হইতে পা মবারক পর্যন্ত
পর্যন্ত হজরত রহুল মকবুল (ছালঃ)-এর সম্পূর্ণ 'মশাবাহ' (আকৃতি
বিশিষ্ট) ছিলেন। যেমন খোদা তালা এই উভয় শাহ্‌বাদাকে 'মজ্‌যুরী'
(একত্রে) হজরত রহুল আল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের
'তছবির' (মূর্তি) 'মকম্মল' (পূর্ণভাবে) সৃজন করিয়াছিলেন।

ফজলারেল ও মনাক্কব

(সদগুণাবলী ও সদাচার) ।

জনাব হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সদগুণাবলী ও প্রশংসা সীমাতীত ও অনুমান বহির্ভূত ; অর্থাৎ তাঁহার সদগুণ ও প্রশংসা লিখিয়া শেষ করা যায় না । তদীয় পবিত্র জীবনী ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা সেই সদগুণ ও প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ । তাঁহার ফজিলত পূর্ণতা প্রাপ্ত কেন হইবে না ? তাঁহার মধ্যে হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর 'খুন' (শোণিত—রক্ত) প্রবাহিত ছিল । তাঁহাকে ছরদারী বা নেতৃত্ব এবং বোজর্গী খোদাতায়ালা হইতে বিশেষ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল । জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) তাঁহার প্রতি 'বেহদ' (অসীম) 'মহব্বৎ' (মেহ—ভালবাসা) রাখিতেন । নিম্ন-লিখিত রওয়ায়েতানুযায়ী (বর্ণনানুসারে) হজুর (ছালঃ)-এর মহব্বৎ বা মেহ ভালবাসার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইবে । ছনিন তেরমবি শরীফে লায়লী-বিন্-মররাহ (রাজিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, হোছেন (রাজিঃ) আমার মধ্যে আছে, এবং আমি হোছেন (রাজিঃ)-এর মধ্যে আছি । খোদা তা-লা তাহাকে দোস্ত রাখিয়াছেন (বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন) ; বে হোছেন (রাজিঃ)-এর দোস্ত ; হজুর আকরম (ছালঃ) তাঁহাকে সীমাতীত রূপ পছন্দ ফরমাইতেন । এতদ্ সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা এই যে, একদা হজরত ছারওয়ায়ে কাসেনাত (ছালঃ) মদীনা শরীফের কোনও গলি দিয়া গমন করিতেছিলেন । তথায় কয়েকটি ছোট ছোট বালক খেলা করিতেছিল । হজুর (ছালঃ) তন্মধ্যে হইতে একটি বালককে ক্রোড়ে

তুলিয়া লইলেন ; এবং তাহার ‘পেশানীতে’ (কপালে) চুম্বন করিলেন । জনৈক ছাহাবাঃ (রাজিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর এটি কাহার ছেলে যে আপনি উহার প্রতি এতাদৃশ স্নেহ প্রদর্শন করিলেন ? উত্তরে হুজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, এই বালকটি একদিন আমার হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে খেলা করিতেছিল, আমি দেখিতে পাইলাম, এই বালক হোছেন (রাজিঃ)-এর পারের মাটি লইয়া স্বীয় চক্ষে মর্দন করিল । সেই দিন হইতে এই বালককে আমি মহব্বতের (স্নেহ-ভালবাসার) দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি ; আর এন্শাওয়াহ্-কেয়ামতের দিন উহার পিতা মাতার জন্ত শাফায়াত (‘ছোফারেশ’—মুক্তি প্রদান জন্ত অমুরোধ) করিব ।

এমাম তেরমযি (রহঃ), এব্নে মাজাঃ (রহঃ), এব্নে হবান (রহঃ) ও হাকেম (রাজিঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জনাব হুজরত রহুল করিম (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, “ আমি লড়িব (যুদ্ধ করিব) উহার সঙ্গে—যে লড়িবে (যুদ্ধ করিবে) ফাতেমা (রাঃ—আঃ) ও হাছন (রাজিঃ) এবং হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ; আর ‘ছোলেহ্’ করিব উহাদের সঙ্গে—যাহারা ‘ছোলেহ্’ (সন্ধি) করিবে উহাদের সঙ্গে । ”

ছহিহ্, মোছলেম গ্রন্থে রওয়ায়েত আছে যে, একদা হুজরত রহুল করিম (ছালঃ), গৃহের বাহিরে ‘ছহনের’ (চাতানের) একাংশে উপবেশন করিয়া-ছিলেন ; এবং একখানি বুটাদার কন্ডল তাঁহার গায় ছিল । এই সময় হুজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) তথায় আগমন করিলেন ; তিনি তাঁহাকে ঐ কন্ডলের মধ্যে টানিয়া লইলেন ; অর্থাৎ তাঁহাকে কন্ডল দিয়া ঢাকিলেন ; ইহার পর হুজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আগমন করিলেন ; তাঁহাকে ও তিনি কন্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ; তৎপর হুজরত ফাতেমাঃ মোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আসিলেন ; তাঁহাকেও ঐরূপে কন্ডল দ্বারা ঢাকিয়া

লইলেন ; অবশেষ শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) আগমন করাতে, তাঁহাকেও কবলের মধ্যে ঢাকিয়া লইলেন এবং কোরআন পাকের নিম্ন-লিখিত পবিত্র আয়াত তৎহির পাঠ করিলেন :—

“ ইমামা ইউরিদোল্লাহো লেয়ুহেবা আনকুমোর রেজ্জাহা আহ্ লাল বায়্তে অইউ-তাহ্ হেরা কুম তাংহিরা । ”

এব্নে আবছল্লাহ্ হইতে রওয়ায়েত আছে, আর এই হাদীছ এমাম তেরমযি (রহঃ), হজরত হজ্জিকাঃ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত রছুল করিম (ছালঃ) করমাইয়াছেন, আমার নিকট ‘আছমান’ (আকাশ) হইতে এক ফেরেশ্তা আগমন করিয়াছে— যে ইতঃপূর্বে আর কখনও আমার নিকট আইসে নাই ; সে আসিয়া আমাকে ছালাম করিল, এবং আমাকে ‘খোশ-খবরী’ (সুসংবাদ) দিল যে, “ হাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) ‘বেহেশতের’ (মোছলেম-স্বর্গের) তরুণ যুবকদিগের ‘ছরদার’ (নেতা) ” ।

আহ্ মদ (রহঃ), তেরমযি (রহঃ), এব্নে মাজাঃ (রহঃ), এব্নে আবু দাউদ (রহঃ) এবং ফছালী (রহঃ)-এর সম্মিলিত ‘রওয়ায়েত’ (বর্ণনা) এই যে, একদা আঁ হজরত (ছালঃ) খোতবাঃ পড়িতে ছিলেন, ঐ সময় সন্মুখের দিক্ হইতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আগমন করিলেন । কিন্তু অতি অল্পবয়স্ক বলিয়া তাঁহাদের পদদ্বয় কম্পিত হইতে ছিল । হজুর (ছালঃ) তদর্শনে মনে করিলেন, বালক দ্বয় না পড়িয়া যায় ; এই আশঙ্কা করিয়া তিনি খোতবা পড়া ছাড়িয়া দিয়া উহাদের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং ‘কামাল মহব্বৎ’ ও ‘পেম্মার’-এর সঙ্গে (অতীব স্নেহ-প্রদর্শন পূর্বক) উভয় শাহ্-বাদাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ।

এইরূপে একদিন হজরত রছুলে করিম (ছালঃ) মছজেদ-নববীতে

নমায্ পড়াইতেছিলেন (নমাযে এমামতি করিতেছিলেন), এবং তিনি ছেজদার গিয়াছিলেন, এই সময় হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) দৌড়িয়া আসিলেন, এবং হজুর (ছালঃ)-এর পবিত্র পৃষ্ঠোপরি চড়িয়া বসিলেন, হজুর (ছালঃ) খেয়াল করিলেন যে, যদি আমি এ সময় ছেজদাঃ হইতে মস্তকোত্তোলন করি, তাহা হইলে হোছেন (রাজিঃ) পড়িয়া বাইবে, এবং তাহার শরীরে আঘাত লাগিবে । ইহা মনে করিয়া ছেজদাঃ উঠি রহিয়া গেলেন—যে পর্য্যন্ত হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) হজুর (ছালঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে অবতরণ না করিলেন ।

একদা হজরত রছুল আকরম (ছালঃ), অত্যন্ত স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ; বল ত তাই তোমার ‘মর্ত্বা’ (শ্রেষ্ঠত্ব) অধিক কি আমার ? সেই বালক এমাম ছাহেব (রাজিঃ) একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, নানাজান ! মর্ত্বা ত আমারই অধিক । হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, ইহার কি ‘ছবুত’ (প্রমাণ) আছে ? এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বলিলেন, নানাজান ! আপনি খেয়াল ফরমাইয়া দেখুন, আমার পিতা হজরত শেরে খোদা (কঃ—ওঃ), এরূপ পিতা আপনার কোথায় ছিলেন ? যেমন আমার মাতা হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ), এরূপ মাতা আপনার কোথায় ছিলেন ?—ঈহার সম্বন্ধে আপনি স্বয়ং “বোদোয়াতন মিন্নে ” ফরমাইয়াছেন । আর আমার নানা যেমন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম, এরূপ নানা আপনার কোথায় ছিলেন ? এই সকল কথার দ্বারা পরিষ্কার রূপে জানা যায় যে, আমার মর্ত্বাই বড় । দৌহিত্র-বত্বের ঈদুশ দলীল ও যুক্তির কথা শুনিয়া হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) ‘ঈযৎ হাস্তের’ (মুচ্কি হাসির) সহিত নীরবতা অবলম্বন করিলেন ।

হজরত এব্নোল্ খছাব (রাজিঃ), হজরত আবি আওয়ানাঃ (রাজিঃ) হইতে রওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইয়াছেন, হাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) বেহেশ্তের দুইটি ‘গোশ্-ওয়ারে’ (যেওর—অলঙ্কার) । যখন আল্লাহ্ জল্লশানহ্ বেহেশ্তবরি “ (জন্নতল ফরদ ওছ—মোছলেম-স্বর্গ) ‘পয়দা’ (সৃষ্টি) করিলেন ; তখন উহার প্রতি ফরমাইলেন, তোমাকে ফকীর ও মিছকিনের ‘মছকন’ (গৃহ) বানাইব । বেহেশ্ত্ আদবের সহিত বলিল, ‘এয়ারব !’ (হে আল্লাহ্ তা-লা !) “ লাম এজ্জেলনী মছকন লিল্ মাছাকিন ” (অর্থাৎ) ‘হে পরওয়ার দেগার ! আমাকে ‘মিছকিন’ (ফকীর—দরিদ্র) দিগের ঘর কেন বানাইতেছেন ? যখন আপনি আমার ‘রোত্বাঃ’ (সম্মান—পদ-মর্যাদা) এতদূর বাড়াইয়াছেন, আর আমাকে স্বীয় ‘রহমতে’ (দয়্যাত্ত্বে) ‘ফরদ ওছ’ বানাইয়াছেন ; এরূপ অবস্থায় আমাকে দীন-দরিদ্রের থাকিবার স্থান নির্দ্ধারিত করাতে আমার কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে ? ‘আওরায্’ (শব্দ) আসিল, আর বেহেশ্ত্ ! তুমি কি রাজী নওযে, আমি তোমার ‘আরকান’ (‘ছতুন’—থাম) হাছন (রাজিঃ) ও হোছেন (রাজিঃ) দ্বারা ‘আরাস্তাঃ’ (সুসজ্জিত) করি ? যখন বেহেশ্ত্ এই কথা শুনিল, তখন সে ‘ফথর’ (আত্ম-গৌরব প্রকাশ) করিতে লাগিল, এবং বলিয়া উঠিল “ রদিয়ত্’ (রজিয়ত)—রদিয়ত ” আমি রাজী হইলাম । এই দলিলানুসারে বেহেশ্তের ‘আরকান’ (ছতুন বা থাম) হজরত এমাম হাছন ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) । ইঁহারা যেমন বেহেশ্তের থাম, সেইরূপ ‘মোমেন’ (ধার্মিক) গণের ‘দেলের রিওশ্-নী’ (হৃদয়ের আলো বা জ্যোতিঃ) । ছোবহান আল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা-লা রছুল মকবুল (ছালঃ)-এর এই জগর গোশাকে কি মরতবাই না প্রদান করিয়াছেন :—

আরবী কবিতা।

বাহিতা রছুলোলাহে ছদবী মোনাওয়াফুন ;
 ওহোকো হুমা ফি খাব্বাতিল্ কালবে ইয়ায্-হেকুন ।
 আথুকা হে'র নূর দেল্ কে আরাম হোছেন (রাজিঃ)
 ফরদ ওছ বরি' কি নোব্-হাতে আম হোছেন (রাজিঃ) ।
 দোহু' হায় হাম্মাতে মেলতে মন্তফুয়ী ;
 হায় কহ্ হাছন (রাজিঃ) তো জানে এছলাম হোছেন (রাজিঃ) ।

খোন্সক্ হোছেনী

(সর্ব প্রকার সম্ভাবহার ও ক্ষমা গুণ ইত্যাদি) ।

একদা জনাব হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), আরবের বহুসংখ্যক
 সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে এক সভায় বসিয়া আহার করিতেছিলেন । তদীয়
 একজন ক্রীতদাস অতি গরম আশ্ অর্থাৎ গুরুত্ব পূর্ণ পেয়াদা লইয়া
 পরিবেশন জন্ত যাইতে যাইতে, সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের
 আতঙ্কে পদ-স্থলিত হইয়া সে ফর্শের উপর পড়িয়া যায় ; ঐ অবস্থায় সেই
 পেয়াদা জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর গায় পড়িয়া চূর্ণ-
 বিচূর্ণ হইয়া পড়ে । তিনি 'তাদিবের' (আদব শিক্ষার ইঙ্গিত পূর্ব)
 কটাক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করাতে, সেই 'খাদেম' (ক্রীত-
 দাস) ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; ঐ অবস্থায় কোরআন শরীফের

কয়েকটি শব্দ তাহার স্বরণ পথে পতিত হইল ; আর হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর দিকে ‘রহম তলব’ (দয়া-প্রার্থনার) নম্রো দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল “আল্কা যমিনল্ গারেষা”, তচ্ছবণে জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হে খাদেম ! আমি আমার ক্রোধ-সংবরণ করিলাম । ক্রীতদাস আবার বলিয়া উঠিল, “আল্ আফিনা আনিম্মাছ,” তখন হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আমি তোমার ‘কছুব’ (অপরাধ) ও মার্জনা করিলাম । ক্রীতদাস “ও আল্লাহ ইউহেব্বোল মোহছেনীন” বলিয়া পবিত্র আয়াতটি পরিসমাপ্ত করিল ; হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ), পবিত্র কোরআনের আয়েতের শেষাংশ শ্রবণে ফরমাইলেন, যাও, আমি তোমাকে দাসত্ব ইহাতে ‘আযাদ’ (স্বাধীন—মুক্ত) করিয়া দিলাম । আর চির জীবনের জন্য তোমার ‘কেফালত’ (সামানত—প্রতিভূত) আমি গ্রহণ করিলাম । আল্লাহ্ আকবর ! জনাব হজরত এমাম আলী মকাম (রাজিঃ)-এর ‘খলক্’ (‘নকুওত’—ক্ষমা গুণ—নম্রতা ও শিষ্টতা) এইরূপ ছিল । বর্তমান সময়ের বড় লোকেরা—প্রভুগণ, দাস বা পরিচারক বর্গের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাও একবার খেয়াল করুন । আজকাল কোনও আমীর-ওমরা বা বড় লোকের চাকর কিংবা পরিচারক এইরূপ গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিত, তাহাও খেয়াল এবং চিন্তা করিবার বিষয় ।

এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর যোহদ ও
তকওয়া (পরহেয্গারী এবং
পার্বিক সুখ-সম্পদে
বিভূষণ) ।

জনাব এমাম ছাহেবের উপাসনা আরাধনা ■ পার্বিক সুখ-সম্পদে বিভূষণ ভাব সর্বোচ্চ সীমায় উঠিয়া ছিল। তিনি শৈশব ■ বাল্য জীবনের মাত্র ৭টি বৎসর স্বীয় মহামানবীয় মাতামহ হজরত রহুল আকরম (ছালঃ)-এর নবুয়ত এবং আজমতের ছায়ায় জীবন যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আল্লাহ্ তা-লার ভেদ (গুটতক) লাভে তাঁহার অন্তঃকরণ ভরপুর হইয়াছিল। হজরত রহুল করিম (ছালঃ)-এর ওফাতের (পরলোক গমনের) পরে শরিয়ত, তরিকৎ, হকিকৎ ও মারফত সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার প্রকাশ ও গুপ্ত 'এলম' (বিদ্যা) তিনি স্বীয় 'ওয়ালেদ মোকররম' (সম্মানিত পিতা) হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অসংখ্য মহামান্য ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) দিগের নিকট ■ অনেক বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি দিবা রাত্রি খোদা ও রহুলের আদেশ পালনে অতিবাহিত করিতেন। এই জন্তই তাঁহার সমকালে এবাদৎ-বন্দেগীতে (উপাসনা-আরাধনার), খোদা তা-লার আদেশ-নিষেধ পালনে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না ; অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবীর ও ধর্মের জীবন্ত আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পদব্রজে ১৫ হজ্জ্ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি 'পেয়াদা-পাঃ' (পদব্রজে) ২৫ হজ্জ্ করিয়া

অতুলনীয় গৌরব লাভ করিয়াছিলেন । এবাদত-বন্দেগী ও উপাসনা-আরাধনার এই অবস্থা ছিল যে, তিনি দৈনিক ফরজ, ওয়াজেব ও “ছোমত মওয়াকাদাহ্” ব্যতীত ১০০০ রেকায়াত নফল নমাজ্ প্রত্যহ দিবারাত্রির মধ্যে আদায় করিতেন ।

বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক পাঞ্জে শোয়া (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যার সময় হইতে প্রভাত সময় পর্যন্ত রোদন করিতেন ; এবং ‘তওবাঃ আস্তাগ্ ফার’ পড়িতেন । এই স্থলে ‘গওর’ (অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা) করা উচিত যে, মহামান্য রছুল করিম (ছালঃ)-এর প্রিয়তম দোহিত্র যদি আল্লাহ্ জল্লশানহুর ভয়ে এরূপ ভীত ও আতঙ্কিত থাকিতেন, সেরূপ ক্ষেত্রে আমাদের ছায় ‘গোনাহ্ গার’ (পাপাচারী) লোকের কি উপায় হইবে,—যাহারা দিনরাত্রি নানাপ্রকার ‘ফেছক্’ ও ‘ফজুরে’ (অসার আমোদ-প্রমোদে) লিপ্ত থাকে, তাহাদের কখনও এমন ‘তওফিক’ হয় না যে, আল্লাহ্ তা-লার মহা দরবারে মস্তক অবনত করে, এবং পাপাচারের জন্ত ক্ষমা চায় । আমরা বড় বড় পাপ কার্য্য করিতেও ভয় করি না ; ‘হগীরা গোনাহ্’ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ কার্য্য সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই । স্থূল কথা, প্রকাশ্য এবাদৎ-বন্দেগী ব্যতীত, গুপ্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানেও খোদা প্রাপ্তির পথে তিনি শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন । আর হইবেন ইবা না কেন ? জগতের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী যাহার মাতামহ, তাপস কুলের অগ্রণী মারেফাত তত্ত্বের মহাতত্ত্বজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-পুরুষ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) যাহার মহা সম্মানিত পিতা, স্বর্গ-রাজ্যী হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যাহার জননী, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ছায় আদর্শ পুরুষ যাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে ? এস্থলে একটি উদ্দু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ।

“এব্‌নে আলী (রাজিঃ) ও ছেব্‌তে রুহুলে খোদা হোছেন ;

পেয়ারা থা ক্যায়ছা বেশতরে কিবরিয়া হোছেন ।

মাদর মিলী বতুলছি গোদী খেলানেকো ;

জিবরিল :আয়ে আর্শ্ছে বুলা বোলানেকো ।

‘শাদী’ (বিবাহ) ।

হজরত ওমর ফারুখ রাজি আল্লাহ্ আনুহর খেলাফৎ কালে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শুভ-বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় । এই বিবাহ সম্বন্ধে ইতিহাসে নিম্ন-লিখিত রূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । যখন পারস্ত-সাম্রাজ্য মোছলমানদিগের দ্বারা বিজিত হইল ; ঐ সময় ইবদ্‌জরদ (সম্রাট নওশেরওয়ানের বংশধর) পারস্তের শেষ সম্রাট ছিলেন । যুদ্ধে পারস্ত-সম্রাট পরাজিত ও দেশত্যাগী হন । ইতিপূর্বে বড় বড় যুদ্ধে পারস্তের খ্যাতনামা বীর সেনাপতিগণ, মোছলমানদিগের হস্তে পরাজিত, নিহত বা পলায়ন করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন । পারস্ত-সম্রাটের মূল্যবান সামগ্র্য-সম্ভার আরবদিগের হস্তগত হইয়াছিল । তন্মধ্যে “বছাতে কছরবী” নামক একখানি অতি মূল্যবান “ফর্শ্” (বিছানা বা গালিচাঃ) ছিল ; উহাতে ‘তক্‌ইয়া’ (গেরদা অর্থাৎ মোটা বালিশ) ঠেক লাগাইয়া সম্রাট বসিতেন, এবং বয়স্কগণের সঙ্গে মত্ত পান করিতেন ; ঐ অপূর্ব ও অতি মূল্যবান আসন মোছলমানদিগের হস্তগত হইয়া মদীনায়া আসিল । সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের কন্যারও বন্দিনী বেশে মদীনায়া আনীত হইলেন । হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওকাছ (রাজিঃ) এই বিজয়ী সেনাদলের সর্ব প্রধান সেনাপতি ছিলেন । তিনি বিজয়-লব্ধ-দ্রব্যের এক

পঞ্চমাংশ সহ ঐ বহুমূল্য আসন ■ সম্রাট-হুহিতাকে মহামান্য খলিফা সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই সময় এই নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধে যে সকল ‘মালে-গনিমৎ’ (যুদ্ধ জয়-লব্ধ -দ্রব্য-সামগ্রী) মোছলমানদিগের হস্তগত হইত, উহা ৫ অংশে বিভক্ত করিয়া ■ অংশ বিজয়ী সৈন্য-সেনা-পতিগণ পাইতেন ; আর এক পঞ্চমাংশ ‘রয়তুল-মালে’ জমা করিবার জন্য মহামান্য খলিফা সমীপে প্রেরিত হইত । যখন এই গৌরবান্বিত শেষ বিজয় লাভের পর যুদ্ধে জয়-লব্ধ বহু মূল্যবান সামগ্রী-সস্তারের পঞ্চমাংশ ও পূর্বোক্ত অতি মূল্যবান আসন এবং সম্রাট-নন্দিনী বন্দিনী বেশে মদীনায় আনীত হইলেন, ঐ সময় মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) সমুদয় ‘আরকান-দওলত’ (সভাসদ-পারিষদ) এবং মহামানীয় ছাহাবায় কারাম (রাজিঃ) দিগকে সমবেত করিয়া, মহজেদে-নববীতে এই গৌরবান্বিত বিজয়-সংবাদ ঘোষণা করিলেন ; এবং যুদ্ধে জয়-লব্ধ সামগ্রী-সস্তার প্রদর্শন ও ভাগ-বন্টন করিবার নিম্নরে আরোহণ পূর্বক, মোছলমানদিগের প্রত্যেকের কর্তব্য কার্য সম্বন্ধে একটি হৃদয়াকর্ষণী জলন্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন । ঐ সময় জগদ্বিখ্যাত সুবিচারক সম্রাট নওশেরওয়ানের পোত্ৰী বা প্রপোত্ৰী অবনত মস্তকে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন । আর অহঙ্কার ও গর্বোন্মত্ত কেছরার দরবার হইতে, ফকীরী ও বিনয়-নম্রতার ‘শানদার’ (গৌরবপূর্ণ) সভায় নিশ্চিন্ত ভাবে নীরবে অবস্থান করিতেছিলেন । যুদ্ধ জয়-লব্ধ বিপুল সামগ্রী-সস্তার একদিকে স্তুপীকৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল ; মহামান্য খলিফা ঐ সকল জিনিষ-পত্র মহা মাননীয় ছাহাবাঃ (রাজিঃ) দিগের মধ্য যথাযোগ্য রূপে ভাগ-বন্টন করিয়া দিলেন ; অবশেষে পূর্বোক্ত বহুমূল্য আসন থানিও টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ভাগ করিলেন ; উহার এক অংশ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) পাইয়াছিলেন ।

সর্বোৎকৃষ্ট অংশ না হইলেও ঐ অংশ টুকু ৩০ লক্ষ মুদ্রায় বিক্রয় হইয়া ছিল । এই ভাগ-বন্টনে মহামান্ত খলিফা স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাহ (রাজিঃ) কে কম অংশ ও হজরত এমাম ভ্রাতৃ-যুগলকে অধিক অংশ অর্থাৎ হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) দিগের, অংশের অর্ধেক মাত্র দেওয়াতে, হজরত আবদুল্লাহ (রাজিঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না যে, আমাকে হুছনায়েন (এমাম ভ্রাতৃদ্বয়) হইতে কেন কম অংশ দেওয়া যাইতেছে ; অথচ আমার পিতা স্বয়ং খলিফা । তচ্ছ বণে মহামান্ত খলিফা হজরত ওমর (রাজিঃ) ফরমাইলেন, হে আবদুল্লাহ ! আজ যদি যুদ্ধ বিজয়-লব্ধ সামগ্রী-সম্ভার আমার ব্যক্তিগত মতামুসারে বন্টন করা হইত ; তবে তোমাকে এক কপর্দকও দেওয়া হইত না । ইহার কারণ এই যে, ইহাদের নানা (মাতামহ) রছুল, পিতা ওলি আল্লাহ (সাধক শ্রেষ্ঠ) এবং মাতা হজরত রছুল (ছালঃ)-এর মেহমরী কণ্ঠা । তোমার পিতা কেবলমাত্র খেলাফৎ লাভ করিয়াছে ; আর ইহাও হুছনায়েনের মহামান্ত নানার তাবেদারীর ফল ।

যখন যুদ্ধ জয়-লব্ধ সমুদয় জিনিষ-পত্র ভাগ-বন্টন হইয়া গেল ; কেছরার সেই বহুমূল্য আসন খণ্ড খণ্ড করিয়া বথাযোগ্য পাত্রে বিতরিত হইল ; তখন কেবলমাত্র পারশ্ব-সম্রাটের কণ্ঠাটি অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) মহামান্ত খলিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বালিকাটি কাহাকে দেওয়া যাইবে ? তখন আমিরুল মুমেনিন খলিফাতুন মুছলেমিন হজরত ফারুকে আজম (রাজিঃ) ঐ বালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তিনি দেখিতে পাইলেন, সম্রাট্-নন্দিনী হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন ; তৎক্ষণাৎ মহামান্ত খলিফা আদেশ করিলেন যে, এই সম্রাট্-নন্দিনী এমাম হোছেনের প্রাপ্য ।

তদনুসারে জগদ্বিখ্যাত সম্রাট্ নওশেরওয়ার প্রপৌত্রী, হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর দৌহিত্র-রত্নের সঙ্গে পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন । এছলামী নিয়মানুসারে বালিকাকে বন্দিনী অবস্থা হইতে আবাদ (স্বাধীন—মুক্ত) করিয়া দেওয়া হইল । তখন এই সম্রাট্-বন্দিণীর নাম রাখা হইল “ শহরবানু ” । এই অগ্নি-পূজক সম্রাটের কন্যা যেমন অনিন্দ্য সুন্দরী, সেইরূপ ধার্মিক, সচ্চরিত্রা, দয়াবতী, গুণবতী ও একান্ত স্বামী-পরায়ণা ছিলেন । ইনি হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীর পরম ভক্ত, তাঁহার একান্ত গুণ-গ্রাহিণী এবং তাঁহার ঐকান্তিক প্রেমানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন । কারবালার মহাবুদ্ধে ইনি উপস্থিত থাকিয়া পরম ভক্তি ভাজন স্বামীর প্রতি অসাধারণ প্রেমানুরাগ প্রদর্শন পূর্বক জগতে চির স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন । হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) ইঁহারই গর্ভজাত পুত্র-রত্ন ; তাঁহার বংশ-তরুই অত্যাধি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছৈয়দ নামে বিদ্যমান আছেন ।

এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই পত্নী ব্যতীত আরও চারিটি পত্নী ছিলেন ; একজনের মৃত্যুর পর আর একজনকে তিনি পত্নীতে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন । আলী আকবর (রাজিঃ)-প্রমুখ পুত্রগণ সেই সকল পত্নীর গর্ভ-জাত । কিন্তু তাঁহারা সকলেই কারবালার হৃদয়-বিদারক অত্যাচারে যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন । উপরোক্ত মহা মাননীয়া বিবিগণের নাম এই :—(১) লয়লী-বিন্তে আবি মরত বিন্-য়োরওয়াঃ-বিন্ মহুউদ ছকফি ; (২) ওয়ে এছহাক বিন্তে তালহা-বিন্-আবছল্লাহ্ (৩) আবকাব-বিন্তে আমরাল কুয়েছ-বিন্-আদায়ী ; (৪) ইঁহার নাম অপরিজাত ।

আশ্-বাঠের শাহাদৎ

(শহীদ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী) ।

জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর শাহাদত এর কারণানু-
সন্ধানে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ;
এক দলের মতে এই ব্যাপার একটা ঘটনা স্রোতের মুখে সজ্জাটিত হইয়াছে,
আবার তাঁহাদের অগ্রবর্তী একদলের মত এই যে, ইহা একটা অন্তর্বিপ্লব
বা থান্দানী বিদ্রোহের পরিণাম । কিন্তু আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা
পাইব যে, জনাব হজরত এমাম আলী মকামের শাহাদৎ খোদা তা-বার
অভিলষিত একটি বিশেষ ঘটনা ছিল ; বাহা রোয্ আজলে (সৃষ্টির
প্রারম্ভে—সৃষ্টিকালে) তাঁহার জন্ত নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল । মামুলী
যুদ্ধে, মামুলী অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যুদ্ধে নিহত হওয়া তাঁহার পক্ষে একটা
গৌরবের বিষয় নহে । সেরূপ হইলে এই শোকাবহ ঘটনা বিগত ত্রয়োদশ
শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত মোছলমান জগতে এরূপ স্মরণীয় হইয়া থাকিত না ।

যদি মহামান্ন চৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-
এর শাহাদত কোনও ঘটনার ‘যের আছর’ (অন্তর্বর্তী) হইত,
তবে উহার সংবাদ ও ‘আশ্-হাদ’ (সাক্ষ্য) পূর্ব হইতে ‘নমুদার’
(‘যাহের’—প্রকাশ) হওয়া অসম্ভব ছিল ; কিন্তু প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ
দেখিতে পাইবেন যে, হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ‘ছগর ছিনি’
(শৈশব) অবস্থায়ই আ হজরত (ছালঃ), এই শাহাদতের ভবিষ্যদ্বাণী
করিয়াছিলেন ।

শওয়াহদ নবুওতে ওম্ম-হারেছ হইতে, আর মেশকাত শরীফে জনাব
ওম্ম ফজল-বিন্তে হারেছ (রাঃ—আঃ) হইতে রওয়ায়েত আছে যে,

একদিন আমি জনাব হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলাম, এয়া রছুলোলাহ্ (ছালঃ), আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আপনার পবিত্র 'জেছম' (দেহ) মবারকের এক টুকরা কণ্ঠিত হইয়া আমার ক্রোড়ে পতিত হইয়াছে ; আমি এই স্বপ্ন দেখিয়া নিতান্ত 'হয়রান' (চিন্তাবুদ্ধি) হইয়াছি । এই স্বপ্নের 'তাব্বির' (অর্থ) কি ? হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, আপনি খুব ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছেন । ফাতেমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে খোদা তা-লা 'বেটা' (পুত্র-সন্তান) দিবেন ; আর আপনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিবেন । ওম্ম ফজল (রাঃ—আঃ) ফরমাইয়াছেন, কিয়দিন পরে হজরত ফাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কে খোদা তা-লা এমাম হোছেন (রাজিঃ) রূপ ভনয় রত্ন দান : করিলেন আমি তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলাম । একদিন আমি জনাব এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে ক্রোড়ে লইয়া হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম ; এবং তাঁহাকে আ হজরত (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে প্রদান করিলাম । তিনি জনাব এমাম ছাহেব (রাঃ—আঃ) কে 'পেয়ার' (স্নেহ-প্রদর্শন) করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্র নেত্রযুগল তহিতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল । তদর্শনে আমি বলিলাম, এয়া রছুলোলাহ্ ! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি এ সময় কেন 'মলুল' (শোকাবুগিত) হইলেন ? হজুর (ছালঃ) ফরমাইলেন, অরি ওম্মে ফজল ! আমাকে জিবরিল (আলাঃ) আসিয়া সংবাদ দিলেন, আমার পুত্র (দৌহিত্র) হোছেন (রাজিঃ) আপনার ওম্মতের হস্তে 'আনকরিব' (অনতিবিলম্বে) কতল হইবেন । আমি বিশ্বয়াবিষ্ট ভাবে আরজ করিলাম, এয়া রছুলোলাহ্ ! কি, এমন ব্যাপারই ঘটবে ? তিনি ফরমাইলেন হাঁ, জিবরিল ঐ স্থানের (যে স্থানে সে শহীদ হইবে) রক্তবর্ণ মৃত্তিকা আমাকে আনিয়া দিয়াছেন ।

এই রওয়াকেত দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব হজরত রহুল করিম (ছালঃ), জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ প্রথম হইতেই অবগত ছিলেন। “ শওয়াহেদমবুয়ত ” গ্রন্থে মাওলানা হাজী রহমতোল্লাহ্ আলায়হে করমাইয়াছেন যে, জনাব হজরত রহুল খোদা (ছালঃ-আম), মোছলেম-মাতা হজরত ছালমাঃ (রাঃ—আঃ)-কে একমুষ্টি ‘খাক’ (মৃত্তিকা) দিয়া ফরমাইয়া ছিলেন, অগ্নি ওশ্মে-ছালমাঃ ! যখন এই মৃত্তিকা লালবর্ণ ধারণ করিবে, তখন বুঝিবে যে, আমার মেহাম্পদ বেটা (দোহিত্র—নাতি) হোছেন (রাজিঃ) কতল (নিহত—শহীদ) হইয়া গিয়াছে।

“ কন্যল্ গরান্নেব ” গ্রন্থে সুদৃঢ় প্রমাণের সহিত লিখিয়াছেন যে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শাহাদৎ-সংবাদ (শহীদ হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী), হজরত জিবরিল আলায়হেছ্ ছালান, জনাব ছরওয়ারে কান্নোত (ছালঃ)-কে ক্রমান্বয় পাঁচ বার দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার ‘পরদারেশের’ (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) দিন ; ২য় বার, এমাম ছাহেব (রাজিঃ) যখন ৮ মাস বয়স্ক ছিলেন ; ৩য় বার, যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩ বৎসর হইয়াছিল ; ৪র্থ বার, যখন তিনি ৪ বৎসর বয়স্ক ছিলেন ; ৫ম বার, যখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর হইয়াছিল।

জনাব হজরত রহুলে করিম (ছালঃ), এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ জনাব হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-কেও বলিয়া ছিলেন।

যখন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) কারবালায় পহুঁছিয়াছিলেন, ঐ সময় তিনি স্বীয় কনিষ্ঠা সহোদরা হজরত ওশ্মে-কুলছুম (রাঃ—আঃ)-কে ফরমাইয়াছিলেন, অগ্নি ভগিনি ! একদা আমি পরম ভক্তি-ভাজন ওয়ালেদ মাজেদ আমিরুল মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে ‘ছকরে’

(প্রবাসে) ছিলাম ; যখন তিনি ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে এই ‘যমিনে’ (ভূ-খণ্ড) পঁহুছিলেন, এবং বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন ; এবং পরক্ষণেই শুইয়া গেলেন ; ঐ সময় তাঁহার পবিত্র মস্তক আমার জোষ্ঠ সহোদর হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জাহুর উপর ন্যস্ত ছিল ; আর আমি তাঁহার ‘ছরহানে’ (মস্তকের দিকে) ছিলাম । অল্প কাল মধ্যে জনাব ওয়ালেদ মাজেদ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; ‘একাএক’ (অকস্মাৎ) তিনি নেত্র উন্মীলন করিলেন, এবং রোদন করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন । ভাই ছাহেব তাঁহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ফরমাইলেন, আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, এই ভূখণ্ড রক্তের ‘দরিয়ার’ (সমুদ্রের) আকার ধারণ করিয়াছে ; এবং আমার ‘ফরযন্দ’ (পুত্র)—তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোছেন (রাজিঃ) সেই রক্ত-সমুদ্রে হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছে ; আর ‘করিয়াদ’ (সাহায্য-প্রার্থনা) করিতেছে ; কিন্তু তাহার সাহায্য প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করিতেছে না । সে ‘পানাহ্’ চাহিতেছে, কেহ উহাকে ‘পানাহ্’ (আশ্রয়) দিতেছে না । অতঃপর আমার দিকে ‘মোখাতেব’ হইয়া (লক্ষ্য করিয়া—যাহার সঙ্গে কথা হয়, তাহার দিকে নির্দেশ করা) বলিলেন, যে দিন এই ঘটনা ঘটবে, তুমি তখন কি করিবে ? আমি মস্তক অবনত করিয়া নিতান্ত আদবের সহিত বলিলাম, আয় ‘পেদর বোযর্গ ওয়্যার’ (সম্মানিত পিতঃ) আমি আল্লাহ তাঁলার পরীক্ষার উপর ‘ছবর’ (ধৈর্য্য-ধারণ) করিব ; এন্শাল্লাহ্ ঐ রক্তের সমুদ্রে আমি সঁতার দিব ; আমার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে ।

এই বর্ণনা দ্বারা একথা প্রতিপন্ন হয় যে, জনাব এমাম আলী মকাম (রাজিঃ)-কে ও এই শাহাদৎ-ঘটনার পূর্বে, এ বিষয় জ্ঞাপন করান হইয়াছিল । প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, হজরত জিবরিল আলায়-

হেচ্ছালাম, হজরত আদম (আলাঃ)-কেও এই শাহাদতের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন । আর হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সেই সময়কার (শাহাদৎ হওয়া কালের) :পিপাসার্ত্ত হওয়ার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, তাঁহার এরূপ পিপাসা হইবে যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঘনীভূত ধূম উখিত হইয়া, তাঁহার ও আকাশের মধ্যে ‘হায়েল’ । প্রতি-বন্ধক—দৃষ্টি-রোধক) হইয়া যাইবে ।

জনাব হৈয়দ হোছেন কাছকি (রহঃ) স্বীয় “ রওজাতোশ-শোহাদাঃ ” নামক গ্রন্থে এই ঘটনা সম্বন্ধে আর একটি রওয়ায়েত ফারছীতে লিখিয়াছেন, যাহার মূল মর্ম্ম এই যে, জনাব হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লা জিবরিল (আলাঃ)-কে, জনাব আঁ হজরত (ছালঃ)-এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, যাও, আমার হাবিবকে—এমাম হোছেনের জন্ম-গ্রহণের স্মৃতিসংবাদ জ্ঞাপন কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শাহাদতের সংবাদও দাও ; এবং ‘তায়যিয়ত’ (শোক-প্রকাশার্থুষ্ঠান) ও আদায় কর । এমাম ছাহেব (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর ক্রোড়ে ছিলেন ; এবং তিনি ঐ সময় তাঁহার ‘হলকে’ (গলদেশে) চুষন করিতে ছিলেন ; ঐ সময় জিবরিল আলায়হেচ্ছালাম আসিয়া ‘মবারকবাদ’ দিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন আঁ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, মবারক বাদ প্রদানের কারণ ত অবগত আছি, কিন্তু এই শোক প্রকাশের কারণ কি ? জিবরিল আমীন বলিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ্ ! এই যে আপনার প্রিয় নাতির গলদেশ আপনার চুষনের স্থান ; মায়ের পরলোক প্রাপ্তি এবং পিতা ও ভ্রাতার শাহাদতের পর উহাতে ‘খজর জফা’ (তরবারি বা ছুরী) চালান হইবে । তৎপর হজরত জিবরিল আলায়হেচ্ছালাম কারবালার ভবিষ্যৎ

ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিলেন । জনাব হজরত রছুলে খোদা (ছালঃ) এই ভাবী শোকাবহ ঘটনার সংবাদ শুনিয়া খুব ক্রন্দন করিলেন । হজরত আলী মরতুজা (রাঃ—আঃ) ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি ঐ হজরত (ছালঃ) ও হজরত জিবরিল আমীনের কথোপকথন কিছুমাত্র শুনিতে পাইয়াছিলেন না ; তিনি ঐ হজরত (ছালঃ)-কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—অত্যন্ত ঘাবড়াইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আর হৈয়দল মোর-ছালিন (ছালঃ) ! আপনার এক্রপ ক্রন্দনের কারণ কি ? তখন ঐ হজরত (ছালঃ), জিবরিল আমীন যে সংবাদ দিয়া গেলেন, সেই কথা আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন । জনাব হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এই অশুভ-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ‘পেরেশান’ হইলেন ; এবং তাঁহারও চক্ষুধর হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল । তিনি এই রোক্তমান অবস্থায় হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর হজ্রায় গমন করিলেন ; জনাব হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) যখন হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-কে রোদন করিতে দেখিলেন, তখন বলিয়া উঠিলেন ; হে পুত্রের পিতা, হে ‘ছরুওরে দেল’ (প্রাণের ছরদার) ! আজ আনন্দ প্রকাশ করিবার দিন, না কি শোক প্রকাশ করিবার দিন ? আপনার এই রোদন যদি আনন্দ জনিত হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন, নচেৎ আপনার এই পেরেশানীর কারণ প্রকাশ করুন । হজরত খাতুনে জন্নত (রাঃ—আঃ)-এর বাক্য শ্রবণে হজরত আলী মরতুজা (কঃ—ওঃ) ফরমাইলেন, অয়ি ফাতেমাঃ ! আমি হোছেনের শোকে এক্রপ অভিভূত হইয়াছি । আজ তোমার ওয়ালেদ মাজেদ হজরত রছুল আকরম (ছালঃ)-কে জিব্রিল আমীন হোছেনের শাহাদতের সংবাদ দিয়াছেন । এই সংবাদ শুনিবামাত্র জনাব হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ)

শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন; তৎক্ষণাৎ চাদরে দেহ আবৃত করিয়া হজরত রছুল করিম (ছালঃ)-এর হজরায় গমন করিলেন, এবং স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদের খেদমতে আরজ করিলেন যে, ‘আয় পের বোয়রগোয়াব’ (হে মহামান্ন পিতা !) আপনি হজরত আলী (রাজিঃ)-কে কি এই সংবাদ দিয়াছেন যে, আমার হোছেনের ঐ পবিত্র গলদেশ—যাহাতে আপনি সর্বদা চুম্বন দিয়া থাকেন, আপনারই ওস্ততের ‘জালেম’ (অত্যাচারী) লোকেরা তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহা ছেদন করিবে ? আ হজরত (ছালঃ) ফরমাইলেন, হাঁ, আমাকে জিব্রিল এইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হজরত কাতেমাঃ বোহরাঃ (রাঃ—আঃ) ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজান ! আমার হোছেন এমন কি ‘গোনাহ্’ (পাপ কার্য) করিয়াছে যে, শৈশব অবস্থায় তাহার উপর এইরূপ অত্যাচার করা যাইবে ? হজরত খাজারে আলম (ছালঃ) ফরমাইলেন, এই ঘটনা উহার শৈশবকালে কিংবা যৌবন কালে সম্ভটিত হইবে না ; বরং এমন সময় ঘটিবে, যখন না তুমি থাকিবে, না আমি থাকিব, না আলী (রাজিঃ) থাকিবে, না উহার ভ্রাতা হাছন (রাজিঃ) জীবিত থাকিবে। তখন জনাব হজরত কাতেমাঃ (রাঃ—আঃ) এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ‘বেকারার’ (অধৈর্য্য) হইয়া ফরমাইলেন, অয়ি-উৎপীড়িত হোছেন-জননি ! অয়ি শহীদ হোছেনের জননি ! অয়ি ‘বেকছ’ (নিরুপায়)—হোছেনের জননি ! যখন হোছেনের নানা, জনক-জননী, ভ্রাতা—ইহাদের কেহই ছুনিয়ায় থাকিবে না যে, তোমার সেই ভীষণ বিপদ কালে সাহায্যকারী হন, এবং তোমার জন্ত শোক প্রকাশ করেন ; এরূপ অবস্থায় তোমার কি উপায় হইবে ? যদি আমি ঐ সময় জীবিত থাকিতাম, তোমার জন্ত শোক প্রকাশ করিতাম। ঐ সময় গায়েব হইতে এই ‘আওয়ায’ আসিল (শব্দ হইল), অয়ি ফাতেনাঃ ! তুমি ‘গম’ (‘রগ’—

দুঃখ প্রকাশ) : করিও না ; তোমার উৎপীড়িত পুত্রের ■■■ কেষামত পর্য্যন্ত লোকেরা শোক প্রকাশ করিবে । আর তোমার পিতার ওষ্মতগণ এনাম আলায়হেচ্ছালামের এই শোচনীয় অবস্থার ■■■ কেষামত পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিবে ।

পবিত্র কোরআন শরীফেও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শাহাদতের ইঙ্গিত আছে ; এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই সকল বহু বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনা করা হইল না । উর্দু ভাষায় এমাম ছাহেবের বহু সঠিক বিস্তৃত জীবনী আছে ; তাহাতে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ।

এমাম ছাহেব শৈশবে মাতামহ হারা হইয়াছিলেন । তাহার ছয় মাস পরেই মাতৃ-হারা হন । ইহার পর যে ভাবে ইনি মহামান্য পিতা ■■■ পরম শ্রেয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ-শীতলচ্ছায়ায় জীবনাতিক্রম করিয়া ছিলেন, তাহা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জীবনীতে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তাঁহার বাল্য জীবন ও যৌবন কালের অধিকাংশ সময় পরম ভক্তি-ভাজন পিতার স্নেহ এবং ভালবাসা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল । পিতা তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে কতই না স্নেহ করিতেন ।

এস্থলে আরও একটি কথার আলোচনা করা কর্তব্য । সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ জল্লশানহ্, মহাপ্রাণ পয়গম্বর হজরত এব্রাহিম খলিলোল্লাহ্ (আলাঃ)-এর প্রতি তাঁহার প্রিয় পুত্র হজরত এছমাইল (আলাঃ)-কে কোরবানী দিতে আদেশ করিয়াছিলেন ; তদনুসারে সেই খোদাগত প্রাণ মহীয়ান্ পয়গম্বর বিনাপত্তিতে পুত্র-রত্নকে কোরবানী দেওয়ার জন্য ছুরী ■■■ দড়ী সহ কোরবানীর স্থানে (বধ্য-ভূমিতে) গমন করেন ; এবং পরম স্নেহাস্পদ পুত্র-রত্নকে কোরবানী করিতে উত্তত হন । আল্লাহ্ তা-লা তাঁহার ঈমানের এবং খোদা-ভক্তির অলস্তু প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রের পরিবর্তে দোষার কোরবানী গ্রহণ করেন ; এই ঘটনা চাক্র

বৎসরের শেষ মাস ১০ই বেগহজ্জ তারিখে ঘটিয়াছিল । আবার হজরত এব্রাহিম (আলাঃ)-এর অধঃস্তন ৭২ তম পুরুষে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) । চান্দ বৎসরের ১ম মাসের ১০ই (মোহাররম) তারিখে কোরবানায় শহীদ হন, সুতরাং সাধারণতঃ মনে এই ধারণা উপস্থিত হয় যে, হজরত এব্রাহিম (আলাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত কোরবাণী জনাব হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) দ্বারাই পূর্ণ হইয়াছিল । এই কোরবাণীর শাহাদতের অন্তরালে কোন্ গুঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহা সেই সর্ব-রহস্যময় আল্লাহ্ তা-লাই জানেন । মানুষের চিন্তাধারা ইহার কোনও কুল-কেনারা করিতে পারে না । কোরআন-হাদীসেও ইহার কোন প্রমাণ নাই ; ঐতিহাসিক গবেষণাও এস্থলে কার্যকরী হয় না । তবে একথা সহজেই বুঝা যায় যে, এই আদর্শ শাহাদৎ—সর্বোন্নত শাহাদৎ দ্বারা মোছলমানগণ পরকালে অনেকটা লাভবান হইবেন । জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই শোচনীয় শাহাদতের ফল কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না । আল্লাহ্ জল্লশানহ্, নাতির আত্মত্যাগের—আত্ম-বিসর্জনের ফল নানার ওস্নত মণ্ডলীকে কিছু না কিছু প্রদান করিবেন ।

৪৯ কিংবা ৫০ হিজরীর ২৯শে ছফর তারিখে হজরত এমাম ছাহন (রাজিঃ) বিষ-প্রয়োগে প্রাণত্যাগ করেন ; বড় এমাম ছাহেব (রাজিঃ) খেলাফৎ পরিত্যাগ করিবার পরে মদীনা তৈয়বায়ই অবস্থান করিতে ছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ এমাম সাহেবও মদীনাবাসী হইয়াছিলেন ; দুই ভ্রাতা পরমানন্দে—নিশ্চিন্ত মনে মদীনায় থাকিয়া পরম শ্রদ্ধেয় নানাজান এবং পরম শ্রদ্ধেয়া ওয়ালেদা মাজেদার রওজা মবারক জেয়ারত করিতেন ; মদীনার ছাহাবাঃ কারাম ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণের সহিত এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করিতেন, প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতেন

আর রাত্রিকালে একান্ত মনে তাহাজ্জদ ও অক্লান্ত নফল নগায়্ যথানিয়মে আদায় করিতেন । রাজনীতির সংশ্বে আদৌ যাইতেন না । খলিফা হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) যথানিয়মে, যথা সময়ে তাঁহাদের বৃত্তির টাকা ও ছুবে আহ্ ওয়াজের খাজানার টাকা পাঠাইতেন ; তদ্বারা খুব সচ্ছলভাবে তাঁহাদের দিন কাটিয়া বাইত । তাহারা দীন-দরিদ্র ও মহতাজদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতেন, নিরপেক্ষ অন্ন ও বস্ত্র হীনকে বস্ত্র প্রদান করিতেন ; আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাহারা অভাবগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও যথোচিত ভাবে সাহায্য করিতেন । হজ্জ্ করিতে মক্কা শরীফে গমন পূর্বক বহু উষ্ট্র ও দোষা কোরবানী দিতেন ; ফকীর মিছকিনকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন । তাহাদের “ দস্তুরখান ” ও অত্যন্ত ‘কোশাদাঃ’ (প্রশস্ত) ছিল ; দুই-বেলা বহু মেহমান-মোছাফের, আগন্তুক অভাগত এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন ।

৪৮ হিজরীতে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ), কুস্তন্তুনিঞা (কনষ্টান্টিনোপল—ইস্তানবুল)স্থ গ্রীক সম্রাটের শক্তি পরীক্ষার পর তাঁহার রাজধানী আক্রমণের ইহা উপযুক্ত সুযোগ মনে করিলেন । নৌ-সামরিক বলে কয়ছরকে পর্য্যদন্ত করিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল । যখন তিনি কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা ঠিক করিলেন, তখন পবিত্র নগরী মক্কা-মোয়াজ্জমা ও মদীনা তৈয়বায় ও এতৎ সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করাইলেন । মহামান্ন ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) গণ, কুস্তন্তুনিয়া'র আক্রমণ সম্বন্ধীয় আ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত পবিত্র হাদীছ অবগত ছিলেন ; ঐ হাদীছের মর্ম্ম এইরূপ :—“ আমার ওয়স্বতের ১ম সেনাদল যাহারা কয়ছরের শহর (রাজধানী), আক্রমণে যোগদান করিবে, তাহারা ‘মর্গ্ ফেরাত’ (মুক্তি) পাইবে । ”

উপরোক্ত ঘোষণামুযায়ী মুক্তি-কামনার হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত আবু-আইউব আনছারী (রাজিঃ)-প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ (রাজিঃ) এই পবিত্র অভিযানে যোগদান করিলেন। এক বিরাট সেনাদল গঠিত হইল; আমীর হজরত মোবিন্না (রাজিঃ) ছুফিহান-বিন্-য়য়োফ্কে এই বিরাট বাহিনীর সর্ব-প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিয়া কনষ্টান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। হজরত আমীর মোবিন্না (রাজিঃ)-এর পুত্র এযিদ, “ছালফাঃ” নামধেয় সৈন্য দলের সেনাপতি ছিল। তাহাকেও একদল সৈন্যসহ প্রধান সেনাপতির অধীনতায় প্রেরণ করা হইল; এই বিরাট সেনাদল জাহাজারোহণে সমুদ্র-পথে কনষ্টান্টিনোপল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবার একদল স্থলসৈন্যও কায়ছরের রাজধানী অভিমুখে প্রেরিত হইল। মোছলমান বীরগণ সমুদ্রপথে ও স্থলপথে গিয়া কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করিলেন। কিন্তু নগরের প্রাচীর অতি দৃঢ় উচ্চ ও দুর্ভেদ্য ছিল, তদ্ব্যতীত এই জগদ্বিখ্যাত রোমক রাজধানী প্রাকৃতিক নিয়মেও অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকাতে, মোছলমান-দিগের ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কনষ্টান্টিনোপল অধিকারের সৌভাগ্য আর একজন বীর পুরুষের ভাগ্যে নির্দ্ধারিত ছিল, এজন্য এই প্রাথমিক আক্রমণ সাফল্য মণ্ডিত হইল না। মোছলমান-দিগের কতিপয় বিখ্যাত বীরপুরুষ এই যুদ্ধে শহীদ হইলেন। প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ হজরত আবু আইউব আনছারী (রাজিঃ)ও এই অবরোধ কালে এন্তেকাল ফরমাইলেন। নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে তাঁহাকে ‘দফন’ (কবরস্থ) করা হইল। অধুনা তাঁহার পবিত্র মজার শরীফ কুন্তস্থানির সর্ব প্রধান ‘ষেয়ারত গাহ্’। জামেয় আবু আইউব

আনছারী নামধেয় বিখ্যাত সুবৃহৎ জামের মসজিদ কনষ্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের একটি প্রধান উপাসনালয় ও প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান । প্রচণ্ড শীত, রসদাদির অভাব ও অন্যান্য নৈসর্গিক বাধা-প্রতিবন্ধকতার এই বিরাট অভিযান ব্যর্থ হইল । যদিও এই অভিযান সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছিল ; কিন্তু এই আক্রমণের ফল বড়ই সঞ্চোধ জনক রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল । মোছলমানদিগের এই আক্রমণে কারছার, তাঁহার সেনাপতিগণ এবং সেনাদলের মনে একরূপ ভ্রাস ও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মোছলমানদিগের অধিকৃত কোনও জনপদ আক্রমণ করিতে আর সাহসী হন নাই । আর যে সকল এলাকা সম্বন্ধে রোমক সম্রাট্ ও মোছলমানগণ পরস্পর দাবী করিতেন, সেই সকল এলাকা মোছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইল । এই অভিযান দ্বারা আরও একটি বিষয় জানিতে পারা যায় যে, মহামান্য এমাম ছাহেব (রাজিঃ) বীরত্ব প্রকাশ এবং যেহাদ করিবার জন্য সুদূর ইউরোপে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ; আর তাঁহার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রচণ্ড শত্রু এবং তাঁহার শাহাদতের প্রধান নায়ক এষিও এই অভিযানে তাঁহার সহযোগী এবং সহকর্মী ছিল । পূর্বে ৩য় খোল্ফায়ে রাশেদীন হজরত ওছমান জিন্নুরায়েন (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালে তিনি যেহাদ উপলক্ষে উত্তর আফ্রিকার টুনিস পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন । একবার যেহাদোপলক্ষে পারস্ত দেশেও গিয়াছিলেন । সুতরাং তাঁহার অবস্থান কেবলমাত্র আরব দেশ, শাম ও এরাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; আর বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ লাভ করিতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা পাইতেন ।

এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশেই তিনি যেহাদে গমন করিয়াছিলেন ।

এযিদের অলি আহাদী বা সুবরাজ্জ

৫০ হিজরীতে :কুফার শাসনকর্তা মগিরাঃ-বিন্-শায়বাঃ, কুফা হইতে দেমেশ্কে গমন করিলেন । তিনি হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমি হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ)-এর শহীদ হওয়ার ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; পরবর্তী আর সমস্ত ঘটনা আমার চক্ষুর সম্মুখে এখনও ঘূর্ণায়মান হইতেছে । খেলাফৎ সম্বন্ধে মোছলমানদিগের মধ্যে কিরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শোণিতপাত হইয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই । এক্ষণ আমার মতে আপনার পক্ষে স্বীয় পুত্র এযিদকে আপনার পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করা উচিত । ইহা মোছলমানদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল জনক ও ফলপ্রসূ হইবে । হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) এষাবৎ কাল এরূপ খেয়াল বা কল্পনা কখনও করিয়াছিলেন না যে, স্বীয় পুত্র এযিদকে খলিফা নির্বাচন করিবেন । মগিরাঃ-বিন্-শায়বার উক্তি শ্রবণে সর্ব প্রথমে এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় । তিনি মগিরাঃ কে বলিলেন, ইহা কি সম্ভবপর যে, আমার পরে মোছলমানগণ আমার পুত্র এযিদের হস্তে ‘বস্-য়েত’ করিবে ? মগিরাঃ বলিলেন, এই কার্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে । কুফার অধিবাসিগণকে আমি এ বিষয়ে রাজী করিব ; আর বস্রাবাসিগণকে আপনার ভ্রাতা যেয়াদ-এব্নে আবু ছুফিয়ান বাধ্য করিবেন । মক্কা ও মদীনায়া মারওয়ান-বিন্-হকম এবং সয়ীদ-বিন্-আছ লোকদিগকে স্ব স্ব মতাবলম্বী করিতে পারিবেন । আর মোলকে শামে ত কোনও প্রকার ‘মোখালেফৎ’ (বিরুদ্ধাচরণ)-এর সম্ভাবনাই নাই । ইহা শুনিয়া হজরত মোবিয়া (রাজিঃ), মগিরাঃ-বিন্-শায়বাকে এই বলিয়া কুফায় ফেরত

পাঠাইলেন যে, তুমি কুফার গিয়া এই কার্য সুসম্পন্ন কর । এই ঘটনাটি অল্প এক ভাবেও বর্ণিত হইরাছে ; তাহা এই যে, হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) কুফার শাসনকর্তা মগিরাঃ-বিন-শয়বাঃ কে লিখিলেন, তুমি আমার পত্র পাঠ মাত্র আপনাকে ‘মোজুল’ (বরখাস্ত—পদচ্যুত) মনে করিবে । কিন্তু এই পত্র যখন মগিরার নিকট পঁহুছিল, তখন এই আদেশ ‘ভায়মিল’ (পালন) করিতে তিনি বিলম্ব করিলেন । তৎপর তিনি যখন হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট দামেশ্কে উপস্থিত হইলেন, তখন হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) তাঁহার আদেশ পালনে বিলম্ব করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মগিরাঃ বলিলেন, আদেশ পালনে বিলম্ব করিবার এই কারণ ছিল যে, আমি কোনও এক ‘খাছ’ (বিশেষ) কার্যে লিপ্ত ছিলাম । আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ প্রয়োজনীয় কার্যে তুমি লিপ্ত ছিলে ? তৎক্ষণে মগিরাঃ বলিলেন, আমি আপনার পুত্র এষিদের নামে লোকের নিকট হইতে বয়স্ক গ্রহণ করিতেছিলাম । আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) এই কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন ; এবং তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কুফার ফেরত পাঠাইলেন । যখন মগিরাঃ দামেশ্কে হইতে কুফার প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন কুফার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, দামেশ্কে তোমার সম্বন্ধে কি ব্যাপার ঘটিল ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-কে এমন এক দলদলে, (গভীর কর্দমে) ফাসাইয়া আসিয়াছি যে, তিনি কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবেন না । ঘটনা যাহাই হউক, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-কে মগিরাঃ-বিন-শায়বাই এমন কার্যে অগ্রসর করিয়াছিলেন যে, যদ্বারা ভবিষ্যতে খেলাফতের নামে পিতার স্থলে পুত্র বাদশাহ হইতে লাগিলেন ; এবং

‘মশ্বেরা’ (পরামর্শ) ও ‘এস্তেখাব’ (নির্বাচন)-এর পবিত্র প্রণালী সেই হইতে উঠিয়া গেল—খেলাফৎ বংশানুক্রমিক হইয়া দাড়াইল । এবিধ আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পুত্র ছিল, পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ-প্রদর্শন, এবং পিতার পুত্রের প্রতি রাজত্ব অর্পণ বা উত্তরাধিকারী নির্বাচন একটি ‘ফেৎরতি’ (স্বাভাবিক) নিয়ম । এবিষয়ে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-কে অনেকটা ‘মশ্বুর’ (নিরুপায়) মনে করা যাইতে পারে ; অবশ্য ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্বলতা এবং পবিত্র খেলাফৎ-নিয়মের পরিপন্থী ; কিন্তু মগিরাঃ-বিন্-শয়বার পক্ষ সমর্থনের কোনও পথই নাই । এই লোকটি জানিয়া শুনিয়া পবিত্র খেলাফতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া-ছিলেন । তিনি একজন ছাহাবাঃ হইয়াও কুফার শাসন কর্তৃত্বের লোভেই এই অন্ডায় অন্ডুঠানে অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন ।

মগিরাঃ দামেশ্কে হইতে কুফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় ‘শোরফাঃ’ ও ‘রোওছাঃ’ (সম্ভ্রান্ত এবং নেতৃ মণ্ডলী)-কে আহ্বান পূর্বক এই কার্যে ‘আমাদাঃ’ (অগ্রসর) করিলেন যে, আপনারা এবিদের ‘ওলী আহাদী’ (যুবরাজত্ব) বিষয়ে স্বীকৃতি দান করুন ; তাঁহাদিগকে একথা বিশেষ ভাবে বুঝান হইল যে, এই উপায়ে ভবিষ্যতে মোছলমানদিগের মধ্যে খেলাফৎ অর্থাৎ আধিপত্য লইয়া কলহ এবং শোণিতপাত হইবে না ; সর্ব প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ এবং বিপ্লবের অবসান হইবে । কুফার চঞ্চল মতি অধিবাসিগণ শাসনকর্ত্তা মগিরার এই বৃত্তি মানিয়া লইলেন, মগিরাঃ যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রস্তাবে কুফাবাসিগণের আর কোনওরূপ মত বৈধ নাই ; তখন স্বীয় পুত্র মুছার নেতৃত্বে কুফার প্রধান প্রধান লোক দ্বারা গঠিত এক ‘ওফদ’ (ডেপুটেশন) খলিফা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সমীপে দেমেশ্কে প্রেরণ করিলেন । তাঁহারা দেমেশ্কে পৌঁছিয়া খলিফা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-কে বলিলেন, আমরা এই মতের

সমর্থন করিবে, এষিদের 'ওলী আহাদ' (যুবরাজ) নির্বাচন করিয়া, তাঁহার নামে বয়্যেত গ্রহণ করা হয় । ইতিপূর্বে মগিরাঃ হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) এর হৃদয়ে যে সঙ্কল্প দৃঢ়ীভূত করিয়া ছিলেন ; উপস্থিত ঘটনার তাহাতে আরও শক্তি-সঞ্চয় হইল । তিনি এই প্রতিনিধি দলের প্রতি খুব সমাদর প্রদর্শন পূর্বক বিদায় করিলেন ; এবং ইহাও বলিয়া দিলেন যে, যখন সময় আসিবে, তখন তোমাদের নিকট হইতে বয়্যেত গ্রহণ করা যাইবে । আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) একজন 'দূর আন্দেহ' (বহুদর্শী—ভবিষ্যদর্শী) এবং সতর্কতার সহিত কার্য উদ্ধার-কারী রাজনীতি কুশল পুরুষ ছিলেন । তিনি এই অনুমান করিতে চাহিতে ছিলেন যে, তদানীন্তন মোছলেম-জগত তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল কি না ? এ বিষয়ের পরীক্ষা ■ তিনি একদিকে মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান-বিন্-হকম কে, অন্যদিকে বস্রার শাসনকর্তা যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ; আমার মনে এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার পরে মোছলমানদিগের মধ্যে খেলাফৎ লইয়া না বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয় । এজন্য আমি ইচ্ছা করি যে, আমার জীবিত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিকে আমার পরে খলিফা নির্বাচন করি । বৃদ্ধদিগের মধ্যে খলিফার উপযুক্ত কেহ আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইতেছেন না ; যুবক দলের মধ্যে আমার পুত্র এষিদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে । তোমাদের উচিত যে, খুব সতর্কতার সঙ্গে এসম্বন্ধে জন-সাধারণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির কর । আর তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য এষিদের হস্তে বয়্যেত করিবার জন্য বাধ্য কর । বস্রার শাসনকর্তা যেয়াদ-বিন্-আবি ছুফিয়ানের নিকট এই মর্ম্মের পত্র পৌঁছিলে, তিনি বস্রার জনৈক রইছ-য়বেদ-বিন্-কায়াব নরিনিকে ডাকাইয়া হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর ঐ

পত্র খানি দেখাইলেন, এবং বলিলেন, আমার মতে আমিরুল মুমেনিন এই ব্যাপারে বড় তাড়াতাড়ি করিয়াছেন ; এবিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্দেশ করেন নাই । কারণ এযিদ একজন বিলাস ব্যসন-পরায়ণ তরুণ যুবক । একথা সকলেই অবগত আছে যে, সে সর্বদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও যুগয়াদি কার্যেই সময়ান্তিপাত করে । তাঁহারা নিশ্চয়ই উহার নামে বয়স্বেত করিতে আপত্তি করিবে । রবিদ-বিন্-কায়াব নমিরি বলিলেন, আপনি আমিরুল-মুমেনিনের মতের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিবেন না । আমাকে আপনি দৈমশ্কে পাঠাইয়া দেন, আমি এযিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব, এবং তাঁহাকে বলিব, আপনি নিজের কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করুন—যাহাতে আপনার নামে বয়স্বেত গ্রহণে কোনও প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা না জন্মে । আমি আশা করি, এযিদ অবশ্যই আমার এই উপদেশ গ্রহণ করিবেন । যখন উহার অবস্থার পরিবর্তন হইবে, চাল-চলন সংশোধিত হইবে, তখন উহার নামে বয়স্বেত গ্রহণ করিতে কোনও রূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতা জন্মিবে না ; সঙ্গে সঙ্গে আমিরুল-মুমেনিনের উদ্দেশ্য ও পূর্ণ হইবে । যেসাদ তাঁহার এই পরামর্শ যুক্তিমুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে অতি সত্বরে দামেশ্কে রওয়ানা করিয়া দিলেন । রবিদ দামেশ্কে পৌছিয়া এযিদকে সকল বিষয় বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন ; তদনুসারে এযিদও কিছুকালের জন্য স্বীয় কার্য্য-কলাপ ও আচার-ব্যবহার সংশোধন করিয়া লোকদিগের প্রতিবাদের পথ বন্ধ করিল ।

মদীনা-মনুওরায় যখন মারোয়ানের নিকট এই মর্ম্মের পত্র পৌছিল, তিনি মদীনার সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া প্রথমে কেবলমাত্র এই কথা প্রকাশ করিলেন যে, আমিরুল-মুমেনিনের [] এই যে, তিনি জীবিত থাকিতে মোছলমামদিগের আত্ম-কলদুহ ব্রীকরণ মানসে

কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ খলিফা মনোনীত করেন । ইহা শুনিয়া সকলে বলিলেন, তাঁহার এই মত আমাদের সকলেরই মনঃপুত । আমরা সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত আছি । কয়েক দিন পরে আবার মারোয়ান-বিন্ হকম মদীনার প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, দামেশ্‌ক্ হইতে আমিরুল-মুমেনিনের ২য় পত্র আসিয়াছে, ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, আমি মোছলমানদিগের ‘বেহ-তরীর’ জন্ম (মঙ্গলার্থ) আমার পুত্র এখিদ্কে ‘ওলি যাহ-দী’ (সুবরাজ বা ভাবী খলিফা) পদে নির্বাচিত করিয়াছি । এই কথা শ্রবণে হজরত আবদুর রহমান বিন্-আবিবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লা-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিলেন । তাঁহারা বলিলেন, এই নির্বাচন মোছলমানদিগের মঙ্গলার্থে নয়, বরং মোছলমানদিগের ‘বরবাদির’ (ধ্বংস সাধনের) জন্ম করা হইয়াছে । কারণ, এইরূপ নির্বাচন দ্বারা মোছলমানদিগের খেলাফৎ কয়ছর এবং কেছরার (রোমক-সম্রাট্ ও পারস্ত-সম্রাট্) এর ছোলতানতের স্থায় হইয়া যাইবে ; অর্থাৎ পিতার পরে পুত্র সিংহাসনারূঢ় হইবে ; এইরূপ নির্বাচন এছলামী খেলাফতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ।

এইস্থলে এ ঘটনাও উল্লেখ যোগ্য যে, যখন মদীনা মনুওরায় মারোয়ান-বিন্ হকম, হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর ‘মনশাঃ’ (অভিপ্রায়)-এর ‘এলান’ (ঘোষণা) করেন, ইহার কয়েক মাস পূর্বেই হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পরলোক গমন করিয়াছিলেন । লোকেরা সাধারণতঃ একথাও অবগত ছিল যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর সন্ধি স্থাপন কালে আবদুল্লা-বিন্-আমের এই শর্তটি নিজের পক্ষ হইতে লাগাইয়াছিলেন যে, আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-

এর পরে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) পুনরায় খলিফার পদ লাভ করিবেন ; কিন্তু বড় এমাম ছাহেব (রাজিঃ) সন্ধি-পত্রে এই শর্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন না । অথচ সর্ব সাধারণের মনে এই 'খেয়াল' (ধারণা) ছিল যে, যদিও হজরত এমাম হাছন আলায়হেচ্ছালাম সন্ধিপত্রে ভাবী খলিফা-নির্বাচন সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু মোছলমান জগৎ হজরত এমাম হাছন আলায়হেচ্ছালামের খেলাফৎ লাভ সম্বন্ধে এক মতাবলম্বী হইবেন । মারওয়ান-বিন-হকম যখন প্রথমবার মদীনায়া আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পত্রের মর্ম ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন অধিকাংশ লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর পরলোক গমনে হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর মনে এই খেয়ালের উদ্রেক হইয়াছে যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাহাকেও খলিফা নির্বাচন করেন ; কারণ যখন হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) জীবিত ছিলেন, ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি (হজরত মোবিয়া [রাজিঃ]), এমাম হাছন (রাজিঃ)-কেই নির্বাচিত ভাবী খলিফা বলিয়া মনে করিতেন ; প্রথম ঘটনা দ্বারা একদিকে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর 'নেক-নিয়তি' (সংস্কার) ও 'এন্ছাফ-পছন্দ' (সহিবেচনা বা সুবিচার)-এর বলক প্রকাশ পাইতেছিল ; পক্ষান্তরে তাঁহার পরে যাহারা আপনাদিগকে খলিফা পদের 'মস্তহক' (হকদার—স্বাধীন সত্ত্বত অধিকারী) বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের মনে উহা লাভের আশা জন্মিয়াছিল । মারওয়ান যখন দ্বিতীয় বার এমিরের ভাবী খলিফা নির্বাচন সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিলেন, তখন পূর্বোক্ত দুই প্রকার ধারণাই লোকের মন হস্তে অন্তর্হিত হইল । আর হজরত এমাম হাছন রাজি আল্লাহ্ আনহুর পরলোক গমনের পরই এই কার্যের (এমিরকে খলিফা নির্বাচন) জন্য লোকের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইতে লাগিল । কতক

লোক এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল যে, হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-ই হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে বিষ-প্রয়োগে শহীদ (হত্যা) করিয়াছিলেন। এষিদের ‘অলী-আহাদী’ (খেলাফতের উত্তরাধিকারিত্ব) ঘোষণা করিবার পূর্বে কাহারও মনে এরূপ সন্দেহের উদ্ভেক হইয়াছিল না যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ‘ওফাত’ (পরলোক প্রাপ্তি)-এবং হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর ‘থাহেশ’ (ইচ্ছা) ও ‘কোশেশ’ (চেষ্টা)-এর মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আছে—কিংবা নাই। পাঠকগণ ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর বিষ-প্রয়োগে মৃত্যুর ~~কাল~~ আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এরূপ একটা ভীষণ গর্হিত কার্য তাহার স্ত্রীর একজন বিখ্যাত ছাহাবাঃ (রাজিঃ) কখনও করিতে পারেন না। মহামান্য আছহাবগণ নরহত্যা—বিশেষতঃ হজরত রছুল-করিম (ছালঃ)-এর দোহিত্রের হত্যা সাধন করিবেন, এরূপ একটা খেয়াল মনে স্থান দেওয়া ও মহাপাপ। অবশ্য চাতুরী, ধোকাবাজী প্রভৃতি অনুষ্ঠান কোনও কোনও ছাহাবাঃ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিবী জয়নবের বিবাহ সম্বন্ধে এষিদের ষড়যন্ত্র বিষয়ক যে কাহিনী সাধারণতঃ প্রচলিত আছে; তাহার মূলে সত্য থাকিতে পারে। কারণ এষিদের স্ত্রীর কামাতুর পাপাচারীর পক্ষে সেরূপ কার্য করা অসম্ভব নহে। তাহার দলে ঐরূপ ষড়যন্ত্রকারী দ্রুতরিজ লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর জ্ঞাতসারে এরূপ পাপানুষ্ঠান কোনও ক্রমেই হয় নাই। বিশেষতঃ আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) জীবনে কখনও হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর ~~কোনও~~ কোনও রূপ অসম্মত ব্যবহার করেন নাই। আবার মগিরাঃ-বিন্-শরবাঃ (রাজিঃ), হজরত এমাম হাছন আলায়

হেচ্ছালামের পরলোক গমনের পরে, আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-কে এখিদের 'অলী আহাদী' (যুবরাজ) সম্বন্ধে মনোযোগী ঃ উৎসাহিত করিয়াছিলেন ; তৎপূর্বে তাঁহার মনে এরূপ খেয়ালও কখন উদয় হয় নাই ।

মগিরাঃ-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ), এখিদকে 'অলী আহাদী' অর্থাৎ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা সম্বন্ধে যেমন প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন ; সেই রূপে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধেও বিশেষ রূপ উত্তোগ-আয়োজন করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই । একাধারে তাঁহার দ্বারা আশ্রয় চেষ্টা আর কেহই করিয়াছিলেন না । আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) মদীনাবাসী এবং হেজাব্বাসীর বিরুদ্ধাচরণের সংবাদ মারওয়ান-বিন্-হকমের পত্রে জানিতে পারিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, মদীনাবাসীদিগকে কিরূপে স্বমতে অনলয় করা যায় ; অর্থাৎ কিসে—কোন উপায়ে তাঁহারা এখিদের ভাবী খেলাফত সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন । এই সময় হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, কুফার শাসনকর্ত্তা মগিরাঃ-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । ইহা ৫১ একার হিজরীর ঘটনা । মগিরাঃ-বিন্-শয়বাঃ (রাজিঃ)-এর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া হজরত মোবিয়া (রাজিঃ), স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানকে বস্ত্রার সঙ্গে কুফার শাসন কর্ত্ত্বও প্রদান করিলেন ।

৫৮ হিজরীতে ওম্মোল-নুমেনি হজরত আয়েশা ছিদিকা (রাঃ—আঃ) পরলোক গমন করেন । 'জিন্নতল বকিয়' নামক মদীনার সুবিখ্যাত গোরস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল । তিনি সর্বদাই মদীনায় তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা শঠ-চুড়ামণি মারওয়ান-বিন্-হকমের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন ; কারণ মারওয়ানের কার্য্য-কলাপ ভাল ছিল না । এই প্রথের

স্থানে স্থানে মারওয়ান-বিন্-হকমের অস্তায় ■ অসম্ভব কার্যের একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে । মারওয়ান একদিন খোকাবাজীর সহিত মোছলেম-মাতাকে দাওত করিলেন ; মারওয়ান পূর্ব হইতেই একটি গর্তের ভিতর গুপ্তাবাসি এবং ছুরা ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্রে খাড়া করাইয়া রাখিয়া ছিলেন ; ■ মোমেনিন (রাঃ—আঃ) যখন তাহার গৃহে বাইতেছিলেন, তখন তাহার নিরোজিত লোক, তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঐ গর্তে ফেলিয়া দিল ; তিনি অতি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন ; বয়ঃক্রম ৬৮ বৎসর হইতে ৭০ বৎসরের মধ্যে ছিল ; তিনি এই ঘটনার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, (ইম্মা-লিল্লাহে ওয়াইম্মা এললামহে রাবেউন) । দুঃখের বিষয়, আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ), এরূপ ভীষণ দুর্কার্য সম্বন্ধে মারওয়ানের প্রতি কোনও রূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন না ; তাহার এই দুর্কার্যের বিষয় অবশ্যই আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) অবগত হইয়াছিলেন ।

৫৯ হিজরীতে স্বনামখ্যাত হাদীছ-বেত্তা মহাপণ্ডিত হজরত আবু-হোরেয়াঃ (রাজিঃ) পরলোক গমন করেন । তিনি প্রায়ই বলিতেন, ■ এলাহি ! আমি তোমার নিকট তরুণ যুবকদিগের হুকুমত (রাজত্ব) ও ৬০ হিজরী হইতে পানাঃ (আশ্রয়) চাহিতেছি—অর্থাৎ ঐ দুইটি ব্যাপার যেন আমাকে দেখিতে না হয় । পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁহার পরগণা তাহার প্রার্থন। কবুল (গৃহীত) হইয়াছিল ; অর্থাৎ তিনি ৬০ হিজরীর পূর্বেই, আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর খেলাফতের শেষ ভাগে ৫৯ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন ।

হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ)-এর 'ওম্মাত' (পরলোক গমন)।

৬০ হিজরীর রজবমাসের প্রারম্ভে আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ব্যারামের অবস্থায় যখন তিনি বৃদ্ধিতে পারিলেন— তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহার আসন্ন সময় উপস্থিত— জীবন-প্রদীপ নির্বাণ হইবার আর বেশী দিন বাকী নাই ; তখন তিনি স্বীয় পুত্র এষিদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এষিদ ঐ সময় রাজধানী দামেস্কের বাহিরে কোথাও শিকারে কিংবা অভিযানে গমন করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট 'কাজেদ' (দূত) রওয়ানা করা হইল ; দূত গিয়া এষিদকে ডাকিয়া আনিল ; সে পিতৃ-সম্মিথানে উপস্থিত হইলে, আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) তাহার দিকে 'মোখাতেব' হইয়া (লক্ষ্য করিয়া বা সম্বোধন করিয়া) ফরমাইলেন :—

“ হে পুত্র ! আমার 'ওছিয়ত' (অন্তিম-নির্দেশ) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, এবং আমার প্রশ্ন সমূহের জওয়াব দাও। এক্ষণে খোদা তা-লার ফরমান অনুযায়ী আমার মৃত্যুকাল আসন্ন। তুমি আমাকে বল, আমার পরে তুমি মোছলমানদিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে চাও। ” উত্তরে এষিদ বলিল, “ আল্লাহর কেতাব ও রছুলোম্মার 'পয়গবী' (পদানুসরণ) করিব। ”

হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, হিন্দিকী ছোন্নতের প্রতিও আমল করা চাই। কারণ তিনি 'মোরতেদ' (এছলাম ধর্ম-ভ্যাগী)-দিগের সঙ্গে 'জহ্দ' (যুদ্ধ—যেহাদ) করিয়াছিলেন ; ঐ অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ; 'ওম্মাত' (মোছলমান)-গণ তাঁহার উপর অত্যন্ত 'খোশ' (সন্তুষ্ট) ছিলেন

এষিদ বলিল, “ তা নয়, কেতাব আল্লাহ্ (কোরআন) ছোন্নত রছুলোল্লাহ্ ‘পয়রবী’ (অনুসরণ) করাই যথেষ্ট । ”

হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) আবার বলিলেন, হে পুত্র ! হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর ও ‘পয়রবী’ (পদানুসরণ) করিবে ; কারণ তিনি অনেক নূতন শহরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; সৈন্য দলকে মজবুৎ ও শক্তিশালী করিয়াছেন, আর যুদ্ধে বিজয়-লব্ধ ‘মাল’ (অর্থ ও সম্পত্তি) মোহলমানদিগের মধ্যে যথাযোগ্যরূপে বন্টন করিয়া দিয়াছেন । ”

উত্তরে এষিদ বলিল, তা নয়, কেতাব আল্লাহ্ ও রছুলোল্লাহ্ পদানুসরণ করাই যথেষ্ট ।

হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) আবার বলিলেন, “ হে পুত্র ! ওছমান মনী (রাজিঃ) ‘ছিন্নত’ (সদ্গুণাবলী) -এর প্রতি ও আমল করা চাই । কারণ, তিনি স্বীয় জীবনে লোকদিগকে নানাপ্রকারে উপকৃত করিয়াছেন ; আর দাতব্য শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । ”

এষিদ বলিল, “ তা নয়, কেতাব আল্লাহ্ ও ছোন্নত রছুলোল্লাহ্ অনুবর্তী হইয়া চলাই যথেষ্ট । ”

এষিদের উক্তি শুনিয়া হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) বলিলেন, হে পুত্র ! তোমার ঈদৃশ উক্তি দ্বারা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তুমি আমার এই সকল উপদেশ পালন করিবে না । বরং আমার উপদেশের বিপরীতা-
করিবে । হে এষিদ ! তুমি এই কথার উপর অহঙ্কার করিও না যে, আমি তোমাকে স্বীয় ‘অগি-আহাদী’ (উত্তরাধিকারী—মুবর্তী—ভাবাধিকার) নির্বাচিত করিয়াছি ; আর আমার অধিকার ভুক্ত সকল দেশের অধিবাসিগণ তোমার ‘ফরমাবরদারী’ (অধীনতা) একরার (স্বীকার) করিয়াছে । আবুছল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই ; কারণ তিনি পার্থিব সুখ-সম্পদের অভিলাষী নহেন

হোছেন বিন্-আলী (রাজিঃ)-কে এরাকবাসিগণ অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিবে ; তুমি যদি যুদ্ধে জয়ী হও ; তবে কিছুতেই তাঁহাকে ‘কতল’ (হত্যা) করিবে না । ‘করাবত্’ ও ‘রেশ্-তাদারীর’ (আত্মীয়তার) খেয়াল রাখিবে । আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) খুঁত শৃঙ্গালের স্থায় চালবায়্ লোক, উহাকে যদি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিতে পার, তাহাকে তবে ‘কতল’ (হত্যা) করিবে । মক্কা ও মদীনার অধিবাসিদিগের প্রতি সর্বদাই সদ্যবহার করিবে । এরাকের অধিবাসিগণ যদি সর্বদা শাসনকর্ত্তা বদলী করার জন্য ‘ফরমায়েশ্’ (অমুরোধ—আবেদন) করে, তবে সর্বদাই তাহাদের মন রক্ষার জন্য শাসনকর্ত্তা বদলী করিবে । ‘আহ্-লে শাম’ (শাম অর্থাৎ সিরিয়াবাসী)-দিগকে সর্বদা আপনায় ‘মদদগার’ (সাহায্যকারী) মনে করিবে ; আর তাহাদের ‘দোস্তীর’ (বন্ধুত্বের) উপর ভরসা রাখিবে । ”

ইহার পর এমিদ আবার মৃগয়ায় (শিকারে) চলিয়া গেল । হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল । অবশেষে ৬০ হিজরীর ২২শে রজব বৃহস্পতিবার দিন তিনি এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া পরলোক গমন করিলেন (ইম্মা লিল্লাহে ওয়াইম্মা এলায়হে রাযেউন) । মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছিল । তিনি একজন অতি উপযুক্ত ও ধোয়াভ্য শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ খলিফা ছিলেন । তাঁহার খেলাফৎকালে মোছলমানদিগের বিজয়-স্রোত পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল ।

হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট আ হজরত (ছালঃ)-এর কেশ ও ‘নাখুন’ (নখ) ছিল ; তিনি মৃত্যুকালে ওছিয়ত করিয়া গিয়া-ছিলেন যে, এই পবিত্র কেশগুচ্ছ ■ ‘নাখুন’ (নখ) মবারক কবরে আমার মুখ ও চক্ষের উপর বাধিয়া দিবে । জোহাক-বিন্-কয়েছ তাঁহার জানাঘর

নমায্ পড়াইয়াছিলেন । ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দামেশ্‌ক্ শহরের “ বাবে জাবিয়াঃ ” ও “ বাবে ছগীর ” এর মধ্যবর্তী স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয় । হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবিবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর কিছু দিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ।

হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) সুদীর্ঘ ২০ বৎসর কাল বিশাল মোছলেম-জগতের উপর পূর্ণ প্রভাবের সহিত আধিপত্য করিয়াছিলেন । তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে কোনও শত্রুই জয়ী হইতে পারেন নাই । মোছলমানদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন না ; হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করাতে, আর কেহই খেলাফতের দাবি করেন নাই । তাঁহার খেলাফতের প্রথম আধিপত্য কালে আশ্‌রায় মোবাস্বরা দিগের মধ্যে পারস্ত-বিজয়ী মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি-ওকাছ (রাজিঃ) জীবিত ছিলেন ; তিনিও তাঁহার হস্তে বয়্‌য়েত করেন । এমাম হোছেন (রাজিঃ) প্রথমে বয়্‌য়েত না করিলেও, একটু পরেই বয়্‌য়েত করেন । হজরত আবদুর রহমান-বিন্-আবিবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছাহাবাঃ গণ তাঁহার হস্তে বয়্‌য়েত করিয়াছিলেন । মেছের-বিজয়ী মহাবীর হজরত ওমর বিন্-আছ (রাজিঃ) ত সফিন যুদ্ধকাল হইতে তাঁহার প্রধান পরামর্শ-দাতা ও প্রধান মন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন ; পরিশেষে মেছেরের গবর্ণর হন ; এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ান একজন রাজনীতিবিদ মহা প্রতাপশালী শাসনকর্তা ও সুবিখ্যাত বীরপুরুষ

ছিলেন ; প্রথমে তিনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অধীনে বস্মা এবং সমগ্র পূর্ব দেশের প্রধানতম শাসনকর্তা বা রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন । তাঁহার শাহাদৎ প্রাপ্তির পর আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে বিশেষ কোশলে বশীভূত করেন । হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) মহাসৌভাগ্য-শালী পুরুষ ছিলেন ; তিনি উপযুক্ত মন্ত্রী, উপযুক্ত শাসনকর্তা, উপযুক্ত সেনাপতি ও খ্যাতনামা বীরপুরুষদিগের সাহায্য লাভে রাজ্য শাসনে এবং এছলামের গৌরব রক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে সফলকাম হইয়াছিলেন । সমুদয় প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধেই তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন । তাঁহার আধিপত্য কালে এছলামের বিজয় কার্য অতি গৌরবান্বিত রূপে সাফল্য লাভ করিয়াছিল । পূর্বেদিকে এসিয়ায়, উত্তর দিকে এসিয়ায় এবং পশ্চিম দিকে আফ্রিকায় তাঁহার রাজ্য বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল । তিনি এছলামের গৌরব সর্বতোভাবে বজায় রাখিয়া ছিলেন । তখন মদীনা-তৈয়বাঃ ও কুফার পরিবর্তে মহানগরী দামেশ্‌কই মোছলমান-জগতের মহারাজধানী ও কেন্দ্র স্থানে পরিণত হইয়াছিল । অর্থাগমের আশায়, প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়, মোছলেম-জগতের বহু বিদ্বান্ ও প্রতিভা সম্পন্ন লোক দামেশ্‌কে সমবেত হইয়াছিলেন । আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) আত্মীয়তার অনুরোধে কুচক্রী মারওয়ান-বিন্-হকমকে মদীনার শাসন-কর্তা করিয়াছিলেন । খেলাফতের-শেষভাগে যেমাদ-পুত্র হুদািস্ত ওবায়-হুলাহ্‌কে বস্মার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । অবশেষে অপত্য-ব্রহ্মের বশীভূত হইয়া বিলাসী, দুশ্চরিত্র, মদুপায়ী, অহঙ্কারী এষিদকে মোছলেম-জগতের খলিফা নির্বাচন করিলেন । যাহার প্ররোচনা ও উৎসাহেই তিনি এই কার্য করিয়া থাকুন না কেন, সেই অত্যাচারী পুত্রের দুর্কার্যের ফলে আবু হজরত (ছালঃ)-এর বংশধরগণ এক প্রকার নিশ্চল হইয়া

গিয়াছিলেন ; ইহার দ্বারা এমন একটি ভীষণ অত্যাচার-মূলক শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল, জগতে যাহার তুলনা নাই ; এবং আজ তের শত বৎসর পর্য্যন্ত মোছলমান জগত সেই শোচনীয় বিষাদ-কাহিনী স্মরণ করিয়া বৎসর বৎসর কঠোর ভাবে শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন । আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) একজন প্রধান ছাহাবাঃ, বিদ্বান্ ও জ্ঞানী পুরুষ হইয়া খলিফা নির্বাচনের পবিত্র প্রণালী ভাঙ্গিয়া দিলেন । সেই হইতে খেলাফৎ বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইল ; আর তাঁহার দ্বারা সর্বপ্রকারে উপরূত জাতি-ভ্রাতা মারওয়ান-বিন্-হকম, তাঁহার বংশধরের হস্ত হইতে খেলাফৎ কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার বংশের অস্তিত্ব এক প্রকার মুছিয়া ফেলিল ।

এমিদ বিন্ হজরত মোবিয়া ।

এমিদের অপর নাম আবু খালেদ ; ২৫ কিংবা ২৬ হিজরীতে, হজরত ওহমান গনী (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ কালের শেষভাগে সে জন্ম গ্রহণ করে ; তখন হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) শাম (সিরিয়া) এবং পার্শ্ববর্তী কতিপয় প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন । ইহার মাতার নাম মিছন-বিন্তে বহদল ছিল, তিনি বহু-কলব সম্প্রদায়ের মেয়ে ছিলেন । এমিদ খুব মোটা তায়্য (স্কলান্দ), এবং তাহার শরীর বহু লোম বিশিষ্ট ছিল । এমিদ জন্ম-গ্রহণ করিয়া ‘হুকুমত’ ও ‘এমারত’ এর বেঠেনী মধ্যে ও মহা আড়ম্বরের ভিতরে থাকিয়া লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল । হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন ।

তিনি স্বীয় একমাত্র প্রিয়পুত্র এষিদের শিক্ষাকল্পে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিয়াছিলেন না । তাহাকে একজন আদর্শ চরিত্র পুরুষ রূপে গঠন করিতে চেষ্টা বিশেষ ভাবে পাইয়াছিলেন । কারণ তিনি স্বয়ং সমগ্র মোছলেম-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন । পৃথিবীতে সে সময় তাঁহার ছায় মহা প্রতাপশালী বাদশাহ আর কেহ ছিলেন না । তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্বে হিন্দুস্তান ও তুর্কীস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । তিনি এষিদকে দুই একবার “ আমীর-ইজ্জ ” নিযুক্ত করিয়াও মক্কার পাঠাইয়াছিলেন । সেনাপতির পদ ও প্রদান করিয়াছিলেন । রোমক রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল মহানগরী আক্রমণ ও অবরোধ কালে এষিদ একদল সৈন্তের সেনাপতি ছিল । এষিদ বড়ই মৃগয়া-প্রিয় ছিল । পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, ইজ্জরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর মৃত্যুকালে এষিদ দেমেশ্কে উপস্থিত ছিল না ; মৃগয়া উপলক্ষে রাজধানী হইতে অনেক দূরে ছিল । কয়েক দিন পরে আসিয়া পিতার কবরের উপর জানায়ার নমায পড়িয়াছিল । আমীর ইজ্জরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর জীবিত অবস্থায়ই উহার জন্ত স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব-চরিত্র, বিলাসিতা, ধর্ম্যভাবের অভাব প্রকৃতি কারণে অধিকাংশ মোছলমান উহার উপর নারাজ ছিলেন । তাঁহারা উহাকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু ভক্তি করিতেন না । মদীনা-মনুওয়ার তদানীন্তন ধার্মিক ও ধ্যাননাশী পুরুষ (ছাহাবাঃ কারাম)-গণও এষিদের নামে বয়্য়েত করিতে স্পষ্ট ভাবেই অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । ইজ্জরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পক্ষে স্বীয় জীবিত অবস্থায়, এষিদের নামে বয়্য়েত গ্রহণ করা বিষম ভ্রমাত্মক কার্য্য ছিল ; অনেকেই এই ভ্রমকে “ মহব্বত পেদরী ” (অপত্য-স্নেহ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; আমরাও তাহা স্বীকার করি ; কিন্তু অপত্য-

স্নেহের বশীভূত হইয়া কেহ অন্যায়-অসঙ্গত কার্য্য করিলে তাহা কি সমালোচনা-বহির্ভূত হইতে পারে ? মহামান্ন ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ)-দিগের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সমালোচনা করা পরবর্ত্তী মোছলমানদিগের পক্ষে বে-আদবী হইলেও, অতি বড় ভ্রম-প্রমাদ এবং ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হিসাবে কিরূপে নীরব থাকা যায় ? অপত্য-স্নেহ কার না আছে ? ১ম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) স্বীয় পুত্রের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম পুরুষ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-কে স্বীয় উত্তরাধিকারী বা পরবর্ত্তী খলিফা নির্বাচন করিলেন ; ২য় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), ৬ জন প্রধান পুরুষের হস্তে খলিফা-নির্বাচনের ভারার্পণ করিয়া গেলেন ; আর স্বীয় পরম ধার্ম্মিক ■ বিদ্বান্ পুত্র হজরত আবুল্লাহ্ (রাজিঃ) কে খলিফা নির্বাচন করিতে দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করিয়া গেলেন ; ৩য় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ) অকস্মাৎ শহীদ হওয়াতে খলিফা নির্বাচনের অবসর প্রাপ্ত হন নাই ; ৪র্থ খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় উপযুক্ত পুত্র হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ভাবী খলিফা মনোনীত না করিয়া, মোছলমানদিগকে উপযুক্ত খলিফা নির্বাচন করিতে বলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু হজরত সাবিয়া (রাজিঃ) স্বীয় হুজ্রিয়াশীল অযোগ্য পুত্রকে মোছলমান জগতের ভাবী খলিফা নির্বাচন জন্ত মোছলমানদিগের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। পক্ষান্তরে তিনি এছলামের পবিত্র গণতন্ত্র-প্রথা, খলিফা নির্বাচন ও বয়্য়েত গ্রহণের পবিত্র নিয়ম চিরদিনের ■ বন্ধ করিলেন । তিনি শাসনকার্য্যে যেরূপ দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম প্রচার ও এছলাম ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষায় এবং নব নব দেশ বিজয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র

মোসলমান জগতের তিনি সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খলিফা নির্বাচন কার্যে মোছলমানদিগের যে ক্ষতি সাধন হইয়াছিল, তাহা অসাধারণ, সে ক্ষতির আর পূরণ হইল না। তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারী নানাপ্রকার দুষ্কার্য করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিল; তাঁহার বংশধরগণ খেলাফৎ লাভে চির দিনের জন্য বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার বংশের সন্ধান ও আজ হুনিয়াতে খুজিয়া পাওয়া বাইতেছে না। এমন কি, “এযিদ” নামের উপর মোছলমানদিগের এমন ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, কেহ স্বীয় পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনের ঐ নাম রাখিতে চান না। এযিদ নামের উল্লেখ হইলেই লোকের মনে একটা নির্দয় নিশ্চয় পাষণ্ডের কল্পনা হয়। আজ দামেশ্‌ক্‌ নগরে খুজিয়াও এযিদের কবর পাওয়া যায় না। লোকে ঘৃণাভরে এখনও তাহার কবরের উদ্দেশ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে।

আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পরলোক গমনের পর ‘আহ্‌লে শাম’ (সিরিয়ার অধিবাসি)-গণ ত বিনা আপত্তিতেই এযিদের হস্তে বস্‌য়েত করিল; অত্যাচর ছুবার লোকেরাও এযিদের নামে স্থানীয় শাসনকর্তা দিগের হস্তে বস্‌য়েত করিতে বাধ্য হইল। ছোলতানতের দাপটে ও ভয়ে কেহ বস্‌য়েত করিতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। এযিদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও গবর্ণরদিগের নামে আদেশ-লিপি পাঠাইল যে, লোকের নিকট হইতে আমার নামে বস্‌য়েত গ্রহণ কর। এই সময় অনিদ-বিন্-য়োক্বাঃ-বিন্-আবু-ছফিয়ান মদীনাঃ-তৈয়বার ও নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। এই উভয় শাসনকর্তাই ‘নেক-তবিয়ক্‌’ (সদাশয়) এবং “ছোলোহ্‌ জো’ (শান্তি-প্রিয়) গবর্ণর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অত্যাচর শাসনকর্তাদিগের ভয় কঠোরতা

নির্দয়তা ইহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। যখন এষিদের আদেশ-
 লিপি মদীনার শাসনকর্তা অলিদ-বিন-রোক্ত্বার নিকট পৌঁছিল; তিনি
 মদীনার প্রধান প্রধান লোকদিগকে (যাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ছাহাবাঃ
 কারাম [রাজিঃ] ও ছিলেন) আহ্বান করিয়া এষিদের প্রেরিত পত্র
 খানি পড়িয়া শুনাইলেন। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ), আমীর
 মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ, এবং
 তাঁহার মগ্গফেরাত্ (পরলৌকিক মঙ্গল) জন্ত দোওয়া করিলেন; আর
 অলিদ কে বলিলেন, আমার বয়সেত গ্রহণ জন্ত তাড়াতাড়ি করিবেন
 না। আমি বুঝিয়া-শুঝিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিব। মদীনার
 ভূতপূর্ব শাসনকর্তা কুচক্রী ও কুটিল চূড়ামণি মারওয়ান-বিন-হকম এ সময়
 শাসনকর্তার পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া, নব-নিয়োজিত শাসনকর্তা অলিদের
 ‘মশির’ (মন্ত্রী) স্বরূপ কাজ করিতেছিল; সে অলিদকে পরামর্শ
 দিল যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ) হইতে এখনই বয়সেত গ্রহণ করা
 চাই; বয়সেত না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে এখান হইতে যাইতে দেওয়া উচিত
 নহে। এস্থলে বোধ হইতেছে, মারওয়ানের কার্য্য-কলাপে অসম্বদ্ধ হইয়া
 আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) তাহাকে শাসনকর্তার পদ হইতে
 বিচ্যুত করিয়া, নব নিযুক্ত শাসনকর্তা স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র অলিদের মন্ত্রী
 স্বরূপ নিয়োজিত করিয়াছিলেন; সে টুকুও নিতান্ত আত্মীয়তার খাতেরেই
 করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, শাসনকর্তা অলিদ,
 মারওয়ানের পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না; হজরত এমাম
 হোছেন (রাজিঃ)-এর বয়সেত পর দিবসের জন্ত ‘মুলতবি’ রাখিলেন।
 হজরত আবদুল্লাহ্-বিন-যোবের (রাজিঃ) শাসনকর্তা অলিদের নিকট
 আসিলেন না; পুনরায় ডাকিবার জন্ত লোক পাঠাইলে তিনি যাইতে
 অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন; এবং একরাত্রির অবকাশ চাহিয়া পাঠাইলেন;

তাঁহাকে ও অলিদ এক রাত্রির অবকাশ দিলেন । অতঃপর হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) রাত্রির সুযোগে স্বীয় পরিবারবর্গ মদীনা হইতে বাহির হইয়া গেলেন, এবং মদীনা হইতে মক্কা গমনের প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ পূর্বক, অপর কোনও ‘গয়ের মোক্ফ’ (অপ্রসিদ্ধ—অপ্রকাশ্য) পথে ক্রতগতি মক্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । পর দিন তাঁহার মদীনা ত্যাগের সংবাদ শুনিয়া শাসনকর্তা অলিদ ও মারওয়ান ৩০ জন সৈন্য সহ তাঁহার অনুসরণে বাহির হইলেন ; কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না । অকৃত-কার্য্য হইয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । ইহাঙ্গ সমস্ত দিন হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর অনুসরণে ব্যাপ্ত ছিলেন ; এজন্য হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মমোনাগ প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন না, সুতরাং পরবর্তী রাজিতে তিনিও সুযোগক্রমে সপরিবারে মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; পরদিন এমাম ছাহেবের মদীনা ত্যাগের সংবাদ প্রচার হইলে অলিদ বলিলেন, আমি এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ‘তায়াক্ব’ (পশ্চাৎসাবন) করিব না ; হইতে পারে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তাঁহার শোণিতে আমার হস্ত রঞ্জিত হইবে । এরূপ কার্য্য করা আমি কোনও ক্রমেই সম্মত করি না । উপরোক্ত দুই মহাত্মার মদীনা ত্যাগের পর অলিদ-বিন্-যোক্বাঃ মদীনার অবশিষ্ট অধিবাসিগণের নিকট হইতে এবিদের নামে বয়্য়েত গ্রহণ করিলেন । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) হইতে কোনও ‘খৎরাঃ’ (আশঙ্কা) ছিল না, কারণ তিনি স্বীয় মহামান্য পিতার নির্দেশ ক্রমে কখনও খেলাফতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না । আবার এমির লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, যদি হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) বয়্য়েত না করেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে বাধ্য করিবে না ; সুতরাং

পাক পাঞ্জতন (৮৮০) এমাম হোছেন ।

হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ)-কে বয়স্বেত করিবার জন্ত কেহ অনুরোধ করিলেন না । ইহার কয়েক দিন পরে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ও হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) মদীনা হইতে মক্কার চলিয়া গেলেন । হারেছ-বিন্-হর (রাজিঃ)-কে এমিদ মক্কার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইয়াছিল । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) একই সময় মক্কা-মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইলেন ; ইহাদিগকে দেখিবামাত্র মক্কার অন্ততম 'শরীফ' (সম্রাট) পুরুষ আবদুল্লাহ্-বিন্-ছফ্-ওয়ান-বিন্-ওম্মিয়া হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়স্বেত করিলেন ; ইহার পর মক্কার দুই হাজার সম্রাট ও প্রধান প্রধান লোকও তাঁহার হস্তে বয়স্বেত করিলেন । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), এমিদ কর্তৃক প্রেরিত শাসনকর্তা হারেছ (রাজিঃ)-কে ধৃত করিয়া কারাগারে বন্দী অবস্থায় রাখিলেন, এবং মক্কার শাসনকর্ত্বয় স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কার উপস্থিত ছিলেন, তিনি হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর বয়স্বেত করিলেন না ; হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও তাঁহার বা তাঁহার বংশের অপর কাহারও নিকট হইতে বয়স্বেত গ্রহণ করিলেন না ; কিংবা তাঁহাদিগকে বয়স্বেত করিবার জন্ত অনুরোধও করিলেন না । এইরূপে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) ও হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) যখন মক্কার আগমন করিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও বয়স্বেত গ্রহণ করিলেন না বা বয়স্বেত গ্রহণ জন্ত অনুরোধও করিলেন না ; আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) অধিকাংশ সময় থানাহ্-কাবার (পবিত্র কাবাগৃহ) এবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করিতেন । এই চারি মহাত্মা ■ হজরত নবী করিম (ছালঃ)-এর বংশধর অপর লোক ব্যতীত, মক্কার অন্যান্য

জন-সাধারণ সকলের নিকট হইতেই হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) বয়সেত গ্রহণ করিয়াছিলেন । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ এবং যুক্তি-পরামর্শ করিতেন । অনুমান করা হয়, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) নিজে খলিফা হইবার লোকের নিকট হইতে বয়সেত গ্রহণ করিতেন না, বরং এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতেন যে, অসচ্চরিত্র, সুরাপায়ী, ব্যভিচারী এখিদের নামে যেন কেহ বয়সেত না করে ; অর্থাৎ তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করা হয় । আর যে পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনানুসারে, বৈধ উপায়ে, সর্ববাদী-সম্মত রূপে কেহ খলিফা নির্বাচিত না হন, তৎকাল পর্যন্তের অল্প শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনার্থে তিনি মক্কা-মোরাব্বিয়ায় সাময়িক শাসন কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু কিছু দিন পরে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে এ বিষয় অগ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল যে, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে কেন মক্কার শাসনকর্তা খলিফা বলিয়া স্বীকার করা হয় । তাঁহার মনের গতি ক্রমেই এ সম্বন্ধে প্রতিকূল হইতে থাকে ; অবশেষে তিনি এবং তাঁহার ‘আহলে-খানদান’ (স্বংশীয় লোক), কাবা-গৃহে, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর এমামতিতে নমায় পড়িতে যাইতেন না ।

ওদিকে আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মদীনা হইতে চলিয়া যাওয়া, এবং মদীনা-বাসী অপর সকল লোক হইতে বয়সেত গ্রহণের সংবাদ মারওয়ান-বিন্-হকম, এখিদের নিকট লিখিয়া পাঠাইল । এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেই এখিদ তৎক্ষণাৎ অলিদ-বিন্-য়োকবাঃ কে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থলে য়োমরু-বিন্-ছয়ীদ-বিন্-আছকে মদীনার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইল ।

ওমরু-বিন্-ছয়ীদ মদীনায় আসিয়া দৃঢ়হস্তে মদীনার শাসনভার ধারণ করিলেন ; ইতিপূর্বে তথায় কিছু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও, নূতন শাসনকর্তার দৃঢ় শাসনে সে চাঞ্চল্য দূর হইল । অলিদ-বিন্-য়োক্-বাঃ মদীনাঃ হইতে দৈনন্দিনে এখিদের নিকট চলিয়া গেলেন । ওদিকে হজরত আবুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) কর্তৃক মক্কার আধিপত্য বিস্তার এবং এখিদের নিয়োজিত শাসনকর্তা হারেছকে বন্দী করার সংবাদ, হারেছ-বিন্-খালেদ :পত্র লিখিয়া এখিদের নিকট প্রেরণ করিলেন । হারেছ-বিন্-খালেদ মক্কার বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে ঘরের বাহির হইতেন না । মক্কার অবস্থা অবগত হইয়া এখিদ মদীনায় শাসনকর্তা ওমরু-বিন্-ছয়ীদকে লিখিয়া পাঠাইল, তুমি সর্বসঙ্গে মক্কার বাইয়া আবুল্লাহ-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে 'গেরেক্-তার' (বন্দী) কর, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমার নিকট পাঠাইয়া দাও । ওমরু একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে একদল প্রবল সৈন্য মক্কার পাঠাইলেন ; হজরত আবুল্লাহ-বিন্-যোবেরের সঙ্গে তাহার ভীষণ যুদ্ধ হইল ; যুদ্ধে মদীনা হইতে আগত সেনাদল পরাস্ত ও তাহাদের সেনাপতি, হজরত আবুল্লাহ-বিন্-যোবের (রাজিঃ) কর্তৃক ধৃত ■ বন্দী হইল ।

কুফাবাসিগণ হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর জীবিত অবস্থায়ই হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ■ গোপনে পত্র ব্যবহার করিতে ছিল, এবং বারংবার এই অনুরোধ জানাইতেছিল যে, আপনি সত্ত্বর কুফায় চলিয়া আসুন, আমরা আপনার হস্তে বস্তুত করিব । কুফাবাসিগণের এই গোপনীয় কার্য ও ষড়যন্ত্রের বিষয় আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) ও অবগত ছিলেন । হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ) কুফাবাসীদিগের স্বভাব চরিত্র ও কার্য-কলাপের বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন, তাহার :চক্ষের উপর কুফাবাসিগণ তাহার পরম প্রদেয় ওয়ালেদ মাজেদ

হজরত আলী মর্তুজা (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে, এবং পরে তাঁহার নিজের সঙ্গে যে দুর্জীবহার করিয়া ছিল, তাহাতে তাহাদের উপর বড় এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর একটু মাত্র বিশ্বাস ও আস্থা ছিল না ; একতাই তিনি যত্নের অবাবহিত পূর্বে স্বীয় পরম মেহান্পদ সরলচেতাঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে ‘ওছিয়েত’ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তোমাকে কুফাবাসিদিগের ‘ফেরেবে’ পড়া চাই না । ওদিকে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)ও যত্নাকালে স্বীয় পুত্র এযিদকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া গিয়াছিলেন যে, কুফাবাসিগণ এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বাধ্য করিবে ; যদি এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়,—এবং তুমি তাঁহার উপর যুদ্ধে জয়ী হও, তবে তাঁহাকে কোনও ক্রমেই হত্যা করিবে না ; এদিকে মক্কার শাসন কর্তৃক হজরত আবদুল্লাহ্ বিন-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তগত হওয়াতে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর মনোযোগ কুফার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল । কুফার যখন তথাকার শাসনকর্তা নওমান-বিন-বশির (রাজিঃ)-এর নিকট এযিদের পত্র পৌঁছছিল ; এবং হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর পরলোক গমন সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইল ; তখন বহু-ওম্মিয়ার ভক্ত মওলী তৎক্ষণাৎ এযিদের খেলাফৎ স্বীকার করিয়া এযিদের নামে শাসনকর্তার হস্তে বস্য়েত করিল । আর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ভক্ত মওলী—বাহারা ইতিপূর্বে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে কুফার আহ্বান করিবার ‘কোশে’ (চেষ্টা) করিতেছিল, তাহারা এযিদের নামে বস্য়েত করিতে কলঙ্ক করিল ; এবং ছোলায়মান-বিন-ছরদের গৃহে সমবেত হইল । সেখানে পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, এযিদকে কিছুতেই খলিফা স্বীকার করা হইবে না ; আর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-

কে কুফায় আহ্বান করা হউক । তাহাদের মধ্যে এইরূপ ‘খুফিয়া’ (গোপনীয়) পরামর্শ হইতেছিল, ইতিমধ্যে তাহারা সংবাদ পাইল যে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মদীনা হইতে মক্কায় চলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু মক্কাবাসিগণ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত না করিয়া, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করিয়াছেন ; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এষাবৎ হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়্য়েত করেন নাই । তখন তাহারা মনে করিল, এইবার হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) তাহাদের আহ্বানে নিশ্চয়ই কুফায় আগমন করিবেন । সুতরাং তাহারা নিম্ন-লিখিত মর্মে হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর নামে পত্র লিখিলেন,—

“ আমরা আপনার ‘ওয়ালেদ বোয়র্গওয়ার’ এবং আপনার পরম ভক্ত—
আপনাদের নামে জীবনোৎসর্গকারী এবং বনু-ওম্মিয়ার শত্রু । আমরা সর্বদাই আপনার ওয়ালেদ মাজেদের ‘হেমায়েত’ (সহযোগিতা—
সাহায্য) করিয়া, তাঁহার সাহায্যকারী রূপে হজরত তাল্হা (রাজিঃ) ও হজরত যোবের (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি ; আমরা ছফিন-প্রান্তরে যুদ্ধক্ষেত্র গরম করিয়াছিলাম । ‘শামী’ (সিরিয়াবাসী)-দিগের ‘দাত খাট্টা’ করিয়া দিয়াছিলাম । আমরা এক্ষণে আপনার পক্ষাবলম্বন পূর্বক শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি । আপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র কুফাতিমুখে রওয়ানা হইবেন । আপনি এখানে আসিলে আমরা শাসনকর্ত্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ)-কে ‘কতল্’ (হত্যা) করিয়া, কুফা নগরী আপনার হস্তে অর্পণ করিব । কুফা ও এরাকে ১ লক্ষ মোদ্ধ পুরুষ ‘মওজুদ’ (বর্তমান) আছে ; উহারা সকলেই আপনার হস্তে বয়্য়েত করিতে প্রস্তুত । আমরা সকলে আপনাকে খেলাফতের ‘হক্কার’ (শাস্য অধিকারী) বলিয়া মনে করি ; এষিদি আপনার ‘মোকা-

বেলায়' (সম্মুখে) কোনও ক্রমেই খেলাফতের দাবী করিতে পারে না । এক্ষণে মহা সূযোগ উপস্থিত, আপনি এখানে আসিতে আর কখনো বিলম্ব করিবেন না । আমরা এষিদকে হত্যা করিয়া আপনাকে 'আলমে এছলামের' (মোছলেম-জগতের) একমাত্র খলিফা পদে অভিষিক্ত করিতে চাই । আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এষিদের অধীনস্থ শাসনকর্তা অর্থাৎ নওমান বশির (রাজিঃ)-এর পশ্চাতে জুমার মমাব্ পড়া ■ ছাড়িয়া দিয়াছেন । কারণ, আমরা এমামতের 'মস্তহক্' (হকদার—অধিকারী) আপনাকে এবং আপনার 'নায়েব' (প্রতিনিধি) দিগকে মনে করি । ”

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নিকট মক্কার এই 'মজমুনের' (মন্দের) পত্র ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল । ইহাতে তাঁহার মনে কুফা-বাসীদিগের প্রতি বিশ্বাস জন্মিল । তিনি অবশেষে এই কর্তব্য অবধারণ করিলেন যে, প্রথমে আমার একজন প্রতিনিধি কুফায় পাঠান উচিত । তদনুসারে তিনি স্বীয় 'চাচ্চাযাদ ভাই' (পিতৃব্যপুত্র) মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন । ইনি হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ আকিল (রাজিঃ)-এর পুত্র—যিনি ভ্রাতা খলিফা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সহিত মনোবাদ করিয়া আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মোছাহেব ও অন্ততম মন্ত্রী পদ লাভ করিয়াছিলেন ; আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর নিকট হইতে তিনি উচ্চ বৃত্তি লাভ করিতেন । সম্ভবতঃ পিতার মৃত্যুর পর ইহারা মদীনায চলিয়া আসিয়াছিলেন ; আর বর্তমান সময়ে ইনি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মক্কার আগমন করিয়াছিলেন । এমাম ছাহেব (রাজিঃ), ভ্রাতা মোছলেম (রাজিঃ)-কে ফরমাইলেন, ভ্রাতাঃ ! আপনি আমার প্রতিনিধি রূপে কুফায় যান ; এবং গুপ্তভাবে

পাক পাণ্ডিত্য (৮৮৬) এমাম হোছেন ।

গমন পূর্বক সজোপনে গিয়া সেখানে বাস করুন ; আর আমার নামে লোকদিগের নিকট হইতে বয়স্বেত গ্রহণ করিতে থাকুন । যে সকল লোক আপনার হস্তে আমার নামে বয়স্বেত করিবে, তাহাদের সংখ্যা ও তন্মধ্যে প্রধান প্রধান লোকের নামের তালিকা, পত্রযোগে আমার নিকট পাঠাইবেন । আপনি আপনাকে গোপন রাখিতে বিশেষ রূপে চেষ্টা পাইবেন । আর বাহারা বয়স্বেত করিবে, তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন, আমি যে পর্যন্ত সেখানে গিয়া না পঁহছি, তৎকাল পর্যন্ত যেন তাহারা কোনও রূপ যুদ্ধ-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত না হয় । তদনুসারে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) বাহাতে জানিতে না পারেন, এইরূপ সতর্কতার সহিত হজরত মোছলেম (রাজিঃ) কুফা অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে গিয়া তাঁহার মনে এমন এক ভাবের উদয় হইল যে, তিনি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে পত্র লিখিলেন, ভ্রাতঃ ! আমাকে এই কার্যের পরিণাম ভাল বোধ হইতেছে না ; আপনি আমাকে কমা করুন ; আমার পরিবর্তে অন্য কোন ও লোককে কুফায় পাঠাইয়া দিন । পত্রোত্তরে এমাম ছাহেব (রাজিঃ) লিখিলেন, আপনি ‘বোয়্দেলী’ (সাহস হীনতা—কাপুরুষতা) পরিহার করিয়া কুফায় গমন করুন । অগত্যা হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল কুফায় রওয়ানা হইলেন । তিনি কুফায় পঁহছিয়া মোখতার-বিন্-ওবেদার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ ‘শইয়ানে আলী’ (হজরত আলীঃ [কঃ—ওঃ]-এর ভক্ত মণ্ডলী)-এর মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়াতে, দলে দলে লোক আসিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নামে, হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়স্বেত হইতে লাগিল । প্রথম দিনেই ১২ হাজার লোক বয়স্বেত করিল । হজরত মোছলেম (রাজিঃ), হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে মঙ্গল মতে কুফায় পঁহছার সংবাদ সহ কুফাবাসিগণের বয়স্বেত করিবার অবস্থা লিখিয়া পাঠাইলেন ; এবং

ইহাও লিখিলেন যে, প্রথম দিনেই ১২ হাজার কুফাবাসী আপনার নামে আমার হস্তে বয়্য়েত করিয়াছে ; তন্মধ্যে ছোলতান-বিন্-ছরদ, মছিব-বিন্-নাজিয়াঃ, রকাতাঃ-বিন্-শদাদ, হানী-বিন্-রুফাঃ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক সকলও আছেন। কয়েছ ও আবদুর রহমান নামক দুই ব্যক্তি এই পত্রখানি লইয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর খেদমতে মক্কা শরীফে গমন করিল। এই পত্র পাঠ করিয়া হজরত এমাম হোছেন আলারহেচ্ছালাম বড়ই আনন্দিত হইলেন ; এবং পত্র বাহক দ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কুফাভিমুখে রওয়ানা করিয়া দিলেন ; তৎসঙ্গে হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-কে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমি অতি সত্বরেই কুফায় পঁহুছিতেছি। এক্ষণে হজরত এমাম হোছেন আলারহেচ্ছালামের মনে এই ধারণা উপস্থিত হইল যে, বস্রায় ও ওয়ালেদ মাজেদ মরহুমের বহুসংখ্যক ভক্ত এবং অনুরক্ত লোক আছে ; তাহারাও অবশ্যই আমার নামে বয়্য়েত করিবে। তদনুসারে স্বীয় একজন 'মোয়াতামদ' (বিশ্বস্ত) লোক, বস্রায় আখফ-বিন্-মালেক এবং বস্রায় অশ্রাফ 'শোরকার' (সম্রাট লোকের) নিকট পত্রসহ পাঠাইলেন। এই সকল পত্রে লিখিত ছিল, আমার নামে বয়্য়েত করিয়া আপনাদিগকে অনতিবিলম্বে কুফায় পঁহুছান চাই।

কুফায় যখন মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর পঁহুছার লোকদিগের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণের সংবাদ সাধারণ ভাবে সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল, তখন এষিদ-ভক্ত কুফাবাসী আবদুল্লাহ-বিন্-মোছলেম আল-খজরমী, শাসনকর্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হে আমির ! খলিফার কাজে এরূপ 'ছুছ্তি' (শৈথিল্য) প্রদর্শন করা উচিত নহে। আজ কয়েক দিন হইল, মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) কুফায় আসিয়া লোকদিগের নিকট

হইতে (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর নামে খেলাফতের বয়্য়েত গ্রহণ করিতেছেন, আপনার পক্ষে কর্তব্য এই যে, মোছলেম (রাজিঃ)-কে কতল করেন, কিংবা বন্দী করিয়া খলিফা এমিদের নিকট পাঠাইয়া দেন। আর বাহারা বয়্য়েত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করেন। উত্তরে শাসনকর্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) বলিলেন, ঐ সকল লোক যে কার্য্য আমা হইতে গোপন রাখিয়া করিতেছে, আমি তাহাদের সেই কার্য্য প্রকাশ করা 'মোনাছেব' (কর্তব্য) বলিয়া বোধ করি না। যে পর্য্যন্ত তাহারা প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ করিবার ■■■ অগ্রসর না হয়, তত্কাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে আক্রমণ করিব না। আবদুল্লাহ্ এই কথা শুনিয়া শাসনকর্তার দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত মর্মে একখানি পত্র এমিদকে লিখিল :—

“ মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) কুফায় আসিয়া (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর নামে লোকের নিকট হইতে বয়্য়েত গ্রহণ করিতেছেন ; আর বহুসংখ্যক লোক তাঁহার হস্তে বয়্য়েত করিতেছে। (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ) ও সম্বরে কুফায় আসিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শাসনকর্তা নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ) এ বিষয়ে বড়ই দুর্বলতা প্রকাশ করিতেছেন। আপনি যদি বেলায়েতে কুফাঃ (কুফাঃ প্রদেশ) স্বীয় আয়ত্তাধীনে রাখিতে চান, তবে কোনও 'যবরদস্ত' (ক্ষমতাশালী) গবর্ণর কুফায় পাঠাইয়া দিন ; সেই শাসনকর্তা আসিয়া যেন মোছলেম (রাজিঃ)-কে 'গেরেফ্-তার' (বন্দী) করেন, এবং লোকদিগের বয়্য়েত 'ফেছ্-ক' (বাতিল) করিয়া দেন। আর (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-কে কুফায় প্রবেশ করিতে বিশেষ ভাবে বাধা প্রদান করেন। এই কার্য্যে যদি আপনি

বিলম্ব করেন, তবে কুফা আপনার হস্ত-বহির্ভূত হইল বলিয়া মনে করিবেন। ”

এই মর্শ্বের পত্র যেমারা-বিন্-রোত্বাঃ ও আবি-ময়্যিতও এষিদকে লিখিয়া ছিল। এই সকল পত্র পাঠ করিয়া এষিদ নিতান্ত ‘পেরেশান’ ও চিন্তাকুল হইল। ছরজুন নামক হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর একজন ‘আবাদ-করদাঃ’ (মুক্তি প্রাপ্ত) ক্রীত দাস ছিল। সে অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিল বলিয়া, হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) ও কোন গুরুতর ও পেচিদাঃ (জটিল) ব্যাপারে তাহার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং অনেক গুরুতর বিষয়ে উহার পরামর্শ গ্রহণে ‘ফায়দাঃ’ (উপকার)ও লাভ করিতেন। ছরজুনকে অনেকে “রুমী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লোকটি পূর্বে রোমক খৃষ্টীয়ান ছিল। যাহা হউক, এষিদ পিতার সেই বিশ্বস্ত ■ হিতাকাঙ্ক্ষী মুক্ত দাসকে ডাকিয়া কুফা নিবাসী আবদুল্লা-বিন্-হয্রমীর পত্রখানি দেখাইল। এস্থলে একথাও উল্লেখ যোগ্য যে, এষিদ, যেমাদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানের উপর সর্বদাই নারাজ ছিল। যেমাদের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ওবায়দুল্লাহর প্রতিও সে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেমাদকে আমীর হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) বস্তার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এষিদ ‘এরাদা’ (ইচ্ছা) করিয়াছিল যে, ওবায়দুল্লাহকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোনও ব্যক্তিকে বস্তার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিবে। এক্ষণে কুফা হইতে যখন এই ভীতিপ্রদ অমঙ্গল জনক সংবাদ আসিল, তখন এষিদ পূর্বোক্ত ছরজুনের নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, এ সময় এরাক প্রদেশ আপনার হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি আপনি ছুবে এরাক রক্ষা করিতে চান, তবে ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেমাদ ব্যতীত এসময় আপনাকে কেহ সাহায্য

করিতে পারে না । আমি জানি যে, আমার এই পরামর্শ আপনার পক্ষে বিরক্তি-জনক হইবে, কিন্তু ওবায়দুল্লাহ্ ব্যতীত আর যাহাকেই না কেন আপনি এরাকের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন, সে এরাক কিছুতেই [redacted] করিতে পারিবে না । সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে এই পরামর্শও দিতেছি যে, যেরূপ আপনার পিতা হজরত মোবিয়া (রাজিঃ), ওবায়দুল্লাহর পিতা যেমাদকে কুফা এবং বস্রা উভয় ছুবার (প্রদেশের) শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন ; আপনিও সেই প্রকার ওবায়দুল্লাহ্কে উপরোক্ত উভয় বেলায়তের (প্রদেশের) শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করুন । বস্রার জন্য কোনও নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই । এষিদ ছরজুনের পরামর্শ শুনিয়া কিছুকাল চূপ করিয়া থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল । তৎপর “ ফওরান ” (তৎক্ষণাৎ) ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেমাদের নামে নিম্ন-লিখিত মর্মে ‘ইকুমনামা’ (আদেশ-লিপি) লিখাইয়া পাঠাইল :—

“ আমি বস্রার সঙ্গে কুফাঃ ‘বেলায়েত’ (ছুবা বা প্রদেশ)ও তোমার শাসনাধীনে প্রদান করিলাম । এক্ষণে তোমার কর্তব্য এই যে, এই আদেশ-লিপি পৌছিবামাত্র বস্রায় কাহাকেও স্বীয় ‘নারেব’ (প্রতিনিধি) নিযুক্ত কর, এবং অনতিবিলম্বে কুফায় উপস্থিত হও । সেখানে মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) আসিয়া, এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর [redacted] বস্রয়েত লইতেছে, উহাকে ধরিয়া বন্দী কিংবা ‘কতল’ (হত্যা) কর ; আর যাহারা উহার হস্তে ‘বস্রয়েত’ করিয়াছে, যদি সেই বস্রয়েত ‘ফেছ্-খ’ (তদ) না করে, তবে তরবারির দ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন কর । এইরূপে সর্ব প্রকার ‘খৎরাঃ’ (আশঙ্কা নিবারণের বন্দোবস্ত কর । ”

“ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেমাদের সম্পূর্ণ ‘একিন’ (বিশ্বাস—ধারণা) ছিল যে, এষিদ আমাকে বস্রার শাসনকর্তৃত্ব ‘হইতে মায়যুল’ (পদচ্যুত) ও

‘বরতরফ্’ না করিয়া ছাড়িবে না । উপরোক্ত পত্রখানি পড়িয়া দিকে সে ‘হয়রান’ (বিস্ময়াবিষ্ট), এবং অন্য দিকে ‘রজ্জিদাঃ’ (ছঃখিত)ও হইল । কারণ, তাহার মনে এই আশঙ্কারও উদয় হইয়াছিল যে, এষিদি এই বাহানায় আমাকে বন্দী হইতে স্থানান্তরিত করিতে চায় । তবুও সে ঐ আদেশ পালন করাই কর্তব্য বলিয়া মনে করিল । তদনুসারে স্বীয় ভ্রাতা ওছমান-বিন্-যেয়াদকে বন্দায় স্বীয় ‘কায়েম-মোকাম’ (স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্ত করিয়া, আগামী দিবস কুফায় রওয়ানা হইবার সঙ্কল্প করিল । ইতিমধ্যে মন্যর-বিন্-আল্ হারেছ দৌড়িয়া উহার নিকট আসিল, আর বলিল (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (কঃ—ওঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি এখানে আসিয়াছে, এবং আপনার অজ্ঞাতসারে গোপন ভাবে লোকের নিকট হইতে (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর অস্ত্র বস্ত্রের গ্রহণ করিতেছে । ওবায়দুল্লাহ্ এই সংবাদ পাইয়া ধোকা প্রদান পূর্বক, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর প্রেরিত ‘কাছেদ’ (দূত বা গুপ্তচর)-কে গেরেফ্-তার করিল ; এবং পরদিন নগরবাসীদিগকে সমবেত করিয়া নিম্ন-লিখিত মর্মে এক বক্তৃতা প্রদান করিল :—

“(হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর এক কাছেদ বন্দায় আসিয়াছে ; এবং অনেক লোকের নামে ‘খতুত্’ (চিঠি-পত্র) আনিয়াছে । আমি ঐ কাছেদকে গেরেফ্-তার করিয়াছি । বন্দায় যে যে লোকের নামে চিঠি-পত্র ও ‘পয়গাম’ (সংবাদ) আনিয়াছে, উহার নিকট হইতে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়াছি । আর যে যে ব্যক্তি উহার হস্তে বস্ত্রের গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নামের ‘ফেহরলু’ (তালিকা) ও তৈয়ার করিয়াছি । তোমরা একথা বেশ অবগত আছ যে, আমি যেয়াদ-বিন্-আবু-ছুফিয়ানের পুত্র । মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ), কুফায় আসিয়াছে, আমি এক্ষণে কুফায় যাইতেছি ; সেখানে মোছলেম-

বিন্-আকিল (রাজিঃ) ■ যে সকল লোক তাহার হস্তে বন্ধ্যত করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই 'কতল' (হত্যা) করিব । আর যদি সমগ্র কুফাবাসী বন্ধ্যত করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সকলকেই হত্যা করিব, কাহাকেও ছাড়িয়া দিব না । তোমাদের সঙ্গে অধুনা এই 'রেয়ায়েত' (অনুগ্রহ প্রদর্শন) করিতেছি যে, (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর কাছেদ ব্যতীত আর কাহাকেও কিছু বলিব না ; কিন্তু আমার এখান হইতে যাওয়ার পর যদি কেহ কণ্ঠ হেলায় (কাণ নাড়ে), তবে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না । ■

এই বক্তৃতা প্রদানের পর সে, (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর কাছেদকে সেখানে আনাইল ; এবং সেই সমবেত নগরবাসীদিগের সমক্ষেই তাঁহাকে কতল করিল । এই শোচনীয় ব্যাপারে কেহ উচ্চ-বাচ্য বা আহা উহ করিল না । এই অমুষ্ঠানের পর সে নিশ্চিন্ত হইয়া কুফাভিমুখে রওয়ানা হইল । ওদিকে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কা শরীফে থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, বঙ্গাতেও আমার নামে বন্ধ্যত গ্রহণ করা হইতেছে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বঙ্গায় তাঁহার প্রেরিত কাছেদ অতি শোচনীয় ভাবে নিহত হইলেন । ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ কাদেছিয়ায় পহুছিয়া, স্বীয় সঙ্গীয় সেনাদলকে সেখানে রাখিয়া, স্বয়ং স্বীয় পিতার 'আযাদ করদাঃ' (স্বাধীনতা প্রদান করা—মুক্ত) গোলামকে সঙ্গে লইয়া একটি উষ্ট্রে আরোহণ পূর্বক দ্রুতগতি কুফাভিমুখে যাইতে লাগিল, এবং মগ্-রেব ও এশার নমাযের মধ্যবর্তী সময়ে কুফা শহরে প্রবেশ করিল । ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ হেজাযী আমামা মস্তকে বাধিয়া ছিল । কুফাবাসিগণ হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ভক্তগণের প্রভাব নগরে এত বাড়িয়া গিয়াছিল

যে, শাসনকর্তা নওয়ান-বিন-বশির (রাজিঃ) সন্ধ্যার পরফণেই স্বীয় 'দেওয়ান খানার' (দরবার গৃহের) 'আহ-তার' (সীমা বেটনীর) সদর দরওয়াজা (গেট) বন্ধ করিয়া দিতেন, আর স্বীয় খাছ খাছ (বিশিষ্ট) বন্ধুদিগকে লইয়া 'মজলোছ গরম' করিতেন । দারদেশে গোলাম (ক্রীত দাস) এই উদ্দেশ্যে বসাইয়া রাখিতেন যে, প্রত্যেক আগন্তুক লোকের নাম ঠিকানা জানিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত লোক বোধ করিলে দরওয়াযাঃ খুলিয়া ভিতরে যাইতে দেয়, আর প্রবেশের অযোগ্য বোধ করিলে দ্বার খুলিয়া না দেয় । ওবায়দুল্লাহ-বিন-যেয়াদ যখন কুফায় প্রবেশ করিল, এবং লোকেরা হেজাযী আমামা পরিহিত উষ্ট্রারোহীকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, তখন ওবায়দুল্লাহর উট যে দিক দিয়া যাইতে লাগিল, সেই দিক হইতেই "আচ্ছালানো আল্লাহ্-ক্বা-এয়া এব্-নে রছুলোলাহ্" এই পবিত্র ধ্বনি উথিত হইতে লাগিল । ওবায়দুল্লাহ উষ্ট্রারোহণে সরকারী 'দেওয়ান খানাঃ' (শাসনকর্তার বাসগৃহ বা দরবার গৃহ) পর্যন্ত পহুঁছিয়া দেখিল, দরওয়াযাঃ বন্ধ রহিয়াছে । ওবায়দুল্লাহ দরওয়াযাঃ খট্ খটাইল (দ্বারে করাঘাত করিল বা দরওয়াযার কড়া নাড়িল), কিন্তু মুখে কোন কথা বলিল না । শাসনকর্তা নওয়ান-বিন-বশির (রাজিঃ) স্বীয় বন্ধুবর্গকে লইয়া গৃহের ছাদে বসিয়াছিলেন, তিনি দ্বারের করাঘাত শব্দ শুনিয়া ছাদের কেনারে গমন করিলেন, এবং হেজাযী পরিচ্ছদধারী ওবায়দুল্লাহকে দেখিতে পাইলেন । তখন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) কুফায় আগমন করিবেন বলিয়া লোকেরা তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল ; তিনি ওবায়দুল্লাহকেই হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিয়া মনে করিলেন, এবং তদনুসারে তিনি উপর হইতে বলিলেন, "এয়া এব্-নে রছুলোলাহ্ ! আপনি 'ওয়াপছ' (ফেরত) চলিয়া যান, এখানে 'ফেৎনা' (বিপ্লব) উপস্থিত করিবেন

না ; এবিধ কখনও আপনাকে কুফা ছাড়িয়া দিবে না । ” নওমান-বিন্-বশির (রাজিঃ)-এর যে সকল বন্ধু ছাদের উপর বসিয়াছিলেন, তাহারা বলিলেন, আপনি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর প্রতি ঈদৃশ ‘বে-মরওতি’ (শিষ্টাচারের বিরুদ্ধাচরণ) করিবেন না ; কম পক্ষে দরওয়াযাঃ খুলিয়া তাহাকে গৃহের ভিতরে আসিতে দিন ; তিনি ‘ছফর’ (প্রবাস—মোছাকেরী) হইতে সোজামুজি আপনার গৃহে ‘মেহমান’ (অতিথি) রূপে উপস্থিত হইয়াছেন । নওমান (রাজিঃ) বলিলেন, আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, লোকে একথা বলিবার সুযোগ লাভ করে যে, নওমানের শাসনকর্তৃত্ব কালে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে কুফায় ‘কতল’ (নিহত—শহীদ) করা হইয়াছে । ইত্যবসরে ওবায়দুল্লাহ্ মত্তকের আমাখা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘কম-বখ্ত’ (হতভাগ্য) দরওয়াযাঃ ত খোল । ওবায়দুল্লাহর আওয়ায শুনিয়া সকলে উহাকে চিনিতে পারিল, এবং তাড়াতাড়ি দরওয়াযাঃ খুলিয়া দিয়া সকলে এদিক-ওদিক সরিয়া পড়িল । ওবায়দুল্লাহ্ ভিতরে প্রবেশ করিবার কিছুকাল পরেই তাহার সৈন্যদল কুফা শহরে আসিয়া প্রবেশ করিল । সঙ্গে সঙ্গেই হজরত মোছলেম (রাজিঃ) সংবাদ পাইলেন যে, ওবায়দুল্লাহ্ সসৈন্তে কুফায় উপস্থিত হইয়াছে । তিনি যে গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন, ও সাধারণতঃ সকলে যে গৃহ জানিত, তিনি সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক হানী-বিন্-য়কযার গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ঐ সময়ে পর্যন্ত হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে যাহারা বস্য়েত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ১৮ হাজার পর্যন্ত উঠিয়াছিল । ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ পরদিন নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে নিম্ন-লিখিত মর্মে একটি বক্তৃতা প্রদান করিল ; এষিদের যে ‘হুকুমনামাঃ’ (আদেশ-লিপি) ব্যাখ্যা তাহার নিকট পৌছিয়াছিল, তাহাও পড়িয়া শুনাইল, এবং বলিল :—

“তোমরা আমার পিতা যেহাদ-বিন্-আবি ছুফিয়ানকে খুব ভালরূপেই জান। আর তোমাদের ইহাও জানা আছে, তিনি কিরূপ রাজনীতি বিশারদ মহা পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমার মধ্যেও পিতার সর্বপ্রকার ‘আদাত’ (শক্তি ও গুণ) বিদ্যমান আছে। তোমরা আমাকেও বিশেষ ভাবে জান; আর আমিও তোমাদের প্রত্যেকের নাম জানি; এবং সকলের গৃহ ও মহাল্লার সন্ধান ও রাখি। আমার নিকট কোনও ‘চিয্’ (বস্তু) তোমরা গোপন রাখিতে পার না। আমি ইহাও চাই না যে, কুফা নগরে শোণিত স্রোত প্রবাহিত, এবং তোমাদিগের হত্যা সাধন করি। তোমরা (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ) এর নামে, মোহলেম-বিন-আকিল (রাজিঃ)-এর হস্তে বর্ষয়েত করিয়াছ; আমি এই শর্তের উপর তোমাদিগকে ‘আমান’ (শাস্তি) দিতেছি যে, তোমরা পূর্বোক্ত বর্ষয়েত ভঙ্গ কর; আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে, তাহাকে কেহ স্ব-গৃহে স্থান দিবে না। যদি আশ্রয় দাও, তবে প্রত্যেক আশ্রয় দাতাকে তাহার গৃহের দ্বারদেশে করা যাইবে।”

ইহার পর ওবায়দুল্লাহ্ সকলের নিকট জানিতে চাহিল যে, মোহলেম (রাজিঃ) কোথায় আছেন; কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান বলিয়া দিল না। ইহার পর ওবায়দুল্লাহ্ স্বীয় ‘জাছুছ’ (গুপ্তচর)-দিগের দ্বারা জানিতে পারিল যে, তিনি হানী-বিন্-য়ক্কার গৃহে গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ওবায়দুল্লাহ্, ময়কল নামক তমিমের একজন ‘আযাদ করদাঃ’ (মুক্ত) ক্রীতদাসকে (যাহাকে কুফাবাসী কোনও লোকই চিনিত না) ডাকিয়া, ৩০০০ দরহমের একটি ‘ডোড়া’ (থলে) তাহার হাতে দিয়া বলিল, তুমি অমুক মহাল্লায় হানী-বিন্-য়ক্কার গৃহে গমন কর, হানী-বিন্-য়ক্কার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইলে তুমি তাহাকে বলিবে, আপনার সঙ্গে আমার

কিছু গোপনীয় কথা আছে । যখন তাহার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহাকে বলিবে, বস! নগরবাসী অমুক অমুক ব্যক্তি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, আর তাঁহারা এই ৩০০০ তিন হাজার দরহম আমাকে এই বলিয়া দিয়াছেন যে, যাও, তুমি কুফায় গমন পূর্বক এই দরহম গুলি হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-কে পঁছাইয়া দাও ; আর তাঁহাকে বল, আমাদের নিকট মক্কা শরীফ হইতে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের পত্র আসিয়াছে, তিনি আমাদের লিখিয়াছেন, তোমরা অমুক তারিখে কুফায় পঁছিয়া যাও, আমি ঐ তারিখে নিশ্চয় কুফায় পঁছিব । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা সকলেই ঐ নির্দিষ্ট তারিখে, হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের সঙ্গে একত্রে কুফায় প্রবেশ করিব । এই ৩ হাজার দরহম পাঠাইতেছি, আপনি ইহা আমাদের নজর স্বরূপ গ্রহণ করিবেন ; এবং প্রয়োজনীয় কার্যে খরচ-পত্র করিবেন । অতএব আপনি (হানী) আমাকে হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর নিকট পঁছাইয়া দিন ; আমি এই সকল 'পয়গামাত' (সংবাদ) এবং দরহম গুলি তাঁহার খেদমতে পঁছাইয়া দিব ; এবং এখনই বস্তায় চলিয়া যাইব । কারণ, এখানে যেসাদ কুফায় পঁছিয়াছে ; সে আমাকে চেনে ; সুতরাং সে জানিতে পারিলে আমার ধৃত ও বন্দী হইবার আশঙ্কা আছে । এখানে যেসাদ বদনেহাদের এই উপদেশানুসারে ময়কল দরহমের থলিটি লইয়া হানীর গৃহে গিয়া পঁছিল । তিনি তখন গৃহের দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন ; ময়কলের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে হজরত মোছলেম (রাজিঃ) এর খেদমতে লইয়া গেলেন । হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ময়কলের কপটতা পূর্ণ কথা শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক, মুদ্রার থলিটি গ্রহণ করিলেন ; এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন ।

ময়কল স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া সোজামুজি ওবায়তুল্লাহর নিকট গিয়া পহুছিল ; এবং বলিল, আমি দরহমের খণ্ডটি মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর হস্তে দিয়াছি ; আর তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তাও বলিয়া আসিয়াছি ; তিনি হানীর গৃহেই আছেন। ওবায়তুল্লাহ-বিন্-যেয়াদ তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হানীকে ডাকাইয়া আনিল, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মোছলেম (রাজিঃ) কোথায় আছেন ? হানী বলিলেন, তাহা আমি জানি না। তখন ওবায়তুল্লাহ ময়কলকে ডাকিয়া বহু লোকের সম্মুখে উহার বর্ণনা শুনাইল। তখন হানী ‘শরমেন্দা’ (লজ্জিত) হইয়া বলিলেন, হাঁ, হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) আমার গৃহে ‘পানাহ্-গুধিন’ (আশ্রয় গ্রহণ করিয়া) আছেন ; কিন্তু আমি নিজের এই ‘বে-য়েযতি’ (অবমাননা) ‘বরদাশ্-ত্’ (সহ) করিতে পারি না যে, আমি তাঁহাকে তোমার হস্তে ‘ছোপর্দ’ (সমর্পণ) করি। ওবায়তুল্লাহ তখন তাঁহাকে ‘গেরেফ্তার’ (বন্দী) করিল ; শহরে এই জনরব রাষ্ট্র ভইয়া পড়িল যে, ওবায়তুল্লাহ হানীকে ‘কতল’ (হত্যা) করিয়াছে। হানী-বিন্-য়োরুয়ার বাড়ীর মহিলাগণ এই সংবাদ শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) এই হৃদয় বিদারক ব্যাপার দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; তিনি তৎক্ষণাৎ ‘শমশের’ (তরবারি) হস্তে ধারণ পূর্বক হানীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ঐ সকল লোককে আহ্বান করিলেন, যাহারা তাঁহার হস্তে বয়্য়েত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৮ হাজার কুফাবাসী হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নামে ‘বয়্য়েত’ করিয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার আহ্বানে মাত্র ৪০০০ যোদ্ধ-পুরুষ সমবেত হইল। হজরত মোছলেম (রাজিঃ) অবশিষ্ট লোকদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা প্রত্যেকেই উত্তর প্রদান করিল যে, আমাদিগের নিকট হইতে

বয়স্ক গ্রহণকালে এই ‘একরার’ (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, যে পর্য্যন্ত হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এখানে আগমন না করিবেন, ততাবৎ কাল পর্য্যন্ত বেন আমরা কাহারও সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হই । তাঁহার আগমন কাল পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত । কিন্তু হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) গুপ্ত স্থান হইতে একান্ত স্থানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, একদল যোদ্ধাপুরুষ ও যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তিনি আর আত্ম-গোপন করিতে পারিতেছিলেন না ; বিশেষতঃ তদীয় আশ্রয়-দাতা হানীর পরিবার বর্গের ক্রন্দন ও আর্তনাদে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল ; হাশেমী শোণিত তাঁহার ধমনীতে ‘জোশ্’ মারিতেছিল ; তিনি ঐ চারি হাজার সৈন্য সহ ধাওয়া করিয়া ‘দারুল এমারতে’ (শাসনকর্তার প্রাসাদে) ওবায়দুল্লাহ্ কে গিয়া ‘মহাছেরা’ (অবরোধ) করিলেন । ওবায়দুল্লাহ্ তখন দারুল এমারতে ৩০।৪০ জন লোকের সঙ্গে বসিয়াছিল । তাহারা গৃহের ছাদে চড়িয়া অবরোধকারীদিগের প্রতি তীর বর্ষণ করিতে লাগিল । ইত্যবসরে আক্রমণকারী ও অবরোধকারীদিগের আত্মীয়-স্বজন সেখানে আসিয়া হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর সাহায্যকারী যোদ্ধাপুরুষদিগকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, তোমরা কেন আপনাদিগকে ‘হালাকতে’ (ধ্বংসপথে) নিপাতিত করিতেছ ? এবল পরাক্রান্ত খলিফীয় সৈন্যদিগের হস্তে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য । এই কথা শুনিয়া সেই আক্রমণকারী কুফী যোদ্ধাপুরুষগণ আস্তে আস্তে ছত্রভঙ্গ হইয়া এদিক ওদিকে সরিয়া পড়িল । হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মাত্র ৩০।৪০ জন লোক রহিয়া গেল । এই অবস্থা দর্শনে বেগতিক দেখিয়া তিনিও ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন ; ক্রমে সেই ৩০।৪০ জন

লোক ও পলায়ন করিল । তিনি নিরুপায় হইয়া জনৈক কুফাবাসীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার ■■■ ওমরু-বিন্-জরীর মথ্বুমীকে কতিপয় যোদ্ধৃপুরুষের সঙ্গে পাঠাইয়া দিল । হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) উপায়াস্তর না দেখিয়া নিকোষিত তরবারি হস্তে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । ওমরু-বিন্-জরীর তদর্শনে বলিল, আপনি কেন অনর্থক নিজের জীবন নষ্ট করিতেছেন ? আপনি আমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করুন, আমি স্বীয় ‘বেম্বাদারী’তে আপনাকে আমার হস্তে ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের নিকট লইয়া যাইব ; আর আপনার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে, আপনার জীবন রক্ষা করাইয়া দিব । তচ্ছবণে হজরত মোছলেম (রাজিঃ) তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া, স্বীয় হস্ত উহার হস্তে অর্পণ করিলেন ; সে হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-কে ওবায়দুল্লাহ্ নিকট লইয়া গেল । ওবায়দুল্লাহ্ হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-কে ঐ প্রকোষ্ঠে বন্দী করিল—যে প্রকোষ্ঠে ইতিপূর্বে হানী-বিন্-য়োকুয়াঃকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল । সে রাত্রি ত ঐ ভাবে অতিবাহিত হইল ; পর দিবস বয়স্নেতকারীদিগের ১০ হাজার যোদ্ধৃপুরুষ সমবেত হইয়া ওবায়দুল্লাহ্ বাসগৃহ—অর্থাৎ শাসন-কর্তার রাজপ্রাসাদ গিয়া অবরোধ করিল ; এবং হজরত মোছলেম ও হানীকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত দাবী করিল ; আর বলিতে লাগিল, যদি ইচ্ছা পূর্বক তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তবে ত ভালই, নচেৎ আমরা বলপূর্বক তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া লইব । ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ তদর্শনে স্বীয় লোকদিগের প্রতি আদেশ করিল, মোছলেম (রাজিঃ) ও হানীকে ছাদের উপর লইয়া গিয়া সমবেত লোকদিগের সম্মুখে ‘কতল’ (হত্যা) কর । তদনুসারে অনতিবিলম্বে এই দুই জন ধর্মবীরের হত্যা সাধন করা হইল । এই হৃদয় বিদারক ভীষণ ব্যাপার দর্শনে

সমবেত যোদ্ধৃপুরুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল । বোধ হইল, উহারা যেন এই দুইজন ধর্মবীরের হত্যা সাধন করাইবার জন্যই সজ্জিত হইয়া সেখানে আসিয়াছিল । অতঃপর ওবায়দুল্লাহ্ স্বীয় লোক-দিগকে আদেশ করিল যে, গৃহের দ্বার খুলিয়া উভয়ের দেহ 'দারে' (শূলকাষ্ঠে) লটকাইয়া দাও ; এবং তাহাদের ছিন্ন মস্তক দেমেশকে খলিফা এযিদের নিকট লইয়া যাও । তাহার আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যোপরিগত হইল ।

ওদিকে এযিদের নিকট হইতে ওবায়দুল্লাহর নামে এই মর্মের পত্র আসিল যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন, তিনি অতি শীঘ্রই কুফায় পঁহুছিবেন, তুমি খুব ভাল রূপে আপনার 'হেফাযৎ'—অর্থাৎ আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা কর । আর তাঁহার আগমনের পথে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যদল স্থাপন কর—যেন তাহারা পথিমধ্যেই এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর গতিরোধ করে, তাঁহাকে যেন কোনও ক্রমেই কুফায় প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয় ।

এস্থলে কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে প্রাধান্য যোগ্য । পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুফা নগরী তদানীন্তন মোছলেন জগতের একটি প্রধানতম সামরিক আড্ডা ছিল । এই নগরে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) স্বীয় খেলাফতের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । অধিবাসীদিগের মধ্যে বহুতর ছাহাবাঃ কারাম (রাজিঃ) এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত মোছলমান যোদ্ধৃপুরুষগণ ছিলেন । প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্বে এই কুফার পরাক্রান্ত অধিবাসিগণ তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ)-এর নিয়োজিত শৃঙ্গনকর্তাকে নগরে প্রবেশ করিতে না দিয়া ফিরিয়া যাইতে, এবং তাঁহাদের মনোনীত হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজিঃ)-কে শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইতে বাধ্য করিয়াছিল । এই কুফার পরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ



“ জমল ” যুদ্ধে মোছলেম-মাতা হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ—আঃ)-এর বশ্রাবাসী সৈন্যদিগকে শোচনীয় রূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল । আবার ইহারাই হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর সঙ্গে নানাপ্রকার ‘নাফরমানী’ ও ‘বে-আদবী’ করিয়াছিল ; কিন্তু ছফিন যুদ্ধে হজরত মোবিনা (রাজিঃ)-এর প্রবল পরাক্রমশালী শামী সেনাদলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল ; ইহাদেরই একজন সুবিখ্যাত বীরপুরুষ মালেক আশ্-তর হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর নামে জীবনোৎসর্গকারী এবং তাহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন । তিনি জীবিত থাকিলে এবং মেছেরের শাসনকর্তৃত্ব পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত । এই কুফাবাসী এক পাষাণের হস্তেই মহাবীর মহাপ্রাণ সাধক কুল-চুড়ামণি আদর্শ খলিফা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহ্ অতি শোচনীয় রূপে শহীদ হইয়াছিলেন । ইহারাই হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে নানাপ্রকার অসদাচরণ করিয়াছিল । ইহাদেরই একজন শঠ কুল-চুড়ামণি বিপ্লববাদীদিগের নেতা মোছলেম-শত্রু আবদুল্লাহ্-বিন্-ছাবার প্ররোচনায়, তাহার মন্ত্র-শিষ্য কতিপয় লোক মহামান্ব তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমান গণী (রাজিঃ)-কে শোচনীয় ভাবে শহীদ করিয়াছিল ; ইহাদেরই একদল “ খারেজী ” রূপে আবির্ভূত হইয়া মোছলমানদিগের মধ্যে ভীষণ বিপ্লব ও অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল । হজরত আলী (কঃ—ওঃ) কর্তৃক নহরওয়ানের যুদ্ধে ইহাদের নিপাত সাধন না হইলে, এই পাষাণের দল আরও নানা অনর্থ ঘটাইত । ইহারা একদিকে দুর্জয় সাহসী ও মৃত্যু-ভয় শূন্য ভীষণ বোদ্ধা ছিল, পক্ষান্তরে অতি অগ্নেতেই ভাত হইয়া পড়িত ; ইহাদের মতের কোনও দৃঢ়তা ছিল না । প্রতিশ্রুতি পালনে ইহারা অনভ্যস্ত ছিল । আবার অত্যন্ত লোভ ও স্বার্থপরতার তাহাদিগকে শয়তান ও পিশাচে পরিণত করিয়া ছিল । উপরোক্ত ঘটনা গুলিই

তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থল । যে ১৭।১৮ হাজার কুফাবাসী হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নামে, মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে বর্ষেত করিয়াছিল, যদি তাহারা আপনাদের বর্ষেত প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকিত । যদি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর প্রতি তাহাদের অহুগ্রাগ ■ কতি : অকপট হইত, তবে যে দিন ওবায়দুল্লাহ্-এবনে বেরাদ কুফার প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিন বা তাহার পর দিনই তাহার যুগপাত এবং তাহার সঙ্গীয় বন্ধ্যা হইতে আগত অন্নসংখ্যক সৈন্যবলের নিপাত সাধন করিত ; কিংবা হজরত মোছলেম বিন-মকিন (রাজিঃ) কর্তৃক প্রথম আক্রমণে কালে ওবায়দুল্লাহ্কে সদলবলে কুফার রাজ-প্রাসাদে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারিত । অবশেষে তখন ■ মোছলেম (রাজিঃ) ও হানী-বিন্ য়োকরাকে হত্যা করিল, তখনও সমাগত ১০ হাজার যোদ্ধাপুরুষ দারুল-ওমরায় প্রবেশ করিয়া সাক্ষোপাক সহ এবনে বেরাদ বদ নেহাদের যন্তক ধ্বংসাৎ করিতে পারিত । পরিণামে এষিদি প্রেরিত প্রবল সেনাদল আসিলেও, তাহাদিগকে পরাজিত এবং বিধবস্ত করিতে সক্ষম হইত । তখনও কুফায় ৫০।৬০ হাজার বিক্রান্ত যোদ্ধাপুরুষ ছিল । শামী সেনাদল যুদ্ধে তাহাদের সঙ্গে কিছুতেই ঝাটিয়া উঠিতে পারিত না । তাহারা অনায়াসে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে খেলাফৎ দেওয়াইতে সক্ষম হইত । মক্কা ও মদীনার ধর্মপ্রাণ মোছলমানগণ এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন । পারস্তাদি পূর্ব দেশের মোছলমান অধিবাসিগণ হজরত আলী (কঃ—ওঃ) এবং এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর পরম ভক্ত ছিল । কুফাবাসীর দুর্ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতায়ই মহামান্ন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম ঘটয়াছিল । ■ বিধাতার বিধান ইহাই ছিল ।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-

মক্কা শরীফ হইতে

কুফাভিমুখে যাত্রা ।

হজরত এমাম হোছেন আলারহেছালাম মক্কা-মোরাব্বা হইতে কুফা গমনের উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । যখন এবাসোপযোগী সামগ্রী-সম্ভার ঠিক হইল, এবং মক্কা এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, হজরত এমাম হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ) কুফার যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর প্রতি ‘মোহব্বত’ (ভালবাসা) ও সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকেরা তাঁহাকে এই ‘এরাদাঃ’ (সঙ্কল্প) হইতে বিরত থাকিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিলেন, আপনার কুফার গমন করা বিশেষ রূপ বিপদ জনক । প্রথমতঃ আবদুর রহমান-বিন্-হারেছ আসিয়া আরজ করিলেন, আপনি কুফা যাত্রার  পরিত্যাগ করুন । সেখানে ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-বেলাদ এরাকের শাসনকর্তা রহিয়াছে ; কুফার অধিবাসিগণ ‘লাল্চি’ (লোভী) ; খুব সম্ভবপর যে, যে সকল লোকেরা একগুণে আপনাকে তথায় আহ্বান করিয়াছে, তাহারাই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার  সময়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) তাঁহার কুফা-যাত্রার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি বস্তুত গ্রহণ করিতে এবং ‘এমারত’ (আমীরী—শাসনকর্তৃত্ব) লাভের জন্য মক্কার বাহিরে গমন করিবেন না ; আ হজরত (ছালঃ)-কে খোদাতালা ‘ছনিয়া’ ও ‘আথেরাৎ’ (ইহকাল এবং পরকাল)-এর মধ্যে একটি গ্রহণ করিবার জন্য ‘আযাদী’ (স্বাধীনতা) প্রদান করিয়াছিলেন ; তিনি ইহকালের পরিবর্তে পরকালই

‘এখ্ তেয়ার’ (গ্রহণ) করিয়াছিলেন ; আপনি খান্দানে নবুয়তের একজন, আপনি ছনিয়া তলব করিবেন না (অর্থাৎ পার্থিব প্রাধান্য লাভের দিকে অগ্রসর হইলেন না) ; আপনি স্বীয় পবিত্র ‘দামন’ (বস্ত্রের প্রান্তভাগ) পার্থিব ‘আলায়েশে’ (আবর্জনায়) ‘আলুদাঃ’ (অপবিত্র) করিবেন না ; এই কথা বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন । তদর্শনে এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও রোদন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না । নিকুপায় হইয়া হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর (রাজিঃ) প্রস্থান করিলেন । তৎপর এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর পিতৃব্য হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) আসিয়া বলিলেন, আপনি কোনও ক্রমেই মক্কা ত্যাগ করিবেন না । খানাঃ-খোদা (পবিত্র কাবাগৃহ) হইতে দূরবর্তী হইবেন না । আপনার ওয়ালেদ মাজেদ মক্কা ও মদীনা ত্যাগ করিয়া কুফায় বাস করাই পছন্দ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কুফাবাসিগণ তাঁহার সঙ্গে কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল ; অবশেষে উহারা তাঁহাকে শহীদ পর্য্যন্ত করিল । আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর (হজরত) এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর যথাসর্বস্ব কুফিগণ লুণ্ঠন করিয়া ছিল, ‘কতল্’ (হত্যা—শহীদ) করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিল ; একরূপ ক্ষেত্রে কুফাবাসিদিগের বাক্য আপনার কোনও ক্রমেই আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে । না উহাদের বয়্যেত এবং ‘কছমের’ (শপথের) কোন ভরসা আছে, না উহাদের চিঠি-পত্র বিশ্বাস বা নির্ভর যোগ্য । হজরত এব্নে আব্বাছ (রাজিঃ)-এর কথা শুনিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ফরমাইলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য ; কিন্তু ভ্রাতা মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর পত্র আসিয়াছে যে, কুফার ১২ হাজার লোক আমার নামে তাঁহার হস্তে বয়্যেত করিয়াছে ; আর ইহার পূর্বে কুফাবাসী সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দেড় শত চিঠি-পত্র

আমার নামে আসিয়াছে ; সুতরাং কোনও রূপ ভয়ের কারণ নাই ; আমার সেখানে যাওয়া একান্তই কৰ্ত্তব্য । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ) তাঁহার মতের দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কমপক্ষে আপনি এই যেমহজ্জ (হজ্জের) মাস শেষ হইতে দিন, নূতন বৎসরের প্রারম্ভে প্রবাস-যাত্রা করিবেন । হজ্জের সময় সমাগত, মোছলেম-জগতের প্রত্যেক স্থান হইতে পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পাদন জন্য দলে দলে লোকেরা মক্কা আসিতেছে, আর আপনি পবিত্রমক্কা নগরী ছাড়িয়া দূরদেশে গমন করিতে চাহিতেছেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব বোধ হইতেছে না । ইহাই ‘মোনাছেব’ (কৰ্ত্তব্য) যে, আপনি হজ্জ ‘শরীক’ হন, আর হজ্জ-প্রার্থী লোকদিগকে পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্ব ■ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে দেন, তৎপরে যদি একান্তই প্রয়োজন বোধ করেন, তবে কুফায় রওয়ানা হইবেন । তদন্তরে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, এই ব্যাপার এমন গুরুতর যে, আমি কিছুতেই বিলম্ব করিতে পারি না, আমাকে ‘ফওরান’ (এখনই) রওয়ানা হইয়া যাওয়া চাই । এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর দৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ) অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা, আপনি যদি আমার কথা না শুনে—অমরোধ রক্ষা না করেন, তবে ‘কম্ আব্ কম’ (অন্ততঃ পক্ষে—কমপক্ষে) স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না । কারণ, কুফাবাসিদিগের উপর কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না । ১২ হাজার লোক যখন আপনার নামে বর্ষয়েত্ করিয়াছে, তখন তাহাদের উচিত ছিল, এষিদের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া । ঐরূপ করিয়া এবং খাযানাঃ (রাজ-কোষ) হস্তগত করিয়া আপনাকে আহ্বান করা । কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা-পরম্পরায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, এষিদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তার

বিক্রমে উহারা কিছুই করিতে পারে না ; যখন তাহাদের হস্তে খাযানাও নাই, এবং শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করিবার শক্তিও নাই ; একপক্ষে বুঝাইতেছে যে, এযিদের অধীনস্থ ‘আমেন’ (শাসনকর্তা) উহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন পূর্বক বা প্রলোভন দেখাইয়া স্বীয় ‘হুবে মনশাঃ’ (অভিপ্রায়ানুযায়ী) যখনই ইচ্ছা, স্বীয় অনুকূলে কাজ করাইয়া লইবে— উহাদিগকে আপনাদের স্বরূপ ব্যবহার করিবে ; আর ইহাও সম্ভবপর যে, বাহারা একপে আপনাকে সাগ্রহে কুকার আহ্বান করিতেছে, তাহারাই এযিদের পক্ষাবলম্বন পূর্বক আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে । এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আপনার জীবন বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতেছে । যদি জীলোক ও বালক-বালিকাগণ আপনার সঙ্গে থাকে, তবে হজরত ওছমান গনী (রাজিঃ) বেরূপ স্বীয় ‘আহলে ও আরাল’ (স্ত্রী-পরিবার) বর্গের সম্মুখে শহীদ হইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইয়াছিল, আপনার পরিবার বর্গকেও না সেইরূপ হৃদয় বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হয় । সেইরূপ অবস্থায় শত্রু দল তাহাদিগকে বন্দী করিয়া দাস-দাসী রূপে না বিক্রয় করে ; আমার কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে । হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) যখন হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ)-এর একথায় ও স্বীয় মতের পরিবর্তন করিতে চাহিলেন না ; তখন তিনি বলিলেন, যদি আপনার হুকুমত লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আপনি আপাততঃ এমানে চলিয়া যান, সেখানে আপনার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ভক্ত লোক বিস্তর আছে ; আর উহা পার্বত্য প্রদেশ, সুতরাং শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও, আত্ম-রক্ষার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে । তদ্ব্যতীত হেজাযের আধিপত্যও আপনি খুব সহজে লাভ করিতে পারেন । কিন্তু এমাম (রাজিঃ) তাহার কোনও পরামর্শই গ্রহণ করিলেন না । অগত্যা

তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন । অবশেষে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) আসিলেন, এবং দূতের সহিত বলিলেন, আপনি কোনও ক্রমেই কুফার বাইবেন না । আপনার কুফা গমনের সকল যথন মক্কাবাসিগণ জানিতে পারিয়াছে, তখন কেহ কেহ বলিয়াছে যে, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মক্কা হইতে চলিয়া গেলে, আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) খুব সন্তুষ্ট হইবেন ; কারণ মক্কার তখন আর তাঁহার ‘রকীব’ (প্রতিদ্বন্দ্বী) কেহ থাকিবেন না । ■■■ আমি ঐ সকল ‘বদ-গোমানওয়াল’ (ভ্রান্ত বিশ্বাসকারী) লোকদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সরল ভাবে আপনাকে আরজ করিতেছি যে, আপনি মক্কার শাসনকর্ত্তৃক গ্রহণ করুন, আর আপনি হস্ত বাড়াইয়া দিন, আমি আপনার হস্তে এখনই বস্ স্নেহ করিতেছি । তদ্ব্যতীত আমি আপনার সাহায্যকারী রূপে তরবারি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেও প্রস্তুত আছি । তাঁহার কথা শুনিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, আমি প্রতিশ্রুতি-সূচক ‘এন্তেলা’ (সংবাদ) কুফার পাঠাইয়াছি, বাত্মা করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছি, এক্ষণে কোনও মতেই বাত্মা স্থগিত রাখিতে পারি না । ইহা শ্রবণে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ) ও নিরাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

অবশেষে হজরত এমাম হোছেন আলারহেচ্ছাগাম, ৬০ হিজরীর ৩রা বেলহজ্জ্ তারিখ—রবিবার দিবস, শীর্ষ পরিবার বর্গও থান্দানের (বংশের) লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । ঠিক ঐ তারিখেই হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ) কুফার শহীদ হইয়াছিলেন । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) যখন মক্কা হইতে রওয়ানা হইতে ছিলেন, তখন ওমরু-বিন্-ছরীদ-বিন্-অল্-আছ (রাজিঃ)-প্রমুখ কতিপয় মক্কাবাসী তাঁহার গতিরোধ করিতে

চাহিলেন, এবং বলিলেন—যদি আপনি আমাদের অনুরোধে যাত্রা স্থগিত না রাখেন, তবে আমরা বল পূর্বক আপনার গমনে বাধা দিব, এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিব । এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ফরমাইলেন, তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আর যুদ্ধ করিবার সাধ থাকে তা'সে উদ্দেশ্যও পূর্ণ কর ; ইহা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার সম্মুখ হইতে হটিয়া গেলেন ; এবং এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কুফাতিমুখে যাত্রা করিলেন । শেষ বিদায় প্রদান কালে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) আসিয়া বলিলেন, আমি এসময় আপনার উষ্ট্রের সম্মুখে শুইয়া পড়িতাম, আর আপনার উষ্ট্র আমাকে পদদলিত করিয়া অগ্রসর হইত ; তাহাতে যদি আপনি যাত্রার ক্ষান্ত হইতেন, তবে আমি সেইরূপই করিতাম । কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি তাহাতেও যাত্রা স্থগিত রাখিবেন না ; এবং কুফা গমনে ক্ষান্ত হইবেন না ; অতঃপর হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ) অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পরম স্নেহ-ভাজন ভ্রাতৃপুত্রকে বিদায় দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এমাম ছাহেব (রাজিঃ) মক্কা হইতে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে একটি ‘কাফেলা’ প্রাপ্ত হইলেন । এই কাফেলা এমনেক শাসনকর্তার নিকট হইতে ‘তহায়েফ্’ (উপঢৌকনাদি) লইয়া এখিদের নিকট দেমেক্ গমন করিতেছিল । তিনি এই কাফেলাঃ গেরেফ্-তার করিয়া উহা হইতে কতক সামগ্রী-সস্তার গ্রহণ পূর্বক সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । মক্কা ও কুফার মধ্যস্থিত ‘ছফাহ্’ নামক স্থানে প্রসিদ্ধ আরব কবি ফরযোকেসর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল ; তিনি কুফা হইতে আসিতেছিলেন । কবি ফরযোকেস যখন কুফা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত ওবায়দুল্লাহ্-এবনে সেরাদ কুফায় পহুঁছিয়া ছিল না ; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এই কবির নিকট কুফাবাসী দিগের মতি-গতির বিষয়

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কুফাবাসীগণের ‘দেল’ (মন) ■
 আপনার দিকে আছে ; কিন্তু তাহাদের তরবারি আপনার অনুকূলে
 ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না । এখান হইতে এমাম ছাহেব
 (রাজিঃ) আরও কিয়দূর অগ্রসর হইলে তিনি হজরত আবদুল্লাহ-বিন-
 জাফর (রাজিঃ)-এর একখানি পত্র—যাহা তিনি স্বীয় দুই পুত্র যয়োন
 ও মোহাম্মদের হস্তে মদীনা হইতে পাঠাইয়াছিলেন—প্রাপ্ত হইলেন । তিনি
 পত্রে লিখিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ ! আমি খোদার ‘ওয়াস্তাঃ’ (শপথ) দিয়া
 আপনাকে অনুরোধ করিতেছি—আপনার খেদমতে আরজ করিতেছি,
 আপনি কুফা গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্বক মদীনায়া চলিয়া আসুন, আমার
 আশঙ্কা হইতেছে যে, আপান না ‘কতল (নিহত) হইয়া যান । খোদার
 ওয়াস্তে আপনি এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিবেন না । সঙ্কে সঙ্কে মদীনার
 শাসনকর্তার একখানি পত্রও ঐ কাছের (দূত) গণ হজরত এমাম হোছেন
 (রাজিঃ)-এর হস্তে প্রদান করিলেন ; উহাতে লিখিত ছিল, আপনি
 যদি মদীনায়া আসিয়া বাস করিতে চান, তবে আপনার জন্ত ‘আমান’
 (শান্তি)—অর্থাৎ আপনি নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে এখানে বাস করিতে
 পারেন ; কিন্তু এমাম ছাহেব (রাজিঃ), ‘ওয়াপেছি’ (প্রত্যাবর্তন)
 জন্ত সম্পূর্ণ রূপে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । বরঞ্চ মোহাম্মদ ও যয়োন—
 এই ভ্রাতৃপুত্র দ্বয়কেও সঙ্কে লইয়া চলিলেন । বসাবাসী একজন লোক
 তদীয় পথ-প্রদর্শক রূপে সঙ্কে গমন করিতেছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন,
 যতশীঘ্র সম্ভব, আমাদিগকে কুফায় পঁহুছাইয়া দাও—যাহাতে আমি
 ওবায়দুল্লাহ-বিন-বেয়াদের পূর্বেই কুফায় পঁহুছিতে পারি ; কারণ কুফা-
 বাসিগণ আমার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত অবস্থায় বাস করিতেছে ।
 ঘটনাক্রমে ঠিক সেই দিনই এযিদের এই মর্মে পত্র ওবায়দুল্লাহ-বিন-
 বেয়াদের নামে কুফায় পঁহুছিল যে, তুমি নিজের ‘হেফাযত’ এর (আত্মরক্ষার)

সুবনোবস্ত কর । সম্ভবতঃ এমাম হোছেন (রাজিঃ)-মক্কা হইতে কুফাভিমুখে রওমানা হইয়াছেন ; অতএব কুফার প্রত্যেক রাস্তায়ই সৈন্ত সমাবেশ কর, যেন তাঁহাকে কোনও ক্রমেই কুফায় প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয় । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) মনে মনে এই ধারণা করিতেছিলেন যে, ভাতা মোছলেম (রাজিঃ)-এর হস্তে প্রত্যহ দলে দলে লোক ‘বয়্য়েত’ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া থাকিবে । তিনি মক্কায় থাকিয়া একই দিনে ১২ হাজার লোকের বয়্য়েত করিবার সংবাদ পাইয়াছিলেন, সুতরাং প্রায় এই এক মাস কাল মধ্যে ৫০।৬০ হাজার লোকের বয়্য়েত করার সম্ভাবনা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে । কিন্তু অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত ছিল । আবদুল্লাহ্-বিন্-মুন্নাদ ‘বদনেহাদ’ হজরত মোছলেম (রাজিঃ) হাদী-বিন্-রোহমাঃকে ‘শহীদ’ (হত্যা) করিয়া, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে বন্দী কিংবা ‘কতল’ (শহীদ) করিবার জন্য সেনা দল সুসজ্জিত করিতে ছিল । এমাম ছাহেব (রাজিঃ) আরও কয়েক দিনের পথ অগ্রসর হইবার পর আবদুল্লাহ্-বিন্-মতিনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । তিনি এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁহার গতিরোধ করিলেন, তাঁহার কুফায় গমনের কঠোর প্রতিবাদ করিলেন ; এবং মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিবার ‘কছম’ দিতে লাগিলেন । তিনি বিশেষ ভাবে বুঝাইলেন যে, আপনি এরাবাসীদিগের ‘ফেরেবে’ (‘ধোকা’—প্রতারণা-জালে) পতিত হইবেন না । যদি আপনি বনি-ওমিয়া হইতে খেলাফৎ কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করেন, তবে তাহারা নিশ্চয় আপনাকে ‘কতল’ (শহীদ—হত্যা) করিবে ; সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বনি-হাশেম, প্রত্যেক আরব ও প্রত্যেক মোছলমানকে হত্যা করিবার জন্য সাহসী হইবে । আপনি আপনাকে ‘হালাকতে’ (মৃত্যুর

কবলে) নিক্ষেপ করিয়া এছলাম, আরব ■ কোরেশদিগের ‘হোরমত’ (সম্মান) নষ্ট করিবেন না । কিন্তু হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও দ্রুতগতি কুফার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । “ হাজর ” নামক স্থানে পঁহুছিয়া কয়েছ-বিন্-মছহরের হস্তে একখানি পত্র কুফাবাসিদিগের নামে এই বলিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদের খুব নিকটে আসিয়া পঁহুছিরাছি, তোমরা আমার কষ্ট অপেক্ষা কর । কয়েছ “ কাদেছিরায় ” পঁহুছা মাত্র এব্নে যেমাদের প্রেরিত সৈন্যদল কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হইলেন । উহারা অবিলম্বে তাঁহাকে কুফায় ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেমাদের নিকট, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ঐ পত্রসহ পাঠাইয়া দিল । এব্নে যেমাদ তাঁহাকে ‘কছরে এমারত’ (শাসনকর্তার দরবার ও বাসগৃহ)-এর ছাদ হইতে নীচে নিক্ষেপ করাইল, কয়েছ সেই অত্যাচ প্রাসাদের ছাদ হইতে পতিত হইবামাত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন । পরদিন :এমাম ছাহেব (রাজিঃ) স্বীয় ‘যেযায়ী’ ভাই (দুই-ভ্রাতা) আবদুল্লাহ্-বিন্ য়েকতরকে ঐ মর্শ্বের পত্রসহ কুফাভিমুখে রওয়ানা করিলেন ; তিনিও কাদেছিরায় এব্নে যেমাদের নিয়োজিত সৈন্য দল কর্তৃক ধৃত ও কুফায় নীত হইয়া, ঐরূপ শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন ; অর্থাৎ তাঁহাকেও প্রাসাদের চূড়া হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা হইল । এই কাফেলাঃ যখন “ ছয়লবিয়াঃ ” নামক স্থানে পঁহুছিল, তখন হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) জানিতে পারিলেন যে, মোহলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-কে কুফায় কতল (হত্যা—‘শহীদ’) করা হইয়াছে । এক্ষণে একটি মাত্র লোকও তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী কুফায় নাই । এই সংবাদ শুনিমাত্র সমগ্র কাফেলায় ‘মায়ুছি’ (নৈরাশ্র) ছাইয়া পড়িল ; এবং প্রত্যাবর্তন করিবার ‘এরাদাঃ’ (সঙ্কল্প) করা হইল ; কারণ, কুফার দিকে অগ্রসর

হইতে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল যে, হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যে ছলুক' (ব্যবহার) করা হইয়াছে, এই কাফেলার সঙ্গেও ঐরূপ ব্যবহার করা হইবে । এই কথা শুনিয়া হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর পুত্রগণ বলিয়া উঠিলেন, আমরাগকে কিছুতেই প্রত্যাবর্তন করা চাই না । এক্ষণে আমরা হয় হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর 'কেছাছ' (মৃত্যুর প্রতিশোধ) গ্রহণ করিব, নচেৎ তাঁহার শ্রায়ই জীবন বিসর্জন দিব । দ্বিতীয় কথা এই যে, হজরত এমাম হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-এর অবস্থা হজরত মোছলেম (রাজিঃ)-এর মতন নহে । অর্থাৎ এমাম ছাহেবের পূর্ণ প্রভাব কুফাবাসীদিগের মধ্যে আছে ; তাঁহার প্রতি কুফাবাসীদিগের অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা রহিয়াছে ; যখন কুফাবাসিগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে ; এবং এব্নে বেরাদকে 'গেরেফ্তার' (বন্দী) করিয়া লইবে । এই কাফেলার সঙ্গে প্রথম হইতেই কয়েক শত লোক ছিল ; এবং পথিমধ্যে আরও বহুসংখ্যক লোক ক্রমশঃ যোগদান করিয়া, লোকসংখ্যা অনেক বাড়াইয়াছিল । কিন্তু ছয়লবিয়ায় পৌঁছিয়া যখন কুফার ঘটনা শুনিতে পাইল, এবং কাফেলা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে ছিল ; তখন হইতে অগ্ন্যান্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা কাফেলা হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল । কেবলমাত্র শীঘ্র 'খান্দান' (বংশীয়) ও কবিলার (সম্প্রদায়ের) লোকেরাই অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন । আর কতিপয় বিশ্বস্ত ও জীবনোৎসর্গকারী অনুচর মাত্র সঙ্গে থাকিলেন । ইহাদের সংখ্যা ৭০।৮০ জনের বেশী ছিল না । কোনও কোনও রওয়াকেতে বর্ণিত আছে যে, ইহাদের সংখ্যা ২৫০ আড়াই শত ছিল । কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাই সঠিক বলিয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত ।

কারবালার হৃদয়-বিদায়ক শোচনীয় ঘটনা ।

ওবায়দুল্লাহ্-বিন্ যেসাদ, ওমরু-বিন্-ছায়াদ-বিন্-আবিওকাহকে ‘রয়’ (এফাহান) প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া, ‘ফিলহাল’ (সম্প্রতি—উপস্থিত ক্ষেত্রে) চারি হাজার সৈন্য সঙ্গে দিয়া, মক্কাভূমির দিকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল যে, কুফার দিকে মক্কা হইতে যতগুলি রাস্তা আসিয়াছে ; ঐ সকল রাস্তায় যেন (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর সন্ধান করিতে থাকে । পাঠক ! আশ্চর্য্য মোবাস্বরার অন্ততম ছাহাবাঃ হজরত ছায়াদ-বিন্-আবিওকাহ (রাজিঃ), আঁ হজরত (ছালঃ)-এর সম্পর্কে ‘মামু’ (মাতুল) হইতেন ; আর তিনি কত বড় ধার্মিক ও কত বড় বীরপুরুষ ছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন । তাঁহারই নরাদম পুত্র ওমরুঃ “রয় = প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভের আশায় এখিদের অধীনস্থ হুর্কৃত শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেসাদ কর্তৃক হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইল । সে দুনিয়ার লোভে পরকালের পথে কণ্টক স্থাপন করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না । যাহা হউক, এব্নে যেসাদ বদনেহাদ আর এক হাজার সৈন্যকে হোর-বিন্-এযিদ-য়েতিমির নেতৃত্বাধীনেও ঐ কার্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইল । ওমরু-বিন্-ছায়াদ কাদেছিয়ায় পহুছিয়া নানা দিকে সৈন্য দল প্রেরণ পূর্ব্বক, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সন্ধান লইবার ব্যবস্থা করিল । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কিং-কর্তব্য বিমুঢ় অবস্থায় “শরাফ্” নামক স্থানে পহুছিলেন ; তৎপরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, হোর-বিন্-এযিদ এক হাজার

যোদ্ধপুরুষ সহকারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) তাহাকে দেখিয়া, অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগের আস্থানেই এখানে আগমন করিয়াছি । যদি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালনে অটল থাক, তবে আমি তোমাদের নগরে প্রবেশ করি, নচেৎ আমি যেদিক হইতে আসিয়াছি, সেইদিকে ফিরিয়া চলিয়া যাই । হোর বলিলেন, আমীর ওবারুজ্জাহ্-বিন্-যেয়াদের আমার প্রতি এই আদেশ যে, আমি সসৈন্তে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকি, এবং আপনাকে বন্দী অবস্থায় তাহার সম্মুখে উপস্থিত করি । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, এ অপমান ত আমি কিছুতেই সহ করিতে পারি না যে, আমি গেরেফ্-তার হইয়া এব্-নে যেয়াদের সম্মুখে গমন করি । এই স্থলে স্বরণ রাখা উচিত যে, যেয়াদ-বিন্-আবু ছুফিয়ানকে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) স্বীয় ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তাঁহার বংশের লোকেরা যেয়াদকে ঘৃণা করিত ; মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী (কঃ—ওঃ) তাঁহাকে হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন ; যদিও যেয়াদ হজরত আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর পবিত্র এছলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে একটি গ্রীক ক্রীত দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তবু তাহার অসাধারণ ধী-শক্তি, রাজনীতি কুশলতা ও শাসন কার্যে দক্ষতা দর্শনে তাঁহাকে বঙ্গার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । যেয়াদও ঐকার্য্যে খুব দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন । ইহার পর হজরত আলী (কঃ—ওঃ) শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলে, হজরত মোবিয়া (রাজিঃ) তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র দর্শনে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করেন ; তাঁহারই দুর্দান্ত ■ ছরাশর পুত্রের হস্তে হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) কিরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া এযিদের নামে বয়্যেত করিতে পারিতেন ? বাহা হউক, ইহার পর তিনি প্রত্যাবর্তন

করিবার ‘এরাদাঃ’ (সঙ্কল্প) করিলেন, কিন্তু হোর, এব্‌নে ষেয়াদের ভয়ে তাঁহার প্রত্যাবর্তনে বাধা প্রদান করিলেন। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের পথ রোধ করিয়া স্বীয় সৈন্ত দলসহ দণ্ডায়মান হইলেন। হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) সেখান হইতে ‘শেমাল’ (উত্তর) দিকে গমন করিতে লাগিলেন, এবং কাদেছিয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, ওমরু-বিন্-ছায়াদ এক প্রবল সৈন্ত দল লইয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেছে। হোর সসৈন্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। কাদেছিয়ার নিকটে পহুঁছিয়া হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ১০ মাইল দূরবর্তী “কারবালা” নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন; ওমরু-বিন্-ছায়াদ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং পরদিন সসৈন্তে কারবালায় গিয়া পহুঁছিল। ওমরু-বিন্-ছাদ স্বীয় সেনাদল হইতে অগ্রবর্তী হইল হজরত এমাম ছাহেব (ছালঃ)-এর শিবিরের সন্নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিল, তিনি আহ্বান শুনিয়া নিকটে উপস্থিত হইলে ওমরু-বিন্-ছাদ তাঁহাকে বলিল :—

“নিশ্চয় আপনি এযিদের ‘মোকাবেলায়’ (তুলনায়) খেলাফতের অধিকতর ‘মন্তহক্’ (হকদার) : কিন্তু খোদা তা-লার ইহা ইচ্ছা নয় যে, আপনার খান্দানে ‘ইকুমত্’ (আধিপত্য) ও খেলাফত আইসে। হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এবং হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর অবস্থা আপনার সম্মুখে সজ্জাটিত হইয়াছে। যদি আপনি এই ‘ছোলতানৎ’ ও ইকুমতের খেয়াল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে অতি সহজেই ‘আযাদ’ (স্বাধীন) অবস্থায় থাকিতে পারেন। নচেৎ আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে; আমরা আপনার গেরেফ্তারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছি।”

তদন্তরে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম ফরমাইলেন :—

“ এক্ষণে আমি তিনটি প্রস্তাব তোমার নিকট ‘পেশ’ করিতেছি ; ইহার মধ্যে যে প্রস্তাব ইচ্ছা আমার জন্ত মঞ্জুর কর । প্রথম প্রস্তাব এই যে, আমি যে দিক্ হইতে আসিয়াছি, আমাকে ঐ দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে দাও ; আমি মক্কা-মোরাক্কমান্ন গমন পূর্বক আল্লাহ্ তালার এবাদত-বন্দেগীতে আত্ম-নিয়োগ করিব । ২য়তঃ, আমাকে কোনও সীমান্ত প্রদেশের দিকে বাইতে দাও, সেখানে গিয়া আমি বিধর্ম্মাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া যাইব । তৃতীয়তঃ, তুমি আমার পথ হইতে হটিয়া যাও, আমি সোজা-সুজি দেমেশ্কে এখিদের নিকট গমন করি, সেখানে এখিদ আমার সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য নির্দেশ করে, তাহাই হইবে ।

ওমরু-বিন্-ছায়াদ এই কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইল ; আর বলিল, আমি আপনা হইতে আপনাকে কোনও পাকা উত্তর দিতে পারি না । আমি কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদকে সংবাদ পাঠাই ; আমার বিশ্বাস, তিনি অবিলম্বে আপনার তিনটি প্রস্তাবের কোনও একটি প্রস্তাব মঞ্জুর করিবেন । তৎপর ওমরু-বিন্-ছায়াদ ঐ মসদানেই সসৈন্তে শিবির সন্নিবেশিত করিল ; এবং সমস্ত ব্যাপার এব্নে যেয়াদকে লিখিয়া পাঠাইল । ৬১ হিজরীর ২রা মহররম তারিখে এমাম ছাহেব আলায়হেচ্ছালাম কারবালায় পহুঁছিয়া ছিলেন ; তৎপর দিন ওমরু-বিন্-ছায়াদ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ দিন এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ঐরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল । ওবায়দুল্লাহ্ এব্নে যেয়াদ, ওমরু-বিন্-ছাদের পত্র পাঠ করিয়া খুব সন্তুষ্ট লাভ করিল, এবং বলিল, এমাম হোছেন (রাজিঃ) যে প্রস্তাব করিয়াছেন ; তাহাতে বিপ্লবের অবসান হইবে । তিনি দেমেশ্কে এখিদের নিকট গমন পূর্বক তাঁহার হস্তে বয়্য়েত করিলে, আর কোনও খৎরাঃ (আশঙ্কা)ই বাকী থাকিবে না । কিন্তু শেগর ষিল ঘোশন ঐ সভায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল, হে আমির !

এসময় তোমার মহা সূযোগ উপস্থিত ; তুমি এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে এসময় ‘কতল্’ (হত্যা) করিলে তোমার প্রতি কোন ‘এল্‌ঘাম’ (দোষারোপ) হইবে না ; কিন্তু যদি এমাম হোছেন (রাজিঃ) এষিদের নিকট চলিয়া যান, তবে তাঁহার মোকাবেলায় তোমার কোন ‘এয্‌যত’ (সম্মান) ও ‘কদর’ (মর্যাদা—প্রতিপত্তি) অবশিষ্ট থাকিবে না । আর (এমাম ছাহেব) তোমাপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিবেন । দুর্ন্যতি শেষরের বাক্য শ্রবণে স্বার্থপর, গোরব-লিপ্সু এব্‌নে যেম্মাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইল ; সে উহার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া ওমরু-বিন্-ছায়াদকে এই মর্ম্মের পত্র লিখিয়া পাঠাইল :—

“ তোমার লিখিত ৩টি প্রস্তাবের একটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে না ; উহার কোনও প্রস্তাবই গ্রহণ যোগ্য নহে ; মাত্র একটি উপায় এই হইতে পারে যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ) আমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ‘নেয়াবতান’ (প্রতিনিধি-সূত্রে) প্রথমে আমার হস্তে বয়্‌য়েত করেন, পরে আমি তাঁহাকে স্বীয় বন্দোবস্তানুযায়ী খলিফা এষিদের নিকট রওয়ানা করিয়া দিব । ”

এই উত্তর পাইয়া ওমরু-বিন্-ছাদ হজরত এমাম হোছেন আলায়-হেচ্ছালাম কে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইল ; এবং বলিল, আমি ‘মজবুর’ (নিরুপায়) ; এব্‌নে যেম্মাদ এষিদের খেলাফতের বয়্‌য়েত প্রথমে নিজে গ্রহণ করিতে চান, আর অন্য কোনও প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে তিনি রাজী নহেন ।

হজরত এমাম হোছেন আলায়-হেচ্ছালাম, এব্‌নে যেম্মাদের পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন, এব্‌নে যেম্মাদের হস্তে বয়্‌য়েত করাপেক্ষা আমার পক্ষে যত্নাই শ্রেয়ঃ ।

এব্‌নে ছাদ এই চেষ্টায় ছিল যে, যাহাতে কোনও রূপ শোণিতপাত

ব্যতীত এই ব্যাপারের মীমাংসা হইয়া যায়। হুসু হুজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এব্নে যেমাদেব প্রস্তাবে মঞ্জুর করেন; কিংবা এব্নে যেমাদই এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ৩টি প্রস্তাবের কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে দেমেশ্কে এমাদেবের নিকট বাইতে দেন। এই সকল পত্র ব্যবহারে—প্রস্তাবের ‘এন্কার’ (অসম্মতি) ও ‘এছরায়ে’ (হঠকারিতায়—অস্বীকৃতিতে) এক সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এই এক সপ্তাহ কাল মধ্যে হুজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম ও ওমরু-বিন্-ছোয়াদ এবং তদীয় সৈন্তদল পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মিলিয়া এব্নে ছোয়াদ ও তাহার সেনাদল একত্রে নমায্ পড়িত; এমাম ছাহেব (রাজিঃ)ই নমাযে এমামতি করিতেন; এই সংবাদ যখন এব্নে যেমাদেবের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহার মনে এই আশঙ্কার উদ্বেগ হইল যে, ওমরু-বিন্-ছোদ না এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে বড়বক্ত করিয়া আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। তদনুসারে সে অতি দ্রুততার সহিত জুয়েরাঃ-বিন্-এতিমি নামক এক চোপদারকে ডাকাইয়া, তাহার হস্তে এব্নে ছোদেব নামে নিম্ন-লিখিত মর্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইল :—

“আমি তোমাকে (হুজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-কে গেরেফ্-তার করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলাম; তোমার ইহাই কর্তব্য ছিল যে, উহাকে ‘গেরেফ্-তার’ (বন্দী) করিয়া আমার নিকট আনিতে; গেরেফ্-তার করিতে না পারিলে উহার মস্তক ছেদন পূর্বক আমার নিকট আনয়ন করিতে। আমি তোমাকে এই ‘হোকম’ (আদেশ) দিয়া-ছিলাম না যে, তুমি উহার ‘মোছাহেবী এখ্-তিমার’ কর, এবং বন্ধুতা-সূচক সম্বন্ধ বাড়াও। এক্ষণে তোমার জন্য ইহাই ‘বেহ্-তর’ (মঙ্গল-জনক) যে, তুমি এই পত্র পাঠ মাত্র (হুজরত এমাম) হোছেন-বিন্-

আলী (রাজিঃ)-কে অনতিবিলম্বে আমার নিকট আনয়ন কর ; তাহা না হইলে যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন পূর্বক আমার নিকট লইয়া আইস । পত্র পাওয়া মাত্র আমার আদেশ পালনে একটু মাত্র বিলম্ব করিলে, পত্রবাহক ছরহককে হুকুম দিয়াছি যে, তোমাকে বন্দী করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দেয় ; দ্বিতীয় সেনাপতি গেরণ পর্য্যন্ত সেনাদলকে ঐ স্থানে অবস্থান করিবার বন্দোবস্ত করে—যাহাকে আমি তোমার স্থলাভিষিক্ত করিয়া পাঠাইব ।”

জুয়েরাঃ এই পত্র লইয়া ৬১ হিজরীর ৯ই মোহাররম বৃহস্পতিবার দিন ওমরু-বিন্-ছাদ-এর নিকট পহুছাইল । এব্নে ছাদ ঐ সময় স্বীয় ‘খিমায়’ (শিবিরে) বসিয়াছিল । পত্রপাঠ মাত্র অখারোহণ পূর্বক স্বীয় সেনাদলকে সজ্জিত হইবার জন্ত আদেশ প্রদান করিল ; এবং জুয়েরাঃ-বিন্-বদর এতিমিকে কহিল, তুমি সাক্ষী থাক, আমি আমীরের পত্র পাঠ মাত্র তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছি । সৈন্যদল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইলে সে জুয়েরাঃকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল, এবং এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে ডাকাইয়া বলিল, আমীর এব্নে যেসাদের এই আদেশ-লিপি আসিয়াছে যে, আমি যদি তাঁহার আদেশ পালনে কিঞ্চিদ্মাত্রও বিলম্ব করি, তবে এই ‘কাছেদ’ (দূত বা পত্রবাহক) বিত্ৰমান আছে, ইহাকে হোকম দিয়াছেন যে, আমাকে তগুহুর্সেই বন্দী করে । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, আমাকে আগামী কল্য পর্য্যন্ত সময় দাও ; আমি ইতিমধ্যে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া দেখি । এই কথা শুনিয়া এব্নে ছাদ জুয়েরার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, সে বলিল, কাল ত বেশী দূর নহে ; এতটা সময় দেওয়া কর্তব্য । তদনুসারে এব্নে ছাদ স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল ; সৈন্যদিগকে ও অস্ত্রকার জন্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া বলিল, আজ যুদ্ধ হইবে না ; তোমরা অস্ত্র রাত্রের জন্ত বিশ্রাম কর ।

ওবায়দুল্লাহ্ এব্নে যেয়াদ, জুরেরাঃ-বিন্-বদর এতিমিকে পত্র সহ এব্নে ছায়াদের নিকট পাঠাইয়া চিত্তা করিল যে, যদি এব্নে-ছায়াদ আমার আদেশ পালনে বিলম্ব করে, আর জুরেরাঃ উহাকে বন্দী করিয়া লয়, তবে সৈন্যগণ সেনাপতি বিহীন অবস্থায় থাকিয়া ‘মোন্তশর’ (ছত্রভঙ্গ) হইয়া যাইবে, এবং এরূপ অবস্থায় ইহাও অসম্ভব নহে যে, ঐ নেতৃহীন সৈন্যদল এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে গিয়া সম্মিলিত হয় ; এরূপ ঘটনা ঘটিলে বিষম অসুবিধায় পড়িতে হইবে, আর এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর পক্ষে বিশেষ সুযোগ ঘটবে ; হয় ত তিনি সেই সুযোগে মক্কাভিমুখে পলায়ন করিবেন । এই চিত্তা তাহার মনে উদ্ভিত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ শেষর ঘিল বেশনকে ডাকিয়া পাঠাইল । সে উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিল, আমি জুরেরাঃ কে এব্নে ছায়াদের নিকট পাঠাইয়াছি, আর তাহাকে এই ‘হোকম’ (আদেশ) দিয়াছি যে, যদি এব্নে ছাদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব করে, তবে উহাকে গেরেফ্-তার করিয়া এখানে লইয়া আইসে । এব্নে ছায়াদ সম্বন্ধে আমার ‘মোনাফেকানা’ (বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক) সন্দেহ আছে ; যদি জুরেরাঃ এব্নে ছায়াদ কে বন্দী করে, তবে তাহার অধীনস্থ যে সৈন্য দল কারবালার ময়দানে অবস্থান করিতেছে, উহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নষ্ট হইবে ; আমি এই কার্যের জন্য তোমা অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র আর কাহাকেও দেখিতেছি না । তুমি এখনই কারবালা প্রান্তরাভিমুখে গমন কর ; যদি এব্নে ছায়াদ বন্দী হইয়া থাকে, তবে তুমি গিয়া সেনাপতির পদ গ্রহণ কর ; এবং এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহার মস্তক কাটিয়া আন । আর যদি এব্নে ছায়াদকে বন্দী করা না হইয়া থাকে, এবং সে যুদ্ধে বিলম্ব করে, তবে তুমি সেখানে পঁহছামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও ; ও আমার আদেশানুযায়ী অতি সত্বরে কার্য শেষ করিয়া ফেল । ওবায়দুল্লাহর

প্রস্তাব শুনিয়া শেমর ষিল যোশন বলিল, আমার একটি শর্ত আছে, তাহা এই যে, আপনি অবগত আছেন, আমার ভগিনী ওম্মল বয়ীন-বিস্তে-হরামকে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর চারিটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ; উহাদের নাম আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ), জাফর (রাজিঃ), ওছমান (রাজিঃ) ও আব্বাহ (রাজিঃ) । আমার এই ভাগিনের চতুষ্টয় ও স্বীয় ভ্রাতা (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত আছে ; আপনি আমার এই ভাগিনের চারি জনের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করুন ; তবেই আমি কারবালার গমন করিতে পারি । এব্নে যেয়াদ এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজ, কলম ও দোয়াত আনাইয়া, উপরোক্ত ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিয়া দিল, এবং তাহাতে স্বীয় নাম স্বাক্ষর ও মোহর অঙ্কিত করিল । অতঃপর ঐ সময়েই তাহাকে কারবালাভিমুখে রওয়ানা করিয়া দিল ।

জুয়েরাঃ বুধবার দিবাগত রাত্রে রওয়ানা হইয়া বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষে কারবালায় পঁহুছিয়াছিল ; শেমর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে রওয়ানা হইয়া ঐ দিন আছরের নমাযের সময় কারবালায় গিয়া পঁহুছে । শেমর পঁহুছিলে যুদ্ধ মূলতবি সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহাকে তাহা জানান হইল । দুর্বৃত্ত শেমর এব্নে ছায়াদ কে বলিল, আমি ত যুদ্ধ সম্বন্ধে এক মুহূর্তের ও ‘মোহলত’ (অবসর) দিব না । হয় তুমি এখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ সৈন্যদলের কর্তৃত্ব আমার হস্তে অর্পণ কর । এব্নে ছায়াদ তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ পূর্বক শেমরকে সঙ্গে লইয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর নিকট গমন করিল ; এবং তাঁহাকে বলিল, ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ এই দ্বিতীয় ‘ক্বাছেদ’ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আপনাকে একটু মাত্র সময় ও মোহলত দিতে চাহেন না । তচ্ছ বণে হজরত এমাম হোছেন আলায়-

হেচ্ছালাম ফরমাইলেন, “ ছোব্-হানাল্লাহ্ ” এক্ষণে ‘মোহলত’ (সময়) দেওয়া বা না দেওয়ার কি প্রয়োজন ? স্বর্ঘ্য অস্তাচলে গমন করিতেছে, তোমরা এই রাত্রিকালের জন্তও কি যুদ্ধ স্থগিত রাখিবে না ? এই কথা শুনিয়া পাষণ্ড হৃদয় ছরাচার শেমর ঘিল-যোশনও আগামী কল্যাণ প্রভাত কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখা ‘মোনাছেব’ (কর্তব্য) মনে করিল ; এবং উভয়ে আপনাদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল । রাত্রিকালেই এব্-নে যেমাদের পত্র সহ কুফা হইতে আর একজন লোক আসিল, ঐ পত্রে আদেশ ছিল, যদি এখনও যুদ্ধ আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে এই আদেশ-লিপি পঁহছিবামাত্র পানীর উপর ‘ক্বব্-জাঃ’ (আধিপত্য বিস্তার) করিয়া লও । আর (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ) ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগের পক্ষে পানী বন্ধ করিয়া দাও । যদি সৈন্যদল শেমরের নেতৃত্বাধীনে আসিয়া থাকে, তবে আমার এই আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করা চাই । এই আদেশ-লিপি পঁহছিবামাত্র ওমরু-বিন্-ছায়াদ, ওমরু বিনল্ হেজাজকে ৫০০ পাঁচ শত সৈন্য দিয়া ‘ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস্) নদীর তীরে স্থাপন করিল । এমনই ব্যাপার যে, সে দিন হজরত এমাম (রাজিঃ) ছাহেবের লোকেরা প্রয়োজনীয় পানীও নদী হইতে তুলিয়া আনিয়া রাখিয়া ছিলেন না । তাঁহাদের সমুদয় জলাধার (মোশক প্রভৃতি পানীর পাত্র) পানী শূন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল । রাত্রিকালে যখন তাঁহারা পানী আনয়ন ■■■ নদী তীরে গমন করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, শত্রুগণ নদী-তট দখল করিয়া পানী লইবার পথ বন্ধ করিয়া আছে । হজরত এমাম ছাহেব আলায়হেচ্ছালাম এই সংবাদ শ্রবণে স্বীয় ভ্রাতা হজরত আব্বাছ-বিন্-আলী (রাজিঃ)-কে ৫০ জন বোদ্ধ পুরুষ সহ পানী আনয়ন ■■■ ফোরাৎ নদীর তটে পাঠাইলেন । উদ্দেশ্য, বল পূর্বক পানী আনয়ন

করেন ; কিন্তু ‘জালেম’গণ পানী আনিতে দিল না । ৫০০ সৈন্তের সঙ্গে ৫০ জন লোক যুদ্ধ করিয়া পানী আনয়ন করা সম্ভবপরও ছিল না ; বিশেষতঃ নিকটেই এবনে ছায়াদ ও শেমরের মূল সৈন্তদল অবস্থিত করিতে ছিল ; সংবাদ পাইবামাত্র তাহারাও তন্মুখর্তে নদী-তটে উপস্থিত হইত । মরুভূমির দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে পানীর সম্পূর্ণ অভাব, ক্রমে দারুণ পিপাসায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন । এই পানীর অভাব এমন একটি ‘আযিয়েত্’ (‘মছিবত’—কষ্টকর ব্যাপার) ছিল যে, তীর ও তরবারির ব্যবহারও ঈদৃশ ভীষণ নশ্বাস্তিক ক্লেশকর নহে ।

পাঠক ! এই ৯ই দিবাগত ১০ই মোহাররমের ভীষণ রাত্রির কথা একবার স্মরণ করুন ; হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের শিবির কয়টিতে আজ কি হৃদয় বিদারক শোচনীয় দৃশ্য ! এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর মুষ্টিমেয় আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত সহচর এবং অনুচর ; আর কতিপয় স্ত্রীলোক বালক বালিকা মাত্র । এবনে ছায়াদ ও শেমরের এবং ঈদে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে এমাম ছাহেব (ছালঃ)-এর যে শেষ কথাবার্তা হইয়াছে, তাহাতে সকলেই বুঝিয়া লইয়াছেন যে, নিশাবসানে সকলকেই মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করিতে হইবে । এই রাত্রিই সকলের পক্ষে জীবনের শেষ রাত্রি ।

তাহারা কেহই বিচলিত, ভীত বা আতঙ্কিত হইয়াছিলেন না ; তাহারা সকলেই আল্লাহর প্রতি নির্ভরকারী পরম ধার্মিক পুরুষ ও ধর্ম-পরায়ণা নারী । সত্য ও জ্ঞানের মর্যাদা রক্ষার জন্য কেহই জীবন দানে অগুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন । তাহারা সপ্তাহ কাল পূর্বেই মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; এবনে ছায়াদ ও কুফাবাসী বিশ্বাস ঘাতকদিগের পাশব আচরণের পরিণাম ফল বাহা হইবে, তাহা তাহাদের বুঝিতে বাকী ছিল না । পাষণ্ড শেমরের আগমনে তাহাদের পরিণাম যে আরও শোচনীয় হইবে, তাহা তাহারা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

এক্ষণে পানী বন্ধ হওয়াতে যুদ্ধের পূর্বেই যে পিপাসায় মরিতে হইবে, তজ্জন্মই তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। মানুষ অনাহারে বহু সময় থাকিতে পারে ; কিন্তু পিপাসার্ত হইয়া কতক্ষণ থাকা যায় ? এরাকের মরু প্রদেশ কিরূপ গরম, সেখানে গ্রীষ্মের কিরূপ আতিশয্য, তাহা ভুক্ত-ভোগিগণই অনুভব করিতে পারেন। পানীর সুবিধা হইবে বলিয়া ফোয়াত নদীর তটেই হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। মোছলমান হইয়া মোছলমানের পানী বন্ধ করিবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল ; বিশেষতঃ হজরত নবী করিম (রাজিঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্র-রত্ন এবং তত্ত্বংশীয়দিগের মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের পানী বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে জীবন্মৃত করিবে, ইহা চিন্তা ও খেয়াল করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। ২১২২ বৎসর পূর্বে যে কুফানগর হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়ায্‌হর রাজধানী ছিল ; তিনি তখনও অর্দ্ধ মোছলেম-জগতের সর্ববাদী-সম্মত খলিফা ছিলেন ; কুফাবাসিদিগের কতকগুলি লোক নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, এব্‌নে ছাব্বার মতাবলম্বী থাকিলেও, অধিকাংশ অধিবাসী শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর জন্ম প্রাণদানে প্রস্তুত ছিল ; বিংশতি বৎসর পূর্বে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর পতাকা-মূলে ও ৪০ হাজার যোদ্ধা পুরুষ সনবেত হইয়াছিল ; আর আজ ? আজ সেই কুফাবাসী বিশ্বাসঘাতক, ধূর্ত, ঝাপুরুষ, কপটাচারিগণ, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-কে বয়্‌য়েত করিবার জন্ম আহ্বান করিয়া, ছরাচার ওয়ায্‌হুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদের আদেশে যুদ্ধ করিয়া বধ করিবার জন্ম অগ্রসর ; কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের জন্ম পানী বন্ধ করিয়া, তাঁহাদিগকে যুদ্ধের পূর্বেই বধ করিবার ■■■ প্রস্তুত ! কুফার প্রধান প্রধান লোকেরা—যাহারা এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে অতি ভক্তিভাবে খেলাফৎ প্রদানের আশা দিয়া আহ্বান করিয়াছিল, তাহারাই ত্যাগ এব্‌নে

যেহাদের প্রেরিত সেনাদলের নেতৃত্বে, কারবালাক্ষেত্রে হজরত এমাম আলায়হেছালামের প্রাণবধার্থে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত ! ইহাদের হৃদয় কি পাষণ ! ইহাদের প্রবৃত্তি কি নীচ ! ইহাদের কপটতা ও কাপুরুষতা কি ঘণিত ও সাত্মাতিক ! ইহাদের হৃদয় হইতে এছলাম ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল ; ইহাদের হৃদয়ে শয়তান যেন পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ; নরোধম ও বায়তুল্লাহর ভয়ে এবং তাহার একটু করুণা-দৃষ্টি লাভাশায় ইহারা পরকালের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল ; ইহারা যে মোছলমান, একথা বিস্মৃতি সলিলে বিসর্জন দিয়াছিল । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহামান্ন ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-দিগের সন্তান-সন্ততিও ছিল ; তাহার জীবন্ত আদর্শ ওমরু-বিন্-ছারাদ-বিন্-আবি ওক্বাছ । ফেরেশ্তার ঘরে শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । আর শেষর-প্রমুখ কতিপয় পাষণ্ড, কতিপয় নরোধম !! এই কাল রাত্রির অবসানে সদল-বলে মহামান্ন এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে বধ করিতে পারিবে বলিয়া কতই না আনন্দিত ! আজ ভীষণ নিশান্তে হাশেম-বংশের গৌরবান্বিত সন্তানগণ, আ হজরত (ছালঃ)-এর নয়ন তারা আদর্শ মোছলমান ও আদর্শ মহাপুরুষগণ, সত্য ও স্রায়ের মর্যাদা রক্ষার্থ, পবিত্র এছলাম ধর্মের গৌরব রক্ষার্থ কারবালা-প্রান্তরে দেহপাত করিবেন, একজন্ত ফেরেশ্তাঃ-গণও শোকাকুলিত । পক্ষান্তরে ওমরু-বিন্-ছারাদ ও শেষর-প্রমুখ মহাপাতকী পাষণ্ডদিগের শিবির আনন্দ কোলাহলে মুখরিত । আজ প্রায় তের শত বৎসর পরে যে শোচনীয় ঘটনা স্মরণ করিতে আমাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ হয় ; মোছলমান জগতে শোকের প্রবল প্লাবন উপস্থিত হয়—সেইরূপ নির্দয় ব্যবহার, শোচনীয় অনুষ্ঠান, ভীষণ সংহার কার্য সম্পন্ন করিতে এবনে যেহাদ-বদ-নেহাদ-প্রমুখ কুলান্দারদিগের মনে একটুও ভাবান্তর উপস্থিত হইল না । তাহার মহামান্ন পিতার আশ্রয়ে, অনুগ্রহে, দয়া ও সহানুভূতি প্রভাবে

হজরত আবু ছুফিয়ান (রাজিঃ)-এর বংশীয় লোকদিগের দ্বারা নিন্দিত, উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত ওবায়দুল্লাহর পিতা বেরাদ, উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন ; বস্ত্রের গোরবান্বিত শাসনকর্তার পদলাভ করিয়াছিলেন, হজরত আমীর মোবিয়া (রাজিঃ) পূর্বে ঐহাকে ভ্রাতা বলিয়া কখনও স্বীকার করেন নাই ; তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দর্শনে মহামানুষ আমিরুল-মুমেনিন হজরত আলী করমুল্লাহ ওরাজহ ঐহাকে সন্নেহে আশ্রয় দান করিয়া-ছিলেন ; তাঁহারই ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পাষণ্ড ওবায়দুল্লাহ্ আজ নবী-বংশ ধ্বংস করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ! তাঁহাদিগকে পদে পদে অবমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প !! পাষণ্ডের পরকালের ভয় একটুও হইল না । মোছলমান নামে পরিচিত হইয়া এই নর-পিশাচ ও ইহার অনুচরগণ কিরূপে ঈদৃশ মনুষ্যত্ব হীন অকৃতজ্ঞতা-সূচক বর্বরোচিত পৈশাচিক কার্য্য করিতে কোমর দাঁধিয়া ছিল, তাহা আমাদের কল্পনারও বহির্ভূত । তুচ্ছ শাসনকর্তৃত্বের লোভে, পার্থিব গৌরব ও আড়ম্বর লাভেচ্ছায় সে বা তাহারা পরকালের আশায় জলাঞ্জলি দিল কাটা কাফের হইতেও নৃশংসতা প্রকাশ করিল, ইহা একটা কল্পনাভীত ব্যাপার । আজ তের শত বৎসর ধরিয়া মোছলমানগণ কোটি কোটি কণ্ঠে এই সকল নর-নিশাচের ঘৃণিত আত্মার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতেছেন ; উহাদের বংশধরগণ মোখতারের হস্তে নিম্নল হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও, আজ ছুনিয়াতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই ; তাহারা বাঁচিয়া থাকিলেও আত্ম-পরিচয় দিতে অসমর্থ । পরিচয় পাইলে মোছলমানগণ “ লালত-মালামত ” না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না ।

সে যে কি ভীষণ কাল রাত্রি ছিল, স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে । দারুণ পিপাসায় সকলেই ছট্‌ফট্ করিতেছেন ; অসহ্য তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া বাইতেছে, কয়টি তাম্বুর মধ্যে এক বিন্দু পানী নাই, নির্দয়

পাষাণগণ নদী-তট আগুনগিয়া আছে । পশু-পক্ষী সকলেই ফোরাতের পানী পান করিবার অধিকারী ; কেবলমাত্র নবী-বংশের জন্যই আজ উহার পানী বন্ধ । সেই রাত্রির এক এক পল যেন এক এক বৎসর বলিয়া অনুমিত হইতেছে, মহিলাগণ নিশাবসানের কথা—আগামী কল্যের কথা ভাবিয়া আকুল । শিবির করটি দুঃখ-ব্যাকুলতা ও আন্তনাদে মুখরিত । চেরাগ গুলিও যেন শোক-দুঃখে আলো বিস্তার করিতেছে না । মনোদুঃখে বায়ু ও যেন প্রবাহিত হইতেছে না । ফোরাতের স্রোতও যেন প্রবাহিত হইতেছে না ।

হজরত এমাম হোছেন আলারহেচ্ছালামের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র আলী-বিন্-হোছেন (রাজিঃ) পীড়িত অবস্থায় ‘খিমায়’ (শিবিরে—তাম্বুতে) শয্যাশায়ী ছিলেন ; হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর আহ্-লিয়া এবং তদীয় ভগিনী হজরত ওম্মে কলছুম (রাঃ—আঃ), ইহা দেখিয়া আর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শত্রুদল আক্রমণ করিবে—যে সকল ‘আযিয্’ ও ‘আকারেব’ (আত্মীয়-স্বজন)-এখানে উপস্থিত আছে, সকলেই কতল ও শহীদ হইয়া যাইবেন, ইহা শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) খিমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং বলিলেন, শত্রুদল আমাদের অতি নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তোমাদের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া উহারা আনন্দ লাভ করিবে ; আর আমাদের সঙ্গীয় লোকদিগের হৃদয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে ; অতএব তোমরা ক্রন্দন করিও না । যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় তাঁহাদের ক্রন্দন বন্ধ করিয়া তিনি শিবিরের বাহিরে আগমন করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, বাস্তবিকই ত্রীলোক এবং বাস্তব-দিগকে সঙ্গে আনিয়া আমি অতি অন্মায় কার্য করিয়াছি ; ইহাদিগকে কিছুতেই সঙ্গে আনা উচিত ছিল না । আমি আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ

শুনিলাম না ; বিশেষতঃ পিতৃব্য হজরত আবদুল্লা-বিন্-আব্বাছ (রাজিঃ), পরিবার বর্গ সঙ্গে আনিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন—প্রবল ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার অনুরোধ উপরোধে কর্ণপাত করিলাম না । অতঃপর তিনি আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত অনুচর বৃন্দকে আহ্বান করিয়া ফরমাইলেন, তোমরা এখান হইতে যে যে দিকে যাওয়া 'মোনাছেব' (উচিত) মনে কর, সেই দিকে চলিয়া যাও । তোমাদিগকে কেহই কিছু বলিবে না ; কারণ শত্রুপক্ষ আমার প্রতিই বিরূপ ; আমার হত্যা সাধন করাই উহাদের উদ্দেশ্য, তোমরা চলিয়া গেলে তাহারা ও 'গণিমত' মনে করিবে, আমি তোমাদিগকে প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি প্রদান করিতেছি, তোমরা স্ব স্ব প্রাণরক্ষা কর । সঙ্গীয় আত্মীয়-স্বজন এবং অনুগত ভক্তবৃন্দ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, আমরা কোনও ক্রমেই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব না, আমরা সকলেই আপনার উপর 'কোরবান' (উৎসর্গীত প্রাণ) হইয়া যাইব । আর যে পর্যন্ত আমাদের দেহে জীবন থাকিবে, আপনার উপর কষ্ট হইতে কিছুতেই দিব না । ইহার একটু পরেই :তয় বংশীয় তরমাহ-বিন্-আদি নামক এক ব্যক্তি গুপ্তভাবে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর শিবিরে উপস্থিত হইলেন ; ঐ ব্যক্তি কোনও কার্যোপলক্ষে এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, এবং হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও এব্নে ছায়াদের সৈন্যদলের বিষয় এবং এব্নে যেমাদের ভীষণ সঙ্কল্প ও পৈশাচিক আদেশের কথা শুনিয়া হজরত এমাম আলায়হেছালামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, আপনি একাকী আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাকে এমন এক গোপনীয় পথে এখান হইতে লইয়া যাইব যে, কেহ ইহার সন্ধানই পাইবে না । আর স্বীয় সম্প্রদায় বনি তয় এর মধ্যে পঁছছাইয়া, তাহাদের ৫ হাজার ঘোড়পুরুষকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব ; আপনি তাহাদিগকে যে আদেশ করিবেন,

বিনা আপত্তিতে—অবনত মস্তকে তাহারা সেই আদেশ পালন করিবে । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) বলিলেন, আমি এই মাত্র আমার এই সঙ্গীয় আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুগত লোকদিগকে বলিয়া ছিলাম, তোমরা আমাকে একাকী কেলিয়া চলিয়া যাও, এবং আপনাদের প্রাণ-রক্ষা কর । কিন্তু তাহারা আমার সে প্রস্তাব কোনও ক্রমেই গ্রহণ করে নাই ; এরূপ ক্ষেত্রে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, আমি ইহাদিগকে শত্রুর অন্ত-মুখে কেলিয়া একাকী চলিয়া যাই । সঙ্গীয়গণ বলিলেন, হজরত ! আপনি এই মাত্র ফরমাইলেন যে, শত্রুদল আমাদিগকে কিছুই বলিবে না, উহারা কেননামাত্র আপনারই ‘দোশ্মন’ (শত্রু) ; সুতরাং এরূপ অবস্থায় আপনার একাকী চলিয়া যাওয়া ও প্রাণরক্ষা করা একান্ত কর্তব্য ; সম্ভবতঃ আমাদিগকে তাহারা বধ করিবে না । তখন হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) গভীর মর্শ্ব বেদনা সহকারে ফরমাইলেন, হে প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত বৃন্দ ! একথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে যে, আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক একাকী স্বীয় প্রাণরক্ষা করণার্থ গোপনে এখান হইতে চলিয়া যাইব । অতঃপর তরু বংশীয় সেই সহৃদয় ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন । এইরূপে সেই কাল রজনীর অবসান হইল ।

রাত্রি প্রভাত হইনামাত্র হজরত এমাম আলায়হেছালাম সদলবলে ফজরের নমাজ আদায় করিলেন । পূর্ব গগনে তরুণ অরুণ দেখা দিল । সঙ্গে সঙ্গে শেষর-বিল যোশনও ওমরু-বিন্-ছায়াদ স্ব স্ব সেনাদল সুসজ্জিত করিয়া মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে সমরাস্রমে অবতীর্ণ হইল । কুফী যোদ্ধৃপুরুষগণ পিশাচের ন্যায় নর্তন ও কুর্দন করিয়া বিকট তাণ্ডব সহকারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । ৭০।৮০ জন লোকের বিরুদ্ধে ৫।৬ হাজার দুর্দৈব সৈন্তের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কি বিবেচনা বহির্ভূত হৃদয় হীন নৃশংস ব্যাপার !

আর সেই মুষ্টিমেয় লোক সারারাত্রি দারুণ পিপাসায় ছটফট করিয়া মৃতকল্প হইয়াছেন ; তাঁহাদের গলনালী শুকাইয়া গিয়াছে, তৃষ্ণায় ছাতি কাটিয়া যাইতেছে । নৃশংস নরাধমদিগের হৃদয়ে মনুষ্যোদিত দয়া ও সহানুভূতির লেশমাত্রও নাই । বাহা হউক, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ■ স্বীয় মুষ্টিমেয় ভাই-ভাতিজা, আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্ত-বৃন্দকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া যথোচিত উপদেশ প্রদান পূর্বক যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন । ছুরাওয়া শেমর খিল যোশন স্বীয় ভাগিনেয় আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ), জাকর (রাজিঃ), ওছমান (রাজিঃ) ও আব্বাহ (রাজিঃ)—হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর এই পুত্র এবং হজরত এমাম আলারহেচ্ছালামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চতুষ্টয়কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ডাকাইয়া বলিল, তোমাদিগকে আমি এব্নে বেরাদ ‘আমান’ (শান্তি—জীবন রক্ষার অধিকার) প্রদান করিয়াছেন । এতচ্ছবণে তাঁহারা বজ্র-নির্ধোমে উত্তর করিলেন যে, এব্নে বেরাদের ‘আমান’ (শান্তি প্রদান) হইতে আল্লাহ্ তা-লার আমান ‘বেহতর’ (উৎকৃষ্ট) । তাঁহাদের এই খোদা তা-লার প্রতি নির্ভর-সূচক সদর্প বাণীতে ছুরাচার শেমরের কাল মুখ অধিকতর কালিমা প্রাপ্ত হইল । জাহান্নামের ভীষণ অগ্নি উহার বক্ষঃস্থলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । পাপাচারীর পাপ-পিপাসা কি সহজে নিবৃত্ত হয় ? ভাগিনেয় চতুষ্টয়ের মুখের মতন উত্তরে ও পাষণ্ডের চৈতন্যোদয় হইল না ।

কোনও কোনও রওয়ান্নেতানুসারে ১০ই মোহররম তারিখের এই যুদ্ধে—অন্যায় সংগ্রামে হজরত এমাম আলারহেচ্ছালামের সঙ্গে ৭২ জন মাত্র পুরুষ ছিলেন । কোনও কোনও রওয়ান্নেতানুসারে লোক সংখ্যা ১৪০ একশত চল্লিশ এবং কোনও কোনও বর্ণনানুসারে তাঁহাদের সংখ্যা ২৪০ জন ছিল । যদি উক্ত সংখ্যা এই ২৪০ জনই ধরা হয়, তবুও শত্রু পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্যের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ছিল ।

আর শত্রুদল অন্ত-শত্রে সম্পূর্ণ রূপে সজ্জিত, পক্ষান্তরে এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সঙ্গিগণের মধ্যে উহার অনেকটা অভাব ছিল । হজরত এমাম হোছেন আলায়-হেচ্ছালাম স্বীয় সঙ্গীয় লোকদিগকে উপযুক্ত স্থানে দাঁড় করাইয়া স্বয়ং উত্তোরোহণে একাকী কুফী সৈন্যদিগের সম্মুখে গমন করিলেন । উহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ফরমাইলেন, হে কুফিগণ ! আমি একথা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার এই বক্তৃতা এ সময় আমার পক্ষে কোনও রূপ ফলপ্রদ হইবে না । আর তোমরা যে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তাহা হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না । কিন্তু আমি ইহা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, এক্ষেত্রে খোদা তা-লার আদেশ তোমাদের প্রতি পূর্ণ এবং আমার ‘ওযর’ (আপত্তি) ও প্রকাশ হউক । তিনি এই পর্য্যন্ত কথা বলিবামাত্র তাঁহার ‘খিমাঃ’ (শিবির) হইতে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল । এই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে তিনি নিতান্ত হঃখিত হইয়া স্বীয় বাক্যস্রোত বন্ধ করিলেন, এবং “ লাহওলা ” পড়িলেন ; এবং ফরমাইলেন (হজরত) আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাহ (রাজিঃ) আমাকে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না । আমি বড়ই ভুল করিয়াছি যে, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি নাই । পরে খানিকদূর পশ্চাদগমন পূর্ব্বক ভ্রাতা এবং পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া ফরমাইলেন, তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে রোদন করিতে নিষেধ কর, এবং এ সময় ‘খামুশ’ (নীরব) থাকিতে বল । আগামী কল্য যেন খুব প্রাণ ভরিয়া রোদন করে । তাঁহারা মহিলাদিগকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া ক্রন্দন বন্ধ করাইলেন । অতঃপর হজরত এমাম আলায়-হেচ্ছালাম পুনঃ অগ্রসর হইয়া কুফীদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিম্ন-লিখিত রূপে বক্তৃতা প্রদান করিলেন :—

“হে লোক সকল ! তোমরা প্রত্যেকেই আমাকে বেশ করিয়া জান এবং চেন । আর যাহারা না জান, তাহারা অবগত হও যে, আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের ‘নওয়াছাঃ’ (দৌহিত্র—নাতি), এবং হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজ্জল্হুর পুত্র । হজরত ফাতেমাঃ যোহরাঃ (রাঃ—আঃ) আমার জননী এবং হজরত জাফর তইয়্যার (রাজিঃ) আমার চাচ্চা (পিতৃব্য) ছিলেন । এই ‘ফখর নছিবী’, (বংশ-গৌরব) ব্যতীত আমার এ গৌরব ও আছে যে, আ হজরত (ছালঃ) আমাকে এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-কে ‘জম্মত’ বাসী যুবকগণের ‘ছরদার’ (নেতা) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । যদি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে এখন পর্য্যন্ত আ হজরত (ছালঃ)-এর বহুসংখ্যক ‘ছাহাবাঃ’ জীবিত আছেন, তোমরা তাঁহাদের নিকট আমার বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে পার । আমি কখনও ‘ওয়াদাঃ-খেলাফি’ (প্রতিশ্রুতি পালনের বিপরীতাচরণ) করি নাই ; আমি কখনও নমায় ‘কযা’ করি নাই ; আমি কোনও মুমেন (মোছলমান)-কে ‘কতল’ (হত্যা) করি নাই—কিংবা কাহাকেও ‘আযার’ পঁহুছাই নাই (কষ্ট দেই নাই) ; যদি হজরত ইছা আলায়হেছাল্লামের গর্দভটি আজ জীবিত থাকিত ; তবে সমুদয় ঈছায়ী (খৃষ্টীয়ান) ক্রোয়মত পর্য্যন্ত সেই গর্দভকে প্রতিপালন ও উহার তত্ত্বাবধান করিত । তোমরা কেমন মোছলমান ও ওম্মতে মোহাম্মদী যে, স্বীয় রছুলের ‘নওয়াছাঃ’ (নাতি)-কে হত্যা করিতে চাও ? তোমাদিগের মধ্যে কি খোদা তা-লার ‘খওফ্’ (ভয়) ও রছুলের ‘শরম’ (লজ্জা) নাই ? আমি যখন জীবনে কাহাকেও হত্যা করি নাই, তখন আমার নিকট হইতে কাহারও মৃত্যুর প্রতিশোধও গ্রহণ করা যাইতে পারে না । এ অবস্থায় আমার শোণিতপাত করা তোমরা কিরূপে ‘হালাল’ (বৈধ)

মনে করিতেছ ? আমি হুনিয়ার ঝগড়া হইতে ‘আবাদ’ (স্বাধীন) থাকিয়া মদীনায় আ হজরত (ছালঃ)-এর পাদপদ্মে শান্তিতে বাস করিতে ছিলাম, তোমরা আমাকে সেখানে সেই শান্তিভোগ করিতে দিলে না । পরে মক্কা শরীফে গিয়া পবিত্র থানাঃ খোদায় (কাবাগৃহে) এবাদত-বন্দেগীতে ব্যাপ্ত ছিলাম, হে কুফিগণ ! তোমরা সেখানেও আমাকে শান্তির সহিত বাস করিতে দাও নাই । আর ক্রমাগত আমাকে এই মর্মেণ্ড পত্র লিখিতে লাগিলে যে, আপনাকে আমরা এমামতের হকদার মনে করি ; আপনি এখানে আসুন, আমরা আপনার হস্তে খেলাফতের ‘বস্য়েত’ করিব । যখন আমি তোমাদের আহ্বানে এখানে আসিলাম, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে ; আমাকে হত্যা করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলে । এখনও যদি তোমরা আমার ‘মদদ’ (সাহায্য) কর ; তবে আমি এইটুকু মাত্র চাই যে, আমাকে ‘কতল’ (হত্যা) করিও না । আর আমাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দাও, আমি মক্কা কিংবা মদীনায় গিয়া খোদা তা-লার এবাদত-বন্দেগীতে আত্ম-নিয়োগ করি ; আর খোদা তা-লা এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন যে, কে হক পথে (জায়পথে) ছিল ; আর কে ‘জালেম’ (অত্যাচারী) ছিল । ”

হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর এই বক্তৃতা শুনিয়া যুদ্ধোত্ত কুফিগণ নীরব হইয়া রহিল, কাহারও মুখ হইতে বাক্য স্ফূরণ হইল না । ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম আবার ফরমাইলেন :—

“ খোদা তালার শোকর, আমি তোমাদের প্রতি ‘হজ্জত’ পূর্ণ করিয়া দিলাম, অতঃপর তোমরা আর কোনও ‘ওয়র পেশ’ (আপত্তি উত্থাপন) করিতে পারিবে না । ”

অবশেষে তিনি কুফার নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার আহ্বানকারীদিগের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া আওয়ায দিলেন :—হে শব্ব-বিন-রবয়ী, হে হেজাজ-বিন-আল-হছন, হে কয়েছ-বিন-আল আয়ত, হে হোর-বিন-এযিদ এতিমি ইত্যাদি—তোমরা কি আমাকে পত্র লিখিয়া ছিলে না ? আর বিশেষ অনুরোধের সহিত আমাকে এখানে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলে না ? তৎপর আমি যখন তোমাদের আহ্বানে এখানে আসিলাম, তখন আমাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ ? ” ইহা শুনিয়া সেই মিথ্যাবাদী ভণ্ড কপটের দল বলিয়া উঠিল, আমরা আপনাকে কোন পত্র লিখি নাই, বা ডাকিয়া পাঠাই নাই । ইহা শুনিয়া হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ঐ সকল পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, এই তোমাদের পত্র গুলি ও তাঁহার মর্ম । তখন ঐ নির্লজ্জ বেহায়া কাপুরুষের দল অগ্নান বদনে বলিয়া উঠিল, আমরা এই সকল পত্র লিখিয়া থাকি, কিংবা না লিখিয়া থাকি, তাহা বাইতে দিন, কিন্তু আমরা এক্ষণে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা আপনার প্রতি ‘বেযার’ (নারাজ—অসন্তুষ্ট) । এই কথা শুনিয়া জনাব হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) উদ্ভূ হইতে অবতরণ পূর্বক অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন ; এবং যুদ্ধের ■■■ প্রস্তুত হইলেন ।

পাঠক ! ইহা ৬১ হিজরীর পবিত্র মোহররম মাস—পবিত্র আশুরার দিবস এবং পবিত্র জুমার দিন ছিল । এই পবিত্র দিনে মোছলমান নাম-ধারী কুফার বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, কপট ও নির্দম পাষণ্ড বোদ্ধগণ এব্-নে ছায়াদ ও শেমর-যিল্ ঘোশন কর্তৃক পরিচালিত হইয়া মহামান্ন হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও তাঁহার মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র দলটিকে হত্যা করিবার জন্য মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে অগ্রসর । ইহাদের হৃদয় কি পাষণ ! ইহাদের অন্তঃকরণ কি পাপ-কালিমায় কলঙ্কিত । ইহারা কি নির্দম

ও নৃশংস নর-পিশাচ। পৃথিবীর কোনও নির্দয়-নৃশংস লোকের সঙ্গে ইহাদের শয়তানী কার্যের তুলনা হয় না। ইহারা মোছলমান নামে পরিচিত হইয়া “লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রছুলোলাহ্” এই পবিত্র কলোমা উচ্চারণ করিয়া, এছলাম ধর্মের শেষ প্রবর্তক, শেষ নবী—আখেরী রছুল, সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আত্মদ মোজতবা (ছালঃ)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, আদর্শ চরিত্র, আদর্শ ধার্মিক, আদর্শ নেতা, আদর্শ মনুষ্য এবং আদর্শ মোছলমান হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এবং নবী বংশের অন্ত্যস্ত যুবক ও বালক মওলীকে হত্যা করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোনও বিধর্মী কাকেরও একরূপ ভীষণ ও পৈশাচিক অমুঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত কি না সন্দেহ, ফলতঃ একরূপ নৃশংস কার্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। যাহা হউক, কুফি-দল হইতে প্রথমেই একটা যোদ্ধা যুদ্ধ করণার্থ এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু উহার অশ্বটি হঠাৎ ভড়কিয়া উঠাতে আরোহী তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এতদর্শনে হোর-বিন্-এবিদ এতিমি সবলে অশ্ব ধাবিত করিয়া, সম্মুখ দিকে ঢাল স্থাপন পূর্বক এমন ভাবে অগ্রসর হইলেন, যেন কেহ শত্রুকে আক্রমণের জন্য উৎসাহ-তরে অগ্রসর হয়; এই বীরপুরুষ হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়াই ঢালখানি হস্ত হইতে ফেলিয়া দিলেন; তদর্শনে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হোর! তুমি কি জন্য আসিয়াছ? হোর বলিলেন, আমি ঐ ব্যক্তি—যে আপনাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া (বেষ্টন করিয়া) এবং আপনার পথাবরোধ করিয়া কোনও দিকে যাইতে দেয় নাই; এবং আপনাকে এই ময়দানে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিল; আমি এই কুকার্যের প্রতিকার বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার পক্ষাবলম্বন

পূর্বক কুফিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব । আপনি আমার ■■■ 'মগ্ ফেরাতের' (পারলৌকিক মুক্তি লাভের) ■■■ দোওয়া করুন । হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) তাঁহাকে দোওয়া করিলেন ; এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন । ঐ সময় শেমর যিল জোশন এব্নে ছায়াদকে বলিল, তুমি এক্ষণে আক্রমণ কার্যে কেন বিলম্ব করিতেছ ? তচ্ছবণে ওমর-বিন-ছায়াদ একটি তীর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর যোদ্ধাদের প্রতি নিক্ষেপ করিল ; এবং শেমরকে বলিল, তুমি সাক্ষী থাক যে, এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর সেনাদের প্রতি আমিই সর্বপ্রথমে তীর নিক্ষেপ করিলাম । স্বার্থক এব্নে ছায়াদ, এব্নে বেরাদ বদনেহাদের তৃপ্তি সাধন জন্য—তাঁহাকে রাজী রাখিয়া রয়ওতেহারান প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভের ■■■ এইরূপ তোষাথোদ পূর্ণ উক্তি করিল ; এবং সে যে ওয়ায়জুলার নিতান্ত আজাবহ, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল । ইহার পর কুফি দল হইতে দুই জন যোদ্ধা বাহির হইল ; এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে একজন বাহাদুর বীরপুরুষ অগ্রসর হইয়া ঐ উভয় কুফি যোদ্ধাকে শমন সদনে পাঠাইলেন । এইরূপে দ্বৈরথ যুদ্ধ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চলিল, ইহাতে কুফিদিগের পক্ষে অধিক সংখ্যক যোদ্ধা নিহত হইল । ইহার পর হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর পক্ষ হইতে এক এক জন বীরপুরুষ বাহির হইয়া সিংহ-বিক্রমে তাহাদের দলে প্রবেশ পূর্বক, বহু সৈন্তের প্রাণ সংহারাস্তে শাহাদতের শরবৎ পান করিতে লাগিলেন । তাহাদের বীর-বিক্রমে বহুসংখ্যক কুফি যোদ্ধা শমন সদনে প্রেরিত হইতে লাগিল ; ইহাতে ওমর-বিন-ছায়াদ ও শেমর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল । হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গীয় জীবনোৎসর্গকারী বীরপুরুষগণ আলে-আবিতালেব অর্থাৎ আবিতালেব বংশীয় হাশেমী বীর বৃন্দকে ঐ সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইতে দেন নাই—যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের একজন মাত্রও জীবিত ছিলেন । নবী বংশের প্রতি ইহাদের কিরূপ অতুলনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, এই ঘটনার দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । ভক্ত অতুল বৃন্দ সকলেই যখন শত্রু হস্তে শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন, তখন হজরত মোছলেম-বিন্-আকিল (রাজিঃ)-এর ভ্রাতাগণও পুত্রগণ সমর-মাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন । বহু কুক্ষী সৈন্তের নিপাত সাধন করিয়া ইহারাও একে একে শহীদ হইয়া গেলেন । ইহার পর হজরত এমাম আলারহেচ্ছালামের জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত আলী আকবর (রাজিঃ) কুখার্ত কেশরীবৎ শত্রু-সৈন্যদলে প্রবেশ পূর্বক, রোস্তমের স্ত্রীর মহাবীরত্ব সহকারে শত্রু সৈন্তের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিলেন । তিনি একবার সম্মুখে, একবার দক্ষিণে, একবার বামে অস্ত্র সঞ্চালন পূর্বক বাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাইলেন । অবশেষে অসংখ্য শত্রু দলের অস্ত্র-প্রহারে তরবারি নেযাঃ (বর্শা বিশেষ) ও তীর দ্বারা জর্জরিত হইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে সমর-ক্ষেত্রে চির বিশ্রাম লাভ করিলেন । ইহার শাহাদৎ-প্রাপ্তি দর্শনে হজরত এমাম আলারহেচ্ছালাম শোক-সংবরণ করিতে পারিলেন না ; তিনি রোদন করিতে লাগিলেন । পুত্রশোকে তাঁহার জুপিও যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল । অতঃপর এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ভ্রাতা হজরত আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ), মোহাম্মদ (রাজিঃ), আব্বাছ (রাজিঃ), ওছমান (রাজিঃ) ও অন্যান্য ভ্রাতাগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহাবীর-বিক্রমে শত্রু সেনাদলে প্রবেশ করিলেন ; এবং ভীষণ ভাবে শত্রু-দলকে আক্রমণ করিয়া হাশেমী বীরত্বের পূর্ণ ‘জওহর’ দেখাইলেন । তুর্গার্ত বীরবৃন্দ অসংখ্য শত্রু সৈন্তের দেহ-পরম্পরায় কারবারার যুদ্ধক্ষেত্রে সমাচ্ছন্ন করিয়া একে একে শহীদ হইয়া গেলেন । ইহার পর এমাম আলারহেচ্ছালামের তরুণ বয়স্ক

বীরপুত্র হজরত কাছেম (রাজিঃ) ■ শত্রু সেনাদলে প্রবেশ পূর্বক অসংখ্য কুফি যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া শহীদ ও জরতবাসী হইলেন । এইস্থলে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় । অনেকের মতে হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত কাছেম (রাজিঃ) এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ; এবং মহা পরাক্রমের সহিত বহুসংখ্যক শত্রু সৈন্যের নিপাত সাধন পূর্বক শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন । বাহা হউক, হজরত এমাম আলায়হেছালামের ভক্ত সহচর বন্দ, ক্রীতদাসগণ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতৃপুত্রগণ, ভাগিনেয়গণ, পুত্রগণ—একে একে সকলেই শহীদ হইয়া গেলেন । তাঁহারা যুদ্ধে যে অগামুখিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ একটু মাত্র ‘কমবোরী’ ও ‘বোয়্দেলী’ (দৌর্বল্য ও কাপুরুষতা) প্রদর্শন করিয়াছিলেন না ; পক্ষান্তরে প্রসন্ন চিত্তে পবিত্র এছলাম ধর্মের গৌরব—শ্রাব্যের মর্যাদা রক্ষা এবং এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর জন্ত সম্মুখ সমরে জীবনোৎসর্গ করিয়া-ছিলেন । অকাতরে শত শত অস্ত্রের আঘাত সহ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শত্রু সৈন্য নিপাত সাধনে বিরত হন নাই । যদি তাঁহারা দারুণ পিপাসায় কাতর না হইতেন, তাহা হইলে কারবালার যুদ্ধে কুফি-সৈন্য চতুর্গুণ নিহত হইত । পিপাসায় তাঁহাদের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল ; ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল ; এই অবস্থায়ও সেই মুষ্টিমেয় খোদাগত প্রাণ আদর্শ মোছলমানগণ যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না । আল্লাহ তা-বার ছাচ্চা ‘বান্দাঃ’—হজরত নবী করিম (ছালিঃ)-এর অকপট ভক্ত ও ওয়তগণ কারবালা যুদ্ধে পবিত্র ধর্মের যে

* কোনও কোনও গ্রন্থে এমাম ছাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আলী আছগর নামে অভিহিত হইয়াছেন ।

আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন ; তাহা কেয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে । হজরত এমাম ছাহেব (রাজিঃ) যদি এছলামের গৌরব ও আত্ম-মর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া পাপাচারী এব্নে যেয়াদ-বদনেহাদ ওবায়দুল্লাহ দরবারে উপস্থিত হইতেন, এবং এষিদের খেলাফৎ স্বীকার পূর্বক উহার হস্তে বস্য়েত করিতেন, তবে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদিগের জীবন রক্ষা হইত । হযরত দেয়েন্নে উপস্থিত হইলে এষিদ তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিত : তাঁহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বৃত্তিরও বরাদ্দ করিত ; কিন্তু তিনি ছফ্রিয়াশীল ধর্মদ্রোহী এষিদের খেলাফৎ স্বীকার করিতে কোনও ক্রমেই ইচ্ছুক ছিলেন না । আর পিতৃ-ভৃত্য যেয়াদের পুত্র পাপাচারী ওবায়দুল্লাহ দরবারে তিনি গিয়া এষিদের নামে বস্য়েত করিবেন, ইহা ত একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল । পাপাচারী এব্নে যেয়াদ যাহার পিতার অগ্রে প্রতিপালিত ও গর্দভের ন্যায় ছুষ্টপুষ্ট হইরাছিল ; তাঁহার প্রতি এই অকৃতজ্ঞতা মূলক নির্দয় ব্যবহার—এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ।

অবশেষে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) স্বীয় পরম ভক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর বুদ্ধ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতৃপুত্রগণ, ভাগিনেরগণ এবং পুত্রগণ,—সকলকে হারাইয়া একাকী রহিয়া গেলেন । ‘খিমায়’ (শিবিরে) স্ত্রীলোকগণ এবং একমাত্র পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র আলী ওস্ত্—অর্থাৎ এমাম য়য়নাল আবেদীন (রাজিঃ) ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট ছিলেন না । হৃদয়হীন পাষাণ ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যেয়াদ, তাহার উপযুক্ত চেলা-চামুড়া ওমর-বিন্-ছারাদ ও শেমরের নিকট একুপ ভীষণ আদেশ ও পাঠাইরাছিল যে, এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর (পবিত্র) মস্তক কাটিয়া তাঁহার লাশ (মৃতদেহ) অশ্ব পদ-তলে দলিত এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিবে ।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম যখন একাকী মাত্র রহিয়া গেলেন, তখন তিনি শত্রুপক্ষকে যেরূপ অসাধারণ ও অতুলনীয় বীরত্বের

সহিত আক্রমণ করিলেন, তাহা দেখিবার জন্য তদীয় 'হামরাই' (সঙ্গী)
 দিগের মধ্যে কেহই তখন অবশিষ্ট ছিলেন না, তিনি ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায়
 হুর্কৃত কুফীদিগকে আক্রমণ করিয়া ঝড়ে নিপতিত কদলী গাছের ন্যায়
 ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন । কখনও সম্মুখ দিকে, কখনও দক্ষিণ
 দিকে, কখনও বাম দিকে অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া শত্রুদিগকে ভূপাতিত
 করিতে লাগিলেন । তাঁহার সেই অমানুষিক বীরত্বের সম্মুখে আজ
 কেহই তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না । নিদারুণ শোক-দুঃখে তাঁহার হৃৎপিণ্ড
 বিদীর্ণ হইতেছিল, দারুণ পিপাসায় তাঁহার ছাতি ফাটিয়া যাইতে ছিল,
 মোহলমান নামধারী পাষণ্ড হৃদয় পাষাণদিগের নেযাঃ তরবারি ও তীরের
 আঘাতে তাঁহার শরীর জর্জরীত হইতেছিল, সর্বাঙ্গ দিয়া রুধির ধারা
 প্রবাহিত হইতে ছিল, তবু তিনি ক্রোধিত কেশরীৰূপে শত্রু সংহার কার্যে
 ব্যাপৃত ছিলেন । কত কুফী বীরের ছিন্ন মস্তক ভূতলে গড়াগড়ি দিতে
 লাগিল, কাহাকেও তরবারির আঘাতে বিধণ্ডিত করিলেন, কেহ-ছিন্ন
 বাহু হইয়া ভূতলে বিলুপ্ত হইতে লাগিল, কাহারও মস্তক হইতে
 কোমর পর্য্যন্ত ছুই ফাঁক হওয়াতে বিরাট তাল তরুর ন্যায় ভূপতিত
 হইল, কাহারও কোমরের উর্দ্ধভাগ তরবারির আঘাতে বিধণ্ডিত হইল ।
 তাঁহার ঈদৃশ অসামান্য বীরত্ব দর্শনে নরাধম ওমর-বিন্-ছায়াদ ও নর
 পিষাচ শেমর-যিল যোশন একে অপরকে বলিতেছিল, আমরা একরূপ
 বাহাদুর ও অতুলনীয় বীরপুরুষ অজ্ঞাপি দেখি নাই । বীরেন্দ্র কেশরী
 হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর বীরপুত্র হজরত এমাম হোছেন আলায়-
 হেচ্ছালাম, পিতার উপযুক্ত তনয়-রত্নই ছিলেন ; মহামান্য শেরেখোদা
 (রাজিঃ)-এর পুত্র আজ 'শেরে নর' সদৃশ শত্রুদল নিপাত করিতেছিলেন ।
 কিন্তু সহস্র সহস্র শত্রুর সম্মুখে একজন বীরপুরুষ কতক্ষণ তিষ্ঠিতে
 পারেন—কত সময় আত্ম-রক্ষা করিতে পারেন ? তাঁহার বীরত্ব-কাহিনীতে

কোনও রূপ কল্পনা বা অতি রঞ্জনের লেশমাত্রও নাই । বনি-হাশেমের গৌরব স্তম্ভ, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ)-এর পরম স্নেহাধার দৌহিত্র, হজরত শেরে খোদার প্রিয়তম পুত্র, হজরত ফাতেমা সোহরাঃ (রাঃ—আঃ)-এর চক্ষের পুতুলী, হজরত এমাম হাছন (রাজিঃ)-এর স্নেহাস্পদ অনুজ, ধর্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) আজ অতি অন্তায় রূপে মোছলমান নামধারী দুর্বৃত্ত পাষণ্ডদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আল্লাহ্, তা-লার পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্বক রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন । আজ পবিত্র আশুরার দিন—পবিত্র জুমার দিন, পাষণ্ড কুফিগণ এহেন পবিত্র দিনে কি ভীষণ পাপানুষ্ঠানেই না প্রবৃত্ত হইয়াছে । এমাম আলায়হেছালামের মহামান্ন মাতামহ (ছালঃ) মাত্র ৫০ বৎসর অপেক্ষাও কম সময় পূর্বে হইলোক ত্যাগ করিয়াছেন, এই অল্পকাল মধ্যে মহানবীর একদল পাপীষ্ঠ, ‘যখম’ (শিষ্য), তদীয় পরম-স্নেহভাজন দৌহিত্র-রত্নকে শহীদ করিবার রণক্ষেত্রে দানব-বেশে অবতীর্ণ ; পাষণ্ডদিগের খোদা ও রচুলের ভয় হইল না, পরলোকের চিন্তা হইল না, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া আনিয়া, আজ তাঁহার হত্যা কার্য সম্পাদনে পরমোৎসাহে অগ্রসর । কিন্তু তাহাদের বহু পাপাচারী, বহু নরাধম, মহামান্ন এমাম আলায়হেছালামের পরম ভক্ত অনুচর বৃন্দের দ্বারা, ভ্রাতা-ভ্রাতৃপুত্র-ভাগিনের ও পুত্রগণের দ্বারা, ও তাঁহার স্বহস্তে নিহত হইয়া জাহান্নমবাসী হইয়াছে ; হতাবশিষ্ট নর-পিশাচগণ দূর হইতে তীর ও নেযাঃ (বল্লম বা বর্শা বিশেষ) নিক্ষেপ করিতেছে ; তদ্বারা মহামান্ন এমাম আলায়হেছালামের পবিত্র দেহে ৪৫টি তরবারি ও নেযার, আর ৩৫টি তীরের ‘যখম’ হইয়াছিল । কিন্তু এই ভীষণ ‘যখম’ (অস্ত্রের আঘাত) লইয়া ও তিনি শত্রুর নিপাত সাধন করিতেছিলেন । অন্য রওয়াকেত অনুসারে তাঁহার পবিত্র দেহে ৩৩টি ‘যখম’ নেযার ও ৪৩টি

‘যথম’ তরবারির হইয়াছিল ; তদ্যতীত অসংখ্য তীরের যথম ছিল । প্রথমে তিনি অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতেছিলেন ; কিন্তু যখন তাঁহার প্রিয় অশ্বটি মারা গেল, তখন পদাতিক রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । শত্রুদলের মধ্যে ইহা কেহই ইচ্ছা করিত না যে, হজরত এমাম আলায়হেছালাম আমার হস্তে শহীদ হন ; বরং সকলেই আক্রমণ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে—পাশ কাটাইতে চেষ্টা পাইত ; এবং তাঁহাকে আপনার নিকট হইতে দূরীকর্ত্তা রাখিতে চেষ্টা করিত । অবশেষে দুরাশ্বা শেষর-যিল-ঘোশন ৬ জন যোদ্ধাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে ভীমবেগে আক্রমণ করিল ; তন্মধ্যে, এক ব্যক্তির তরবারির আঘাতে তদীয় পবিত্র বাম হস্ত থানি ছিন্ন হইয়া গেল । তিনি দক্ষিণ হস্তে উহাকে তরবারির আঘাত করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দক্ষিণ হস্তথানি আর এক পাষণ্ডের তরবারির আঘাতে এমনভাবে ‘মজরুহ্’ (আহত) হইল যে, তিনি আর তরবারি উত্তোলন করিতে পারিলেন না । এই সময় পশ্চাদ্ধিক্ হইতে দুর্কৃত্ত ছনান-বিন্-আনছ নখরী সবলে নেযাঃ নিক্ষেপ করিল ; ঐ নেযাঃ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল । আহা ! এই ভীষণ আঘাতেই তিনি ভূপতিত হইলেন । নব্বাথম যখন নেযাঃ তানিয়া বাহির করিল, তখনই তাঁহার পবিত্র অমর আত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক “তুহুতল ফেরদওছে” চলিয়া গেল (ইচ্ছা লিঙ্গাটহ ওয়া ইচ্ছা এলায়হে রাযেউন) । ইহার পর মালাউন শেষর, কিংবা তাহার আদেশে তদীয় কোনও সঙ্গী; এমাম আলায়হেছালামের পবিত্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল । কেবল তাহাই নহে, নর-পিশাচ ওবারুজ্জার আদেশানুযায়ী দুরাচার শেষর ১২ জন অশ্বারোহী ‘মতয়ন’ (নিযুক্ত) করিল, উহারা তাঁহার

পবিত্র দেহের উপর অশ্রু প্রধাবিত করিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্থি রাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল । পৃথিবীতে একুশ নৃশংস আচরণের দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে । এই মানুষ গুলি দৈত্য-দানব বা হিংস্র পশু হইতেও নৃশংস ছিল । মোছলমান দূরে থাকুক, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরাও এই শোচনীয় ঘটনার বিষয় পাঠ করিয়া শোক-হঃখে মুহমান হন । দুনিয়াতে কোনও ধর্ম-প্রচারকের পুত্র-পৌত্র বা দৌহিতের প্রতি তাঁহার ভক্ত বা শিষ্য মণ্ডলী একুশ নৃশংস পৈশাচিক ব্যবহার করে নাই । পরবর্তী ত্রয়োদশ শত বৎসর পর্যন্ত মোছলমানগণ এই সকল পাপের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিতেছে—আর কেয়ামত পর্যন্ত করিবে । কুফার অধিবাসীদিগের মধ্যে বাহারা এই পাপাচুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল, এবং পাপাচারী ওয়ায়হুলাহ, ওমরু-বিন্-ছায়াদ, শেমর-ঘিল ঘোশন প্রভৃতি এক একটি জীবন্ত পিশাচ ছিল ; উহারা মোছলমান কেন ? মানব নামেরও কলঙ্ক । উহারা দুনিয়াতেই পাপের পূর্ণ প্রতিফল ভোগে করিয়াছিল ; পরকালের বিষয় আল্লাহ তালাই জানেন ।

অতঃপর কুফি পাষাণগণ হজরত এমাম আলায়হেছালামের ‘খিমাঃ’ (শিবির) লুণ্ঠন করিল । “আহ্লে বয়েতঃ” (আঁ হজরত [ছালঃ] এর পরিবারবর্গ—অর্থাৎ তাঁহার বংশের মহামাননীয়া মহিলা) দিগকে বন্দী করিল । এমাম আলায়হেছালামের কল্প কনিষ্ঠ পুত্র হজরত এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ)-এর প্রতি যখন নরাদম শেমর ঘিল ঘোশনের দৃষ্টি পতিত হইল, তখন সে তাঁহাকেও হত্যা করিতে চাহিল ; কিন্তু ওমরু-বিন্-ছায়াদ তাহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে স্তম্ভ রাখিল । হজরত এমাম আলায়হেছালামের পবিত্র মস্তক নবারক ও আহ্লে বয়েত্কে বন্দী অবস্থায় কারবালার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কুফায়, নর-পিশাচ এব্নে যেসাদের নিকট পাঠাইল ; কুফায় ইঁহাদিগের সম্বন্ধে ‘তশ্-হীর’ (মন্দভাবে

ঘোষণা—বে-আদবীর সঙ্গে তাঁহাদের বিষয় প্রচার) ■ করা হইল । অবশেষে ছরাচার এব্নে যেমাদ এক দরবার আহ্বান করিল, হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র মস্তক এক ‘তশ্তে’ (খালা বা ঐ শ্রেণীর কোনও পাত্রে) রাখা হইল ; নরাদম ওবায়দুল্লাহ্ ঐ পবিত্র মস্তকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক বে-আদবী জনক কথা বলিল ; অতঃপর এই ঘটনার তৃতীয় দিবসে দুর্কৃত্ত শেমর বিল যোশনকে এক ‘দস্তাঃ’ (দল) সৈন্ত সহকারে, উক্ত ‘ছের মোবারক’ (পবিত্র মস্তক) ও বন্দীদিগকে দেমেশ্কে এযিদের নিকট পাঠাইয়া দিল । এই পবিত্র মস্তকের ‘কারামত’ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থে বহু অপূর্ব ঘটনার উল্লেখ আছে ; উহার সকল ‘কারামত’ প্রামাণ্য না হইতে পারে, কিন্তু বহু ‘কারামত’ ঐতিহাসিকদিগের সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রামাণ্য । বাহা হউক, উক্ত পবিত্র মস্তক ও পীড়িত হজরত বরনাল আবেদীন (রাজিঃ) এবং আহ্লে বয়েত (আ হজরত [ছালঃ]-এর বংশীয় শিশু ও মহিলাগণ) দেমেশ্কে এযিদের নিকট যখন পহুছিল ; হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ছিন্ন মস্তক সে যখন দেখিতে পাইল, তখন সে সেই প্রকাশ্য দরবারে জ্বন্দন করিয়া উঠিল ; এবং বলিতে লাগিল, এই ‘ছমিতাঃ’-পুত্রকে (এব্নে যেমাদ বদ নেহাদকে) আমি কবে হুকুম দিয়াছিলাম যে, (হজরত) এমাম হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-কে ‘কতল’ (শহীদ—হত্যা) করে । তৎপর পাষণ্ড শেমর-বিল-

* এস্থলে “ তশ্-হীর ” অর্থে মহামান্য এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর ছের ‘মোবারক’ (পবিত্র মস্তক) নেযায় বিক্রয় করিয়া আহ্লে বয়্য়েতের সঙ্গে কুফা নগরের রাজপথে ভ্রমণ করাইল ; আর রাজদ্রোহীর প্রতি এইরূপ শাস্তি বিধান করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করাইল—অর্থাৎ অপমানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল ।

যোশনও অন্যান্য এরাকীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি ত তোমাদের আনুগত্য স্বীকারে ও আমার নামে 'বয়্য়েত' করাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম, তোমরা (হজরত এমাম) হোছেন-বিন্-আলী (রাজিঃ)-কে কেন হত্যা করিলে ? দুর্বৃত্ত শেমর যিল যোশনও উহার 'হামরাহী' (সঙ্গীয়) পাষণ্ডগণ আশা করিয়াছিল, তাহাদের ঈদৃশ পৈশাচিক ও দানবীয় কার্যে এষিদ আমাদের প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবে ; এবং আমাদিগের 'এব্-যত্' (সম্মান) খুব বাড়াইবে ; কিন্তু এষিদ উহাদিগকে পুরস্কৃত এবং সম্মানিত করিবে দূরে থাকুক, বরঞ্চ উহাদের প্রতি 'নাখুশী' (অসন্তুষ্টি—বিরক্তি) ও 'নারাজী' প্রকাশ করিল ; আর উহাদিগকে ঐ অবস্থায়ই কুফার ফেরত পাঠাইয়া দিল । পাষণ্ডগণ আপনাদের কাল মুখ লইয়া, নিতান্ত 'বেযার' হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল । পাপাচারী এব্-নে যেমাদ ও উচ্চতম পুরস্কার, উচ্চতম পদ প্রাপ্তি এবং ধন্যবাদ প্রাপ্তির যে আশা করিয়াছিল, তাহাও নিরাশার পরিণত হইল ; তখন উহার হৃদয়ে যেন শত শত কালসর্প দংশন করিতে লাগিল । 'কমবখ্-তের' (হতভাগার) কহ্ (আত্মা) আরও 'ছেয়াহ্' (কাল) হইল ।

এষিদ অতঃপর দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, (হজরত এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর মাতা, আমার মাতা অপেক্ষা 'আচ্ছা' (উত্তম—শ্রেষ্ঠ) ছিলেন ; উহার 'নানা' (মাতামহ) আঁ হজরত (ছালঃ) সমুদয় রছুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আদমের আওলাদের 'ছরদার' (নেতা) ছিলেন । কিন্তু আমার পিতা মোবিয়া (রাজিঃ) ও হজরত আলী (রাজিঃ)-এর মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ ছিল ; সেই সূত্রে আমার সঙ্গে ইঁহার মনোনালিন্ত ঘটিয়াছিল ; (হজরতে) এমাম হোছেন (রাজিঃ) ও উহার পিতা হজরত আলী (কঃ—ওঃ)

বলিতেন, ষাহাদের পিতামাতা আচ্ছা হয়, সেই ব্যক্তিই খলিফা হইবার যোগ্য ; কিন্তু কোরআন শরীফের এই আয়াতের প্রতি তাঁহারা ‘গওর’ (মনোযোগ প্রদান) করেন নাই যে,—

“ কুলিল্লা হুম্মা মালেকাল মোল্কে তুতেল মোলকা মান তাশাও ”
(আয়াত শেষ পর্য্যন্ত) । অবশেষে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, খোদা তা-লা আমার অল্পকূলেই ‘করছলাঃ’ (মীমাংসা) করিয়াছেন ।

অতঃপর এই কয়েকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত ‘মেহমান’ (অতিথি) স্বরূপ স্বীয় মহলে রাখিল ; মহাসম্মানিতা মহিলা (আত্মলে বয়েত) দিগকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিল ; তাঁহারা এযিদের ‘মহল ছরাম’

(অন্তঃপুরে) প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, এযিদের পরিবারস্থ মহিলাগণ ঐরূপ ক্রন্দন, বিলাপ ও শোক প্রকাশ করিতেছেন—যেক্রমে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর ভগিনী ও ‘আহলিয়া’ (স্ত্রী) প্রভৃতি, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) এবং অপরাপর শহীদদিগের শোক প্রকাশ করিতেছিলেন । কিয়দিবস শাহী ‘মেহমান’ (অতিথি) রূপে থাকিয়া এই ‘বরবাদ শোদাঃ’ (ধ্বংস প্রাপ্ত) কাফেলাঃ দেমেশ্কে হইতে মদীনাতিমুখে রওয়ানা হইল । এযিদ ইহাদিগকে বথোচিত পরিমাণ অর্থাদি দিয়া সম্মানে বিদায় করিল । আর আলী-বিন্-হজরত এমাম হোছেন—এমাম যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ)-কে সর্ব্ব-প্রকার ‘এমদাদ’ (সাহায্য) করিতে প্রতিশ্রুত হইল । তদ্যতীত ইহাও বলিয়া দিল যে, আপনার যখন যাহা প্রয়োজন হয়, আমাকে জানাইলেই আমি তাহা পাঠাইয়া দিব ।

এযিদ নানাপ্রকার পাপ কার্যে লিপ্ত থাকিলেও, হজরত এমাম আলয়হেচ্ছালামের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পাপীষ্ঠ এব্নে যেমাদকে কখনও আদেশ প্রদান করিয়াছিল না । ওবারুজ্জার নামে তাহার যে সকল আদেশ-

পত্র গিয়াছিল, ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; উহার কোনও আদেশ-লিপিতেই এরূপ কোন হুকুম ছিল না যে, হজরত এমাম আলার-হেচ্ছালামকে ‘কতল’ (শহীদ) করিবে, কিংবা তাঁহার ও তদীয় পরিবার বর্গের প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার-অনাচার, অসম্মান জনক ব্যবহার ■ বে-আদবী করিবে । প্রধানতঃ তাঁহাকে কুফার প্রবেশ করিতে বাধা দিবার জন্তই আদেশ ছিল । পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরার প্রমাণিত হইতেছে যে, এই অত্যাচার ও হৃদয়-বিদারক হত্যাকাণ্ডে সে খুবই দুঃখিত হইয়াছিল । সে যদি তাঁহার আদেশের বিপরীত আচরণ করিবার জন্ত পাষাণ্ড এব্‌নে যেয়াদ, পাপীষ্ঠ শেমর-যিল বোশন-প্রমুখ দুর্বৃত্তদিগের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিত, তবে তাহার দুর্গামের অনেকটা লাঘব হইত । সে “ লালত-মালামত ” হইতে অনেকটা রক্ষা পাইত । একপ আদেশ-অবমাননা কারীদিগকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিলে, এতৎ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান পরতা প্রকাশ পাইত । কিন্তু সে উহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছিল । খোদা তালার উদ্দেশ্য মানুষের বুঝিবার শক্তি নাই ; তিনি এমাম আলারহেচ্ছালাম, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বর্গ, পুত্র ও ভক্ত অনুচরদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করাইয়া শাহাদতের উন্নত আদর্শ দেখাইয়াছেন ; এবং এই শোকাবহ ঘটনাটিকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন । আজ কোটি কোটি কণ্ঠে তাঁহাদের পবিত্র আত্মায় জন্ত মঙ্গল কামনা করা হয়, পক্ষান্তরে দুর্বৃত্ত হত্যাকারীদিগের প্রতি “ লালত-মালামত ” (অতিসম্পাত) করা হইয়া থাকে । এই অতি অত্যাচার অনুষ্ঠান-কারীদিগের প্রতি অতি অল্প কাল মধ্যেই যে কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ; তাহাও ‘গওর’ এবং ‘থেয়াল’ করিবার বিষয় । পাষাণ্ড-দিগের সকলেই সমুচিত দণ্ড ভোগ করিয়া ছিল ; কেবল তাহাই নয়— তাহাদের পুত্র কন্যা—সন্তান-সন্ততি বর্গের মধ্যেও অনেকেই এই মহাপাপের

প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অতি শোচনীয় ভাবে নিহত হইয়া ছিল ; কারবালা-কাণ্ডে যে সকল পাষণ্ড ‘শরীক’ (সহযোগী) ছিল ; আল্লাহ্ তায়ালায় পার্থিব দণ্ড বিধান হইতে তাহাদের কেহই অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল না । ঐ কাণ্ডের প্রধান প্রধান নেতাদিগের ‘নাপাক’ (অপবিত্র) দেহগুলি ও অতি ঘৃণিত ভাবে ধ্বংস বা আগুনে পোড়াইয়া ভস্মরূপে পরিণত করা হইয়াছিল । এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে কৌশলময় আল্লাহ্ তা-লার কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায় ।

কারবালায় শাহাদত প্রাপ্ত মহাত্মা- পণের নামের তালিকা ।

১। ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম
এব্নে হজরত আলী (কঃ—ওঃ) ; ২। হজরত ওছমান-বিন্-আলী
(রাজিঃ) ; ৩। হজরত আব্বাছ এব্নে আলী (রাজিঃ) ; ৪। হজরত
মোহাম্মদ এব্নে আলী (রাজিঃ) ; ৫। হজরত জাফর এব্নে আলী
(রাজিঃ) ; ৬। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আলী (রাজিঃ) ; ৭। হজরত
কাছেম এব্নে এমাম হাছন (রাজিঃ) ; ৮। হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-
হাছন (রাজিঃ) ; ৯। হজরত ওমর এব্নে এমাম হাছন (রাজিঃ) ;
১০। হজরত আবুবকর এব্নে এমাম হাছন (রাজিঃ) ১১। হজরত
আলী আকবর এব্নে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ; ১২। হজরত
আলী আছগর এব্নে হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ) ; ১৩। হজরত
মোহাম্মদ-এব্নে আবদুল্লাহ্-বিন্-জাফর তইয়্যার (রাজিঃ) ; ১৪। হজরত

মওন-এবনে আবদুল্লাহ্-বিন্-জোফর তইয়্যার (রাজিঃ) ; ১৫ । হজরত আবদুল্লাহ্-এবনে মকিল (রাজিঃ) ; ১৬ । হজরত আবদুর রহমান এবনে মকিল (রাজিঃ) ; ১৭ । হজরত জোফর এবনে মকিল (রাজিঃ) । এই ১৭ জন মহাত্মা “ আহ্লে বয়েত আত্‌হার ” কারবালায় শহীদ হইয়া-ছিলেন । তৎপূর্বে কুফায় (১) হজরত মোছলেম-বিন্-মকিল (রাজিঃ) ও তাঁহার দুই পুত্র (২) এব্রাহিম (রাজিঃ) এবং (৩) মোহাম্মদ (রাজিঃ) শহীদ হন ; সুতরাং ইহাদের (নবী বংশের) সংখ্যা মোট ২০ বিংশতি জন ।

কারবালায় অন্যান্য শহীদগণের নাম ।

১ । হজরত হোর-বিন্-এযিদ আল্ রেয়াহী ; ২ । হজরত মছম্ব-বিন্-এযিদ আল্ রেয়াহী (হোবের ভ্রাতা) ; ৩ । হজরত আলী-বিন্-হোর ; ৪ । হজরত যযাঃ (হজরত হোবের ক্রীতদাস) ; ৫ । হজরত যবির-বিন্-হেছান আছদী ; ৬ । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর ; ৭ । হজরত বরির-বিন্-হছির হমদানী । ৮ । হজরত ওহব-বিন্-আবদুল্লাহ্ আল্ কল্বী ; ৯ । হজরত মোমক-বিন্-খালেদ ওব্দী ; ১০ । হজরত খালেদ-বিন্-ওমর-ওব্দী ; ১১ । হজরত ছায়াদ-বিন্-হনযলাঃ যেতিমি ; ১২ । হজরত ওমর-বিন্-আবদুল্লাহ্ নদহজী ; ১৩ । হজরত য়েমা-বিন্-আনছ ; ১৪ । হজরত ওকাছ-বিন্-মালেক ; ১৫ । হজরত ছরিহ-বিন্-মবিদ ; ১৬ । হজরত মোছলেম-বিন্-মওছজঃ আছদী ; ১৭ । এবনে মোছলেম বিন্-মওছজঃ আছদী ; ১৮ । হজরত

বেলাল-বিন্-নাফের ছজলবী ; ১৯ । হজরত আবদুল্লাহ্ যিব্নী ; ২০ । হজরত এহিয়া-বিন্-ছলিম মাযনী ; ২১ । হজরত আবদুর রহমান-বিন্-য়রুহ-গফ্-ফারী ; ২২ । হজরত মালেক-বিন্-আনছ ; ২৩ । হজরত য়মরু-বিন্-মতালম আল জয়ফি ; ২৪ । হজরত কয়েছ-বিন্-ময়িনাঃ ; ২৫ । হজরত হাশেম-বিন্-মতবাঃ-বিন্-ওকাছ ; ২৬ । হজরত হবিব-বিন্-মজাহের ; ২৭ । হজরত হরাঃ ; ২৮ । হজরত য়েযিদ এব্-নে মহাজর জয়ফি ; ২৯ । হজরত আনিছ-বিন্-ময়কল আছজি ; ৩০ । হজরত আবছ-বিন্-শয়শাকরী ; ৩১ । হজরত হজাজ-বিন্-মছরুফ জয়ফি ; ৩২ । হজরত ছয়েফ-বিন্-হারেছ-বিন্-ছরিয় ; ৩৩ । হজরত মালেক-বিন্-আবদুল্লাহ্-বিন্-ছরিয় ; ৩৪ । হজরত হনজলাঃ-বিন্-ছায়াদ যজলী ; ৩৫ । য়েযিদ-বিন্-যেয়াদ আল্ রাছবাঃ ; ৩৬ । হজরত ছয়ীদ-বিন্-আল্ থফি ; ৩৭ । হজরত থযাদাঃ-বিন্-হারেছ ; ৩৮ । হজরত য়মরু-বিন্-থবাদাঃ ; ৩৯ । হজরত মরত-বিন্-আবি ছরত গফ্-ফারি ; ৪০ । হজরত মোহাম্মদ-বিন্-মকদাদ ; ৪১ । হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-আবি দোজানাঃ ; ৪২ । হজরত ছায়াদ বরদাঃ ; ৪৩ । হজরত আলী করম ; ৪৪ । হজরত কয়েছ বিন্-রবিয় ; ৪৫ । হজরত আশয়ছ বিন্-ছায়াদ ; ৪৬ । হজরত য়মরু-বিন্-করতাঃ ; ৪৭ । হজরত আজমাঃ ; ৪৮ । হজরত হহাদ রেজওয়ালোম্মাহে তায়লা আজমায়ীন ।

পূর্বোক্ত ১৭ জন আহ্লে বয়েত আত্-হার শহীদেব পবিত্র দেহ, জনাব হজরত ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ (এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম) এর পবিত্র মযার শরীফের বামদিকে একই কবরে (গজ-শহীদান রূপে) সমাধিস্থ করা হইয়াছিল ; সুতরাং ইহাদের মযার (সমাধি) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নির্মিত হয় নাই । কেবল মাত্র হজরত আব্বাছ (রাজিঃ)-এর মযার তাঁহার শাহাদতের স্থান—গাদর পান্ডার রাস্তায় স্বতন্ত্র ভাবে

নির্মিত হইয়াছে । খাছ ও আঁম মোছলমানগণ ঐ পবিত্র মবার শরীফ স্বতন্ত্র ভাবে এখনও য়েয়ারত করিয়া থাকেন ।

ইহার ব্যতীত আর যে সকল আন্হার ও আওয়ান, জনাব হজরত ছৈয়দশ, শোহাদার সঙ্গে কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মযারের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না ; কিংবা কোনও কেতাবে ঐ সকল স্থানের নির্দেশ পাওয়া যায় না । কোনও কেতাব ছহিহার লিখিত আছে, কারবালার সমুদয় শহীদগণের মবার শরীফ বেষ্টন করিয়া এক প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল ; কিন্তু বর্তমান সময়ে উহার এমনই বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, উক্ত প্রাচীরের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না । অধুনা মযায় শরীফ অপূর্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে , এবং সেই কারবালা ক্ষেত্র একটি সুদৃশ্য মনোরম বৃহৎ শহরে পরিণত হইয়াছে ।

ওবায়দুল্লাহ্, এব্নে য়েয়াদদের 'মামুছি' (মৈনরাস্তা) ।

পাষও ওবায়দুল্লাহ্ এব্নে য়েয়াদ মনে করিয়াছিল, হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর কতন্ (হত্যাকাণ্ড)-এর পর আমার খুবই 'কদরদানী' (সম্মান—প্রতিপত্তি) হইবে । কিন্তু এষিদ উহার প্রতিপত্তি বাড়াইবে দূরে থাকুক, কারবালার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনার পর ছলম-বিন্-য়েয়াদকে খোরাছানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া, ইরানের যে সকল ছুবা বস্তার এলাকাভুক্ত ছিল, এবং ছুরাচার ওবায়দুল্লাহ্ প্রধান

রাজ-প্রতিনিধি রূপে ঐ সকল ছুবা শাসন করিত, উহার অধিকাংশও ছলমের শাসনাধীন করিয়া দিল । আর শাহের একদল প্রবল সৈন্ত ছলমের অধীনে স্থাপন পূর্বক উহাকে কুফাভিমুখে রওয়ানা করিল । তৎসঙ্গে ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেয়াদকে এই মর্ম্মের এক পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে, তোমার অধীনে এরাকের যে পরিমাণ সৈন্ত আছে, উহাদের মধ্য হইতে ৬০০০ ছয় হাজার সৈন্ত—যাহাদিগকে ছলম পছন্দ করে—উহার সঙ্গে যাইতে দাও । ছলম কুফায় পঁহুছিয়া ঐ পত্র তাহাকে প্রদান করিল । এই ঘটনায় ওবায়দুল্লাহ প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল ; সে তখন হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের ‘কতল’ (হত্যাকাণ্ড) সম্বন্ধে ‘আফ্-ছোছ’ (আক্ষেপ) করিতে লাগিল । সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যদি এমাম ছাহেব (রাজিঃ) জীবিত থাকিতেন, তবে এখিদ আমার ‘এহ্-তিয়াজ’ (আবশ্যকতা) অনুভব করিত ; এবং আমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াইতে ক্রটি করিত না । কিন্তু এক্ষণে সে ‘বে-ফেকের’ (নিশ্চিন্ত) হইয়াছে, এজন্যই সে আমার শাসনাধীন রাজ্য ও সেনাদল আমার অধিকার ও অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল । ছলম কুফায় পঁহুছিয়া যখন সৈন্তদল গণনা করিল ; এবং তাহাদের ‘ছরদার’ (সেনানী)-দিগকে বলিল, তোমাদের মধ্যে কে কে আমার সঙ্গে খোরাছানে যাইতে চাও ? তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই ছলমের সঙ্গে যাইবার জন্য অতিমত প্রকাশ করিল । ওবায়দুল্লাহ্ বিন্-যেয়াদ রাত্রিকালে উহাদের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইল যে, আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা সকলেই কেন আমার অধীনতা ত্যাগ করিয়া ছলমের সঙ্গে খোরাছানাভিমুখে যাইতে চাহিতেছ ? উত্তরে কুফী সেনানায়কগণ বলিয়া পাঠাইল যে, তোমার নিকটে (অধীনে) থাকিয়া ত আমাদিগকে আহ্লে বয়্যেত নববী (রাজিঃ) দিগের শোণিতে স্ব স্ব হস্ত রঞ্জিত করিতে হইয়াছে ;

এক্ষণে ছলমের সঙ্গে গিয়া আমরা তুর্কী ও মোগলদিগের সঙ্গে জেহাদ করিবার 'মওকা' (সুবোগ) লাভ করিব, ইহা দ্বারা আমরা যদি পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত ও বিধান করিতে পারি । পর দিবস ছলম ৬০০০ বাছা বাছা কুফী সৈন্য ও সেনানী লইয়া খোরাছানাভিমুখে রওয়ানা হইল । তুরাত্মা ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-বেয়াদের কারবালার হৃদয়-বিদারক ঘটনার পর অপমান, অনুশোচনা ও আক্ষেপ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই ।

এই পাষণ্ড বর্ষের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের নামও গন্ধ থাকিত ; তবে মহামাণ্ড এমাম আলায়হেচ্ছালামকে সোজাসুজি দেমেশ্কে এবিদের নিকট যাইতে অনুমতি দিত ; বরং তাহার মনে অল্প প্রকার আশঙ্কা থাকিলে প্রহরী স্বরূপ একদল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতে পারিত । এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-কে মক্কা কিংবা মদীনায় ফিরিয়া যাইতে দিলেও এবিদ তাহার প্রতি কোনও রূপ দোষারোপ করিত বলিয়া মনে হয় না । এমাম ছাহেব (রাজিঃ) ও অতঃপর আর এবিদের বিপক্ষতাচরণ না করিয়া, হয় ত এবাদত-বন্দেগীতে অবশিষ্ট জীবনাতিবাহিত করিতেন ; রাজনীতির বন্ধুর ক্ষেত্রে আর পদার্পণ করিতেন না । এমাম ছাহেব (রাজিঃ)-এর বিরুদ্ধে ঐ নর-পিশাচের যুদ্ধ করিবার কোনও কারণও প্রয়োজনই ছিল না । ৭০।৭২ বা-জ'শ সংখ্যক এক প্রকার নিরস্ত্র ক্ষুদ্র দলের বিরুদ্ধে ৬৭ হাজার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য প্রেরণ করা, এবং পুনঃ পুনঃ ভীষণ বর্ষরতামূলক আদেশ পাঠান, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বহির্ভূত । আর হতভাগা মোছলমান নাম ধারণ করিয়া সেই পবিত্র ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার পরম ধার্মিক দোহিত্র-রত্নকে সদল বলে এরূপ নির্দয়ভাবে নিহত করা, সেই মৃতদেহ অশ্রু পদতলে মর্দিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণিত করা, মনুষ্যের আত্মা-বিশিষ্ট কোনও মানুষের কার্য্য নহে । পাষণ্ড একথা অবশ্যই শুনিয়াছিল যে, হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) তাঁহার এই দোহিত্র-রত্নকে কিরূপ স্নেহ

করিতেন ; ইনি তাঁহার বংশের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ছিলেন। পুত্র সন্তান
 হীন মহানবীর দুইটি দৌহিত্রই তাঁহার পুত্র স্থানীয় ছিলেন। ইহাদের
 দ্বারাই তাঁহার বংশ-তরু প্রতিষ্ঠিত ছিল ; আর হজরত এমাম হোছেন
 (রাজিঃ) একজন আদর্শ ধার্মিক পুরুষ যে ছিলেন, তাহাও এই ছুরাত্মার
 অবদিত ছিল না। কুফায় তাঁহার মহামান্ব পিতার খেলাফৎ ও
 সে দেখিয়াছিল। এইরূপ নৃশংস পাশব অত্যাচারের পরিণাম ফল কি,
 মোছলমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজে মোছলমান নামে পরিচিত
 হইয়া সে ইহা অবশ্যই জানিত। উহার এবং উহার উপযুক্ত
 অনুচর ও ‘তাবেদার’ ওমর-বিন-ছায়াদ এবং শেমর বিল-যোশন-প্রমুখ
 নির্দয় পাষাণগণের হৃদয় কি উপকরণে গঠিত ছিল, তাহা ধারণার অতীত।
 হজরত এমাম ছাহেবকে হত্যা করার কোন আদেশ এমিদ দিয়া ছিল
 না ; তাঁহার পবিত্র দেহের অবমাননা করা বা আহলে বয়েতের থিমাঃ
 (শিবির) লুণ্ঠন করা প্রভৃতি কার্যেরও কোন ইঙ্গিত-এশারা ছিল না ; তবু
 এই নরাধম কেন এরূপ পাশোচিত নৃশংস কার্য্য করিল, তাহা বুঝিতে পারা
 যায় না। আর কুফা শহরের মাটির যে কি গুণ ছিল, তাহাও খেয়ালের
 বহির্ভূত। অবশ্য এই নগরে হজরত এমাম আজম আবু হানিফাঃ
 (রহঃ) ও আরও বহু তাবেয়ীন বা তাবা-তাবেয়ীন এবং আলেম ও
 তাপস পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু সাধারণতঃ এই শহরের
 অধিবাসিগণ নির্দয়, চঞ্চলমতি, লোভী, অকৃতজ্ঞ ও অধর্ম্মাচারী ছিল।
 এই দোষেই কুফা-নগরী অচির কাল মধ্যে ধ্বংস-মুখে পতিত হয় ; বর্তমান
 কালে উহা একটি বিরাট শহরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ মাত্র।

এমাম বশরু রূপ শাপের প্রতিফল ও
শোচনীয় পৈশাচিক কার্যের
ভীষণ প্রতিক্রিয়া ।

অতঃপর এষিদের পাপাচরণ চরমে উঠিল । তাহার প্রেরিত পাষণ্ড সেনাপতিগণ মদীনা-তৈয়বাঃ আক্রমণ, বহু ছাহাবাঃ (রাজিঃ) ■ অসংখ্য মদীনাবাসীর শোণিতে ঐ পবিত্র নগরী প্লাবিত এবং আ হজরত (ছালঃ)-এর পবিত্র রওয মবারক আস্তাবলে পরিণত করিয়া, উহা কলুষিত করিল । এষিদ যেমন দুর্বৃত্ত ছিল, তেমন অশুচরও অনেক গুলি জুটিয়াছিল । হজরত মোবিয়া (রাজিঃ)-এর আফ্রিকা-বিজয়ী বিখ্যাত সেনাপতি য়োক্‌বার পুত্র মোছলেমের প্রতি মদীনাও মক্কা-বিজয়ের ভারার্পিত হয় ; তাহার সহকারী সেনাপতি ছিল হছিন-বিন্-নমির । এই উভয় নর-পিশাচ মদীনা-তৈয়বাঃ বিধ্বস্ত করিয়া মক্কায় হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে আক্রমণ করিবার জন্ত ধাবিত হয় ; পথিমধ্যে “ আবুয়া ” নামক স্থানে মোছলেম মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল ; সে মৃত্যুকালে হছিন-বিন্-নমিরকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিল । এই দুরাচার মক্কা-মোকাররমা অবরোধ ও আক্রমণ করে, যে দিন মক্কা আক্রমণ করা হয় ; ঠিক ঐ দিনই এষিদের দেমেশ্‌কে মৃত্যু হয় । অগত্যা হছিন-বিন্-নমির মক্কা-মোয়াজ্জমার অবরোধ পরিত্যাগ পূর্বক মদীনা-তৈয়বাঃ হইয়া দেমেশ্‌কে চলিয়া যায় ।

এষিদের মৃত্যুর পর খেলাফৎ লইয়া মহা গোলবোগ উপস্থিত হয় । আরব, এরাক, মেছের ও পারস্ত বাসিগণ হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন । দেমেশ্‌কে

এযিদের পুত্র ২য় মোবিয়া খলিফার পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে, মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয় । এবনে যেমাদ বদনেহাদ ও কুফা হইতে আসিয়া এই রাজনীতিক গোলযোগে যোগদান করে ।

ইতিমধ্যে নানা গোলযোগের পর মোখ্তার-বিন্-য়বিদ কুফার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করিলেন । তিনি কুফার শাসন কর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াই সৈন্য সেনাপতিদিগের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন, যে সকল কুফাবাসী কারবালার হত্যাকাণ্ডে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর । তদনুসারে কয়েকশত লোক ধরিয়া আনা হইল ; এবং ইহাদিগের সকলকেই নানাপ্রকার আযাবের সঙ্গে হত্যা করা হইল । ইহাদের মধ্যে যে সকল লোক ছলমের সহিত খোরা-ছানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই তুর্কী ও মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইয়া ছিল । হফছ্-বিন্ ওমর-বিন্-ছায়াদ যখন মোখ্তারের দরবারে উপস্থিত হইল ; তখন মোখ্তার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাপ এখন কোথায় আছে, এবং কি করিতেছে ? সে বলিল, পিতা বেকার অবস্থায় ঘরেই আছেন ; তাহা শুনিয়া মোখ্তার বলিলেন, সে রয় (এফাহান), তবরস্তান ও তেহারানের শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া এখন কেন ঘরে বেকার অবস্থায় চূপ করিয়া বসিয়া আছে—যে শাসন-কর্তৃত্বের লোভে সে একরূপ দুষ্কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল ; যদি উহাকে নিষ্কল্যা অবস্থায় ঘরেই বসিয়া থাকা ছিল ; তবে যখন এবনে যেমাদ বদনেহাদ হজরত রছুলোল্লাহ্ (ছালঃ)-এর বংশধরদিগকে ‘কতল’ (হত্যা—শহীদ) ও ‘গারত’ (ধ্বংস) করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তখন কেন সে গৃহে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিল না ; তাহা হইলে সে দুনিয়া (পৃথিবী) ও পরকালের ‘আযাব’ (শাস্তি) হইতে পরিত্রাণ পাইত । অত বড় একজন ছাহাবাঃ (রাজিঃ)-এর পুত্র হইয়া তাহার

মনে খোদা ও রছুলের ভয় হইল না ; এবিদ্ পলিদ্ ও এব্নে যেমাদ বদনেহাদের অধীনতায় দুর্জয় লোভের বশবর্তী হইয়া একুপ ভীষণ পাপানুষ্ঠান করিতে তাহার পাপ-হৃদয় : একটু ও বিচলিত হইল না । এক্ষণে সে কি ধার্মিক সাজিয়া নীরবে গৃহে অবস্থান করিতেছে ? অতঃপর সৈন্তদিগকে আদেশ করিল, পাষণ্ড ওমর-বিন্-ছায়াদকে আমার নিকট ধরিয়া লইয়া আইস । সৈন্তেরা তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহে গমন পূর্বক উহাকে ধরিয়া লইয়া আসিল । সে মোখ্তারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট ‘লানত-মালামত’ করিবার পর, পিতা ও পুত্র উভয়ের মুওপাত করিতে আদেশ দিলেন ; আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল ; অতঃপর তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর অন্ততম পুত্র হজরত মোহাম্মদ-বিন্-হানফিয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । তৎপর তিনি আদেশ করিলেন ; যাহারা ‘কাতেলানে’ আলী মকাম (হজরত এমাম ছাহেবের হত্যাকারী) দিগের মধ্যে ছিল, এবং যাহারা কারবালার যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল ; তাহাদের যাহাকে যেখানে পাইবে, বিনা জিজ্ঞাসা বাদে তাহাকে হত্যা করিবে, তাহাদের কোন আপত্তি বা ‘ফরিয়াদ’ শুনিবে না । মোখ্তার-বিন্-য়বিদ ছক্কির এই আদেশে কুফায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল । অনেকে এদিক ওদিক পলায়ন করিতে লাগিল । কিন্তু যাহাকে যেখানে পাওয়া গেল, তাহাকে সেখানেই হত্যা করা হইল ।

ইহার পর মোখ্তার, পাষণ্ড শেমর-যিল ঘোশনের অনুসন্ধানে স্বীয় ‘গোলাম’ (ক্রীত দাস) যরবীকে পাঠাইলেন । যরবী কতিপয় যোদ্ধ-পুরুষকে সঙ্গে লইয়া শেমরের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল । সেখানে গিয়া জানিতে পারিল, দুরাশ্রয় গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ; যরবী সদল বলে উহার সন্ধানে ছুটিল ; এক স্থানে গিয়া দেখিল, শেমর একদল

লোকের সঙ্গে অবস্থান করিতেছে ; যখন শেষর মুজীর সহচরগণ অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন তাহারা সচকিত ও আতঙ্কিত হইয়া উহাকে বলিল, ‘একিনান’ (নিশ্চয়ই) কাহার আবাদিগকে বন্দী করিবার জন্ত আসিতেছে ; বলিতে বলিতে তাহারা সকলেই উহাকে ঐস্থানে ফেলিয়া পলায়ন করিল । শেষর একাকী মাত্র সেখানে রহিয়া গেল । মোখ্তারের প্রেরিত অস্বারোহী দল তৎক্ষণাৎ তাহাকে ‘গেরেফ্তার’ (বন্দী) করিতে চেষ্টা পাইল ; শেষর তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল । কিন্তু আবদুর রহমান-বিন্-আবিল কনজুদ নামক জনৈক যোদ্ধা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এমন সজোরে ‘নেযাঃ’ (বড়শা) নিক্ষেপ করিল যে, সে সেই প্রচণ্ড আঘাতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । মোখ্তারের প্রেরিত লোকেরা উহার মস্তক কাটিয়া লইল, এবং উহার ‘নাপাক’ (অপবিত্র) দেহ অশ্ব পদতলে ফেলিয়া খুব মর্দিত করিল ; অবশেষে উহা কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল ; এবং উহার ছিন্ন মস্তক মোখ্তারের নিকট নিয়া উপস্থিত করিল । পাষণ্ড স্বীয় ভীষণ দুর্কার্যের প্রতিফল যথোচিত রূপে প্রাপ্ত হইল ।

অনন্তর মোখ্তার, ওমর-বিন্-আল্ হেজাজের গেরেফ্তারীর আদেশ প্রদান করিলেন ; আর উহাকে ধৃত করিবার জন্ত একদল যোদ্ধাপুরুষ পাঠাইয়া দিলেন । যখন উহারা তাহার অগুসরণে এক জঙ্গলে গিয়া পহুছিল, তখন দেখিতে পাইল, ওমর-বিনল্ হেজাজ প্রায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে । আর তাহার জিহ্বা মুখ হইতে অনেকটা বাহির হইয়া উঠা অবস্থায় রহিয়াছে । লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এ কি অবস্থা ? সে ‘এশারায়’ (ঈদ্রিতে) বলিল, ৩ দিন হইতে আমার ‘হলকে’ (কণ্ঠনালীতে) পানী প্রবেশ করিতে পাইতেছে না । দারুণ পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত । আমার সঙ্গে যে

মোশকে পানী ছিল, ঐ মোশক আপনা হইতে চানুনির দ্বার ছিদ্র হইয়া, সমুদয় পানী বাহির হইয়া গিয়াছে । দলস্থ এক ব্যক্তি কয়েক ফোঁটা পানী উহার হলকে (গলনালীতে) নিক্ষেপ করিল ; পানী টপ্কাইয়া দেওয়ার উহা গলনালীতে পঁহুঁছিবামাত্র উহাতে একটি ‘ছুরাথ’ (ছিদ্র) হইল ; এবং ছিদ্র-পথে পানীটুকু বাহির হইয়া গেল । ঐ সময় মোখ্তারের প্রেরিত লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল, ওমরু-বিনলু-হেজাজ, দেখিলি স্বীয় দুষ্কার্যের ফল ? তুই হজরত আব্বাছ (রাজিঃ)-এর মোশক ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলি, ইহা তোর সেই দুষ্কার্যের ‘বদলা’ (প্রতিদান) । এক্ষণে তুই এক ‘কাৎরাঃ’ (বিন্দু) পানীর জন্ত ছট্ফট্ করিতেছিস্ ! আর তোর পানীর মোশক ও গলনালী ছিদ্র হইয়া গিয়াছে । এই অবসরে এক ব্যক্তি তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে উহার শিরশ্ছেদন করিল ; এবং উহার সেই ছিন্ন [redacted] মোখ্তারের নিকট লইয়া গেল ; আর উহার দেহ ঐ স্থানেই আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইল । মোখ্তার-বিনু-রবিদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে পর্যন্ত হজরত এমাম আলায়হেছালামের হত্যাকারীদিগকে এক এক করিয়া হত্যা না করিব, তত্তাবৎকাল ‘বেস্তরের’ (বিছানার—শয্যার) সঙ্গে পাঠ লাগান আমার পক্ষে হারাম হইবে । এক্ষণে তিনি দিবারাত্রি এই ‘ফেকেরে’ (চিন্তায়) ‘মছরুফ্’ (মগ্ন—অভিভূত) থাকিতেন, এবং ‘কাতেলানে’ (হত্যাকারিগণ) এমাম আলায়হেছালাম ও ‘দোশ্মনানে’ (শত্রুগণ) আহলে বয়য়েত কে খুজিয়া খুজিয়া গেরেফ্তার করাইতেন, এবং উহাদিগকে নানাপ্রকার কঠোর শাস্তি প্রদান পূর্বক ‘কতল্’ করিতেন । তদনুসারে ওমরু-বিনু-আল হেজাজকে হত্যা করিবার পরে স্বীয় সৈন্য ও সেনাপতিদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন যে, হবিব, কয়েছ, বশির [redacted] আছুদকে ধৃত করিয়া আনয়ন কর । তাহারা এই দুর্বৃত্ত চতুষ্টয়কে

ধরিয়া মোখ্তারের নিকট আনয়ন করিল। মোখ্তার উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রে খোদার ভয়-বিরহিত পাষণ্ডগণ ! এক্ষণে বল্ ঐ সকল ‘বদ-ছলুকী’ : (দুর্ব্যবহার) ও ‘বে-আদবীর’ (অশিষ্টতার) কি শাস্তি তো দিগকে দেওয়া যায়—যাহা তোরা হজরত এমাম আলায়-হেচ্ছালামের প্রতি ‘রওয়া’ (সিদ্ধ—কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত) রাখিয়া-ছিলি। উহারা বলিতে লাগিল, মোখ্তার ! আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমরা পাপ হইতে তওবা : (অনুতাপ) করিতেছি। মোখ্তার বলিলেন, রে পাপচারিগণ ! ঐ সময় তাদের প্রস্তরময় হৃদয় কেন বিগলিত হইয়াছিল না—যখন হজরত নবী করিম (ছালঃ) এর ‘নওয়াছে’ (দোহিত্র—নাতি) তাদের নিকট দয়া ও শাস্তির জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; আজ আপনাদিগকে মৃত্যুর কবলে পতিত হইবার উপক্রম দেখিয়া দয়া-প্রার্থনা করিতেছি। আমি তাদের ঈশ্বর পাষণ্ড পিশাচদিগকে কিছুতেই জীবিত রাখিব না ; অতঃপর স্বীয় সৈন্ত-সেনাপতিদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন, যেরূপে এই পাষণ্ড বর্বরগণ হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার স্ববংশীয় পুরুষ এবং ভক্ত বৃন্দকে কারবালার সমরক্ষেত্রে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও যাতনা প্রদান পূর্বক নিহত করিয়াছিল, ইহাদিগকেও সেইরূপ ‘বেলত’ (লাঞ্ছনা) ও ‘বে-হোরমতির (অপমানের) সহিত হত্যা কর। সৈন্তগণ আদেশ প্রাপ্তিমাত্র উহাদিগের প্রতি ধাবিত হইয়া অতি লাঞ্ছনা ও অপমানের সহিত ঐ কয়জনকেই হত্যা করিল ; আর উহাদের ‘নাপাক’ (অপবিত্র) মৃতদেহ গুলি শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহের ন্যায় জঙ্গলে ফেলিয়া দিল।

উপরোক্ত নর-পিশাচদিগের হত্যা কার্য সম্পন্ন করিয়া মোখ্তার হমল এব্নে মালেক ও আবদুল্লাহ্ এব্নে ওমেদকে গেরেফ্তার করিয়া আনিবার জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন। এই পাষণ্ড হৃদয়

‘ছেয়াউল-কলব’ কুফিদের সম্বন্ধে রওয়ায়েত আছে যে, যখন হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালাম শহীদ হইয়া গেলেন, তখন এব্নে ছায়াদের সৈন্যদিগের মধ্যে কোনও ব্যক্তি বলিল, যাহা হইবার তাহাত হইয়া গিয়াছে, আইস, এক্ষণে রছুলের নাতির জানাঘার নমায্ পড়িয়া লওয়া যাউক । সেই কথা শুনিয়া এই ‘জালেম’ (অত্যাচারী—পাপী) দ্বয় তাঁহার পবিত্র মস্তক তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলিল; এবং বলিল, আর (হে) এমাম আলায়হেচ্ছালামের ‘হেমায়েতী’ (সাহায্যকারি) ! তুই এমাদের শত্রুর পক্ষ সমর্থন করিতেছিস্ ! স্থূলকথা এই যে, উপরোক্ত উভয় দুৰ্ভৃত্ত ধৃত হইয়া মোখ্তার সমীপে আনীত হইল; মোখ্তার তৎক্ষণাৎ উহাদিগের মৃত্যুপাত করিলেন ।

অতঃপর মোখ্তার এব্নে যবিদ হুকুম প্রদান করিলেন যে, এইবার খুলি-বিন্-এমিদকে ধরিয়া আন । খুলি যখন জানিতে পারিল যে, উহাকে ধৃত করিবার জন্য আদেশ জারী হইয়াছে, তখন সে স্বীয় গৃহের ‘তহঃখানায়’ (গ্রীষ্মের আতিশয্য কালে মৃত্তিকার নিরে যে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়া বাস করা হয়) গিয়া আত্ম-গোপন করিল; কিন্তু মোখ্তার-প্রেরিত সৈন্যগণ তাহার গৃহ ভগ্ন ভগ্ন করিয়া খুজিয়া উহাকে সেই ‘তহঃখানাঃ’ হইতে বাহির করিল, এবং বন্দী করিয়া মোখ্তারের নিকটে লইয়া আসিল; মোখ্তার বলিলেন, এই পাশও ঐ ব্যক্তি—বে হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের পবিত্র মস্তক নেঘায় বিদ্ধ করিয়া আহলে বয়েতের সম্মুখে আসিয়াছিল; এবং তাঁহাদিগকে এমনভাবে করাইয়াছিল, যাহা শ্রবণ করিলেও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয় । উহাকে কতল করিয়া উহার মস্তক ও বর্শাবিদ্ধ করিয়া উহার পুত্র পরিজনের সম্মুখে লইয়া যাও, তাহাদিগকে দেখাইয়া সমগ্র শহরে পরিভ্রামিত কর, এবং কুফাবাসীদিগকে দেখাও । তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল ।

মোখ্তার ‘জালেম’ দিগকে হত্যা করিতেন, কিন্তু তাঁহার দেল ঠাণ্ডা

■ ক্রোধানল নির্ধাপিত হইত না । তিনি ক্রোধভরে বলিতেন, যদি আমি কুফা ও শামের সকল লোককেও হত্যা করি, তবু ‘মজলুম’ ‘উৎপীড়িত’ এমাম আলায়হেচ্ছালামের একবিন্দু শোণিতেরও বদলা হইবে না ।

অতঃপর তিনি হকীম-বিন্-তফিলের গেরেফ্-তারীর আদেশ প্রদান করিলেন—যে পাষণ্ড হজরত এমাম আলায়হেচ্ছালামের ‘পেশানীতে’ (কপালে) তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল । সে যখন ধৃত হইয়া আনীত হইল ; তখন মোখ্-তার স্বীয় সৈন্যদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, উহাকে দাঁড় করাইয়া উহার কপালে ও মুখে এই পরিমাণ তীর বর্ষণ কর, যেন হতভাগ্য উহাতেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয় । তদনুসারে তীরন্দায্-গণ উহার প্রতি অবিরল ধারে তীর বর্ষণ করিতে লাগিল ; সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল ; তচ্ছ-বশে মোখ্-তার-বিন্-য়বিদ বলিলেন, রে দুর্বৃত্ত জালেম, মনে ভাবিয়া দেখ, তোমার নিক্ষিপ্ত তীরে ‘ছব ত্ রছুলের’ (পয়গম্বর [ছালঃ]-এর নাতির) এইরূপ কষ্টই হইয়াছিল । দেখিতে দেখিতে অজস্র তীরে বর্ষণের ফলে পাপাচারীর পাপ আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল ।

বহুসংখ্যক জালেম পাষণ্ড এই কঠোর শাস্তির বিষয় জানিতে পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া পাপের মহা প্রতিফল ভোগ করিল ; মোখ্-তার উহাদের গৃহাবলী সমভূমি করিয়া ফেলিলেন ; দুই দশজন পলায়ন করিয়াও জীবন রক্ষা করিল ; কিন্তু খোদাতা-লার গণব হইতে উহারা নিষ্কৃতি লাভ করে নাই । কারবালা-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল লোকই দুনিয়াতে তাহাদের মহাপাপের প্রতিফল ভোগ করিয়াছিল ; তাহাদের বংশাবলী পর্যন্ত উৎসন্ন গিয়াছিল ।

যখন কুফার সমস্ত অত্যাচারী দল নিপাত হইল, তাহাদের অস্তিত্ব মাত্র রহিল না ; তখন মোখ্-তার, হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর প্রধান সেনাপতি ও পরম ভক্ত মহাবীর মালেক আশ্-তরের বীরপুত্র এব রাহিম আশ্-তরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ; তিনি উপস্থিত হইলে

তাঁহাকে বলিলেন, হে এব্রাহিম ! আমি আহলে বয়েতের শত্রু দল হইতে যতদূর সম্ভব, প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি ; এক্ষণে কেবলমাত্র এব্নে যেমাদ বদনেহাদ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বাকী আছে—যে পাষণ্ড এই অত্যাচারী দলের সর্ব প্রধান নেতা ও পরিচালক ছিল ; তুমি সম্বরে মওছল (মোসল) শহরে যাও ; এবং উহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহার মস্তক কাটিয়া আন ।

মোখতারের আদেশানুসারে তদীয় প্রধান সেনাপতি এব্রাহিম আশ্‌তর একদল প্রবল সৈন্য লইয়া মওছলে পহুছিলেন । যখন ওয়ায়ছলাহ এব্নে যেমাদ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইল, সেও স্বীয় সৈন্যদল সুসজ্জিত করিয়া নগর হইতে মহাডঙ্ঘরে বাহির হইল । বলা বাহুল্য, খেলাফতের গোলযোগের সময় সে মওছলের শাসনকর্ত্ত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ; এখন সে আর পূর্বের স্থায় বিশাল জনপদের রাজ-প্রতিনিধি ছিল না ; একটি ক্ষুদ্র ছুবার শাসনকর্ত্ত্ব মাত্র ছিল ; উহার বীরত্ব ও পরাক্রম সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না ; সে কয়েক সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য লইয়া মহাবীর এব্রাহিম আশ্‌তরের সম্মুখীন হইল । দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল । এব্নে যেমাদ বদনেহাদ ও তাহার সৈন্যগণ বীরত্ব-প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটি প্রদর্শন করিল না ; কিন্তু পাপাচারীর পাপ লীলার অবসান হইয়া আসিয়াছিল ; খোদা তা-লা মহামান্ব এমাম আলারহেচ্ছালামের শত্রুদল-নিপাত এবং ভীষণ নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; সুতরাং ভীষণ যুদ্ধের পর এব্রাহিম আশ্‌তর জয়ী হইলেন ; এব্নে যেমাদের সেনাদল পরাজিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল ।

মহাবীর এব্রাহিম-বিন্-মালেক আশ্‌তর যখন বুদ্ধে জয়ী হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; তখন স্বীয় সৈন্যদিগকে বলিলেন, আল্লার শূপথ, আমি আজ এক ব্যক্তিকে ‘কতল্’ (হত্যা) করিয়াছি—বাহার হস্তে ছরদারীর ‘নিশান’ (পতাকা) ছিল । সে নহর খারযের (খারযনামক ক্ষুদ্র তটিনীর)

তটে দণ্ডায়মান ছিল ; আমি স্বীয় রক্ত-রঞ্জিত তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাতে উহাকে দ্বি-খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছি ; যখন সে দ্বি-খণ্ডিত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তখন উহার হস্ত পূর্বদিকে ও পদদ্বয় পশ্চিম দিকে ছিল । উহার পরিহিত বস্ত্র সাদা, এবং উহা মেশ্‌ক্‌ ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা 'খোশ্‌বুদার' ছিল । উহার মৃতদেহ 'তালাশ' করিয়া (খুঁজিয়া) শীঘ্র আনয়ন কর । তদনুসারে তাঁহার কতকগুলি সৈন্ত দৌড়িয়া 'খারব', নামক স্রোতস্বতীর তটে উপস্থিত হইল ; এবং এব্‌রাহিম-বিন্‌-মালেক আশ্‌তরের নির্দেশিত স্থানে তালাশ করিয়া পাষণ্ড এব্‌নে ঘেয়াদ বদ-নেহাদের দ্বি-খণ্ডীকৃত মৃতদেহ প্রাপ্ত হইল ; সৈন্তগণ তাহা তুলিয়া সেনাপতি এব্‌রাহিম আশ্‌তরের নিকটে লইয়া আসিল । বিশেষ-ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া জানা গেল, উহা বাস্তবিকই হুসাইন ওবায়দুল্লাহ্‌ এব্‌নে ঘেয়াদের মৃতদেহ । তৎক্ষণাৎ উহার মস্তক ছেদন করিয়া মোখ্‌তারের নিকট কুফায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল ; আর তাহার মস্তক হীন দেহটা সেই খানেই অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল ।

৬৬ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে মোখ্‌তার কর্তৃক কারবালার শৌচনীয় কাণ্ডের প্রধান প্রধান নায়কগণ, ঐকার্থ্যে সংশ্লিষ্ট কুফার পাষণ্ড অধিবাসিগণ সমূলে নিশ্চূর্ণ হইয়াছিল । খোদা তা-লা যেন ঐ সকল পাষণ্ডের দণ্ড বিধান জন্তই মোখ্‌তার-বিন্‌-য়বিদ-বিন্‌ মছয়ুদ ছক্‌ফিকে আবিভূত করিয়াছিলেন ; তাঁহার এই কার্যের জন্ত একটি স্বর্ণ-সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল । যদি ঐ সময় মারওয়ান কিংবা তৎপুত্র আবদুল মালেক খলিফার পদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন ; তবে মোখ্‌তার এই সকল পাষণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না । বনি-ওম্মিয়ার খলিফাগণ (হজরত ওমর-বিন্‌-আবদুল আযিয্‌ [রাজিঃ] ব্যতীত) আহলে বয়েতের প্রতি তেমন ভক্তিম্যান্‌ ও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন

না । সুতরাং স্বয়ং খোদাতা-লাই এসম্বন্ধে মহা সুযোগ উপস্থিত করিয়া-
 দিয়াছিলেন ; এবং মহা পাপকার্যের অনুষ্ঠানকারীদিগকে সমূলে নির্মূল
 করিয়াছিলেন । কম বেশ সাড়ে চারি বৎসর মাত্র সময়ের মধ্যে এষিদ
 হইতে আরম্ভ করিয়া এব্নে যেয়াদ-প্রমুখ দুরাচারগণ, মদীনার হত্যাকাণ্ডের
 নায়ক এবং উক্ত পবিত্র নগরীর বিধ্বস্তকারী মোছলেম-বিন্-য়োক্-বাঃ
 প্রভৃতি পাষাণগণ শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে কারবালা-
 কাণ্ডের নায়কগণের নিপাত ব্যাপার একটি শিক্ষণীয় ব্যাপারে । তাহাদের
 ঐ মহা পাপকার্যের প্রতিশোধ খোদা ভীমা কিরূপ ক্ষিপ্তকারিতার
 সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহা চিন্তা ও খেয়াল করিবার বিষয় ।
 যদি কারবালার ভীষণ শাহাদৎ-কাণ্ড সত্যটিত না হইত, তবে হজরত এমাম
 আলায়হেচ্ছালাম “ ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ ” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন
 না ; শহীদে মর্তবা (পদ-মর্যাদা) ও দরজা এত বৃদ্ধি হইত না ; আর গত
 ত্রয়োদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত শত শত কোটি মোছলমান তাঁহাদের জন্ত
 কঠোর শোক প্রকাশ এবং অশ্রুমালায় বক্ষঃ ভাসাইত না ; এবং কেয়ামত
 পর্য্যন্ত এই শোক প্রকাশের প্রবল স্রোত, প্রবাহিত ও তাঁহাদের পবিত্র
 আত্মার মঙ্গল কামনায় দোওয়া করা সম্ভবপর ছিল না । নবী-বংশের প্রতি
 হজরত আব্বাছ বংশীয় খলিফাদিগের মধ্যে মনছুর-প্রমুখ কেহ কেহ যোর
 অত্যাচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এব্নে যেয়াদী দলের অত্যাচারের সঙ্গে
 তাহার তুলনা হয় না । আবার কারবালার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট লোকগুলি
 যেরূপ ভাবে সমূলে নির্মূল ও তাহাদের গৃহাবলী যেরূপ ভাবে ভূপৃষ্ঠ
 হইতে মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল, এমন ব্যাপার এবং দুষ্কার্যের প্রতিক্রিয়া ও
 ছুনিয়াতে আর কখন হয় নাই ।

হজরত এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর শাহাদতের পরবর্তী কতিপয় ঘটনা ।

মোবিয়া বিন্ এযিদের খেলাফৎ ।

মোবিয়া-বিন্-এযিদের কুনিয়েত আবুলেয়লী এবং আবদুর রহমান ।
এযিদের মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ২০ বিশ বৎসর কয়েক মাস মাত্র ছিল ।
এই যুবক পরম ধর্ম-পরায়ণ, ‘ছালেহ্’ (নিষ্পাপ), ‘আবেদ’ (‘এবাদত’
অর্থাৎ উপাসনাকারী), ‘যাহেদ’ (পরহেয়্-গার—পার্থিব সুখ-সন্তোকে ও
ভোগ-লিপ্সায় বিতৃষ্ণ) পুরুষ ছিলেন । আহ্লে শাম অর্থাৎ শামবাসীগণ
এযিদের মৃত্যুর পর ইঁহার হস্তে বয়ঃক্রম করিল । এযিদের প্রেরিত মক্কা
আক্রমণকারী সেনাপতি হুইন-বিন্-নমির যখন শামী সেনাদল এবং বনি-
ওমিয়াদিগকে (যাহারা মদীনায়া নিঃসহায় অবস্থায় অবস্থিতি করিতে
ছিল) লইয়া দেমেশ্কে পহুছিল, তৎপূর্বেই লোকেরা মোবিয়া-বিন্-
এযিদের হস্তে বয়ঃক্রম করিয়াছিল । মোবিয়া, খেলাফৎ ও লোকের নিকট
হইতে বয়ঃক্রম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না । পিতার অন্তায় ও অসঙ্গত
এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য-কলাপ সকল তাহার চক্ষের সমক্ষে ঘটিয়াছিল ।
কারবালার শোচনীয় ঘটনা—অর্থাৎ হজরত এমাম হোছেন আলায়-
হেচ্ছালামের শাহাদৎ-ঘটনাও তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ আঘাত প্রদান
করিয়াছিল ; প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও আমীর-ওমরাহ

প্রভৃতির মধ্যেও ধর্মতাবের একান্তই অভাব দেখিতে পাইতেছিলেন ; স্বার্থপরতা, গৌরব-স্পৃহা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শাসন-ক্ষমতা লাভ, লোকের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রভৃতির প্রবৃত্তিই প্রধান প্রধান লোকের মধ্যে সাধারণতঃ দৃষ্ট হইত । মোবিয়া বিশাল মোছলেম জগৎ শাসন করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা নিজের মধ্যে দেখিতে পাইতে ছিলেন না ; আবার তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না ; পীড়িত ছিলেন । এই পীড়িত অবস্থায়ই লোকেরা তাঁহার হস্তে বসুয়েত করিয়া ছিল । ইনি লোকের একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া বসুয়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর মাত্র ৫০ দিন কাল, অপর রওয়ানেতানুসারে দুই মাস (৬০ দিন), তৃতীয় বর্ণনানুসারে ৩ মাস (৯০ দিন) মাত্র খেলাফতের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া, খেলাফৎ ত্যাগ করেন ও মৃত্যু-মুখে পতিত হন । এই অল্পকাল মধ্যে কোনও উল্লেখ যোগ্য কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই । মোবিয়ার পীড়া যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন লোকেরা বলিল, আপনার পরে কে খলিফা হইবেন, আপনি তাহা মনোনীত করুন । মোবিয়া বলিলেন, আমি প্রথম হইতেই আমার মধ্যে খলিফার উপযুক্ত 'তাকত' (শক্তি) দেখিতে পাই নাই ; তোমরা 'যবরদস্তী'ক্রমে (বলপূর্বক) আমাকে খলিফার পদে অভিষিক্ত করিয়াছ । আমি মনে করিয়াছিলাম, যদি কোনও ব্যক্তিকে হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর মতন উপযুক্ত প্রাপ্ত হই, তবে তাঁহার হস্তে খেলাফতের ভার অর্পণ করিব ; কিন্তু সেরূপ লোক কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না । পরে মনে করিলাম, হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) যেমন মৃত্যুর পূর্বে কয়েক ব্যক্তির (৬ ব্যক্তির) উপর খলিফা-নির্বাচনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ কতিপয় ব্যক্তিকে খলিফা-নির্বাচন জন্য মনোনীত করি ; কিন্তু ঐরূপ উপযুক্ত লোকও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না ।

সুতরাং খেলাফৎ সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলিতে ইচ্ছা করি না । তোমাদের যাহাকে ইচ্ছা, খলিফা নির্বাচন কর, আমার তাহাতে কোনও ‘ছরোকার’ (সম্বন্ধ) নাই । এই কথা বলিয়া তিনি সমবেত লোক-দিগকে গৃহ হইতে বাহির করাইয়া দিয়া, ‘মহল ছরার’ (রাজ-প্রাসাদের) দ্বার বন্ধ করাইয়া দিলেন । ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার জানাযাঃ মহলছরাঃ হইতে বাহির হইল ।

এবিল স্বীয় ২য় পুত্র খালেদকে অধিকতর ভালবাসিত ; কিন্তু মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র মোবিয়াকেই ‘ওলি আহাদ’ (স্থলাভিষিক্ত—রাজ্যের উত্তরাধিকারী) নির্বাচন করিয়া গিয়াছিল । খালেদ অতি তরুণ বয়স্ক যুবক ছিলেন ।

বস্রায় এব্‌নে যেম্মাদ বদ-নেহাদেদর বস্রয়েত গ্রহণ ।

ওবায়দুল্লাহ্, এব্‌নে যেম্মাদ কারবালার ভীষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া এখিদের নিকট হইতে কোনও পুরস্কার লাভ ত করিলই না, বরং বিশাল পারশ্ব সাম্রাজ্যের সুবিধৃত এলাকার শাসন-ভার তাহার হস্তচ্যুত হইল । কুফাবাসী বীর সৈন্ত ও সেনাপতিগণ তাহার নিকট হইতে খোরাছানাভিমুখে চলিয়া গেল ; সে মাত্র কুফা ও বস্রার শাসনকর্তাই রহিল । সে স্বীয় কৃতকার্যের কোনও পুরস্কার এখিদের নিকট হইতে পাইল না ; অথচ এখিদের পক্ষ হইতে এমন অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত [REDACTED] এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার সৃষ্টিমেয় ভ্রাতা-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুচর বৃন্দকে নিহত করিল, মহাপাপের বোঝা স্বীয়

স্বক্কে লইল, পরে ইহাতে তাহার মনস্তাপের সীমা পরিসীমা রহিল না ; এযিদের প্রতি তাহার সহানুভূতি থাকা দূরে থাকুক, বরং জাতক্রোধ উপস্থিত হইল । কিন্তু ইহার কোনও রূপ প্রতিকার করিবার উপায় তাহার নিকট ছিল না । অশান্তির ভীষণ অনলে তাহার পাপ-হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল । মদীনা হইতে যে দশ ব্যক্তি তত্রত্য শাসনকর্তা ওছমান-বিন-মোহাম্মদ-বিন-আবুছকিয়ান কর্তৃক এযিদের নিকট দেয়শ্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ জন যথোচিত পুরস্কার লাভ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু মনযর-বিন-যবির মদীনায় না গিয়া কুফায় এব্নে যেমাদের নিকট গমন করিলেন ; কারণ এব্নে যেমাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল । যখন মদীনায় প্রতিনিধিগণ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এযিদের সুরা পান ও অস্ত্রাস্ত্র প্রকার শরিয়ত-বিরুদ্ধ দুর্কার্যের বিষয় প্রচার করিয়া, তাহার খেলাফতের বিরুদ্ধে মদীনা-বাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, ঐ সংবাদ এযিদ প্রাপ্ত হইয়া কুফায় এব্নে যেমাদকে এই বলিয়া পত্র লিখিল যে, মনযর-বিন-যবির তোমার নিকট কুফায় গিয়াছে, তুমি পত্র পাওয়ামাত্র তাহাকে ধৃত করিয়া বন্দী কর ; উহাকে কোনও ক্রমেই মদীনায় যাইতে দিও না । এব্নে যেমাদ এযিদের প্রতি ‘নাখোশ্’ (অসন্তুষ্ট) ছিল, এক্ষণে স্বীয় বন্ধু মনযর-বিন-যবিরকে তাড়াতাড়ি মদীনায় রওয়ানা করিয়া দিল ; আর এযিদকে পত্র লিখিল যে, আপনার পত্র পঁছছিবার পূর্বেই মনযর মদীনায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছে ।

ওদিকে মনযর মদীনায় পঁছিয়া আবল্লাহ্ বিন-হনজলাঃ ও আবদুল্লাহ্ বিন-মতিয়কে বলিলেন, তোমাদের পক্ষে উচিত, আলী-বিন-হোছেন (এমাম যয়নাল আবেদীন [রাজিঃ]) এর হস্তে খেলাফতের বস্তুস্বত করা । তদনুসারে মদীনায় প্রধান লোককে সঙ্গে লইয়া ইহার

হজরত আলী-বিন্-হোছেন (রাজিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন । তাহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, এবং বলিলেন, আমার পিতা এবং পিতামহ, ইহারা উভয়েই এই খেলাফৎ লাভের চেষ্টায় জীবন বিসর্জন করিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে আমি ঈদৃশ 'খতরনাক' (ভয়াবহ) কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না ; আমি নিজেকে 'কতল' (হত্যা) করাইতে কোনও ক্রমেই ইচ্ছুক নহি । ইহা বলিয়াই তিনি মদীনা পরিত্যাগ পূর্বক নিকটবর্তী এক পল্লীগ্রামে সপরিবারে চলিয়া গেলেন । ইত্যবসরে মদীনা বাসীদিগের মধ্যে মহা উত্তেজনার সঞ্চার হইল । মারওয়ান-বিন্-হকম-প্রমুখ বহু ওম্মিয়ার প্রধান প্রধান লোকদিগকে তাহারা বন্দী করিলেন । হজরত এমাম যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ) মদীনার বর্তমান অবস্থা দেমেশ্কে এষিদকে লিখিয়া পাঠাইলেন । এষিদ মদীনার অবস্থা অবগত হইয়া নওমান-বিন্-বশির আনছারী (রাজিঃ)-কে এই বলিয়া মদীনায় প্রেরণ করিলেন যে, তুমি যাইয়া মদীনাবাসীদিগকে বুঝাইয়া বল, তাহারা আমার বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হউক । বিশেষতঃ তুমি আবদুল্লাহ-বিন্-হন্বলাঃ কেও এই বলিয়া উপদেশ দান করিও যে, তোমরা এষিদের নিকট গমন করিলে, এবং 'এন্য়াম' ও 'একরাম' ('বখ্শেশ্' ও পুরস্কারাদি) গ্রহণ পূর্বক মদীনায় প্রত্যাবর্তন পূর্বক এষিদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, লোকদিগকে এষিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাহার প্রতি কোফরের ফত্ওরা জারী করিলে ? তোমাদের এরূপ কার্য্য বুদ্ধিমত্তা এবং বীরত্বের পরিচায়ক নহে । তুমি আলী-বিন্-(এমাম) হোছেন (রাজিঃ)-এর সঙ্গে মিলিয়া মদীনাবাসীদিগকে গিয়া বল, তোমাদের 'ওফাদারী' (আনুগত্য—বিশ্বস্ততা) ও 'কার গোযারীর' (কার্য্য-কলাপের—কর্তব্য নিষ্ঠার) পুরস্কার অবশ্যই দেওয়া যাইবে । বহু-ওম্মিয়ার যাহারা মদীনায় উপস্থিত

আছে, তাহাদিগকে এই কথা বলিবে, তোমরা কি এই টুকু কার্য্যও করিতে পারিলে না যে, যে দুই ব্যক্তি তথায় বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, তাহাদিগকে ‘কতল’ (হত্যা) করিয়া বিপ্লবের অবসান করে ? নওমান-বিন-বশির (রাজিঃ) এযিদের আদেশানুসারে এক দ্রুতগামিনী উষ্ট্রীতে আরোহণ করিয়া মদীনায়া রওয়ানা হইয়া গেলেন ; মদীনায়া পহুছিলা তিনি বিপ্লবানল নির্বাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ মদীনাবাসিগণ সুরাপারী, ব্যভিচারী ও শরিফতের বিরুদ্ধাচরণ-কারী এযিদের খেলাফৎ কিছুতেই স্বীকার করিলেন না । অগত্যা নওমান-বিন-বশির (রাজিঃ) বিফল মনোরথ হইয়া দেমেশ্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন । ইহার পর এযিদ সেনাপতি মোছলেম-বিন-যোক্বাঃ ■ হছিন-বিন-নমিরকে মদীনায়া পাঠাইয়া ঐ পবিত্র নগরীর অধিবাসীদিগকে বিরূপ ভাবে হত্যা করাইয়া ছিল, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।

এযিদ মদীনা আক্রমণ জন্য মোছলেম-বিন-যোক্বাকে সসৈন্তে রওয়ানা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ওবায়দুল্লাহ্ এব্নে যেমাদের নামে একখানি পত্র লিখিয়া, একজন ‘কাছেদ’ (দূত) কুফায় প্রেরণ করিল । ঐ পত্রে লিখিত ছিল, তুমি স্বীয় অধীনস্থ সেনাদল লইয়া গিয়া মক্কা আক্রমণ কর ; আর আবদুল্লাহ্-বিন-যোবের (রাজিঃ)-এর ‘ফেৎনাঃ’ (বিপ্লব-মূলক কার্য্যের) মূলোচ্ছেদ কর । এব্নে যেমাদ ঐ পত্র পাইয়া এযিদকে উত্তরে লিখিল, দুই কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে না । আমি (হজরত) এমাম হোছেন (রাজিঃ)-এর বধকার্য্য সম্পাদন রূপ এক কার্য্য করিয়াছি ; এক্ষণে খানাঃকাবাঃ ‘বিরান্’ (ধ্বংস) করা কার্য্য আমার দ্বারা কিছুতেই সম্পাদিত হইবে না ; আপনি ঐ কার্য্যের জন্য ■ বাহাকে ইচ্ছা, নির্বাচিত করুন । এস্থলে দেখা যায়, পাষণ্ড ওবায়দুল্লাহ্, হজরত এমাম আলায়হেছ্‌আলামকে সদল বলে নৃশংস

ভাবে শহীদ করাইয়া, স্বীয় কুকার্যের বিষয় অনুভব করিয়া কতকটা অনুতপ্ত হইয়াছিল । নচেৎ তাহার ঈশ্বর ধর্মজ্ঞান শূন্য দুর্দান্ত দানবের পক্ষে মক্কা আক্রমণ করিতে যাওয়া অসম্ভব ছিল না । বিশেষতঃ এমাম ছাহেবকে শহীদ করিয়া তৎপরিবর্তে এযিদের নিকট হইতে কোনও পুরস্কার বা ধন্যবাদ লাভ করা দূরে থাকুক, বরং অবমানিত ও অপদস্থই হইয়াছিল । তাহার শাসনাধীন বিস্তৃত ভূভাগ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল ; এবং তটধীন সৈন্যসংখ্যা ও হ্রাস করা হইয়াছিল ; এই সকল কারণে এযিদের প্রতি তাহার আদৌ সহানুভূতি ছিল না । বাহা ইউক, এই ঘটনার পর এযিদ আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে নাই ; সুতরাং ওবায়দুল্লাহর প্রতি তাহার নূতন কোনও আদেশ জারী করিবার ও সুযোগ ঘটে নাই । এযিদের মৃত্যু, মোবিয়া-বিন্-এযিদের খেলাফৎ ত্যাগ এবং মৃত্যুর পর দেমেশ্কে খেলাফৎ সম্বন্ধে যে মতভেদ ও বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, যাহাতে একদল বনু-ওম্মিয়ার পক্ষপাতী হইয়া খালেদ-বিন্-এযিদকে খেলাফৎ প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছিল ; তাহাদেয় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেমেশ্কের মহা পরাক্রমশালী শাসনকর্তা জোহাক-বিন্-কয়েছের পক্ষাবলম্বী একটি প্রবল দল, হজরত আবদুল্লাহ্-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-এর খেলাফতের পক্ষপাতীও প্রদর্শন করেন এবং দুই দলে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয় । খালেদ-বিন্-এযিদ মাঝে পড়িয়া আপাততঃ এই বিবাদ মিটাইয়া দেন । ঠিক ঐ সময় ওবায়দুল্লাহ্-বিন্-যোবের কুফার শাসনকর্তৃত্ব হইতে বিতাড়িত হইয়া দেমেশ্কে আসিয়া পঁহুছে । উহার আগমনে বনু-ওম্মিয়ার সাহস অনেক বৃদ্ধি পাইল ; এতদিন খালেদ-বিন্-এযিদের পক্ষেই বনু-ওম্মিয়ার নেতৃমণ্ডলী খেলাফতের দাবী করিতেছিল । কিন্তু ভিতরে ভিতরে কুচক্রী মারওয়ান-বিন্-হকম, নিজের খেলাফৎ লাভ সম্বন্ধে গোপনে যোগাড়-যন্ত্র করিতে ছিল ; এবং বহু

সংখ্যাক লোককে স্বীয় অনুকূল মতাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছিল । অবশেষে
 রুহ-বিন্-যন্বাস এক প্রকাশ্য সভায় খালেদের তরুণ বয়স্কতা প্রদর্শন
 করিয়া মারওয়ানের অনুকূলে এক বক্তৃতা প্রদান করাতে, ওবায়দুল্লাহ্-
 বিন্-যেয়াদের সমর্থনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল । তদনুসারে ৬৪ হিজরীর
 ৩রা যেকদ তারিখে “ জাবিয়া ” নামক স্থানে মারওয়ানের হস্তে বনু-
 ওমিয়া, বনু-কলব, গচ্ছান ও তর সম্প্রদায়ের লোকেরা বস্মত করিল ।
 আমরা এই স্থলে ওবায়দুল্লাহ্কে খেলাফৎ নির্বাচন-ব্যাপারে একজন
 প্রধান পাণ্ডা রূপে দেখিতে পাইতেছি । ওবায়দুল্লাহ্ একজন প্রতিভা-
 শালী ও মহাশক্তিশালী বীর-পুরুষ এবং রাজনীতি-কুশল ব্যক্তি ছিল, সন্দেহ
 নাই । সে কুফা ও বস্রাবাসীদিগকে অতি কঠোর হস্তে শাসন করিয়া-
 ছিল ; কিন্তু তাহার নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, গৌরব-লিপ্সা—সর্বোপরি
 ধর্মভাবের অভাব অত্যন্ত মারাত্মক ছিল । তাহার এই সকল মারাত্মক
 দোষের ফল যে সে অচির কাল মধ্যে হাতে হাতেই পাইয়াছিল, ইতিপূর্বে
 তাহা বর্ণিত হইয়াছে । তাহার শয়তানী ও পৈশাচিক কার্যের উপযুক্ত
 প্রতিদান তাহার অদৃষ্টে এই দুনিয়াতেই ঘটিয়াছিল । হজরত এমাম হোছেন
 আলায়হেচ্ছালামের প্রতি তাহার এবং শেনর-মিল-যোশন-প্রমুখ পাপাত্মা-
 দিগের ঈদৃশ নির্দয় ব্যবহারের কোন কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না ।
 মানুষ স্বার্থ লাভের জন্য যে এত দূর অন্ধ হইতে পারে, এবং ঈদৃশ
 পশোচিত নির্যম ব্যবহার করিতে পারে, ইহা কল্পনারও অতীত । শেষ জীবনে
 এখানে যেসাদ মোছলের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল ; এবং ঐ স্থানেই
 তাহার ভীষণ পাপের ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিয়া, চিরদিনের
 মোছলমানগণের অভিসম্পাতের পাত্র হইয়া আছে । মোখ্তারকে
 আল্লাহ্ তা-লা এই পাষাণদের যম স্বরূপ দুনিয়ায় অবতীর্ণ করিয়া-
 ছিলেন । উহারা সকলেই স্বকৃত ভীষণ পাপের ভীষণ প্রতিফল হাতে

হাতে পাইয়াছিল । উহাদের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবার লোক পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিলেও, মোছলমানদিগের “ লানত-মালাগতের ” ভয়ে তাহারা বোধ হয় আত্ম-পরিচয় দিতে অক্ষম । দুনিয়াতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই সকল হৃদয়হীন পাষণ্ড, অভিসম্পাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে না । ওয়াসুজ্জার প্রভাব ও প্রাধান্ত বোধ হয় ৭৮ বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী ছিল না ।

তাজিস্থানদারীর ইতিহাস ।

হজরত আলী (কঃ— ৩ঃ) যখন মোছলেম-জগতের খলিফা ছিলেন, এবং কুফা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল ; ঐ সময় তিনি একখানি ‘কুরছি’তে (চেয়ার বা ঐ শ্রেণীর আসনে) বসিয়া খেলাফতের ‘হুকুম-আহ্-কাম’ জারী, এবং বিচার কার্য সম্পাদন করিতেন ; তাঁহার শাহাদৎ-লাভের পর ঐ আসন থানি তদীয় ভাগিনেয় ওম্মেহানী-বিস্তে-আবি তালেবের পুত্র, জায়দাঃ-বিন্-হবিবের নিকট ছিল । জায়দাঃ কুফা শহরেই বাস করিতেন । মোখ্তার কুফার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়া ঐ কুরছি থানির সন্ধান পাইলেন ; এবং জায়দাঃ কে ডাকাইয়া বলিলেন, ঐ কুরছি থানি আমাকে আনিয়া দাও । জায়দাঃ বলিলেন, আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিন, আমি কুরছি থানি আপনাকে আনিয়া দিতেছি । উহা কোথায় পড়িয়া আছে, আমাকে সন্ধান করিয়া আনিতে হইবে । মোখ্তার বলিলেন, আমি তোমাকে ৩ দিনের বেশী সময় দিতে পারি না ; ৩ দিনের মধ্যে তুমি যদি ঐ কুরছি আমার নিকট পহুছাইয়া

না দাও, তবে কঠোরতার সহিত, বলপূর্বক তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা যাইবে । জায়দাঃ তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । জায়দার মহান্নায় এক তৈল-বিক্রেতার গৃহে ঠিক ঐরূপ একখানি কুরছি ছিল ; জায়দাঃ সেই কুরছি থানি উহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইলেন ; এবং অতি গোপন ভাবে উহা গৃহে আনয়ন করিলেন ; অতঃপর উহা খুব পরিষ্কার করিয়া উহাতে মূল্যবান ‘গেলাফ্’ (আস্তরণ) চড়াইলেন ; তৎপর অতি সম্মান সহকারে মোখ্তারের দরবারে নিয়া পহুঁছাইলেন । মোখ্তার ঐ নকল কুরছি থানি পাইয়া জায়দাঃকে বথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন ; এবং ভক্তি সহকারে সেই নকল কুরছি থানিকে ‘বোছা’ দিলেন (চুষন করিলেন) । আর উহা সম্মুখে রাখিয়া দুই রেকয়াত নফল নমাজ্ ও পড়িলেন । অতঃপর স্বীয় ভক্ত-অনুরক্ত মুরীদিগকে সমবেত করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে প্রকারে খোদা তা-লা ‘বনি এস্রাইল’ (এস্রাইল বংশীয়) দিগের জন্য “তাবুত ছকিনা” কে তাহাদের বিজয় লাভ ও বরকতের অবলম্বন স্বরূপ করিয়া ছিলেন, সেইরূপে হজরত আলী (কঃ—ওঃ)-এর ভক্ত বৃন্দের জন্য এই কুরছি ‘নেশানী’ (নিদর্শন) স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে । এক্ষণে আমাদিগকে প্রত্যেক যুদ্ধে ‘ফতেহ্’ ও বিজয় লাভ হইবে । তদনুসারে তাঁহার মুরীদিগণ ঐ কুরছিতে চক্ষু মলিতে (আমর্ষণ করিতে) ও ‘বোছা’ দিতে (চুষন করিতে) লাগিল ; এবং উহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া, ও নতজানু হইয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল । তৎপর মোখ্তার আদেশ প্রদান করিলেন, এক্ষণে একটি ‘তাবুত’ নির্মাণ করা উচিত । তদনুসারে নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটি সুন্দর তাবুত প্রস্তুত করা হইল । ঐ তাবুতের ভিতর পরম যত্ন ও ভক্তি সহকারে ঐ উৎকৃষ্ট গেলাফ্ বিমণ্ডিত কুরছি থানি রাখা গেল । পরে ‘চান্দি’ (রৌপ্য) নির্মিত একটি তালা উহাতে লাগাইয়া

উহার হেফাজতের ■■■ লোক নিযুক্ত করা হইল । অবশেষে কুফার বিরাট আয়েম মছজেদে আনিয়া ঐ তাবুত খানি রাখা গেল । লোকেরা নমায্ পড়িবার পর ঐ তাবুত চুম্বন করিত । মোখতার কুফার শাসন-কর্তৃত্ব লাভের পূর্বে ইহাতেই স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে কৌশল-জ্ঞান বিস্তার করিতেছিল । শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়া দিন দিন নিজের কারামত ও বোয়গী জাহের (প্রকাশ) করিতে লাগিল । অবশেষে নবুয়তের দাবী করিয়া বসিল । সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধঃপতনের পথ ও পরিষ্কার হইয়া আসিল । এমন একটি লোকের শোচনীয় অধঃপতনে হৃদয়ে অবশ্যই দারুণ আঘাত লাগে ।

মোখতারের পরবর্তী চালবাজী, আরব, পারস্য ও মেছেরের স্বীকৃত খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্-বিন-যোবের (রাজিঃ) বুঝিতে পারিয়া, উপযুক্ত সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে স্বীয় ভ্রাতা মছয়ব-বিন-যোবের (রাজিঃ)-এর অধিনায়কতায় বস্রা হইতে মোখতারের বিরুদ্ধে কুফাভিমুখে বাইতে আদেশ করিলেন । প্রধান সেনাপতি মছয়ব (রাজিঃ) তখন বস্রার শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি মহলবকে আদেশ করিলেন, তুমি “ জহরে আকবর ” এ গিয়া সৈন্যদল সন্নিবিষ্ট কর ; আবদুর রহমান-বিন-আথফ্কে কুফা শহরাভিমুখে রওয়ানা করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তুমি কুফায় পহুঁছিয়া গোপন ভাবে লোকদিগের নিকট হইতে হজরত আবদুল্লাহ্-বিন-যোবের (রাজিঃ)-এর নামে বয়্য়েত গ্রহণ কর । এদিকে স্বয়ং যেমাদ-বিন-হাছিন হতিম তমিমিকে অগ্রবর্তী সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া মহাড়ম্বরে কুফাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ‘ময়মনাঃয়’ (দক্ষিণপার্শ্বে) ওমর-বিন-ওবেদুল্লাহ্-বিন-ময়মরকে, আর ‘ময়ছরায়’ (বাম পার্শ্বে) মহলব-বিন-আবি ছোফরাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ‘কলবে লশ্কার’—মধ্য অর্থাৎ সম্মুখ ভাগের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন,

এইরূপে তিনি মহাডম্বরে বস্মা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । মোখতার যখন জানিতে পারিল যে, বস্মা হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটি প্রবল অভিযান রওয়ানা হইয়াছে ; তখন সেও যতদূর সম্ভব, সৈন্যদল সংগ্রহ পূর্বক কুফা হইতে বাহির হইল । মহাবীর এব্রাহিম-বিন্-মালেক আশ্-তর ঐ সময় কুফার উপস্থিত ছিলেন না । ওবায়দুল্লাহ্-এব্নে যেমাদের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি মওছল (মোসল)-এর শাসন-কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন । বস্মার সেনাদলের মধ্যে একদল ঐ সৈন্যও ছিল—যাহারা কুফা হইতে পলায়ন পূর্বক বস্মায় পৌঁছিয়া, হজরত মছম্ব (রাজিঃ)-এর সঙ্গে যোগ দিয়াছিল । ঐ সেনাদলের সেনাপতি পদে মোহাম্মদ-বিন্-আল্-আশ্-রতকে নিযুক্ত করা হইল । বস্মার প্রচণ্ড সেনাদল অগ্রসর হইয়া “ মদারা ” নামক গ্রামের নিকটবর্তী হইলে, মোখতারের সঙ্গে তাহাদের সম্মুখ উপস্থিত হইল ; উভয় দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল ; ভীষণ শোণিত পাতের পর অবশেষে মোখতার পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্বক কুফা নগরে প্রবেশ করিল । সে ‘কছরে এমারতে’ (রাজ-প্রাসাদে) প্রবেশ পূর্বক উহা ধুব সুরক্ষিত করিয়া, তথায় আত্ম-রক্ষা কার্যে প্রবৃত্ত হইল । কুফী সেনাদল যখন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, ঐ সময় মোহাম্মদ-বিন্ আল-আশ্-রত ঐ পলায়মান সৈন্যদিগের পশ্চাৎদাবন করিলেন ; এবং ঐ পলায়মান সৈন্যদিগকে বহু-দূর পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া চলিলেন । মছম্ব-বিন্-যোবের (রাজিঃ) অগ্রবর্তী হইয়া কুফার রাজ-প্রাসাদ অবরোধ করিলেন ; এই অবরোধ কার্য্য কয়েক দিন পর্য্যন্ত চলিয়া ছিল ; মোখতারের সঙ্গে ১০০০ লোক রাজ-প্রাসাদে অবরুদ্ধ ছিল ; অবশেষে যখন রসদ ফুরাইয়া আসিল, লোক-দিগের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের বিশেষ অভাব ঘটিল, তখন সে রাজ-প্রাসাদের দ্বার খুলিয়া জীবনান্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ; তাহার

সন্ধিগণ তাহাকে এ বিষয়ে বাধা প্রদান করিয়া বলিল, মছরব (রাজিঃ)-এর নিকট জীবন-ভিক্ষা করিয়া রাজ-প্রাসাদের দরওয়াজাঃ খোলা হউক, আশা করা যায়, তিনি আমাদের জীবন রক্ষা করিবেন । কিন্তু মোখ্তার তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিল না । সে মস্তকে সুগন্ধি তেল মাখাইল, বস্ত্রে আতরা দি লাগাইল ; এবং অন্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাজ-প্রাসাদের দ্বার উন্মোচন পূর্বক শত্রুদলের সম্মুখীন হইল । এক সহস্র যোদ্ধৃপুরুষের মধ্যে মাত্র উনিশ জন মাত্র লোক তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; অবশিষ্ট লোকেরা রাজ-প্রাসাদেই রহিয়া গেল । মোখ্তার বাহির হইয়াই ভীষণভাবে অন্ত্র-সঞ্চালন করিতে লাগিল ; কিন্তু কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর তরফাঃ ও তরাফ্-বিন্-আবদুল্লাহ্, বিন্-দজাজাহ্, থয়ফি নামক ভ্রাতৃ-যুগলের হস্তে নিহত হইল । ৬৭ হিজরীর ১৪ই রমজানুল মবারক মোখ্তার ‘মক্‌তুল’ (নিহত) হইয়াছিল । মোখ্তারের ‘হামরাহী’ (সঙ্গীয়) দিগের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্, বিন্-আলী-বিন্-আবিতালেব ও নিহত হইয়াছিলেন ।

অতঃপর কছরে এমারতস্থ অবরুদ্ধ লোকদিগকেও বন্দী করা হইল ; ইতিপূর্বে যুদ্ধে পরাজিত লোকদিগের মধ্যেও বহুসংখ্যক যোদ্ধৃ-পুরুষ বন্দী হইয়াছিল । ইহাদের সকলকে কুফা নগরের এক প্রশস্ত ময়দানে আনয়ন করা হইল । ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত, মছরব (রাজিঃ) সেনাপতিদিগের নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন । সেনাপতি মহলব-বিন্-আবি ছফ্‌রাঃ বলিলেন, ইহাদিগের সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ; কিন্তু মোহাম্মদ-বিন্-আলাশয়ত এবং অন্যান্য কুফী সেনানিগণ মরছব-বিন্-যোবের (রাজিঃ)-কে বলিলেন ; আপনি কদাচ এই সকল লোকের জীবন রক্ষা করিবেন না । মছরব-বিন্-যোবের (রাজিঃ) হয়রান ছিলেন যে, এ সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য । কুফী

নেতৃ-মণ্ডলী বলিতে লাগিলেন, এই বন্দী লোক গুলি মোখ্তারের হস্তে বয়্যেত করিয়া কুফা নগরের এমন কোনও ঘর ছাড়িয়া দেয় নাই, যে গৃহের কোনও না কোনও লোককে হত্যা করা হইয়াছে । যদি এই লোক গুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কুফার লোকেরা বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে । এই বন্দী লোকদিগের সংখ্যা ছিল ৬০০০ ছয় হাজার ; ইহাদের মধ্যে ৭০০ আরব, আর সকলে ইরানী (পারস্যবাসী) ছিল । মছয়ব-বিন্-যোবের (রাজিঃ) অনেক চিন্তা করিয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহাদিগকে ‘কতল্’ (হত্যা) করাই উচিত । তদনুসারে ইহাদিগকে হত্যা করা হইল ; সঙ্গে সঙ্গে কুফাবাসিগণ ও শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল । কিন্তু এই সকল নিহত লোকেরা কারবালার ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট লোক-দিগেরই হত্যা সাধন করিয়াছিল, সে কার্য তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না ; রাজ-নীতিক-চক্রে আজ তাহাদের হত্যা সাধন হইল ।

মছয়ব (রাজিঃ) মোখ্তারের দুই হস্ত কাটাইয়া, কুফার জামেয় মছজেদের দ্বারদেশে তাহার মৃতদেহ লট্কাইয়া (ঝুলাইয়া) রাখিলেন । হোজ্জাজ-বিন্-ইউছফের শাসনকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঐ মৃতদেহ তথায় ঝুলিতে ছিল । এইরূপে কারবালার কাণ্ডের ষবনিকা পতন হইল ।

এরাকের কুফাঃ শহর ।

হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফত-কালে যখন পারস্যের রাজধানী “ মদায়েন ” ও অন্যান্য বহু নগর-নগরী বিজয়ী মোছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইল, তখন পারস্য-বিজয়ী মহাবীর হজরত ছায়াদ-বিন্-

আবি ওকাছ (রাজিঃ), মহামান্ন খলিফাকে পত্র লিখিলেন যে, মদায়েনের ‘আব-হাওয়া’ (জলবায়ু) আরবদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে ; ঐ সময় মদায়েনেই পূর্বদেশ আক্রমণকারী মোছলমানদিগের প্রধান সামরিক আড্ডা (কেন্দ্রস্থল) ছিল । প্রধান সেনাপতি পত্রে ইহাও লিখিলেন যে, আব-হাওয়ার প্রতিকূলতা বশতঃ আরবদিগের ‘রং-রূপ’ (বর্ণ এবং সৌন্দর্য) ও বদলিয়া গিয়াছে । পত্র পাইয়া মহামান্ন খলিফা উত্তর লিখিলেন, ছাউনীর ■■■ এমন কোনও স্থান নির্বাচন করুন, যে স্থান কোরাত (ইউফ্রেটিস্) নদীর তটবর্তী এবং যে স্থান শ্রামল বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর হয় । আবার সঙ্গে সঙ্গে জল ও স্থল উভয় বিষয়ের পক্ষেই সুবিধা-জনক এবং অনুকূল হইতে পারে । মহামান্ন খলিফার আদেশ ক্রমে প্রধান সেনাপতি হজরত ছায়াদ-বিন্ আবি ওকাছ (রাজিঃ)—ছোলেমান (রাজিঃ) ও হযিকাঃ (রাজিঃ)-কে উপযুক্ত স্থান-নির্বাচন কার্যে নিযুক্ত করিলেন । তাঁহারা উভয়ে কুফার যমিনেই এছলামী সেনাদলের বাসস্থানের ■■■ মনোনীত করিলেন । “ কুফাঃ ” শব্দের অর্থ ‘রেতিলি’ (বালুকাপূর্ণ) ও ‘কঙ্করিলী’ (কঙ্কর পূর্ণ) ভূভাগ ; এই অর্থে এই নগরের নাম “ কুফাঃ ” রাখা হইয়াছিল । ইতিহাসবেত্তা দিগের অনেকের মতে ইহা ঐ স্থান—যে স্থান হইতে হজরত নোহ্ (আলাঃ) মহাজল-প্লাবনের সময় জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন । আবার আরব জাতির বিশ্বাস, যে সর্প বেহেশতে হজরত হাওয়া (রাঃ—আঃ)-কে খোকা দিয়াছিল ; সেই সর্প রূপ শয়তান এই স্থানে নিক্ষিপ্ত হয় । এই জন্যই বোধ হয় কুফাঃ নগর বাসীদিগের মধ্যে ধূর্ততা, অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দাগাবাবীর প্রভাব এত বেশী ছিল । প্রাচীন কালে (এছলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে) যখন নওমান-বিন্-মন্সর এরাকও আরবের অধিপতি ছিলেন ; তখন এই স্থানের নিকটে তাঁহার রাজধানী ছিল । নওমান বংশীয়দিগের বিশ্ব-

বিস্তৃত যেনারত (প্রাসাদ) ‘খোরনক্’ ■ ‘ছদিরাঃ’ প্রভৃতিও এই স্থানের আশ-পাশে অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয় । এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম এবং ফোরাতে নদী হইতে মাত্র দেড় মাইল পশ্চিম দিকে ইহা অবস্থিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন । আরবগণ এই স্থানকে “ খন্দল আয্-রা ” অর্থাৎ “ আরেজে মহবুব ” নামে অভিহিত করিত । কারণ, এইস্থান বিভিন্ন প্রকার আরবীয় কুসুম মালার আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ; যথা :—কাহ ওয়ান, ককায়েশক্, কয়ছুম, ফরামী প্রভৃতি কুসুমদাম এই স্থানে আপনা হইতে জন্মিত । পরবর্তী কালে এই বৃহৎ নগরটি এমনই প্রসিদ্ধি লাভ করিল যে, ফরাত নদীও কুফাঃ নামে অভিহিত হইতে লাগিল । স্থলকথা, ১৭শ হিজরীতে এই নগরের ‘বনিয়াদ’ (ভিত্তি) স্থাপিত হয় । আর মহামান্ব খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ৪০ হাজার লোকের বাসোপযোগী করিয়া এই নগর প্রথমে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । ঐ পরিমাণ লোকের বাসোপযোগী গৃহাবলীও প্রথমেই কুফা নগরে নিৰ্ম্মিত হয় । হেইরাজ্-বিন্-মালেকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন গোষ্ঠীও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের ■■■ বিভিন্ন মহান্না (পাড়া—পল্লী) গঠিত হইয়াছিল । নগরের গঠন-প্রণালী ও সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধন সম্বন্ধে মহামান্ব খলিফার খাছ আদেশ-লিপি আসিয়াছিল । তীক্ষ্ণদর্শী মহামান্ব খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), রাজধানী মদীনা-তৈয়বায় বসিয়া নগরের নকশা ঠিক এবং রাস্তা গুলির পরিসর ইত্যাদি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন ; সর্ব প্রধান সাধারণ পথ গুলি ৪০ (৬০ ফুট) হাত চওড়া ছিল ; এই রোড্ বা স্ট্রীট্ গুলি স্থান বিশেষে ৩০ হাত এবং ২০ হাত প্রশস্তও রাখা হইয়াছিল । আর সাধারণ গলি পথ অর্থাৎ লেন গুলির পরিসর ছিল ■ হাত । জামেয়-মছজেদ একটি চৌরাস্তার সঙ্গম স্থলে উচ্চ চবুতরার উপর নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । ঐ মছজেদ এত বৃহৎ ও প্রশস্ত ছিল যে, ৪০ হাজার

লোক একত্রে উহাতে নমায্ পড়িতে পারিত । মহজেদের চতুর্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ‘খোলা যমিন’ (উন্মুক্ত ভূখণ্ড—মরদান) রাখা হইয়াছিল ।

নগর-পত্তনের সময় গৃহাবলী প্রথমে ঘাস ও পাতার দ্বারা নির্মিত হয় ; কিন্তু যখন ঘন ঘন আশুণ লাগিয়া উহা ভস্মীভূত হইতে লাগিল ; ঐ সংবাদ পাইয়া মহামান্ন খলিফা ইষ্টক, প্রস্তর ও মার্বেল পাথরাদি দ্বারা গৃহ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করিলেন । উৎকৃষ্ট এমারতাদির মূল্যবান প্রস্তর ও কাষ্ঠ সকল মদায়েন রাজধানীর পরিত্যক্ত গৃহাবলী হইতে আনিয়া লাগান হইল—যেমন বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হইতে ইষ্টক ও প্রস্তর রাজি আনিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মুর্শিদাবাদের বহু অট্টালিকাদি নির্মাণ করা হইয়াছিল । বাজারের রাস্তাগুলি খুব সোজা (সরল) রাখা হইয়াছিল ; এবং বাজারের ঠিক মধ্যস্থলে অতি সুন্দর “ চওক ” বিরাজ করিতেছিল । উহারই পাশ্বে একটি ‘অজিমখান’ (বিরাট—বিশাল) জামের মহজেদ উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এছলামের গৌরব ঘোষণা করিতেছিল । মহজেদের বিপরীত দিকে ‘মণ্ডি’ (বণিকদিগের কারবারের গৃহাবলী) নির্মিত হইয়াছিল । উহারই সম্মুখ ভাগে একটি সুবিস্তৃত ‘ছায়েবান’ (ছাদ-বিশিষ্ট খোলা গৃহ) প্রতিষ্ঠিত ছিল । উহার দৈর্ঘ্য ছিল ২০০ হস্ত । “ ছজে-রকাম ” নামক প্রস্তরের থামের উপর উহার ছাদ নির্মিত হওয়াতে, অপূর্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিত । সম্রাট্ নওশেরওয়ানের হুম্ম্য ও এমারতাবলী হইতে এই সকল মূল্যবান প্রস্তর আনিয়া এই ছায়েবান নির্মাণ করা হইয়াছিল । এস্থলে একথাও প্রণিধান যোগ্য যে, এ সময় পরিত্যক্ত ও উৎসন্ন প্রাপ্ত মদায়েন রাজধানীর কেহ অধিকারী ছিল না, সুতরাং ইহার এমারত ও অট্টালিকাদির মালেক যদি কেহ ছিলেন, তিনি বিজয়ী খলিফা । কিন্তু কায়পরাযণ সন্ধিচারক মহামান্ন খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ), পারসিক প্রজাদিগের যমিন

ও পরিত্যক্ত গৃহাদির মূল্য নির্ধারণ পূর্বক, “জয়িয়া” নামক করে (ট্যাক্স) উহা উম্মুল দিয়াছিলেন । জামেয় মছজেদ হইতে ২০০ হাত দূরে ‘আয়ওয়ানে হকুমত’ (শাসনকর্তার দরবার গৃহ ও বাসগৃহ বা রাজ-প্রাসাদ) নির্মিত হইয়াছিল । উহাতে ‘বয়তুল-মাল’ অর্থাৎ খাজানা:খানা: (রাজকোষ বা সাধারণ ধনাগার) ও ছিল । আবার অতিথি-অভ্যাগত দিগের বাসের জন্য একটি ‘আম মেহমান খানা:’ (সাধারণ অতিথিশালা)ও নির্মিত হইয়াছিল । উহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ‘মোছাকের’ (প্রবাসী) গণ বাস করিতেন ; ‘বয়তুল মাল’ (সাধারণ ধনাগার) হইতে তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল । প্রধান সেনাপতি হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওক্কাছ (রাজি:) পারস্ত দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া, ইরানীদিগের ন্যায় অনেকটা আড়ম্বর প্রিয় ও শৌখীন খেয়াল সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন । তদনুসারে তিনি স্বীয় বস-বাসের মহাজাঁক-জমক বিশিষ্ট একখানি বিরাট গৃহ নির্মাণ করেন । ঐ গৃহের ‘দরওয়াযা:’ (দ্বার) অতি ‘আলীশান’ (বিরাট—বিশাল) ছিল ; এই গৃহ-নির্মাণের সংবাদ যখন মহামান্ন খলিফার নিকট পৌঁছছিল, তিনি ইহাতে এই বলিয়া বড়ই ‘নারাজ’ হইলেন যে, আরব জাতি আরবের সাদা-সিদে ভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহের পথ পরিত্যাগ পূর্বক, ভিন্ন দেশের—ভিন্ন জাতির আড়ম্বর-প্রিয়তা ও বিলাসিতা অবলম্বন করিয়া, আপনাদের ‘শোজা:খানা’ (বীরত্ব-বাঞ্ছক) আদর্শ গুলি না বিসর্জন দিয়া বসে । এজন্য সেনাপতি হজরত-ছায়াদ (রাজি:)-কে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, আমি জানিতে পারিলাম, আপনি স্বীয় বস-বাসের জন্য একটি ‘কেলআ’ (কেল্লা—দুর্গবৎ বৃহৎ অট্টালিকা) নির্মাণ করিয়াছেন । জানিয়া রাখুন, উহা দোষখেরই একটি মহল । আমার ‘কারকুন’ (কর্মচারী) হইয়া আপনি এরূপ আড়ম্বর পূর্ণ বিলাসিতার পরিচায়ক অট্টালিকায় বাস করিবেন—যেখানে গরীব ‘মিছকিন’

ও ‘মজলুম’ (উৎপীড়িত) লোকেরা আপনার নিকট পর্য্যন্ত পঁহুঁছিতে পারিবে না—তাহাদের ‘ফরিয়াদ’ (অভিযোগ) আপনার কর্ণগোচর হইবে না । এমতাবস্থায় আপনার অধিকৃত বিশাল এলাকার চতুর্দিকে অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়া যাইবে । তিনি শুধু এইরূপ পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না—বরং মোহাম্মদ-বিন্-মোছলেমার নামে আদেশ-লিপি পাঠাইলেন যে, তুমি অবিলম্বে কুফা নগরে পঁহুঁছিয়া, প্রধান সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ)-এর নিশ্চিত বিরাট অট্টালিকা অগ্নি দ্বারা পুড়াইয়া দাও, ও উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেল । আমি ইহা ‘পছন্দ’ করি না যে, আমার ‘আহেল্‌কার’ (অধীনস্থ কর্মচারী) এরূপ আড়ম্বর ও জাঁক জমক বিশিষ্ট বিশাল অট্টালিকায় বাস করে—যাহাতে প্রজা সাধারণের পক্ষে তাঁহার ‘বারএয়াবি’ (সাক্ষাৎ লাভ) সম্বন্ধে কষ্ট ও অসুবিধা ঘটে । আদেশ প্রাপ্তি মাত্রে মোহাম্মদ-বিন্-মোছলেমাঃ কুফায় পঁহুঁছিয়া, রাশিকৃত কাষ্ঠ ঐ গৃহের দরওয়াজার নিকট স্তুপীকৃত এবং উহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন ; হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপন বা উচ্চবাচ্য করিলেন না ; দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট অট্টালিকা ভস্মীভূত হইয়া ভস্ম-স্তূপে পরিণত হইল । পরবর্ত্তী কালে দেখা গিয়াছে, হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-এর পুত্র ওমরু, দুর্জয় পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া, হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এবং তাঁহার শাহাদতের কারণ হইয়াছিল । কিন্তু পরিণামে অতি শোচনীয় ভাবে নিজেও নিহত হইল ।

কিছুদিন পরে একদা কুফার ‘বয়তুল-মালে’ (সাধারণ ধনাগারে) চুরি হইল । মহামান্ন খলিফার দূরদর্শিনী জ্ঞান, প্রতিভা ও সুবন্দোবস্ত প্রভাবে সকল দেশের—সকল স্থানের ছোট বড় সংবাদ অচিরকাল মধ্যে তাঁহার হজুরে পঁহুঁছিত ; কারণ তাঁহার নিযুক্ত অতি বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ গুপ্তচরগণ

সর্বত্র বিরাজ করিত ; এই চুরির সংবাদও অনতিবিলম্বে তাঁহার
 কর্ণ গোচর হইল । তিনি শাসনকর্ত্তা হজরত ছায়াদ (রাজিঃ)-কে
 পত্র লিখিলেন ‘আমুওয়ানে হকুমত্’ (শাসনকর্ত্তার কাছারী গৃহ) মহাজেদের
 সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিন । তদনুসারে হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) রোযিয়া
 নামক একজন সুবিখ্যাত পারসিক ‘মেয়মার’ (স্থপত্য—ইঞ্জিনিয়ার)
 কে এই নূতন ‘তায়মির’ (নির্মাণ) কার্যে নিযুক্ত করিলেন । সে
 অতি দক্ষতা সহকারে রাজ-প্রতিনিধির দরবারগৃহ মহাজেদের সঙ্গে
 মিলাইয়া দিল । এই মিলান কার্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইয়া-
 ছিল । হজরত ছায়াদ (রাজিঃ) এই পারসিক ইঞ্জিনিয়ারের কার্যে
 সন্তুষ্ট হইয়া, ঐ সুদক্ষ স্থপত্যের সঙ্গে আরও কতিপয় কর্ম্মঠ পারসিক
 রাজমিস্ত্রিকে মহামাত্ত খলিফার নিকট মদীনা-তৈয়বায় পাঠাইয়া দিলেন ।
 মহামাত্ত খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) এই সোধ-শিল্পীর প্রতি
 বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন ; এবং তাহার রোযিনাঃ (দৈনিকবৃত্তি)
 নির্দিষ্ট ও তাহার সঙ্গীয় স্থপত্যদিগকে সরকারী কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত করি-
 লেন । জামের মহাজেদ ব্যতীত প্রত্যেক কেল্লার (দুর্গের) জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
 মহাজেদ নির্মিত হইল । প্রথমতঃ কুফাঃ নগরে যে সকল ‘কবিলাঃ’ (জাতি—
 সম্প্রদায়) বসতি-স্থাপন করিল, তাহাদের সংখ্যা এইরূপ :—এমনে ১২
 হাজার ও নযার নামক স্থানের ৮ হাজার অধিবাসী ছিল ; অন্যান্য যে
 সকল জাতীয় লোক তথায় বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিল, তাহাদের নাম
 এই :—বনি ছক্কিফ, বনি হমদান, বনি বহিলাঃ, বনি হওয়াযন, বনি
 তগ্‌লব, বনি তমিম, বনি আছদ এবং আরও বহু সম্প্রদায় । ছাহাবা
 (রাজিঃ)-দিগের মধ্যে ১০৫০ জন এই নগরে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া-
 ছিলেন—তন্মধ্যে ২৪ জন ‘বোযর্গ’ (মহাত্মা) এরূপ ছিলেন, ‘খাহারা
 বদর যুদ্ধে তাঁ হজরত (ছালঃ)-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করেন । এই মহাত্মা-

দিগের দ্বারা কুফা নগরে হাদীছের রওয়ায়েত সম্বন্ধীয় আলোচনা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল ; এই কুফার এক এক গৃহ হাদীছ ও রওয়ায়েতের ‘দরছগাহ্’ (মাদ্রাছা বা শিক্ষাগার) এ পরিণত হইয়াছিল । সোফিয়ান-বিন্-আফিনাঃ—বিনি ‘আম্মাঃ হাদীছ’ অর্থাৎ হাদীছ শাস্ত্র-বিদগণের মধ্যে অন্ততম পুরুষ, তিনি বলিতেন, পবিত্র হজ্জ্ কার্য সম্পাদন জন্ত মক্কাঃ-মোবাজ্জমা, ‘কেরয়াত’ (বিস্তৃতভাবে কোরআন-পাঠ)-এর মদীনাঃ তৈয়বাঃ, আর হালাল-হারাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ—অর্থাৎ ফেকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষার জন্ত কুফা নগর ‘মস্তনদ’ (সনন্দ প্রাপ্ত) । এই শহর খলিফাঃ হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ)-এর খেলাফৎ-কাল মধ্যে উন্নতি, সম্মান ও গৌরবের এরূপ উন্নত শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল যে, ইহা “ জময়তল আরব ”, “ হুজ্জাতুল্লাহ্ ”, “ কানযল ইমান ”, “ রাছল এছলাম ” প্রভৃতি মহা গৌরব জনক নামে অভিহিত হইতে থাকে । ক্রমশঃ এই শহরের লোকসংখ্যা অপ্রত্যাশিত রূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল । ৪র্থ খলিফা হজরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজ্জু ইহাকে স্বীয় ‘দারুল-খেলাফতে’ (খলিফীয় রাজধানীতে) পরিণত করিয়াছিলেন । কিন্তু এই নগরের বিশেষত্বঃ এই ছিল যে, ঔপনিবেশিকগণ প্রধাণতঃ আরব জাতীয় লোকই ছিল ; অন্যান্য জাতীয় লোকের সংখ্যা খুব কমই দৃষ্ট হইত । ২৬৪ হিজরীতে আব্বাছ বংশীয় খলিফা ময়তমদ বিল্লাহের খেলাফৎ কালে যখন আলী-বিন্-যয়েদ উনুতীর বিদ্রোহ দমন করিবার পর খলিফার আদেশে এই নগরের লোকসংখ্যা গণনা করা হইল, তখন ৫০ হাজার ঘর কেবল রবিয় ও ময়র সম্প্রদায়ের ও ২৪ হাজার ঘর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ছিল । তদ্যতীত এমন বাসী ৬ হাজার ঘর অধিবাসী এই শহরে বাস করিত । সুতরাং এই নগরের ৮০ হাজার গৃহে (বাড়িতে) কম বেশ অন্ততঃ ২ লক্ষ অধিবাসী বাস করিত । বোন্দাদ নগর পত্তনের পূর্বে এই নগরের

অধিবাসী সংখ্যা যে আরও অধিক ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায় । হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহুর খেলাফৎ-কালে যখন ৬০।৭০ হাজার যোদ্ধ-পুরুষ এই নগর হইতেই বাহির হইত, তখন ইহার লোক সংখ্যা বোধ হয় ৩৪ লক্ষের কম ছিল না ।

পরবর্তী কালের পরিবর্তন ও পরিবর্তনে যদিও পূর্ববর্তী এমারতাদি অক্ষুণ্ণ থাকে নাই, তবুও ইহা ‘তায়াজ্জবের’ (আশ্চর্যের) বিষয় নহে যে, কোনও কোনও এমারতের ‘নেশান’ (চিহ্ন) সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত ‘কায়েম’ (বিদ্যমান) ছিল । হিজরীর অষ্টম শতাব্দীর বিশ্ব-বিশ্রুত ভ্রমণ-কারী এবনে বতুতাঃ দ্বীয় সুবিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, হজরত ছায়াদ-বিন্-আবি ওকাছ (রাজিঃ) যে ‘আরওয়ান’ (প্রাসাদ) নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার ‘বনিয়াদ’ (ভিত্তি) এখনও বিদ্যমান আছে ।

কুফার ‘এলুমি হায়ছিয়ত’ (বিজ্ঞানোচনার গৌরব) এই যে, আহলে ছোয়ত জমায়াতের ‘মশহর’ (সুবিখ্যাত) এমাম—এবং ফেকাহ-শাস্ত্রের এমাম আজম হজরত এমাম আবু হানিফাঃ (রহঃ) এই নগরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ফেকাহ হান্ফির ভিত্তি এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল । এমাম ছাহেব (রহঃ), দ্বীর্ণ প্রধান শিষ্য এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) ও এমাম কাজী আবু ইউছফ (রহঃ)-প্রমুখ মহা বিদ্বান পুরুষদিগের ‘শরকতে’ (সহকারিতায়) ফেকাহ যে ‘মজলেছ’ (সমিতি) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহা এই নগরেই বিরাজিত ছিল । ‘ফণ নোহ্’ এর (নোহ বিদ্বার—ব্যাকরণের) ভিত্তি ও প্রথমে এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত হয় । আবুল আছওদ ও দুইলী এখানে বসিয়াই প্রথমে নোহ বিদ্বার ‘কওয়ায়েদ’ (কায়দা বা প্রণালী) ‘মজবুৎ’ (দৃঢ়তর) করিয়া ছিলেন । ‘কুফি খৎ’ (কুফি ছাঁদের আরবী অক্ষর) এখানে বসিয়াই আরব পণ্ডিতগণ জারী করেন । হাদীছ, নোহ ও

আরবীর বড় বড় ‘ফনের’ (বিচার) আবিষ্কারকদিগের মধ্যে এব্রাহিম নখয়ী (রহঃ), হেমাদ (রহঃ), এমাম আবু হানিফাঃ (রহঃ), এমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রভৃতি, মোছলেম জগতে মহাপ্রাজ্ঞ ও মহা পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত । জগতে তাঁহাদের তুলনা নাই ।

বর্তমান সময়ে এই বৃহৎ নগরী উৎসন্ন প্রাপ্ত, জন-মানব শূন্য । ইহার বিপুল ভগ্নাবশেষ বোঙ্গাদ হইতে ৮৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ।

নূতন কুফাঃ ।

কুফার ধ্বংসাবশেষের নিকটেই একটি নূতন ‘কুছবাঃ’ (নগর) গড়িয়া উঠিতেছে—যাহা “ নজফ্ আশরফ্ ” (যে নগরে হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর পবিত্র মযার শরীফ্ বিরাজিত) হইতে ৪।৫ মাইল মাত্র দূরবর্তী । কাজেমীন ও বোঙ্গাদ হইতে এই পর্য্যন্ত ট্রাম গাড়ী যাতায়াত করে । এই ট্রাম অশ্ব-চালিত, এবং গাড়ীগুলি দ্বিতল । নূতন শহরে নদীর তটে একটি নূতন বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । উপরে কুফার যে বিরাট জামেয় মছজেদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে ; তথায় আজকাল এক বৃহৎ প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে । এই মছজেদের আজিমস্থান “ ছহন ” (চাতান) মহামান্য খলিফা হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহর ‘দারুল এমারতাঃ’ (আদালত বা কাছারী-গৃহ) রূপে ব্যবহৃত হইত । এখনও কাছারী গৃহের ‘নেশান’ (চিহ্ন) ‘মওযুদ’ (বর্তমান) আছে । যে মেহরাব বা দরওয়াযার নিকটে তাঁহার হত্যাকারী আবদুর রহমান এব্নে মলজুম তাঁহাকে তরবারির ভীষণ আঘাত করিয়াছিল, তথায় একখানি ‘খোশরুমাঃ’ (সুদৃশ্য) বাঙ্গলা নির্মিত

হইয়াছে । হজরত মোছলেম (রাজিঃ) ও হজরত হানী (রাজিঃ)-এর পবিত্র সমাধি এই স্থানে পরস্পর সম্মুখ ভাগে (ছামনা-ছামনী) অবস্থিত । দুরাত্মা ওবায়দুল্লাহ-বিন্-যেয়াদ কর্তৃক ইঁহারা যে অতি নৃশংসভাবে শহীদ হইয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । বহুসংখ্যক যাত্রী এই কবরদ্বয় ঘেয়ারত করিতে গমন করিয়া থাকেন । নব-প্রতিষ্ঠিত শহরের লোক সংখ্যা ১০ হাজার হইবে । ওছমানী আধিপত্যের শেষভাগে এই নব-গঠিত কুফা নগর ক্রমশঃ উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছিল । বর্তমান এয়াকী গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে সেই উন্নতি-শ্রোত বোধ হয় অক্ষুণ্ণ আছে । বর্তমান কুফা ও কারবালার মধ্যে আঙ্গকাল নৌকা-পথে যাতায়াত চলে । বর্তমান সময়ে এই নগরে বরফের কলও স্থাপিত হইয়াছে । কুফা ও কারবালা নগর ফোঁরাত নদী ■ নব খনিত 'নহর' (খাল) দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ।

কারবালার শহর ।

যে কারবালা-ক্ষেত্রে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালাম সদল বলে, অতি শোচনীয় রূপে—নৃশংসভাবে শহীদ হইয়াছিলেন, আর তাঁহার পবিত্র দেহ পাপাচারী পিশাচ-গণের দ্বারা অশ্ব পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল ; শাহাদতের ২৩ দিন পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা আসিয়া এমাম আলায়হেচ্ছালামের সেই চূর্ণ-বিচূর্ণীকৃত দেহাংশ এবং অপর শহীদ-গণের দেহ সকল যথানিয়মে কবরস্থ করিয়াছিল । অধুনা ঐস্থানে একটি সুদৃশ্য বৃহৎ নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । এই শহর বেলায়েত বোদগাদে—

বর্তমানে এরাক গবর্ণমেন্টের অধীনে বোঙ্গাদেহ ৬০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । কারবালার সেই চির স্মরণীয় মসজিদ বা বর্তমান কারবালা শহর হইতে ফোয়াত নদী ২০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে । কারবালার কাণ্ডের সময় নদী ঐ স্থানের ঠিক পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত । এই তেরশত বৎসরে উহা ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া ২০ মাইল দূরবর্তী হইয়াছে । বর্তমান সময়ে নদী হইতে একটি ‘নহর’ (খাল) খনন করান হইয়াছে । ঐ খাল “ হিন্দিয়া ” নামে অভিহিত । শহরের চতুর্দিক ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত । কারবালা নগর আজকাল একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান । ১৮৭৮ সালের গণনায় এই নগরের লোক সংখ্যা ৬০ হাজার নির্দিষ্ট হইয়াছিল । বর্তমান সময়ে লোক সংখ্যা আরও অনেক বাড়িবার কথা ; সম্ভবতঃ এক্ষণে প্রায় ১ লক্ষে পরিণত হইয়াছে । ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় তীর্থ যাত্রীর সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে ; শিয়াদিগের পক্ষে এই নগরী সর্ব প্রধান তীর্থ স্থান । নজফ্ আশরফ এবং কাজেমীনে ও শিয়াদিগেরই আধিক্য । এই সকল পবিত্র নগরে শিয়া-প্রধান দেশ হইতে শিয়াদিগের মৃতদেহ লইয়া গিয়া দফন করা হয় ; তজ্জন্ত এই সকল নগর প্রধানতঃ বিশাল “ গোরস্থানে ” পরিণত হইয়াছে । ভারতীয় বড় বড় শিয়াদিগের মৃতদেহ ও প্রধানতঃ কারবালায় সমাহিত হইয়া থাকে । গবর্ণরের বাসগৃহ যে বাজারের পথে অবস্থিত, ঐ স্থানের রাস্তা ঘাট অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । দ্বিতীয় বাজারের রাস্তা ও গলি সমূহ সঙ্গীর্ণ । এই নগরে ৬টি খুব বৃহৎ জামেয় মসজিদ বিদ্যমান । ইহার মধ্যে হজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের কবর যে মসজিদে আছে, ঐ মসজিদ অতি ‘শানদার’ (আড়ম্বর ও শোষ্ঠব পূর্ণ) ও বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট ; উহার গুম্বজোপরিস্থ সূবর্ণ কলস সমূহ বহু দূর হইতে যাত্রীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ ‘যাত্রীগ’ (তীর্থযাত্রী

বা যেসারতকারী), যেসারতার্থে তথায় গমন করেন । কারবালা মোসল্লার
 যমিন (ভূমি) তেমন উৎকৃষ্ট ও উর্বরা নহে ; উহা মরুভূমি-সংশ্লিষ্ট
 অমুর্বর স্থানই ছিল । বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং অর্থব্যয়ে উহাতে
 সুন্দর বাগ-বাগিচাঃ তৈয়ার করা হইয়াছে । রওজাঃ শরীফের অভ্যন্তরস্থ
 কোব্বায় ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত এমাম আলায়হেছালাম ও তদীয়
 জ্যেষ্ঠ পুত্র তরুণ যুবক ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ হজরত আলী আকবর (রাজিঃ)
 এর কবর, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নির্মিত আছে । কোব্বার বাহিরে হজরত
 হবীব-এব্নে মজাহেরের কবর ও স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে ; কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র
 কবরের অস্তিত্ব সন্দেহ জনক । অবশিষ্ট শহীদগণের মৃতদেহ একই কবরে
 দফন করা হইয়াছিল । এখান হইতে ২ বা ৩ মাইল দূরে হজরত আব্বাছ
 ‘আলমদার’ (যুদ্ধের পতকাবাহী [রাজিঃ])-এর কবর বিরাজিত ।
 এই কবর ও হজরত ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ (রাজিঃ)-এর সমাধি-গৃহের
 অমুকরণে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত ; কিন্তু ইহাতে শীশার (কাচের)
 কারুকার্য অতি মনোহর ও শোভনীয় । এই উভয় কবরের মধ্যস্থলে
 একটি নব-নির্মিত সুদৃশ্য বাজার অবস্থিত । মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে
 কতিপয় মিনার দৃষ্ট হয় ; উহাতে ছোলতানতে ওছমানীয়ার বিবিধ ঘটনা
 যুক্ত প্রস্তর-ফলক আছে ।

কারবালা মোসল্লার রওজাঃ মোকদছ প্রথমতঃ ইষ্টক ও মৃত্তিকা
 নির্মিত মামুলী রকমের ছিল । কিন্তু মহা পরাক্রমশালী ওছমানীয় ছোলতান
 ছিলেন—যাহার সঙ্গে পারস্যের শিয়া বাদশাহের সর্বদা যুদ্ধ-হাঙ্গামা হইত ;
 আর যিনি মেছের জয় করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন মেছেরের আব্বাছীয়
 খলিফাকে কিছু ‘পেশ্‌কশ্’ বা ‘নজরানাঃ’ প্রদান পূর্বক খেলাফত গ্রহণ
 করিয়াছিলেন—ইনি বড়ই দীনদার পরহেয্‌গার এবং খাদেম-এছলাম
 ছিলেন । উল্লিখিত মহামান্ন ছোলতান এই পবিত্র মস্জার পরীফ্‌কে অতি

সুদৃশ্য ভাবে নির্মাণ করাইয়া দেন, এবং উহার চতুর্দিকে বাজার বসান । তিনি আরবদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া উপরোক্ত নহর অর্থাৎ খাল খনন করাইয়া দেন । কারবালায় প্রবাদ আছে যে, ছোলতান ছলিম টাকা মাটিতে বিছাইয়া দিয়াছিলেন ; আর তদ্রূপ আরবদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা খাল কাটিয়া এই টাকা তুলিয়া লইয়া যাও । ই'নিই হজরত ছৈয়দশ্ শোহাদাঃ ও হজরত আব্বাহ (রাজিঃ)-এর কবরের তত্ত্বাবধান জন্য একদল 'খাদেম' (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিয়া দেন । ঐ খাদেমদিগের বংশধর দিগের নিকট ঐ 'নেকনাম' ছোলতানের প্রদত্ত নিয়োগ-পত্র বা সার্টিফিকেট রহিয়াছে ।

ওছমানীয়া খেলাফতের শেষভাগে—ছোলতান আবদুল হামিদ খানের ছোলতানতের শেষ অংশে, মহামতি কাজেম পাশা বোঙ্গাদেহর গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া আসিয়া, বাজার গুলিকে 'বা-কায়েদাঃ' (শৃঙ্খলাবদ্ধ) ও রাস্তা গুলিকে বেশ প্রশস্ত করিয়াছিলেন । এখানকার তদানীন্তন শাসনকর্তা কালেক্টর কিংবা ডেপুটী কমিশনারের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন । কথিত আছে, ই'নি স্বয়ং কুলিদিগের সঙ্গে মিলিয়া কুলিদিগের স্মারাই কাজ করিতেন ; এবং কঠোর পরিশ্রম করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না । এই কার্যের বরকতে ই'নি পরে বঙ্গার গবর্ণর নিযুক্ত হন । ই'নি ভূতাদিগের সঙ্গে থাকিয়া রাত্রিকালে স্বয়ং মযার শরীফের বাতিগুলি জালাইতেন ।

পরবর্তী এক গণনায় নগরের গৃহ-সংখ্যা ৮০০০ ও অধিবাসী সংখ্যা ৮০ হাজার স্থিরীকৃত হইয়াছে ; ইহাদের অধিকাংশই শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত । এই নগরে ছাপাখানাও আছে, সেই প্রেস হইতে "আছর" নামক পারসী ভাষায় একখানি দৈনিক সংবাদপত্র বাহির হয় । শিয়া-গণের বিশ্বাস, এই পবিত্র নগরে কবরস্থ হইলে তাহাদের 'নজাত' (মুক্তি) লাভ সুনিশ্চিত । ছৈয়দশ্ শোহাদার পবিত্র মযার শরীফের

নৈকট্য ও দূরত্বানুসারে তুর্কী ছোলতানতের সময় প্রত্যেক কবরের দেড় গিনি হইতে ১২ গিনি পর্য্যন্ত মূল্য আদায় করা হইত । বর্তমান এরা ক গবর্ণমেন্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, জানা যায় নাই । এই টাকা ওয়াক্ফ বিভাগে জমা হইত—যাহা হরমের মেরামত এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করা যাইত ।

কারবালা মোরাল্লার যেয়ারতের জন্ত যখন আরব, পারস্য, সিরিয়া, মেহের ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়, তখন এখানে জিনিষ-পত্র ক্রয়-বিক্রয় যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে । যে সকল কাফণের কাপড়ে দোওয়া-দরুদের ছাপ দেওয়া থাকে, উহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয় । লোকে ঐরূপ কাফণের কাপড় বিস্তর ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যায় । তছবিহ ও যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে । ভারতীয় যাত্রীগণের পক্ষে করাচি হইতে জাহাজে বসিয়া হইয়া তথায় যাওয়াই সুবিধাজনক । যাহারা হেজাযের পথে গমন করেন, তাঁহারা মদীনা-তৈয়বাঃ হইতে রেলযোগে দেনেক বা হলব হইয়া, মোটর যোগে বোঙ্গাদের পথে কারবালায় উপস্থিত হইতে পারেন ।

যাহারা পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য সম্পাদন জন্ত পবিত্র আরবস্থ হেজায ভূমিতে গমন করেন, তাঁহারা যদি অন্ততঃ শা'বান মাসের ১ম ভাগে এদেশ হইতে যাত্রা করেন, এবং পবিত্র রমজান শরীক্ মক্কা-মোকাররমায় অতিবাহিত করিয়া মদীনা-মক্কাওয়ায় যান ; আর তথা হইতে হেজায-রেলওয়ে যোগে বয়তুল মোকাদ্দছ ও দেমেশক্ হইয়া মোটর যোগে বোঙ্গাদ, কারবালা, কুফাঃ, নজফ্-আশরফ্, কাজেমীন ও বস্রার যেয়ারত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আবার ঐ পথে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন, এবং পবিত্র হজ্জ্ কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে বেশ-হইতে পারে । কিন্তু ইহা অর্গশালী লোকদিগের জন্তই সুবিধাজনক । পক্ষান্তরে

ঠিক ঐ সময়ে করাচি বন্দর হইতে এরা কে—বসায় গমন পূর্বক সমুদয় পবিত্র স্থানের যেরারত কার্য সম্পন্ন করিয়া, মদীনা-তৈয়বায় উপস্থিত হইলে, এবং তথাকার যেরারত কার্য সম্পন্ন করিয়া মক্কা-মোয়াজ্জমায় গমন এবং হজ্জ্ কার্য সম্পন্ন করিলে, যথা সময়ে জেদ্দার পথে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন, ইহা মধ্যবিন্ত শ্রেণীর বাত্নীদিগের পক্ষে সুবিধাজনক । ইহাতে ৫টি মাস সময় অতিবাহিত হয় । এরা ক, শাম ও ‘ফলস্তিন’—প্যালেষ্টাইন (বস্তুল-মোকদ্দছ)-এর যেরারত কার্য করা অতি পুণ্যানুষ্ঠান । জুখের বিষয়, আমাদের দেশের নওয়াব, আমীর-ওমরাহ, জমীদার-তালুকদার-ছওদাগর প্রভৃতি অর্থশালী লোকেরা হজ্জের ফরজ আদায় করিতে নিতান্তই কুষ্ঠিত ; অথচ নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাস-ব্যসন জনক বেহুদা কাজে অজস্র অর্থ অপব্যয় করেন । তাঁহারা পবিত্র হজ্জ্ কার্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল পবিত্র স্থানের যেরারত কার্য সম্পন্ন করিলে একদিকে ‘ছওরাব্ হাছেল’ (পুণ্যভাভ), অন্য দিকে ভ্রমণ-জনিত সুখভোগ ও স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভ করিতে পারেন ।



হজ্জরত এমাম হোছেন আলায়হেছালামের

হেছালামের ‘ছের মবারক’

(পবিত্র মস্তক) ।

হজ্জরত এমাম হোছেন আলায়হেছালামের পবিত্র মস্তক, এমাম জয়নাল আবেদীন (রাজিঃ), দেমেশ্কে হইতে মদীনায় লইয়া আসিয়াছিলেন, ইহা ত বিভিন্ন রাবি ও বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় ;

কিন্তু উহা কোথায় দফন করা হইয়াছিল, একথা সুস্পষ্ট রূপে জানা যায় না । মেহেরের রাজধানী 'কায়রো' (আল-কাহেরা) শহরে তাঁহার পবিত্র মস্তক দফন হইয়াছিল বলিয়া কথিত ; এবং সেই স্থলে এক অতি বিরাট ■ সুদৃশ্য জামেয়-মছজেদ বিরাজ করিতেছে । বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মোছল-মান যাত্রী গিয়া সেই পবিত্র মবার শরীফ্ বেরারত করিয়া থাকেন । ছের মবারক কিরূপে মেহেরে নীত হইল, তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ নীরব । হুজরত এমাম যয়নাল আবেদীন (রাজিঃ), স্বীয় ওয়ালেদ-মাজেদের পবিত্র মস্তক মদীনা তৈয়বার, তাঁহার মহামাননীয়া দাদী আন্না ও জ্যেষ্ঠ চাচ্চার পবিত্র কবর শরীফের পাশে কেন দফন করাইলেন না ; ইহার কোনও কারণ উপলব্ধি করা যায় না । যেখানে তাঁহার পিতার নানাজানের— হুজরত ছরওয়ারে কায়েনাত জনাব রছুলে আকরম (ছালঃ)-এর পবিত্র রওজাঃ মবারক বিদ্যমান, যে পবিত্র নগরী তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের জন্ম-ভূমি, সেই নগরে ছের মবারক দফন না করিয়া বহু দূরবর্তী মেহেরে কেন পাঠাইলেন, আর কে তাহা সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা একটি প্রহেলিকায়ময় ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় । অগত্যা মেহের—কায়রো শহরে তাঁহার ছের মবারক কবরস্থ হইয়াছে বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে ।

প্রহকাতের শেষ প্রার্থনা ।

আমরা এই স্থলেই হুজরত এমাম হোছেন আলায়হেচ্ছালামের জীবনী এবং পাক পাঞ্জতনের পূত জীবন-কাহিনী শেষ করিলাম । এক বিশাল চমৎকার সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম বলিয়া আজ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ । জীবনের শেষ ভাগে—এই ভগ্নদেহে, ঈদশ

বিরটি কার্য যে সমাধা করিতে পারিব, সে ভরসা বড় ছিল না। জনাব হজরত রেছালতমাব (ছালঃ) ও পাক পাক্তনের দোওয়ার বরকতে আমার এই চেষ্টা ও সাধনা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে ; এজন্য আ হজরত (ছালঃ)-এর নামে লক্ষ লক্ষ দরুদ ; আর মহামান্ন আহ্লে বয়েত ■ ছাহাব কারামের পবিত্র রুহের প্রতি সংখ্যাভীত ছালাম জ্ঞাপন করিতেছি। হে দয়াময় আল্লাহ্, জব্বানহ ! তুমি তোমার প্রিয় নবীর ওছিনায় মোছলমান-দিগের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল বিধান কর। আহ্লে বয়েত ও শহীদানে কারবলার আত্মত্যাগ ও শাহাদৎ-প্রাপ্তির বরকতে এবং পুণ্য ফলে সমগ্র মোছলমান জাতির মঙ্গল বিধান কর ; তাহাদিগকে সৎপথের পাহু কর ; তাহাদিগকে সর্ব-প্রকার পাপ কার্য হইতে বিরত ও বিমুক্ত রাখ। আর পাক পাক্তনের অতুলনীয় পবিত্র আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্বক তাহারা বাহাতে আদর্শ মোছলমান রূপে ছনিয়াতে বিরাজ করিতে পারে, তাহার 'তওফিক' প্রদান এবং ব্যবস্থা কর। সর্ব-প্রকার পাপাচার, স্বার্থ-পরতা, কুটিলতা, পরানিষ্ট সাধন-স্পৃহা ও শয়তানের 'পরবি' হইতে ওস্মতে মোহাম্মদীকে রক্ষা কর। পবিত্র শরা-শরিয়তের অনুগামী হইয়া প্রত্যেক মোছলমান বাহাতে জব্বত (বেহেশত্) বাসের, এবং তোমার পবিত্র দীদার লাভের অধিকারী হইতে পারে, হে দয়াময় আল্লাহ্ ! তুমি তাহার উপায় বিধান কর। এছলামের জন্ত আত্মোৎসর্গের শক্তি তাহাদিগকে দাও। তুচ্ছ পার্থিব মোভের বশবর্তী করিয়া তাহাদিগকে পরকালের ভীষণ আধাবে নিপাতিত করিও না।

হজরত এমাম হোছেন আলায়হেছালামের শাহাদত-ব্যাপার পৃথিবীর মোছলমানদিগের পক্ষে একটি হৃদয়-বিদারক শোচনীয় ঘটনা ; পক্ষান্তরে একটি মহান শিক্ষণীয় বিষয়। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার অধিবাসী ও প্রবাসী মোছলমান মাত্রেই প্রতি বৎসর মোহররম মাসে

একবার ইহাদের জন্য শোক-প্রকাশ করিয়া থাকেন । আবার শাহাদতের দিবস—অর্থাৎ ১০ই মোহররম আশুরার দিন শোক প্রকাশের প্রধান স্থতি-দিবস । কিন্তু এই উপলক্ষে নানাদেশে—বিভিন্ন জাতীয় মোছলমানদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম-বিরুদ্ধ বেদমাত কার্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । পারস্তদেশবাসী শিয়াদিগের বেদমাত-অনুষ্ঠান চির প্রসিদ্ধ । সেই অনুকরণে ভারতবাসী শিয়াগণও নানাপ্রকার বেদমাত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । কেবল তাহারাই নহে—ভারতীয় ছদ্মী মোছলমানগণের এক প্রকাণ্ড দল এই উপলক্ষে যে সকল বেদমাতও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়, তাহা অধিকতর লজ্জা-জনক পাপানুষ্ঠান । তাহাদের সেই অশ্রাব্য ও উদ্ভট নর্তন-কুর্দন, তাজিয়াদারী, “হায় হোছেন—হায় হোছেন” বলিয়া উচ্চ চীৎকার ও উৎকট তাণ্ডব বড়ই হৃদয় বিদারক ব্যাপার । কোথায় শাহাদত-প্রাপ্ত মহাত্মাদিগের নামে কোরআন শরীফ ও দোওয়া দরুদ পাঠ এবং নফল নমাজ পড়িয়া, উহার ছওয়াব তাঁহাদের পবিত্র রুহের প্রতি বখশিয়া দিবে; রোজা রাখিয়া, দান-খয়রাত করিয়া ও দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইয়া তাহার পুণ্য শহীদ মহাত্মাদিগের রুহের উপর অর্পণ করিবে; নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিবে; তাঁহাদের পবিত্র জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া নীরবে শোক প্রকাশ করিবে; তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্বক আপনাদের চরিত্র গঠন করিবে; পবিত্র এছলাম ধর্ম-রক্ষার্থ আত্ম-বিসর্জন করিতে শিক্ষা করিবে; এবং স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে ঐ পুণ্য-কাহিনী শুনাইয়া ধর্মের নামে আত্মাহুতি প্রদানে অনুপ্রাণিত করিবে; অনবরত দরুদ শরীফ পাঠ করিবে; এতিন বালক-বালিকাদিগের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মেহ ও করুণা প্রদর্শন করিবে; মোছলমানদিগকে শরবৎ পান করাইবে; খিচুড়ি বা অন্ন ও রুটি ইত্যাদি খাওয়াইবে; বিশেষতঃ আশুরার পূর্ব রজনীতে নির্দিষ্ট নফল নমাজ সকল পড়িবে, এবং পরম করুণাময় খোদা

তা-লার দরগায় গিরিয়া ও জারি করিতে থাকিবে ; পবিত্র এছলাম ধর্মের অনন্ত গৌরব এবং সত্য ও ঈশ্বরের মর্যাদা রক্ষার্থে কিরূপে আত্ম-বিসর্জন করিতে হয়, তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিবে ; তাহা না করিয়া নানাপ্রকার 'বেহুদা হরকৎ', শোক-গাথা বা 'মরছিয়া' পাঠ করা, আঙণের লুক (মশাল) জ্বালাইয়া অগ্নি-ক্রীড়া করা, বাজ-বাজনা করা, পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মারামারি করা—এমন কি মদ ও তাড়ি প্রভৃতি নেশা পান করা কতদূর ভীষণ পাপানুষ্ঠান, তাহা একবারও স্মরণ করে না । এই সকল পাপানুষ্ঠানে তাহারা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকে । সুখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে এই সকল বেহুদা অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব অধুনা নাই বলিলেই চলে । কলিকাতা, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, হাওড়া, লুগলী, বর্তমান প্রভৃতি বড় বড় শহরে, বড় বড় কল-কারখানার শ্রমজীবী দিগের মধ্যে—বিশেষতঃ হিন্দুস্থানী ও বিহার প্রদেশীয় এবং থাছ শহরবাসী লোকের মধ্যে এই সকল বেদমাত আজিও পূর্ণভাবে বিরাজিত ।

কিন্তু এই মহররম উপলক্ষে লাঠি ও তরবারি খেলা, তীর ও গুলেল বাঁশের লক্ষ্য ঠিক করা, ডন ও কুশ্‌তি-কছরত প্রভৃতি বীরত্বাভিনয় করা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে । এটুকু না করিলে মোছলমানদিগকে ভবিষ্যতে বড়ই বিপন্ন হইতে হইবে ।

মোনাজাত ।

রহমান রহিম আল্লা, জলিল জব্বার রব ।

তব সৃষ্ট আকাশ ও চন্দ্র সূর্য্য আদি সব ॥

এহ-উপএহ তারা, সাগর পাহাড় যত ।

ধুমকেতু উল্কাপিণ্ড, আদি নাম কব কত ॥

বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম, কেবল ও জেন নর ।
 গো-নহিষ মেঘ ছাগ, সিংহ ব্যাঘ্র কি বানর ॥
 মৃত্তিকা ও বায়ু পানী, সুবিশাল মরুভূমি ।
 হে করিম ! এ সবার একমাত্র স্রষ্টা তুমি ॥
 সকলের স্রষ্টা তুমি, অনাদি অনন্ত প্রভু ।
 জন্ম নাই মৃত্যু নাই, বিশ্রাম নাহিক কভু ॥
 শ্রান্তি ক্লান্তি শূন্য প্রভু, নহ পুত্র নহ পিতা ।
 নিরাকার নির্বিকার জাহানের স্থাপয়িতা ॥
 জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমি করুণার মহাসিন্ধু ।
 সবার হিতকামী তুমিই প্রকৃত বন্ধু ॥
 সৃষ্ট মধ্যে শ্রেষ্ঠ : তব, নূর-নবী মোহাম্মদ (ছালঃ) ।
 সর্বগুণে গুণাবিত, অনুপম শ্রদ্ধাস্পদ ॥
 তোমার প্রথম সৃষ্ট, নবী মধ্যে তিনি শেষ ।
 তিনি সর্ব নবী শ্রেষ্ঠ, সন্দেহের নাহি লেশ ॥
 পাপ-পূর্ণ ধরা মাঝে, গড়িলেন ধর্ম রাজ্য ।
 অতুল তাঁহার শক্তি, অনুপম তাঁর কার্য ॥
 ঘোষিলেন মহাতেজে, তোহিদের মহাবাণী ।
 তাঁর শিষ্যগণ ছিল, জ্ঞান রাজ্যে মহাজ্ঞানী ॥
 কোরাণ নাজেল কৈলে, সেই ত নবীর প্রতি ।
 যাহার তুলনা নাই, ওহে জগতের পতি !
 অনন্ত রত্নের খনি, অই যে কোরাণ খানি ।
 ওহে মহাপ্রভু তব, অমীয় পবিত্র বাণী ॥
 খোল্ফায়ে রাশেদীন, আর আছহাবগণ ।
 আদর্শ মানব তাঁরা, আদর্শ ধার্মিক জন ॥

ফাতেমা নবীর কন্যা, নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ।
 স্বর্গের সম্রাজ্ঞী তিনি, নাহিক তাঁর উপমা ॥
 জামাতা হজরত আলী, শেরে খোদা মহামতি ।
 বীরত্বে অতুলনীয়, ধর্মের বিগল জ্যোতি ॥
 ধর্মের সাক্ষাৎ মূর্তি নবীর দুইটি নাতি ।
 ধর্ম-অমুষ্ঠানে ব্রতী থাকিতেন দিবারাতি ॥
 শহীদে অগ্রগণ্য ইঁহারা দুইটি ভাই ।
 ছারে জাহানের মাঝে এঁদের তুলনা নাই ॥
 দরুদ তাঁহার প্রতি, বহুত ছালাম আর ।
 তিনি বিনে ওস্তানেরে তরাইতে শক্তি কার ?
 হে পরোয়ার দেগার, ওহে জিন্না দয়াময় !
 তোমার দীদার যেন, সবার নছীব হয় ।
 লেখকের পিতা মাতা আর ভাই বন্ধুগণ ।
 তোমার করুণা লাভে যেন না বঞ্চিত হই ॥
 প্রকাশক—মালেকের আত্মীয়-কুটুম্বগণ ।
 পিতা মাতা আর যত বান্ধব কিয়ৎ স্বজন ॥
 সবাকার তরে আল্লা দিও মুক্তি ও নাজাত ।
 দুই হাত তুলে এই করিতেছি মোনাজাত ॥

